এ-সংখ্যায়

আলোচনা

পঞ্চাশ বছরের শিল্পকলা আলোচনা। শতবর্ষে নীরদ সি চৌধুরী।

একানব্বই-এ হীরেন্দ্রনাথ। পটভূমিঃ লক্ষ্মণপুর বাথে।

বাঙালীর সমাজ জীবনে আড্ডা—প্রসঙ্গ : রণেশ দাশগুপ্ত। সুধী প্রধান।

অরুন্ধতী রায়ের 'গড্ ওফ স্মল থিংস্'। দুশো বছরের বাংলা নাটক। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে মোসলেম পত্রিকা।

গল্প

বারিদবরণ চক্রবর্তী। সীমা গঙ্গোপাধ্যায়। নীরদ রায়

কবিতা

প্রণব চট্টোপাধ্যায়। কমলেশ সেন। অনীক রুদ্র। ইন্দ্রাণী দত্ত অভীক রায় চৌধুরী নিখিলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। দুলাল ঘোষ

পুস্তক সমালোচনা ও অন্যান্য
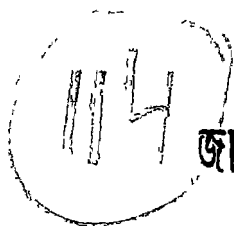
জাতীয় সংহতি

...ভারতের হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মুসলমান শিখ পার্সি খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্রক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ। ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো, সায়েন্স শেখানো নহে। লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয়, দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায় না, লওয়াও যায় না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
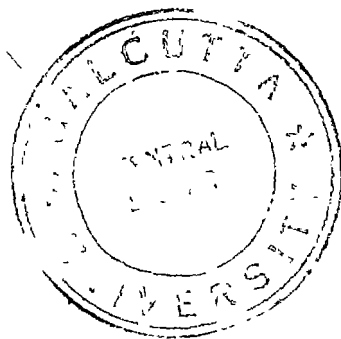
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ, ১৭০/৯৪

প্রত্যেক নবসাক্ষর জাতির গর্ব

বামফ্রন্ট সরকারের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গ্রামই সাক্ষর হয়েছে বা হতে চলেছে।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রতি মানুষের অক্ষরজ্ঞান প্রয়োজন। আসুন, আমরা সবাই মিলে প্রতিটি ঘরে সাক্ষরতার প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলি।

সাক্ষরতা প্রসারে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ১৭০/৯৮

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী ঃ

বিভিন্ন ধবনেব পবিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদের সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এই পবিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈবী হযনি। প্রাকৃতিক নিযমগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনের ক্রমবর্দ্ধমান ও জটিল চাহিদার সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নততর জীবনযাত্রার প্রযোজনে মাটি, জল, অবণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার কবেছে। অতিব্যবহাবেব ফলে যে ক্ষতি তা পূরণেব ব্যবস্থা না করেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গ্রহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকাবখানাব বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীব নির্মল স্রোতকে বন্ধ কবা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁযা ও কর্কশ উচ্চগ্রামেব শব্দ আমাদেব পবিবেশ দূষণেব শিকাব কবে তুলেছে।

কিন্তু আমবা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত ?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিবেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হযে যাবে, খরা এবং বন্যাব কবলে পড়বে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতেব অংসখ্য প্রজাতি চিরদিনেব মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দব গ্রহের বাতাস হযে পডবে নিঃশ্বাস নেবাব অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটছে আমাদের অপরিনামদর্শিতা লোভত্তপ্রাকৃতিক সম্পদেব ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদেব চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু তা কবতে হবে প্রাকৃতিক ভাবসাম্যেব হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যাব সাহায্যে আমবা এই বিপদেব মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংবক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়ার উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থাবী সংগ্রামের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি. এ. ১৭০/৯৮

ঐক্যই শক্তি

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—
ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি এ. ১৭০/৯৮

পরিচয় পড়ুন

ও

গ্রাহক হোন

পরিচয়

নভেম্বর ১৯৯৭-জানুয়ারি ১৯৯৮
কার্ত্তিক-পৌষ ১৪০৪
৪-৬ সংখ্যা ৬৭ বর্ষ

প্রবন্ধ

আলোচনা

গল্প

কবিতা

পুস্তক সমালোচনা

বিষয় সূচি

বিয়োগপঞ্জি

প্রচ্ছদ

দীপ্ত দাশগুপ্ত

সম্পাদক
অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ
রঞ্জন ধর

কর্মাধ্যক্ষ
পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলী
ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য
শুভ বসু অমিয় ধর

উপদেশকমণ্ডলী
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়
মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস
সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত

পঞ্চাশ বছরের শিল্পকলাঃ শতাব্দী শেষের খতিয়ান

শোভন সোম

উনিশশো সাতচল্লিশ থেকে সাতানব্বইয়েব হিসেব, পঞ্চাশ বছবেব বা আধ শতকেব হিসেব। এই আধ শতকেব হিসেব শিল্পকলা বা যে-কোনও প্রসঙ্গে কবতে গেলেই প্রথমে প্রশ্ন উঠবে কেন এই হিসেব। এই হিসেব কি শুধু ক্ষমতা-হস্তান্তবেব পবিপ্রেক্ষিতে প্রযোজন। ক্ষমতা-হস্তান্তবেব কোনও প্রতিক্রিয়া কি আমাদেব শিল্পকলায পড়েছে! আবও প্রশ্ন উঠবে, আগেব যে আধ শতক অতিবাহিত হল, তাবই বা খতিযান কি? দুই আধ শতকে মিলে যে একটি শতাব্দী অবযব পেল, শিল্পকলাব দেশিক ব্যঞ্জনা আমবা তাব মধ্যে কি পেলাম!

ফবাসিতে ফ্যাঁ দ' সিযেক্লে বা শতাব্দীব অন্তিম উনিশ শতকেব শেষ চবণে যে দেশিক ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে দেখা হযেছিল, সেই দর্শনেব নিষ্কর্ষ ছিল এক সর্বব্যাপী হতাশাব সংক্রামক বোগ। শতাব্দী শেষেব ফবাসি চিত্রকব আদিলোঁ বদ' তাঁব ভইঁযজ বা ভিশনেব মধ্যে এক অদ্ভুত বসেব অবতাবণা কবেছিলেন। হিবঙ্গসেণ্ট ফান গখেব গনগনে আলোব গোলকের মতো আকাশেব তাবা, মৃত্তিকাব বন্ধন ছিঁড়ে উড়ে যেতে চাওযা সাইপ্রেস গাছ, উপচানো ফসলে ভবা মাঠেব উপব ঝেঁকে আসা কালো অলৌকিক কাকেব পাল, পল গগ্যাঁর সভ্য ইযোবোপ ছেড়ে ভুডু ও অলৌকিকে বিশ্বাসেব জগৎ সমুদ্রেব মধ্যে বিচ্ছিন্ন দ্বীপদেশে পলাযন, নবওযেব এডহ্বার্ড মুংখেব আর্তনাদ ছবিতে আগুনের ছুটন্ত হলকায় ভবা আকাশ, জলেব উপব এক আশ্চর্য সাঁকো এবং তাঁব উপ'ব অন্তবেব যন্ত্রণাব তাপে বেঁকেচুবে যাওযা এক পুবুষেব আর্তনাদ কাতব চিৎকাব—যে চিৎকাব স্থলে জলে অন্তবীক্ষে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে, এমন কি ইমপ্রেশনিস্ট-পোস্ট ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকবদেব সমাজেব বন্ধন সহবত ইত্যাদি উপেক্ষা কবে উচ্ছৃঙ্খল বোহেমিযান জীবনযাপন, সমস্ত পাবিবাবিক বন্ধন ত্যাগ কবে এক বিষাদময একাকিত্ব স্বেচ্ছায বেছে নেওযা, সিফিলিস-গনোবিযাকে দেহে জেনে শুনে স্থান কবে দেওযা, অ্যাকসাঁখ খেয়ে পড়ে থাকা এবং সর্বোপবি চতুষ্পার্শ্বেব ঘটমান জীবনেব আনন্দকে তুচ্ছ কবে ব্যক্তিগত বিষাদকে স্বাগত জানানোব মধ্যে শতাব্দী শেষের এক সংক্রামক বিষাদের পরিচয় মেলে। এই শিল্পীরা কেউ জীবিত থাকতে সমাজের

স্বীকৃতি পাননি। ফান গখ তাঁর ছবির খদ্দের পাননি। ভাই থিয়োর বদান্যতা ছিল তাঁর বেঁচে থাকার নির্ভর। জীবনে তিনি কারু ভালবাসা পাননি। আজ শুনলে চমকে উঠতে হয় যে এই ফান গখের একটি ছবি, নাম আইরিশ ফুল, মাপে আঠাশ ইঞ্চি × ছত্রিশ ইঞ্চি, অর্থাৎ সোয়া দু ফুট উঁচু ও তিন ফুট চওড়া, তার দাম পৃথিবীর বিখ্যাত নিলাম ঘর সদবি থেকে আট বছর আগে বিক্রি হয়েছে পাঁচ কোটি উনচল্লিশ লক্ষ ডলারে। কিনেছেন এক জাপানি বিমা প্রতিষ্ঠান।

ফ্যাঁ দ' সিয়েক্লের সর্বব্যাপী এক রোমান্টিক বিষাদ এমনই সংক্রামক হয়ে উঠেছিল যে, উনিশ শো সালে পাবলো পিকাসো স্পেইন থেকে ফ্রান্সে অভিবাসিত শিল্পী হিসেবে এসে এর সংক্রমণ এড়াতে পারেননি। তুলুজ লোত্রেকের ছবিতে ফরাসি শহরজীবনের উন্মার্গগামিতা, উদ্দেশ্যহীন এবং অসহ্য ক্লান্তিতে কেবল দিনযাপনের গ্লানির পৌনঃপুনিকতা তাঁকেও অভিভূত করে। শতাব্দী শেষে এসে মনে হয়েছিল, বোহেমিয়ান দায়িত্বহীন জীবনচর্যায় নিবেদিত হলেও ইমপ্রেশনিস্ট ও পোস্ট-ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রকরদের আলোক বনাম রঙের তত্ত্ব বিষয়ে অনুসন্ধান, দৃশ্যমান জগৎকে রঙের ভাষায় রূপান্তরজনিত সমস্যার একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজে নেবার চেষ্টা ইত্যাদির মধ্যে যে অন্তত প্রয়োগকৌশল ও শৈলীগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিল, তাও বুঝি শতাব্দী শেষের বিষাদে, শিল্পকলায় কোনও আশার জ্যোতির এই ব্যাপ্ত অভাবে কোথায় তলিয়ে যাবে। শতাব্দীর উৎক্রান্তি উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে ইয়োরোপে এই-ই হয়েছিল। উপনিবেশ বিস্তারের রমরমা, বাণিজ্যের বিশ্বগ্রাস ও এশিয়া আফ্রিকা দক্ষিণ আমেরিকায় অবাধ লুণ্ঠন দেখে বোঝা যাবে না, ইয়োরোপের শিল্পকলা ও সংস্কৃতির জগতে কোনু সর্বব্যাপী নাস্তি ছিল। বোঝা যাবে না, কোন নাস্তি থেকে শিল্পীরা সমাজের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে শিল্পের জন্যে শিল্পের চিৎকার করে চলেছিলেন। পিকাসো ফ্রান্সে শতাব্দীর শেষ বছরে এসে কিউবিজমের আগে নীল ও গোলাপি পর্বের যে ছবিগুলি এঁকেছিলেন, তার মধ্যে মানুষের দারিদ্র্য, বঞ্চনা, অভাব ইত্যাদি সামাজিক অসাম্যের প্রতি প্রতিবাদই ছিল, এ-কথা মনে করা ঠিক নয়। যে জীবন তিনি ওই দুটি পর্বের চিত্রমালায় দেখিয়েছিলেন, সেই জীবন ছিল সম্পূর্ণ নগরজীবন। দুটি-একটি ব্যতিক্রম বাদে, উনিশ শতক শেষের ইয়োরোপীয় চিত্রকলায় প্রবলভাবে নাগরিক নিম্নবিত্ত জীবন প্রতিফলিত হয়েছে। অনোরে দমিয়ে ও গুস্তাফ কুর্বে-র আগে চিত্রকলায় নিম্নবিত্ত জীবন ও দারিদ্র্য দেখানো ছিল এক ধরনের ট্যাবু, ছিল নিষিদ্ধ বিষয়। কিন্তু ওঁদের চিত্রকলা থেকে শতাব্দীর

শেষ অতিক্রান্ত হয়ে বিশ শতকের শুরু অবধি ইয়োরোপীয় চিত্রকলায় নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র-বঞ্চিতের জীবন রোম্যান্টিক আবেগে দর্শানো হয় নি। এদ্‌গার দেগা-র ছবিতে যে মেয়ে দুটি কাপড় ইস্ত্রি করছে, ওদের একজন ক্লান্তিতে হাই তুলছে, আরেকজন অবসাদে ঝুঁকে পড়েছে। এই ক্লান্তি, এই অবসাদ, শুধু প্রাণধারণের শুধু দিনযাপনের এই গ্লানি পিকাসোর নীল ও গোলাপি পর্বের ছবিতে, যা প্যারিস মাদ্রিদ বার্সেলোনার গরিব বস্তির মানুষের ছবি, তাতে আমরা দেখতে পাই।

এই ফ্যাঁ দ' সিয়েক্লে-র প্রতিধ্বনি আমরা রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য'র কবিতায় শুনি,

> "শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে
> অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে
> অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিণী
> ভয়ংকরী। দয়াহীন সভ্যতানাগিনী
> তুলেছে কুটিল ফণা ।"

ইয়োরোপে শতাব্দী শেষে যে বিষাদ সর্বব্যাপী হয়েছিল, তার কারণ হিসেবে রবীন্দ্রনাথ দয়াহীন সভ্যতানাগিনীর কথা বলেছিলেন। ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল রেভোল্যুশন যে পুঁজিসর্বস্ব ভোগবাদী জীবনবোধ ও মানুষে মানুষে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করেছিল তারই পরিণামে বিষাদ ছিল অনিবার্য। ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল রেভোল্যুশনের আগে উৎপাদন ব্যবস্থা ছিল কায়িক শ্রম ও হস্তকুশলতানির্ভর। সেই সমাজে শিল্পকলায় চারুকলা কারুকলা ও নিত্য ব্যবহার্য বস্তুর উৎপাদনের মধ্যে ইতরেতর বা উচ্চনীচ ভেদাভেদ ছিল না। সমাজ কোনও না কোনও উপায়ে শিল্পকলা ও শিল্পীর উৎপাদনের উপরে নির্ভরশীল ছিল এবং শিল্পীর রুজি-রোজগারের জন্যে কোনও গভীর সংকট দেখা দেয়নি। কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থা ক্রমেই যন্ত্রনির্ভর হতে থাকলে এবং উৎপাদনে শিল্পীর ভূমিকা গৌণ হতে থাকলে শিল্পীসমাজ সমাজে অবাঞ্ছিত হয়ে পড়েন। গির্জে ও সামন্ততন্ত্র আঠারো শতক অবধি কোনও না কোনওভাবে, তাদের মহিমা প্রচারের লক্ষ্যে হলেও, শিল্পকলা ও শিল্পীর পৃষ্টপোষকতা করেছিল। কিন্তু ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল রেভোল্যুশন তার অর্থনীতির ব্যবস্থায় শিল্পকলা ও শিল্পীদের আহ্বান করেনি। উনিশ শতকের মধ্য দুপুরে নিসর্গের দুই চিত্রকর—টার্নার ও কন্‌স্টেবল নিছক রোম্যান্টিক আবেগে নিসর্গের বন্দনা গান করেন নি, কিংবা সেই আবেগে যন্ত্রবিপ্লব-উত্তর

সমাজের চিহ্নাদি তাঁদের ছবিতে বর্জ্য মনে করেন নি। যে নতুন সমাজব্যবস্থায় শিল্পকলা ও শিল্পীর স্থান ছিল না, সেই সমাজব্যবস্থার প্রতি এক নিবিড় অনাস্থা থেকেই তাঁরা যন্ত্রবিপ্লব-উত্তর সমাজের ছবি আঁকেন নি। ইমপ্রেশনিস্টরাও মনে করেছিলেন যে, যে-সমাজব্যবস্থায় তাঁদের স্থান নেই, যে-সমাজ তাঁদের আহ্বান করে নি, সেই সমাজের প্রতি তাঁরা দায়বদ্ধ নন। সমাজের সব কিছুকেই তাঁরা অস্বীকার করতে চেয়ে বোহেমিয়ান উচ্ছৃঙ্খল জীবনধারা বেছে নিলেন। অতঃপর শিল্পী বলতেই যে একটা চালচুলোহীন, অদ্ভুত পোশাকের অদ্ভুত আচরণের মানুষ মনে করা হতে লাগল, যে আকাশচারী যে সমাজের নিয়মকানুন মানে না, সেই ইমেজ সেই থেকেই তৈরি হল। এমন কি পিকাসো, তাঁর চূড়ান্ত ও ঈর্ষণীয় আর্থিক সফলতার পরও তাঁর তথাকথিত অসামাজিক জীবনযাপন ছাড়তে পারেন-নি। এই সব তথাকথিত অসামাজিকতাই পরে তাঁদের আর্থিক সফলতার পরে তাঁদের ঘিরে কাল্ট তৈরির উপাদান হল। তাঁরা যে আর দশটা মানুষের মতো নন, তাঁরা যে আলাদা, সেই কাল্ট ও তাঁদের ছবির বা তাঁদের গড়া মূর্তিকলার বিক্রয়যোগ্যতা বিবর্ধনে সহায়ক হল। যে নঞর্থকতা তাঁরা সমাজের প্রতি তাঁদের প্রতিক্রিয়া দেখাতে প্রকাশ করেছিলেন, সেটা থেকেই তৈরি হল তাঁদের ইমেজ আর কাল্ট। এদেশেও দেখা যাবে, যাঁর তৈরি একটি ছোটো মাপের মূর্তি এক থেকে দশ লক্ষ টাকার মধ্যে যে-কোনও দাম তিনি চাইলেই বিক্রি হয়, যাঁর আঁকা পনেরো লক্ষ টাকা দামের একটি ছোটো ক্যানভাস বিত্তবান মানুষ তাঁর ড্রইংরুমে রাখাকে স্টেটাস্ সিম্বল মনে করেন, সেই শিল্পীকে হয়তো দেখা যাবে গরিব ভারতবাসীর দুঃখে কাতর হয়ে নগ্নপদে বিচরণ করতে, লিভাইজ্ জিন্সে তাপ্পি মেরে পরতে এবং বিড়ি খেতে। কারণ এগুলো তাঁর কাল্ট তৈরির জন্যে প্রয়োজন।

যে-দেশে পুঁজির বিকাশ ঘটেনি, যে-দেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোল্যুশন হয় নি, সে-দেশ আধুনিক নয়। ইয়োরোপের আধুনিকতার এই মাপকাঠিতে গোটা এশিয়া আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকা আধুনিকতার হিসেবের বাইরে। আধুনিকতার মাপকাঠি কৃষিনির্ভর, হাতের কৌশল নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তে যন্ত্র-নির্ভর, প্রকৌশল নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা ও বিশ্ব জুড়ে বাজার বিস্তার। আঠারোশো একাত্তরে অক্সফোর্ডের প্রোফেসর অফ অ্যানথ্রপোলজি এডওআর্ড টাইলার তাঁর 'প্রিমিটিভ কালচার' বইতে সভ্য মানুষ ও বর্বর মানুষের মধ্যে মানবিক অবস্থার বৈষম্য সম্পর্কে নিরীক্ষণে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভোল্যুশনকে

আধুনিকতার ও সভ্যতার মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। শ্বেতকায় পরিমণ্ডলের বাইরের মানবগোষ্ঠীর সমাজ ও জীবনচর্যা অধ্যয়নের জন্যে ইয়োরোপের বিভিন্ন রাজধানী শহরে এথনোগ্র্যাফিক্যাল মিউজিয়ম গড়ে তোলা হয়েছিল। শ্বেতকায় উপনিবেশবাদীরা, বিশেষ করে ইংরেজ মনে করতে থাকে যে, আধুনিক পরিমণ্ডলের বাইরের কৃষ্ণকায় জাতিকে উদ্ধার করতে তারা মর্ত্যভূমে অবতীর্ণ হয়েছে।

উপনিবেশবাদের কার্যক্রম ভারতে কেবল শাসনাধিকারের মধ্যেই সীমিত থাকেনি। ক্লাইভের রাজ্যজয়ের পর থেকেই বিজিত জাতির সংস্কৃতির নির্বৈধীকরণের বা ডিকালচারেশনের একটি কার্যক্রমও এদেশে শুরু হয়। বিজেতা জাতি তার ভাষা, সংস্কৃতি, শৌর্যবীর্য ও গরিমার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনে তৎপর থাকে এবং ক্রমাগত মানসিক অভিভাবন পেতে পেতে বিজিত জাতিও তার হীনমন্যতার কারণে বিজেতার ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রার আদর্শকে আত্মস্থ করে বিজেতার সঙ্গে মানসিক ঐকাত্মে এক হবার চেষ্টা করে। বিজেতার ভাষা, সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রাকে আত্মস্থ করে বিজিত জাতি তার অস্তিত্বকেই ভুলে যেতে চায়। তার নিজের সংস্কৃতি ও পরম্পরার প্রতি তাঁর মনে হীনতা জন্মায়, নিজের অতীতকে সে হয় জানে না কিংবা ভুলে যেতে চায় এবং নিজের দেশের যাবতীয় ব্যাপারকে সে অশ্রদ্ধা করতে শেখে।

ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহাসিক পরম্পরা পাঁচ হাজার বছরের বেশি পুরোনো। বিভিন্ন বহিরাগত জাতির সংশ্লেষ যেমন ভারতীয় শিল্পকলায় উর্বর পলিমাটিরআস্তরণ রেখে গেছে তেমনি শিল্পকলার প্রতিটি শাখায় ভারতীয়রা তাদের অসম কৃতিত্ব দেখিয়েছে। সুবৃহৎ ইমারতি প্রকল্প থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চিত্রকলা ও মূর্তিকলার প্রকল্প এদেশে বিস্ময়করভাবে সম্পন্ন হয়েছে। একটি শিল্পকলা যখন নির্মিত হয় তখন সেই নির্মাণ প্রকৌশলকেও এগিয়ে নিয়ে যায়। ইলোরার বিশাল পাহাড় থেকে বিরাট বিস্তারের যে হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মন্দির ও মূর্তিপ্রকল্প হয়েছিল বা অজন্তায় বিশাল পাহাড় কেটে যে গুহাগুলি খোদাই করা হয়েছিল, তা অতি উন্নতমানের প্রকৌশলজ্ঞান ভিন্ন সম্ভব হতো না। যিশুর জন্মের আগে যে অশোকস্তম্ভগুলি তৈরি হয়েছিল, বৌদ্ধশিল্পকলার যে অসংখ্য মূর্তি তৈরি হয়েছিল, তা প্রকৌশলগত পরিপক্কতা ছাড়া হতে পারত না। চোল রাজত্বকালে যে বিশাল মাপের ধাতুঢালাই মূর্তিগুলি নির্মিত হয়েছিল, সেগুলিও প্রকৌশলগত দক্ষতার পরিচয় বহন করছে। ভারতীয় শিল্পকলার

উন্নতির সঙ্গে প্রকৌশল বা টেক্‌নোলজিও উন্নত হয়েছে এবং ভারতীয় শিল্পীরা পরিকল্পনা, নির্মাণ, প্রকৌশল দক্ষতার চূড়ান্ত উৎকর্ষ তাঁদের স্থাপত্য ভাস্কর্য চিত্ররচনায় দেখিয়েছিলেন। জর্জ বার্ডউড্‌ আঠারোশো আশিতে 'দি আর্টস্‌ অব ইণ্ডিয়া' বইতে ভারতের তাৎকালিক প্রায় যাবতীয় হস্তকলার পঞ্জীয়ণ করেছিলেন কিন্তু অজন্তা থেকে কালীঘাট পট অবধি বিস্তৃত চিত্রকলার এবং সিন্ধুসভ্যতা থেকে বাংলার পোড়ামাটির মন্দির অবধি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের কোনও উল্লেখ তিনি করেননি। তিনি লিখেছিলেন, ফাইন আর্ট বলতে যা বোঝায় তার বিকাশ ভারতবর্ষে কস্মিনকালে হয়নি। ভারতীয়রা তাদের যা কিছু কল্পনা ও শক্তি কিম্ভূতকিমাকার সব দেবদেবীর মূর্তি তৈরিতে শেষ করে ফেলেছে। উনিশশো আটে স্টুডিয়ো পত্রিকায় 'দি নিউ স্কুল অফ পেইণ্টিং' নিবন্ধে কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ই, বি, হ্যাভেল লিখেছিলেন ক্লাইভ থেকে মেকলে' অবধি মানুষেরা শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে এই ধারণা দৃঢ়মূল করতে সমর্থ হয়েছেন যে, ভারতের নিজস্ব কোনও শিল্প পরম্পরা নেই, ইতিহাস নেই।

এই নির্বোধীকরণ বা ডিকালচারেশন ছিল উপনিবেশবাদী কার্যক্রমের অঙ্গ। বিজিত জাতিকে তার শেকড় থেকে বিচ্ছিন্ন করে সেই মাটিতে বিজেতার সংস্কৃতির বীজরোপণের ব্যাপার বিভিন্ন উপনিবেশে দেখা গেছে। বিজিত জাতিও তার হীনমন্যতার অবস্থান থেকে বিজেতার ভাষা সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা জ্ঞান করে উন্মার্গগামী হয়ে ওঠে। এই ডিকালচারেশনের কারণেই রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চোখে ওড়িশার সুরসুন্দরীদের মূর্তির চেয়েও রোম্যান নির্মিত কিউপিডের মূর্তি সুন্দর মনে হয়েছিল। এই ডিকালচারেশনের কারণেই ইয়োরোপের নিয়ো-ক্লাসিসিজমের অনুসরণে অ্যাকাডেমিক আদর্শে আঁকা রবি বর্মার ছবিকে স্বাগত জানিয়ে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন যে, "চিত্রকলা এদেশে তাহার সেই আদিম রঙ্‌লেপা বর্বর অবস্থা হইতে অল্পই অগ্রসর হইয়াছে।" একই কারণে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইতে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন যে, ইয়োরোপের মতো চিত্রকলা ও মূর্তিকলা হতে এদেশে ঢের-ঢের দেরি। এই শিক্ষিত মানুষদের ভারতীয় শিল্পকলার পাঁচ হাজার বছরের উজ্জ্বল বিস্তার, তার নান্দনিক যাবতীয় গুণ, তার নির্মাণ ও প্রকৌশলগত যা কিছু দক্ষতা সবকিছুই ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির তুলনায় এক অনস্তিত্বের শূন্যতায় এসে ঠেকেছিল।

ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে শ্রেষ্ঠতম হিসেবে মেনে নেবার কালে এদেশের শিক্ষিত মানুষেরা এই সত্যের দিকে আদৌ দৃক্‌পাত করেননি, ইংল্যাণ্ড তার রাজত্বকালের সূচনা থেকেই নিজেকে ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিভূ হিসেবে জাহির করেছে। ভারত যেমন কখনই নিজেকে সম্পূর্ণ এশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির নির্বিঢ় দাবিদার বলতে পারে না, তেমনি ইংল্যাণ্ড—বিশেষ করে দ্বৈপায়ন ইংরেজ নিজেকে ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির দাবিদার বলতে পারে না, এই ঐতিহাসিক হেত্বাভাসের দিকে রামমোহন রায় থেকে কেউই তাকিয়ে দেখেননি।

খোদ ইংল্যাণ্ডেই আঠারো শতকের আগে কোনও উল্লেখযোগ্য শিল্পীর আবির্ভাব হয়নি। হোগার্থ-এর আগে ইংল্যাণ্ডে কোনও উল্লেখযোগ্য প্রতিকৃতি চিত্রকর হননি, ফলে মেইনল্যাণ্ড ইংল্যান্ড থেকে শিল্পী আনিয়ে ইংল্যাণ্ডে রাজপ্রতিকৃতি আঁকাতে হতো। যে গথিক স্থাপত্য নিয়ে ইংল্যাণ্ড গর্ব করে সেই গথিক স্থাপত্য আদর্শ ইংল্যান্ড পেয়েছিল ফ্রান্সের কাছ থেকে। শিল্প সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের কাছে অধমর্ণ ইংল্যাণ্ড তার উপনিবেশে নিজেকে উপস্থিত করেছিল এমন এক শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিভূ হিসেবে, যে-সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোনও বিকল্প নেই। বস্তুতপক্ষে উনিশ শতকে আমাদের দেশের শিক্ষিত মানুষের কাছে ইংল্যাণ্ড দেশটি তার সভ্যতা সংস্কৃতি ভাষা নিয়ে দেখা দিয়েছিল বিশ্বসভ্যতা সংস্কৃতি ও ভাষার একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে।

সরকারি আর্ট স্কুলগুলি ছিল শিল্পকলার ক্ষেত্রে নির্বৈধীকরণ সঞ্চারের ক্ষেত্র। সেখানে গ্রিক রোম্যান শিল্পাদর্শকে শিল্পকলার চূড়ান্ত পরাকাষ্ঠা হিসেবে দর্শিয়ে এদেশি শিল্পশিক্ষার্থীদের মস্তিষ্ক শোধন করা হতো।

ইয়োরোপে শতাব্দী শেষের যে বিষাদ ছিল, তার যে পরিপ্রেক্ষিত ছিল, ভারতে শতাব্দী শেষের বিষাদের কারণ ছিল তার থেকে আলাদা। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোল্যুশনের মরীচিকা মানুষের বুনিয়াদি কোনও সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। উপরন্তু ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভোল্যুশনের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় মানুষ মানুষের কাছ থেকে এবং মানুষ কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই বিচ্ছিন্নতা একটি নিরন্তর সক্রিয় ব্যাপার। আরেক শতাব্দী শেষে কম্পিউটারের ব্যাপকতায় সেই বিচ্ছিন্নতা বিস্তৃত ও ব্যাপকতর হয়ে চলেছে।

উনিশ শতক শেষ হবার ঠিক পাঁচ বছর আগে আঠারোশো পঁচানব্বইতে

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব শতাব্দী শেষেব বিষাদে আক্রান্ত হবার কারণেই নিজের মধ্যেই তার থেকে নিরাময খ‌ুঁজেছিলেন। সেই বছবই পল্ সেজান কলকাতা থেকে তখন জাহাজপথে অনেক দূবেব পথ প্যাবিসে তাঁব জীবনেব বৃহত্তম একক প্রদর্শনীতে প্রথম অ্যাকাডেমিক আর্টের নিশ্চলতা থেকে ইযোবোপেব শিল্পকলাকে নতুন পথেব দিশা দেখালেন। অবনীন্দ্রনাথও ছেড়ে দিলেন অ্যাকাডেমিক বাঁধাগতে চোখের সামনে দেখা বস্তুব নিঃশর্ত নকল কবাব প্রবণতা, একটি ধরাবাঁধা ছকে আঁকাব প্রবণতা। সেটাকেই তিনি বলেছিলেন দেশেব শিল্পকলার পথ। দেশেব পথ বলতে অবনীন্দ্রনাথ গুপ্ত যুগ থেকে কোম্পানি যুগ অবধি যে শিল্পকলা হযেছিল, তার কোনও একটিকেও বোঝেননি। দেশেব পথ বলতে তিনি বুঝেছিলেন নিজেব মতে স্বাধীনভাবে চলা।

অবনীন্দ্রনাথ সেই নিজেব মতে স্বাধীনভাবে নিজে চলে এবং তাঁব শিষ্য-প্রশিষ্যদেব নিজেব মতে নিজেব পথে চলবাব কথা বলে বিশ শতকে এদেশেব শিল্পকলায একই সঙ্গে পূর্ববর্তী শতকেব বিষাদ ঘুচিযেছিলেন এবং শিল্পে মুক্তিব হাওযা বইযেছিলেন। সবকাবি আর্ট স্কুলেব শিক্ষায় ছিল এক কঠোর বেজিমেণ্টেশন, এক নিঃশর্ত ডিসিপ্লিন আদাযেব প্রয়াস। যা শেখানো হচ্ছে, সেটাই শিল্পকলাব চর্চাব মোক্ষ এবং এই পন্থাব কোনও বিকল্প নেই এমন এক ধারণা নির্বোধীকবণের মাধ্যমে জনমানসে গেঁথে দেওযা হযেছিল। এমনকি, আর্ট স্কুলেব শেষ ইংরেজ অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনেব কালে চিত্রকলা বিভাগটির নাম বাখা হয ফাইন্ আর্টস–ওযেস্টার্ন স্টাইল এবং তাব পাশাপাশি অপব একটি বিভাগ খুলে নাম বাখা হয ইন্ডিয়ান স্টাইল অব পেইন্টিং। এটি কবা হযেছিল এই বোঝাতে যে ফাইন্ আর্টস বা চাবুকলা হচ্ছে পশ্চিমি শিল্পকলা। ভাবতীয শিল্পকলাকে ফাইন আর্ট বলা যায না, কাবণ শাসক ইংবেজেব শিল্প-বিশাবদদেব ধারণায ভাবতে ফাইন্ আর্ট নামে কোনও কিছুব বিকাশ হযনি।

উনিশশো পনেবোতে অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুল থেকে পদত্যাগ কবেন। তাঁব পদত্যাগেব পব অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউন তাঁব ভারতীয সহযোগী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যাযেব সহযোগিতায চিত্রকলাশিক্ষাকে ফাইন্ আর্টেব পাশাপাশি ইন্ডিযান স্টাইল অব পেইন্টিং নামেব বিভাগ তৈবি কবে দ্বিখণ্ডিত করেন। সেদিন এদেশেব দেশাভিমানী মানুষবা পার্সি ব্রাউনেব এমত সিদ্ধান্ত দেখে ঊর্ধ্ববাহু হযে নৃত্য কবেছিলেন। তাঁদের সেদিন মনে হয়েছিল যে এমন নামের একটি বিভাগ খুলে বুঝি সরকাব ভাবতীয শিল্পকলাকে স্বীকৃতি জানালেন,

বুঝি এদেশের একটি জাতীয় আকাঙ্ক্ষা সরকার পূরণ করলেন। সেদিন তাঁরা বুঝতে পারেননি যে এর পেছনে ছিল ডিভাইড্ অ্যান্ড রুল নীতি এবং বিশ্বের সামনে এই কথাকে সত্যের প্রতিষ্ঠা দেওয়া যে, ভারতীয় শিল্পকলা ফাইন্ আর্ট-পদবাচ্য নয়।

গত শতকের শেষ থেকে এক নাগাড়ে কয়েক দশক অবনীন্দ্রনাথকে লড়তে হয়েছিল, প্রথম, এই নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে যে, উপনিবেশবাদী প্রচারকরা যা-ই বলে থাকুন না কেন, ভারতের শিল্পকলার পরম্পরা বিশ্বের মধ্যে প্রাচীনতম, যা এখনও সমানভাবে প্রবহমান। বিশ্বের বহু প্রাচীন সমৃদ্ধ শিল্পকলা বর্তমানে মৃত হলেও ভারতের শিল্পপরম্পরা একটি সচল পরম্পরা। সেই পরম্পরা যে সচল সে-কথা হ্যাভেল ছাড়াও পার্সি ব্রাউনও তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান পেইন্টিং' বইতে বলে গেছেন। অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর দাদা গগনেন্দ্রনাথ তাঁদের ব্যক্তিগত উদ্যমে দেশের প্রাচীনকাল থেকে পরম্পরাগত শিল্পকলার এক বিশাল সংগ্রহ গড়ে তোলেন। সেই সংগ্রহের ভিত্তিতেই তাঁদের বাড়িতে অতিথি হিসেবে থেকে গবেষণা করে আনন্দ কেন্টিশ কুমারস্বামী তাঁর প্রথম দুটি বই লেখন। এই বই থেকেই বিশ্বসমক্ষে রাজপুত ও পাহাড়ি চিত্রকলা সম্পর্কে সকলে জানতে পারেন। অবনীন্দ্রনাথ নিজেও প্রাচীন শিল্পশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তার পরিচয় ও তত্ত্বগত বিশ্লেষণ আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়ে ভারতীয় শিল্পের নন্দনতত্ত্বচর্চার পুনঃ প্রবর্তন করেন। তিনি আরও যে বিশেষ একটি কাজ করেছিলেন, সেটি হলো বাংলার আবহমান লোকসাহিত্য ও লোকশিল্পতত্ত্বের আলোচনা। ফোক্‌লোর বলতে যা বোঝায় তার সূত্রপাতে রেভারেন্ড লালবিহারী দে, রেভারেন্ড জেমস্ লং ফোক্‌লোরের সংগ্রহের কাজ শুরু করলেও তত্ত্বচর্চার কাজ শুরু করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'বাংলার ব্রত' নামক নাতিদীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে—একই সঙ্গে গণভিত্তিক শিল্পকলা, ওর‍্যাল লিটারেচার বা মৌখিক সাহিত্য ও সমাজতত্ত্বের আন্তর্বিদ্যা চর্চার কাজটি তিনি করেছিলেন। সেই সঙ্গে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, অর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ যেমন ভারতীয় শিল্পতত্ত্বের দর্শন নতুন করে গড়ে তোলার কাজে নেমেছিলেন, একই সঙ্গে সুকুমার রায়, বিনয়কুমার সরকার আধুনিক ইয়োরোপীয় শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কেও চর্চা করছিলেন।

অবনীন্দ্রনাথ সরকারি আর্ট স্কুলে শেখাবার সময় থেকেই একটি বিকল্প শিল্পশিক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করছিলেন। তাঁর ছাত্র অসিতকুমার হালদার,

নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর এই শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে শান্তি-নিকেতনে সরকারি শিল্পশিক্ষানীতির একেবারেই বিপ্রতীপে এক বিকল্প শিল্পশিক্ষার প্রবর্তন করলেন। সরকারি আর্ট স্কুলগুলি তৈরি হয়েছিল ইণ্ডাস্ট্রিয়্যাল আর্ট স্কুল হিসেবে দক্ষ কারিগর তৈরির লক্ষ্যে। সেই হিসেবেই সরকারি আর্ট স্কুলগুলির শিক্ষা ও পাঠ্য ইংল্যাণ্ডের টেক্‌নিক্যাল স্কুলগুলিকে অনুসরণ করেছিল। ঔপনিবেশিক সরকার যদি বিজিত জাতির শিল্প-শিক্ষার্থীদের শিল্পী বানাতে চাইত তাহলে ইংল্যাণ্ডের রয়্যাল আর্ট কলেজ বা রয়্যাল অ্যাকাডেমির অনুসরণে এখানকার আর্ট স্কুলগুলি গড়ে তুলত। কিন্তু ওদের প্রয়োজন ছিল উপনিবেশের সর্বেক্ষণ জরিপ সংগ্রহশালা ইত্যাকার দফতরগুলিতে নিম্নস্তরের পদে কিছু কারিগর গড়ে তোলা। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আর্ট স্কুলগুলি তৈরি হয়েছিল। আর্ট স্কুলগুলির বার্ষিক প্রতিবেদন দেখলেই সেই উদ্দেশ্য বোঝা যায়। এমন কি কলকাতার সরকারি আর্ট স্কুলের (যা এখন কলেজ) বার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায় যে, স্কুলের আয় বাড়াবার জন্যে ছাত্রদের বাড়িতে বাড়িতে পঙ্খের কাজ ও চুনকামের কাজ করবার জন্যে পাঠানো হত।

অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে শুরু করেছিলেন এক নির্মাণ ও সৃষ্টির যুগ। নিজে তিনি ছিলেন সাহিত্যসেবী, সাহিত্যের নিবিড় পাঠক, শিল্পতত্ত্বের ও ফোকলোর-চর্চার অগ্রণী। তাঁর চিত্রকলার মাধ্যমে বিশ শতকে ভারতীয় শিল্পকলা এক বিশিষ্ট চেহারা ও আত্মপরিচয় অর্জন করেছিল। সেই চিত্রকলা যেমন অজন্তার নকল ছিল না তেমনি রাফায়েলেরও নকল ছিল না। তিনি একদল সুদক্ষ ছাত্র তৈরি করেছিলেন যাঁরা গুরুকে অন্ধভাবে অনুসরণ না করে নিজ নিজ শৈলী গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর ছাত্ররা কলাভবনে সরকারি আর্ট স্কুলের শিক্ষাপদ্ধতির রেজিমেণ্টেশনের বিকল্প এক শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন, যার লক্ষ্য ছিল মৌমাছির মতো দক্ষ কারিগর গড়ে তোলা নয়, তার লক্ষ্য ছিল শিল্পী গড়ে তোলা, যে শিল্পীরা কেবল ধনীর দেয়ালসজ্জার জন্যে পরিশ্রম করবে না, তারা মানুষের জীবনকে, মানবসমাজকে সুন্দরতর করে তুলবে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর শান্তিনিকেতনের সমাজজীবনে নানা উৎসব অনুষ্ঠানের প্রবর্তন করেছিলেন, নৃত্যগীত—নাটকানুষ্ঠান ছিল সেই সমাজজীবনের অঙ্গ। সেই উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রূপসজ্জায় ওতপ্রোত থাকতেন শিল্পীরা। রবীন্দ্রনাথ ভুবনডাঙার শূন্য প্রান্তরকে শ্যামলিম সুন্দর মানববসতি করে গড়ে

তুলেছিলেন। সেই পরিবেশ রচনায় যুক্ত থেকে শিল্পী ও শিল্পশিক্ষার্থীরা মানবসমাজে তাঁদের ভূমিকা পালন করেছিলেন। শিল্প যে জীবনবিচ্যুত নয়, এই সংবাদ শান্তিনিকেতনের শিল্পসাধনায় শিল্পীরা বুঝেছিলেন।

সেই নির্মাণ ও সৃষ্টির তপস্যায় ঔপনিবেশিক নিয়ো-প্যালাডিয়ান স্থাপত্য শৈলীর বিপরীতে একালের ভারতীয় স্থাপত্যে প্রথম মৌলিক চিন্তা দেখা গেল শান্তিনিকেতনে সুরেন্দ্রনাথ করের স্থাপত্যচিন্তায়। যখন এদেশের ভাস্করেরা ভাববাদী মূর্তি রচনা করছিলেন কিংবা শহরের চৌরাস্তায় উঁচু বেদীতে বসাবার জন্যে বিভিন্ন ব্যক্তি-প্রতিকৃতি তৈরি করছিলেন, তখন শান্তিনিকেতনে রামকিঙ্কর পরিবেশগত মূর্তিকলা সৃষ্টির এক নজিরবিহীন আদর্শ তৈরি করলেন। সাঁওতাল পরগনায় দুর্ভিক্ষের কালে ভূমিহীন অভাবী নিরন্ন চাষিরা যখন তাঁদের সর্বস্ব নিয়ে বর্ধমানের চালকলে চাকরির আশায় আসছিলেন, সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের দেখে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে রামকিঙ্কর সৃষ্টি করেছিলেন 'সাঁওতাল পরিবার' নামের ভূমিতল সংলগ্ন গুচ্ছমূর্তি। এই মূর্তিতে কোনও তথাকথিত রাজনৈতিক নেতার মহিমা কীর্তন করা হয়নি, এই মূর্তি শহরের মানুষের জন্যে পারিশ্রমিক বা অর্থের বিনিময়ে চাহিদামাফিক নির্মিত হয়নি। অনামা মানুষদের অভাব ও শ্রমকে এভাবে ভারতীয় শিল্পকলায় স্থান দেওয়া হয়নি।

কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হলেও কলকাতায় কোনও শিল্পপ্রদর্শ-শালা ছিল না। এই শতকের গোড়ায় শিল্পপ্রদর্শশালার অভাবে অবনীন্দ্রনাথ যখন পার্ক স্ট্রিটে বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডার্স অ্যাসোসিয়শনের বিলিয়ার্ড রুমে ছবির প্রদর্শনী করেছিলেন তখন খেলায় বিঘ্ন ঘটায় জমিদারেরা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সেই কারণে প্রদর্শনী গুটিয়ে ফেলতে হয়েছিল। এই দুঃখ থেকেই অবনীন্দ্রনাথ ও গগনেন্দ্রনাথ উনিশ শো সাতে গড়ে তুলেছিলেন দি ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট। এই সোসাইটির কর্মকাণ্ড একদিন পৃথিবী জুড়ে ব্যাপ্ত হয়েছিল। চিন জাপানের সঙ্গে বিনিময়-প্রদর্শনী ছাড়াও এই সোসাইটির প্রদর্শনী হয়েছিল ইয়োরোপের বিখ্যাত রাজধানীগুলিতে। এই সোসাইটির উদ্যোগে ভারতীয় শিল্পীদের ছবি ছাপা হতো লন্ডনের বিখ্যাত শিল্প-পত্রিকা 'স্টুডিয়ো'তে ও টোকিয়োর বিখ্যাত শিল্প-পত্রিকা 'কোক্কা'য়। এই সোসাইটির উল্লেখযোগ্য কীর্তির মধ্যে রয়েছে উনিশশো বাইশে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জর্মান শিল্পীদের প্রদর্শনী। হুয়াসিলি ক্যান্ডিনস্কি, পাওল ক্লে প্রমুখ বিশ শতকের

বিখ্যাত আধুনিক চিত্রকরদের নাম যখন জর্মানির সীমা পেরিয়ে ইয়োরোপের অন্যত্র পৌঁছয়নি, তখন রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ ও স্টেলা ক্রামরিশের উদ্যোগে জর্মানি থেকে এঁদের আধুনিক চিত্রকলা এনে প্রদর্শনী হয়েছিল কলকাতায় সমবায় ম্যানসনে এই সোসাইটির উদ্যোগে। নামে সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট এবং শিক্ষাদানে ভারতীয়ত্বের প্রচারক হলেও এই সোসাইটির কর্মকাণ্ডের মধ্যে আর্ট স্কুলের অনড় অ্যাকাডেমিক পন্থার বিপরীতে দেখা গিয়েছিল এক বিশ্ববোধ।

কলকাতার সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট, বোম্বের বোম্বে আর্ট সোসাইটি, দিল্লির অল ইন্ডিয়া ফাইন্ আর্টস্ অ্যান্ড ক্রাফটস্ সোসাইটি সম্মিলিতভাবে শিল্পকলায় ভারতের একটি নিজস্ব চরিত্র নির্মাণে সক্রিয় ছিল। সেই সঙ্গে শান্তিনিকেতন-কলাভবনে এবং দেশের নানা জায়গায় অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রেরা শিক্ষক হিসেবে ছাত্র গড়ে তোলার সাধনা করেছিলেন।

ত্রিশের শেষে ফ্যাসিবিরোধী প্রগতি আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন দলমত-নির্বিশেষে এদেশের শিক্ষিত মানুষ। চল্লিশের প্রগতি আন্দোলনেও এগিয়ে এসেছিলেন শিল্পীরা। সেই থেকে ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যন্ত প্রতিটি সদর্থক আন্দোলনেও শিল্পীদের আমরা সামনের সারিতে দেখেছি। পঞ্চাশের মন্বন্তরে যে-ভাবে শিল্পীরা মানুষের অপমানের প্রতিবাদ তুলির ভাষার প্রকাশ করেছিলেন তার তুলনা নেই। পঞ্চাশের মন্বন্তরের কালে উনিশশো তেতাল্লিশে কলকাতার কয়েকজন শিল্পী সমবেত হয়ে ক্যালকাটা গ্রুপ তৈরি করলেন। সেই গ্রুপের প্রদর্শনী গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে নিয়ে যাওয়া হলো বোম্বেতে। বোম্বের তরুণ শিল্পীরা সেই প্রথম প্রতিবাদী ও মানুষের সহমর্মী শিল্পভাষার চেহারা দেখতে পেলেন। কলকাতার তরুণ শিল্পীদের প্রেরণায় তাঁরাও উনিশশো সাতচল্লিশে তৈরি করলেন বোম্বে প্রোগ্রেসিভ সোসাইটি। দেখাদেখি মাদ্রাজ, শ্রীনগর ও দিল্লিতেও গড়ে উঠল তরুণ শিল্পীদের দল। সেদিনের শিল্পীদের মধ্যে এই সঙ্ঘশক্তি যদি দেখা না দিত তাহলে এঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে হয়তো বিখ্যাত হয় উঠতে পারতেন না। সেদিনের এই তরুণদের মধ্যে ছিলেন এখনকার বহু প্রখ্যাত শিল্পীর নাম।

অতঃপর দেশভাগ হলো। কলকাতা থেকে জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান, শফিউদ্দীন আহমেদ চলে গেলেন পূর্ব পাকিস্তানে। দিল্লি বা বোম্বেতে কোনও মুসলিম চিত্রকর ছিলেন না। সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানে ভারত থেকে কারও

যাবার প্রসঙ্গ ওঠে না। লাহোবে ছিল প্রাচীন এক সরকারি আর্ট স্কুল। নাম নের্যো স্কুল অব আর্ট। দেশবিভাগকালে এব অধ্যক্ষ ছিলেন অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত। উপাধ্যক্ষ ছিলেন ভবেশচন্দ্র সান্যাল। এঁবা এবং লাহোব থেকে হিন্দু ও শিখ চিত্রকবেবা ভাবতে চলে এলেন। অবনীন্দ্রনাথেব ছাত্র আবদুব রহমান চুঘতাই আগে থেকেই ছিলেন লাহোবে। সবচেয়ে আশ্চর্যেব কথা, দেশবিভাগেব মতো ঘটনাব কোনও প্রতিফলন চিত্রকলায দেখা গেল না।

এমনটি ছিল সত্যিই অভাবনীয। এর আগে ঔপনিবেশিক ভারতে বাষ্ট্রীয় স্তবেব বিবিধ ঘটনাব প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষ তরঙ্গাভিঘাত ভাবতীয় শিল্পকলায় দেখা গেলেও দেশবিভাগ,উদ্বাস্তু সমস্যা এবং সাম্প্রদায়িক হানাহানিব কোনও প্রতিফলন ভাবতীয় বা পাকিস্তানী শিল্পচিন্তায দেখা গেল না। উনিশশো পাঁচে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত কবে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে একটি প্রদেশ তৈবি হয। এই ঘটনা বঙ্গভঙ্গ নামে খ্যাত। বিশেষ কবে হিন্দু বাঙালিবা বঙ্গভঙ্গেব কাবণে বিচলিত হযেছিলেন। তার বাইবেব কাবণ ছিল বাঙালিজাতিব মধ্যে বিভাজন। ভেতরের কাবণ ছিল বাঙালিকে এভাবে সম্প্রদাযগত ভাবে বিভাজন কবে বাঙালির মধ্যে চিবস্থাযী অনৈক্য তৈবি কবার ঔপনিবেশিক প্রযাস। পূর্ববঙ্গ ও আসামের গভর্নব ব্যামফিল্ড ফুলাব বঙ্গভঙ্গ বিবোধীদেব উপর অকথ্য দমননীতি চালিয়েছিলেন। অথচ তিনি বলেছিলেন, তিনি নাকি বাঙালিব প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল। এই ঘটনাকে উপলক্ষ কবে গগনেন্দ্রনাথ ছবি এঁকেছিলেন 'টৌবিবলি সিমপ্যাথেটিক।' এই ছবি প্রচাবিত হয়েছিল। এতে ফুলাবকে উন্মাদের মতো আচবণ কবতে দেখা যাচ্ছে। উনিশশো উনিশে জালিযানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডেব প্রতিবাদে গগনেন্দ্রনাথ সবকাবী বক্তব্য 'পীস বেস্টোবড ইন পঞ্জাব' কে ব্যঙ্গ করে একই নামেব ছবি এঁকেছিলেন। সেই ছবি যে প্রদর্শনীতে দেখানো হযেছিল সেই প্রদর্শনী উদ্বোধন করতে লাটসাহেবকে ডাকা হযেছিল। পবিযায়ী শ্রমকে বিষয কবে ভাবতীয কৃষিব্যবস্থাব এক বাস্তব সত্যকে বামকিঙ্কব ধবেছিলেন তাঁর 'সাঁওতাল পবিবাব' মূর্তিতে। ফ্যাসিবাদেব ঘনায়মান আতঙ্কজনক রূপ দেখে ববীন্দ্রনাথ মুসোলিনিকে উন্মাদেব ভঙ্গিতে নৃত্যবত দেখিযে প্রতিবাদী ছবি এঁকেছিলেন। পঞ্চাশের মন্বন্তবের অভিজ্ঞতায অবনীন্দ্রনাথ তৈরি কবেছিলেন 'খিদে' নামে কুটুমকাটাম্। এমন বহু দৃষ্টান্ত আমবা ঔপনিবেশিক আমলে দেখেছি—যেখানে শিল্পীর মনন ও হাত কখনও প্রত্যক্ষের প্রণোদনায জডীভূত হযে থাকেনি।

সাতচল্লিশে ক্ষমতা হস্তান্তরকালে অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন জীবিত এবং ছিলেন প্রায়-স্বেচ্ছানির্বাসনে কলকাতার উপকণ্ঠে। যামিনী রায়ের আনন্দ চাটুজ্যে লেনের সংকীর্ণ গলিতে এক সময় সার বেঁধে ইংরেজ-মার্কিন তরুণ সৈনিকদের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকত। সাতচল্লিশে যামিনী রায় এঁকে চলেছিলেন পৌনঃপুনিক ছবি এবং একই ছবির কপির পর কপি। কিন্তু তখন এঁরা সব তথাকথিত আধুনিকতার প্রবাহে সমালোচকের ভাষায় পিছিয়ে পড়েছিলেন।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে দিল্লিতে ক্ষমতার কেন্দ্র ঘিরে শিল্পীদেরও সমাবেশ এবং রাজনৈতিক আশীর্বাদ পেতে দেখা যেতে লাগল। স্বাধীন দেশের একদল তরুণ শিল্পী ভাবলেন, জাতীয়তায় এখন আর কুলোচ্ছে না, এখন হতে হবে আন্তর্জাতিক। শিল্পীমহলে নিজেদের মধ্যে ইয়োরোপের আধুনিক শিল্পকলা বিশ্বমান ও আন্তর্জাতিকতার নিরিখ হিসেবে দেখা হতে লাগল। উচ্চারিত হতে লাগল পুঁথির পাতায় পড়া নানা ইয়োরোপীয় নাম। নিজেদের শিল্পরচনাকে ইয়োরোপীয় বিচিত্র শিল্প-আন্দোলনের তুল্যমূল্য বিবেচনা করা হতে লাগল। কেউ এটা ভেবেও দেখলেন না যে, ইয়োরোপে কোনও শিল্পী-আন্দোলনই বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখা দেয়নি। প্রতিটি শিল্প-আন্দোলন, তা সে ফিউচারিজমের মতো মুসোলিনির সমর্থক হোক বা এক্সপ্রেশনিজমের মতো হিটলারেত্ব বিরোধী হোক, সব আন্দোলনই একটি সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে উঠে এসেছিল। অথচ সেই আন্দোলনগুলির শৈলীলক্ষণকে ফর্মালিজম্ বিবেচনা করে এদেশে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন আর্থ-সামাজিক পটে ব্যবহৃত হতে দেখা গেল। কিউবিজম্ এক্সপ্রেশনিজম্ ইত্যাদির অনুসন্ধান সমালোচকেরা এদেশি ছবিতেও করতে লাগলেন।

উনিশ শো চুয়ান্নতে জওহরলাল নেহরুর উদ্যমে গড়ে উঠল ললিতকলা অকাদেমি। ললিতকলার কার্যক্রমে রাষ্ট্রীয় প্রদর্শনী, আন্তর্জাতিক ত্রৈবার্ষিক প্রদর্শনী ও বিশ্বের বিভিন্ন বিখ্যাত প্রদর্শনীগুলিতে যোগদান, ফেলোশিপ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হলো। কংগ্রেসি রাজনীতির সহায়তায় ক্ষমতার অলিন্দে দুকান কাটা শিল্পীদের আনাগোনা বেড়ে গেল এবং এর পরিণামে নিজেদের মধ্যে কুকুরের মতো খেয়োখেয়িও দেখা গেল। দেখা গেল, বিচারকমণ্ডলীর সদস্য নিজেকেই পুরস্কৃত করে বসে আছেন। দেশে আন্তর্জাতিক ত্রৈবার্ষিক প্রদর্শনী সংগঠন ও বিদেশে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে যোগদানের সূত্রে এদেশেও বইল বিশ্বায়নের ঝোড়ো বাতাস।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে আমেরিকায় শিল্পজগতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা ঘটে যায়, যে-বিষয়ে কোনও আলোচনা এদেশে এযাবৎ হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাগম অবধি বিশ্বে ইনভেস্টমেন্ট বা লগ্নির দুটি সাবেক উপায় ছিল—বুলিয়ন বা সোনায় লগ্নি এবং রিয়্যাল এস্টেট বা জমিতে লগ্নি। প্রথম লগ্নি ছিল অস্থাবর লগ্নি। দ্বিতীয় লগ্নি ছিল স্থাবর লগ্নি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা, টেকনোলজি বা প্রকৌশল এবং যুদ্ধ-পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখিয়ে দিল যে এই দুটি সাবেক লগ্নির কোনওটিই নিরাপদ নয়। সোনার দর ইনফ্লেশনে প্রভাবিত হতে পারে, যা মূল্য হ্রাসেরই কারণ হবে। সোনা মজুত রাখারও হাজার হ্যাঙ্গামা। উপরন্তু সোনার দাম তুলনায় খুব বেশি বাড়ে না। যখন ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা বা সঞ্চয়ের অন্য উপায় ছিল না তখন সোনা কিনে রাখা হতো টাকা সঞ্চয়ের লক্ষ্যে। গোল্ড রিজার্ভ দিয়ে সরকারি স্তরে মুদ্রার মান নির্ধারিত হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় বোঝা গেছে যে বেসরকারি লগ্নিতে বুলিয়ন সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য লগ্নি নয়। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্ব প্রেক্ষাপটে রিয়্যাল এস্টেটও আর নিরাপদ বা একমাত্র লগ্নি নয়। এই লগ্নির নির্ভরযোগ্যতা সর্বত্র সমান নয়। এই কারণে লগ্নির এক তৃতীয় উপায় খুঁজে বার করা হয়। সে উপায় হলো আর্ট অবজেক্ট বা শিল্পবস্তুতে লগ্নির উপায়। শিল্পবস্তুর কিছু অনন্যতা আছে। সোনার বিকল্প সোনা। একতাল সোনা বেচে দিলেও আরেক তাল সোনা টাকা থাকলেই কেনা যায়। একটি জমির বিকল্প আরেক খণ্ড জমি হতে পারে। কিন্তু শিল্পবস্তু চরিত্রগতভাবে ইউনিক বা অসাধারণ, কারণ শিল্পকলা এমনই এক মানবিক চর্চা যা সব সময়ই এগিয়ে চলেছে, যা নিজের পুনরাবৃত্তি নিজে কখনও করে না। পাবলো পিকাসোর আঁকা 'গের্নিকা' ছবির কোনও বিকল্প নেই। সালভাডোর ডালির আঁকা 'পার্সিসটেন্স অব মেমোরি' ছবিরও কোনও বিকল্প নেই। যদি কোনও শিল্পসৃষ্টিরই দ্বিতীয় প্রতিরূপ তৈরি করা হয়, তাহলে সেটি প্রতিরূপ হিসেবেই গণ্য হবে। প্রথম সৃষ্টিটি মৌলিক সৃষ্টির গৌরব এবং মূল্য দুই পাবে।

এই লক্ষ্যে পেগি গাগেনহাইম নাম্নী ধনাঢ্য মার্কিন মহিলা গড়ে তুললেন নিউইয়র্কে সমকালীন শিল্পকলার মিউজিয়ম—গাগেনহাইম মিউজিয়াম। এই কার্যক্রমে তিনি জ্যাকসন পোলোক নামক এক তরুণ প্রতিভাধর শিল্পীকে নিয়োজিত করলেন। প্রতিভাধর অথচ প্রবলভাবে নেশাগ্রস্ত জ্যাকসন পোলোক যা কিছু আঁকবেন, সেটাই গাগেনহাইমের অধিকারভুক্ত হবে বলা হলো। বিনিময়ে

জাক্সান পোলোককে যাবতীয নেশা ও ভোগবাসনাব অর্থ জোগানো হতে ল্যগল। পোলোককে ঘিবে তৈরি কবা হলো প্রেস-ক্রিটিক-গ্যালাবি-পেট্রনের আঁতাতে এক আশ্চর্য ইমেজ। তাঁকে দেখা হলো অ্যাকশন পেইন্টিং আন্দোলনের পুবোধা হিসেবে। পোলোকেব ছবিব দাম কোটি কোটি ডলাবে উঠে গেল।

ঠিক এভাবেই এদেশেও জবুরি অবস্থাব কালে মকবুল ফিদা হুসেনকে দিযে ইন্দিরা গান্ধীকে দেশমাতৃকা হিসেবে দর্শিযে ছবি আঁকা হলো। কংগ্রেস-সভাপতি দেবকান্ত ববুযা কলকাতায এসে সে-ছবিব প্রদর্শনীব উদ্বোধন কবে গেলেন। হুসেন আবও আঁকতে লাগলেন হনুমান, গণেশ ইত্যাদি দেবদেবীর ছবি। ক্ষমতাব অলিন্দে তাঁব যাতাযাত যত বাড়ল তত তাঁব ছবিব দাম বাড়ল। তাঁব ছবি দশ পনেরো লক্ষ টাকা দামে বিক্রি হতে লাগল। তিনি হযে উঠলেন কাল্ট ফিগাব। সেভিল বো-ব দর্জিব ছাঁটা সুট পবে বড়ো বড়ো শহবে হোটেলে স্থাযীভাবে ভাড়া কবা স্যুটে থাকলেও বেচাবি গরিব ভাবতবাসীর দুঃখে তিনি খালি পাযে হাঁটেন। কোনও বিশেষ চিত্রকবের একটিও একক প্রদর্শনী না হলেও তাঁকে কাল্ট ফিগার তৈরি কবাব দৃষ্টান্তও রযেছে। জবুবি অবস্থাব কালে কোনও শিল্পীব ছবি বাষ্ট্রনেতাব ড্রইংবুমে ঝুলিযে সেটিকে খবব কাগজেব প্রথম পৃষ্ঠায় বক্স নিউজ কবে, তাঁকে শ্রেষ্ঠতম তবুণ শিল্পী ঘোষণা কবে এবং ব্যবসাযীদেব দিযে বিবিধ পুবস্কারে ভূষিত কবে বাতাবাতি তাঁব ছবিব দাম লক্ষাধিক টাকায় তোলা হযেছে। তিনি ছবি আঁকাব আগেই ছবি বুক হযে যায়, আগাম টাকা পড়ে এবং তাবপব ফ্যাক্টবি প্রোডাক্টেব মতো শিল্পী ছবি আঁকেন।

বিগত পঁচিশ বছবে ভাবতেব প্রতিটি মেট্রো শহবেব যত্রতত্র গড়ে উঠেছে ব্যাঙেব ছাতাব মতো গ্যালাবি। এইসব গ্যালাবি নিজেদেব উদ্যোগে বাছা বাছা শিল্পীব ছবিব বা মূর্তিব প্রদর্শনী কবে, ইমেজ তৈবি কবে এবং শিল্পব্যবসা কবে। এদেশেও অনেক শিল্পী গত কযেক বছবে দেখা দিযেছেন যাঁবা জ্যাক্সন পোলোকেব মতো তাঁদেব যাবতীয় শিল্পসৃষ্টি সংবক্ষণেব, মূল্য নির্ধাবণেব এবং বিক্রিব দাযিত্ব দিযে বেখেছেন নির্দিষ্ট গ্যালাবি মালিকেব হাতে।

ফলে সংঘশক্তি এখন আব নেই। শিল্পীবা লক্ষ লক্ষ টাকাব মুখ দেখেছেন। ওঁদেব অনেকেবই আব সংঘে অনুরাগ নেই। শিল্পীসংঘ ভাঙছে। শিল্পীবা আজ গ্যালারিব কথায ওঠেন বসেন। স্বাধীনতা পববর্তী ভারতে ছবি বা মূর্তি গড়ার পেছনে এখন আর অন্তবেব তাগিদ কাজ করে না। তাই বিগত

পঞ্চাশ বছবেব মধ্যে এই শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছবে এককভাবে গড়ে ওঠা রাম-কিংকবেব 'সাঁওতাল পরিবাব' মূর্তি'ব মতো আব দ্বিতীয় কোনও মূর্তি হয়নি। বিগত পঞ্চাশ বছবের মধ্যে এমন কোনও উল্লেখযোগ্য ছবি আঁকা হয়নি যা এই শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে আঁকা অবনীন্দ্রনাথের 'কবিকংকনচণ্ডী' বা 'কৃষ্ণমঙ্গল' চিত্রমালাব সমতুল্য। চব্বিশ বছরেব তরুণ অবনীন্দ্রনাথ এঁকেছিলেন বাধাকৃষ্ণেব যুগললীলাব সুকুমাব সূক্ষ্ম মিনিযেচাব। জীবনসায়াহ্নে সত্তব বছরেব বৃদ্ধ অবনীন্দ্রনাথ শেষবারেব মতো যখন তুলি ধবলেন তখন দ্বিতীয বিশ্বযুদ্ধেব উগ্ররূপ দেখা দিয়েছে। সেই বিশ্ব পাবিপ্রেক্ষিতে আঁকা অবনীন্দ্রনাথেব মোটা তুলিব বলিষ্ঠ সম্পাতের চিত্রমালায শিশু কৃষ্ণেব যাবতীয দানব নিধনের যে ছবি দেখা গেল, তা তো নিবর্থক ছিল না। কিন্তু বামকিংকব, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ তো কোনও গ্যালাবিব নির্দেশে, ব্যাংক ব্যালান্স বা পার্থিব সুখভোগেব লক্ষ্যে শিল্পসৃষ্টি করেননি। এইসব সৃষ্টি তো বিক্রি হযনি। তাহলে কেন গত পঞ্চাশ বছবে এমন শিল্পসৃষ্টি হল না, যাকে বলা যাবে মাইলফলক যেমন হযেছে আগেব পঞ্চাশ বছবে।

বিশ্বাযনের ঢেউ আজ এদেশে পেঁছেছে। এই বিশ্বাযন নির্দেশ দিযেছে, সঙ্ঘ ভাঙো; এই শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছব ছিল সঙ্ঘশক্তিব যুগ। এখন সঙ্ঘবদ্ধ সংগ্রাম নেই। আগে শিল্পীবা ছবি আঁকতেন প্রদর্শনীব জন্য, পত্রপত্রিকায ছাপবাব জন্যে। কালেভদ্রে পঁচিশ পঞ্চাশ টাকায সে ছবি বিক্রি হলে শিল্পী বর্তে যেতেন। নন্দলাল বসুব বহু ছবিও অবিক্রীত অবস্থায় ছিল তাঁব মৃত্যুব পবেও। ছিল রামকিংকবেব, ছিল অবনীন্দ্রনাথেব, ছিল গগনেন্দ্রনাথেব। এখন ছবি ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যক্তির ভোগ্য। ছবি আঁকাব আগে টাকা আগাম আসে। সে ছবি চলে যায় ক্রেতাব কাছে লোকচক্ষুব অন্তবালে। আম দর্শক সে-সব ছবি কোনও দিন হযত দেখবেনই না। আজকেব ক্রেতা প্রদর্শনীতে এসে বা গ্যালাবিতে গিযে ছবি কেনেন না। আজকেব ছবি কেনা মানে ছবিতে টাকা লগ্নি কবা। আজকেব ক্রেতাকে গ্যালাবিমালিক বলে দেন, কার ছবি বা কাদের ছবি ড্রইংরুমে বদলে বদলে বাখলে সেটা স্টেটাস্ সিম্বল বলে গণ্য হবে। আজকেব গ্যালারির মালিক ক্রেতাকে বলে দেয, কার ছবিতে লগ্নি লাভদাযক হবে।

কিছুদিন আগে সদ্‌বি-র নিলামঘবে হালফিল ভাবতীয় চিত্রকলা বিক্রি হলো লক্ষ লক্ষ টাকা দামে। কাগজে কাগজে ফলাও কবে সে-খবর বেবোল।

কোনও শিল্পীর ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল, কারও ভাগ্যে ছিঁড়ল না। যাঁদের ছিঁড়ল না অথচ যাদের এক একটি ছবি লক্ষ লক্ষ টাকায় বিক্রি হলো, সেইসব ছবি সেইসব শিল্পীরা আগেই অত্যন্ত কম দামে গ্যালারির কাছে বিক্রি করে দেওযায় পুনবায় বিক্রির মূল্য তাঁরা পেলেন না। যাঁরা কিনলেন তাঁরা কেউ বা স্টেটাস্ সিম্বল বাড়াবার জন্যে, কেউবা আবার লগ্নি করবার জন্যে কিনলেন। এ হলো ফান গখের সেই আইরিস ফুলের ছবির মতো। শিল্পী কিছুই পেলেন না, নেপোয় মারল দই।

আজ শিল্পের বাজার এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যা ফ্যাঁ দ' সিয়েক্লে-বা শতাব্দী শেষের বিষাদের অন্ধকারে আমাদের ঠেলে দেয়। আজ সাধারণ গ্যালারিতে ছবি দেখতে ছুটকো বা কজন বন্ধু বান্ধব ছাড়া কেউ যান না। কোনও ছবির মর্যাদাজনক দাম এক লক্ষের নিচে নয়। ছবির যত দাম শিল্পীর তত দাম। আর শিল্পীর দাম হচ্ছে তার নাম। আজকের ছবি হল সিগনেচার পেইন্টিং। অজানা শিল্পীর ছবির কোনও গুণাগুণ বিচার আজকের সমাজে হয় না। যে-সব গ্যালারি যশাকাঙ্ক্ষী শিল্পীরা নিজেদের খরচে ভাড়া নিয়ে প্রদর্শনী করেন, সেগুলো আম-জনতার জায়গা। সেলিব্রিটিদের পদধূলি সেখানে পড়ে না। আজকের প্রেস্টিজিয়াস্ প্রদর্শনী হল স্পনসর্ড প্রদর্শনী। প্রাইভেট গ্যালারি প্রভূত খরচে সেই শিল্পীরই ছবির বা মূর্তির প্রদর্শনী করবে, ক্যাটালগ ছাপবে, প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন দেবে, উদ্বোধনে পার্টি দেবে, যার উপর লগ্নি করা লাভজনক এবং ব্যবসার দিক থেকে নিরাপদ। সুতরাং গ্যালারি মালিকের স্বীকৃতি না-পেলে আজ কোনও যশাকাঙ্ক্ষী শিল্পীর পক্ষে নিজগুণে ওই সব গ্যালারিতে স্পনসার্ড প্রদর্শনী করা সম্ভব নয়। যাঁরা ছবি কেনেন তাঁদের গ্যালারিতে আসার সময় নেই। ঘরে বসে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ ব্যবস্থায় সেখানে বিশ্বের যে কোনও কোণের সঙ্গে ব্যবসা করা যায়, ঠিক তেমনি পণ্য হিসেবে শিল্পবস্তুতে লগ্নি করার কালে ক্রেতারা পরামর্শ নেন গ্যালারি মালিকের কাছে। কিন্তু গ্যালারি মালিক ও ক্রেতার আঁতাতের মধ্যে আরেক-জনেক ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ—সে ভূমিকা হলো সমালোচকের ও ছাপাই মাধ্যমের। সমালোচক যদি সহায় না হন, তাহলে বাণিজ্যিক সিদ্ধিও সম্ভব নয়।

যখন গণেশের ছবি বিক্রির ধুম পড়েছিল তখন গ্যালারি মালিকের চাহিদায়

প্রগতিপন্থী শিল্পীদেরও গণেশ আঁকতে দেখা গেছে দেখা গেছে। কৃষ্ণ আঁকতে। অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলালকে সেকেলে ইলাস্ট্রেটর বলে যিনি এককালে নিন্দেমন্দ করেছেন, তাঁকেও দেখা গেছে গ্যালারি মালিকের চাহিদার কথামত থেকে ছবি আঁকতে। শিল্পকলা এখন একটা চাহিদা পূরণের উপায়ে এসে ঠেকেছে। ললিতকলা অকাদেমি, রাজ্য কলা অকাদেমি ইত্যাদি অনড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিশ্বায়নের তোড়ে ও শিল্পকলার ফাটকাবাজিতে এই সব সরকারি প্রতিষ্ঠান কোনও শিল্প ও শিল্পীসহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। এই অচলায়তনগুলির সামাজিক প্রয়োজনও আর আছে বলে মনে হয় না।

আজ শিল্পকলার বাজারদর যে জায়গায় উঠেছে তা ছিল এতকালের সমস্ত ধারণার বাইরে। স্বাধীনতার পরে এক বিশেষ শ্রেণীর ভারতীয় দেখা দিয়েছেন যাঁদের বলা হয় এন. আর. আই। এঁরা বিশ্বময় বিপুল সংখ্যায় ছড়িয়ে আছেন। ভারতের মতো গরিব দেশ তার গরিব করদাতাদের টাকা খরচ করে, শিক্ষায় ভরতুকি দিয়ে যে সব টেকনোক্র্যাট, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক তৈরি করে, সেই সব লোকেরা তাদের মেধার জোরে সহজে ধনী দেশে চাকরি পেয়ে অভিবাসিত হয়। ধনীদেশগুলি টেকনোক্র্যাট, ডাক্তার, বৈজ্ঞানিক বানাতে এমন ঢালাও ভরতুকি দেয় না। তারা পয়সা খরচ না করেই গরিব দেশের মেধা স্রেফ টাকার জোরে পেয়ে যায়। এই এন আর আইরা প্রতীকীভাবে নানা পন্থায় তাঁদের ভারতীয়ত্ব ও ভারতের সঙ্গে যোগ বজায় রাখেন। এই ধনাঢ্য এন আর আইরাও এখন ভারতীয় শিল্পকলার ক্রেতা। ক্রেতা যেমন ভোগপণ্য যাচাই করে কেনেন, এই এন. আর আইরাও শিল্পীর নাম, ইমেজ এবং আঁকা বিষয় যাচাই করে কেনেন। এন আর আইরা কি কি পছন্দ করেন, সেটা গ্যালারি মালিক এবং বহু শিল্পীর জানা।

দেশের ধনাঢ্য লগ্নিকারী, এন আর আই ছাড়া আরেক ধরনের ক্রেতা আছেন যাঁরা বিদেশি। যেমন কোনও জাপানি ধনাঢ্য মানুষের ঝোঁক ভারতীয় ছবি সংগ্রহের। এক্ষেত্রে তিনি সহায়তা ও পরামর্শ নেবেন কোনও গ্যালারি মালিক বা এজেন্টের। ছবির দাম এখন সাধারণের ক্ষমতার বাইরে। আম-জনতার জন্যে রয়েছে ললিতকলা অকাদেমি বা কোনও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বদান্যতায় ছাপা প্রিন্ট। আজকের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ঘরে এ-ধরনের প্রিন্ট বাঁধিয়ে রাখতে দেখা

যায। এই প্রিণ্টগুলিতে প্রায সকল ব্যবসা-সফল ভারতীয় শিল্পীব কাজেব নিদর্শন পাওয়া যায়।

গত শতাব্দীর অন্তিমে ভাবতীয শিল্পকলা এক নৈরাজ্যেব মধ্যে নিজেকে দেখেছিল। সেই নৈরাজ্য থেকে সার্থক এক অস্তিত্বের সন্ধানে শিল্পীবা যাত্রা কবেছিলেন। তাঁদেব সেই যাত্রা ব্যর্থ হযনি। অর্ধ শতকেব শেষে তাঁবা আমাদেব এক উজ্জ্বল উত্তবাধিকাব দিযেছিলেন। তখন ছবিব বাজার ছিল না। ছবি আঁকা অর্থকরী বিদ্যাও ছিল না। ভাস্কর্যেব বাজাব ছিল আবও সীমিত। প্রতিকৃতি ছাডা অন্য ভাস্কর্যেব কোনও চাহিদা ছিল না। এখন পবিস্থিতি পাল্টেছে। শিল্পীদেব মধ্যে অনেকে এখন প্রভূত বিত্তশালী। তাঁদেব শিল্প সৃষ্টি এখন ফাটকাবাজিব বিষয়। তাঁদেব উৎপাদনে এখন টাকা লগ্নি কবা হয। মুখ্যমন্ত্রী থেকে প্রধানমন্ত্রী, বাজনৈতিক দলের সভাপতি থেকে বাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত তাঁদেব পৃষ্ঠপোষকের তালিকা বিস্তৃত।

কিন্তু তার দরুন শিল্পকলাব কি উন্নতি হয়েছে! এখন কি জনচেতনা উদ্বোধনেব লক্ষ্যে বামকিংকর বা চিত্তপ্রসাদেব মতো পোস্টাব আঁকেন? অথচ এঁরা বিগত আধ শতকেব শিল্পী হলেও বর্তমান আধ শতকেও তাঁদের আমরা পেযেছি। ব্যামফিল্ড ফুলাবেব অত্যাচার বা জালিয়ানওয়ালাবাগেব নির্বিচাব হত্যাব প্রতিবাদে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুব তুলি ধবেছিলেন, যদিও তাঁব সমযেব প্রায় সকল ক্ষমতাশালী উচ্চপদস্থ ইংবেজ বাজপুরুষেব সঙ্গে ছিল তাঁব সখ্য। দেশ-বিভাগ থেকে শুরু কবে হালফিল অবধি নানা ঘটনা জাতির জীবনে ঘটে গেলেও তার কোন প্রতিক্রিযা আমাদেব এই পঞ্চাশ বছবেব শিল্পীদেব কাজে আমবা দেখেছি! উল্লেখযোগ্য কযেকটি ব্যতিক্রম অবশ্য আছে। ভাগলপুরে বন্দীদের চোখ উপড়ে ফেলাব ঘটনায় মনু পাবেখ ছবি এঁকেছিলেন। ভিযেত-নামেব যুদ্ধেব প্রতিক্রিযায় সোমনাথ হোড় তাঁর ক্ষত-নামেব ছাপছবিগুলি করেছিলেন। সেই সঙ্গে জরুরি অবস্থায আমরা মকবুল ফিদা হুসেনেব মতো চিত্রকবও দেখেছি। কিন্তু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই।

আজকের চিত্রকলা ও মূর্তিকলার দিকে তাকালে একটা জিনিস চোখে পড়ে। চোখে পড়ে আজকে শিল্পকলাব শতাব্দী শেষেব এক আশ্চর্য বিষাদ। আজকের শিল্পীরা তাঁদের সৃষ্টিব উন্নত মানেব জন্যে গর্ববোধ করতে পাবেন। তাঁদের কারিগরি দক্ষতা তুলনাহীন। তাঁদের ছবি ও তাঁদের ভাস্কর্য অনেক মাস্টর্,

তাঁদের উপস্থাপনও প্রশংসনীয়। আজকের শ্রেষ্ঠতম ভাস্কর্যে দেখা যাবে ধাতুর অসাধারণ ব্যঞ্জনায় বিশ্বের যাবতীয় বঞ্চনা ও উৎপীড়নের অপমান আর্তির মতো ধ্বনিত। আজকের বাণিজ্য-সফল এবং সেই সঙ্গে অঙ্কনে অসাধারণ পারঙ্গম চিত্রকরের ছবিতে দেখা যাবে এক অলৌকিক ধূসর অন্ধকার, মানুষের শরীরেও খয়েরি মরচে ধরেছে, এক যাদুপ্রতিম মেটামরফিক অবস্থায় মানুষ পশুপাখি ক্রমেই প্রাণহীন প্রত্ন কঙ্কাল হয়ে যাচ্ছে। কারও ছবির থলথলে বর্ণহীন মানুষ-গুলি অস্থিহীন এবং তাঁদের দেহ কুঞ্চিত হয়ে ঢলে গড়িয়ে পড়ছে। কারও আঁকা কাচের ছবিতে আমাদের ভুয়ো সামাজিক মূল্যবোধকে প্রতিটি রেখায় ব্যঙ্গ পরিহাস করা হচ্ছে। কেউ বা একই ছবি বছরের পর বছর এঁকে চলেছেন। তাঁদের সৃষ্টিতে পৌনঃপুনিকতা আছে, বিকাশ বা বিবর্তন নেই। পঁচিশ ত্রিশ বছর ধরে কেউ কেউ একই জায়গায় অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওই হয়। কোনও শিল্পীর একটি শৈলী বৈশিষ্ট্য যখন বাজারে বিক্রয়যোগ্যতা অর্জন করে তখন তিনি আর ওই বিশেষ শৈলী থেকে নড়তে ভয় পান, পাছে তাঁর ক্রেতার কাছে তাঁর নতুন সৃষ্টি অপরিচিত ঠেকে। আর্থিক সফলতা শিল্পীর মধ্যে এক অচলায়তন সৃষ্টি করেছে। বাজারি অর্থনীতিতে এই-ই ঘটে থাকে। ভিতরের তাগিদ থেকে উদ্গত না-হয়ে শিল্পী যদি বাজারি চাহিদার জোগান হয়ে ওঠে তাহলে শিল্পকলাও আবেগহীন এক পণ্য উৎপাদনে পরিণত হয়। যামিনী রায়ের ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল।

এই শতকের প্রথম আধখানা কেটেছে পরাধীনতায়। ওই আধ শতকের শুরুতে নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে অস্তিত্ব সংগ্রাম ছিল। শিল্পকলায় অধমর্ণ না থেকে, শিল্পকলায় আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠার সংকল্প ছিল। সেই সংকল্প ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার সংকল্প আর এই আত্মপরিচয় আর আত্মপ্রতিষ্ঠায় সমগ্র জাতির সংকল্প এক হয়ে মিশেছিল। দেশের জন্যে, জাতির জন্যে একটি সৃষ্টি রেখে যাব, এই কথা বুঝেছিলেন তখনকার শিল্পীরা। তখন গ্যালারি সিস্টেম ছিল না, কালেভদ্রে দু' একজন খদ্দের জুটত। ওঁরাও ফাটকাবাজি করবার জন্যে বা পরে দাম বাড়বার আশায় ছবি কিনতেন না। তখনও বুলিয়ন ও রিয়্যাল এস্টেটের পাশাপাশি শিল্পবস্তু লগ্নির উপায় হয়ে ওঠেনি। তখনও জানা ছিল না যে যামিনী রায়ের একটি ছবি সাতচল্লিশ সালে কিনলে সেই পঁচাত্তর টাকা দামের ছবিটি সাতানব্বইতে তিন থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা দামে বিকোতে পারে। উনিশশো সাতচল্লিশে কলকাতার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের প্রদর্শনীতে

মকবুল ফিদা হুসেনের ছবির দাম ছিল একশো পঞ্চাশ টাকা। সেদিন ওই ছবির ক্রেতা জোটে নি। আজ ওই ছবি আর্লি হুসেন হিসেবে কম-সে-কম পনেরো লক্ষ টাকা দামে বিক্রি হবে। শিল্পবস্তুর মূল্য, এমনকি জীবিত শিল্পীর তৈরি শিল্পও এই হারে বাড়ে, কখনও তা কমে না। আর এই ভাবেই আজকে তৃতীয় বিশ্বের গরিব দেশ, যেখানে দুই-তৃতীয়াংশ লোক আধপেটাও খেতে পাবে না, সেই ভারতবর্ষের শিল্পীরাও ক্রমে আর্থিক সুবিধাভোগের জায়গায় উঠে আসছেন। যদিও সংখ্যায় তাঁরা কম এবং ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়ানো শিল্পী এখনও আছেন, কিন্তু মনে রাখতে হবে যে স্বাধীনতার সময় এই গোটা ভারতে মাত্র একজন শিল্পী, যামিনী রায়, ছিলেন যিনি শুদ্ধমাত্র ছবি বেচেই পেট চালাতেন, সংসার টানতেন। তখন তাঁর ছবি পঁচিশ টাকা দামেও পাওয়া যেত। বাকি শিল্পীরা ছিলেন হয় বিত্তবান যেমন অবনীন্দ্রনাথ; নয় চাকরিজীবী যেমন নন্দলাল বসু ও অতুল বসু, কিংবা অজুবায় প্রতিকৃতি-মূলক চিত্রকর যেমন হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। অনিশ্চিত জীবনের ঝুঁকি নেওয়া শিল্পীর পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না। খ্যাতিমান শিল্পীদের রচনা দর্শক দেখতে পেতেন। আজকের মতো গোপনে সেগুলি শিল্পীর ঘর থেকে ক্রেতা বা ফাটকাবাজ গ্যালারি-মালিকের ঘরে চলে যেত না। শুনলে অবিশ্বাস্য ঠেকতে পারে যে, প্রভূত বিত্তশালিনী মহিলারা তাঁদের ড্রইংরুমের কালার স্কিমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘোড়ার ছবি এঁকে দেবার জন্যে কোনও রাজনীতির অলিন্দে ঘোরাফেরা করা শিল্পীর কাছে ব্ল্যাঙ্ক চেক পাঠান। আজকের শিল্পকলা প্রভূতভাবে স্টেটাস সিম্বল, লগ্নির উপায়ের সঙ্গে 'ফার্নিচার পিস হয়ে উঠেছে।

শিল্পীরা বাজারি চাহিদা জোগাচ্ছেন। বাজার দেখে কখনও কৃষ্ণ আঁকছেন, কখনও গণেশ আঁকছেন। এর সঙ্গে ফ্যাক্টরি-উৎপাদনের তফাত কোথায়! এক অদ্ভুত বিচ্ছিন্নতায় এখন শিল্প তাঁর শিল্প থেকে বিচ্ছিন্ন। কেন এখনকার শিল্পসৃষ্টিতে সংকল্প নেই, আনন্দ নেই, বাঁচবার প্রেরণা নেই! এখনকার কোন্ ভারতীয় শিল্পীর সৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা শ্রদ্ধায় নতজানু হই, আনন্দে সেটাকে জড়িয়ে ধরতে চাই!'

রামকিংকরের 'সাঁওতাল পরিবার' পরিযায়ী শ্রমের মূর্তি, ভিটে থেকে উন্মূল মূর্তি। ওঁরা কাজের সন্ধানে চলেছে, ওরা কাজ করবে, কিন্তু ওরা আর্তনাদে ক্রন্দনে ভেঙে পড়ে না। পুরুষটি লম্বা গলা বাড়িয়ে কোন ভবিষ্যৎ দেখতে

চাইছে! এই ভারতীর অনাম্নী শ্রমিকেরা হাজার হাজার বছর ধরে চলেছে তো চলেছে। ওদের শ্রমের সামনে, জড়ীভূত না হয়ে সামনের দিকে পদক্ষেপের নিচে আমরা শ্রদ্ধায় নতজানু হই। নতজানু হই শিল্পীর কাছে যিনি এমন একটি বিষয়কে এমন এক সময়ে ভাস্কর্যের বিষয় করেছিলেন যখন এরকম ভাবনাই ছিল বৈপ্লবিক। কারমারকারের 'মন্দিরের পথে' মূর্তিটি নিয়ে 'বিস্তর' ভাববাদী বিশ্লেষণ হয়েছিল, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ণাবয়ব মূর্তিটি তার ব্যঞ্জনার জন্যে প্রশংসিত হয়েছিল কিন্তু রামকিঙ্করের মূর্তিটি আপামর জনসাধারণের কাছে অভিনন্দিত হয়েছিল।

আজকের শিল্পীদের সৃষ্টিতে কোন্ আত্যন্তিক প্রেরণা আছে এই প্রশ্ন আমাদের মনে জাগে। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের শিল্পকলা কেবল স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছরের শিল্পকলার খতিয়ান নয়। এই শিল্পকলা শতাব্দী শেষেরও শিল্পকলা। কিন্তু কী আশ্চর্য সমাপতন আগের শতাব্দীর শেষের সঙ্গে এই শতাব্দীর শেষের! একুশ শতকের দোরগোড়ায় এসে একটিই প্রশ্ন, আজকের বাজার ব্যবস্থায় মানুষের মেধা থেকে নিমপাতা অবধি সব কিছুই পণ্য, সব কিছুই বিক্রয়যোগ্য। এই পণ্য হয়ে ওঠা, লগ্নির উপায় হয়ে ওঠাই কি শিল্পের নিয়তি! সোনা জড় বস্তু, জমি জড় বস্তু, ওগুলো প্রকৃতির দান। কিন্তু শিল্পকলা তো জড় বস্তু নয়। শিল্পকলা যে মানুষের সৃষ্টি। মানুষ মৌমাছি নয় যে যন্ত্রের মতো উৎকর্ষহীন পারিপাটি নির্মাণই তার ধ্যান জ্ঞান। মানুষ ভবিষ্যৎকে দেখে, মানুষ তার পরিপার্শ্বকে পরিবর্তিত করে, মানুষ কল্পনা করে আর কেবল নির্মাণ নয়, সৃষ্টিও করে। শতাব্দীর অন্তিমে বিশ্বব্যাপী শিল্প-বাজার ব্যবস্থা ভারতকেও গ্রাস করেছে। সদ্বিতে সমকালীন ভারতীয় শিল্পকলা লাখ লাখ টাকা দামে নিলাম হয়। কিন্তু এই বিক্রয়যোগ্যতাই কি শিল্পকলার মোক্ষ, তার পরিণাম! আজকের শিল্পীর কাছে একটাই প্রশ্ন, সেটি এই তাঁদের অন্তরেই কি কোনও উদ্দীপনা নেই যে তাঁরা দর্শককেও উদ্দীপিত করতে পারছেন না। তাঁদের সামনে কি কোনও সংকল্প নেই যে আম-জনতাকে সেই সংকল্পে শরিক করা যায়! তাঁদের চোখে কি কোনও স্বপ্ন নেই!

শতাব্দী শেষের এই বিষাদের অবসান কত দূরে। এক সৃষ্টিহীন পণ্য-নির্মাণের কাজই কি বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতীয় শিল্পকলার নিয়তি!

বাঙালির সমাজজীবনে আড্ডা

সমীরকুমার দাস

আমার এই লেখার বিষয়বস্তু ঠিক আড্ডা নিয়ে নয়—আড্ডা নিয়ে আমাদের যে গর্ব তাই নিয়ে। বাঙালির সমাজজীবনে আড্ডার ভূমিকা নিয়ে বিশ্লেষণ করতে বসলে গর্ব করার মতো বেশি কিছু পাওয়া যাবে না বলেই আমার বিশ্বাস। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। একটা কথা গোড়াতেই বলে নেয়া দরকার। আড্ডা দেয়া এবং তা নিয়ে গর্ব করা অবশ্যই এক জিনিস নয়। আড্ডা দিই বলে যে তা নিয়ে গর্ব করতে হবে—এমন কোনো কথা নেই। বা না করতে পারলে লজ্জা এবং অপমানে মুখ-চোখ লাল হয়ে যাবে—ব্যাপারটা এমনও নয়। শুক্তো খাই—এমন কি পছন্দ করি বলেই যে তা নিয়ে গর্ব করতে হবে, অন্যথায় হীনমন্যতায় ভুগতে হবে—তার কোনো মানে নেই। আসলে আড্ডা দেয়াটা আমাদের এক জীবন্ত ঐতিহ্য—তার সাথে গর্ব-লজ্জা-অপমানের কোনো অবধারিত সম্পর্ক নেই। এই সামান্য ব্যাপারটাই আজ আবার নতুন করে বোঝার সময় এসেছে।

আড্ডা নিয়ে আমাদের যে গর্ববোধ—তা অন্তত তিন ধরনের লেখায় লক্ষ করা যাবে। প্রথম ধরনের লেখা নিতান্তই আত্মস্মৃতিমূলক। এক ধরনের লেখায় নিজের কথা—বিশেষত তৎকালীন আড্ডার আসরে নিজের অংশগ্রহণের ইতিবৃত্তান্ত অন্যকে শোনানোর তাগিদ অতি সহজেই চোখে পড়ে। অনেক সময়ে নিজের কথা নিজেকে শোনানোর তাগিদও কম থাকে না। আর তা লিপিবদ্ধ হলে আমার মতো খুচরো গবেষকরা তার আস্বাদ গ্রহণ করতে পারে। ধূর্জটিপ্রসাদের 'মনে এলো' ঠিক আড্ডা নিয়ে নয়, তবে কথাপ্রসঙ্গেই এসেছে সেই যুগের কলকাতা কিংবা লক্ষ্ণৌর আড্ডার কথা। নিজের কথা বলতে গিয়ে একেবারে কথারম্ভে তিনি লিখেছেন "সারাদিন খেটেখুটে একলা খাবার টেবিলের ধারে বসে নিজের সঙ্গে যা কথোপকথন করেছি এ খানিকটা তাই। অতএব এক্ষেত্রে দায়িত্বহীনতা, কিংবা অসংলগ্নতার কথাই ওঠে না।"[১] অন্যান্য স্মৃতিমূলক রচনায় নিজের সঙ্গে কথোপকথনের চাইতে সামাজিক পরিবেশের বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়েছে। বলা বাহুল্য এই শ্রেণীর রচনায় নিজেকে লুকিয়ে বা অন্তত দাবিয়ে রেখে পরিবেশের বর্ণনাই একটা বড় জায়গা অধিকার করেছে। হীরেন মুখোপাধ্যায়ের ভাষায় "অত্যন্ত অপ্রতিভ বোধ করব যদি কেউ ভেবে বসেন যে আত্মকথা লিখতে বসেছি। অনেক দ্বিধার পর কিছু বলতে চাইছি জীবন যে পরিবেশে কেটেছে সে

বিষয়ে।"[২] এইদিক দিয়ে অগ্রগণ্য বোধ হয়, কালীপ্রসন্নর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ যে পরিচয়-এর আড্ডার ডায়েরি লিখে গেছেন সেখানে আড্ডাধারী হিসেবে তিনি কেমন নিজেকে সযত্নে গুটিয়ে রেখেছেন ; সেখানে তিনি বাদে আর সবায়ের কথাই আশ্চর্য বিশ্বস্ততায় বর্ণিত হয়েছে। এই দ্বিতীয় ধরনের স্মৃতিমূলক লেখায় নিজেকে লুকিয়ে বা অন্তত দাবিয়ে রাখতে গিয়ে দুটো বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে এক, যত নৈর্ব্যক্তিকই হোক, লেখার মধ্যে 'অনুপস্থিত' লেখক মাঝে মাঝেই উদ্ভাসিত হয়েছেন। নিজেকে দমিয়ে রাখার ধর্মকামিতা সবসময়ে কার্যকরী হয়নি। একজনের স্মৃতির ওপরে নির্ভর করে লেখা বলেই ইতিবৃত্তেই যাথার্থ্য সবসময়ে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই অবশ্য সুযোগ পেলেই লেখক 'নিজের ভুল স্বীকার' করে নিতে প্রস্তুত থাকেন।[৩] সে ঔদার্য হিরণ সান্যালের মতো মানুষের থাকলে ও আর সবার যে থাকবেই-এমন আশা করাটা বাড়াবাড়ি। আবার পরিবেশ বর্ণনায় লেখক যে তাঁর স্বাধীনতা মোটেই নেবেন না এবং তার মধ্যে 'আপন মনের মাধুরী' মেশাবেন না—তাও নয়। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে সাগরময় ঘোষ দেশ-এর আড্ডার কথা বলতে গিয়ে বেশ সততার পরিচয় দিয়েছেন "কিছু খাদ না থাকলে সোনা যেমন উজ্জ্বল হয় না, কিছু ভেজাল না থাকলে আমাদের আজকের সমাজজীবনে লোকে দু-পয়সা করে খেতে পারত না। খাঁটি তেল-ঘির স্বাদ আজকের দিনে আমরা ভুলেই গেছি। আমি এই যুগকে বলতে চাইছি ভেজালের যুগ। সুতরাং এই কাহিনীর মধ্যে কিছু ভেজাল যদি থাকে তো আমি নাচার।"[৪] দুই, আড্ডার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আর কেউ ডায়েরিতে টুকে রাখছেন—এই অস্বস্তিকর বোধই আড্ডার স্বতঃস্ফূর্ততা বা সাবলীলতাকে বিঘ্নিত করেছে। পরিচয়-এর আড্ডার কথা বলতে গিয়ে হীরেন মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন "মনে আছে আমাদের মধ্যে (এবং শ্যামলবাবুর সামনেই) হাসিঠাট্টা চলত যে তিনি প্রতিটি বৈঠক বিষয়ে রোজনামচায় লিখে চলেছেন আর সবাইয়ের যেন 'ভয়' যে কোন আকারে আমরা তাতে দেখা দেব কে জানে?"[৫] একদিন এই ডায়েরি প্রকাশিত হলে ভবিষ্যতের এক অজানা পাঠক সমাজের কাঠগড়ায় প্রত্যেক আড্ডাধারীকে দাঁড়াতে হবে। আড্ডায় উপস্থিত সকলের কাছে জবাবদিহি করা যায়। কিন্তু ভবিষ্যতের পাঠক সমাজ অনেকটাই অজানা তাদের প্রশ্নের উত্তর দেবার স্বাধীনতা আড্ডাধারীর অবশ্যই নেই। ভবিষ্যতের পাঠকসমাজ এসে আড্ডার পরিসরকেই কেবল বাড়ায় না, তাকে আরো জটিল করে তোলে। শুধু তাই

নয়। যেহেতু অন্যে তাঁকে নিয়ে লিখছেন সেহেতু অন্যের লেখায় তিনি কিভাবে ফুটে উঠবেন এবং ঠিক যেমনটি চান সেভাবেই ফুটে উঠবেন কিনা—এ সমস্ত সংশয় আড্ডাধারীকে যথেষ্ট 'ভীত' করে তোলে। সমাজজীবনে আড্ডার স্থান নিয়ে মননশীল, প্রবন্ধমূলক লেখার ঐতিহ্য নেই বললেই চলে। বুদ্ধদেব বসু গোপাল হালদারের মতো সাহিত্যিক বা সাহিত্য সমালোচকরা এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ উদ্যোগ দেখালেও সমাজতাত্ত্বিকদের তরফে একমাত্র বিনয় সরকার বাদে আর কারো উল্লেখযোগ্য উদ্যোগের কথা আমি মনে করতে পারি না। বাঙালির আড্ডা কেবল তার গর্বের বিষয়, সমাজতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয় হয়ে উঠতে পারেনি।

আড্ডা নিয়ে আমাদের যে গর্বের কথা দিয়ে এই লেখার সূত্রপাত করেছিলাম, তা এই তিন ধরনের লেখাতেই অল্পবিস্তর উপস্থিত: একদিকে আড্ডা নিয়ে আমাদের একটা আচ্ছন্নভাব, একটা স্মৃতিমেদুরতা আবার অন্যদিকে তাকে পুনরুজ্জীবনের আপ্রাণ চেষ্টা—এই দুইই যুগপৎ চলতে দেখা যায়। যে আড্ডা নিয়ে আমাদের গর্বের অন্ত নেই, তা আজ বেঁচেবর্তে নেই বলে মনে করা হয়। এই বিষয়ে কোনো কথা বলতে গেলেই একটা অদ্ভুত নস্ট্যালজিয়া আমাদের ভর করে বসে। মান্না দে-র মর্মস্পর্শী গানে ('কফি হাউসের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই') তা অমর হয়ে আছে। অঞ্জন দত্তের সাম্প্রতিক এক গানে সেই একই বিহ্বলতা লক্ষ করা যাবে "যাচ্ছে জমে কতো আড্ডা-তর্ক, যাচ্ছে ভেঙে কতো কতো সম্পর্ক!" আজকে গর্ব করার সেই প্রিয় জিনিসটা হারিয়ে গেছে বলেই হাহাকার এত তীব্র আকার ধারণ করেছে। গোপাল হালদার দুঃখ করে লিখেছেন: "আড্ডা ভেঙে আমরা যখন আসরের যুগে এসে গিয়েছি তখন কি আর ফিরে পাবো সেই অন্তরঙ্গ আশ্রয়?"[৬] এর পাশাপাশি প্রায় নিরবচ্ছিন্ন থেকেছে, একে পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা। বুদ্ধদেব বসু আড্ডা নিয়ে 'পৃথিবী-জয়ের' স্বপ্ন দেখেছেন। অজ্ঞাতকুলশীলদের নামগোত্রহীন চোথা আড্ডাকে 'বাংলা সাহিত্যের সূতিকাগার' বলে চিহ্নিত করেছেন বিনয় সরকার।

আড্ডা নিয়ে আমাদের যে গর্ব—তার পেছনে অন্তত দুটো কারণ খাড়া করা হয়। এই দুটো কারণ আবার পরস্পরবিরোধী; একটার সঙ্গে আর একটার কোনো সম্পর্ক থাকা সম্ভব নয় প্রথমত, আড্ডা জাতি, গোষ্ঠী বা কৌম হিসেবে আমাদের অর্থাৎ বাঙালিদের একটা স্বতন্ত্র আত্ম পরিচয় দান করেছে। আড্ডার কোনো সঠিক প্রতিশব্দ পৃথিবীর আর কোনো ভাষাতে নেই কারণ পৃথিবীর আর কোথাও বাঙালি যে অর্থে আড্ডা দেয়—তার চল নেই। বুদ্ধদেব বসুর কথায়

বলতে গেলে ঃ "·· আড্ডার মেজাজ নেই অন্য কোনো দেশে, কিংবা মেজাজ থাকলেও যথোচিত পরিবেশ নেই।"[৭] একই কথার প্রতিধ্বনি মেলে গোপাল হালদারের লেখায় ঃ "আড্ডাই বাঙালির বৈশিষ্ট্য।"[৮] আড্ডার পরে এই 'ই' বর্ণটা প্রমাণ করে যে তিনি আড্ডাকেই বাঙালিব একমাত্র বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেছেন—যা তাদের অন্যান্য জাতি, গোষ্ঠী বা কৌমের থেকে পৃথক করেছে। আড্ডাই আমাদেব স্বতন্ত্র জাতিসত্তাব একমাত্র চিহ্ন। আর সেই জন্যেই আড্ডা আমাদের গর্বের বিষয়। একদিকে আড্ডা যেমন জাতি হিসেবে আমাদের অন্যান্যদের থেকে পৃথক কবেছে ঠিক তেমনিই আর একদিকে আমাদের অন্তর্নিহিত সমস্ত অনৈক্যকে অনায়াসে অতিক্রম করে একটা সাধারণ সূত্রে আবদ্ধ কবেছে। এ এমন এক সামাজিক ক্রিয়া যা সমস্ত বাঙালির মধ্যেই অল্পবিস্তব লক্ষ করা যায ; ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নিচ, সাক্ষব-নিরক্ষব মায বয়সের তারতম্য নির্বিশেষে সমস্ত বাঙালিব মধ্যে আড্ডা দেয়ার প্রচলন বযেছে ঃ "বাঙালীর যত দলাদলি থাক, এঁদেব যত মতভেদ থাক, এঁরাও কেউ আড্ডার অতীত নন। সমস্ত বাঙালীর মধ্যে এই একটি মিল আছে—আড্ডা।"[৯] আড্ডা তাই বাঙালির একটা সাধাবণ বৈশিষ্ট্যেব মর্যাদা পেযেছে। আড্ডার জীবন ঐতিহ্য বাঙালি জাতিসত্তাকে টিঁকিয়ে রাখতে সক্ষম হযেছে। ফলত আমরা আড্ডাব 'অন্তরঙ্গ আশ্রয' ছেডে আসবেব প্রাতিষ্ঠানিক নৈর্ব্যক্তিকতাব মধ্যে এসে পডলে ও 'আমাদেব চাপে কোনো প্রতিষ্ঠান নিযম না-বাঁধা থেকে মানুষী জিনিষ হয়ে উঠতে চায়।"[১০] আশ্চর্যেব কথা, আবার ঠিক উল্টো কারণেও আড্ডা সমাদৃত হয়েছে। আড্ডার অবাধ এবং স্বাধীন আলাপ-আলোচনাব ধাবা ব্যক্তিকে গোষ্ঠীক কৌমের বন্ধন থেকে মুক্ত কবে এক স্বাধীন, সার্বভৌম সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। আড্ডাব মধ্যে ব্যক্তির নিজের মত এবং যুক্তির অবতাবণা কবার পথে কোনো বাধা নেই ; কৌম বা গোষ্ঠীব চোখরাঙানির কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয় না। বাঙালি জাতিকে আড্ডাব ঠেকে তুলো ধোনা করলেও তাকে সালমন রুসদি বা তসলিমা নাসরিনেব মতো হেনস্থা হতে হয় না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে আয়াতোল্লা খোমেইনিব কথা। মৌলবাদী বিপ্লবেব অব্যবহিত পবে ইবানে মোল্লা-মৌলানা-আযাতোল্লাদের অবিসম্বাদিত কর্তৃত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য বক্তৃতায তিনি তাঁদেবকে আলাপ-আলোচনা বিতর্কে খামোকা টেনে আনাব বিরুদ্ধে হুঁশিযাবি দিযেছিলেন। এখানে কিন্তু আলাপ-আলোচনাব সজীব ধারা ব্যক্তিকে কৌম ব্যতিবেকে তার এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব দান করেছে। কৌমেব বন্ধন থেকে সে সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং মুক্ত।

সামাজিক জীবন এবং সামূহিক জীবন

ঠিক এই প্রসঙ্গেই বাঙালির সমাজজীবন এবং সামূহিক (পাবলিক) জীবনের মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য নির্দেশ করা প্রয়োজন। সামাজিক জীবন বলতে প্রবন্ধের এই স্বল্প পরিসরে আমরা জীবনের সেই অংশকে বোঝাব যেখানে এক ব্যক্তির সঙ্গে আর এক ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের গোষ্ঠীগত আত্মপরিচয়টাই বড় হয়ে দাঁড়ায়। গোষ্ঠীর বাইরে যুক্তিশীল, একক ব্যক্তি হিসেবে তাদের আলাদা কোনো পরিচয় নেই। 'প্রতুল মুখোপাধ্যায়ের গানের ভাষায় "আমি আমার আমাকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই।" ফলত একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক একটা পূর্বনির্ধারিত ছক ধরে এগোয়, দুজনের একজনেরও ইচ্ছে অনিচ্ছের ওপরে নির্ভর করে না। যেমন, একজন যুক্তিশীল মানুষ হিসেবে আমি মনে করতে পারি, বাঙালি হয়েও কোনো হিন্দুস্থানী মহিলাকে বিয়ে করতে আমার কোনো বাধা নেই, এই বিয়েতে আমাদের দুজনেরই পুরোপুরি সম্মতি আছে। কিন্তু সম্মতি থাকলেই যে আমরা বিয়ে করে উঠতে পারব —ব্যাপারটা মোটেই এত সহজ নয়। আমার পরিবার এবং প্রতিবেশীদের এই বিয়েতে ঘোরতর আপত্তি থাকতে পারে। ঠিক তেমনি সেই মহিলার পরিবার এবং প্রতিবেশীদের তরফেও অনুরূপ আপত্তি থাকতে পারে। আপত্তি এত তীব্র, হতে পারে যে, তার কাছে আমরা দুজনেই মাথা নত করতে বাধ্য হতে পারি বিয়ে ভেঙে দেয়াটাই সংগত বলে মনে করতে পারি। এক্ষেত্রে গোষ্ঠীর বিধানের কাছে আমাদের যুক্তি পরাজয় স্বীকার করে নিল। এই অর্থে গোষ্ঠী বলতে যে কেবল কোনো ভাষাগোষ্ঠী বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকেই শুধু বোঝানো হবে—এমন কোনো কথা নেই। ভাষাগোষ্ঠী বা ধর্মীয় গোষ্ঠীর বাইরের মানুষদের নিয়েও একইরকম নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। পরিচয় এর আড্ডার শুধু সর্বভারতীয় নয়—একটা বিশ্বজনীন চরিত্র ছিল। হামফ্রে হাউসের মতো অনেক বিদগ্ধ সাহেব-সুবোও এতে যোগদান করতেন। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা দেখতে পাব, এরকম বিশ্বজনীন চরিত্র থাকা সত্ত্বেও পরিচয়-এর আড্ডার গোষ্ঠীগত চেহারা অক্ষুণ্ণ ছিল। কালীপ্রসন্নর লেখা থেকে জানা যায়, বাঙালি বাবুর যতো দহরম-মহরম তার সবটাই ছিল হয় সমগোত্রীয় বাবুদের সঙ্গে আর না হয় 'লক্ষ্ণৌয়ে পাতি ও ইরানী চাঁপদাড়ি বাবু' এবং সম্পন্ন বিহারিদের সঙ্গে।[১২] নিজের ভাষাগোষ্ঠীর 'বাজে' বা 'ছোটলোক'দের সঙ্গে তার কোনো ওঠাবসা ছিল না। আড্ডায় যোগদানকারী পাঁচমেশালি

সদস্যদেব নিয়েও একধবনেব আধুনিক গোষ্ঠীব উদ্ভব একালেব কলকাতায় ঘটেছে।

সামূহিক জীবনের ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যক্তিব স্বাধীনতাটাই বড় কথা, গোষ্ঠীগত পবিচযটা নয়। এই ব্যক্তিস্বাধীনতা সামূহিক ক্ষেত্রের প্রাণ। ব্যক্তিব নিজস্ব স্বার্থ এবং যুক্তিবোধ আছে—যেটা সম্বন্ধে ব্যক্তি শুধু ওয়াকিবহালই নয়, যাকে বূপাযিত কবতে ব্যক্তি অত্যন্ত তৎপব। বূপায়ণের পথে ব্যক্তি বাইবেব কোনো বাধাব সম্মুখীন হয না। বাঙালি হযে যদি হিন্দুস্তানীকে বিয়ে করাটা আমি যুক্তিযুক্ত বলে মনে কবি, তাহলে আমাব বা আমাব বান্ধবীর গোষ্ঠীসত্তা বিযে কবাব পথে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কবতে পারে না। এব বাইরে অবশ্য ব্যক্তিস্বাধীনতাব আব একটা গভীব অর্থ বয়েছে। সেটা সমাজেব মূল্যায়ন-সংক্রান্ত। শুধু তো বিযে কবলেই হল না—যে কোনো সামাজিক কাজ বিশেষত বিযে কবার মতো সামাজিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সামাজিক মূল্যাযণেব অতীত নয। হিন্দুস্তানীকে বিযে কবাব ফলে আমার সমাজে আমাকে নিযে কানাঘুষো শুরু হয়ে যেতে পাবে, নানাবিধ কটুকাটব্যে আমি অস্থিব এবং বিপন্ন বোধ কবতে পাবি। কিন্তু সামূহিক ক্ষেত্রের ব্যক্তিস্বাধীনতার অর্থ হল, সামাজিক মূল্যাযনকে প্রভাবিত কবাব স্বাধীনতা। এব ফলে সামাজিক মূল্যায়নেব অমোঘ কোনো বিধান থাকে না। পুরো ব্যাপাবটাই আপেক্ষিক হয়ে দাঁডায। গোষ্ঠীব বাইরে কাউকে বিযে করলে যদি সমালোচনা ওঠে তবে তার উচিত জবাব দেবাব স্বাধীনতা আমাব আছে—এমন কি যুক্তির জোরে আমি অন্যদের আমাব মতে নিযে আসতে পাবি। সুতরাং প্রথম অর্থে স্বাধীনতা থাকলেই যে দ্বিতীয অর্থে স্বাধীনতা থাকবে—এমন কোনো কথা নেই। কিন্তু এই দুই অর্থেব স্বাধীনতা নিয়েই গড়ে ওঠে সামূহিক ক্ষেত্র। সামূহিক জীবন গড়ে তোলাব পেছনে আলাপ-আলোচনার অবদানকে কোনক্রমেই খাটো করে দেখা যায় না প্রথমত, অবাধ আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যক্তি তার একান্তভাবেই নিজস্ব যুক্তিব অবতারণা করে; এক্ষেত্রে সে জাতি-গোষ্ঠী-কৌমেব চোখরাঙানির কাছে কোনভাবেই আত্মসমর্পণ করে না। অর্থাৎ, সামূহিক জীবনে তার নিজস্ব যুক্তি স্বাধীনভাবে অবতারণা করার অধিকার স্বীকার করে নেযা হয। বাঙালি হযেও বাঙালির আড্ডায় বাঙালির মুণ্ডুপাত করতে আমার কোনো বাধা নেই। আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আপন যুক্তিকে অবতারণা করার এই প্রতিবন্ধকহীন শক্তিই সামূহিক ক্ষেত্রের প্রাণ। দ্বিতীযত, একথা ঠিক যে আলাপ-আলোচনা

ব্যক্তিকে তার নিজস্ব যুক্তি অবতারণা করার সুযোগ এনে দেয়। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সারাক্ষণ সে নিজের যুক্তিকে আঁকড়ে ধরে বসে থাকে; অন্যের থেকে তার শেখার কিছু নেই। আধুনিক মানুষ অবশ্য আত্মগর্বে গর্বিত— আলাপ-আলোচনায় নিজের যুক্তিকে খাড়া করতে অসফল হলে তার আর মান থাকে না। ঠিক এই কারণেই আমরা অনেক সময় এঁড়ে তর্কে প্রবৃত্ত হই। এঁড়ে তর্ক কোনো অবস্থাতেই নমনীয় নয়। আধুনিকতা আমাদের আর কিছু করতে না পারুক—আপন যুক্তিকে অন্ধভাবে আঁকড়ে ধরে রাখার ঔদ্ধত্য শিখিয়েছে। অন্যের থেকে আমার আর কিছু শেখার নেই—এই অনুদারতা আধুনিক ব্যক্তির লক্ষণ। ব্যক্তি যুক্তির অবতারণা করে মাত্র; অন্যের সংস্পর্শে এসে তাকে শোধরায় না—বদলানো তো দূরের কথা। ধরে নেয়া হল, আলাপ-আলোচনায় অংশগ্রহণের আগেই তার ব্যক্তিসত্তার সম্পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে; এতে অংশগ্রহণ করে তার নতুন করে পাবার মতো আর কিছু নেই। প্লেটোর 'কথোপকথনে' সক্রেটিস অন্যের সঙ্গে কেবল আলোচনায় প্রবৃত্ত হননি, এর মাধ্যমে অন্যকে বদলেছেন। আর সবাই সমৃদ্ধ হয়ে—যেন নতুন মানুষ হয়ে যে যার বাড়ি ফিরে গেছেন। আমার কিন্তু ভাবতে অবাক লাগে, সক্রেটিস কখনো বদলান না, তাঁর যুক্তিকে শোধরাবার দরকার হয়নি। নামে কথোপকথন হলে কি হবে—এই গ্রন্থে বর্ণিত কথোপকথন কিন্তু শুধুই একতরফা। অন্যদিকে একতরফা আলোচনা নিয়ে কোনো যথার্থ সামূহিক জীবন গড়ে উঠতে পারে না। এতে অংশগ্রহণ করেই ব্যক্তি ইতিবাচক অর্থে ব্যক্তি হয়ে ওঠে, তার আগে নয়। ব্যক্তির এই ব্যক্তি হয়ে ওঠার রহস্য আলাপ-আলোচনার মধ্যে নিহিত আছে। ব্যক্তিত্বের বিকাশে তাই আলাপ-আলোচনার অবদানকে লঘু করে দেখা যায় না। এর অর্থ কিন্তু কখনোই এই নয় যে, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অন্যের সংসর্গে এসে নিজেকে শোধরালে—এমনকি বদলালেই আমার নিজের বলতে যা কিছু তার সবটাই জলাঞ্জলি হয়ে যায়। অন্যের সংস্পর্শে এসে নিজেকে শোধরানো বা বদলানোর প্রয়োজনীয়তাটাই আমিই অনুভব করি—আমাকে জোর করে কেউ শোধরায় বা বদলায় না। এটা আমার—একেবারেই আমার অনুভব। ব্যক্তিত্বের জয়টা এই প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করার মধ্যে দিয়েও অনেক সময় ধ্বনিত হয়। নিজের ব্যক্তিত্বকে শোধরাবার বা বদলাবার যে স্বাধীনতা—তা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমেই সম্ভবপর হয়। এর ফলে সামূহিক জীবনে যুক্তি তার একান্ত নিজস্ব, ব্যক্তিগত চরিত্র হারায়। এক বিশিষ্ট জার্মান দার্শনিকের ভাষায়, এ হল,

'যোগাযোগকারী যুক্তি' ('কমিউনিকেটিভ রিজন')। সামূহিক জীবনের কেন্দ্রে রয়েছে এই যোগাযোগকারী যুক্তি।

এটা ঠিক যে অত্যন্ত প্রাথমিকভাবে হলেও আমাদের এখানে সামূহিক জীবন গড়ে তোলার একটা আন্তরিক প্রয়াস চালানো হয়েছে। কিন্তু আড্ডার পরিমণ্ডলে যে সামূহিক জীবনের উদ্ভব ঘটেছে তা সামাজিক জীবন থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। অর্থাৎ, এখানে বলা যেতে পারে, সামূহিক জীবনের একটা সামাজিকীভবন বা গোষ্ঠীভবন ঘটেছে। কিন্তু তার মধ্যে দিয়ে বাঙালি গোষ্ঠীসত্তাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। গোষ্ঠীভবন হলেও তা আমাদের বাঙালি সত্তার দ্যোতক হয়ে উঠতে পারেনি। আড্ডার আসরে একদিকে যেমন আমরা বাঙালি গোষ্ঠীসত্তাকে হারিয়েছি, আর একদিকে তেমনি যথাযথ সামূহিক জীবনের গোড়াপত্তনও করতে পারিনি। তাই, বাঙালির আড্ডা নিয়ে গর্ব করার মতো বেশি কিছু আজ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে এ প্রবন্ধের কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ সীমাবদ্ধতার কথা বলে রাখা দরকার প্রথমত, আমার এ লেখা আড্ডা নিয়ে—স্বভাবতই বাঙালির আলাপ-আলোচনার অন্যান্য ধারাগুলোকে খুব ভেবেচিন্তেই আমাদের প্রবন্ধের সীমিত পরিসরের বাইরে সরিয়ে রাখা হয়েছে। সরিয়ে রাখা হয়েছে বলেই সেগুলো তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ—এমন অনুমান করা অন্যায় হবে। বাঙালির আলাপ-আলোচনার অন্যান্য ধারাগুলোও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। এরমধ্যে সভা-বৈঠক-মজলিশ কথকতার মতো প্রাতিষ্ঠানিক আলাপ-আলোচনার ঘরাণাও যেমন রয়েছে, তেমনি আড্ডা-গল্প খোশ গল্প—এমন কি গাঁয়ের পুকুর ঘাটে দুই সখির মুখের পাশে সংগোপনে হাত রেখে ফিসফিস করে প্রাণের কথা বলা এবং পরনিন্দা-পরচর্চার ঘরাণাও রয়েছে। গবেষণার জন্যে এর কোনটাই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কথকতা নিয়ে অধ্যাপক গৌতম ভদ্রের সামপ্রতিক গবেষণা বাঙালির আলাপ-আলোচনারা ঐতিহ্যকে নতুন করে মূল্যায়ণ করার সুযোগ এনে দিয়েছে।[১২] দ্বিতীয়ত, প্রবন্ধের শিরোনাম 'বাঙালির সমাজজীবনে আড্ডা' হলে কি হবে—আমরা মূলত কলকাতার ভদ্রলোকদের আড্ডার মধ্যেই আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি। কলকাতার ভদ্রলোকদের নাগরিক আড্ডার সঙ্গে মফস্বলের শহর বা গ্রামের আড্ডার অনেক ব্যাপারেই মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। প্রসঙ্গত বলি, এ লেখা বাঙালির আড্ডার কোনো কালানুক্রমিক ইতিহাস নয়। বরং বিক্ষিপ্ত কিছু উদাহরণের সাহায্যে পূর্বোল্লিখিত সিদ্ধান্তকে তুলে ধরাটাই এর

প্রধান উদ্দেশ্য। পাল্টা উদাহরণ অবশ্যই থাকতে পারে, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অথচ গুরুত্বপূর্ণ কোনো বক্তব্য ভেসে উঠতে পারে। আর তা যদি কোনো বিতর্কের সূচনা করতে পারে, তাহলে সেটাই আমার লাভ। আমার বক্তব্য চূড়ান্ত বা অমোঘ—কোনটাই নয়। তৃতীয়ত, আমি কলকাতার ভদ্রলোকদের নাগরিক আড্ডার কেবল সেই অংশের ওপরেই আমার দৃষ্টি আবদ্ধ রেখেছি, যে অংশটা আপেক্ষিক অর্থে বেশ খানিকটা লিপিবদ্ধ। আড্ডা নিয়ে যে তিন ধরনের লেখালেখির কথা গোড়াতেই বলেছি—তার প্রথম দুই ধরনই আমার তথ্যসূত্র হিসেবে কাজ করেছে। লিপিবদ্ধ নয়—এমন আড্ডার প্রসঙ্গ যেমন ওঠেনি, তেমনি লিপিবদ্ধ হবার ফলে আড্ডার সাবলীলতায় যে ছেদ পড়েছে এবং তাতে যে অল্পবিস্তর 'ভেজাল' এসে মিশেছে—তার কথা আগেই বলেছি। আর তার ওপর নির্ভর করে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছনো, তার মধ্যেও গাজোয়ারি ব্যাপারটা বা ভেজাল থেকে যেতে পারে—তা নিয়ে আমি যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

আড্ডা এবং গল্প

আড্ডা দেয়া এবং গল্প করার মধ্যে গবেষণার স্বার্থে একটা পার্থক্য করা চলতে পারে। আবার এটাও ঠিক যে, কার্যক্ষেত্রে অনেক সময়ে এই পার্থক্য অন্তর্হিত হয়ে যেতে দেখা যায়। তবুও এই দুই প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য টানা সম্ভব এক, আড্ডা দেয়ার মধ্যে নিজে মজে যাওয়া এবং অন্যেকে মজানোর একটা ব্যাপার আছে। যিনি আড্ডা দেন, তিনি আড্ডাতেই এত তন্নিষ্ঠ হয়ে পড়েন যে, সাংসারিক কাজ, সামাজিক দায়দায়িত্ব, ইতিকর্তব্য কিছুই তাঁর খেয়ালের মধ্যে থাকে না। সমর সেনের বাবা ছিলেন, তাঁর নিজের ভাষায় 'আড্ডাবাজ ও বন্ধু বৎসল।' মার মৃত্যুর পরে আড্ডা নিয়ে এতই মশগুল হয়ে থাকতেন যে সংসারের হাল ধরার কোনো দায়িত্ব অনুভব করেন নি "বাবার দিন কাটত কলেজে ও আড্ডায়।···এতগুলো পুত্রকন্যার তদারক করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ।"[১৩] আড্ডাবাজ বাবা-দাদার বদগুণে সংসার বয়ে যাওয়ার ঘটনা মোটেই বিরল নয়। এই জমে যাওয়া বা জমানোর ব্যাপারটা যে সবাই সমান ভাবে পারেন—এমন নয়। হিরণ সান্যালের কথায়, সত্যেন বোস ছিলেন 'আড্ডার রাজা'।[১৪] আবার হীরেন মুখোপাধ্যায় অকপটে স্বীকার করেছেন, 'আড্ডাধারী' হবার মতো 'স্বভাব' তাঁর ছিল না।[১৫] আড্ডা জমাতে ওস্তাদ—এরকম প্রায় সমসাময়িক কয়েকজন মানুষকে নিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ একটা তালিকা তৈরি

করেছেন। তাতে আছেন রবীন্দ্রনাথ, নাটোর, সাহেদ সুবাওর্যাদি', অমৃতলাল, প্রমথ চৌধুরী, শরৎদা, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশ চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন, হারীৎকৃষ্ণ দেব, হিরণকুমার সান্যাল, শিশির ভাদুরী।'[১৬] গল্প করার মধ্যে এই নিজে মজে যাওয়া বা অন্যেকে মজানোর ব্যাপারটা নেই। কারণ গল্প হয়, কাজের ফাঁকে—সবসময়ে কাজের ভূত মানুষকে তাড়া করে ফেরে। এখানে একনিবিষ্ট বা তদগতপ্রাণ হয়ে যাবার কোনো সুযোগ নেই।

ঠিক একইভাবে আড্ডা এবং গল্পের মধ্যে দ্বিতীয় একটা পার্থক্য লক্ষ করা যায়। বেঁচে থাকবার আটপৌরে অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানকে নিয়ে গল্প। আড্ডার বিষয়বস্তু আবার ঠিক এই আটপৌরে, দৈনন্দিন জীবনবৃত্তের মধ্যে আবদ্ধ নয়। বরং তার উল্টোটা। এই বৃত্তের গণ্ডি কেটে ব্যক্তিত্বকে স্বাধীন করার অঙ্গীকার থাকে আড্ডায়। আমাদের আটপৌরে অভিজ্ঞতায় পৃথিবী কখনোই তার অখণ্ডতায় বা সমগ্রতায় ধরা দেয় না; অসংখ্য আপাত-অসংলগ্ন টুকরো-টাকরা নিয়েই তার ঝুলি ভরে ওঠে। আমরা যুক্তিবাদী আন্দোলনের সারবত্তাও যেমন অনুভব করি, তেমনি গণেশকে দুধ খাওয়ানোর জন্যেও ছুটি। আড্ডায় কিন্তু এই অসংগতি বা অসামঞ্জস্যের কোন স্থান নেই। আড্ডায় আলোচনা সেই আটপৌরে, খণ্ডিত পৃথিবীকে অখন্ডভাবে বা সামগ্রিকভাবে দেখা, বোঝা এবং উপলব্ধি করার প্রয়াস চালায়। এর মধ্যে বিশ্বের রহস্যকে উদ্ঘাটন করতে পারার নির্মল আনন্দ বা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, অহেতুকী আনন্দ, থাকে বলেই তা সংসার উদাসী এবং জাগতিক দায়দায়িত্বকে অবলীলায় হেলাফেলা করতে পারে। বিশ্বকে আমি আমার মতো করে, সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দেখি, বুঝি, জানি, উপলব্ধি করি—এই পূর্ণতাবোধই আমার ব্যক্তিত্বকে স্বাধীন এবং মুক্ত করে। তা কিন্তু অন্যের কাছে নিতান্ত অবৈজ্ঞানিক, ভ্রান্ত এবং অসত্য হতে পারে। তবু আমার কাছে তার মূল্য অপরিসীম; আমি তাকে সত্য এবং সংগতিপূর্ণ বলে জেনে পরম আনন্দ বোধ করি। নিজের বাড়ির বৈঠকখানায় পিতৃবন্ধুদের আড্ডার বিবরণ দিতে গিয়ে হীরেন মুখোপাধ্যায় যেমন বলেছেন।

"...সেদিনের আড্ডায় প্রায়ই যে অট্টহাস্য উঠত তা যেন আজকালকার বাঙালি জীবন থেকে অন্তর্ধান করেছে—গালগল্প করার মতো লোক কেউ তাঁরা ছিলেন না, হাসিঠাট্টা মসকরা যাকে বলে তাও সেখানে তেমন চলত না, কথাবার্তা বেশির ভাগই হত নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার নিয়ে, কিন্তু তা থেকেও প্রবল হাসির খোরাক আমাদের জ্যেষ্ঠেরা জোগাড় করতে পারেন।"[১৭] বাঙালির এই ধরনের আড্ডা

ক্রমশ বিরল হযে পড়ছে “ তিবিশ-চল্লিশ দশকেব আড্ডায যা গুরু-গম্ভীব জ্ঞানগর্ভ আলোচনা চা সিগারেটেব সাহায্যে অল্প স্বল্প চলত তা এখন সম্ভব নয়। চা আজকাল বুদ্ধি শানায় না। অথচ তরল মাদক দ্রব্যে ফূর্তিব ভাবটা যত বাড়ে, আলোচনার সার পদার্থ তত কমে।”[১৮] বাঙালি ভদ্রলোকেব গর্ব কিন্তু এই পুবনো, হাবিযে-যাওযা আড্ডা নিযে। কেন তা আজকেব যুগে ক্রমশ বিরল হযে পড়ল—সে অন্য প্রশ্ন।

ভদ্রলোকেব আড্ডা / আড্ডাব ভদ্রতা

আগেই বলেছি, আমাব এ লেখা কলকাতাব বাঙালি ভদ্রলোকেব আড্ডা নিযে। শত দুর্বলতা সত্ত্বেও উপনিবেশিক শাসকদেব সুবাদে কলকাতাতেই প্রথম একটা সামূহিক জীবনেব পরিকাঠামো তৈরিব সংঘবদ্ধ প্রযাস লক্ষ কবা যায। বাংলাই ছিল এই 'নবজাগরণ' বা গোষ্ঠীব বন্ধন থেকে ব্যক্তিসত্তাব মুক্তিব পীঠস্থান। এখান থেকেই ভাবতবর্ষেব অন্যান্য প্রান্তে সামূহিক জীবনেব পবিকাঠামো বা অন্তত তাব গভীব স্বপ্ন চালান হতে থাকে। বলা বাহুল্য, গ্রামবাংলাব তুলনায এ ব্যাপাবে কলকাতাই অগ্রনী ভূমিকা গ্রহণ কবে।[১৯] কলকাতায বসবাসকারী সমস্ত শ্রেণীব মানুষকেই সামূহিক জীবনেব প্রাণকেন্দ্র হিসেবে ভাবলে মুশকিল আছে। এব গোড়াপত্তন বিশেষত বাঙালি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক সমাজেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাই, সামূহিক জীবনেব হদিশ পেতে হলে এই ভদ্রলোক সমাজেব ইতিহাস পবিষ্কাব বুঝে নেযা দবকাব। কলকাতাব সামূহিক জীবনেব গোড়াপত্তন মুখ্যত ঔপনিবেশিক শাসকদেব বদান্যতায যে ঘটেছিল—সে ব্যাপাবে কোনো সন্দেহ নেই। দক্ষিণ আফ্রিকাব বর্ণবিদ্বেষী উপনিবেশিক সবকাব কিন্তু স্থানীয কৃষ্ণাঙ্গ মানুষেব আত্মিক উন্নতিব কোনো প্রযাস চালাযনি কাবণ তাদেব মুক্তিব যোগ্য বলেই সবকাব বিবেচনা কবেনি। কিন্তু ভাবতবর্ষে প্রধানত প্রাচ্য পণ্ডিতদেব পবামর্শে উপনিবেশিক শাসকেবা আমাদেব আত্মিক উন্নতিব কাজে সময বিশেষে মনোনিবেশ কবেছিল। সবচেযে বড কথা, এই কাজে তাঁবা আমাদেব দোসব করে নিযেছিল। আত্মিক উন্নতিব কর্মসূচিটা ছিল মূলত সামূহিক জীবনেব গোড়াপত্তন—প্রাক-আধুনিক, মধ্যযুগীয গোষ্ঠী এবং কৌমের থেকে ব্যক্তিসত্তাব বন্ধনমুক্তি। আমাদেব সামূহিক জীবনেব উত্থান এবং বিকাশে উপনিবেশিক শাসকদের অবদানকে বেমালুম অস্বীকাব করলে সত্যেব অপলাপ হবে।

বাঙালি ভদ্রলোকের সঙ্গে আড্ডার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক আছে। বাঙালি ভদ্রলোক যেমন আড্ডার প্রতি প্রবল আকর্ষণ বোধ করেছে, তেমনি আড্ডাও বাঙালি ভদ্রলোক সমাজেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। আড্ডার প্রতি বাঙালি ভদ্রলোকের তীব্র আকর্ষণের পেছনে কয়েকটা কারণ এখানে সূত্রাকারে বিবৃত করা যেতে পারে এক, আমরা জানি ঐতিহাসিক কারণেই উৎপাদন-নির্ভর অর্থনীতিতে বাঙালি ভদ্রলোকের ঠাঁই হয়নি। এর ফলে, তার হাতে ছিল অখণ্ড অবসর এবং অবসরই মন্থর এবং নৈর্ব্যক্তিক আড্ডার অবাধ সুযোগ করে দিয়েছিল। অনুরূপ ঘটনা প্রাচীন গ্রীসদেশেও ঘটেছিল। যেখানে আলাপ-আলোচনার পরিপুষ্টি লাভ করার মূলে ছিল, দাসপ্রথা। দাসপ্রথার প্রচলন তদানীন্তন অভিজাতদের কায়িক পরিশ্রম থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। এর ফলে তাঁরা বিশুদ্ধ সারস্বত সাধনায় মনোনিবেশ করতে পেরেছিলেন। বস্তুত, অ্যারিস্টোটল দাসপ্রথাকে নৈতিক সমর্থন করেছেন ঠিক এই কারণে। আমাদের এখানেও ভদ্র এবং অভদ্রের মধ্যে ভেদরেখা হচ্ছে, কায়িক শ্রম। যিনি ভদ্রলোক, তিনি 'লোকনিন্দার ভয়ে ঘটি হারাইবেন'—কিন্তু কায়িক শ্রম একেবারেই করবেন না। ভদ্রলোকের সম্মানের পক্ষে তা অত্যন্ত হানিকর বলে গণ্য হয়। একদিকে কায়িক শ্রমের প্রতি তীব্র বিতৃষ্ণা, আর একদিকে বাঙালির ভাষা এবং সংস্কৃতির অভিভাবক হিসেবে নিজেকে ভাবা—এই দুটোই বাঙালি ভদ্রলোকের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। কায়িক শ্রমের প্রতি অনীহা যেমন তাকে আড্ডার অখণ্ড অবসর এনে দিয়েছে, তেমনি অভিভাবকত্বের অভিমান বাংলা ভাষা এবং সংস্কৃতিকে তার আড্ডার বিষয় করে তুলেছে। একটা কথা এখানে অবশ্য বলে রাখা দরকার। তারা যে নিজেদের অভিভাবক বলে মনে করছে—তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, সমাজের আর সবাই তাদের একই চোখে দেখেছে। অনেক সময়ে গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল হতে গিয়ে ভদ্রলোকদের কম নাকাল হতে হয়নি। ১৮২৯-এর প্রথম প্রকাশ্য বিতর্কেও দরিদ্র কৃষকেরা ভদ্রলোকদের সঙ্গে তাদের গলা মেলাতে পারেনি। এতৎসত্ত্বেও অভিভাবকত্বের অভিমান আজকের দিনেও লক্ষ করা যাবে।

এবারে আসি প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশে। আড্ডা কেন ভদ্রলোক সমাজেই সর্বাধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে ভদ্রলোকের স্বাভাবিক ভদ্রতাই আড্ডার প্রাণ। আমি একথা একবারও বলছি না যে, যে কোনো ভদ্রলোকের আড্ডায় ভদ্রতাকে সবসময়ে বজায় রাখা সম্ভব হয়। ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। ব্যাপারটা হল, আড্ডার মধ্যে

ভদ্রতা বজায় রাখার দায় ভদ্রলোক মোটেব ওপব চিরকালই অনুভব কবেছে। সাধারণ বাঙালি ভদ্রতাকেই গোপাল হালদাব চোদ্দ নম্বব পাশী বাগানের খোলা ফবাসে আসন গ্রহণ করার 'একমাত্র পাশপোর্ট' বলে উল্লেখ ঝরেছেন।[২০] ভদ্রতার ব্যাপারে চূড়ান্ত নজির হল, পবিচয়-এব আড্ডা। এই আড্ডায় নিজেব বক্তব্যকে যেমন-তেমন পেশ করার গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত ছিল না "মন্তব্যকে একটা বিশেব ভব্যতাব কাঠামোর মধ্যে বেখে যুক্তি দিযে প্রকাশ কবতে হত। (ফলত) অনেক সমব বহির্জগতের উত্তাল-উত্তেজনাব সাথে সভ্যদের উদ্বেগশূন্য নিশ্চিন্ততার মধ্যে সূক্ষ্ম আপাত-অনাবশ্যক কথায় মেতে থাকতে দেখতাম।"[২১] উত্তাল-উত্তেজনাব কথা এখানে বলা হযেছে, তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেব সময়কাব। যে কথা 'ভব্যতাব কাঠামো'র মধ্যে প্রকাশ করা যায় না বা আমি করতে পাবি না—তা বলার অধিকার আমার নেই। এ ব্যাপারে নামকরা ছিলেন সুধীন দত্ত "(তাঁর) গালিগালাজেব মধ্যেও এমন একটা কেতা থাকত যে মনে হত তা যেন অভিনয-দুবস্ত।"[২২] ভদ্রলোক যে আড্ডার ভদ্রতাকে বজায় রাখায দায তীব্রভাবে অনুভব কবেছেন—তাব উদাহরণ বুদ্ধদেব বসু। মূলত ভদ্রতা বজায় রাখতেই আড্ডায 'স্ত্রী-পুরুষেব সংমিশ্রণেব' প্রযোজনীয়তা অনুভব করেছেন তিনি "মেযেবা কাছে থাকলে পুরুষের এবং পুরুষ কাছে থাকলে মেযেদের রসনা মার্জিত হয। কণ্ঠস্বব নিচু পর্দায় থাকে, অঙ্গভঙ্গী শ্রীহীন হতে পাবে না।"[২৩] আড্ডাব ভদ্রতাকেই যদি বজায না রাখা যায়, তাহলে যে ভদ্রলোকের 'ভদ্র' আত্মপরিচয়টাই বিপন্ন হয। ভদ্রতাকে বজায় রাখার প্রশ্ন তাই ভদ্রলোকেব অস্তিত্বের প্রশ্ন বলে বিবেচিত হয।

প্রসঙ্গান্তবে যাবাব আগে কয়েকটা কথা একটু বলে নেযা দরকার। যে কোনো আড্ডার চক্রে অনুচ্চারিত হলেও প্রায সর্বজনগ্রাহ্য একটা ভদ্রতার সীমা লক্ষ করা যায়। এব আভাস পাওয়া যায়; কিন্তু ঘোষিত বা লিখিত বিধিনিযম থাকে না। সম্ভবত তা থাকতেও পাবে না। কারণ যুগে যুগে ভদ্রতার সংজ্ঞা পাল্টায়, সীমানা পরিবর্তিত হয়। হুতোমের যুগেব ভদ্রতাব সঙ্গে সুধীন দত্তেব ভদ্রতাকে মেলানো ভাব। আবার খোদ সুধীন দত্তের জীবনেই অনেক পরিবর্তন এসেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি যে বাজাবদর নিয়ে আলোচনা করতেন—সেকথা সমর সেনও লিখে গেছেন।[২৪] বিশেষ যুগে যেমন আড্ডার ভদ্রতার একটা প্রায় সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা থাকে, তেমনি কাজের ক্ষেত্রে তাব বিধি-বিধানগুলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মানা হবে—এমন মনে করার কোন

কারণ নেই। কল্লোল এর আড্ডায় নজরুলকে ভদ্রতার রশিতে বেঁধে রাখা অসম্ভব ছিল। ভদ্রতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার দরুণ অনেক সময়ে কাগজের ভেতরেই সমালোচনার তুফান উঠেছে, অশান্তিও কম হয়নি। এ বিষয়ে সরোজ দত্তকে পথিকৃৎ বলে গণ্য করা যেতে পারে। অত্যন্ত সচেতনভাবে ভদ্রতার ব্যাকরণকে ভেঙে ফেলার ক্ষেত্রে অসাধারণ সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধকে প্রভাবিত করতে গেলে যে ধরনের উদ্যোগ নেয়া দরকার ছিল–তার অভাবেই সম্ভবত তাঁর প্রয়াস দানা বাঁধতে পারেনি। ভদ্রতার ব্যাকরণকে ভাঙতে গেলে ভদ্রলোকদের তরফে তাকে বাঁচিয়ে রাখার তীব্র দায়বোধ অকস্মাৎ জাগ্রত হয়, বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অভদ্রতার নিজস্ব ব্যাকরণ তৈরি হয় না। তা করতে গেলে সামাজিক মূল্যবোধকে সংগঠিতভাবে প্রভাবিত করার উদ্যোগ নিতে হবে। তা না হলে ভদ্রতার ব্যাকরণকে একক বিরোধিতায় ভাঙা সম্ভব নয়। এখানে আবার একটা চিরন্তন বিয়োগান্তিকতা লুকিয়ে আছে। অভদ্রতার ব্যাকরণ তৈরি করতে গেলে অভদ্রতাকেই বিসর্জন দিতে হয়। ব্যাকরণের অনুশাসনে বাঁধলে অভদ্রতার চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকে না।[২৫] যাক সে অন্য প্রশ্ন। আড্ডা নিয়ে বাঙালি ভদ্রলোকের যতো গর্ব তা কিন্তু আড্ডার ভদ্রতা নিয়ে; এটা বজায় না রাখতে পারলে তার গর্ব করার আদৌ কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

যুক্তি এবং সমর্থন

সামূহিক ক্ষেত্রে সামাজিক জীবনের অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশ আড্ডার আসরে গোষ্ঠীগত সম্পর্কগুলোকে নতুন ভাবে চাঙ্গা করে তুলেছে। এর ফল হয়েছে দ্বিমুখী এক, ব্যক্তিকে গোষ্ঠীর বন্ধন থেকে মুক্ত করার যে অঙ্গীকার সামূহিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করার প্রয়াসের মধ্যে নিহিত ছিল–তাকে বাস্তবায়িত করা সম্ভব হল না। সামূহিক জীবনকে গ্রাস করল সামাজিক জীবন। এই গ্রাস করার পুরো প্রক্রিয়াটাকেই আমরা গোষ্ঠীভবন বলে আখ্যাত করেছি। দুই, আড্ডার আসরে গোষ্ঠীগত সম্পর্কগুলো মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেও তা কিন্তু আমাদের বাঙালি সত্তার যথার্থ পরিচায়ক হয়ে উঠতে পারেনি। ফলে, আমরা বাঙালি সত্তাকেও হারালাম, আবার সামূহিক জীবন গঠন করতেও অসমর্থ হলাম। প্রবন্ধের এই অংশে বাঙালি ভদ্রলোকের আড্ডায় গোষ্ঠী ভবনের অন্তত তিনটে রূপ নিয়ে খানিক আলোচনা করতে পারি। এই তিনটে রূপ হল সমর্থন, বিরোধিতা এবং হস্তক্ষেপ।

গোষ্ঠীভবনের প্রথম রূপ হল, সমর্থন। পুরনো আড্ডায়—বিশেষ করে গত শতকের আড্ডায় এর প্রচুর নজির মিলবে। আজকের দিনেও অবশ্য এই আড্ডার চল একেবারে উঠে যায়নি। এর দুটো মূল বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে প্রথমত, একই আড্ডার আসরে অনেকে দৈহিকভাবে হাজির থাকলেও সবাই যে একইভাবে যুক্তিপ্রয়োগে পারদর্শী হবে—এমন নয়। যুক্তি মনুষ্য চরিত্রের এমন বিরল গুণ যে তা কেবল একজন বা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত থাকে—সবার মাঝে সহজলভ্য হয় না। দ্বিতীয়ত, যুক্তির জগতে এই অসাম্য এত প্রবল যে আড্ডার আসরে উপস্থিত সকলের বিশিষ্ট, অধিকতর যুক্তিক্ষম এবং প্রাজ্ঞজনের যুক্তি অনুধাবন করা বা হৃদয়ঙ্গম করার মতো ক্ষমতাও নেই। ফলে বাকি সবাই যুক্তি দিয়ে প্রাজ্ঞজনের যুক্তি বোঝে না—বরঞ্চ তাতে অন্ধ বিশ্বাস রাখে। বাবুর প্রজ্ঞা প্রদর্শিত হয় মোসাহেবদের সামনে। মোসাহেবি ঐতিহ্য আজকের দিনেও দিব্যি বেঁচেবর্তে আছে। সুমন চট্টোপাধ্যায়ের এক গানে এদের 'তালে তাল দেয়া, হ্যা-হ্যা-বলা সং' বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, অধিকতর যুক্তিবানদের প্রতি আস্থা কিন্তু যুক্তির দ্বারা যাচাই করে তৈরি হয় না—কারণ মোসাহেবদের সেই ক্ষমতাটিই নেই। ফলত যুক্তির পেছনে এসে ভর করে, বিশিষ্ট জনের যুক্তি ক্ষমতার প্রতি অচলা আস্থা বা বিশ্বাস। যুক্তি ক্ষমতার প্রতি আস্থা থাকা এবং যুক্তির ওপরে আস্থা থাকা আবার এক কথা নয়। আমি যুক্তিক্ষম বলেই যে সব সময়ে যুক্তির পথ ধরে চলবো, বা এঁড়ে তর্ক করব না—এমন কোনো নিশ্চয়তা আছে কি? ব্যক্তি যুক্তিক্ষম বলে বিশিষ্ট নন, বিশিষ্ট বলেই যুক্তিক্ষম—এমন মনে করা হয়। এই ধরনের আড্ডায় যুক্তির ক্ষমতার প্রতি আস্থা তৈরি হয় বা অনেক সময়ে সচেতনভাবে তৈরি করা হয়। তথাকথিত বিশিষ্টজনেরা যে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এই আস্থার তৈরির কাজটা সম্পন্ন করেন—তার কথা কালীপ্রসন্ন বলে গেছেন। মোসাহেবদের মাইনে দিয়ে পুষতে হয়। তাদের নিয়ে গার্ডেন ফিসট করতে যে খরচা হয় তাতে 'চার-পাঁচটা ইউনিভার্সিটি ফাউণ্ড হয়।'[২৬] টিকিধারী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নদের চাঁদ গোস্বামীকে—যাচাই করতে গিয়ে রামহরিবাবুর সোনাগাছির আড্ডায় কি রকম হেনস্থা হতে হয়, তার আনুপূর্বিক বিবরণ কালীপ্রসন্নর লেখায় মিলবে।[২৭] মোসাহেবদের কাজ বাবুর যুক্তিকে প্রশ্ন করা নয়—স্বয়ং বাবুকেই 'তুন্দুলে পাঁউরুটি'র মতো ফোলানো।

এখনকার আড্ডায় অবশ্য বাবু-মোসাহেবদের এই ধরনের অসাম্য চোখে

পড়বে না। ফলত সমর্থনের প্রকৃতিটা অভিন্ন থাকলেও তার ধরনে পরিবর্তন এসেছে। এখনকার আড্ডা গোপাল হালদারের ভাষায়, 'মনের মতো জন কয়েক নিয়ে বসে।'[২৮] এই 'মনের মতো জন কয়েক' কারা ? তাঁদের মধ্যে একে অন্যেকে সমর্থন করার ব্যাপারটাই বা কিভাবে সম্পন্ন হয় ? প্রথমত, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এরা সমমর্যাদাসম্পন্ন বা প্রায়-সমমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ। মর্যাদা কথাটাকে বুদ্ধদেব বসু 'মনের স্তর' বোঝাতেই ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে "যদি এমন কেউ থাকেন যিনি এতোই বড়ো যে তাঁর মহিমা কখনো ভুলে থাকা যায় না, তাঁর পায়ের কাছে আমরা ভক্তের মতো বসবো, কিন্তু আমাদের আনন্দে তাঁর নিমন্ত্রণ নেই, কেননা তাঁর দৃষ্টিপাতেই আড্ডার ঝর্ণাধারা তুষার হয়ে জমে যাবে। আবার অন্যদের তুলনায় অনেকখানি নিচুতে যার মনের স্থান, তাকেও বাইরে না রাখলে কোনো পক্ষেই সুবিচার হবে না।"[২৯] সামাজিক-আর্থনীতিক স্তর যাদের আলাদা তাদের মনের স্তর কি কখনো এক হতে পারে এসব গভীর প্রশ্নে বুদ্ধদেব বসু যাবার আগ্রহ বোধ করেননি। ইদানীং আড্ডায় অবশ্যই ব্যাপক বাবু মোসাহেবি তারতম্য চোখে পড়বে না। 'মনের স্তর' কথাটা ব্যবহার করলে যে অন্য সব সমস্যা চোখের পলকে উধাও হয়ে যাবে—এমন নয়। তবে এর দুটো দিকের উল্লেখ না করলে আলোচনা 'অসম্পূর্ণ' থেকে যেতে পারে। খুব ইতিবাচক অর্থে গোপাল হালদারের ভাষা ধার করে বলা যায় " একটি মাত্র নিয়ম আছে—তাল না কাটা· কোনো গল্প, কোনো সমালোচনার কৈফিয়ত সেখানে নেই। কারণ সবাই সব বিষয়ে মূলত একমত ।"[৩০] তাল রাখতে পারলেই আড্ডা জমে ওঠে। আবার 'সবাই সব বিষয়ে মূলত একমত' না হলে তাল রাখা দায় হয়ে পড়ে। গান্ধী চরিত্র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে হীরেন মুখোপাধ্যায়ের এমন ঘোরতর 'মতান্তর হয়েছিল যে ঘটনাটার উল্লেখ করে হীরেন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'বলছি এই ঘটনার কথা, কারণ 'পরিচয়' গোষ্ঠীর মানসিকতা বলে যদি কিছু বর্ণনা করা যায় তো তা থেকে আমার অবস্থান ছিল অনেকটা দূরে।"[৩১] তাল রাখতে না পারার কারণে এই আসরে তিনি 'এবং ইন্দ্রজিৎ'। 'মনের মতো' মানুষেরা আসলে একই মতের মানুষ। মতের বিরোধিতা করা অসৌজন্য ভেবে অনেকে যদি 'মনের মানুষের' ভান করেন, তাহলে তাঁরা আসলে নিজেদেরই ঠকান। ভদ্রলোকের সৌজন্যবোধ তাঁকে বিপাকে ফেলে। নেতিবাচক অর্থে, 'বিরোধী যাদের মতামত, তারা এক আড্ডায় থাকতে পারে না।'[৩২] হীরেন মুখোপাধ্যায় যেমন পরিচয়-এর আড্ডায় থাকতে পারেন

না। সবাই যদি একই মতের অধিকারী হবে, তাহলে আড্ডা থেকে মৌলিক বিতর্কের সূত্রপাতই বা কি করে হবে? তবু 'ব্যক্তিগত ঝোঁক এবং রুচি' একই যুক্তির অবতারণার মধ্যেও একটু ভিন্নতার আস্বাদ দেয়। গোপাল হালদারের একটা কথা খুব প্রণিধানযোগ্য: " সবাই সব বিষয়ে মূলত একমত, তবু রং ফলাতে যার যা রুচি তা প্রকাশিত হয়।"[৩৩] ফলে যেটুকু বিতর্কের সূচনা হয় তা শুধু 'রং ফলানো'র জন্যে, রুচির ভিন্নতার কারণে। তার বেশি কিছু নয়। একটুখানি বিমূর্ত চিন্তার আশ্রয় নিয়ে একই কথা একটু ভিন্নভাবে বলা যেতে পারে। ভদ্রলোকের আড্ডায় যে ঐক্যমত্য (কনসেনসাস) বা মনের স্তরের কথা বারবার বলা হচ্ছে তাকে হেগেলের সমন্বয়ের (সিনথেসিসের) সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। পক্ষ এবং প্রতিপক্ষের সংঘর্ষে সমন্বয় সাধিত হয়—সাধারণভাবে হেগেল সম্বন্ধে এরকম একটা কথা চাউড় থাকলেও 'সংঘর্ষ' কথাটাকে তিনি মার্কসের থেকে অনেক লঘু অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর মতে, পক্ষের মধ্যেও যেমন প্রতিপক্ষের উপস্থিতিটা অনুমিত থাকে, তেমনি প্রতিপক্ষের মধ্যেও থাকে পক্ষের উপস্থিতির অনুমান। দুয়ের মধ্যে প্রকৃত কোনো বিরোধ নেই। সমন্বয়ের বীজ দুয়ের মধ্যেই সমান উপ্ত আছে। আমাদের উপলব্ধির আলোয় যখন তা ধরা পড়ে, তখন তাদের মধ্যে পুনরায় সমন্বয় সাধিত হয়। আমরা বুঝতে পারি, বিরোধিতা বা সংঘর্ষের অসারতা। আড্ডার বিরোধিতাটাও সেই রকমই অসার; বিতর্কের মধ্যেই একের প্রতি অন্যের অনুচ্চারিত অথচ নির্দ্বিধ সমর্থন আছে।

দ্বিতীয়ত, আমাদের আড্ডায় নৈর্ব্যক্তিক যুক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে আনন্দ দেয়া বা পাওয়ার মতো আড্ডাধারী খুব কমই আছে। যে প্রশ্নটা স্বভাবতই আমাদের সামনে ধরা দেয় তা হল মৌলিক বিতর্কই যদি সম্ভাবিত না হয়, তাহলে আর আড্ডার যাথার্থ্য কি? আসলে আড্ডার মাধ্যমে অনুরূপ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে এসে আমরা 'আরাম' বোধ করি—এর দ্বারা আমাদের আবেগিক (ইমোশনাল) চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হয়। 'অনুরূপ' ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে এসে আমরা 'অনুরূপ'ই থাকি, ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করি না। নিজেকে পরিবর্তন করে ভিন্ন ব্যক্তিতে রূপান্তরিত হতে হলে আবেগিক চাহিদা পূরণ হয় না—বরং আবেগিক সংকট দেখা দিতে পারে। আধুনিক মানুষের তা মোকাবিলা করার যথেষ্ট দুঃসাহস থাকা চাই। এই দুঃসাহসীদের বাঙালির আড্ডায় স্থান হয়নি।

এইরকম সমর্থনের মধ্যে দিয়ে আর যাই হোক—সামূহিক জীবনের ভিত-

গড়ে তোলা যায় না। মোসাহেবির ঢং-এ হ্যাঁ-হ্যাঁ করলে বিশিষ্টজনের যুক্তি-ক্ষমতার ওপরে বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়, যুক্তির প্রতি সমর্থন বোঝায় না। যুক্তির এই বিশ্বাসে পর্যবসিত হবার ইতিহাস কিন্তু নতুন কিছু নয়।[৩৪] তারপর আড্ডার তাল রাখতে গিয়ে নিজের ব্যক্তিগত মতকে বিসর্জন দিয়ে অন্যের সঙ্গে একমত হতে গেলে নিজেকে ঠকানো হয়; বিসর্জন দেয়ার প্রয়োজনীয়তাটা যুক্তির কষ্টিপাথরে যেমন পরখ করে দেখা হয় না, তেমনি ব্যক্তিগত স্তরে অনুভূতও হয় না। এসবই সামূহিক ক্ষেত্রের অপরিহার্য অঙ্গ। আড্ডার তাল রাখাটা আসলে কি? ইতিবাচক অর্থে এটা গোষ্ঠীর সম্পর্ককেই বুঝিয়ে থাকে।

এই সম্পর্কের দুটো দিক আছে এক, গোষ্ঠীবদ্ধ সকলের মতের প্রতি অবিচল আস্থা রাখা এবং দুই, নিজের মত যদি ভিন্ন হয় তাহলে তাকে যথাসম্ভব প্রকাশ না করা। মতের প্রতি আস্থা আসলে গোষ্ঠীর প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচায়ক। গোষ্ঠীর প্রতি দায়বদ্ধ বলেই আমি মতের প্রতি আস্থা-প্রদর্শন করি। মতের প্রতি দায়বদ্ধ বলে যে আমি গোষ্ঠীর প্রতি দায়বদ্ধ এবং যতদিন মতের প্রতি দায়বদ্ধ থাকব ততদিনই শুধু গোষ্ঠীর প্রতি দায়বদ্ধ থাকব—অন্যথায় গোষ্ঠী ভেঙে চলে যাব—ব্যাপারটা এমন নয়। গোষ্ঠীর প্রতি দায়বদ্ধতাটা প্রাথমিক; আর সেজন্যে আমি নিজেকেই গোষ্ঠীর ছাঁচে ঢেলে সংশোধন—এমনকি পরিবর্তন করে নিই। হীরেন মুখোপাধ্যায় সমর সেনদের মতো 'এবং ইন্দ্রজিতে'র সংখ্যা, হাতে গোনা যাবে। এই জন্যেই গোপাল হালদারের মতো 'সংগীতকালা লোককেও 'সর্বাপেক্ষা যে ভালবাসে ধ্রুপদ' তার সাথে জমিয়ে নিতে হয়।[৩৫] তাঁর ভাষায় আমাদের আড্ডা আমাদের নাতি-উগ্র ব্যক্তিত্বের ও নীতি-তীব্র খেয়ালের উপযুক্ত পরিবেশ চায়।[৩৬] গোষ্ঠীবদ্ধ হবার শৃঙ্খলা ব্যতীত আড্ডার তাল রক্ষা করা যায় না।

সামাজিক বিরোধিতা

বাঙালি ভদ্রলোকের আড্ডায় সামূহিক জীবনের গুরুত্ব একদমই স্বীকৃত হয়নি—এমন ভাবা বাতুলতা। এ ব্যাপারে গত শতাব্দীর ইয়ং বেঙ্গলদের আড্ডার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। এই আড্ডার দুটো বৈশিষ্ট্য কিছুতেই আমাদের নজর এড়িয়ে যায় না এক, গোষ্ঠী জাতি কৌমের বন্ধনে আবদ্ধ না থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং যুক্তি অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে আলাপ—

আলোচনায স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ কবে তাঁবা বাঙালিব আড্ডায এক উল্লেখযোগ্য পবিবর্তন নিযে আসেন। এব্যাপাবটা এত বেশি আলোচিত যে এ নিযে আব কিছু বলাব অবকাশ নেই। দুই, অন্যেব যুক্তিক্ষমতাব প্রতি অবিচল আস্থা নয—অন্যেব যুক্তিকে নিজেব যুক্তিব আলোয ফেলে যাচাই কবাই ছিল তাঁদেব মূল কাজ। এই পবীক্ষায উতবোতে পাবলেই আস্থা-প্রদর্শনেব প্রশ্ন আসে। কিন্তু এই ধবনেব আড্ডাও এক গভীব সামাজিক সমস্যাব সৃষ্টি কবেছিল। সমসাময়িক সমাজেব তুলনায তাঁবা সবাই আগাম জন্মেছিলেন। তাই, সামূহিক জীবন গড়ে তুলতে গিযে তাঁবা সমাজেব তবফ থেকে প্রবল বিবোধিতাব সম্মুখীন হযেছিলেন। হাল আমলেব যুক্তিবাদী সংগঠনগুলোব ভেতবকাব আড্ডাও এত তীব্র না হলেও—একধবনেব সামাজিক বিবোধিতাব সম্মুখীন হযেছে। তুমুল বিবোধিতাব সামনে পড়ে এই আড্ডাব দুটোর মধ্যে যেকোনো একটা পবিণতি হয হয তাবা নিজেব ভেতবে আবো গুটিয়ে যায। নযতো তীব্র অসহিষ্ণুতায আবো বেশি কবে আতিশয্যেব শিকাব হয। ইবং বেঙ্গলদেব বাড়াবাড়ি শিবনাথ শাস্ত্রীব মতো নবমপন্থী পণ্ডিতপ্রববেব পছন্দ ছিল না। তিনি ব'লছেন ; "প্রাচীন পক্ষাবলম্বিগণ একদিকে অতিবিক্ত মাত্রাতে যাওযাতে এই সন্ধিক্ষণে নবীন পক্ষপাতিগণও অপবদিকে অতিবিক্ত মাত্রাতে গিযাছিলেন। যাহা কিছু প্রাচীন সকলি মন্দ এবং যাহা কিছু নবীন সকলি ভাল, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইযাছিলেন।"[৩৭] তাব কি বিটকেল ফল দাঁড়িযেছিল—তা অসংখ্য উদাহবণ সহযোগে সবস ভাষায তিনি বিবৃত কবেছেন। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁদেব পাবিবাবিক জীবনে নানা দুর্ভোগেব সম্মুখীন হতে হয—এমনকি সমাজচ্যুত হতে হয। তাদেব আতিশয্য সমাজকে আবো বেশি করে রক্ষণশীলতার দিকে ঠেলে দেয। যেমন, ইযং বেঙ্গলদেব ঠেকাতে সমাজে একেব পব এক বক্ষণশীল সংগঠন তৈবি হতে থাকে।

এইবকম সামাজিক বিবোধিতাব সামনে পড়ে যুক্তিবাদী, সামূহিক জীবনেব উদ্গাতাবা অনেক সমযে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হযে যান। বৃহত্তব সমাজেব থেকে একেবাবে সংস্রবহীন এবং বিচ্যুত হযে তাঁবা তাঁদেব পাল্টা সমাজ তৈবি কবেছেন এবং নিজেদেব নির্বাচিত বৃত্তেব ভেতবে আবদ্ধ বেখেছেন। ফলত তাঁদেব প্রতিবাদ বৃহত্তব সামাজিক আন্দোলনেব জন্ম দিতে পাবেনি। যত বেশি কবে তাঁবা নিজেদেব মধ্যে সিঁটিযে গেছেন, তত বেশি করেই তাঁরা সামূহিক জীবনেব প্রতিশ্রুতি থেকে সবে এসেছেন। সামাজিক জীবনেব 'অন্তবঙ্গ আশ্রয়'

যৌবনে উপেক্ষা করা গেলেও বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে এসে আর উপেক্ষা করা সম্ভব হয়নি। তাঁরা তাঁদের নিয়ে এক সমাজ তৈরি করেছেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ইয়ং বেঙ্গলদের এত বড় কর্ণধারকেও পরবর্তী জীবনে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হতে হয়। শুধু তাই নয়, অন্যান্যদের দীক্ষিত করার সংকল্পে তিনি আচার্যের পদে উন্নীত হন এবং অনেককে দীক্ষিত করতে 'সমর্থ' হন। নিজের যুক্তির বলে বলীয়ান হয়ে যে তীব্র অনাস্থা তাঁরা একদা হিন্দু-ধর্মের প্রতি প্রদর্শন করেছিলেন তা বিশুদ্ধ যুক্তি দিয়ে বাঁধা সামূহিক জীবনের ক্ষেত্র প্রস্তুত না করে শেষ পর্যন্ত আর এক ধর্মের প্রতি অনুরক্তিতে এসে স্তিমিত হল। সেখানে তাঁরা খ্রিস্টান—তাঁদের এই গোষ্ঠীগত আত্মপরিচয়টাই যুক্তিশীল ব্যক্তিত্বের যাবতীয় ঔজ্জ্বল্যকে শুষে ম্লান করে দিল। আজকের দিনে যুক্তিবাদী আন্দোলন ও আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ এরকমই আর একটা সমাজ—যেখানে যুক্তিবাদী গোষ্ঠীর প্রতি অচলা আস্থা ব্যক্তিগত যুক্তির গরিমাকে ম্লান করে দেয়। খ্রিস্টধর্মের জায়গায় এসেছে যুক্তিবাদ নামের এক আধুনিক ধর্ম—যার গোঁড়ামি এবং সংস্কার অন্য কোন ধর্মের বা গোষ্ঠীর গোঁড়ামি এবং সংস্কারের থেকে কোনো অংশে কম নয়।[৩৮]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সামূহিক জীবনের গোড়াপত্তন করতে এসে এর প্রবক্তারা বৃহত্তর সমাজ থেকে স্বতন্ত্র—অথচ তারই সদৃশ আর একটা ক্ষুদে সংখ্যালঘু সমাজ তৈরি করেছেন। এই জীবনেও গোষ্ঠীগত আত্মপরিচয় মুখ্য হয়ে দাঁড়ায় সামূহিক ক্ষেত্রকে সামাজিক জীবন এসে আচ্ছন্ন করে। বাঙালি ভদ্রলোকের আড্ডায় যে গোষ্ঠীভবনের কথা বলছি, বিরোধিতা হল তার দ্বিতীয় রূপ।

হস্তক্ষেপের অধিকার

পঞ্চাশ বছরের আগে এক অন্তরঙ্গ কথোপকথনে বিনয় সরকার বাঙালি আড্ডায় দুটি পরস্পরবিরোধী বৃত্তের কথা বলেছিলেন একটা হল, বুড়ো, গণ্যমান্য, নামজাদা, কুলীনদের আড্ডা এবং আরেকটা হল, গরিব উদীয়মান, অজ্ঞাতকুলশীল, ছোকরা-জোআনদের চোখা-নগণ্য-নামহীন আড্ডা প্রথমতঃ, গরীবেরা নিজেদের জন্যে নিজেদের তাঁবে ছোটখাটো মজলিশ, আড্ডা, বৈঠক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। দ্বিতীয়তঃ, ছোকরারাও নিজেদের জন্যে নিজেদের তাঁবে এই ধরণের মজলিশ, আড্ডা, বৈঠক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে

তোলে। দেশের ভেতরকার গণ্যমান্য, নামজাদা বা কুলীন মজলিশ আড্ডা-বৈঠকে গরীবেরও ঠাঁই নাই, ছোকরারও ঠাঁই নাই। গরীব উদীয়মান ছোকরা জোআন সকলেই আপন আপন ঝুঁকিতে চরে বেড়াতে বাধ্য।"[৩৭] পরস্পর-বিরোধী হলে কি হয়, প্রথম বৃত্তের অনেকেরই হাতেখড়ি কিন্তু এই দ্বিতীয় বৃত্তে। তবে, বৃত্তের সীমানা ছাড়িয়ে একবার প্রথম বৃত্তে আশ্রয় পেয়ে গেলে দ্বিতীয় বৃত্তের সঙ্গে সব সংস্রব একেবারে চিরদিনের মতো ছিন্ন হয়ে যায়। দুটো বৃত্তের মাঝে অসাম্য থাকলেও এর যে কোনোটার ভেতরেও যে আবার অসাম্য থাকতে পারে—তার উল্লেখ বিনয় সরকারের এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনে কোথাও নেই। এর অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি একেবারেই অবহিত ছিলেন না—এমন মনে হয় না। আমার এই শেষ পর্বের আলোচনা বৃত্তের অন্তর্নিহিত অসাম্য নিয়ে।

বোঝার সুবিধের জন্যে উদারবাদী তত্ত্বে সাম্য-সম্বন্ধে যে দুধরনের ধারণা প্রচলিত আছে তার উল্লেখ করা যেতে পারে আড্ডার আসরে সবারই নিজের যুক্তি অবতারণা করা এবং অপরের যুক্তিকে পরখ করে গ্রহণ-বর্জন এবং সংশোধনের সমান সুযোগ এবং স্বাধীনতা থাকা দরকার। এর একটা অন্যতম প্রাকশর্ত অবশ্যই, আড্ডার আলোচনায় অংশগ্রহণের সমান সুযোগ। ব্যাপারটাকে একেবারে গাণিতিক সমাধানের পর্যায়ে নামিয়ে এনে বলা যায়, দুজন সদস্যের একঘণ্টার আড্ডায় প্রত্যেকের কাঁটায়-কাঁটায় দশমিনিট করে সময় বরাদ্দ থাকবে; কেউ তার বেশি বা কম সময় পাবে না। সময়ের সমান বণ্টনের মধ্য দিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণের সমান সুযোগ করে দেয়া সম্ভব হবে। তবে এই ধরনের সাম্যের ধারণাকে গ্রহণ করতে গেলে একটা সমস্যায় পড়তে হয়। মূর্খ ততক্ষণই শোভন যতক্ষণ সে মুখ খোলে না। পণ্ডিতপ্রবরদের আড্ডায় আমার মতো অর্বাচীনের মুখ না খোলাটাই সমীচিন; বরং আমার দশ মিনিট অন্যেকে দিয়ে দিলে আড্ডাটা সমৃদ্ধ হতে পারে। তবে আমি যে মূর্খ—সে সম্বন্ধে আমি যদি ওয়াকিবহাল হই, তাহলে অন্যেকে সময় দিতে আমার আপত্তি থাকার কথা নয়। নিজের যুক্তির অবতারণা এবং অন্যের যুক্তি যাচাই করার সমান সুবিধে দিলেই যে সবাই তা করতে সমান সমর্থ হবে—এমন নয়। গাণিতিক সমাধান এই সামর্থ্যের অসাম্যকে হিসেবের মধ্যে আনে না। এই প্রয়োজন থেকেই দ্বিতীয় ধারণা এসেছে। কথা বলার সমান সুযোগ থাকা এবং আড্ডায় সমান অবদান রেখে যাওয়া—এক বিষয় নয়। সুতরাং সময়ের সমান

বণ্টন নাও থাকতে পারে, কথা বলার একেবারে ঘড়ি ধরে সমান সুযোগ না থাকতে পারে, কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল, এই না-থাকার পেছনে এমন কিছু যৌথ সিদ্ধান্ত থাকা দরকার—যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে সবার সমান অধিকার স্বীকৃত রয়েছে। আমি আমার সীমাবদ্ধতা জানি বলেই নিজের সময়টা অন্যেকে দিয়ে দিতে আপত্তি করি না; অসম সময়বণ্টনে আমার পূর্ণ সম্মতি রয়েছে। আমার সময়ের ওপরে অপরের হস্তক্ষেপ আমাদের আড্ডার মানকেই উন্নীত করে।

কিন্তু বাঙালি ভদ্রলোকের আড্ডায় হস্তক্ষেপ—এমন কোনো যৌথ সিদ্ধান্তের ফসল হতে পারেনি, যার পেছনে সবার পূর্বপ্রদত্ত সম্মতি আছে। বরঞ্চ হস্তক্ষেপের পেছনে আড্ডায় অংশগ্রহণকারীদের স্বীকৃতির বদলে উষ্মা রয়েছে—যে উষ্মার প্রকাশ অনেক চেষ্টাতেও ঢেকে রাখা যায় না। তা অবধারিতভাবে ভদ্রলোকসুলভ সৌজন্যের দরজা ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। ধূর্জটিপ্রসাদের গান্ধী-বিশ্লেষণকে খারিজ করতে গিয়ে হীরেন মুখার্জীকে নিজের সঙ্গে রীতিমতো লড়াই করতে হয়েছেঃ "· অনভিপ্রেত অসৌজন্যই বোধ হয় দেখালাম হঠাৎ প্রশ্ন করে?" বাঙালি আড্ডায় এমনতরো হস্তক্ষেপের অন্তত দুটো কারণ লক্ষ করা যায় প্রথমত, হস্তক্ষেপ করাটা অনেকের ব্যক্তিগত চরিত্রলক্ষণ বলে প্রতীয়মান হয়। সবুজ পত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর সম্ভবত এই স্বভাব ছিল। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষের একদিনকার বর্ণনা থেকে অন্তত তাই মনে হয় "(পরিচয়-এর) বৈঠকে পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা হয় না বড় একটা, কিন্তু প্রমথবাবুর উপস্থিতির জন্যেই বোধহয় আড্ডা জমছিল না। তিনি হারীৎকৃষ্ণকে কাছে পেয়ে বলেই চলেছিলেন। 'সবুজ পত্রে'র যুগ যে বিগত সে কথা হয়ত ভুলেই গিয়েছিলেন।"[৪০] আবার ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসুর ব্যক্তিত্বটা (গোপাল হালদারের ভাষায়) 'প্রচণ্ড না, কিন্তু প্রশস্ত' বলেই পার্শীবাগানের "উৎকেন্দ্রিক ক্লাবের আড্ডা দিব্যি জমে উঠতো।[৪১] দ্বিতীয়ত, আমাদের আড্ডায় তথাকথিত বিশিষ্টজনের হস্তক্ষেপের অধিকার তাঁর যুক্তির সারবত্তাকে সূচিত করে না। সামাজিক মর্যাদায় তিনি আগেভাগেই বিশিষ্ট হয়ে বসে আছেন; কি ধরনের যুক্তি তিনি অবতারণা করলেন বা আদৌ করলেন কিনা—এ প্রশ্ন অবান্তর। সমাজে বিশিষ্ট বলে তিনি উন্নত যুক্তির অবতারণা করেন; উন্নত যুক্তির অবতারণা করেন বলে বিশিষ্ট হন না। সামাজিক মর্যাদায় উঁচুতে আছেন এমন মানুষ আমাদের দেশে যে সর্বদাই উন্নত যুক্তির অধিকারী হবেন—এমন

আশা করা অন্যায়। নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্র রায় বসুমতীর আড্ডায় যোগ দিলেও একটা পূর্বনির্ধারিত সামাজিক ব্যবধানকে কাটিয়ে ওঠা কখনোই সম্ভব হয়নি. "পরিচিত প্রায় সকলকে 'তুমি' এমনকি 'তুই' বলে সম্বোধন করতে তাঁর দেরি লাগতো না, তবে কিনা তাঁকে ঐভাবে প্রতি সম্বোধন বরদাস্ত ছিল না।"[৪২] বয়োজ্যেষ্ঠ বলে অনেকে আবার হস্তক্ষেপের অধিকার ভোগ করেন—সেটাও অবশ্য তাঁর যুক্তির সারবত্তার প্রতি আস্থার পরিচায়ক নয়। সামাজিক মর্যাদার ব্যাপারটা এত কঠোর ছিল যে, অনেক সময় অনেক বিশিষ্ট আড্ডায় অল্পবয়সী, অর্বাচীনদের প্রবেশাধিকার ছিল না। পরিচয়-এর আড্ডায় রবি মিত্রের প্রবেশাধিকারের ক্ষেত্রে সুধীন দত্তের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ না থাকলেও প্রচ্ছন্ন উষ্মা ছিল। শ্যামলকৃষ্ণের জবানিতে কথাটা শোনা যাক "আজকের 'পরিচয়'-এর আসরে হারীতদা তাঁর একজন আত্মীয় রবি মিত্রকে নিয়ে আসেন। একেবারে ছেলেমানুষ। কলেজের ছেলে হবে। সুধীন্দ্র খুশী হন নি বুঝতেই পারলাম।"[৪৩] আধুনিককালের বাঙালি ভদ্রলোকের আড্ডায় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন সেই বিরল প্রজাতির নব্য বিপ্র—যাঁদের অন্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের পূর্বস্বীকৃত অধিকার রয়েছে। ঠিক সেইরকমই সম্ভবত মস্কোফেরত এবং তাই সামাজিক মর্যাদায় প্রায় অচ্ছুৎ বলে সমর সেন এডওয়ার্ড শিলসের সঙ্গে আলোচনার জন্যে সুধীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণ পাননি।[৪৪] প্রতিতুলনায় নবীন লেখকদের সুযোগ দেয়ার ব্যাপারে বুদ্ধদেব বসু অনেক দরাজ ছিলেন।[৪৫] এককথায় বলতে গেলে, প্রকাণ্ড ব্যক্তিত্ব এবং পূর্বস্থিরীকৃত সামাজিক মর্যাদা—এই দুটোর কোনটাই সামূহিক ক্ষেত্রে যে সাম্য লক্ষ করা যায়, তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। ফলত আড্ডার এই তৃতীয় রূপেও সামূহিক জীবনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারেনি। মোটের ওপর, বাঙালি ভদ্রলোকের আড্ডায় হস্তক্ষেপের ধরনটা গোষ্ঠীর সম্পর্কেই মনে করিয়ে দেয়।

বাঙালি ভদ্রলোকের আড্ডার গোষ্ঠীভবন সামূহিক জীবনের ভিতকে তো নড়বড়ে করে দিয়েইছে, বাঙালি আত্মপরিচয়কেও টিকিয়ে রাখতে পারেনি। এর পরেও আড্ডা নিয়ে গর্ব করে আমরা আমাদের অবক্ষয়কেই বোধ হয় ভুলে থাকতে চাই। আড্ডার গর্ব ব্যাঙালির এই এক নিদারুণ আত্মবিস্মৃতি।

তথ্যসূত্র

['পাবলিক ডিসকাশনস ইন মডার্ন বেঙ্গলি সোসাইটি'—এই শিরোনামে একটি

গবেষণার কাজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থানুকূল্যে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। সেজন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। গত ২৬ নভেম্বর, ১৯৯৬ তারিখে অ্যানথ্রপলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া (পূর্বাঞ্চল কেন্দ্র)-এর সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে 'কমিউনিটি গোজ পাবলিক : পাবলিক ডিসকাশনস ইন মডার্ন বেঙ্গলি সোসাইটি' (প্রকাশিতব্য)-এই শিরোনামে একটি গবেষণাপত্র পাঠ করি। বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাবার প্রয়োজন মনে করছি, ড্যুরহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্বের অধ্যাপক অ্যানড্রু বাসেলকে তাঁর মূল্যবান বক্তব্য আমায় সমৃদ্ধ করেছে। এরপরে স্কটিশ চার্চ কলেজে 'সমাজ ও চিন্তা'র তরফে গত ২রা মার্চ 'হাবেরমাস ও বাঙালির আড্ডা' বিষয়ে বলবার সুযোগ পাই। পরবর্তীকালে (২৬শে মে, ১৯৯৭) ঘরোয়া এক আলোচনাচক্রে এই একই বিষয়ে বক্তব্য পেশ করি। এই তিনটি আলোচনাচক্রে উপস্থিত শ্রোতাদের মন্তব্য আমায় সমৃদ্ধ করেছে। অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক কৃত্যপ্রিয় (অভ্র) ঘোষের অনুপ্রেরণার কথা না বললে অন্যায় হবে। অন্যান্য অনেক বিষয়ে মূল্যবান চিন্তার খোরাক অধ্যাপক অমিতাভ চন্দ্র এবং শ্রীসন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পেয়েছি। তবে এই প্রবন্ধের যা কিছু বক্তব্য—তার দায়দায়িত্ব সবটাই আমার। স কু দা]

১। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মনে এলো, দ্রষ্টব্য, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, (কলিকাতা : দে'জ, ১৯৮৭), পৃঃ ৫।

২। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তরী হতে তীর (কলিকাতা : মনীষা, ১৯৭৪), পৃঃ ১।

৩। হিরণকুমার সান্যাল, পরিচয়-এর কুড়ি বছর ও অন্যান্য স্মৃতিচিত্র (কলিকাতা : প্যাপিরাস, ১৯৭৮), পৃঃ ১২।

৪। সাগরময় ঘোষ, সম্পাদকের বৈঠকে (কলিকাতা : আনন্দ ; ১৩৬৯) পৃঃ ১।

৫। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, পরিচয়-এর আড্ডা (কলকাতা : কে পি বাগচী, ১৯৯০)। হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'মুখবন্ধ', পৃঃ [৭]।

৬। গোপাল হালদার, 'আড্ডা' ; (কলিকাতা : বেঙ্গল, ১৩৬৩ বঃ), কৈফিয়ৎ [২]।

৭। বুদ্ধদেব বসু, 'আড্ডা', দ্রষ্টব্য, বুদ্ধদেব বসু, প্রবন্ধ সংকলন (কলিকাতা : দে'জ, ১৯৮২), পৃঃ ৩৩৪।

৮। হালদার, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১০।

৯। তদেব, পৃঃ ৩।

১০। তদেব, পৃঃ ১৩।

১১। গৌতম ভদ্র, 'কথকতার নানা কথা'। যোগসূত্র, ৩ (২), অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৯৩, পৃঃ ১৬৭-২৭৮।

১২। কালীপ্রসন্ন সিংহ, হুতোম প্যাঁচার নকশা (কলকাতা ঃ নতুন সাহিত্য ভবন, ১৩৬২ বঃ), পৃঃ ৫৪

১৩। সমর সেন, বাবু বৃত্তান্ত (কলকাতা ঃ দে'জ, ১৯৭৮), পৃঃ ১৪।

১৪। সান্যাল পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৪৫।

১৫। ঘোষ, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ৮।

১৬। ধূর্জটিপ্রসাদ, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ২২।

১৭। হীরেন্দ্রনাথ, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৯৭।

১৮। সেন, উড়ো খৈ, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১০১।

১৯। বিনয় ঘোষ, বাংলার নবজাগৃতি (কলিকাতাঃ ওরিয়েণ্ট লংম্যান, ১৩৫৫ বঃ), পৃঃ ২।

২০। হালদার, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৪।

২১। ঘোষ, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ৩।

২২। সান্যাল, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৫৩।

২৩। বসু, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৩৮।

২৪। সেন, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ২২।

২৫। গত ২৯-৭-৯৭ তারিখে স্কটিশ চার্চ কলেজে 'সমাজ ও চিন্তা'র এক আসরে অধ্যাপক অজিত চৌধুরী 'দেরিদার উত্তরাধিকার' নিয়ে বলেন। আমি যে বিয়োগান্তিকতার কথা বলছি তা সম্ভবত তাঁর ভাষায় যে কোনো 'থার্ড-স্ট্রিম রাইটিং'-এর বিয়োগান্তিকতা।

২৬। সিংহ, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ৪১

২৭। তদেব, পৃঃ ৬৩-৫।

২৮। হালদার, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৬।

২৯। বসু, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ৩৩৬।

৩০। হালদার, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৪-৫।

৩১। হীরেন্দ্রনাথ, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ৩৮৪।

৩২। হালদার, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৬।

৩৩। তদেব, পৃঃ ১৫।

৩৪। সমীরকুমার দাস, 'মৌলবাদ বনাম মৌলবাদ', পরিচয়, শারদ সংকলন ১-০০, আগস্ট সেপ্টেম্বর, ১৯৯৩।

৩৫। হালদার, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৪।

৩৬। তদেব, পৃঃ ১৭।

৩৭। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (কলিকাতাঃ বিশ্ববাণী, ১৩৯০ বঃ), পৃঃ ৭৪-৫।

৩৮। দাস, পূর্বোদ্ধৃত পৃঃ ৯০-৫।

৩৯। বিনয় সরকারের বৈঠকে (বিংশ শতাব্দীর বঙ্গসংস্কৃতি), দ্বিতীয় ভাগ, শ্রী হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে কথোপকথন (কলিকাতাঃ চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী এণ্ড কোং, ১৯৪৫), পৃঃ ১৩৪।

৪০। ঘোষ, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ৩৫।

৪১। হালদার, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১৭।

৪২। হীরেন্দ্রনাথ, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ১০৪।

৪৩। ঘোষ, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ৭৫।

৪৪। সেন, পূর্বোদ্ধৃত, পৃঃ ২২।

৪৫। তদেব, পৃঃ ১১৩।

শতবর্ষে নীরদ চৌধুরী

হিতেন ঘোষ

একশো বছর পূর্ণ করলেন নীরদ চৌধুরী। শতবর্ষে তৃপ্ত, ডক্টর নীরদ সি চৌধুরী, দেশিকো সি বি ই তুম আজ আর আননোন ইণ্ডিয়ান নন। এই মুহূর্তে হয়তো তিনি সবচেয়ে বিখ্যাত ভারতীয়, বাঙালী। আজ পৃথিবীর সব প্রধান দেশের Who's Who গ্রন্থে তিনি উল্লিখিত। তাঁর নাম সকলেই জানে, তাঁর কীর্তির কথাও। তাঁর লেখার সঙ্গে পরিচিত পাঠকের সংখ্যাও আজ যে কোন সিরিয়াস লেখকের পক্ষে সত্যিই ঈর্ষণীয়। সারা বিশ্বে, এমন কি স্বদেশেও, আজ তিনি সম্মানিত, পুরস্কৃত।

কিন্তু সত্যিই কি তিনি তৃপ্ত, শান্ত সমাহিত? প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে, যে অজ্ঞাত ভারতীয় আত্মজীবনী লিখে বিশ্ব জোড়া খ্যাতির জয়যাত্রা সুরু করেছিলেন তাঁর ঐশী অতৃপ্তির কি সত্যিই অবসান ঘটেছে? যে নৈঃসঙ্গ্য ও বিচ্ছিন্নতা তাঁর আত্মজীবনী লেখার মূল প্রেরণা সেটা কি আজও নীরদবাবুকে আমাদের কাছে ভিন্ন অর্থে unkown করে রাখেনি? প্রকৃত মানুষটি কি আজও, খ্যাতি-অখ্যাতির নেপথ্যে আত্মগোপন করে নেই?

নীরদ চৌধুরীর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ দি অটোবায়োগ্রাফি অব অ্যান আননোন ইণ্ডিয়ান' তাঁর জীবনের প্রথম একুশ বছর বয়সের অভিজ্ঞতাও উপলব্ধির বিবরণ। যে অনন্য ব্যক্তিত্ব পরবর্তী অর্ধ শতাব্দী ধরে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য বৈদগ্ধ্য, মননশীলতা ও রচনাশৈলী দিয়ে আমাদের কখনো মুগ্ধ, কখনো উত্তেজিত করে এসেছেন, সেই গোপনচারী মানুষটির যন্ত্রণার স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে তাঁর সেই প্রথম গ্রন্থের পৃষ্ঠাতেই।

সন্দেহ নেই, আত্মজীবনীর মূল সুর পরিবেশ থেকে বিছিন্নতাবোধের নিরন্তর বিরোধ এবং একাকিত্বের। কিন্তু এই নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণায় তিনি নিজের কাছ থেকে পালাতে চাননি। চাননি কোন ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক মতাদর্শের আশ্রয়। নির্মম, নির্মোহ সত্যদৃষ্টি নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন নিজের ব্যক্তিগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক স্ববিরোধ। আত্মবিশ্লেষণের এই প্রক্রিয়ায় উদঘাটিত হয়েছে উনিশ শতকের বাঙালী শিক্ষিত, ভদ্র সমাজের বিচ্ছিন্নতা ও স্ববিরোধ।

কিন্তু, তাঁর মতে, অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালী যেখানে এই বিরোধ ও বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখি দাঁড়ানোর পরিবর্তে Sartre কথিত Mauvais foi বা bad faith-এর প্রভাবে কোন-না-কোন অলীক সান্ত্বনাকে আশ্রয় করেছেন, নীরদবাবু সেখানে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

উনিশশতকী নবজাগরণের যে Torch Race-এর কথা তিনি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন তাঁর আত্মজীবনীর পুরো একটা অধ্যায় জুড়ে, তারও প্রেরণা ও উৎস বাঙালীর ইংরেজি শিক্ষা এবং এই শিক্ষার ফলে ঐতিহ্যগত শিক্ষা সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংঘাত এবং বিচ্ছিন্নতা-বোধ নীরদ বাবুর মতে বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথ সকলেই এই বিচ্ছিন্নতার উত্তরণ খুঁজছেন প্রাচ্য প্রতীচ্যের এক কল্পিত সমন্বয়ের আদর্শে। সেই আদর্শ খাঁটি ও আন্তরিক হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়নযোগ্য নয়। ইতিহাসে এই সমন্বয়ের কোন দৃষ্টান্ত নেই।

ফলে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই উনিশ শতকী বাঙালী তথা ভারতীয় নবজাগরণের আদর্শ ভেঙে পড়ছিল। এবং তার জায়গায় আস্তে আস্তে দেখা দিচ্ছিল একটা crude westernization-এর প্রবণতা, যা শেষ পর্যন্ত সমগ্র দেশ ও জাতিকে গ্রাস করবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেছিলেন The Statesman কাগজে ১৯২৬ সালে তাঁর প্রথম প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধে। আজ এই crude westernization-এর পরিণতির সাক্ষী আমরা সকলেই। আমাদের পোষাক পরিচ্ছদ, আসবাব পত্র রান্নাঘর, জীবনযাত্রার সর্বাঙ্গে এর ছাপ। নীরদ বাবুর ভবিষ্যদ্বাণী আজ সত্য প্রমাণিত।

মুখে স্বীকার না করলেও বিশ তিরিশ দশকের সব বাঙালী লেখক বুদ্ধিজীবীই জাতীয় এই অবক্ষয়ের নিদর্শন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন। জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম কিংবা কমিউনিজমের স্বপ্নে বিভোর হয়ে তাঁরা প্রকৃত অবস্থা থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন। আর কোন কোন অতি আধুনিক কবি ও লেখক পশ্চিমী অবক্ষয়ের ধার-করা ভাবনা চিন্তা, অনুভূতি বাংলা সাহিত্যে আমদানি করছিলেন রবীন্দ্র—বিরোধিতার নামে। এঁরা কেউই বুঝতে পারছিলেন না, উনিশ শতকে বাঙালীর জীবনে ও সাহিত্য-সংস্কৃতিতে যেটা ঘটেছিল তা হল প্রাচীন ঐতিহ্যও মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদের assimilation বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই দেখা দিল, একদিকে crude imita-

tion, জীবনে সাহিত্যে সর্বত্র, অন্যদিকে স্বদেশীয় অতীত ও ঐতিহ্য নিয়ে সেণ্টিমেণ্টালিজম।

আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডের নামকরণ (Thy Hand, Great Anarch) থেকেই বোঝা যায়, এই গ্রন্থের মূল থিম Progressive rebarbarization of the country—যা বাঙালী জীবনের অবক্ষয়েরই পরিণাম। অর্থাৎ বাঙালী গোটা ভারতবর্ষকে civilize করার যে সুযোগ উনিশ শতকে পেয়েছিল, বিংশ শতাব্দীতে এসে তা নিজের দোষেই হারিয়েছে। বাঙালী তাই আত্মঘাতী। নীরদবাবু বলেছেন জীবনকে বিচার-বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা তাঁর তীব্রতর হয়েছে পরিবেশের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা বোধের ফলেই : I understand the life around me better not from love which everybody acknowledges to be a great teacher but from estrangement to which nobody has attributed the power of reinforcing insight.

কিশোরগঞ্জ ছেড়ে কলকাতায় এসে বসবাস করার সময় থেকেই এই বিচ্ছিন্নতার সুরু। ইংরেজি শিক্ষাত ইতিহাসচর্চা, হিন্দু সভ্যতাও সংস্কৃতির সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়, বাংলার নবজাগরণের অবিস্মরণীয় প্রেরণা এবং তার দ্রুত অবক্ষয়ের বেদনা নীরদ চৌধুরীকে যে বিচ্ছিন্নতাবোধে পীড়িত করেছে, সেই বোধই তাঁর সমস্ত সৃষ্টি প্রেরণার মূল। পরিবেশের সঙ্গে এই বিরোধ, এই বিচ্ছিন্নতাই তাঁকে লেখক করেছে।

তাঁর এই মানসিক অবস্থার কথাটা বোঝাতে তিনি একটি আশ্চর্য উপমা বা ইমেজ ব্যবহার করেছেন : I am ever aware of [my environment] as an intolerable pressure...I have for it the same kind of feelings as, endowing the aeroplane with consciousness, I imagine it to have for what is popularly believed to be its home element but through which it really has to drag its heavier—than-air body inth infinite strain. I know what it means to be unable to forget that strain—to be pepetually remembering that as soon as that colossal horsepower and those thousands of revolutions per minute have ceased to shake and tear one's being one would plunge headlong and crash...I should not be surprised to hear from the aeroplane

a confession that in spite of being the proudest of modern beauties it feels thoroughly unhappy comparing itself with its out of date rival on the sea...There is a world of difference between being buoyed up by one's environment so as to be able to glide naturally on it, and having to beat it until it willingly generates the force to keep one afloat.

নীরদবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিবেশের সম্পর্ক বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে এরোপ্লেনের সম্পর্কের মতন। প্রচণ্ড হর্সপাওয়ার এবং প্রতি মিনিটে কয়েক সহস্র ঘূর্ণনের বা আবর্তনের প্রক্রিয়ায় বাতাসের চেয়ে ভারী প্লেনের দেহটাকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখতে হয়। জাহাজের সঙ্গে জলের সম্পর্ক অনেক স্বাভাবিক, তার গতি স্বচ্ছন্দ সাবলীল। প্লেনের সৌন্দর্য তার গতি যতই নয়নাভিরাম হোক, প্লেনের যদি অনুভূতি থাকত তবে সে নিজেকে জাহাজের তুলনায় অসুখী ভাবত। জলই জাহাজের শরীরটাকে ভাসিয়ে রাখে, জলের চেয়ে জাহাজ ভারী নয়। এরোপ্লেনকে বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভেসে থাকতে হয়, এগোতে হয়।

এই ইমেজের মধ্যে নীরদ চৌধুরীর সমগ্র জীবনের প্রয়াস ও সিদ্ধির ইতিকথা বিধৃত রয়েছে। যে প্রচণ্ড Strain প্লেনকে বাতাসে ভাসিয়ে রাখে, চালায়, নীরদবাবুর জীবনে মনে সেই Strain সর্বদাই প্রচ্ছন্ন, যদিও তাঁর রচনার প্রাঞ্জলতায়, সাবলীলতায় তার কোন ছাপ পড়েনি। তার সৌন্দর্য আধুনিক জেট বিমানের অবয়ব ও গতির সঙ্গেই তুলনীয়। পরিবেশের দ্বারা তিনি উৎসাহিত, উদ্দীপিত (buoyed up) হননি।

নীরদ চৌধুরীর প্রিয় ফরাসী কবি বোদলেয়রের L' Albatros তাঁর অন্যতম প্রিয় কবিতা। এখানে বোদলেয়র আলবাট্রস পাখিকে কবির প্রতীক রূপে ব্যবহার করেছেন। প্রথমবার লণ্ডন থেকে প্যারিসে প্লেনে যাবার সময়, বোদলেয়রের আলবাট্রসের মতই তিনি অনুভব করেছিলেন—the power of height to liberate the vision and spirit of man বোদলেয়র এই কবিতায় তুলনা করেছেন, নীরদবাবুর ভাষায়, the bird's grand flights with its waddling on the deck of a ship.

উদ্ধৃতিটি নীরদ চৌধুরীর The Continent of Circe থেকে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন Has anyone pondered over the

difference which even a height of two hundred feet makes to our coneeption of the earth we live on ? . All the squalor and confution vanish and we see things spread out below in order, goodness beauty So when I visit the hills, I like to go up to an eminence and sit on it. Even in the big cities in which I have spent most of my life my favourite perch is a high roof বোঝা যায় শেলির Skylark-এর মতই তিনিও scorner of the ground

গ্রন্থের এই অধ্যায়টির শেষ বাক্যেই আছে এর প্রমাণ—None of ns can escape this torture of the body on the ground, but there is no power on earth which can deprive us of the freedom to escape in a different way—to rise in spirit to the infinity of the silent spaces which do not firghtren but only strengthen.

ফরাসী গণিতজ্ঞ দার্শনিক Blaise Pascal-কে যে Infinite silence of the space আতঙ্কে অভিভূত করেছিল, Pascal এর ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও, নীরদবাবুকে সেই infinity মুক্তির আনন্দ দেয়। কারণ, Pascal খ্রীস্টান, নীরন চৌধুরী হিন্দু। তাই বিশ-তিরিশ দশকেব সময থেকেই নীরদবাবু সচেষ্ট হয়েছেন তাঁর এই পীড়িত আত্মাকে পবিবেশেব শৃঙ্খল থেকে মুক্ত কবতে। এই মুক্তিব প্রয়াস প্রাচীন হিন্দু ঋষিদের নির্বাণ বা মোক্ষলাভের প্রয়াস থেকে স্বতন্ত্র যদিও উভয় ক্ষেত্রেই পরিবেশের সঙ্গে বিরোধ ও অসামঞ্জস্যই এব প্রেবণা I Tropical climateএ বন্দী প্রাচীন হিন্দুদের ইউবোপীয আত্মা মোক্ষ সাধনার মরুবালিতে পথ হারিয়েছে। নদীমাতৃক বাংলার বৃষ্টিস্নাত শ্যামল পবিবেশে হিন্দুর আত্মা ততটা পীড়িত বোধ করেনি। তাই সেখানে সম্ভব হযেছে সেক্যুলায় মুক্তির এক আশ্চর্য প্রয়াস—যাব পরিচয বযেছে বাংলায় নবজাগরণেব অজস্র সৃষ্টি কর্মে।

বাঙালী হিন্দুর নতুন এই মুক্তি প্রযাসের উত্তরাধিকারী নীবদ চৌধুবী যে অসহ্য সংগ্রাম করেছেন সাবা জীবন বিরুদ্ধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পবিবেশের সঙ্গে তাব ক্ষযক্ষতি, জ্বালা যন্ত্রণাব অনুভূতি একুশ বছব বয়সেই তাঁব চেতনাব ধবা পড়েছিল : অটোবায়োগ্রাফিতে সেই অনুভূতির যে প্রকাশ ঘটেছিল তিনি সে কথা স্মরণ করেছেন তাঁর The Contenint of Circe-ব Epilogue-এর গোড়াতেই—Those who have read my autobiography will recall

that, so far as it is a personal story, it ends in despair. a very strange state of mind to be in for a young man of about twenty two. It was, I wrote in the book, neither absinthe, nor lust nor disease, nor remorse for some hideous suppresaed crime, nor unrequited love which had brought me to this pass My low spirits were absolute.

এই absolute low spirits এর কারণ অবশ্যই মায়াবিনী মহাদেশের spell—যার প্রভাব কাটিয়ে উঠতেই নীরদ চৌধুরীর অর্ধেক জীবন ব্যয়িত হয়েছে। কিন্তু অব্যবহিত যে ঘটনা জীবন সম্পর্কে তাঁর এই নৈরাশ্যের জন্ম দিয়েছিল তা হোল বি এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করা সত্ত্বেও এম এ পরীক্ষা সম্পূর্ণ করতে না পারার ক্ষোভ। কয়েকটা পেপার দেবার পর উঠে আসতে হয়েছিল যথেষ্ট প্রস্তুতির অভাবে। এ সম্পর্কে অটোবায়োগ্রাফিতে তিনি লিখেছেন : I have now discovered the main reason for my failure it was sheer laek of vitality · My strength was not equal to sustaining even the routine of studies called for by an examination, and I had been attempting, or rather prospectng for too much Even' the giant's energy of Mommsen could not balance his output in synthesis against his output in analysis. . The Roman History remains the paragon of the most inspired and inspiring lumberjack and quarryman of hisroriography, My insane ambrition was to eombine Mabillon Muratori and Tillemont with Gibbon, The idea of a gigantic Corpus piling iteelf up in annual Volumes througout a life-time, a single=handed Monumenta of Indian history rivalling the corporate Monumenta Germarie Historica, and the idea of a stupendons synthesis written on grand scale over decades ard revised on an equally grand scale over succeeding decades obsessed me at the same time. If the synthesis was not to be absolutely like Eduard Meyer's Gesehichte des Altorums, the least that it had to be was

Stern's Geschichte Europas seit den Wiener Vertragen von 1815, and I was in too great a hurry to turn out such a work, No wonder I crashed,

মাত্র কুড়ি একুশ বছর বয়সে এম এ পরীক্ষা দেবার সময় থেকেই যে যুবক এই উচ্চাশা পোষণ করে এবকম Stupendous scale-এ পড়াশুনা সুরু করে তার পক্ষে এম-এ পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়া সম্ভব নয়। একক ভাবে ভারতীয় সভ্যতায় মনুমেণ্টাল হিস্ট্রিও তিনি লিখে ওঠতে পারলেন না। কিছুদিন সরকারী চাকরী করার পর স্বেচ্ছায় সাংবাদিক-লেখক বৃত্তি গ্রহণ করলেন। আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে unsettled যে পেশা তাই হল তাঁর জীবিকা। নিজের সম্পর্কে তাঁর প্লেনের উপমা এই পেশা সম্পর্কেও তাঁর মতে প্রযোজ্য। Scholar Gipsy-র এই জীবন তাঁর কেটেছে, Modern Review শনিবারের চিঠির সম্পাদকীয় সহযোগীরূপে, অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্রের ভাষ্যকার,এবং সবশেষে দিল্লি থেকে AIR-এর—War Commentator-এর ভূমিকায়। মাঝে তিনি শরৎচন্দ্র বসুর প্রাইভেট সেক্রেটারী রূপে কাজ করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হওয়া এবং শরৎ বসুর কারাবদ্ধ হবার—পূর্ব পর্যন্ত। নীরদ বাবু তাঁর অটোবায়োগ্রাফির দ্বিতীয় খণ্ড Thy Hand, Great Anarch-এ শরৎ বসুর একটি অন্তরঙ্গ, সশ্রদ্ধ চিত্র এঁকেছেন। আর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে বর্ণনা করেছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভারতীয় সম্পাদক রূপে। এম. এ পড়ার সময় যাঁর ইতিহাস পড়ানো নীরদ চৌধুরীর সবচেয়ে ভালো লেগেছিল, তিনি হলেন ঐতিহাসিক ড রমেশ মজুমদার। অটোবায়োগ্রাফির প্রথম খণ্ডে তাঁর সম্পর্কে লিখছেন ঃ His lectures gave me the sense of watching the process of the writing of ancient Indian history, and not merely the experience of reading it

জীবনের এই পর্বে যে কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সংস্পর্কে তিনি এসেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন রিপন কলেজের সহপাঠী বিভূতিভূষণ, বহুবাজার স্কুলের শিক্ষক মোহিতলাল আর সাহিত্যিক গোপাল হালদার। একবার বেশ কিছুদিনের জন্য নিজের ভাড়া বাড়ির একাংশে সপরিবারে গোপাল হালদারকে থাকতে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সুরু হবার বেশ-কয়েক বছর আগে থেকেই এই যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবিতা, যুদ্ধে বিশ্বের প্রধান শক্তিগুলির অবস্থান, এমন কি সোবিয়েতের মিত্র শক্তিতে যোগদান

সম্পর্কে তিনি সমসাময়িক অনেক বাঙালী চিন্তাবিদদের ধারণাকে নস্যাৎ করে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ায় দু তিন বছরের মধ্যেই অক্ষশক্তির পতন অনিবার্য হয়ে উঠবে সে কথাও তিনি সাধারণ বাঙালী ও ভারতীয় জনমতের বিরুদ্ধে ঘোষণা করতে কুন্ঠা বোধ করেন নি। তাঁর এই সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী—ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণেরই ফল, কোন অলৌকিক ক্ষমতা নয়। নীরদবাবু মনে করেন স্বাধীনতাকামী ভারতীয় অন্ধ ইংরেজ বিদ্বেষের জন্যই জার্মানীর জয়লাভ কামনা করত। এই কাল্পনিক wish fulfilmntই জীবনের সবক্ষেত্রে এ দেশের মানুষের বৈজ্ঞানিক বিচার শক্তিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

জ্যোতিষ শাস্ত্র তাগাতাবিজ তন্ত্র মন্ত্র এ সব বিশ্বাসই হিন্দুদের—জাতিগত peresution mania xenophobia থেকে এসেছে (Hinduism)। অলৌকিক শক্তি এবং আধ্যাত্মিক শান্তির জন্য আকাঙ্খা বাস্তব সমস্যার বৈজ্ঞানিক সমাধানে ব্যর্থতারই অনিবার্য পরিণাম। নীরদ চৌধুরীর এসব কথা অধিকাংশ শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকের কাছে, বলা বাহুল্য, প্রীতিপ্রদ হয়নি। এদিকে পঞ্চাশ বছর বয়সে পড়তেই দেশ স্বাধীন হল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎস চেহারা খোদ রাজধানীতে বসে স্বচক্ষে দেখলেন। ঐতিহাসিক নীরদ চৌধুরীর মনে সন্দেহ রইল না যে, আধুনিক ভারতীয় সভ্যতার ধ্বংসকাল আসন্ন। ভারতের জাতীয় ঐক্য, রাজনৈতিক অখণ্ডতা, সামাজিক সাংস্কৃতিক অভ্যুদয় আজ অতীতের বিষয়—thing of the past। সেজন্যই তাঁর সেই বহু ধিক্কৃত Dedication—"To the menory of the British Empire··"

অটোবায়োগ্রাফির পাতায় পাতায় অতীতের জন্য এই নস্টালজিয়ার সুর। কিশোরগঞ্জের শৈশব ও বাল্য, পূর্ববঙ্গের অবিরাম বর্ষণের দিনগুলি, মেঘনার বিপুল জলরাশি দুর্গাপুজাআগমনী ও ভাসানের গান, বাংলার নবজাগরণের অজস্র সৃজনশীলতায় বাঙালীর আত্মিক মুক্তির প্রয়াস, যৌবনে কলকাতায় পড়াশুনা—এইসব নিয়েই বাঙালী নীরদ চৌধুরীর নস্টালজিয়া। নীরদবাবু কি তবে রোমান্টিক অতীত বিলাসী? যাঁরা তাঁর ম্যাক্সমুলারের জীবনী The Scholar Exttaordinary পড়েছেন তাঁরা সেটা ভাবতেও পারেন। ঐ গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মূল্যবান স্মরণীয় অধ্যায় হল জার্মান তথা ইউরোপীয় রোমান্টিসিজম সম্পর্কে নীরদবাবুর আলোচনা। হেগেল, শিলার, ম্যাক্সমুলার সকলেই সেই জার্মান Romanticism-এর Product I

ম্যাক্সমুলারের রোমান্টিজম সম্পর্কে লিখতে চেয়ে নীরদবাবু তার সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি তুলে ধরেছেন, অসাধারণ পাণ্ডিত্য অনুভূতি, ও Synthesize করার ক্ষমতা দিয়ে।

মনুমেণ্টাল হিস্ট্রি লেখার স্বপ্নের ব্যর্থতায় নীরদ চৌধুরী পঞ্চাশ বছর বয়সেই আসন্ন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করছিলেন। এই সময়েই হঠাৎই একদিন অটোবায়োগ্রাফি বা নিজের ব্যক্তিগত ইতিহাস লিখতে সুরু করলেন। অসুস্থ শরীর সুস্থ হয়ে উঠল। প্রথম গ্রন্থের অসাধারণ সাফল্য মৃত্যুকে সরিয়ে দিল অনেক দূরে। সুভাষ বোস সম্বন্ধে নীরদবাবু লিখেছেন যে তাঁর শরীর কোনদিনই খুব ভালো ছিল না। প্রায়ই অসুস্থ হতেন। কিন্তু অভিপ্রেত কোন কাজের মধ্যে নিমগ্ন হতে পারলে তাঁর সুস্থতা miraculously ফিরে আসত। এর প্রমাণ আমরাও পাই দেশত্যাগের পর আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক রূপে সুস্থ দেহে তাঁর অসাধারণ কর্মকাণ্ডের রোমাঞ্চকর ইতিবৃত্তে। তাঁর মৃত্যুও হয়েছিল, রোগশয্যায় নয়, বিমান দুর্ঘটনায়—সৈনিকের উপযুক্ত মৃত্যু। গীতাঞ্জলী অনুবাদের সময় রবীন্দ্রনাথও খুবই অসুস্থ ছিলেন। তিনি মৃত্যু আসন্ন বলেই ভাবছিলেন, অনেকগুলি কবিতাতেই সেই আসন্ন মৃত্যু ভাবনার ছায়া পড়েছে। ইংরেজী গীতাঞ্জলীর সাফল্যের পর হঠাৎই যেন মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে ফিরে আবার বেঁচে উঠলেন ও দীর্ঘজীবন লাভ করলেন। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বরাবর সুস্বাস্থ্যের অধিকারীই ছিলেন। তুলনা গুলি মনে এল ব্যর্থতাবোধকে মৃত্যু চিন্তাকে কাটিয়ে উঠতে মানুষের সৃজনী শক্তি কীভাবে কাজ করে সে কথা বোঝাবার জন্য। একথা অস্বীকার করা যায় না যে নোবেল প্রাইজ পাবার আগে রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থতাবোধ এবং মৃত্যু ভাবনাকে প্রভাবিত করেছিল স্বসমাজ ও স্বদেশের একটা বিপুল অংশের স্থূল ও কদর্য বিরোধিতা ও তজ্জনিত ক্লান্তি অবসাদ। গীতাঞ্জলীর সাফল্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে Destiny বিশ্বাস করতে হয়, রবীন্দ্রনাথও করতেন।

প্রচলিত অর্থে ঈশ্বরে অবিশ্বাসী এবং সমস্ত ধর্মীয় dogma বা doctrine-এর বিরোধী হলেও পঞ্চাশ বছর বয়সেই নীরদবাবু মানুষ ও বিশ্ব প্রকৃতির সম্পর্ক নিয়ে একটা স্থিরতর উপলব্ধিতে পৌঁছেছিলেন। প্রথম জীবনে যে intellectual Prometheanism-এর প্রভাবে বিশ্বপ্রকৃতির প্রতি একটা উদ্ধত বিদ্রোহের মনোভাব ছিল এই সময়ে তার বদলে দেখা দিয়েছিল বিশ্বের সঙ্গে মানবসত্তার একটা নিগূঢ় ঐক্যের উপলব্ধি। I have been enabled to

put an end to this duality and found peace in a new form of monism. I have come to see that I and the universe are inseparble, because I am only a particle of the universe and remain so in every manifestation oi my exisstence—intelectual moral and spiritual aa well as physical today bornel on a great flood of faith, hope and joy in the midst of infinite degradation, I feel that I shall be content to be nnthing for ever after death in the ecstasy of having lived and been alive for a moment I have made the discovery that the last act is glorious however squalid the play may be in all the rest,

পঞ্চাশ বছর বয়সের এই উপলব্ধি, আজ একশো বছর বয়সেও নীরদবাবুর অন্তরের কথা, কিন্তু এই উপলব্ধি তো একজন যুক্তিবাদী—আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের মুখে ঔপনিষদিক চিন্তারই প্রতিধ্বনি। এতো রবীন্দ্রনাথেরই অন্তিম উপলব্ধির নীরদ চৌধুরীকৃত version। সমস্ত বিরোধ-বৈপরীত্যকে অতিক্রম করে মানুষকে বলতে হয়, জীবনানন্দের লাইনটাকে একটু বদলে নিয়ে—মানুষ তবুও ঋণী প্রকৃতির কাছে। এটা নীরদ চৌধুরীর Homecoming না কারণ তিনি আজীবন তাঁর সত্তায় গভীরে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। With the conscousness of decay and destruction all aroumd me I have at aost gained an understanding of the history of my country as I rever could expect to have without this personal tribuiplation. Not only have the achiuments of our ciuilization in ancient and modern tims become inexpressibly dearer to me I am able also to see the mistakms comitted and the wrong turns taken by my people with a disconcerting clarity of perception (Autobiography, পৃ 469)

স্বজাতি ও স্বদেশের ঐতিহাসিক বিপর্যয় সম্পর্কে নীরদবাবুর এই অন্তর্দৃষ্টি স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি তাঁকে বিরূপ করেনি, প্রিয়তর করেছে স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরবময় ঐতিহ্যকে। আমরাই না বুঝে তাঁকে বিদায় দিয়েছি আমাদের

কাছ থেকে। কিন্তু আজ অবস্থা পালটেছে। Autobiography Preface-এর স্ত্রীর সন্তান ও বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে নীরদ চৌধুরী নিজের জন্য যে epitaph-এর কথা ভেবেছিলেন-Here lies the happy man who was an islet of sensibility surrounded by the cool sennce of his sife, frisnds and cwildren–"আজ সারা বিশ্বে তাঁর অসংখ্য অনুরাগী পাঠক তাঁর চারিদিকে সেই স্নিগ্ধ শান্ত সহৃদয় আত্মীয়তার পরিবেশ রচনা করেছে।

– হ্যাঁ, একশো বছর বয়সে নীরদ চৌধুরী-সত্যিই তৃপ্ত, প্রশান্ত। সব পাখি আসে, সব নদী–"

দুধেভাতে

বাবিদবরণ চক্রবর্তী

সারাবাত সলিড ঘুমটা দিয়েও মনেব ভূড়ভুড়ি কাটাটা মাবতে পাবল না সুদর্শন সান্যাল, অথচ তুহিন বড়ালেব ভ্যাজভ্যাজানিব মধ্যেকাব হামবাগাজিমটা বাদ দিলে কোনও গ্যালগেলে ধোঁয়াটে ভাব তো ছিল না। একেবাবে ক্রিস্টাল বক্তব্য। অথচ! আজকাল কী যে সব হয়ে যাচ্ছে! কালও বুঝিয়েছিল নিজেকে। আজও বোঝায়।

তবু চোখমুখেব অপ্রসন্নতা সহ সুদর্শন স্ত্রী মহামায়ার হাত থেকে অ্যাটাচিটা নিয়ে গুরুমন্ত্রটা আব একবাব মনে মনে আওড়ে পা বাড়াবার উপক্রম কবতেই বাধা পায়, 'আবও শ চাবেক টাকা দিয়ে যাও। বারোশ'য় হবে না; বাজারে কী নাকি কী এক রিবক এসে গেছে। তার দাম পনেরো'শ।'

রিবক জার্মানির জুতো প্রস্ততকারক সংস্থা। দুনিয়াজোড়া পসার। কলকাতায় যে তাদের নেটওয়ার্কেব কাজ শুরু হয়ে যাবে তাতে বিস্ময়ের কী আছে! তাছাড়া এ-সব খবর নতুন তো কিছু নয়। খববের কাগজেব চাকরি। তেরোপাহাড় সাত সমুদ্র ছেঁচা এ-সব বিজনেস-ডিলিংসই তো প্রতিদিনের আটকলামে নানান শিরোনামে পরিবেষণ করতে হয়,—হেডলাইনকে হেডলাইন, ফিচারকে ফিচার, সম্পাদকীয়কে সম্পাদকীয়; আবাব চৌয়ানিকে চৌয়ানিব মতো করে বক্স কবেও ছাড়তে হয়।

অ্যাটাচিটা ধীরে ধীবে রেখে টাকাগুলো বারই করে দেয় সুদর্শন সান্যাল ভাবলেশহীন মুখে। কিন্তু যে-জায়গায় গেঁথাব সে-জায়গায় গিঁথেই থাকে। বোঝে কাতরতার এ বিলাস তার সাজে না। তাছাড়া সে বেচারিই বা কী করবে; সেও তো একজন ফ্রি-ল্যান্সাব, কথার ফেকো উড়িয়ে ইনফর্মেশনের চমকানি ছড়িয়েই তো তাকে পাত্তা পেতে হয়।

মাঝ-বয়সী স্ত্রী মহামায়ার সঙ্গে সুদর্শনেব কথা বলার সময় সকালের নটা-দশটা থেকে দুপুর একটা দেড়টা অব্দি। তাও এরই মধ্যে চা মধু-টোস্ট থেকে শুরু করে দুবার কোষ্ঠশুদ্ধির প্রয়াস, স্নান, দুপুরের খাওয়া,—ছোট্ট করে মিনিট

পনেবোব একটা ভাতঘুম সবই থাকে। তাই অপ্রয়োজনীয় কথাব জের টানাব সময়ই কোথায় ?

তবু পবেরদিন ঠিক বেরোবার মুখেই সুদর্শন জেরই টানে,

'দ্যুতি জুতো কিনেছে ?'

মহামাযাব ভ্রূতে গেঁট পড়ে। স্বামী যে বুড়ো হযে গেছে বুঝতে পাবে। না হলে এসব ছোটখাট ব্যাপাবে মাথা ঘামাতেই বা চাইছে কেন। সেদিন দ্যুতিব কোমবেব বেল্টটা নিয়েও কথা বাড়াতে চেয়েছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বেও তবু জুতোব বাক্সটা সামনে এনে দেয।

জুতোব বাক্সটা সামনে নিযে সুদর্শন হাতেব ঘড়িতে চোখ বাখে। এখনও দশ বাবো মিনিট সময আছে। পত্রিকা হাউসের গাড়ি আসবে ঠিক দেড়টায়। কার্টন থেকে সেলোফেন পেপাবেব সুদৃশ্য মোড়ক থেকে জুতোজোড়া বাব কবতে কবতে নিজেব অতীতটাই একেবারে ধাঁ কবে উঠে আসে চোখের ওপরে ; ছেলে দেবদ্যুতিব যা বযস সেই বযসে তাব পাযে উঠেছিল নটিবয সু-এব পর্ব অতিক্রম কবে বাটাব এক্সক্ল্যুসিভ'। দাম তখন কত ছিল? ভাবতে ভাবতেই সম্বিতে আসে। মিছিমিছি দিনকালের তুলনা যে কেন করে ? করে যে কী কবতে চায ? টিভির বিজ্ঞাপনে কপিলদেব যে-ভাবে 'কেযা জুতে ভি শাঁথ লেতে' বলে জুতোব কমপ্রেসব, সাকসেসব, ভেনটিলেশন প্রভৃতি সুক্ষ্ম কারিকুরিগলো দেখাতে নিবিষ্ট হযে ওঠে, ঠিক সেইভাবেই জুতোজোড়া নাড়ানাড়ি করতে করতে একসময নিজেকে শোনানোব মতো কবেই বলে ওঠে,

'সত্যি পা যে এইভাবে ভোগ কবতে পারে, পা'ও যে এইভাবে নিজের আরাম খুজে নিতে পাবে কযেক বছব আগেও জানা ছিল না।'

অ্যাটাচিটা পরিপাটি কবে গোছাতে গোছাতেই মহামাযা টিপ্পনি কেটে ওঠে, 'কেন পাটা শবীবেব কোন অংশ থেকে কম গুরুত্বেব ? পাযেব ভোগ কবতে বাধবে কেন ?' 'নন্। শরীবব আর পাঁচটা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন তাদেব পাওনা বুঝে নিচ্ছে, বুঝে নিক। তাতে আমাব কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু ব্যাপাবটা কোথাব গিযে দাঁড়াচ্ছে বলো তো। ইতালির প্যান্টজামা, জার্মানিব জুতো, নিউইয়র্কেব মোজা, দক্ষিণ আফ্রিকার গগলস, সিঙ্গাপুরের বেল্টেব জন্যে আমাদের মন পুড়ছে,—রেস্তয কুলোচ্ছে না,—'কুলোলেই কিন্তু—'

মহামাযাব পিত্তথলিব কয়েক ফোঁটা পিত্তই যেন আচমকা রক্তপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে উঠে এসে বুকেব বাতাসে খাবলা দেয,

'কুনো ব্যাঙেব মতো কথা বলো না।–ছেলেব জন্যে তেমন কবে খরচাপাতি কবলে না তো! পাঁচ ছ বছব আগেও সাউথ ইণ্ডিয়াব ব্যাঙ্গালোব ট্যাঙ্গালোরের ইঞ্জিনিযাবিং মেডিকেল কলেজগুলোব খাঁই এতটা ছিল না। ষাট-সত্তর হাজাবেই যে কোনও একটা ইঞ্জিনিযারিং কলেজে দ্যুতিকে জুতে দিতে পাবতে। এতদিনে ইঞ্জিনিযাব হযে এসে চাকরিবাকবিব মুখে দাঁড়াতে পাবত। –তা না কবে অর্ডিনাবি কমার্স গ্রাজুযেট।–এখন ওকে টাফ কম্পিটিশনেব মধ্যে দিযে চলতেই তো হবে। নিজেকে প্রেজেণ্টেবল্ করতে গিযে জামা কাপড জুতোব দিকে তো তাকাতেই হবে।'

ছেলের কেবিয়ব নিযে স্ত্রী মহামায়া সিদ্ধান্তে অটল হযে আছে, যা থেকে কোনও দিন তাকে টলানো যাযনি। সে-নিষ্ফল চেষ্টায আজও সময় নষ্ট না কবে কাঁধ আব টাকাব ঝাঁকুনিতে অসহায়ত্বের ভাব নিযে নিষ্ক্রান্ত হতে পারত। কিন্তু পাবে না। কী যে হযেছে! কেবলই ফিরে নিজের অতীতটা নিযে নাডাচাডা করতে ইচ্ছে কবছে। নির্জনে নিজের বিশ্বাসগুলো নতুন কবে যাচিযে দেখতে ইচ্ছে করছে। তর্কের মুখে পডলে ভেতবেব তার্কিক প্রবৃত্তিটা নেডি কুকুবেব মতো লেজ খাডা কবে দাঁডিযে পডছে। নিজেয় আযত্তেই যেন নিজেকে রাখতে পাবছে না।

'ইঞ্জিনিযার হলে কী হত?'

'তুমিই বলো না কী হত তুমি তো সর্বজ্ঞ।'

'এখন যেমন বাজাব সার্ভেতে টো টো কবে ঘুবে বেড়াতে হচ্ছে, ইঞ্জিনিযাব হলে দেখতে টেকনোলজিব বকমফেব ঘটিযে অমুক অঙ্গকে আব একটু বিল্যাক-সেশন দিতে তমুক প্রত্যঙ্গকে আব একটু মুলেব অনুভূতি দিতে পাগল পাগল হয়ে উঠত। আস্ত মানুষ ছেডে দেখছ না এখন বাজাব কীভাবে নেমে পডেছে মানুষেব অঙ্গপ্রত্যঙ্গেব ফর্দ নিযে। অঙ্গপ্রত্যঙ্গেব? চাহিদা ধরে ধরে জিনিসপত্তর তৈবি করো,–তারপবে বাজাব ছডাও, মাল টেনে তোলো,–তাবপব বিক্রি করো ব্যস্!'

মহামাযা এবাব ধমক দিযেই ওঠে,

'আব কী থাকবে? আব কী কোথায় আছে? তোমারই তো কথা,–সভ্যতাব মানে তিন প্রস্থ কাজ,—প্রোডাকসন মার্কেটিং সার্ভিসিং। পত্রিকায কাজ কবে কবে পাগলছাগল কলমিস্টদেব সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে এই হযেছে তোমাদের সৃষ্টিছাডা চবিত্র! আজ যা বলো,–কালই তাব বিবোধিতা কবে অন্য কথা বলো। কেন বলো নিজেদের কথার ধার যুক্তির ভাব দেখানোব জন্যে?

সে-সব যা করার করো, পেশাগত ব্যাপার, তোমরাই বুঝবে। কিন্তু খবরদার ছেলের জামা জুতো প্যান্ট, চালচলন নিয়ে তাকে দমিয়ে দেবার চেষ্টা করো না। তাকে তার মতো জীবিকা খুঁজে নিতে দাও।'

অবগ্যানের সুর তুলে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। সুদর্শন অব্যাহতি পেয়ে যায়। না হলে ঠিক জানত মহামায়া এরই অব্যবহিত পরে তার পিতৃত্বের গুরুতের কর্তব্য পালনের অক্ষমতা নিয়ে অভিযোগ পেশ করেই যেত। তালিকা পেশ করেই চলত ব্যাঙ্গালোর তামিলনাড়ু হরিয়ানা দিল্লির কোথায় কোথায় ক্যাপিটেশন-ফি দিয়ে লুক্রেটিভ কোর্সে ভর্তি হওয়ার সুযোগ আছে, পরিচিত বন্ধু আত্মীয়দের মধ্যেকার কার কার ছেলেমেয়ে কোন কোন সে-সব প্রতিষ্ঠান থেকে বার হয়ে এসে আজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। আর তার ছেলে, দেবতার কান্তি পাওয়া ছেলে শুধুই কমার্স গ্রাজুয়েট···

ছেলে দেবদ্যুতিকে নিয়ে সুদর্শন কোনদিনই পরিধির বাইরে বেরিয়ে তাল-গোলে কিছু ভাবেনি। জোরাজুরিও করেনি। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল নিয়ে পরিষ্কার বলেছিল, ফার্স্ট ডিভিশন থাকলেও সায়ান্স নিয়ে হায়ার এডুকেশনে যাওয়া ঠিক হবে না, জেনারেল লাইনে কমার্সই নিতে হবে। পড়াশুনো করার ইচ্ছে বাড়লে নিজেকে এলিভেট করতে পারলে তার পরে কস্টিং টস্টিং-এর কথা ভাবা যেতে পারে। তা না হলে এইভাবেই চলতি কা নাম গাড়ির সওয়ার হতে হবে। সঙ্গে গানটাকেও বেড় দিয়ে জোরসে ধরতে হবে। গানও এসকেলেটরের ভূমিকা নিতে পারে।

কিন্তু চার বছর না যেতে যেতেই দুম করে সে-গানও ছেড়ে দিল। কেন ছাড়ল? কোনও মেয়ে টেয়ের জন্যে কী? দু' একজন মেয়ে তো বাড়িতে আসতই। তাদেরই মধ্যে কেউ কী তার ম্যাড়ম্যাড়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে উঁচু নিচু কথা শুনিয়েছে না স্বয়ং মহামায়াই? মহামায়া তো আজকাল তার কাছে কেবলই গল্প পেড়ে চলত, তার কোন্ কোন্ বন্ধুর কোন্ কোন্ ছেলে কোথায় কোথায় কত কত টাকার পোস্টিং পেয়েছে বা পেতে চলেছে।

ছেলেকে চাগিয়ে তোলার জন্যে মহামায়ার এই সব রদ্দিমারা প্যাঁচ পয়জারে সুদর্শন ইদানীং একেবারেই হয়ে উঠেছিল উদাসীন। ফিরেও দেখতে চাইত না মা-ছেলের দিকে। তথ্যের সমুদ্রের মধ্যে থাকতে থাকতে ক্রমশ এক ধরনের নির্বিকারত্ব পেয়ে বসেছিল। দেখে শুনে কী হবে! স্পষ্টই যেন বুঝে গিয়েছিল দুদ্দাড় করে একটা নতুন ব্যবস্থা ছুটে আসছে। এই যায় আসে না,—কে কোথায়

দাঁড়িয়ে আছে ? একটু ওপরে না একটু নিচে ? সামনে না পেছনে ? ডানে না বামে ? নতুন করে অ্যাডজাস্টমেন্ট বি-অ্যাডজাস্টমেন্ট হবে, তাকে ধরেই সংস্থান খুঁজে নিতে হবে। পুরনো হিসাব নিকাশ সবই হয়ে যাবে বরবাদ।

ভূবোদর্শনের এইসব সাত পাঁচ নিয়ে নতুন করে ভাববার আর কোন অবকাশই হয়ত পেত না সুদর্শন, যদি না কাজের সূচিতে প্রসঙ্গটাই হয়ে উঠত সর্বস্ব। রবিবাসরীয় পাতার দায়িত্বে সে। চিরাচরিত রবিবারের পাতা মানেই ছিল একটা গল্প, একটা ধারবাহিক উপন্যাস, একটা কমিক রিলিফ লাগানো ছোট্ট ফিচার, আর খুব প্রয়োজনীয় জনজীবনের কিছু ইনফর্মেশন ব্যস। দিনে দিনে রবিবারের পৃষ্ঠাগুলো হয়ে উঠছে ট্যাবলয়েড চরিত্রের—সমাজ জীবনের গভীর থেকে আনা একটা হইচই ফেলা হল্লা জুড়তেই হবে আলগা আলাগা ভাসা ভাসা ভাবে। প্রতিটি সংখ্যাতেই রাখতে হচ্ছে এই ধরনের এক একটা মার মার কাট কাট আর্টিকেল। এই এক-একটা আর্টিকেলের জন্যেই প্রতিটি রবিবার সার্কুলেশন বাড়ছে সোয়ালাখ থেকে দেড়লাখ। আগামী সংখ্যা 'জীবন-জীবিকা এবং আজকের বাজার।' ভেতরের খবর উড়তে লেগেছে হাউসের যে পাক্ষিক সাহিত্য পত্রিকাটা আছে, যার সম্পাদনায় আছে জড়দগব এক বৃদ্ধ,—যার কর্মকুশলতায় পত্রিকার সার্কুলেশন এসে দাঁড়িয়েছে কুড়ি হাজারে, পত্রিকার থিংকব্যাঙ্কের মাথায় আছে তারই সম্পাদকরূপে বসানো যায় কি না সুদর্শন সান্যালকে।

সুদর্শন হাউসে এসে পৌঁছোয় ঠিক দুটোয়। আধ ঘণ্টার মধ্যে আগামী চব্বিশ ঘণ্টার নির্ঘণ্টটা সাজিয়ে নিয়ে অ্যাসিসট্যান্ট, জুনিয়র ফ্রি-ল্যান্সারদের ডাক পাঠিয়ে ল্যাপকম্পিউটরটার কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। আজ কিন্তু সেই আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে দাঁড়ায় তুহিন বড়াল।

'স্যর!'

'বলুন।'

'ওই কালকের কথাটা বলছিলাম। এত বড় একটা ট্যাবলয়েড হতে চলেছে অথচ বেডলাইট এরিয়ার ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিকস্‌টা থাকবে না?'

গতকাল বেলা শেষের অবসন্নতায় যে-কথাগুলি বুঝিয়ে বলা সম্ভব হয়নি, সে কথাগুলিই বলতে চায় সুদর্শন সান্যাল,

'বসুন মিস্টার বড়াল। পত্রিকার পাঠক মানেই অপরিণত ফ্যানাটিক লুনাটিক যত গসিপ তত খবরের স্বাদ বাড়ে তাও ঠিক। তবুও তো সব কিছুর একটা মাত্রা আছে,—বিশ্বাসযোগ্যতা—পাঠকের গ্রহণযোগ্যতা বলেও তো একটা বস্তু আছে—'

'সে তো স্যর আপনাদের লেখার প্রতিভার ওপর, প্রজেকসনের কায়দার ওপর।'

'না। ওই সব ভেজানো কথা বলবেন না। যত এলেমই থাকুক না কেন, কেউ প্রমাণই করতে পারবে না গবু গাছে ফলে।'

'কিন্তু স্যার। আমার কাছে স্ট্যাটিসটিকস আছে। ওই দুর্গাচরণ মিত্র স্ট্রিট, অবিনাশ কবিরাজ লেন, ইমাম বক্স লেন, সোনাগাছি, মসজিদ বাড়ি স্ট্রিটেই থেমে নেই, চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউ-পাক স্ট্রিট এমন কি সল্ট লেকের এদিক ওদিকেও বাজার ছড়িয়েছে। 'দেখুন বড়াল, আপনি রাস্তাঘাটের নাম করে অথেনটিসিটি বাড়াবার চেষ্টা করবেন না। আপনি বোধহয় জানেন না জীবনমুখী সাহিত্য করার ঝোঁকে আমি এক সময় ছিলাম। এদিক ওদিক আমিও কম কড়া নাড়িনি। তথ্য আমারও কিছু আছে। জানি, সেক্সওয়ার্কাররা মানে প্রতি বারবণিতা ভেড়ুয়া নামের একজন করে পুরুষ পোষে, তারা স্বামীর মতো থাকে কিন্তু স্বামী নয়। এরা ওদেরই রোজগারে খায়দায়, প্রয়োজনীয় এটা ওটার খরচপাতিও করে, —কিন্তু' 'প্লিজ স্যর প্লিজ। এ যুগ সে যুগ নয়। এ যুগ মাল্টিন্যাশনালদের যুগ, ওপেন মার্কেটের যুগ। জানেন কত রকমের গেস্ট হাউস গিজগিজিয়ে উঠেছে। কত ধরনের লোক আসছে যাচ্ছে। প্রতিদিন মিটিং-সেমিনার-সামিটকে কেন্দ্র করে কত হাজার হাজার টাকা উড়ছে।'

সুদর্শনের কষ্ট হয় তুহিন বড়ালকে দেখে। মধ্য চল্লিশের ফ্রিল্যান্সার। এখনও অন্দি বাঁধা একটা চাকরি জোটাতে পারেনি। প্রতি ইস্যুতে ভাবে, প্রয়োজনীয় তথ্যের বান ডাকিয়ে এইবার ঠিক অভীষ্টটা পূরণ করে নেবে।

সুদর্শন নরম গলাতেই বলে ওঠে,

'মানছি আপনার কথা। তবু প্রমাণ দিন।'

'কালই আপনাকে বললাম না সরাসরি প্রমাণের অসুবিধে আছে একটু। এখনও তো ঠিক এটা রেড্‌লাইট এরিয়ার ফিচার হয়ে ওঠেনি, তবুও দু' এক পিস যে নেই তাও নয়। যদিও দু চার বছরের মধ্যে—'

'কেন কথা বাড়াচ্ছেন। গিমিকের মত করে স্টোরি করা হলেও চ্যালেঞ্জ হলে যেন বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে যেতে পারি। তাই মালমশলা সব সময়েই মজুদ রাখতে চাই। তাছাড়া কেন বুঝছেন না এর একটা অন্য ডাইমেনশন এসে যাচ্ছে'—বলতে বলতে সুদর্শন নিজেকে থিতিয়ে নেবার জন্যে থামে। কালও এতটা উত্তেজিত হয়নি, চমকে উঠেছিল এই মাত্র।'

'স্যব্।'

'ওই তো বললাম না, ফিচাবটা অন্য পারস্পেকটিভে চলে যাবে। ঘরে ঘরে তল্লাশিও শুরু হযে যেতে পাবে। তাই নিজেদেব দিক থেকে দুশো ভাগ দাযিত্বশীল থাকতে চাই।'

'তাহলে একটা কাজ করি স্যর। সোনাগাছি খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জ মানে ওই-সব অঞ্চলে বেশ কিছু ননগভর্নমেণ্ট অর্গানাইজেশন,—এন জিও কাজ করছে তো,—ওই বকমেব একটা প্রতিষ্ঠানই 'অমল।' আমাব প্রাথমিক ইনফবমেশনটা পাওযা ওদের থেকেই। 'অমল'-এরই কযেকজন কর্মকর্তা ইনফবমেশন নিযে আসতে বলেছি। আপনি যাচিযে নিন। আব লেখাতেও সূত্র হিসেবে জুড়ে দিন ওদেব নাম।'

'নো নেভাব। ওদেব সব জানা আছে। সব কটা ধান্দাবাজ। যে যেমন ভাবে পাবে এ-সবকাব সে-সবকাব থেকে টাকা মেরে আখেব গুছোবার তালে আছে, আব বাকিবা বিদেশি এসপাইওনেজ অর্গানাইজেশনগুলোব হাতে তামাক খেযে দেশের সর্বনাশ কবে যাচ্ছে!'

থামে সুদর্শন। গলা শুখিযে কাঠ। এ কী হচ্ছে তাব! তবে অধিকাংশ স্নাযু পেশিতন্তু ক্ষণে ক্ষণে একজোট হযে এ ভাবে উল্টোপাল্টা কাণ্ড কবে যাচ্ছে কেন? এতবাব এ-ভাবে 'দাযিত্বশীল' 'দাযিত্বশীলতা' কথাগুলো উচ্চারণ কবে গেল কেন? কোথায গেল তাব সেই দার্শনিকতা! তাত্ত্বিকতা!

'তাহলে!—তাহলে ওদেব প্যারেড কবিয়ে দি।'

'প্যাবেড!'

'ওই আর কি! ওদের মধ্যে যে কজনকে পাবি বুঝিযে সুঝিয়ে আপনাব কাছে এনে ফেলছি,—আপনিই যাচিযে নিন। তাবপর কী ভাবে ডকুমেণ্টেশন্ কববেন তা আপনিই ঠিক কবে নেবেন।'

'হ্যাঁ। তা হতে পাবে।'

'তাহলে একটা শর্ত থাক্। আপনি ওদেব ছবি ছাপতে পারবেন না। প্রামাণিকতা বাখার জন্যে নাম ধামও দিতে পারবেন না। মানে এসব সিক্রেটস তো। আপনিই না বললেন এক হিসেবে দেখলে এটা একটা বেদনার দিক, যন্ত্রণার দিক। মানে ঠিক ভেড়ুযাদেব মতো সমগোত্রীয় হযেও সমগোত্রীয তো নয। এটা একটা ইনট্যারিম প্রিযমেব—মানে তেমন তেমন সুবিধে কবতে পারলে—'

'ফালতু সমাজতত্ত্ব কপচাচ্ছেন কেন, নাটশেলে যা বলার বলে ফেলুন।'

'মানে ওই বলছিলাম আর কী। এরা সবাই লেখাপড়া জানা বড় বড় বাড়ির ছেলে। খুঁজলে দেখা যাবে ওদের বাবামায়েদেরও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। তাই বলছিলাম সব যেন ঠিকঠাক থেকে যায়। যদিও অর্থনীতির দিক থেকে এসব কিছুই নয়, পেশা পেশাই। ফ্লারিসিং ইকনমি নতুন নতুন ছোট ছোট অসংখ্য পেশার পথ খুলে দেয়,—পেশার মানুষজন আসে যায়, কিন্তু পেশাটা আস্তে আস্তে বড় হয় পুরনো হয় জাঁকিয়ে বসে। তা কেউ চাক বা না চাক। তাই বলছিলাম আর কী, লাইটটা যেন পড়ে ওই অর্থনীতিটার ওপরেই।'

ধীরে ধীরে কথাগুলি শেষ করে সরাসরি তুহিন বড়াল চেয়ে থাকে সুদর্শন সান্যালের মুখের দিকেই। কিন্তু মুখ না তুলেই হাতের নাড়ায় আর বিড়বিড়ে উচ্চারণে কোন ক্রমে জানিয়ে দেয়,—'আসুন। ডিসিশনটা পরে জানাচ্ছি।'

তুহিন বড়াল চলে যেতেই সুদর্শন সান্যাল বিদ্যুৎবেগে উঠে পড়ে আরাম কেদারাটার মধ্যে নিজেকে ছুড়ে দেয়। কিন্তু তাতে উনিশবিশ কিছুই হয় না। টিভির রিওয়াইণ্ডের মতনই চোখের পর্দায় ঘটে যেতে থাকে পুরনো সেই সে দিনটা। পাগলের মতো খোঁজ খোঁজ করতে করতে মনিপলের ডেণ্টাল হসপিটালের ফর্ম প্রসপেক্টাস ইত্যাদি যোগাড়যন্তর করে চোয়াল এঁটে দাঁড়িয়ে মহামায়া, অতীশকেও ডাক দিয়ে এনেছে, যেহেতু অতীশ প্রিয় বন্ধু, নানান ব্যাপারে তার পরামর্শ মতামতের একটা মূল্য আছে। অতীশ বলে চলেছে,—'বৌদি ঠিকই তো বলছে। মানুষ ফেসিয়াল বিউটির জন্যে আজ যেমন মরিয়া হয়ে উঠেছে তাতে দাঁতের ডাক্তারের কদর বাড়বে বই কমবে না। ইংল্যাণ্ড আমেরিকায় তো এখন ডেণ্টিস্ট যুগই চলেছে।'

উত্তরে সে-ও বলে উঠেছিল,—'হ্যাঁরে বাবা হ্যাঁ। পত্রিকায় কাজ করি, প্রতিদিন টেলিপ্রিণ্টারে উগড়ানো রাশি রাশি খবর বাছি। আমি জানি না মানুষজন কী চাইছে, হাওয়া কোন্ দিকে বইছে! মাল তৈরি মাল বিক্রি এবং পরিষেবা এই নিয়েই তো জগৎজীবন। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যরক্ষার দিকটা তো এই পরিষেবার মধ্যেই পড়ে। কী ভাবে যে ডায়োগেনেসিস. সেণ্টার, হেন তেন ক্লিনিক, হেল্থ ক্লাব যে চারিদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠছে তা আমার থেকে কে ভাল জানে।'

প্রত্যুত্তরে খেঁকিয়ে উঠেছিল মহামায়া,—তাহলে সময় নষ্ট করছ কেন? মনিপলে পাঠিয়ে দাও। ক্যাপিটেশন ফি'র ষাট হাজার, আর মাসে মাসে—

—টাকাতে আটকাচ্ছে তোমাকে কে বলেছে ?

—তবে কিসে আটকাচ্ছে ?

—আটকাচ্ছে ওর অ্যাপটিচুডের প্রশ্নে।

বিস্ময়ের রেশ নিয়ে ধমকে উঠেছিল অতীশ,—একটা আঠারো বছরের ছেলে, তার আবার অ্যাপট কী। যেটা ধরে স্কু এ'টে দিবি সেটাই হবে ওর ক্ষেত্র।'

—কী আজে বাজে বকছিস, এই জন্যে আমাদের ছেলেপুলেদের কিছু হচ্ছে না। ভেতরের প্রবণতাই তো মানুষকে তার পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে নিজেকে মেলে ধরবার শক্তি জোগায়। গান বাজনার দিকে ঝোঁক আছে, সেটাই নিয়ে থাকুক না, আর তার সঙ্গে গ্রাজুয়েশনের একটা ছাপ্পা নেবার জন্যে কমার্সে ভর্তি হয়ে যাক।

—তাহলে তোমার ওই থিয়োরি, যা তুমি সবাইকে শোনাচ্ছ। জগৎজীবনের সেই পাঁচালী—মাল তৈরি মাল বিক্রি আর পরিষেবার কী হবে ?

—সার্টেনলি, গানবাজনাও এক ধরনের পরিষেবামূলক কাজ। গানবাজনার মধ্যে দিয়েও বাজারের সেই মূল ট্রেইণ্ডটাকে ধরতে পারলে রীতিমত দুধে ভাতে থাকবার স্কোপ আছে, আর চারদিকে তার ফলাও দৃষ্টান্ত আছে। সারাটা দিন টিভি স্ক্রিনে তুমি চোখ দিয়ে আছ, তুমি সে-সব ভালই জান।

—জানি বলেই ওই দুর্মতিতে আমি আমার ছেলেকে মজতে দেব না।

—তাহলে তুমি সেই সুমতির পথ দেখাও।

—তাই করব। উপায় করলে তোমাকে আর বলতে হত না। তবুও সেই চেষ্টাই করে যাব। আসল কাজটা তো ভেতরের আগুনটা জ্বালিয়ে রাখা। নিষ্ঠুর পৃথিবীটার স্বরূপ জানিয়ে নিজেরটা বুঝে নেবার জেদ চাগিয়ে দেওয়া এই তো।

—ব্যস্ ব্যস্ তাহলেই হল। আমিও তো তাই চাই।

সুদর্শন চোখের মণি দুটো গেলে ফেলবার মত করেই ফোঁসফোঁসে আক্রোশে রগড়ায়। স্প্রিঙের নমনীয়তাতেই লাফিয়ে উঠে টয়লেটে ছুটে গিয়ে বেসিনে ঝুঁকে পড়ে জলের ঝাপটায় ঝাপটায় সব কিছু উপড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। দু দণ্ড বাজে খরচের সময় নেই, অথচ কী ভাবে যে কাল থেকে অথচ বোতাম টিপলেই কম্পিউটর স্ক্রীন তাক লাগিয়ে দেবার মতো কত তথ্যই না আসছে! কেউ জানে কী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সরকার সুদের কারবারিদের জন্যে সুদের যে হারই বেঁধে দিক না কেন, সেই সবকিছুকে কলা দেখিয়ে খোদ কলকাতার সোনাগাছিতেই

সন্দের এক ধবনের কারবারি আছে যাদের নাম চটাওয়ালা। ওদেব রীতিনীতি মেনে টাকা নেওয়াকে বলে চটা নেওয়া। সোনাগাছিব ওই অঞ্চলেই ন্যূনপক্ষে চটাওয়ালা আছে তিনশো থেকে সাড়ে তিনশো।

ডাবল ভারসান বাংলা-হিন্দিতে মিঠুন চক্রবর্তীব একটা ছবি কযেক বছর আগে তো খুব পয়সা পিটে গেল,—'দালাল।' এখনও ক্যাসেটেব বিক্রিপাটা খারাপ নয়। কেউ কী জানে কলকাতাব পতিতাপল্লীতে কত বকমেব দালাল আছে। দালালদের অ্যাসোসিযেশন আছে। সিফটিং ডিউটি আছে। কমিশনেবও বেট বাঁধা আছে।

ভয়ংকর ভযংকব তথ্য দিযে কৌতূহলোদ্দীপক কী গুরুত্বপূর্ণ ট্যাবলয়েডই না বচনা কবা যায়। অথচ সাবাটা দিন থেকে থেকে—

প্রশ্রয় দিলেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়, না দিলে সব ফাঁকা।—এই বকমেব গোঁ নিয়ে সুদর্শন সান্যাল অতীতে অনেক সমস্যা কাটিযে উঠেছে। আজও কাগজ পেড়ে কলম উঁচিযে বসে, কিন্তু সেকেন্ড-মিনিটেব কাঁটাই তো নড়ে যায়। আঁচড়গুলো অর্থবহ হয় কই। বাজাব, মালবিক্রি, মাল তৈবি, পবিষেবা—সেই সব কথাগুলিই ক্রমশ কিম্ভুতকিমাকাব জন্তু হযে হযে নড়াচড়া কবতে থাকে, কী থেকে কী যেন সব হযে চলে। ক্রমশ চেতনা থেকে লুপ্তই হতে বসে শীততাপনিয়ন্ত্রিত ঘরটার অস্তিত্ব। মগজেব মধ্যে চেপে বসতে থাকে ঝড়জলের দুর্যোগপূর্ণ রাত। চারিদিকে বাজ পড়ছে, বিদ্যুত চমকাচ্ছে এবং তাবই মধ্যে সে ছুটছে, পিছনে পশ্চাদ্ধাবনরত সেই সব জন্তুগুলো,—ঠিক সে-ই তো। না—

উঠে পড়ে সুদর্শন সান্যাল, অন্যদিন এ সমযটা হয বাত আটটা। আটটা থেকে দশটা মযদান-ক্লাবে কাটিযে ধীবেসুস্থে বাড়ির পথে গাড়িতে গা এলিয়ে দেয়।

আজ সাতটা'তেই উঠে পড়ে।

ভিজিটরস কর্নাবে তুহিন বড়ালকে বসে থাকতে দেখে ডাক দিযে বলে যায়, তাহলে কালই প্যারেড কবিয়ে দিন।

ময়দান-ক্লাবেব একটা কোণ বরাবব খালিই থাকে যতই ভিড়ে ভিড়াক্কাব হয়ে উঠুক না কেন। জ্যেষ্ঠ-বরিষ্ঠ সংবাদিকরা এই-বিশেষ সম্মানটা ক্লাব থেকে পেযে থাকে, এটাই প্রথা। সুদর্শন দেখে, অসময় হলেও তাব অন্যথা নেই, তবু পরিবেশটা মনঃপূত লাগে না। হালফিল বেশ কযেকটা বাংলা পত্রিকা বেরিয়েছে, তাছাড়া জার্নালিজম কোর্সটা বিশ্ববিদ্যালযগুলোতে চালু হয়ে যাওয়াব দরুণ

দেওয়ালি পোকার মতোই ঝাঁকে ঝাঁকে অল্পবয়সী ছেলেছোকরাবা বন্ধুবান্ধবদের নিযে সন্ধেব দিকটা অল্প পয়সায মদ খেতে যে ভিড় করে তাও তাব জানা। কিছুটা যেন বিবক্তই হয়ে ওঠে বাবমুডা পরা প্রণবেন্দু দাশগুপ্তকে তাব দিকে এগিযে আসতে দেখে। প্রণবেন্দু ববাববই বকমবাজ। যদিও সম্প্রতি তাব কদব আকাশ ছোঁযা হযে গেছে বড একটা বিদেশি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানেব স্থানীয় প্রতিনিধি হয়ে। বাজনৈতিক কেস্ট-বিস্টুদের সঙ্গে ট্যুব কবে· সম্প্রতি মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যেব নেপাল সফব কভাব কবাব দাযিত্বে ছিল সে-ই। তাব কাছে এখন দিস্তে দিস্তে খবব। টেবিলে টেবিলে তাব এখন খাতিব, তার গা ঘেঁষে বসবাব জন্যে নবাগতদেব মধ্যে বীতিমত হুড়োহুড়ি। তবু লেপ্টালেপ্টির সেই-সব মৌতাত ছেড়ে তাবই দিকে এগিযে আসে,—'হাই সানিয়েলদা, তোমার এবাব কাব নতুন এক্সপিডিশন কী?' এবই মধ্যে পানীযতে একেবারে টইটুম্বুব হযে গেছে। তাব উত্তব শুনে হিজড়েদেব মতোই তালি দিতে দিতে তার সামনেব চেযাবটা টেনে নিযে ঝুঁকে পড়ে বলে ওঠে,

'তাহলে আমাকে তো তোমাব দবকাব হবেই। আই মিন আমাকে ছাড়া তোমাব চলবেই না।'

'কেন?'

দ্বিরুক্তি না করেই ফোলিও থেকে ঝপ কবে একটা ছবি বাব করে বলে ওঠে, 'বলো দেখি মালটিকে?'

'কে আবাব? নাম না জানা কোনও একজন অঘর গবিব মানুষ।'

'অঘব গরিব আগে ছিল, এখন তাব নেবাবাবসুদেব স্ট্যান্ডার্ডে রীতিমত স্বচ্ছল বহিম। নাম, বাহাদুব তামাং। নেপালেব নযাকোট জেলাব ঘিয়ন-ঘেবি গ্রামেব আদমি। সোর্স অব ইনকাম কী জানো,—আই মিন তোমার ইনভেসটিগেশনেব ক্যাপশন অনুযাযী পেশা?'

'না বললে কী কবে জানব?'

'বেপুটেড দালাল বেছে বাকি দুটো মেযেকে মুম্বাই পাঠালো। ইয়েস ছ মেযেব বাপ্ এই-তামাং ব্যাটা। চাব মেযের মধ্যে তিন মেযে মুম্বাই রেডলাইট এবিয়ায খাটে, আব একজন তো আমাদেবই সোনাগাছিতে। মেযেদের পাঠানো পযসাতেই বাপেব এখন চালচুলো পিবেন পিন্ধন। সামাজিক বেপুটেশন।'

'মানে!'

'ইয়েস হিস একসেলেন্সি। শুধু নযাকোট জেলা নয়, সিন্ধুপালচক

চিতওয়ান মাকানপুর কামকি তানাহু সব কটা জেলার গ্রামেব মানুষগুলোব সামাজিক সম্ভ্রম হু হু কবে বেড়ে যাচ্ছে এই একটা ইস্যুতে। গ্রামগুলোর নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মানুষ তো-সুদখোব মহাজনদেব কাছে ধাবী। যে শালা মহাজন আগেব মুহূর্তেই যদি কাউকে বলে থাকে তাকে আব ধাব দেবে না, কোন ভাবে যদি জেনে যায় ওই শালা ধাবীব মেয়ে মুম্বাই বা কলকাতার খাটে তাহলে দ্বিরুক্তি না কবেই বটুয়া খুলে রুপেয়া গিনতিতে লেগে যাবে ফিন দেনে কো লিয়ে। ইয়েস দিস ইজ বিয়্যালিটি—দালালদেবও কী সামাজিক মর্যাদা বেড়ে গেছে জানো।'

অনেকক্ষণ ধবেই সোডা মেশানো পানীয়েব গ্ল্যাসটা সামনে পড়েছিল। সুদর্শন সান্যাল আব দেবি কবে না, এক নিঃশ্বাসেই পেটের মধ্যে উপুড় কবে দেয়, এবং এই এক গ্ল্যাসেব মধ্যেই মাথাব মধ্যে কেমন যেন এক চক্কব লেগে যায়। তবু দৃষ্টিটাকে ধবে বাখতে চায় বাহাদুব তামাং নামেব লোকটিব দিকে।

'হাই সানিয়েলদা হাই। তুমি তো থিয়োরিঝাড়নেবালা পার্টি। কিছু থিয়োবিজাইশনে আসতে পাচ্ছ? খুঁজে পাচ্ছ কোনও স্যোশ্যাল মবিলিটিব দিক? নেপালের মেয়েবা বছবেব পয বছব মুম্বাই কলকাতা চেন্নাই'এর রেডলাইট এবিয়ায আসে। নতুন কিছু, নয। চুপিসাবে আসে, কখনও বা হাফগেবস্ত কায়দাতেও আসে। কখনও কিন্তু এভাবে সোশ্যাল অ্যাপ্রুভাল নিয়ে আসে না, আসেনি।'

উঠে দাঁড়ায সুদর্শন সান্যাল। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত সদর্শনেব হাতেব পোঁছা ধবে টান দিয়ে বলে ওঠে,

'এর মধ্যে কোথায উঠছ? উলুবনে মুক্তো ঝবালাম না কি? অন্তত দুটো গ্ল্যাস খাইয়ে মাইবি সেলামটা জানিয়ে যাও।'

সুদর্শন আশপাশটা দেখে। প্রণবেন্দু আছে, অথচ ছেলেছোকরাবা নেই তা তো হবাব নয। এতক্ষণ সম্বিত ছিল না তাই দেখতে পায়নি। বীতিমত উঠতি বযসীদেব ভিড়েব মধ্যেই পড়ে গেছে। উঠে দাঁড়াবাব সময তাব বোমকূপ-গুলো দিয়ে হলকাই ছুটছিল, এখন সেটাই উল্টে যায, শীত-শীত অনুভূতিতে। ক্রমশ একটা হি হি কাঁপুনিই যেন তাকে জড়িয়ে ধরতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

বেয়ারা সামনে এসে দাঁড়ায়। তাব এক হাতে 'হোযাইট মিসচিফ' এর একটা বোতল। অন্য হাতে কয়েকটা গ্লাস। মাসকাবারি পেমেন্ট, সুতরাং একে

ঝটকায় ওই 'হোয়াইট মিসচিফ'-এর বোতলটা টেনে নিয়ে প্রণবেন্দু দাশগুপ্তের হাতে গুঁজে দিয়ে টলতে টলতে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়।

হাউসের গাড়ি এখন পাওয়া যাবে না। সুতরাং ট্যাক্সি ডাকে।

ট্যাক্সি বাড়ির গলির পথে ঢুকতে গেলেই নড়েচড়ে ওঠে সুদর্শন। আর একটা ট্যাক্সিই যেন তার বাড়ির সামনে সেকেন্ডের জন্যে ঘুরে দেবদ্যুতিকেই নামিয়ে দিল না! ট্যাক্সির ভেতর থেকে এক সুবেশা মহিলা হাত নেড়ে টা টা'-ও যেন করল! ভাবতে ভাবতেই একটা পারফিউমের গন্ধও উড়ে এসে লাগল নাকে।

ট্যাক্সি থেকে নেমে কয়েক সেকেন্ড ইচ্ছে করেই দাঁড়িয়ে থাকে সুদর্শন। সময় নিয়ে গুনে গুনে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলে।

এক তলাটা বসার ঘর। ছোট্ট লাইব্রেরি। ডাইনিং কর্ণার। কিচেন। উপর তলায় পাশাপাশি নিজেরই দুটো ঘর। মধ্যেরটা গেস্টরুম। একেবারে কোণেরটা ছেলে দেবদ্যুতির।

অন্যদিন হলে টকটক করে নিজের ঘরেই চলে যেত।

আজ লাউঞ্জের টেবিলেই অ্যাটাচিটা সন্তর্পণে রেখে নিঃশব্দে বসে থাকে।

'তুমি!'

দরজা বন্ধ করতে এসে মহামায়া তাকে দেখে চমকে ওঠে।

'না। শরীরটা ভাল নেই। বড্ড ক্লান্ত লাগছে। তাই একটু বসে আছি।'

দেওয়ালঘড়ির কাঁটার দিকে তাকে তাকিয়ে উদ্বিগ্নতাটা আরও বেড়ে যায় মহামায়ার 'সে কী! ডাক্তারকে ডাকবো! এই দ্যুতি—দ্যুতি—বাবার শরীরটা খারাপ করছে একবার ডাক্তার সেনকে—দ্যুতি তো এখনই ফিরল—'

'আঃ, কী চ্যাঁচামেচি আরম্ভ করলে. আমার কিছু হয়নি বলছি।'

নিজেকে ঝেড়ে ফেলে স্বাভাবিক হয়ে উঠতে চায় সুদর্শন সান্যাল। 'দ্যুতি তো আমার কিছুটা আগেই একটা ট্যাক্সি থেকে—একজন মহিলা নামিয়ে দিয়ে সেই ও ট্যাক্সিটাই নিয়ে চলে গেল দেখলাম।'

ঢোক গিলে গলার স্বরটাকে যতদূর সম্ভব নিচে নামিয়েই মহামায়া বলে, 'ওই মেয়েটির সঙ্গেই তো এখন কী যেন করছে। এক একদিন মেয়েটি বাড়ি থেকে গাড়ি করে তুলে নিয়েও যাচ্ছে।'

'মেয়েটি কে?'

'কী একটা বিজনেস যেন করে। সেক্টর না কাস্টমার কী একটা স্পেসিফিকে—

শনের কাজে খুব ঘোড়দৌড় করাচ্ছে দ্যুতিকে। অবশ্য নিজেও যে খাটছে না, তা নয়। আমি তো বলে যাচ্ছি, দ্যুতিকে মুখ বুজে করে যা, কোনও কিছুতে ব্যোব হবি না। যদিও মেয়েটা একটু দেমাকি আর ফর্মাল। সেদিন হর্ন বাজিয়ে ডাকাডাকি করে চলছিল,—আমি এগিয়ে গিয়ে নামতে বললাম, একটু রেস্ট নিয়ে যাবার জন্যে, কিন্তু কিছুতেই না।'

দ্যুতি এসে দাঁড়ায়। সিঁড়ির রেলিঙে তার হাত। মা'র উদ্বিগ্ন গলার ডাক আগেই তার কানে পৌঁছেছিল।

সুদর্শন অপলক চোখে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে।

কোনও কারণে কোনও বিশেষ মুহূর্তে ছেলের প্রতি বাবার বাৎসল্যের ভাবটা একটু অতিরিক্ত হতেই পারে। কিন্তু ইদানীং মহামায়া যেন সে-ভাবে বিশ্বাসই করতে পারে না সুদর্শনকে। দুদিন তো ক্রমাগতই পাল্টে যাচ্ছে। জট ছাড়িয়ে অবস্থাটা ভাল করে বুঝে নেবার জন্যে দরকার অনেকটা সময়ের। আগে সময়টা পেত সঙ্গমকে মধ্যে রেখে, এখন শরীর আর সে-ধকল বইতে পারে না। আজ সেই সময়কে পেতেই ফুল্ল গলায় মহামায়া ছেলের উদ্দেশে বলে ওঠে,

'তোর বাপি যখন আজ তাড়াতাড়ি ফিরেছে তখন আয় তিনজনে একটু তাড়াতাড়িই খেতে বসে যাই।'

'আজ আমি কিছু খাবো না তখনই বললাম না। অনিমা কাহালির সঙ্গে তাজ বেঙ্গল থেকে ফিরছি। ডিনারটা সেরেই এসেছি।'—দেবদ্যুতি আর দাঁড়ায় না।

মিনিট খানেকের মৌনতা কাটিয়ে ফিসফিসে গলায় মহামায়া বলে ওঠে,

'হ্যাঁ গো কাহালিরা কী ব্রাহ্মণ?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি তো দেখলে, তোমার ছেলের থেকে একটু যেন বড়ই লাগে না?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক কত বড় হবে মনে হয়, দু তিন বছর? না—'

'যতই বড় হোক আই অ্যাম ডেফিনেট মেয়েটির এখনও মাসিক বন্ধ হয়নি।'

খেউড়ে কথা নিয়ে দাবড়ে উঠতে পারত মহামায়াও, তার বুকে বিষ জ্বালা কিছু কম নয়, কিন্তু চটজলদি নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারে না। ধস্তাধস্তি তো কম দিন ধরে হচ্ছে না। ঝাড়পোঁছ করে একের পর এক সাজিয়ে নেয় সে-সব দিনগুলোর কথা। মুখ ছোটায় খাওয়ার টেবিলে,

'এখন টেনশনে ভুগলে কী হবে। এ-সবের জন্যে তোমার দায় তো কিছু কম নয়। তোমাকে তো পই পই করে কত বলেছি,—যা হোক করে হোক বাইরে পাঠিয়ে দাও,—যত টাকা লাগে লাগুক,—দিনকালের যা দস্তুর। আর সত্যি যদি মনে করো বস্তুহীন মাকাল তোমার ছেলে, তবে ইনফ্লুয়েন্স খাটিয়ে দাঁড়ে বসিয়ে দাও,—বরাদ্দের দানাপানি খুটে খাক। তখন কতই না বেদব্যাসের বাণী আওড়ে চললে,—দাঁড়ে বসিয়ে দেবার যুগ নাকি আর নেই, আর ওই বরাদ্দের ছাতু জল ছোলাতেই বা ওর চলবে কেন? দুধ ভাতের বন্দোবস্তে থাকতে থাকতে নিজেকে অন্য স্ট্যাণ্ডার্ডে বেঁধে ফেলেছে। দুধ ভাতের সেই বন্দোবস্তই ওকে ওকে খুজে নিতে হবে। আজকের দিনে ডাক্তারি ইঞ্জিনিয়ারিংই একমাত্র বিদ্যে নয়। নিজেকে আবিস্কার করাই আসল।—নিজের মধ্যে যেটা আছে ঠিক সেটা নিয়েই পায়ের তলাকার মাটি খুজে নিতেহবে।—তাই ছেলে নিচ্ছে। কষ্ট পেলেহবে কী করে?—খুব কষ্ট পেলেভেবে নিতে হবে সবটাই স্টপ গ্যাপ।—ইনট্যারিম।'

কোনও উচ্চ বাচ্য না করে খাওয়া শেষে নিজের ঘরে ফিরে এসে সুদর্শন ডায়োজিপামের স্ট্র্যাপ থেকে অতিরিক্ত একটা ট্যাবলেট টপ করে মুখে ফেলে টেবিলে রাখা বাকি জলটা ঢকঢক করে খেয়ে নিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। যতক্ষণ না ঘুম আসে ততক্ষণ শুধু নিজেকে ধিক্কার দিয়ে যায়, তুচ্ছ ব্যাপারটা নিয়ে তার অকারণ কাতরতার জন্যে, সম্ভবত 'দুধ ভাতে' এই কথাটিই তীক্ষ্ণধার ফলা হয়ে মগজে ঢুকে গেছে। না, কোন ভাবে আর প্রশ্রয় দেবে না, কাজের কাজটা গুটিয়ে নিয়ে একেবারেই ইতি টেনে দেবে।

রাতের নিটোল ঘুম সকালের কৃত্যগুলি স্বাভাবিক ভাবেই সম্পন্ন করে ঠিক সময়েই পত্রিকা হাউসে আসে সুদর্শন। দরজায় যথারীতি এসে দাঁড়ায় তুহিন বড়াল।

'স্যর! আমি ওদের নিয়ে এসেছি।'

'নিয়ে এসেছেন! কোথায়?'

'ভিজিটরস রুমে বসে আছে।'

ভিজিটরস রুমটা অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরের ঘরের ঠিক দক্ষিণে। ঘরটার জ্যামিতিক অবস্থানের জন্যে আসা যাওয়ার পথে ঘরটায় চোখ যায়ই। চোখের সেই দেখাটাই আচমকা বুকে ধাক্কা মারে। রিবক অ্যাডিডাস বাটার সব সুন্দর সুন্দর জুতো, জিনসের বাহার, শ্যাম্পু করা চুল, আফটার শেভিং লোশনের মন মাতানো গন্ধ।

তাহলে ওদের সব এক এক করে ডাকি, না আপনিই একটু কষ্ট করে গিয়ে একই সঙ্গে সবাইকে দেখে নেবেন। সেকেলে ভেড়ুয়ার একেলে সংস্করণ-দুধে ভাতে।'

'দুধে ভাতে।'

'মানে, এটাই তো লাইনের ওদের ব্র্যান্ড নেম। কথা বললেই বুঝতে পারবেন ওরা শুধু ফেবারেবলুকিং ফ্যাশানবলই নয়,—সবাই দস্তুর মতো কালচার্ড,—পেডিগ্রিও কারও কিছু কম নয়,—দু একটা বিষয়ে প্রশ্ন করে দেখুবেন একেবারে হীরের ছটা ঠিকরোবে। কি করা যাবে স্যর। চারিদিকে রাজসূয় যজ্ঞের ওয়র্ম আপ চলছে না।—গঙ্গায় চলছে সিলভারজেট ক্যাটামারান।'

'শুনে আসুন তো ওদেরই একজনের নাম দেবদ্যুতি সান্যাল কি না?'

এতক্ষণ তুহিন বড়ালের দৃষ্টি জেদি মাছির মতোই সুদর্শনের মুখের রেখায় রেখায় ঘুরছিল, এবার হিংস্র ডাঁশ হয়েই যেন মুহূর্তের মধ্যে ফেংলানো চোখের দুই মণির রক্তরস শুষে নিতেই বিশ্রী কোলাহল জুড়ে দেয়।

'নু নু। তা হবে কেন? একজনের নাম অনুপ বর্মণ, একজনের নির্মল চক্রবর্তী, একজনের বীতশোক ভট্টাচার্য, শুমৌলি বোস, উৎপলেন্দু মিত্র,—নামগুলো অনলি ফার্স্ট ইয়োর ইনফর্মেশন।—'

'খুব খারাপ লাগে না তুহিনবাবু এ সব মেনে নিতে? চোখ তুলে দেখতে? এক এক সময় যন্ত্রণা মানুষকে মূর্চ্ছিত না করে খেপিয়েই তোলে। নিমেষে বদলে যাওয়া মানুষের মধ্যে খ্যাপামির লক্ষণগুলো দেখেই তোতলাতে থাকে তুহিন বড়াল, 'তা-তা তো লাগবেই। লাগবে না। কত ফুলের মতো সব ছেলে কী ভাবে জীবনটা শুরু করছে বলুন তো!'

'তবু তো মেনে নিচ্ছেন। এগুলোকেই নেড়েচেড়ে কামিয়ে নেবার ধান্দা করে যাচ্ছেন?'

'স্যর!'

ঠক্ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে যায় সুদর্শন সান্যাল। এখনও তো কিছুই জানে না মহামায়া। জানবে,—নিশ্চয় জানবে। তখন কী করবে? মেনে নেবে কী ভাবে? ইনট্যারিম পিরিয়ড্ বা স্টপ গ্যাপের সান্ত্বনায় নিঃসাড়ে মেনে নেবে না; ভাবতে ভাবতে খুব দ্রুত পায়েই বেরিয়ে যায় নিজে ঘর থেকে সুদর্শন সান্যাল।

আয়না

নীরদ রায়

—কি গো, কি লিখেছে চিঠিতে, কবে আসবে—

—না তেমন কিছু না—

খুবই সংক্ষিপ্ত জবাব সজলের। রত্না যেন খুশি হতে পারে না সজলের কথায় এবং ওর কৌতুহল ওকে আর এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। টী টেবিলের একপাশে বিকেলের জল খাবার ও চায়ের কাপ রেখে সজলের হাত থেকে ছোঁ মেরে চিঠিটা নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। আগামীকাল আবার দেখা হবে বলে সজলের শরীর থেকে সারাদিনের ক্লান্তি আর অবসাদ ততক্ষণে বিদায় নিতে আরম্ভ করেছে। জল খাবার খেতে খেতে সজল দু একবার তাকায় রত্নার দিকে। চিঠিটা পড়তে পড়তে রত্নার মুখের ভূগোলে যে পরিবর্তনের রেখাগুলি ফুটে ওঠে সজল তা ভালো করে লক্ষ্য করে। এরকমটা যে হবেই সজলের অনুমান ওকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলো! চোদ্দ পনেরো লাইনের তো চিঠি, সেটা শেষ করতে রত্নার এতো সময় লাগার কথা নয়। তাহলে চিঠিটা রত্না দুতিনবার করে পড়ছে এই রকম একটা কৌতুহলের সামনে এসে পড়ে সজল—

—কি হলো, ঐ টুকু চিঠি পড়তে এতো সময় লাগে নাকি—

চিঠিটা পড়ার পর রত্নার হাসি খুশির লম্বাটে মুখটায় হঠাৎ যেন একটা দীঘল ছায়া এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। শুধু ছায়া নয়, ছায়ার পেছন পেছন একটা গুমট ভাবও এসে থামে মুখটার বাঁ পাশে। বঙ্গোপসাগরে হঠাৎ করে নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা বা মেদিনীপুরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যে ধরণের গুমটভাব দেখা দেয় ঠিক সেই রকম। অর্থাৎ যে কোনো সময় পঞ্চাশ ষাট কিলোমিটার বেগে ঝড়ো হাওয়া তার সঙ্গে বৃষ্টিও আসতে পারে। রত্না চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে সজলের কথার কোনো জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে চলে যায় শোয়ার ঘরের দিকে। চিঠিটা পড়ার পর রত্নাকে যে বিষাদ নামক একটা বস্তু এভাবে চারপাশ দিয়ে ঘিরে ধরবে সজল জানতো। সজল এও জানতো রত্না এখন শোয়ার ঘরে গিয়ে একটা এলবাম বের করবে, এলবামের দু তিনটে পাতা উলটিয়ে ছেলে মানে সুমন্তর ফোটোর সামনে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকবে চার পাঁচ মিনিট। ফোটোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে চোখের পাতাদুটি

তার এক সময় বেশ ভারী হয়ে উঠবে। গলার স্বর যাবে পাল্টে। চলাফেরায় এসে যাবে একটা মন্থর গতি। পৃথিবীটা বড় স্বার্থপর এখানে কেউ কারুর জন্যে নয় এই রকম একটা দার্শনিক চিন্তা ভাবনার ছায়া রত্নার চোখে মুখে ভেসে উঠবে। এক দুই করে সজল এ সবও জানতো। জেনেও চিঠিটা রত্নাকে না দিয়ে উপায় ছিল না। আজ কদিন ধরেই রত্না ছেলের চিঠির জন্যে প্রায় খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে বসে আছে। দিনে অন্তত তিন চার বার সজলকে বলবেই—কি গো সুমনের চিঠি এসেছে নাকি, কতদিন ওর চিঠি পাই না, আমি নিজেও বেশ কখানা চিঠি লিখলাম তারও কোনো উত্তর নেই, অসুখ বিসুখ করলো নাতো, নাকি অফিসের কাজে বাইরে কোথাও গেছে,' তুমি যদি পারো অফিস থেকে একটা ফোন করে দেখ না—।" সজল নিজেও মাসে দু তিন খানা করে চিঠি লেখে ছেলেকে। অফিস থেকে মাঝে মধ্যে ফোনও করে, কোনোবার পায় কোনোবার পায় না। কখনো কখনো অফিসের সহকর্মীরা ফোন ধরে বলে-'অফিসের কাজে বাইরে গেছে—।' সুমন অফিসের কাজে ছাড়া এভাব বাইরে যায় না কি বাবা-মাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে একটা সূক্ষ্ম অভিনয়। সজল কয়েক শ কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে থেকে এসব বুঝতে পারে না কিছুই। সজলের ভেতরেও একটা ব্যথা মাঝে মধ্যে গুমড়ে ওঠে। মাঝে মধ্যে ওর গলার স্বরও ভারী হয়ে আসে। এখন এই আলো বাতাস ঘর সংসার অফিস কাছারি কি রকম তেতো মনে হতে থাকে সজলের। প্রিয়জন বা বন্ধুবান্ধব কোনো দিকেই আর বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পারে না। ও আস্তে আস্তে একা হয়ে যায়। রাস্তা-ঘাটে কোনো বাবা মা তাদের ছেলেকে নিয়ে বিকেলবেলা ঘুরতে থাকলে-সজল নির্জন জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে হাভাতের মতো তাকিয়ে থাকে সেই দিকে। এ সব কথা রত্নাকে ও বলতে পারে না, নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখে।

চা ও জল খাবার খেয়ে সজল এবার এসব টুকরো টুকরো ভাবনা থেকে উঠে দাঁড়ায়। শোয়ার ঘরে ঢোকে। শোয়ার ঘরের টেবিলে রাখা সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে জ্বালায়। রত্না বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে আছে। যেহেতু মুখটা দেয়ালের দিকে ফেরানো তাই সজল রত্নার মুখটা দেখতে পায় না। কাঁচাপাকা চুলগুলি অর্ধেকটা পিঠে আর অর্ধেকটা বিছানায় এলোমেলো ভাবে ছড়ানো। সমস্ত শরীর জুড়ে একটা বিষণ্ণতার প্রতীক। সজল বিছানার এক পাশে গিয়ে বসে পড়ে। সজলের হাত নয় যেন এক টুকরো মমতা রত্নার পিঠে নিয়ে থমকে দাঁড়াল। অন্য সময় হলে রত্না-এই কি হচ্ছে, বলে তক্ষুনি

বিছানা থেকে উঠে বসতো। রত্না কিন্তু আজ পাশ ফিরেও তাকালো না। সজল অনুভব করে ও যেন কোনো রক্তমাংসের শরীরে হাত দেয় নি, হাত দিয়েছে একটা ধিকিধিকি ব্যথার ওপর। আরো কিছুক্ষণ এইভাবে বসে থেকে সজল বিছানা থেকে সরে আসে। আর একটা সিগারেট জ্বালিয়ে তাতে দু তিনটে টান দিয়ে বলে ওঠে—

—কি করবে বল, সবি আমাদের ভাগ্য—

সজল রত্নার দুঃখ যন্ত্রণার অংশীদার হতে চায়। রত্নার মধ্যে তবু কোনো প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায় না। ও যেভাবে শুয়েছিলো সেভাবেই শুয়ে থাকে। সজল আর একটু এগিয়ে নিয়ে ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে—

—তোমাকে না জানিয়ে আমি ও তো কম চিঠি লিখি না ওকে—

—মা হিসেবে আমি কি কোনো অন্যায় করে ফেলেছি—

সজলের কথার মাঝখানে হঠাৎ এই ভাবে জেগে ওঠে রত্না। বিছানায় উঠে বসা রত্নার দিকে দু একবার তাকায় সজল। চোখ দুটো লাল হয়ে ফোলা, যে কোনো মুহূর্তে শ্রাবণের বৃষ্টি হয়ে নামতে পারে। সজল আরো দু একবার রত্নার দিকে তাকিয়ে সান্ত্বনার ভাষা খুঁজতে থাকে—

—বাবা মা হিসেবে আমরা তো দায়িত্ব কর্তব্যে কোনো অবহেলা করিনি বরং আর দশজন বাবা মা যা করে থাকে ছেলের জন্যে, আমরা তার থেকে একটু বেশিই করেছি—

—তাহলে, তাহলে কেন এই দুঃখ যন্ত্রণা—

এসব কথার জবাব সজলের জানা নেই। সান্ত্বনার ভাষাও অনেক সময় চট করে খুঁজে পাওয়া যায় না। এখন বোবা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। সজলেরও সেই অবস্থা। সব বাবা মাই আশা করে ছেলে বাইরে কাজ করলেও মাঝে মধ্যে ছুটি ছাটা নিয়ে বাড়িতে আসবে। মাসের অধিকাংশ দিন শূন্যতায় ভরে থাকা ঘর বারান্দাগুলি একদিন ছেলের কথাবার্তা আর হই হুল্লোড়ে ঝনঝন করে বেজে উঠবে। বাবা মার জন্যে এটা ওটা এনে বলবে 'তোমার জন্যে এটা, ওটা মার জন্যে—।' কিন্তু বাস্তবে এসব কিছুই হয় না। সজল রত্নার কল্পনায় আঁকা এই দিনগুলি ক্রমেই দূরে সরে যেতে থাকে। সুমন্ত জলপাইগুড়ি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতে করতেই কেমন যেন আরছা হতে আরম্ভ করে। গ্রীষ্ম বা পুজোয় কলেজ বন্ধ হওয়ার চার পাঁচ দিন পর বাড়িতে আসা কিংবা কলেজ খোলার দুদিন আগেই

চলে যাওয়া-ছেলের এই ব্যবহার সজল রত্না কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। অথচ কিছু করারও থাকে না। কলেজ বন্ধ হওয়ার চার পাঁচদিন পর কেন সে বাড়িতে এলো জিজ্ঞেস করলে ছেলের চট জলদি জবাব-এই বন্ধুদের সঙ্গে একটু পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম—।' ছেলের আসার পথ চেয়ে বাবা মা যে প্রতীক্ষায় বসে থাকে, অনেক রাত পর্যন্ত দরজা জানালা বন্ধ করতে পারে না ঠিক মতো অনেক ভালো মন্দ রান্না বান্না বা খাওয়া দাওয়া এমন কি হাসি ঠাট্টা ও তুলে রাখে ছেলের বাড়ি ফেরার দিনগুলি জন্যে, কোনোদিন এমন ভাবনা যেন ছেলে সুমন্তকে স্পর্শই করতো না। দায়িত্ব কর্তব্য সবার সমান থাকে না কিন্তু বাবা মার প্রতি যে একটা টান বা তাগিদ সেটারও অভাব দেখে মাঝে মধ্যে কি রকম উদাস হয়ে যেতো রত্না। তখন ওলট পালোট হয়ে যেতো তার প্রতিদিনের কাজ কর্মের ধারা।

চৈত্র মাসের বিকেল বেলাটা সবে গিয়ে সন্ধ্যের আবছা ভাবটা যেন ডানা মেলে নামতে আরম্ভ করে। এই আবছার ভেতর শোবার ঘরে বিছানার একপাশে সজল আর প্রায় মাঝখানটার পা ছড়িয়ে রত্না। সজল একমনে ভেবে যাচ্ছিলো এসব। রত্না কি ভাবছিলো সেই জানে। হঠাৎ এক সময় রত্না তার দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া শরীরটাকে নিয়ে আস্তে আস্তে বিছানা থেকে নামে।

সুইচ বোর্ডে হাত দিয়ে বলে ওঠে—

—সব আমাদের কপাল—

ঘরে আলো জ্বলতেই ঘরের মধ্যে দণ্ডায়মান আবছা ভাবটা দূর হয়। কিন্তু বিষাদের তেতো ভাবটা থেকে যায় আগের মতোই। রত্না আস্তে আস্তে অন্য ঘরগুলিতে গিয়েও আলো জ্বালে। হাত মুখ ধুয়ে ঠাকুরঘরে ঢোকে। সজল দু একবার ঘরের মধ্যে পায়চারি করে চলে আসে উত্তর দিকের এক চিলতে বারান্দায়। একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ে তাতে। বারান্দায় এসেও রেহাই পায় না সজল, ছেলে সুমন্তর মুখটা চিন্তাভাবনায় বারবার ভেসে ওঠে। ছেলের কথা মনে হওয়াতেই সজল এবার মার স্মৃতিতে চলে আসে। দুই ভাই এক বোনের মধ্যে সজলই তো ছিলো বড়। সহায় সম্বলহীন বিধবা মার প্রধান ভরসা ছিলো সজল। তাই অনেক সময় ছোটভাই বোনদের এড়িয়ে ভালো মন্দটা বিধবা মা তুলে রাখতেন সজলের জন্যে। সজল এসব বুঝতো না তা নয়। এই নিয়ে অনেকদিন প্রতিবাদ করেও কোনো ফল হয়নি। হয়তো বিধবা মা ভাবতেন বড় ছেলে এবং পড়াশোনায় ভালো এই হিসেবে সজলই একদিন পুরো

সংসারটার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিবে। সজল কিন্তু মার এই আশাটা পূরণ করতে পারে নি। চাকরি পাওয়ার পর ভালোবেসে বিয়ে করেছিলো রত্নাকে। রত্না এই সংসারে এসেই রুগ্ন সংসারটাকে আগলাবার চেষ্টা তো করেইনি বরং দু এক মাস যেতে না যেতেই মা ভাই বোনদের মিলিঝুলি সংসারে মুঠো মুঠো ছাই ফেলতে আরম্ভ করে। সজলকে নিয়ে রত্না বাড়ির মধ্যেই একটা আলাদা বিভাজন রেখা টানতে আরম্ভ করে। এই নিয়ে প্রায় প্রতিদিন রাতিরে শোয়ার ঘরটা হয়ে ওঠে সজলের সঙ্গে রত্নার তর্কাতর্কির কুরুক্ষেত্র। সজলের মার বয়স্ক চোখে এসব নিখুঁত ভাবে ধরা পড়তে থাকে। হাসি খুশির মুখটা তাঁর কয়েক মাস যেতে না যেতেই হয়ে ওঠে পাথরের মতো শক্ত। সামনে আরো বিপর্যয় আছে এই ভেবে উনি কলেজ পড়া মেয়ের তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা করেন। সেজো ছেলেকে বাড়ির সামনে একটা ঘর করে মুদিখানার দোকান দিয়ে বসান। প্রকাশ্যে নয় একটু গোপনে রত্নার অবর্তমানে মার সঙ্গে সামান্য দু একটা কথা হতো সজলের। রত্নার হাত ঘুরে যে টাকাটা প্রতি মাসে মার কাছে পৌঁছোতো তার থেকে একটু বেশি দিতে চাইলে সেটা দিতে হতো সজলকে গোপনে। মা ছেলের এই পরিণতি বা অসহায় অবস্থা দেখে ভেতরে ভেতরে দ্রুত ক্ষয়ে যেতে আরম্ভ করেন। ভদ্রলোকের স্বভাব অনুযায়ী অশান্তিও ঝামেলার ভয়ে সজল নিজে সব কিছু জেনেও বোবা কালা হতে থাকে। দু রকম বিপরীত মুখে সংসারটা চলতে থাকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। এভাবে চলতে চলতেই একদিন সশরীরে বিপর্যয় সামনে এসে হাজির-এই পরিবেশে ছেলের পড়াশোনা হবে না, ছেলেকে মানুষ করা যাবে না-রত্না তার দাবিতে অনড়-এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতেই হবে। বিয়ের ক' বছরের মধ্যেই সজলের সমস্ত পছন্দ অপছন্দ ভালো মন্দ এমন কি ব্যক্তিত্ব তার অসাবধানতায় শুষে নিয়েছে রত্না। সজল তখন একটা খোলস আর কিছু নয়। কিছু করার থাকে না তার। একদিন সত্যি সত্যি মা ও ভাইদের চোখের জলে ভাসিয়ে সজল তার বউ আর ছেলেকে নিয়ে চলে আসে অন্য পাড়ায়। অন্য পাড়ায় অন্য পরিবেশে এসে রত্না তার সংসারটাকে সাজিয়ে নেয় নিজের মতো করে। ছেলেকে তিনটে মাস্টার দিয়ে পড়াতে আরম্ভ করে ইংরেজী মিডিয়াম স্কুলে। দিন মাস ঘুরে বছর যায়, ছেলে সুমন্ত বড় হতে থাকে। কখনো বাবার সঙ্গে কখনো বা গোপনে ও মাসে একাধিকবার ঠাকুরমার কাছে যায় সুমন্ত, নারকেলের নাড়ু অথবা মুড়ির মোয়া খেয়ে আসে। সুমন্ত আগে বড় হয়ে স্কুল ছাড়িয়ে চলে যায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে। কখনো কাছে

থেকে কখনো বা একটু দূর থেকে সজল লক্ষ্য করতে থাকে, রত্না ছেলেকে যতটা জড়িয়ে ধরতে চায় ছেলে যেন ততটাই পিছিয়ে আসে। এরই মধ্যে সজল পি এফ, এল আই সি থেকে লোন নিয়ে একটা ছোট্ট বাড়িও করে ফেলে। বাড়ির কবার খরচে ছেলে যতটা আনন্দিত হয় তার থেকে অনেক বেশি আঘাত পায় ঠাকুরমার মৃত্যু সংবাদে। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে বেরিয়ে সুমন্ত চাকরি পেয়ে চলে যায় দুর্গাপুরে। যা ছিলো এতদিন অনুমাননির্ভর সেটাই এক সময় হয়ে ওঠে বাস্তবের কঠিন সত্য।

—তুমি কি একটু চা খাবে—

বত্নার দিকে মুখ তুলে তাকায় সজল। কোনো কথা হয় না, চোখের ভাষায় চায়ের সম্মতি জানায় কেবল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যেবেলাটাও বাষ্প হয়ে উড়ে গিয়েছে, সজল খেয়াল করেনি। আসলে ও তো তখন রাত্রির দিকে তাকিয়ে ছিলো না ররং অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো অতীতের দিকে। সজল এবার একটু উঠে দাঁড়ায়। ঘরে ঢোকে। শোয়ার ঘর থেকে উঁকি মেরে রত্নাকে দেখার চেষ্টা করে। রত্না তখন রান্না ঘরে গ্যাসের আগুনের মুখোমুখি। সিগারেটের প্যাকেট নিয়ে সজল ফের চলে আসে বারান্দায়। ফের রাত্রি এবং অতীতের মুখোমুখি। কিছুক্ষণ পর রত্না দু কাপ চা নিয়ে হাজির হয় বারান্দায়। এক কাপ চা সজলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে একটা মোড়া নিয়ে বসেপড়ে সজলের পাশে।

—কত করে চিঠিতে লিখলাম নববর্ষে বাড়িতে আসিস বাবা, দু দিন থেকে আবার চলে যাবি। ওর জন্যে তন্তুজ থেকে গরদের একটা পাঞ্জাবি কিনে রেখেছি, পায়েস করবো বলে একটু একটু করে দুধ জমাচ্ছি, ভালো চাল কিনে রেখেছি পাঁচ কিলো, দু কিলো খেজুরের গুড় আরো কত কি—

—কি করবে বল—

সজলের কথার কোনো জবাব না দিয়ে রত্না ফিরে যায় তার নিজের কথায়—

—শেষে চিঠিতে লেখে না যেতে পারছি না, বন্ধুদের সঙ্গে সিমলায় ঘুরতে যাচ্ছি। এই ছেলেকে আমি পেটে ধরেছিলাম—এক বারো কি মাটাকে দেখতে ইচ্ছে করে না তার—

সজল চুপ করে থাকে। কিছু বলতে পারে না। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা তার

গলাতে এসে আটকে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ বন্নাও কোনো কথা বলে না। কথাগুলি যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস হয়ে বেরিয়ে যেতে থাকে। শুধু একবার সজলের চোখের সামনে তার মার ভাঙাচোরা মুখটা হঠাৎ হঠাৎ ভেসে ওঠে। মাও তো একদিন ওকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখতো, ছিলো কত আশা আকাঙ্ক্ষার রঙীন ছবি। শেষে সেই মাকেও কথা বলতে হতো দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সাহায্যে।

এরপর ওরা অনেকক্ষণ কেউ কোনো কথা বলতে পারে না। শুধু রাত্রি আরো ঘন হতে থাকে নিঃশব্দে।

আলো-অন্ধকারে যাই

লীলা গঙ্গোপাধ্যায়

এই একটু আগেও কড়া রোদ ছিল। এরই মধ্যে কে যেন খুব সাবধানী পায়ে আলগোছে একটু একটু করে তার যাদুকাঠি ছুঁইয়ে নরম করে দিল রোদটাকে। রোদ্দুর এখন ক্রমশ গলছে। তাই ছাদের ওপর জায়গায় জায়গায় ছায়ার খেলা। কার্নিশে নকশাকাটা জাফরির ছায়া লম্বা হয়ে পড়ে আছে ছাদের মেঝেয়। সেই ছায়া একটু একটু করে দীর্ঘ হচ্ছে। কোণের দিকে ফুলে ফুলে ছেয়ে যাওয়া মাধবীলতা গাছটায় আলগা একটুকরো রোদ্দুর ঝুলে রয়েছে। সব মিলিয়ে ঘন হয়ে আসা বিকেল। স্বর্ণময়ী রোদে দেওয়া বড়ি আর আচার তুলতে এসেছেন। পাতলা শাদা কাপড়ের ওপর দুধ শাদা পোস্তর বড়ি। সুধাময় ভালবাসে। বুদ্র ভালবাসে। ছুটি এসে স্বর্ণময়ীর পাশে বসল। হাতে চিরুনি—'ঠানদি, চুল বেঁধে দাও।' এই কাজটা প্রায়ই করতে হয় স্বর্ণময়ীকে। মেয়েটার চুলও তেমন। দেখবার মতো। আজকালকার মেয়েদের এই রকম গোছ। লম্বায় চুল দেখা যায় কই? হাঁটু ছুঁই ছুঁই কোঁকড়ানো ঝুপসি চুলগুলো বেচারি একা সামলাতে পারে না। স্বর্ণময়ী আচারের শিশিটা কোলের কাছে নিয়ে এলেন। বললেন—'আজ দুপুরে আচার চাইলি না যে বড়? ছুটি স্বর্ণময়ীকে জড়িয়ে ধরল—'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম,' গলায় অভিমানের ছোঁয়া· 'তুমি-ই বা ডাকলে না কেন?' স্বর্ণময়ী একটু সময় চুপ থেকে বললেন—'বউমা পছন্দ করে না। দাদুভাইও জানতে পারলে বকবে শেষকালে।'

—আহা. কে কী বলল, ভাবি বয়েই গেল আমার। আমি রোজ ছাদে চলে আসি না?

—ভাল করিস না নাত বউ। যাদের সঙ্গে ওঠ-বস করবি, তাদের সঙ্গে মিল-মিশ রেখে চলাই ভাল।

ছুটি গলার স্বর ভারি করে বলল—'স্বর্ণ, সব কথায় কথা কইতে নেই।' স্বর্ণময়ী পাখির মতো হালকা শরীরে ঝটপট করে উঠলেন—'খুব ফাজিল হয়েছিস নাত বউ। গুরুজনকে নিয়ে মশকরা।' ছুটি খেয়াল করল স্বর্ণময়ীর ফর্সা মুখখানা আবির হয়ে উঠেছে। সে বয়স খুলে একখানা মশলা মাখানো আম

তুলে নিল। স্বর্ণময়ী বললেন—'এই অবেলায় বেশি খাসনি। অম্বল হবে।' ছুটি জিভ দিয়ে টাকরায় অদ্ভুত একটু শব্দ তুলল। স্বর্ণময়ীর হাতে চিরুণি দিয়ে পেছন ফিরে বসল। স্বর্ণময়ী বললেন—'আজ দুই বিনুনি বাঁধি। ছুটির একঢাল কোঁকড়া চুলে অতি সাবধানে চিরুনি চালাচ্ছিলেন স্বর্ণময়ী। ছুটি বলল—'চুল বাঁধা হয়ে গেলে তোমার ঘরে যাব। সেই কাজটা বাকি আছে।' ছুটির মাথায় স্বর্ণময়ীর চিরুনি থেমে গেল—কি কাজ?' ছুটি খরখরিয়ে উঠল —'ঢং কোরো না। আজ দাদুভাইয়ের ডায়েরি পড়তে দেবে বলেছিলে না?' স্বর্ণময়ী খুব নিস্পৃহ গলায় বললেন—'তাই বল। আমার বলে ছিস্টির কাজ, তাছাড়া তোর বর আসার সময় হয়ে এল। ঘরে ঢুকে বউকে না দেখলে তার মুখের যা অবস্থা হয়।' ছুটি আগের মতোই ঝাঁঝিয়ে উঠল—'বাহানা কোরো না। ভাল হবে না বলছি।' স্বর্ণময়ীর চুল বাঁধা হয়ে গেছে। ছুটির বুকের দু পাশে দুটো বিনুনি ঝুলছে। চিরুনি থেকে চুল জড়ো করে হাতে কুণ্ডলি পাকাতে পাকাতে এক মুখ হাসি নিয়ে বললেন—'আচ্ছা, আচ্ছা সে হবে।' হাসলে তাঁকে ভারি সুন্দর দেখায়। দু একটা নড়বড়ে দাঁত এখনও মায়া কাটাতে পারেনি। বিচ্ছিন্নভাবে রয়ে গেছে। ছুটি স্বর্ণময়ীর গাল টিপে দিল—'তোমাকে এখনও এত সুইট দেখতে। বয়সকালে দাদুভাইকে একেবারে নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়েছে।' স্বর্ণময়ী শব্দ করে হেসে ফেলেন। এই মেয়েটার কাছে তাঁর কোনও রাখঢাক থাকে না। বললেন—'আমার দাদুভাইকে এখন যেমন তুই ঘোরাচ্ছিস। ছ-মাস বে হয়ে এসেছিস, ছটা দিনও কাছ ছাড়া করল না। বাপের বাড়ি গেলেও তোর পেছন পেছন যাওয়া চাই।' ছুটি স্বর্ণময়ীর মুখের ওপর হাত চাপা দেয়—'আর একটাও কথা নয়। চলো, তোমার ঘরে চলো।' বিকেল এখন যাই-যাই করছে। সামনের মাঠ-ঘাট বাড়ি ঘরের ওপর গোধূলিবেলার আলো। চারপাশ ভারি হয়ে আসছে। পেছনের মাঠটুকুতে ছেলেপেলের দল বল পেটাচ্ছে। তাদের চিৎকার, কথার টুকরো টাকরা ভেসে আসছে থেকে থেকে। সামনের রাস্তায় ঘণ্টি বাজিয়ে সাইকেল রিকশা আসছে, যাচ্ছে, আসছে। অফিস-ফেরত লোকজন বাড়ি ফিরছে।

স্বর্ণময়ী ছুটির হাত ধরে উঠলেন। হাঁটুতে বাত। ওঠা-বসা করতে লাগে। বুকের কাছে আঁচার আর বড়িজড়ো করে সিঁড়ি ভেঙে নিজের ঘরের দিকে গেলেন। তাঁর ঘরের খাটের তলা থেকে একটা ভাঙাচোরা বাক্স বার করলেন। বাক্সের ডালাটা ছুটি ধরে রইল। স্বর্ণময়ী ভেতরে থেকে একটা ডায়েরি বার করলেন।

কালো চামড়ার মলাট। বাক্স বন্ধ করে দরজা ভেজিয়ে খাটের ওপর বাবু হয়ে বসলেন। বন্মালের মতো অপরিসর এই ঘরটি ভারি ফিটফাট আর গোছানো। আসলে মেজেনাইন ফ্লোরের অংশটুকু ঘর হিসেবে ব্যবহার হয়। জানলার ধার ঘেঁষে খাট। আর এক পাশে একটা সে-আমলের ইজিচেয়ার। স্বর্ণময়ীর স্বামীর বড় শখের ছিল এটি। একদিন কুলির মাথায় করে ঘরে এনে তুলেছিলেন। বলেছিলেন—'অক্‌শনে পেয়ে গেলুম। সাবেক আমলের ভাল জিনিস।' এ ঘরে একটা দেওয়াল আলমারি আছে। তাতে থরে থরে বই সাজানো। অগোছালো করার মানুষটি চলে গেছেন, তাই যেখানকার যা তা ঠিকঠাক থাকে। খাটের তলার স্বর্ণময়ীর গোটা দুই ট্রাঙ্ক, দুটো হাত বাক্স, একটা হাত ব্যাগ আরও কী সব টুকিটাকি, এটা-সেটা। খাটের পায়ের দিকে একটা চেয়ার-টেবিল। টেবিলের ঢাকার স্বর্ণময়ীর হাতে করা সুতোর কাজ। আগে আগে চোখে যখন জোর ছিল, তখন সেলাইয়ের খুব নেশা ছিল স্বর্ণময়ীর। ছুটি ডায়েরির পাতাগুলো উল্টে পাল্টে দেখছিল। লালচে হয়ে এসেছে। কোথাও কোথাও লেখাগুলো অস্পষ্ট। স্বর্ণময়ী ছুটির কাছে সরে এসে মিনতির মুখে বললেন— 'একটু জোরে পড়বি নাতবউ?' লজ্জায় তার কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল। নিজের মনেই বললেন—

'চোখদুটোয় এত ঝাপসা দেখি। এই যে তুই সামনে বসে আছিস তোকেও ছায়া-ছায়া দেখছি।' ছুটি স্বর্ণময়ীকে থামিয়ে দেয়—'বুঝেছি, বুঝেছি। বরের ভালবাসার কথাগুলো শোনবার জন্য মন আন চান করছে।' অসহায় ঠেলমাটাল চোখে তাকালেন স্বর্ণময়ী। গলায় মিহি বিধাদ—'এই নিয়েই তো আছি ভাই।' ছুটি স্বর্ণময়ীর হাত-দুটো ধরল—'ঠাট্টা করলাম ঠানদি। রাগ করলে?' স্বর্ণময়ী খানিক আগের বিষাদকে হাসি দিয়ে চাপা দেন—'তোর ওপর রাগ করতে পারি? তুই আমার বুকের পাঁজর নাতবউ।' ছুটি স্বর্ণময়ীর হাঁটু ধরে নাড়িয়ে দেয়—'দাদুভাইয়ের সঙ্গে প্রথম দেখার কথাটা একবার বলো না ঠানদি।'

—ওমা, সে তো বাহান্নবার বলেছি বাছা। সেই সে গঙ্গার ঘাটে নাইতে গিয়ে···

—না, না ভাল করে বলো, বায়না ধরে ছুটি।

স্বর্ণময়ীর চোখ দুটো অনেক দূরে চলে যায়। জানলার বাইরে এখন ঘন অন্ধকার। শীতের কুয়াশা এই অন্ধকারের সঙ্গে মিশে গিয়ে তা আরও গাঢ়

করে তুলেছে। আজ রাস্তায় করপোরেশনের আলো জ্বলেনি। আকাশে ক্ষীণ চাঁদ। স্বর্ণময়ী বালিশের তলা থেকে ধূসর রঙের তুষের আলোয়ানটা গায়ে জড়িয়ে নিলেন। পৌষের শীত শরীর কাঁপিয়ে দিচ্ছে। স্বর্ণময়ীর স্বরে শীতের ছোঁয়া—'আগের দিন রাত থেকেই দুর্যোগ। বর্ষায় ভেসে যাচ্ছে রাস্তাঘাট। ভোর বেলাও জল কমার নাম নেই। পড়ছে তো পড়ছেই। রাস্তায় হাঁটু জল। বাগবাজার গঙ্গার ঘাটে নেয়ে ফেরার পথে রাধাজিউয়ের মন্দিরে পয়সা ফেলতে গেছি। দেখি মন্দিরের ঢাকা চাতালে দাঁড়িয়ে রয়েছেন উনি।

—সেই প্রথম দেখলে ?

—না, আগেও যেতে আসতে কয়েকবার দেখেছি। রোজ সকালে হাঁটতে আসতেন। কখনও বেঞ্চির ওপর বসে হাওয়া খেতেন। খুব উঁচু লম্বা ফর্সা চেহারা ছিল তো, তাই অনেকের মধ্যেও চোখ এড়াত না। ছুটি আরও ঘন হয়ে এল—'দাদুভাই সেদিনই প্রথম কথা বলল ?' স্বর্ণময়ী হেসে মুখ নামালেন—'হ্যাঁ, আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'আজকেও আসা হয়েছে ? এবার সাঁতার কেটে ফিরতে হবে।'

—তুমি কিছু বললে না ?

—আমি তখন লজ্জায় বাঁচি না। পরণে ভিজে জামাকাপড়। শুধু বললুম, 'যিনি বলছেন তিনি ও তো বাদ দেন নি।'

—তুমি কী স্মার্ট ছিলে গো। শুনে দাদুভাই কি বলল ?

—কি বলবেন। দরাজ গলায় হা-হা হাসলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় থাকা হয় ?' আমি বললুম।

—তুমি জিজ্ঞেস করলে না ?

—হ্যাঁ, করলুম তো। বললেন, 'ফড়েপুকুরে থাকি। বুকের ব্যামো হয়েছিল, তাই ডাক্তার গঙ্গার হাওয়া খেতে বলেছে।'

—তারপর ?

—সেদিন ওই অবধিই। তারপর ওই এক সময়ে রোজই দেখা হতে লাগল। একটু-আধটু কথা। আস্তে আস্তে উনি আমার কথা জানলেন। আমাকেও ওঁর সংসারের কথা বললেন।

—তখন দাদুভাইয়ের প্রথম বউ বেঁচে ছিল ?

—না, সে বছরই তিনি মারা গেছেন। পুণ্যবতী নারী ছিলেন। স্বামী-পুত্তুর রেখে সিঁথে লাল করে ড্যাংডেঙিয়ে যেতে পেরেছেন।

—কলেজে কলেজে দাদুভাইয়ের বই পড়ানো হয়, জান ঠানদি ?

—শুধু কি কলেজে পড়ানো বাছা ? এই মোটা মোটা বই লিখতেন। আবার ছাপার অক্ষরে কত পদ্য লিখতেন।

স্বর্ণময়ীর দু-চোখের তারা নিবিড় আনন্দে ঝিকিয়ে ওঠে—'জানি। এ বাড়িতে যারা আসে-যায় তাদের মুখেই শুনতে পাই। তোর দাদুভাই কি কম বড় মানুষ ছিলেন ?' স্বর্ণময়ীর তাঁর বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। এতক্ষণ তিনি কথা বলছিলেন, তা যেন বুক থেকে নয়, নাভির অতল থেকে উঠে আসছিল। পারঘাটা ছাড়িয়ে দূর থেকে দূরান্তে ভোঁ বাজিয়ে চলে যাওয়া লঞ্চের মতন যেই কথায় বিষণ্ণতা, ব্যাকুলতা, বেদনা গাঢ় হয়ে মিশেছিল। একটু সময় নিয়ে স্বর্ণময়ী আত্মস্থ হলেন। বললেন—'নে, পড়বি তো পড়া রাত হচ্ছে।' ছুটি ডায়েরির পাতা খুলল। পঁয়তিরিশ বছর আগের তারিখ খুদে খুদে অক্ষরে লেখা : স্বর্ণময়ী, তুমি থাকো হাজার কাজের মাঝখানে, আর আমি সব কাজ চুকিয়ে দিয়ে তোমার ঘাটে এসে চুপচাপ বসেছি। চারদিকে নৈঃশব্দ আর তরল অন্ধকার নেমে আসছে। নাকি এ কোনও ঘাটে এসে বসা নয়, নিরুদ্দেশ যাত্রা ? তবে ফিরব না এ-কথা ঠিক।' স্বর্ণময়ী এখন দু-পা মেলে চোখ বুজে আছেন। মুখে মৃদু হাসির রেখা তিরতির করে কাঁপছে। ছুটি থামতে বললেন—'তোর কাছে আর গোপন করব কি। তখন আমাদের বেশ বোঝাপড়া হয়েছে। উনি আমাকে ওঁর কাছে নিতে চাইছেন, আর আমি সমাজ সংসার দেখিয়ে ওঁকে নিরস্ত করে চলেছি। হাজার হোক বালবিধবা। এ সময়েই অভিমানে এ-লেখা লিখেছেন।' ছুটি পাতা ওলটালো : সারাদিনে একটিবার তোমার ওই করুণ, নরম মুখ আমার করতল দিয়ে ছুঁতে না পারলে এতকাল বহু কষ্টে ধরে রাখা আমার সংযম চুরমার হয়ে যায়। তুমি কী বোঝ না, তোমার স্বামী প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় পাথর হয়ে যাচ্ছে। আমি যে অজ্ঞানের স্বর্গ ছেড়ে, জ্ঞানের নরক পেরিয়ে শেষমেশ আমার চিরাগত রমণীটির কাছে এসেছি।' স্বর্ণময়ী বললেন—'অনেক বাধার মধ্যে দিয়ে উনি আমাকে বিয়ে করে এলেন। বাপের বাড়ি ভাইদের আশ্রয়ে থাকতুম। তারা মুখ দেখা বন্ধ করলে। এ-বাড়ির আত্মীয় স্বজনরাও ছিছিক্কার করলে। তোর শ্বশুরের তখন সতেরো বছর বয়স। কলেজে পড়ে। সে-ও অভিমানে বাপের সঙ্গে কথা কয় না। আর আমার দিকে তো ফিরেও তাকায় না। বয়সের ছেলে। ভয় পেতাম, যদি একটা কিছু করে বসে ? ভয়ে ভয়ে তোর দাদুভাইয়ের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকতুম। আর উনি কাগজ-কলম

নিয়ে অভিমানে ঘসঘস করে এইসব লিখতেন।' ছুটি স্বর্ণময়ীর দিকে তাকাল—'দাদুভাই তোমাকে কী ভালই না বাসত ঠানদি।' তোমার জন্য সমাজ সংসার লোক-লৌকিকতা সব দু-হাতে ঠেলে সরিয়েছেন। আজও কজন পারে?'

স্বর্ণময়ীর চোখে জল এল—'কত বড় মানুষ। আমি কি তাঁর যোগ্য ছিলুম? সব সময় বলতেন, 'তোমাকে আমি অনেক বড় আলোর পরিধির মধ্যে দেখতে চাই স্বর্ণ। তুমি কখনও ছোট হয়ো না।'

ছুটি পড়ছে ঃ 'এভাবে কি কোন ও দিন আমার অধীর বাহুবন্ধনে পুরোপুরি ধরা না দিয়ে নিসর্গে, আকাশে, উন্মুক্ত প্রান্তরে অসীমা হয়ে থেকে যাবে তুমি? তোমার ভেতরে আমাকে মুক্তি দেবে না? আমি যে বড় ক্লান্ত স্বর্ণ।'

স্বর্ণময়ীর দু-চোখ বেয়ে শীর্ণ নদীর মতো জলধারা ক্রমশ নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে। নীরব কান্নায় ভেসে যাচ্ছে বুক। এই অশ্রু গোপন করার চেষ্টা করলেন না। ছুটি তার শাড়ির আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দিল। ফুঁপিয়ে উঠলেন স্বর্ণময়ী। বাচ্চা মেয়ের মতো ছুটির বুকে মুখ গুঁজে দিলেন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'কেবলই কষ্ট পেতেন আমার আচরণে। অথচ আমি তখন ছেলের মন পাওয়ার জন্য মাথা খুঁড়ে মরছি।' ছুটি স্বর্ণময়ীর মাথায় হাত বোলাতে লাগল। তারও দু-চোখ ভিজে উঠেছে। স্বর্ণময়ী সামলে নিলেন—'আজ থাক নাতবউ। কাল আবার পড়িস। রাত হয়েছে। ঘরে যা। দাদুভাই রাগ করবে।'

ছুটি নিচে এসে দেখল, ড্রয়িংস্পেসে শ্বশুর-শাশুড়ি টিভি দেখছেন। ওকে দেখে কেউ-ই কোনও কথা বললেন না। নিজের ঘরে এল। রুদ্র বিছানায় আধ শোওয়া হয়ে কী একটা ম্যাগাজিনে চোখ বোলাচ্ছে। ছুটি জিজ্ঞেস করল—'কখন এলে?' রুদ্র উত্তর দিল না। ম্যাগাজিন থেকে চোখ তুলে একবার তাকাল। ছুটি ফের বলল—'ডাকনি কেন?' রুদ্র একথারও সরাসরি কোনও উত্তর দিল বলল—'একটা আশি বছরের বুড়ির কাছে কি এমন পাও, যা এ বাড়ির আর কেউ দিতে পারে না।' রুদ্রর এই কথার পিঠে ছুটি চট করে কোনও কথা বলে উঠতে পারল না। ওর মনে কতগুলো ছবি ভেসে উঠল। সে যেদিন কনে হয়ে এ বাড়িতে এসে উঠল, যেদিন রুদ্রর মা বসার ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো পাশাপাশি দুটি ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন—'প্রণাম কর। আমার শ্বশুর-শাশুড়ি।' এরপর আশির্বাদের পালা। নানা বয়সের গুরুজন। প্রায় শেষ পর্বে এঁদেরই কোনও একজন আত্মীয় স্বর্ণময়ীকে নিয়ে এলেন—'নতুন কাকি, আশীর্বাদ করো।' শাদা

থানে মোড়া কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা ছোটখাটো চেহারার স্বর্ণময়ী রেকাবি থেকে একটু ধান-দুব্বো তুলে নিয়ে ছুটির মাথায় হাত রাখলেন। ছুটি পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই তাড়াতাড়ি পা দুখানা সরিয়ে নিয়ে বললেন, 'ছি, পায়ে হাত দিসনি নাতবউ। সারা জীবন মাথা উঁচু করে চল।' চমকে উঠেছিল ছুটি। এ বাড়িতে সম্ভবত সব থেকে বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষটির মুখে এ কথা। পাশেই শাশুড়ি ছিলেন। সে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল—'ইনি কে হন মা?' উপস্থিত সকলেই কেমন একটু চুপ হয়ে গেল। শাশুড়ি বললেন—'উনিও ঠানদি হন।' ছুটি লক্ষ করল, মেঘমালার মুখের শিরাগুলো একটু অদ্ভুত রকম কঠিন হয়ে রইল। ঠানদি ছুটির কানের কাছে মুখ রেখে বললেন—'তোর একটা পাওনা রইল ভাই। চুপি চুপি একসময় দোব।' পরের দিন বেলার দিকে একটু ফাঁক বুঝে স্বর্ণময়ী ছুটির ঘরে এলেন। আঁচলের তলা থেকে একটা রুপোর সিঁদুরের কৌটো বার করে ছুটির হাতে দিলেন। একগাল হেসে বললেন—'আমার সর্বশ্রেষ্ঠ ধন তোকে দিলুম নাতবউ। যিনি ভালবেসে দিয়েছিলেন, তিনি তো কবেই ফাঁকি দিয়ে চলে গেছেন। আমি এতদিন সামলে-সুমলে রেখেছিলুম। এবার যোগ্য লোক পেয়েছি ভাই। দেখিস অযত্ন করিসনি।' ছুটির ভাল লেগেছিল। এতদিনের অভ্যেস, পরিচিত পরিবেশ নিজের লোকজন ছেড়ে আসার বিষণ্ণতাটুকু কেটে যাচ্ছিল এই মানুষটার নিরাবরণ আলাপচারিতায়। স্বর্ণময়ীর হাত ধরে বলল—'আপনি বসুন না।' স্বর্ণময়ী আলগোছে বিছানার ধারে একটুখানি জায়গা নিয়ে বসলেন। বললেন—'আ মোলো, আপনি আজ্ঞে করছিস কেন? আমি বলে তোর সঙ্গে মিতে পাতাব বলে কবে থেকে বসে আছি।' ছুটির চিবুক ধরে চুমো খেলেন—'বড্ড ভাল মেয়ে। লক্ষ্মী মাণিক। বেঁচে থাক নাতবউ। সকলকে সুখে রাখিস।' এই কটা কথায় ছুটির আড়ষ্টতা একেবারে কেটে গেল। অনেক দিনের চেনা মানুষের মতন স্বর্ণময়ীর হাত দুটো জড়িয়ে বলল,—'ঠানদি তুমি এ বাড়িতেই থাক তো? আমাকে কেউ বলে দেয়নি।' স্বর্ণময়ীর দু চোখ চিকচিক করে উঠল। আঁচলে মুছলেন। মাথা নিচু করে বললেন—'আর কোথায় থাকব বাছা? তিনি যে আমাকে এইখানেই রেখে গেছেন। তিনি টেনে না নিলে আর কোথায় যাব?' ছুটির কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া লাগছিল কথাগুলো। পরিচয়ের রহস্যটা যেন কাটছে না কিছুতেই। স্বর্ণময়ীর দিকে তাকাল। স্বর্ণময়ী বুঝতে পেরে বললেন—'আমি তোর দাদুভাইয়ের দ্বিতীয় পক্ষ। আস্তে আস্তে জানবি সব।' এবার রহস্য পরিষ্কার হল। এই দুদিনে সে লক্ষ করেছে, এ-বাড়ির

প্রত্যেকটি মানুষের এই মানুষটি সম্পর্কে এক ধরণের নিরুত্তাপ উদাসীন আচরণ। রুদ্র ঘরে এল। ছুটির স্বামী। বিছানার কোণে স্বর্ণময়ীকে দেখে তার দুই ভুরুতে অনন্ত জিজ্ঞাসা চিহ্ন হয়ে রইল কিছুক্ষণ। বলল—'ওর এখন রেস্ট দরকার।' স্বর্ণময়ী ত্রস্তে উঠে পড়লেন—'হ্যাঁ ভাই। বুড়ো হলে জ্ঞানগম্যি লোপ পায়।' ছুটি স্বর্ণময়ীর হাত ধরে থামিয়ে দিল। লজ্জায় এতটুকু হয়ে গেছে যে। রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল—'আমার ভাল লাগছে কথা বলতে।' স্বর্ণময়ী সামাল দিলেন—'এখন তাড়াতাড়ি দুটি খেয়ে জিরিয়ে নে ভাই। দুপুর গড়াতে না গড়াতে আবার লোকজন আসতে থাকবে।

এই ছমাসে একটু একটু করে অনেকটাই জেনেছে ছুটি। কখনও রুদ্র বলেছে, কখনও শাশুড়ি মেঘমালা, কখনও শ্বশুর মশাই। প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তে একজন বালবিধবাকে নিজে পছন্দ করে বিবাহ করায় আত্মীয়-স্বজন, সন্তান-সন্ততি প্রায় একঘরে করে রেখেছিল মানুষটাকে। তাঁর বুকের জোর ছিল, লড়াই করে গেছেন শেষ দিন পর্যন্ত। পড়ে আছেন স্বর্ণময়ী। এ-সংসারে প্রতিটি মানুষের মন জুগিয়ে চলার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও বেশি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছেন। ছুটি বুঝেছে, স্বর্ণময়ীর সঙ্গে তার এই ঘনিষ্ঠতা এ-বাড়ির কেউ পছন্দ করে না। রুদ্রও না। এঁরা আলাদা করে কেউই খারাপ নন। রুদ্র তো রীতিমত হুল্লোরে ছেলে। ছুটিদের বাড়ির সবাই রুদ্রকে তার এই আলাপি স্বভাবের জন্য রীতিমত পছন্দ করে। কিন্তু এই একটা জায়গায় এদের এই ইনহিবিশানটুকুর কারণ ধরতে পারে না সে। অনেকবার রুদ্রর সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে চেয়েছে, কিন্তু পেরে ওঠেনি। কোথায় একটা সংকোচ এসে মুখ চেপে ধরেছে। যা প্রত্যেকেই জানে অথচ মুখে প্রকাশ করে না, তাকে সামনে টেনে এনে দিনের আলোর মতো মেলে ধরতে চায়নি ছুটি। অথবা অন্যরাও।

রুদ্র এখনও একইভাবে ম্যাগাজিনে মুখ গুঁজে রয়েছে। বাইরে এখনও টিভি চলছে। রাত্তিরের রান্না একটি মেয়ে এসে করে দিয়ে যায়। ছুটি ঘড়ি দেখল। আটটা বাজে। বলল—তুমি এসে কিছু খেয়েছ তো?

—ডিউটি করছ?

রুদ্রর গলার স্বরে চমকে উঠল ছুটি। এত নির্মোহ এত বেশি মাজাঘষা গলা এর আগে কখনও শোনেনি সে। রুদ্রর কাছে গেল। হাত থেকে ম্যাগাজিন টেনে নিল—'এভাবে কথা বলছ কেন?'

—কী ভাবে?

—বুঝতে পারছ না ?

—না।

ছুটি চুপ করে গেল। বাইরে চলে এল। মেঘমালা রান্নাঘরের বেসিনে চায়ের কাপ ধুচ্ছিলেন। সুধাময় এখনও টিভি দেখছেন। ছুটি রান্নাঘরে মেঘমালার কাছে এসে দাঁড়াল—'মা, আমি ধুয়ে দিই ?' মেঘমালা ছুটির দিকে তাকালেন। অপ্রসন্ন মুখে বললেন—'যা তোমার শ্বশুরমশাই পছন্দ করেন না, তা আমরা কেউ করি না। অন্য কেউ তা করলে তাঁকে ছোট করা হয়।' ছুটি একথারও কোনও উত্তর দিল না। ঘরে চলে এসে একটা বই হাতে করে বসল। দেওয়াল-ঘড়ির টিকটিক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই ঘরে। শীতের রাত গাঢ় হতে লাগল। একটা অচল পয়সার মতো এককোণে পড়ে থাকা মানুষটার করুণ মুখটুকু বারবারই ফিরে ফিরে আসতে লাগল ছুটির মনে।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে রুদ্রর শোওয়ার ব্যবস্থা করল ছুটি। নিজের বালিশ নিয়ে ঘরের অন্যদিকে রাখা সোফায় পাতল। রুদ্র দেখছিল। রুদ্র কিছু বলল না। আলো নিভিয়ে দিল। হালকা রাত-বাতি জ্বালাল। বাড়ির আর সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে। গোটা বাড়ি নিঃঝুম। রুদ্র ছুটির কাছে এল—একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে ভুল বোঝাবুঝি হওয়া ঠিক নয়।'

—আমার ও তাই মনে হয়।

—কিন্তু তুমিই বা এটা চালিয়ে যাচ্ছ কেন ? এ বাড়ির 'পাল্‌স্‌'টা এতদিনে বুঝেছ নিশ্চয়।

—আমার নিজস্ব একটা পাল্‌স্‌ও রয়ে গেছে যে। তার কী হবে ?

—সবার বিরোধিতা করলে, সবাইকে ছোট করলেই কি তোমার পাল্‌স্‌ ঠিক রান করবে ?

—ছোট করার প্রশ্ন নয়। আমি বুঝতে পারি না, একজন অশক্ত বুড়ো মানুষ, যিনি তোমাদের প্রত্যেকের প্রতি কনসার্নড্‌, তোমাদেরই একমাত্র আপনজন বলে মনে করেন, এত বছর পরেও তাঁকে তোমরা মেনে নিতে পারছ না কেন ?

রুদ্র এবার উঠে দাঁড়াল। ঘরের মধ্যে অস্থির পায়চারি করছে—'ওই মানুষটা আমাদের পরিবারের সম্মান, আভিজাত্য সমস্ত কিছু ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। দাদুভাইয়ের মতো লোককে গঙ্গার ঘাটে হিপ্‌নোটাইস করে । উত্তেজনায় কথা শেষ করতে পারে না রুদ্র। ছুটি বলল—'কিন্তু এগুলো তো কোনওটাই তোমার দেখা নয়!'

—তা বলে মিথ্যে হয়ে যায় না। আমার বাবার তখন সতের বছর বয়স। ওই বয়সের একটা ছেলের বাবা একটি তরুণী বিধবাকে বিয়ে করে ঘরে তুললেন। সেদিনের পক্ষে এটা মেনে নেওয়া তত সহজ ছিল না। ঘরে বাইরে, বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বাবাকে কম অপমানিত হতে হয়েছে?

—ঠাম্মদির এত বছরের নিঃস্বার্থ ভালবাসাতেও সেটুকু ধুয়ে-মুছে যায়নি?

—ওসব ভালবাসা-টাসা ছাড়। আমার অত মাথাব্যথাও নেই। ছোট থেকে যা শুনেছি তাতে এক ধরনের দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। এখন আর সেটা ভাঙবার কোনও কারণ নেই।' ছুটি চুপ করে রইল। বুকের কোনও একটা জায়গায় ক্ষরণ চলছে। রক্ত ঝরছে টুপটাপ। রুদ্র বিছানায় গেল। ছুটিকে ডাকল না। শুধু স্বগতোক্তির মতো করে বলল—তোমারই বা অত মাথা ঘামানোর কী দরকার। আমরা আফটার অল ভদ্রলোক। এ বাড়িতে তো ওর কোনও অযত্ন হয় না।'

শুয়ে পড়ল রুদ্র। ছুটির দাদুভাইয়ের ডায়েরির অংশ মনে পড়ছিল। ঠাম্মদিকে পাওয়ার জন্য কী অধীরতা, কী আকুলতা, কী অভিমান⋯অথচ সংসারের কথা ভেবে সেই মানুষটার কাছেও পুরোপুরি কখনই ধরা দিতে পারেন নি স্বর্ণময়ী, এদের কাছেও আপন হয়ে উঠতে পারেননি। ঘরের বাইরে কিসের আওয়াজ পেয়ে উঠে বসল ছুটি। দরজা খুলে বাইরে গেল। দেখল, স্বর্ণময়ী আস্তে আস্তে বারান্দা পেরিয়ে নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছেন। ছুটি এগিয়ে এসে ধরে ফেলল—'এত রাতে এখানে কী করছিলে ঠাম্মদি?⋯একি তোমার গা এত গরম!' স্বর্ণময়ী উড়িয়ে দেন—ও কিছু না। একটু জ্বর মতো হয়েছে।' তারপর আচমকাই বলেন—'এ বাড়ির দেওয়ালগুলো বড় পাতলা।' ছুটি চুপ করে থাকে। স্বর্ণময়ী ছুটির হাত ধরে বলেন—'রাগকে কখনও রাত পোয়াতে দিসনি বউ। যা দাদুভাইয়ের সঙ্গে মিটিয়ে নে।' স্বর্ণময়ী শীতে কাঁপছেন। ছুটি বলল—'তোমার গায়ে এত জ্বর। আমাকে আগে বলনি কেন? এত রাতে কি ওষুধ দিই, বলতো?' স্বর্ণময়ী ছুটিকে থামিয়ে দিলেন—'অত ব্যস্ত হসনি। এমনিই কমে যাচ্ছে', তাঁর মুখে নেভা হাসি—'রাত করিসনি। বরের সঙ্গে ভাব করে নে।'

—সবই তো শুনলে ঠাম্মদি।

—সব শুনেই বলছি ভাই। ওদের কী দোষ। আমার অতীত তো সত্যিই খুব ফর্শা নয় বউ। তাছাড়া সত্যিই তো আমি এদের শেকড় নই। এক গাছের

শেকড় অন্য গাছে লাগে না রে বউ···কত চেষ্টা করলুম।’ শেষের দিকে স্বর্ণময়ীর গলায় একটু কান্না ছুঁয়ে গেল কি না বুঝতে পারল না ছুটি। বলল—‘এতগুলো বছরে যে তিলে তিলে নিজেকে ক্ষইয়ে দিয়েছ এদের জন্য, তা কিছু নয়?’

—এদের জন্য নয় ভাই। আমার জন্যই। আমি শান্তি পেয়েছি। ছুটি নির্নিমেষ তাকিয়ে আছে স্বর্ণময়ীর দিকে—ভালবাসা মানুষকে এত শক্তি দেয়? স্বর্ণময়ী এবার আত্মগত ভাবে বললেন—তোদের মান-অভিমান-খুনসুটি, একজনের জন্য অন্যের পলকহারা এসবের মধ্যে দিয়েই আমি আমাদের দিনগুলোকে ফিরে পাই নাতবউ। আমার এই বেঁচে থাকাটার একটা তবু যা হোক মানে পাই। এটুকু না থাকলে ·’ ছুটি কান্নায় ভেঙে পড়ে—‘তুমি এখানে আর থেকো না ঠানদি।’

স্বর্ণময়ী ছুটির পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়—‘পাগল কোথাকার। এ বয়সে আর কোথায় ঠাঁইনাড়া হবো? এতো তাঁরই সংসার, তাঁরই ডালপালা, শাখাপ্রশাখা, এদের মধ্যে দিয়ে আমি যে তাঁকেই ছুঁয়ে আছি নাতবউ।’

স্বর্ণময়ী আলো-অন্ধকারে ছায়া ফেলে নিজের ঘরের দিকে যান।

ছুটি নিজের ঘরে শুয়ে দাদুভাইয়ের ডায়েরির পাতা ওলটাচ্ছিল, মাঝখানে একটা পাতায় চোখ আটকে গেল। ‘তুমি নিজে বার-বার বুঝেছ, সজনে বা নির্জনে একটা মুহূর্ত আমি তোমাকে ছাড়া বাস করতে পারি না। সব জেনে বুঝে তুমি কি এক ছাদের তলায় থেকেও এভাবেই দূরে দূরে থাকবে? এর চাইতে সরাসরি আমাকে মৃত্যু হানো স্বর্ণ, দেখবে কত সহজে আমি অগম পারের চৌকাঠে পা ছুঁয়ে দিয়েছি ··’ আর পড়তে পারল না ছুটি। পাতায় পাতায় একটা মানুষের এই কাছে পাওয়ার হাহাকার ছুটিকে উথাল-পাথাল করে তুলছিল। ছুটি ঘর অন্ধকার করে শুয়ে রইল। বাইরে বেলের আওয়াজে মেঘমালা দরজা খুলে দিলেন। রুদ্র আর সুধাময় ফিরে এসেছে। রুদ্র ঘরে এসে জামকাপড় ছাড়ল। আলো জ্বালল না। বারান্দার আলোর অংশ পর্দার ফাঁক দিয়ে ফ্যাকাসে ভাবে ঘরে এসে পড়েছে। সেই আলোতেই কাজ সারছিল সে। সুধাময় আর মেঘমালার কথার ছিটেফোঁটা ভেসে আসছে ঘরে। ডাক্তার, নার্স, ওষুধ, ইনজেকশন· এই রকম টুকরো টুকরো কিছু শব্দ। রুদ্র বাথরুমে গেল। চোখে-মুখে জল দিয়ে নীল আলো জ্বালিয়ে বিছানায় ছুটির পাশে বসল। ছুটি উল্টোদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। কাঁচের জানলার বাইরে আকাশে

মস্ত বড় থালার মতো চাঁদ। আজ পূর্ণিমা। ছুটি এক দৃষ্টে চাঁদের দিকে তাকিয়েছিল। সে দেখেছে, একভাবে তাকালে চাঁদের ভেতরকার গর্তগুলোকে নিজের মনের মতো আকার দেওয়া যায়। এখন চাঁদের ভেতরের বিভিন্ন খাদ, ঢালু, চড়াই, উতরাই মিলিয়ে ছুটি একটা ছবি তৈরি করতে চাইছিল। এক সময়ে ছবিটা তৈরি হল। স্বর্ণময়ী যেভাবে দু পা মেলে কোলে হাত রেখে বসে থাকতেন সেরকম একটা ছবি। ছুটির মনে হল, স্বর্ণময়ী যেন ওখান থেকেই আশ্বাস দিয়ে উঠবেন—'মন খারাপ করিসনি নাতবউ। এই রকম অনেক ভাঙা চোরা খাদ, চড়াই, উৎরাই সব নিয়েই বেঁচে থাকা। সবটা নিয়েই জীবন।' রুদ্র ছুটির কপালে হাত দিল—'শরীর খারাপ লাগছে?' ছুটি যেন এই ঘর-বাড়ি-চেনা পরিবেশ ছাড়িয়ে ক্রমশ অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল। খুব আনমনা ভাবে বলল—'না।'

—ঠানদির কথা জিজ্ঞেস করলে না যে?

—কি জিজ্ঞেস করব?

সে রাতের ধুম জ্বর আস্তে আস্তে অসাড় করে দিয়েছে স্বর্ণময়ীকে। নিঃসাড় স্বর্ণময়ীকে আজ হস্‌পিটালে ভর্তি করা হয়েছে। রুদ্র নিজে থেকেই বলল—'ডক্টররা বলছেন, ডিপ কোমা। অক্সিজেন, স্যালাইন চলছে। এই রকম পেশেন্ট এইভাবে অনেকদিন বেঁচে থাকতে পারে, আবার...'

ছুটি শুনছিল না। সে চাঁদের গায়ে স্বর্ণময়ীকে দেখছে। একটু নাড়াচাড়া করলেই ছবিটা ভেঙে যেতে পারে। স্বর্ণময়ী কী এবার একটু আধশোয়া মতন হলেন? না কি, একটুকরো মেঘ একটু আড়াল দিল বলে ওরকম লাগছে। রুদ্র আরও ঘন হয়ে এল। পেছন থেকে ছুটিকে জড়িয়ে ধরল, পেটে হাত বুলিয়ে দিল। কিন্তু ছুটির শরীরে সে কোনও উষ্ণতা খুঁজে পাচ্ছিল না। বড় নিস্পন্দ হয়ে রয়েছে ছুটি। ছুটি দেখতে পাচ্ছে, স্বর্ণময়ী একটু একটু করে শুয়ে পড়ছেন। এবার আর তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না। শুধু কয়েকটি উঁচু নিচু রেখায় আকার ফুটে আছে। ছুটি কনুইতে মাথা রেখে মুখ উঁচু করল। দেখতে পেল না। এই সময় ভাসতে থাকা একটি প্রকাণ্ড মেঘ চাঁদকে ঢেকে দিল। হারিয়ে গেলেন স্বর্ণময়ী। ছুটি আর্ত চিৎকার করে উঠল—'ঠানদি।' ছুটির গলার স্বরে ভয় পেল রুদ্র। তাকে টেনে নিজের দিকে ফিরিয়ে নিল। জড়িয়ে ধরল। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল—'এই সময় ভয় পেলে বাচ্চার ওপর এফেক্ট হয়। অ্যাড্‌ভানস্‌ড্‌ স্টেজ।' ছুটি রুদ্রর দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু

বুদ্র বুঝতে পারছে, সে তাকে দেখছে না। বুদ্র তার নিবিড় করে চেনা চঞ্চল-উচ্ছল-ছটফটে একান্ত নিজস্ব নারীটিকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না। ছুটির উদাসীন মুখে গাঢ় বেদনা। ছুটির বেদনা, ছুটির উদাসীনতা বুদ্রর বুক ছুঁয়ে গেল। এখন এই বেদনা, এই রূপহীন আকারহীন সীমাহীন বিষণ্ণতা সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল একটু একটু করে। বুদ্র গভীর করে একটি চুমো দিল ছুটির কপালে। ছুটি কেঁপে উঠল। হঠাৎ এক ঝাঁকুনিতে সে যেন পুরোপুরি এই ঘরে ফিরে এল। শব্দ করে কেঁদে ফেলল। থেমে থেমে ভেঙে ভেঙে বলতে লাগল—'একদিন আমিও বুড়ো হয়ে যাব। হয়ত একা হয়ে যাব। বয়সের ভার বোঝা করে তুলবে। তারপর একদিন এভাবে·।' বুদ্র ছুটিকে বুকের মধ্যে মিশিয়ে নিল। তার স্বস্তি হচ্ছিল না। সে আরও আরও ভেতরে নিতে চাইছিল ছুটিকে। বুদ্র ভীত বোধ করছে। সে যেন দেখতে পাচ্ছে ছুটি তার পালকা ছিপছিপে শরীর নিয়ে বিষণ্ণ মুখ নিয়ে আস্তে আস্তে আবছা-হতে হতে মিলিয়ে যাচ্ছে। ভ্রমরের গুঞ্জনের মতো আকাশ-বাতাস আকুল করে ছুটির মাঝে মাঝে গেয়ে ওঠা অত্যন্ত প্রিয় কলি বেজে উঠছে, 'তখন আমায় নাই বা মনে রাখলে, তারার পানে চেয়ে চেয়ে।' ছুটির বুকে মুখ গুঁজল বুদ্র। খুব শৈশবে যখন সে স্বর্ণময়ীর কোলে কাঁখে চড়ত অথবা শীতের দুপুরে কম্বল জড়িয়ে মা-বাবার চোখ ফাঁকি দিয়ে স্বর্ণময়ীর বুকের কাছে মুখ রেখে গল্প শুনতো তখন একরকম গন্ধ পেত স্বর্ণময়ীর গা থেকে। সেই হারিয়ে যাওয়া গন্ধ আজ আবার ছুটির বুকের ভেতর থেকে পেল সে। এখন তার কাছে ছুটি আর স্বর্ণময়ী মিশে একাকার হয়ে যেতে লাগল। বুদ্র বুঝতে পারছিল তার বুকের খুব গভীর গভীরে শ্রাবণের ভারি সংসারের মতো তীব্র কান্না, আর হাহাকার জমছে। জমছে। তা যে কোনও মুহূর্তেই ভূপালি হয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারে।

তিনটি কবিতা । প্রণব চট্টোপাধ্যায়

সেই রাস্তায়

প্রতিদিন যে বাড়ি থেকে
সূর্যোদয়ে পা রাখি রাস্তায়
সারাদিন ট্রাফিক সিগন্যাল
জেব্রা ক্রসিং পার হয়ে
রক্তের রং বদলাতে-বদলাতে,
দিনের সম্বল দু'হাতে লুকতে-লুকতে,
মধ্যরাতে ফিরে
সেই বাড়িটাকে আর চেনা যায় না !

আশপাশের লোকেরাও
কেউ চিনতে পারে না আমাকে,
অথচ তাদের নজরদারি
আমার শিরদাঁড়া বেয়ে
রক্তচাপ-মাপা যন্ত্রের মতো
ওঠা নামা করে !

গতরাত শেষরাতের মতো
যার মুখ দেখেছিলাম
সে মুখ কোনো নারীর না পুরুষের
কিছুতেই মনে পড়ছে না !

এখনও প্রতিদিন এক একটা
নতুন বাড়ির সাথে দেখা হয়
যার কোনোটাই আমাকে ডাকে না,
আবার সকাল হলেই
পা রাখি আদিগন্ত আজন্মের রাস্তায় !

রক্তচাপ বিষয়ক

কারা যেন অবনত হয় ।
রক্তে নবান্নের গন্ধ··
পাখিরাই জানে সে উচ্চারণ,
শব্দগুলোকে সাজিয়ে রাখে সময় ।

যাঁরা বুকের ওপর দাঁড়িয়ে
সাদা পায়রা ওড়ায়
একটু এগোলেই যুবক খুন···
পাশে রক্ত···
আর তারও পাশে
শালিধানে বারুদের গন্ধ
মৃত্যু ফেরৎ মুহূর্তে
ফুসফুসে তক্ষক ডেকে ওঠে
কারা যেন অবনত হয় ।

কারা যেন চৌকাঠে সন্তর্পণে
অকথিত লোক গাঁথা রেখে যায়
বল্লমের ডগায় ছিটকে যায় ক্রোধ
ইদানিং বিপদসীমার উপরেই থাকে
আমার বুনো রক্তচাপ
আমি রাগ মানাতে পারি না !

জানি না বাজবে কিনা

আমার হাতের কলিং বেলটা
সময় মতো বাজে না ··
নির্ঘুম নির্বান্ধব রাতে
তেষ্টার জল চেয়ে বুক ফাটালেও
কাউকে ডাকতে চেয়েছি

আপ্রাণ চেষ্টায়,···
রাত কাবার হয়ে গেল
বেলটা বাজলোই না !

সময় হ'লে যার
জানান দেবার কথা ছিল
সে জানিয়ে গেছে
সময় হয়েছে, বেরিয়ে এসো ··
আমার ভীষণ হাত কাঁপছে
জানি না, এবারও বেলটা বাজবে কিনা ?

দুটি কবিতা। ইন্দ্রানী দত্ত

কলকাতা, প্রিয়তম

তোমাকে দেখতে শহরের পথে পথে
যাব না তো আর, নিয়েছি ঘরের কোণ
তোমার কণ্ঠ দূরে ভেসে যায় ঐ
হাতে তুলে নিই ডিজিটাল টেলিফোন ।

গ্রুপ থিয়েটার শাস্ত্রীয় গান
নীলাকাশ আর খোলা ময়দান
পিচগলা পথ মাঝে মাঝে আজ হঠাৎ বনসৃজন
ডেকে চলে যায় দু' হাতে সবেগে বন্ধ করি শ্রবন।

এখানে সেদিন মেঘ করে এল
কবিতার খাতা পাশে পড়ে ছিল
ওখানের তোমার আনমনে হ'ল মরণের সাথে দেখা
আমি নির্বোধ বাড়াইনি হাত তোমাকে করেছি একা।

হঠাৎ হারাবে মেঘের আড়ালে
অথবা ফেরাবে দু'হাত বাড়ালে
তবুও তোমায় চাইবে আমার ছায়াহীন এই মন
মেঘলা বিকেলে হাতে তুলে নেব ডিজিটাল টেলিফোন।

ইচ্ছাপত্র

সারা জীবন যা কিছু সঞ্চয়
তোমায় দেব এমন ইচ্ছে হয়।
রোজগার কম খরচ বেশি প্রতি মাসের শেষাশেষি
টান পড়ে যায় ভাতে কি বা দুঃখ তাতে?
নিদারুণ সংযমে তবুও কিছু জমে
তোমার জন্যে ভরে উঠছে ঘট
তুচ্ছ করে আজকের সংকট।

খুঁজতে খুঁজতে চকমেলানো বাড়ি
হয়েছিল সুখের সঙ্গে আড়ি
বলতে বলতে ভালোবাসার কথা
ফুটলো কাঁটা বুকে দারুণ ব্যথা—
সেই ব্যাথাটির গায়ে কে বোলাবে হাত?
সকল হাতেই অঝোর রক্তপাত
চলতে চলতে হন্দ খোঁড়া পায়
পৌঁছে যাব তোমার চেনা গাঁয়।

ওসমানের নানাজান

কমলেশ সেন

ওসমানের নানাজানকে আমি কোনদিন দেখিনি
শুনেছি, তিনি টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে
এ-গাঁ সে-গাঁ ঘুরে ঘুরে মরোক্কর বাঁধানো কোরান
বেশ জলের দামে বিক্রি করতেন

তিনি নিজে কোনদিন কোরান পড়েন নি

তিনি যখন কোরান নিযে গাঁয়ে ঢুকতেন
সাবা গায়ের তামাম গবিবগুববো মুসলমানবা ভেঙে আসত
তাঁর পায়ের কাছে
যেন স্বয়ং হজরত মহম্মদ এসেছেন তাদের গাঁযে

একদিন তিনি ওসমানকে ডেকে বললেন—
আমি মুখ্যসুখ্য মানুষ
আল্লা কোবানে কি লিখে পাঠিযেছেন আমার জানা নেই
তুই কোরাণ পড়তে শিখলে বলিস
আল্লা এমন পবিত্র গ্রন্থ কেন একলা মহম্মদকে দিয়ে
এই দীন দুনিয়াতে পাঠালেন

ওসমানের নানাজান মারা গেলে
ওসমান তার কানে কানে কি বলেছিল
আমি তা জানি না

কিন্তু ওসমানেব বালক ছেলে
ওসমানের মৃত্যুর পরে
তার কবরের ওপর পুঁতে দিয়েছিল
নিমগাছের একটি চারা
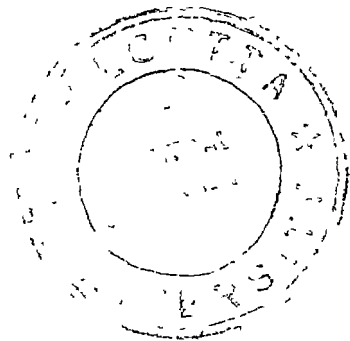
শুনেছি, নিমের সবুজ ছায়ায় নাকি বুকের কোন রোগ হয় না

ওসমানের বুকে কী রোগ বাসা বেঁধেছিল
তা ওসমানেরও জানা ছিল না।

ঘটনাচক্রে

অনীক রুদ্র

অনেক ঘটনা আমি দেখি নাই পৃথিবীর
আমার অদেখা দৃশ্য অনেকাংশে আজ তবু
অনুমান করি

অনুমিত কল্পনায় ভালোবাসা নিয়ে ফেরে
নারী ও পুরুষ
শরীরবিদ্যার ছাত্র, বিপরীত লিঙ্গের আকর্ষণ
যতখানি স্বাভাবিক তার চেয়ে অধিক সমকাম
হয়ত যোজ্যতা আনে স্বপ্নকল্প ঘটনার মত

অনেক আহার কিংবা জ্ঞানচর্চা পোষায় না আমার
অবান্তর ঘোরা ফেরা করি আর ঘুম এলে ঘুমিয়ে পড়েছি
আমার প্রজাতি যেন খাদ্য ও পানীয় পায়
কষ্ট কিংবা ভালোলাগা, কিছুটা অন্বেষা

কখনো-না যুদ্ধ করে মদ গর্বে
যুদ্ধ অতি ভীষণ খারাপ
লড়াই বাধিয়ে খুব মজা পায় কুচক্রীরা
যে রকম আগ্রাসী স্বভাব আর অসুস্থতা দেখতে চাই না আমি

অনেক ঘটনা আমি দেখতে চাই না পৃথিবীর
অনুমান করি, অনেক না-দেখা দৃশ্য
কিছুটা তো দেখতে পাবো তাই
ছোট ছোট শিশুদের হাত ধরে হেঁটে যাচ্ছে আধুনিক জননী
তারা খেলছে যে বৃহৎ কর্মময় জগৎ-সংসারে
দশ হাতে সাজিয়ে তুলছে আনন্দের সুধাভাণ্ড যতো

সাদা ভাত

অভীক রায় চৌধুরী

লাস্ট বাস কোনোদিন থামে নি
আমার স্টপে
বাবার জন্যেও থামে নি
মা'র জন্যেও নয়
এই ভেবে
নিজের মধ্যে এ'কে যাই তামাম ভাঙচুর

মা হাত রাখে
লাস্ট বাস মিস করা-তালুতে
আঁচল ঢেকে দিয়ে বলে
একদিন পেয়ে যাবি
তোর বাবাও পেয়েছিল
লাস্ট বাসে আমাকে

এইভাবে প্রতিরাতে
আমরা আবিষ্কার করি
সাদা ভাত
আরও সাদা বিছানা বালিস

তুই যা-ঘাতক-শব্দ

নিখিল রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

তুই যা ঘাতক-শব্দ
তুলে আন সূক্ষ্মতম অস্ত্রের সম্ভার
সীমারের ভোঁতা খঞ্জরে
আর আমাকে বিক্ষত করিস নে
ক্ষমাহীন নির্দয়তায় বিদ্ধ কর কলজেটা

এফোঁড় ওফোঁড়
কথা দিচ্ছি
তোর দু হাত-ছোপানো রক্তে
আকৃতির হদিস
ছিটে ফোঁটাও পাবি না

এই নে বুকের কোণে
তুলে আন নির্মম থাবায়
ঋতু বিস্মৃতির শেষ অহংকার
শ্রদ্ধাহীন নিষ্পলক চোখে
সারা জনপদে ঢেলে দে
উত্তপ্ত প্রবাহ
কথা দিচ্ছি
শ্বেত পতাকা উড়িয়ে
তোর বিজয়রথকে থামাবো না

নে মেখে নে নিষাদ-শব্দ
দ্বিধাহীন ঘাতকের হাতে
নিরুচ্চার রুদ্ধবাক ভ্রূণের নিঃশ্বাস

গ্যাপ

দুলাল ঘোষ

দেয়ালে টাঙানো পিতামহের ছবি
রিমোটে নামিয়ে আনে
কৌটোর দুধে ডোবা শিশু

অ্যানাটমিতে সিদ্ধহস্ত পিতা
পোস্টমর্টেমে জেনে নেয়
সেতুর জন্মরহস্য

একানব্বইয়ে হীরেন্দ্রনাথ

২৩ নভেম্বর ৯৭ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একানব্বই বছরে পা দিয়েছেন। এই দীর্ঘ জীবনের বেশির ভাগ সময় কেটেছে তাঁর দেশ ও কালের অসংখ্য ঘটনার নিবিড় সান্নিধ্যে, এক বিরামহীন কর্মচাঞ্চল্যে। দর্শকের মতো এক পাশে সরে দাঁড়িয়ে ঘটনার মূল্যায়ন আর নিজেকে জরীপ করে ইতিহাসে স্থান খুঁজে নেওয়ার মতো জীবন বিলাসে তাঁর ঘোরতর অরুচির কথা কাছের মানুষদের অজানা নয়। বিরাট পাণ্ডিত্য, বিপুল কর্মশক্তি, অসাধারণ মনীষার অধিকারী হয়েও, ষাট বছরের বেশি কমিউনিস্টের জীবনে হীরেন্দ্রনাথ অকুণ্ঠভাবে পার্টির নির্দেশে এমন অনেক কাজের দায়িত্ব পালন করেছেন, যা একালের তরুণ কমিউনিস্ট প্রজন্ম 'এসব আমার কাজ নয়' বলে অনায়াসে এড়িয়ে যান। এভাবে হীরেন্দ্রনাথের ক্ষমতা অপচিত না হলে দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন হয়তো আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারতো। আজন্ম-রবীন্দ্র অনুরাগী হীরেন্দ্রনাথ নানা রবীন্দ্রনাথের মতো নানা হীরেন্দ্রনাথ হয়ে ওঠার জীবন সাধনায় নিজেকে জড়াতে চাননি।

পারিবারিক সূত্রে উদার নৈতিকতার সদর্থক অবদান হিসেবে মুক্ত বুদ্ধি, স্বদেশি আন্দোলনের উত্তরাধিকার হিসেবে দেশাভিমান, গান্ধিযুগের গণ-রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংযোগ, আর মননে অনুশীলনে মার্কসবাদের প্রত্যয়, এই সব ধারা দেশের বিরল সংখ্যক যে মানুষদের সক্রিয় রাজনীতির বৃত্তে বিশ ও তিরিশের দশকে টেনে আনে, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই অগ্রগণ্য। সেই সক্রিয়তা, দেহ আগের তুলনায় কিছুটা অপটু হলেও হাতে আর মুখে, কলমে আর বক্তৃতায়, আজও সমান বহমান। হীরেন্দ্রনাথকে যাঁরা কিছুমাত্র জানেন, না ঘনিষ্ঠজনদের কথা বলছি না, তাঁরাও স্বীকার করবেন, জীবনের, জগতের অনেক আশা নিরাশা, ভাঙ্গা গড়ার মধ্যে তাঁর বিশ্বাসের দৃঢ়তা বরাবরের মতোই অটুট আছে।

এদেশে ও বিদেশে ছাত্রজীবনে কৃতিত্ব, অধ্যাপনার সাফল্য, বাগ্মিতায় অনন্যতা আমাদের জীবনের চেনা জানা গণ্ডিতে যে জীবনযাপনের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছিল, হীরেন্দ্রনাথের আকর্ষণ সেই ধরণের মাপা সুনিশ্চিত সাফল্যের দিকে না ঝুঁকে বরাবর ছুটেছে ভিন্ন পথে। প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা...

ছাত্র রাজনীতির পোষকতা, দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতীয় জনগণের বন্ধুতা গড়তে সুহৃৎ সমিতি প্রতিষ্ঠা, বামপন্থী চিন্তাধারার বহুমুখী বিকাশে সর্বশক্তি নিয়োগ সেকালে যেভাবে তিনি শুরু করে ছিলেন, তার কোনটাই জাগতিক সাফল্যের বিচারে মোটেই গড়পড়তা বুদ্ধিজীবীর বাঞ্ছিত কর্মক্ষেত্র ছিল না। অথচ এই সব কাজেই হীরেন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনের সেরা দিনগুলি অকৃপণভাবে খরচ করে এসেছেন। এক সুগভীর শ্রেয়োবোধ থেকে মার্কসীয় বিশ্ববীক্ষায় দীক্ষিত হীরেন্দ্রনাথ নিজের নয়, সমাজ জীবন গড়ার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। সেই ব্রত উদ্‌যাপনে নব্বই পেরিয়েও তিনি অক্লান্ত যোদ্ধা।

হীরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা, ইংরাজি ও বাংলা দুটি ভাষাতেই কিংবদন্তি হয়ে রয়েছে। সেই বাগ্মিতার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে দেশের পার্লামেন্টে তাঁর পঁচিশ বছরের সংসদ জীবনে। এই নিবন্ধকারের সুযোগ হয়েছিল ১৯৫ সালে প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকে ১৯৭৭ সালে সর্বশেষ যে নির্বাচনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, সেই সবকটি নির্বাচনে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার। উত্তর-পূর্ব কলকাতা লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচকদের প্রবীণ প্রজন্ম আজও মনে করতে পারেন নির্বাচনী জনসভায় এই বিদগ্ধ মানুষটি বক্তৃতা করতে উঠে রাজনৈতিক বিতর্কের উত্তপ্ত পারদ সত্ত্বেও সহজাত সৌজন্যবোধ বিন্দুমাত্র বিসর্জন না দিয়ে প্রতিপক্ষকে কথায় কিভাবে মোকাবিলা করতেন। সব মানুষের কাছে পার্টির বক্তব্য বলার জন্যে মূলত মাতৃভাষায় বক্তৃতা করলেও শ্রোতারা হীরেন্দ্রনাথের বক্তৃতা ইংরাজিতে শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন, অনুরোধ করতেন অন্তত কয়েক মিনিট সেই ভাষায় বলার জন্যে। এগুলি ইংরাজি প্রীতির নিদর্শন ছিল না। সংসদে একজন বাঙালির ইংরাজি ভাষণ যে সংবাদের শিরোনাম হয়, সেই বাঙালি প্রীতির সেটা ছিল বিশ্বস্ত নিদর্শন। প্রধানমন্ত্রি জওহরলাল থেকে শুরু করে সেদিনের লোকসভায় এমন কোন সদস্য বিশেষ কেউ ছিলেন না, যিনি এই বাঙালি সাংসদের বক্তৃতার সময় গরহাজির থাকতে চাইতেন। ইংরাজিতে এই অসামান্য বাগ্মিতায় হীরেন্দ্রনাথকে আত্মতৃপ্ত হয়ে কিন্তু কেউ কোনদিন বলতে শোনেনি, 'কেন আমি 'সাম্রাজ্যবাদী।'

ইংরাজদের জীবন ও সমাজের অনুরাগী না হয়েও দেশের সংবিধান পার্লামেন্টারী ব্যবস্থাকে শিরোধার্য করায় কমন্স সভার রীতিনীতি তিনি যেভাবে আয়ত্ত করেছিলেন তার দৃষ্টান্ত বিশেষ চোখে পড়ে না। তাই দেখা যায়, সাংসদের

জীবন শেষে হলেও লোকসভার স্পীকার তাঁকে বিশেষ পরামর্শদাতারূপে দায়িত্ব নেওয়ার জন্যে অনুরোধ করেছেন। দূরদর্শনে এখন পার্লামেন্টের দুই কক্ষের অধিবেশনের সরাসরি সম্প্রচার দেখে মনে হতে বাধ্য, পার্লামেন্টারী রীতিনীতির কোন হাল হয়েছে। নব্বই বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার হাসিম আবদুল হালিম এই সেদিন সেকথা উল্লেখ করে বলেছেন, এই রাজ্যে বিধায়কদের পার্লামেন্টারী রীতিনীতিতে প্রশিক্ষিত করতে কেন তিনি প্রায়ই শরণ নেন বর্ষীয়ান হীরেন্দ্রনাথের।

তিরিশের দশকের মাঝামাঝি থেকে কমিউনিস্ট হীরেন্দ্রনাথ সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি ও বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্য হিসেবে যতো মানুষের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ জোরদার হয়েছিল। তাঁদের তিনজন সম্পর্কেই তিনি মূল্যায়ন ভিত্তিক-জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন, যেখানে একজন মার্কসবাদীর নির্মোহ বিচার আর একজন দেশাভিমানীর জীবন-দৃষ্টির মেলবন্ধন ঘটেছে। বলা বাহুল্য, একজন গোঁড়া মার্কসবাদী কিম্বা তাঁর বিপরীতে একজন একান্ত জাতীয়তাবাদী, কোন পাঠককেই তিনি খুশি করতে পারেন নি। তাঁর 'নেহরু প্রীতি' তো একবার নির্বাচনী বিতর্কেও জোরালো ভাবে উঠেছিল। সহজাত বিনয়ে তিনি তার জবাব দিয়েছেন, কিন্তু নিজের বক্তব্য এতোটুকু বদলাতে রাজী হননি। ঠিক এই মনোভাবই তাঁর বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের আকারে প্রকাশ পেয়েছে স্তালিনের মূল্যায়ণে, গোরবাচেভের পেরেস্ত্রৈকা ও গ্লাসনস্তের তীব্র সমালোচনায়, সমাজতন্ত্রের সোভিয়েত মডেল ব্যর্থ হওয়ার পরেও মার্কসবাদের চূড়ান্ত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর প্রত্যয়ে। হীরেন্দ্রনাথ মানুষের উপর যে বিশ্বাস নিয়ে জীবন শুরু করেছিলেন, মানবিকতার ভাস্বর ভবিষ্যতের স্বপ্নে সেই বিশ্বাস তাঁর একানব্বই বছর বয়সে অম্লান আছে দেখে বিস্ময়ে, শ্রদ্ধার আপ্লুত না হয়ে পারা যায় না। এই সংসার, বিশ্বাসহীন আত্মমগ্নতার যুগে তিনি শতায়ু হোন সুদৃঢ় প্রত্যয়ে।

বাসব সরকার

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে দুটি মোসলেম পত্রিকা—৩

সংকলক ঃ কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়

কিশোর পত্রিকা 'আঙুর' ১৩২৭ (১৯২০) এবং 'সহচর' ১৩২৮ সনে (১৯২১) প্রকাশিত হয়। পত্রিকা দুটির সম্পাদক হলেন যথাক্রমে মোহম্মদ শহীদুল্লাহ এবং সৈয়দ নওশের আলী। 'সহচর'-এর ক্ষেত্রে বারবার সম্পাদক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে।

'আঙুর' পত্রিকাটি কিশোরদের জন্য হলেও সম্পাদক ভূমিকাতে নতুন ভারত ও সাম্য মৈত্রীর কথা বলেছেন এবং একদিন সেই সোনার ভারতের খোলা হাওয়ায় ছেলে-মেয়েদের বিচরণ করার স্বপ্ন ও দেখেছেন।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম ব্যক্তিত্ব দীনেশচন্দ্র সেন এই পত্রিকায় একটা চিঠিতে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির পক্ষে যে বলিষ্ঠ মত প্রকাশ করেছেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'আঙুর'-এর সম্পাদক 'আমাদের কথা' শীর্ষক ভূমিকায় লিখছেন, "এই নতুন যুগে আমরা নূতন আশায় বুক বাঁধিয়া নূতন পথে যাত্রা করিয়াছি। লক্ষ্য, নূতন ভারত। ভেদদ্বন্দ্বের লোহার ভূমি ছাড়িয়া সাম্য মৈত্রীর সোনার ভূমির সন্ধানে আমরা বাহির হইয়াছি। বয়সে বুড়া আমরা, জানি না তলায় পৌঁছিতে পারিব কি না। কিন্তু ছেলে-মেয়েদের হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছি। হয়ত তাহারা একদিন সেই সোনার ভারতের খোলা হাওয়ায় তাহাদের শরীর মন সবল করিতে পারিবে। পুরাতন পাতা ঝরে ঝরুক। নূতনই বজায় থাকুক। তাহারা চিরদিন আঙুর পাতার মতন নধর সবুজ থাকিয়া আঙুরের মতন অমৃত ফল ধরুক। আঙুরের রসে বাঙ্গালীর মুখ মধুময় হউক, মস্তিষ্ক সতেজ হউক, হৃদয় তাজা হউক। আমীন।"

পত্রিকাটির প্রথম বর্ষের পঞ্চম সংখ্যায় সম্পাদকের অনুরোধে দীনেশ চন্দ্র সেনের চিঠিটি প্রকাশিত হয়েছে। তিনি এই চিঠিতে লিখেছেন, "কিন্তু আমি কি লিখিব? একটা কথা মনে হইতেছে; আজকালকার এই সাম্যবাদের দিনে

হিন্দু ধর্ম ও মুসলমান ধর্মে কোন ঝগড়া থাকিতে পারে না। দেখুন না আপনার মত আরবী ফার্সীর মৌলভী সশ্রদ্ধ হইয়া বেদ পড়িতেছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন যেন আমরাও সশ্রদ্ধ হইয়া কোরাণ পড়ি। দুই জাতির ধর্ম শাস্ত্র ও সাহিত্য যদি পরস্পরে পাঠ করেন, তবেই আমাদের ঐক্য দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়াইতে পারিবে। পরস্পরের সঙ্গে গভীররূপে পরিচয় স্থাপন করিতে হইলে আপনার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে হইবে। যিনি হাফেজ ও চণ্ডিদাস পড়িবেন, তিনি দেখিবেন, ফার্সী ও বাঙ্গালা কবি দুই সহোদর—তাহাদের হৃদয় একই প্রীতির সূত্রে গ্রথিত। কিন্তু একথা ছাড়াও আর একটি কথা আছে।

ইরান তুরান হইতে কতজন মুসলমান এদেশে আসিয়াছিলেন? তাঁদের সংখ্যা আমরা হাতের আঙুলে গণনা করিতে পারি। আপনাদের অধিকাংশ আমাদের জ্ঞাতি। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্ক চুকিয়া যায় নাই। তাঁহারা যদি ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া থাকেন—তাহাতে আমাদের প্রীতি লোপ হইবার কোন কারণ নাই। আমাদের মধ্যে যাঁরা ব্রাহ্ম আছেন, বৌদ্ধ আছেন—তাঁদের কি আমরা ছাড়িয়া দিয়াছি? আপনাদের যদি আমরা প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারি, তবে সেই প্রাচীন রক্তের সম্বন্ধ এখনও সাড়া দিবে। ভাই ভাই কত না ঝগড়া বিবাদ করিয়া থাকে, কিন্তু মায়ের কথা মনে হইলে উভয়ের গাও বাহিয়া যে অশ্রু পতিত হয়, তাহাতেই সেই পূর্বতন সুষুপ্ত প্রীতি জাগিয়া উঠে। আমাদের মা এই শুধু বঙ্গভূমি নহে। হয়ত বহু শতাব্দী গত হইল, আপনাদের ও আমাদের পূর্ব পুরুষ সত্যই একই মায়ের অঙ্কে বসিয়া স্তন্য পান করিয়াছিলেন। সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়া আসুন আপনারা আমাদের সঙ্গে প্রীতির আলিঙ্গনে আবদ্ধ হউন।"

চিঠিতে তিনি ঘোষণা করেছেন যে কোন মুসলমান বালক যদি অবিকৃতভাবে 'মালঞ্চ মালার গল্প,' 'রূপমালা ও কাঞ্চন গলার গল্প' এই পত্রিকায় পাঠায় এবং সেটি উৎকৃষ্ট হলে লেখককে তিনি রৌপ্য পদকে ভূষিত করবেন।

সহচর

সৈয়দ নওশের আলী সম্পাদিত 'সহচর'-এর প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় (মাঘ ১৩২৮) মোহাম্মদ ওয়াজেদে আলী 'যুগ সাধনার স্বরূপ' নিবন্ধকে 'স্বরাজ আন্দোলন', 'স্বাদেশিকতা', 'হিন্দু-মুসলমান সম্মিলন' ও 'উপদ্রব হীনতা' (Non Violence)—এই চারটি অধ্যায়ে ভাগ করেছেন। এখানে

কেবল 'হিন্দু মুসলমান সম্মিলন' শীর্ষক অধ্যায়টির কিছু অংশ তুলে ধরা হল।

লেখক বলেছেন, "হিন্দু মুসলমান সম্মিলনের অর্থ কেবল হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে মিলন ও সম্প্রীতি স্থাপন নহে, বরং হিন্দু, মুসললমান, পার্শী, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রভৃতি সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য, সাম্য এবং মৈত্রী বন্ধনের প্রতিষ্ঠা।" এই প্রসঙ্গে ওয়াজেদ আলী মহাত্মা গান্ধীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন যাতে বলা হয়েছে, "স্বার্থকে অবলম্বন করিয়া এই মৈত্রী বন্ধনের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না, প্রেম—অনাবিল স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি ইহার ভিত্তি হওয়া উচিত।"

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির অন্তরায়, সম্পর্কে লেখক বলেছেন, হিন্দুদের শিক্ষাভিমান, পদগৌরব এবং সঙ্কীর্ণতা; মুসলমানদের অন্ধতামূলক স্বধর্ম্ম নিষ্ঠা এবং অশক্ত হিন্দুদ্বেষিতা; পারসীদের উদাসীনতা ও ভারতীয় সমাজ হইতে পৃথক ভাগ; খৃষ্টানদের পাশ্চাত্য রীতিনীতির অনুকরণ প্রভৃতি কারণে ভারতে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলন-সমস্যার সমাধান হওয়া অত্যন্ত কণ্টকর হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু বড়ই আশা ও আনন্দের কথা, যুগ প্রভাবে একই শক্তির লৌহমুষ্টির চাপে পড়িয়া সকল অনৈক্যের সকল দ্বন্দ্ব কলহের অবসান হইতেছে। বিধাতা যেন বড় করুণার চক্ষে চাহিয়া ভারতের ভাগ্য শুভ ও কল্যানের পথে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। ভারতবাসী আজ বুঝিয়াছে, স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশবাসীর প্রতি প্রেম ব্যতীত তাহাদের নিস্তার নাই।"

'সহচর'-এর প্রথম বর্ষ ৭ম সংখ্যায় (১৩২৯) সম্পাদক হিসেবে ডাক্তার লুৎফর রহমন (বিদ্যাবিশরদ, সাহিত্য), প্রথম বর্ষ ১১তম সংখ্যায় সম্পাদকরূপে ইমদাদ আলী খান ও সাহাদাৎ হোসেন এই দুজনের নাম ছাপা হয়েছে। দ্বিতীয় বর্ষে মৌলবী ইমদাদ আলী খানের সম্পাদনায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'সাম্প্রদায়িক মিলন' শীর্ষক এক প্রবন্ধে মনীষী সৈয়দ আহমদ-এর একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। উক্তিটি হল, "হিন্দু মুসলমান ভারত মাতার দুই চক্ষু।" মিলনের পক্ষে এই উদ্ধৃতিটির পাশাপাশি লেখক অন্তরায়গুলি সম্পর্কে উভয় সম্প্রদায়ের কিছু স্বার্থান্বেষীকে দায়ী করেছেন।

দ্বিতীয় বর্ষের ষষ্ঠ সংখ্যার (১৩৩০) 'হিন্দু-মুসলমান' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি প্রসঙ্গে কংগ্রেস আয়োজিত মৌলনা আজাদ, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সহ চার-পাঁচ জনের তথ্যানুসন্ধানী দলের রিপোর্ট তুলে ধরা হয়েছে। রিপোর্টে মিলনের অন্তরায়গুলিকে দুটি

ভাগে ভাগ করে দেখানো হয়েছে, "শিক্ষিত হিন্দু মুসলমান মূলতঃ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগিরি, জেলা বোর্ডের ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্যগিরির জন্য স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া আজ পরস্পর বিরোধী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আর সাধারণ হিন্দু-মুসলমান মোপলা, মুলতান হিন্দু-শুদ্ধি-কার্য্য সংঘাতন প্রভৃতি ব্যাপারে পরস্পর পরস্পরের শত্রু সাজিয়াছেন।"

সম্পাদক এই প্রসঙ্গে সম্পাদকীয়তে বলেছেন, "ব্যবস্থাপক সভার সদস্যগিরি ও জেলা বোর্ডের সভ্যগিরির অজুহাতে ভারতীয় শিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আজ যে রেষারেষি মূর্ত্তিমান হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা বাস্তবিকই নূতন, এবং মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড প্রবর্তিত নূতন শাসন সংস্কারেরই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল। নূতন শাসন সংস্কার অনুসারে জাতি হিসাবে সভ্য নির্বাচিত হয়। এই জাতি হিসাবে সভ্য নির্বাচনই আজকালের এই জাতিগত বিদ্বেষের মূল কারণ। হয়ত জাতি হিসাবে ভাগাভাগি না করিয়া সমগ্র ভারতবাসীকে এক জাতি করিয়া সভ্য নির্বাচন প্রবর্ত্তিত হইলে আজ আর এই অনাবশ্যক বিবাদ-বিসংবাদ বিগ্রহ-পরিগ্রহ করিয়া দেখা দিত না।"

দ্বিতীয় কারণটি সম্পর্কে সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, এই কারণটি নূতন নহে, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ধর্ম্মদ্বেষ আজ নূতন নহে বরং কংগ্রেস, খিলাফত আন্দোলন অপেক্ষাও অধিক পুরাতন।"

সম্পাদক তাঁর সম্পাদকীয়র উপসংহারে বলেছেন, 'স্বরাজ লাভের আশাকে ফাঁসী দিয়া পরস্পর-এত বিদ্রোহে যে কোন জাতিই বলীয়ান হউক না কেন স্বাধীনতা ভিন্ন তাহাদের কোন ইষ্টই লাভ হইবে না। কারণ, কর্ম্মই স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতাই ধর্ম্ম।'

পটভূমি লক্ষ্মণপুর বাথে

কৃষ্ণেন্দু

অনুবাদ ও সংযোজন : সৌমিত্র দস্তিদার

আমি যেখানে জন্মেছি, যে পরিবেশে বড হয়েছি সেখানে জাতপাত কোন নতুন ঘটনা নয। আমাব গ্রাম বাসুদেবপুর—যাদব প্রধান। আরা শহর থেকে ঘণ্টা দেড়েকেব পথ। মনে আছে ছোটবেলায় হবিজন বা অন্যকোন পিছিযে পডা সংপ্রদায়েব ছেলেদেব সঙ্গে খেলতে গেলে বাডিব বডবা এমনকী প্রতিবেশীরা বাবণ কবতো, কবিস কি ওইসব ছোটলোকদের সঙ্গে খেলে কি জাত খোযাবি। তখন বুঝতাম না। এখনও বুঝিনা কিভাবে কেউ জাত খোযায।

পবে যখন কলেজ বিশ্ববিদ্যালযে পড়েছি প্রত্যক্ষ বাজনীতিতে এসেছি তখন দেখেছি যে গোটা বিহাব জুডে জাতব্যবস্থাটা কি ভযানক, কি কঠিন। আমি দীর্ঘদিন ধবে ভাকপা মালের সঙ্গে যুক্ত। বস্তুত গোটা ভোজপুর জেলায লড়াইটা এখন মূলত সীমাবদ্ধ উচ্চবর্ণেব প্রতিনিধি বি জে পি আব তার পোষ্য বণবীব সেনা ও দলিত সমর্থকদেব নেতৃত্বে থাকা মালেব মধ্যে। জাতব্যবস্থা ওখানে কিবকম দুটো উদাহবণ দিই। আমি প্রথম পার্টিব তবফে কাজ করতাম চান্দোয়ায। চান্দোযা হবিজন অধ্যুষিত গ্রাম। আবা শহবেব কাছে। চান্দোযার পবিচযও সহজে দেওযা যায যদি বলি ওটা বাবু জগজীবন বামেব গ্রাম। তা সেখানে দেখেছিলাম, এখনও প্রথাটা আছে যে গ্রামে নতুন বউ এলে ব্রাহ্মণ তা যে বযসেরই হোক না কেন আগে তাকে প্রণাম করে তবে স্বামীর ঘবে যেতে পাববে। ওখানে যে কোন হবিজন অক্লেশে বযসে ছোট উঁচু জাতেব ছেলেকে প্রণাম করে। বাবুজী মন্ত্রী হবাব পরেও ওই রীতি মেনে চলতেন নিষ্ঠাব সঙ্গে।

উননব্বই সালেব আগে হরিজনরা ব্যাপকভাবে ভোট দিতে পারত না। আরার কাছে দানুহিবিটা বলে একটা জাযগা আছে। বাজপুত প্রধান গ্রাম। সেখানে জ্বালাসিং বলে কুখ্যাত গুণ্ডা ছিল, সে উননব্বই সালে ভোটের লাইনে দাঁড়ানো হবিজনদেব গুলি কবে মেবেছিল।

লাইন ভেঙ্গে গেছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে নকশালপন্থীরা জ্বালাসিং-কে খুন করে। তারপব ওই প্রথম পিছড়ে বর্গেব মানুষেবা ভোট দেয়। দ্বিতীয়

উদাহরণটা ওই ভোট নিয়েই। মনে আছে সেবারই আরায় এক বৃদ্ধ আহিরকে অনেক কষ্টে রাজি করিয়েছিলাম ভোটটা দেবার জন্য। বৃদ্ধ সেজেগুজে জীবনে প্রথমবার ভোট দিতে এসেছিলেন। বাইরে এসে উনি কেঁদে ফেলেছিলেন, এই প্রথম উনি নিজেকে মানুষ ভাবতে পেরেছিলেন।

ভোজপুরে নকশালপন্থী রাজনীতির পতাকা প্রথম উড়িয়েছিলেন ৬৭ সালে দুই বন্ধু একোয়ারি গ্রামের জগদীশ মাস্টার ও রামনরেশ রাম। জগদীশ মাস্টার পরে শহীদ হন। রামনরেশজী এখন জনপ্রিয় বিধায়ক। তবে আজকের এই বহু চর্চিত লড়াই-এর জমি তৈরী করেছিলেন কলকাতার ছেলেমেয়েরা। জমি দখল কৃষকদের মধ্যে তা বন্টন করা, লাল দস্তা বা লাল সেনা দিয়ে সামন্ত প্রতিরোধ ঠেকানো সর্ব বিষয়ে নেতা ছিলেন সুব্রত দত্ত। জহর নামেই পার্টিতে যার ব্যাপক পরিচিতি। জহরদা প্রথম সেন্টার নিয়েছিলেন আরার ঘিঞ্জি অব্যয়পুর মহল্লায়। জায়গাটা পুরনো দর্জিপাড়া। লীলাদিদিও এসেছিলেন কলকাতা থেকে ও'র ভাল নাম সম্ভবত স্মৃতিকণা। উনি লালসেনার কম্যান্ডার ছিলেন। দুজনেই পুলিশের সঙ্গে এনকাউন্টারে শহীদ হন। তবে আজ ওরা দুজন ভোজপুরের মাটিতে অমর হয়ে আছেন প্রবীণদের স্মৃতিতে ও চারণদের গানে।

এসব পুরনো কথা বলছি কারণ রণবীর সেনার উত্থান বা একটা বাথানিটোলা কিম্বা লক্ষ্মণপুর বাথে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এমন একটা দিন নেই যে বিহারে কোন না কোন খুনের ঘটনা ঘটছে। লক্ষ্মণপুর বাথের পর পরেই বদলা হিসেবে তিনজন রণবীর সেনার কর্মি খুন হয়েছে ভোজপুরে। কটা খবর আর কাগজে বের হয়? আসলে এই সামন্ত ব্যবস্থা যতদিন থাকবে ততদিনই এই খুনকা বদলা খুন চলতেই থাকবে। যতদিন পাসি পাসোয়ান পাসার দুসন সব নীচুবর্ণের লোকেরা একতরফা মার খাচ্ছিল কেউ একটা কথাও বলেনি। পাল্টা মার শুরু হতেই বিহারে গেল গেল রব উঠল।

চুরানব্বই প'চানব্বই সাল থেকে বিহারের অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। কারণ ততদিনে জন্মলাসিংহের দৌরাত্ম বন্ধ হয়েছে। লাল পতাকার নীচে সংগঠিত হয়েছে বিশাল জনতা। একোয়ারিতে হরিজনদের ভোটে রামনরেশ জী জিতেছেন। আরা লোকসভা সিট বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন আমাদের প্রার্থী রামেশ্বর প্রসাদ। জমি দখল ও তা কৃষকদের মধ্যে বন্টন করো—তখন আমাদের ঘোষিত ও বাস্তব কর্মসূচী।

সেইসঙ্গে গোটা ভোজপুর জেলায় শুরু হয়েছে নাকাবন্দী অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবরোধ। যে সব গ্রামে উচ্চবর্ণের সামন্ত অত্যাচার বেশী, যেখানে ন্যূনতম মজুরিও কৃষকরা পায়না আমরা বেছে বেছে সেসব জায়গায় নির্দিষ্ট জোতদার, জমিদারদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ শুরু করি। জোতদারদের গুণ্ডা লেঠেলদের বাধা দিই কৃষকের প্রাপ্য ফসল জোর করে কেটে নিয়ে যেতে।

দু' এক জায়গায় সংঘর্ষ হয়। পুলিশ যায়। প্রশাসন উচ্চবর্ণের মদত দেয়। কিন্তু দীর্ঘদিনের বঞ্চনার পরে জোটবদ্ধ কৃষক জনতা গ্রামে গ্রামে কঠিন লড়াই-এ নামে।

রণবীর সেনা তো হালে। তার আগেও উচ্চবর্ণের বাবুরা পুলিশ প্রশাসনের মদতে কৃষকদের দমনের জন্য হরেক কিসিমের ঠ্যাঙ্গাড়ে বাহিনী বানিয়েছিল। তালিকাওয়ারি হিসেবটা এরকম—কিষাণ সিকিউরিটি টাইগার, (ভূমিহার সেনা)। গঙ্গাসেনা—ভোজপুর জেলার ভূমিহার মূলত জেলেদের হত্যাকারী সেনাদল।

স্বাধন লিবারেশন ফ্রন্ট—জেহানাবাদ—ভূমিহার (দলটি অঘোষিত রণবীরের বিটিম। সত্যেন্দ্র সেনা—ঔরঙ্গাবাদ—রাজপুত। সানলাইট সেনা—পালামৌ—রাজপুত। ভূমিসেনা—পাটনা জেহানাবাদ—কুর্মি। ব্রহ্মর্ষি সেনা—ভূমিহার —ভোজপুর কুঁয়ার সেনা—ভোজপুর—রাজপুত। লক্ষ্যনীয় যে অধিকাংশ সেনার উৎপত্তি ও রমরমা ভোজপুর জেলায়। তারও সমাজতাত্ত্বিক কারণ আছে। বস্তুত এ জেলায় লড়াই-এর ঐতিহ্য বহু পুরনো। পিছড়ে বর্গের মানুষ এখানে তুলনায় অনেক বেশী সংগঠিত। সামন্ততন্ত্রের বোলবোলাও অনেক জেলার চেয়ে আজও এখানে বেশী।

সামন্ত বলতে যদি আমরা প্রচলিত বা ধ্রুপদী সামন্ত বুঝি তাহলে ভুল হবে। এখানে বিঘের পর বিঘের জমির মালিক প্রায় নেই বললেই বলে। কিন্তু মানসিকতা এখানে আজও রয়ে গেছে মধ্য যুগে। সাধারণ মধ্যবিত্তের বিয়েতেই এখানে বাঈনাচ না হলে চলে না। আমার কলেজে পড়া শালী একবার নাটক করেছিল বলে আমার মহল্লার মাতব্বরেরা সালিস বসিয়েছিল কাজটা কতটা গর্হিত তা বোঝাবার জন্য। ভোজপুরে আজও বাবার ছেলে হলে বাজনা বাজে, মেয়ে হলে বাড়িতে কান্নার রোল ওঠে।

বেলাউর-যে গ্রামে রনবীর সেনার জন্ম, উচ্চবর্ণের ভূমিহারদের সবচেয়ে বড় গড় সেখানে কি অবস্থা, বললে বিশ্বাস করবেন না। সেখানে আজও ছোট

জাতের কোন মহিলা ডোলিতে চেপে উচ্চবর্ণের মানুষদের সামনে দিয়ে যেতে পারে না। কেউ জাতে ছোট হলে সে ভাল পোষাক পড়তে পারে না পায়ে জুতো দিতে পাবে না।

আমবা এ সবের প্রতিবাদ করেছিলাম। তাই এত অশান্তি।

আগেই বললাম বেলাউব ভূমিহারদেব বড ঘাঁটি। ভোজপুরের সর্বত্র যখন নাকাবন্দী হচ্ছে, ঠিক হল যে বেলাউবেও হবে। কথা হয়েছিল, বিরানব্বই সালেব সেপ্টেম্বরে ওখানে সভা হবে কৃষকদেব সংগঠিত করে প্রথমে মজুবি বৃদ্ধির আন্দোলন করা হবে। মজুবি কিন্তু ভোজপুরেব কোথাওই কুড়ি-বাইশ টাকার বেশি নয়।

এই টাকাও দীর্ঘ আন্দোলনেব ফল। তা যেটা বলছিলাম, সেপ্টেম্বরে সভা হবে, ভূমিহাববা করল কি, আগস্ট মাসের পনেরো তারিখে স্বাধীনতা দিবসে বাবা বনবীব চৌধুবীব নামে একটা সমিতি তৈবী করল। বনবীব চৌধুবী ছিলেন মোগল জামানায় ভূমিহারদেব এক বড বীব তাব জন্ম ওই বেলাউব গ্রামে। তাকে স্মরণ কবে জন্ম নিল-বনবীর সংগ্রাম সমিতি। ওই সমিতিই ধীবে ধীবে হযে গেল বনবীব সেনা।

আমাদেব অভিজ্ঞতা বলে এ যাবৎ জাতভিত্তিক যে সব প্রাইভেট আর্মি ছিল বা আছে তারা কেউই রনবীব সেনাব মত সংগঠিত শক্তি নয়। রনবীবের ফৌজ বিরাট। অন্তত হাজার দশেক লোক ওদেব আছে। তাদের অধিকাংশই আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত। প্রশ্ন উঠবে এই অস্ত্র কোথা থেকে এল' সোজা হিসেব মিলিটারি বা সি আব পি তে যত বিহাবেব লোক বযেছে তার অধিকাংশই ভোজপুবেব আবার তাদেব বেশীব ভাগই ভূমিহাব বা বাজপুত। আমি নিশ্চিত, রাষ্ট্রীব আনুগত্য ভুলে ভাই বেরাদবদেব লডাই-এ তাবা বেশী মাত্রায় ভাইদেব মদত দিতে উৎসাহী।

আনুষ্ঠানিকভাবে বনবীব সেনা জন্ম নিল ১৯৯৪ সালেব ২৮শে সেপ্টেম্বব। তাব আগেই পনেরোই আগস্ট ঘোষণা হয়েছিল ভূমিহাববা এক কাট্টা হযে নিজস্ব বাহিনী গডতে চলেছে। শুনলে অবাক হবেন ওই মিটিং-এ হাজিব ছিলেন লালু প্রসাদ যাদবেব বন্ধু ও গুজবাল মন্ত্রীসভার প্রাক্তন সদস্য চন্দ্রদেও প্রসাদ বর্মা।

রনবীর সেনা যেদিন জন্ম নিল সেদিন বাতেই সে তাব ভবিষ্যতের স্বরূপ উন্মোচনে ব্যস্ত হযে পড়ল। সংঘর্ষেব শুরুয়াৎ কিন্তু এক আপাত তুচ্ছ ঘটনার

মধ্যে দিয়ে। হরিজনদের এত অগ্রাহ্য ওই গ্রামে করা হোত দিনকে দিন তা মাত্রা ছাড়াচ্ছিল। আমাদের এক সমর্থক রামরুচি রাম বলল, আমার বউ পাল্কী করে উচ্চবর্ণের লোকেদের সামনে দিয়ে যাবে দেখি কে কি করে।

রামরুচির সাহস ওদের পছন্দ হয় নি। পালকীতে ওঠা মাত্র ওরা ঝাঁপিয়ে পড়ল রামরুচি ও তার বউ রাজকিশোরীদেবীকে কুপিয়ে খুন করল। সে রাতেই বেলাউরের চকবদ টোলায় রামরুচির বাড়িতে রণবীরের কর্মীরা আগ লাগিয়ে লুঠ করল। সেই সূত্রপাত। তারপর এই তিন বছরে রণবীর সেনার অত্যাচার আগেই মাত্রা ছাড়া হয়েছে। রক্তের নেশায় ওরা বেলাউরের সীমা ছাড়িয়ে পৌঁছেছে ভোজপুরের সর্বত্র এমন কী শোন নদীর ওপারে পাটনা জেহানাবাদেও।

রণবীর সেনার সঙ্গে মালের সরাসরি সবচেয়ে বড় সংঘর্ষের দিনটাও মনে আছে। চুরানব্বই সালের ১৪ই নভেম্বর। আরায় সেদিন পার্টির বড় মিটিং ছিল। দুই পুরনো কমরেড, জাতে মুশাহার-জিউৎ ও সাহাতু তাদের স্মরণ অনুষ্ঠান ছিল। হঠাৎ খবর পেলাম বেলাউরে রণবীর-পার্টি কমরেডদের ওপর হামলা চালিয়েছে। আমাদের ছেলেরাও সশস্ত্র ছিল। কিন্তু সংখ্যায় মাত্র চার পাঁচজন, আর ওরা বড় বাহিনী সঙ্গে পুলিশ। তবু কমরেডরা লড়েছিল। কিন্তু গুলি ফুরিয়ে গেল। ওরা আমাদের নেতা প্রযাগ শাকে নৃশংসভাবে খুন করে তারপর থেকে তো শুধু লড়াই আর লড়াই। ভোজপুরের সর্বত্র এখন অগ্নিগর্ভ। সহর, সন্দেশ, একোয়ারি, নানৌর, বাথানিটোলা, বেলাউর—আজ ওরা গুলি চালাচ্ছে তো কাল আমরা। ভাবতের কৃষক মুক্তি আন্দোলনে ভোজপুর এক নয়া ইতিহাসের জন্ম দিচ্ছে। এ লড়াইকে শুধু জাতপাতের লড়াই বলা ঠিক হবে না।

পিছড়ে বর্গের এই আত্মপ্রত্যয়ী লড়াই নিয়ে ভোজপুরের বুদ্ধিজীবিরাও অত্যন্ত সোচ্চার। প্রযাগ খুন হবার পরেই নাটক লিখলাম—'বেলাউর দর্শন' একের পর এক সহজবোধ্য অথচ গা গরম করা সংগীত রচনা করে ভোজপুরের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষকে উদ্বুদ্ধ করলেন চারণ কবিরা। কে নেই সে দলে, বৃদ্ধ ছবিলাজী স্বাধীনতা সংগ্রামী রামকান্ত দ্বিবেদীরমতো, রামদেওকবি দুর্গেন্দ আকারি ও ভোজপুরের গদদার কৃষ্ণকুমার নির্মোহাজী।

আমরা নাটক লিখলাম—মেরা নেহী, তেরা নেহী সব কুছ হামারা—কি জনপ্রিয় সে নাটক গ্রামে গ্রামে বেশ করলাম, বনবীর সেনা বিরোধী নাটক, লোকে

মুগ্ধ হযে দেখতো। আবার উত্তরে এক গ্রাম মকদুমপুরেই রণবীর সেনা নাটকেব ওপর হামলা চালাল।

আমাদেব প্রায তিন চারশো সদস্য সমর্থক খুন হযেছেন। নির্মোহীজী গান বাঁধলেন

কতনু কটব কেয়াবি
অব ধাবছান অব তাহার বারি
বেলাউর লালে লাল হো গইল

দিন একভাবে যায় না, দিন একভাবে যাবে না দেখতে দেখতে বেলাউর লালে লাল হয়ে যাবে··· ।

সেই আশাতেই তো দিন যাপন
সেই প্রত্যয নিযেই তো বেঁচে থাকা।

সংযোজন ঃ

বিহারে আমি চারবার গেছি। মাইলেব পব মাইল গাড়ীতে ও পাযে হেঁটে ঘুরেছি। প্রচুব লোকেব সঙ্গে মিশেছি। তাবপব যতবারই কলকাতায ফিবে এসেছি ততবারই বেশ বুঝেছি চাব কেন, চারশো বার গিযেও বিহারকে জানা-বোঝা যায না।

আমাব যাবাব উদ্দেশ্য বিহারেব এই রক্তাক্ত সময নিযে একটা তথ্যচিত্র বানানো। বিবদমান দুই গোষ্ঠী রণবীব সেনা ও বিভিন্ন নকশালপন্থী দল। পাটনায আমাকে বলে দেওয়া হল যে ভোজপুরেব বিভিন্ন জায়গায রণবীব সেনাব লোকেদেব খোঁজ করতে। বলে দেওযা হল মানে, সম্ভাব্য জাযগাব হদিশও দেওযা হল। কিন্তু পাক্কা তিনদিন আবাব শহব চষে ফেলেও কারুর হদিশ করতে পারলাম না।

পাটনা থেকে যেবার প্রথম আরাব পৌঁছলাম তখন খুব গবম। লু বইছে। ঠিক করলাম সন্ধ্যেব দিকে সি পি, আই এম এলেব অপিসে যাব। শোনামাত্র আমি যে বাড়ীতে উঠেছি তারা সবাই চেঁচিযে উঠল মাথা খারাপ। গেলে দুপুরেই যাওযা ভাল। সন্ধ্যের পব পার্টি অপিস নিরাপদ নয।

পার্টি অপিসটা বেল স্টেশনেব গায়েই। বেলেরই একটা গুমটি দখল করে জেলা দপ্তর তৈরী হয়েছে। কিছুদিন আগে সন্ধেবেলায় কোত্থেকে মাটি ফুঁড়ে এসে রণবীরেব লোকেরা সোজা পার্টি অফিসে গুলি চালিয়ে অন্ধকারে পালিয়ে

গেছিল। কেউ ধবা পড়েনি। ভাগ্য ভাল, কাবু সেরকম বড চোট আঘাতও লাগেনি।

আমার বন্ধু কৃষ্ণেন্দুর বাড়ি আরা শহরেব খুব কাছে—পাকিবাতে। বাড়িটা ঠিক চিনতাম না। একজন বলল—আমাব বাইকে উঠুন এক্ষুনি পেঁছে দেব। যাচ্ছি আর যাচ্ছি পথ আব শেষ হর না। জিজ্ঞেস করলাম তোমাব এক্ষুনিটা আর কতদূর। ও হাসল। এসে গেছি। কৃষ্ণেন্দুব বাড়িব সামনে নামতে নামতে জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কি? এত সময় লাগল, আব বললে বাড়িটা কাছেই।

ও হাসল। অপবাধী অপবাধী মুখ কবে জানাল আপনাকে সামান্য ঘুরপথে নিয়ে এলাম। সোজা পথটা আমাদেব পক্ষে নিরাপদ নয়। পরে থাকতে থাকতে, যেতে যেতে বুঝেছিলাম গোটা ভোজপুব, বৃহৎ অর্থে পুবো বিহার ওবা আর আমরা-য় ভাগ হযে গেছে। পাকিবা হরিজন মহল্লায় আমবা নিবাপদ, ওদিকে কাতিবা বণবীবেব ঘাঁটি বিপদজনক।

অব্যয়পুরে নিশ্চিন্তে হাঁটা যায়—দর্জি মহল্লা, হরিজা কি হাতা রণবীবের লোকে ভর্ত্তি, সন্ধ্যের পব ওদিকে না যাওযাই ভাল।

অবস্থাটা একদম আমাদেব সত্তব একাত্তবেব মত। বিহাবের অবস্থা সত্যি খুব খারাপ। এমন একটা গ্রাম দেখিনি যেখানে কোন পুলিশ ব্যাম্প নেই। মনে পড়ছে যেদিন বেলাউব গেলাম, সেদিনটার কথা। সেই বেলাউর যেখানে কোন গাড়ী যেতে চায় না। পাটনায বন্ধু সাংবাদিকরা বারে বারে বলে দিযেছিল গ্রামের ভিতরে যেন না যাই। আমবা যেদিন গেলাম তাব আগের দিন পাশের গ্রামে মালেব সমর্থক এক চৌকিদার খুন হযেছে। চারপাশটা বড় বেশী চুপচাপ।

গাড়ী থেকে নামতে না নামতে প্যাবা মিলিটাবী ফৌজ আমাদের ঘিরে ফেলল। কেন এসেছি, কি প্রয়োজন পাস কোথায—হাজারো জিজ্ঞাসা। বললাম গ্রামে যাব—জবাব এল, হুকুম নেহী। কাব আবার হুকুম। আমরা যাব আমাদের রিস্কে, বলতে বলতে সামনে এগোলাম। সামনেই প্রাচীন সূর্য্যমন্দির—যার কাছেই বণবীর সেনাব হাতে প্রথম শহীদ হয়েছিলেন রামরুচিরাম ও তাব স্ত্রী রাজকিশোবী দেবী।

গ্রামের একপাশটা হরিজন টোলা। গবীবগুর্বোদের বাস। মাঝখানে রাস্তা। কোন বাড়ীটারি নেই। দুপাশে গম ক্ষেত। নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড।

ওপারে রণবীরের সবচেয়ে বড় গড়। নো ম্যানস্ ল্যান্ডে পা রেখেছি কি রাখিনি ছুটে এসে পথ আটকে দাঁড়ালো এক চৌকিদার হুজৌর মাত যাইয়ে, ওরা আপনাদের মেরে ফেলবে। ওরা কাউকে রেয়াৎ করে না।'

বারেকের জন্য থমকালাম। আমাদের সঙ্গে ছিল দিল্লী ইউনিভার্সিটির ছাত্রী পুষ্পাকুমারী। ও নকশাল মুভমেন্ট নিয়ে পি এইচ ডি, করতে এসে আমাদের সঙ্গে ভিড়ে গেছিল। বললাম—তুমি ফিরে যাও। ও প্রবল ভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে সামনে হাঁটতে লাগল। চৌকিদারের ম্লান ও হতাশ মুখটা এখনও চোখের সামনে ভাসে।

গ্রামের মধ্যে দেখি বড় বড় বাড়ি, প্রাসাদও বলা যায়। উচ্চবর্ণ ব্যাপারটা এই প্রথম বুঝলাম। সামনেই এক মন্দির। বৃদ্ধরা বিশ্রাম করছেন, তাদের জানালাম, কলকাতা থেকে মন্দির নিয়ে শুটিং করব বলে এসেছি।

মুখিয়া ও রণবীর সেনার বড় নেতা শিউপূজন চৌধুরীকেও সামান্য সময় পরে পেয়ে গেলাম। নানা কায়দায় তার ইন্টারভিউ ক্যাসেট বন্দী করে বেরিয়ে আসব, একটা বাচ্চা ছেলে বলল, ভেতরে চলুন, রামপুজনজী ডাকছেন।

কে তিনি। গিয়ে দেখি চকমিলানো বাড়ির দাওয়ায় তিন-চারটে ছেলে বসে ও দাঁড়িয়ে তার মধ্যে একটি ছেলে—সেই সম্ভবত রামপুজন গম্ভীর গলায় বলল, ক্যামেরা বন্ধ করুন। সাফ সাফ জানান কেন এসেছেন। আপনারা কি সি সি বি আই এর লোক? যত বলি নয়, ততই সে খেপে যায়। চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগল আমিতো আর্মি'তে আছি। কি করবেন আপনারা কিছু করতে পারবেন না। অনেকক্ষন পর কি খেয়াল হল, সে হুকুম দিল যান, এখুণি বেলাউর থেকে চলে যান, নাহলে বিপদে পড়বেন।

ছেলেটির চোখের হিমশীতল চাউনি আজও মনে পড়লে রক্ত ঠান্ডা হয়ে যায়।

শ্যুটিং করব কি। খালি টেনশন আর টেনশন। একোয়ারিতে গেছি মাঠের এপারে নকশালপন্থীরা ওপারে রণবীর সেনা। কি ভাগ্য আমরা থাকতে থাকতে গুলিযুদ্ধটা শুরু হয়নি। কিছুক্ষণ আগে খোলা মাঠে প্রচুর লোক দেখে গাড়ী থামালাম। কি ব্যাপার? না ওরা সবাই রাসার দুসাদ, পাসোয়ান, এই অপরাধে রণবীরের লোকেরা ওদের গ্রাম ছাড়া করেছে। কাছেই পুলিস ক্যাম্প। তবু বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে ওদের আশ্রয় এই খোলা মাঠে।

যত দেখছি মনটা ততই ভারি হয়ে যাচ্ছে। তবু একোয়ারিতে করে দেখা

আলোয় মন ভাল হয়ে গেল, যখন দেখলাম বিয়ের গান গাইতে গাইতে মেয়েরা গ্রামের পথে নির্ভয়ে হাঁটছে। জীবনতো এই। কোন মৃত্যু বিভীষিকা তাকে স্পর্শ করে না।

বিহার আমাকে বারে বারেই অবাক করেছে। হাইবাসপুরে যেদিন দশজন মুলায়র খুন হল, তার দু'দিন পরেই সেখানে গেছিলাম। রাস্তা থেকে গ্রামের ভেতরে মুলায়রটোলায় পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন এক মাঝবয়সী নিতান্ত দেহাতী এক গ্রাম্য লোক।

ঘটনার মাস দেড়েক পরে আবার ওদিকে গেছি। নিষিদ্ধ ঘোষিত নকশালপন্থী গোষ্ঠী পার্টি ইউনিটির এক ডেরায় হাইবাসপুরের কাছেই এক গ্রামে। সন্ধেবেলায় গল্প হচ্ছে। চা-মুড়ি খাচ্ছি। হঠাৎ এক প্রৌঢ় আমাকে বললেন কোথায় দেখেছি বলুনতো আপনাকে। চিনিচিনি লাগছে। চেয়ে দেখি সেই তিনি যিনি হাইবাসপুরে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছিলেন. কি করে জানব তিনিই লাল সেনার কমাণ্ডার।

ওপর থেকে দেখলে কিছু বোঝা যায় না। শান্ত, নিরীহ গ্রামগুলো। মেয়েরা কেউ খাটিয়ায় বসে উকুন বাছছে, কেউবা হাঁড়িতে ভাত চাপাচ্ছে। পুরুষেরা জনমজুরি খেটে বাড়ি ফিরছে। রাত হলেই জায়গাগুলোর চেহারা পাল্টে যায়। ঘাঁটি এলাকাগুলোয় শুরু হয় লালসেনার ট্রেনিং, অন্য গ্রামগুলোয় রণবীরের আতঙ্ক।

লক্ষ্মণপুর বাথেতেও গেছিলাম। থাকিনি। পাটনা থেকে যে যে ছেলেটি পাহারা দিয়ে নিয়ে গেছিল বড়জোর তার বয়স কুড়ি, একটা হাত সবসময় পকেটে ঢোকানো, মুখে হাসি। দু'দিন একসঙ্গে থাকতে থাকতে সম্পর্কটা গভীর হয়েছিল। পকেটের হাতটা বাইরে এনে দেখিয়ে ছিল ভিতরে রাখা লোডেড পিস্তলটা। ওইটুকু ছেলে। কোত্থেকে পায় এই সাহস।

রামপ্রকাশজীর কথা খুব মনে পড়ছে। পালামুর ছেলে। জেহানাবাদের দায়িত্বে ছিল। পাটনাতে ওর সঙ্গে আলাপ। শরীরটা ভাল ছিল না বলে লড়াই-এর ময়দান থেকে গোপন ডেরায় দু'দিন বিশ্রাম নিতে এসেছিল।

আমি যেদিন কলকাতায় ফিরব। ও সেদিনই জেহানাবাদ যাবে। বলল আবার আসবেন। আবারতো নিশ্চয় যাব। কাজে কিম্বা অকাজে। তখন রামপ্রকাশ বেঁচে থাকবে তো?

অরুন্ধতী রায় ঃ প্রচারের আলোকে ও সাহিত্যের নিরিখে

কত জন নেটিভ লেখক আজীবন কলম চালিয়ে কোটি কোটি টাকা রোজগার করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন? স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কি পেরেছিলেন? অরুন্ধতী রায় একটি মাত্র বই লিখে তাই করেছেন। মিডিয়ার কল্যাণে তাঁর বিষয়ে এইটাই সবচাইতে বড় খবর !

লেখিকা পিতৃ পরিচয়ে আধা বাঙালী। (হয়তো ঠিক আধা নয়, তাঁর ঠাকুমা নাকি মেমসাহেব।) মা কেরল বাসিনী সিরিয়ান ক্রিশ্চান। প্রাক্তন সংস্করণের আর একটি মিডিয়া সেন্সেশন 'কলাম' লেখিকা তসলিমা নাসরিন ছিলেন এ্যানাস্থেটিস্ট ডাক্তার। অরুন্ধতী রায়ের তেমনি আর একটি পরিচয় হল তিনি Delhi School of Architecture এর স্নাতক। তবে অরুন্ধতী রায় স্থপতি হিসেবে কিছু করেছেন বলে জানা যায় না। তিনি নাকি aerobics instructor হিসেবেও রুজি রোজগার করে থাকেন। একমাত্র প্রচার মাধ্যমে ছোট বড় ঢেউ তোলা ছাড়া তসলিমা নাসরিন ও অরুন্ধতী রায় এই দুজন লেখিকার রচনা ও প্রেরণা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের।

অরুন্ধতী শুরু করেন চিত্রনাট্য রচনা দিয়ে। প্রথম কাজ স্বামী প্রদীপ কিষেণ এর প্রথম সিনেমা 'In Which Annie Gives it to Those Ones'। ছবিটিতে অরুন্ধতী অভিনয়ও করেন। ছবিটির বিষয় বস্তু ছিল Delhi School of Architecture-তার ছাত্রছাত্রিদের জীবনধারার প্রতি তির্যক দৃষ্টিপাত ও অধ্যাপকদের নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা। তাঁর লেখা টেলিভিশন ও সিনেমার অন্যান্য চিত্রনাট্যের মধ্য 'Electric Moon' বেশ নাম করেছিল। 'বি বি সি চ্যানেল ফোর' এর সঙ্গে একবার কাজ করছিলেন। সেই সময়ে ফুলন দেবীকে নিয়ে সিনেমা নির্মাণের বিরোধিতা করে খানিক শোরগোলের সৃষ্টি করেন। বি বি সি'র সঙ্গে তাঁর চুক্তি বাতিল হয়ে যায়। পরের পর্বে অরুন্ধতী রায় কয়েক বছর মিডিয়ার দৃষ্টি এড়িয়ে অজ্ঞাত বাসে অতিবাহিত করেন। THE GOD OF SMALL THINGS তাঁর প্রথম উপন্যাস। তাঁর নিজের বিবৃতি অনুযায়ী সাড়ে চার বছরের একাগ্র অধ্যবসায়ে পঙ্‌ক্তি পঙ্‌ক্তি ধরে বইটি লেখা।

অথচ তিনি আরও বলেছেন দুবার করে কিছু লেখেন না। কেবল আগে পিছে করে পুরনো লেখাকে বার বার সাজান। একটু যেন ধাঁধা লাগে।

শোনা যায় জনৈক বিলিতি প্রকাশক-এর প্রতিনিধি পাণ্ডুলিপিটি পড়া শেষ করতে না করতে প্লেনে চড়ে দিল্লী হাজির হন, এবং তিনি সাড়ে-তিন কোটি সমান বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে বইটি বায়না করে ফেলেন। বিক্রম শেঠ-এর এক মিলিয়ন ডলারের রেকর্ড চূর্ণ হয়ে যায়। অন্তত দিশি মুদ্রার অঙ্কে। রাতারাতি অরুন্ধতী হয়ে ওঠেন বিশ্ববিখ্যাত। একুশটি দেশে বিভিন্ন ভাষায় তাঁর বই প্রকাশিত হচ্ছে। বইটির কথাবস্তুর মধ্যে, অসবর্ণ বিবাহ, বর্ণসংকর অবৈধ প্রেম, যমজ ভাইবোনের যৌন সম্পর্ক, পুলিশের হাতে অচ্ছুতের মৃত্যু, শিশুর সলিল সমাধি, নারী জীবনের বঞ্চনা, ঈর্ষা, হিংসা, দ্বেষ, আত্মত্যাগ ও বাৎসল্য ইত্যাদি ইত্যাদি, বিভিন্ন ধরনের রুচিকে আকৃষ্ট করবার মত রগরগে ও মুখরোচক ভূরি ভূরি উপাদান ঠাসা রয়েছে। নিসন্দেহে সেগুলি ম্যাডিসন রো-তে বইটির জনপ্রিয়তার উল্লেখযোগ্য কারণ। ব্রড-ওয়ে ও হলিউড-এর কবলে শীঘ্রই আমরা বইটির একটি চটকদার রূপান্তর দেখতে পাবো বলে আশা করা যায়।

যাঁদের এখনও বইটি পড়ার সুযোগ হয়নি অথবা যাঁরা কোনওদিন পড়বেন না, কারও কাছেই আজ আর সাঁইত্রিশ বছরের সুন্দরী লেখিকার হীরের নাকচাবি আয়ত নয়নের ঈষৎ ব্যথিত আনমনা দৃষ্টি ও বর্ণময় জীবনের নানান খুঁটিনাটি কিছুই অপরিচিত নেই। পত্র-পত্রিকা, টেলিভিশন ও ইণ্টারনেট দ্বারা প্রচারিত তথ্য অনুসরণ করলে মনে হয় উপন্যাসের প্রধান চরিত্র 'রাহেল' লেখিকারই প্রতিবিম্ব, এমনকি নাকের নাকছাবিটি পর্যন্ত। প্রথম উপন্যাস সাধারণত প্রকট ভাবে আত্মজীবনী মূলক হওয়াই নিয়ম। এই বইটি শতকরা কত ভাগ খাঁটি আত্মজীবনী তাই নিয়েও কৌতূহলের অন্ত নেই। লেখিকা নিজে বলেছেন, 'the emotional texture is absolutely real, but the narrative is fiction/'

লাখ লাখ বা কোটি কোটি টাকা দাও মারার রেকর্ডটাই যখন কোনও সদ্য উন্মোচিত শিল্প কর্মের বিষয়ে সবচাইতে বড় খবর হয়ে দাঁড়ায়, তখন তার রসোপলব্ধি ও মূল্যায়নে দুই বিপরীত বিভ্রান্তি উপস্থিত হয়। অনেকের কাছে টাকার অঙ্কটাই হয়ে ওঠে তার প্রধান গুণ আবার কারো কারো কাছে ঠিক তার উল্টো। বইটি নিয়ে আলোচনার ব্যাপারে বর্তমান পাঠকের আরও একটি বাড়তি বিপত্তি আছে। উপন্যাসে বর্ণিত প্রধান ঘটনাগুলি ঘটেছে কেরলের কোট্টায়াম

ও কোচিন শহর ও শহরতলিতে, ১৯৬৯ সালে। (অবশ্য ফিলহাল ইঙ্গ-ভারতীয় সাহিত্যেব কেতায বিলেত, মার্কিন মুলুক ইত্যাদিব ঝাঁকি দর্শনও বই থেকে বাদ পড়েনি।) আমার বিপত্তি হচ্ছে যে ১৯৬৯ সালে আমি কোট্টায়ম-এব সবোজমিনে বাস কবছিলাম। বই পড়তে পড়তে কেরলার অবিস্মরণীয় সুন্দব দৃশ্যাবলী চোখেব সামনে ভেসে উঠছিল। অনেক ক্ষেত্রে জাযগা, রাস্তা, নদী, মন্দিব, হোটেল, বেল স্টেশন, বিমান বন্দব ইত্যাদির নাম পর্যন্ত বদলান হয়নি। কেবলই মনে হচ্ছিল মূল চরিত্রগুলির ওরিজিনাল মডেলদের যেন কেমন চেনা চেনা লাগছে। অর্থাৎ আমাব বিশেষ আশংকা বর্তমান আলোচনা, I A Richards বর্ণিত Mnemonic Irrelevance (বা আত্মস্মৃতির মোহাচ্ছন্নতা) দোষে দুষ্ট হতে পারে।

কেবালার সিবিয়ান ক্রিশ্চান সম্প্রদাযকে পাশ্চাত্য দেশেব ইহুদিদেব সঙ্গে অথবা আমাদের দেশেব পার্শি সম্প্রদায়েব সঙ্গে তুলনা করা চলে। সংখ্যায় অল্প হলেও ক্ষুদ্র গোষ্ঠী জাতীয জীবনেব সমস্ত শাখায় নিজেদেব প্রতিভার স্বাক্ষব বাখতে সমর্থ হযেছে। উপন্যাসটি পাঠ করলে সিবিয়ান ক্রিশ্চান সম্প্রদাযেব এক অন্তবঙ্গ পবিচয় পাওযা যায। বলে রাখা ভাল, অনেক সিরিয়ান ক্রিশ্চান অবশ্য অভিমত প্রকাশ করেছেন অবুন্ধতীব বর্ণনা পল্লবগ্রাহী।

আমাদেব দেশে জাত পাত-এর ফিকিবে কেবল হিন্দু সমাজই দুষ্ট নয, মুসলমান ক্রিশ্চান ইত্যাদি সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও জাত বিচাব আশ্চর্য রকম ভাবে ক্রিয়াশীল। জাত বিচাবকে ভারতের অন্যতম fundamental unity বলে অনযাসে নির্দিষ্ট করা যায। বইটি নিয়ে নানান তুমুল বিতর্কের মধ্যে উচ্চ বর্ণের সিরিযান ক্রিশ্চান মহিলার একটি অন্ত্যজ যুবকের সঙ্গে অবৈধ সঙ্গমের প্রসঙ্গটি এখন আদালত পর্যন্ত গড়িয়েছে। মামলার শুনানি সম্বন্ধে আজ বিশ্ব ব্যাপি কৌতূহল।

উপন্যাসেব আখ্যানভাগ চারপুরুষ ধবে গড়ালেও সমস্ত কিছু দানা বাঁধে একটি দিনেব কতকগুলি নাটকীব ঘটনা পরম্পরাকে কেন্দ্র করে। গল্পটা মোটামুটি ভাবে এই রকম: সিরিযান ক্রিশ্চান চার্চ-এর শীর্ষে বিরাজ করেন রোমেব পোপ নয়, এন্টিয়র্ক-এর পেট্রিযার্ক। তিনি একবার কোট্টায়াম আসেন। সেই সময়ে ভিড়ের ঠেলাঠেলির মধ্যে কুঞ্জু নামেব একটি ছোট ছেলেকে তার বাবা মহামতি পেট্রিয়ার্কের সামনে এগিযে দেয়। সামনে পেয়ে ছেলেটির মাথায় হাত রেখে ধর্মপ্রাণ তাকে আশীর্বাদ করেন। (কুঞ্জু নামটি বাঙালীদের খোকা নামের

মত।) এই কাকতালীয় ঘটনার পর থেকে কুঞ্জুর নতুন নামকরণ হয় 'পুণ্যান কুঞ্জু'! শুরু হয়ে যায় তার নিজের ও তার উত্তর পুরুষের ভাগ্য পরিবর্তন। কালক্রমে পুন্যান কুঞ্জু নিজেই স্থানীয় 'মার-তোমা' গির্জার রেভারেন্ড ফাদারএর আসন অধিকার করেন। এই সম্প্রদায়ের ক্রিশ্চানদের বিশ্বাস, জিশুর সাক্ষাৎ শিষ্য সেন্ট টমাস কেরালায় আসেন। তিনি যে একশ জন উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণকে খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, আজকের সিরিয়ান ক্রিশ্চানরা তাদেরই বংশোদ্ভুত।

পুন্যান কুঞ্জুর এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলে (উপন্যাসের 'পাপাচি') "ইম্পিরিয়াল এন্টোমলজিস্ট", বড় সরকারী চাকুরে ও শহরের এক গণ্যমন্য ব্যক্তি হয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী 'মাম্মাচি' ও বোন 'বেবি কোচাম্মা' অপেক্ষাকৃত মুখ্য চরিত্রদের মধ্য পড়েন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, পপাচি, মাম্মাচি, আমাদের দাদু দিদার মত সম্বোধন আর কোচাম্মা তো পিশিমা, মাসীমা, খুড়িমা বা ঠাকরুন ইত্যাদির ক্ষেত্রে কেরালায় সমান চলে। নামের বদলে সম্বোধন গুলিকে প্রাধান্য দেবার সুবাদে হয়তো আন্দাজ করা চলে চরিত্রগুলি অরুন্ধতীর আত্মীয়স্বজনদের অনুকরণে রচিত।

বাইরের লোকেদের কাছে পাপাচির ভাবমূর্তি যাই হোক না কেন নিজের স্ত্রীর প্রতি তাঁর ঈর্ষাজর্জরিত ও নিষ্ঠুর আচরণের বিশদ বর্ণনা আছে উপন্যাসে। তিনি একটি নতুন প্রজাতির প্রজাপতি-মথ সনাক্ত করেছিলেন কিন্তু তার সুখ্যাতি কুড়োয় অন্য আর একজন। ঘটনাটি তাঁর চরিত্রের তিক্ততার অন্যতম উৎস।

গল্পের প্রধানচরিত্রগুলির অবতারণা ও শেষ পর্যন্ত তাদের কি পরিণতি হবে তার আভাস অরুন্ধতী প্রথম অধ্যায়েই দিয়ে দিয়েছেন তাঁর কাহিনী বিস্তারের পদ্ধতি হল কেন ঘটনাগুলি ওই ভাবে ঘটল তার রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি বিশ্লেষণ। এই প্রসঙ্গে কথাকলি নাটকের সম্বন্ধে উপন্যাসে লেখিকা যে মন্তব্যগুলি করেছেন, তাঁর নিজের লেখার বিষয়েও সেগুলি প্রযোজ্য। গল্পে কি ঘটবে তার বিষয়ে কৌতূহল নিম্নশ্রেণীর আবেদন। কথাকলিতে রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদির যে সমস্ত গল্প বলা হয় তার আখ্যান ভাগ ও পরিণতির সঙ্গে সকলেই সুপরিচিত। ঘটনাগুলিকে নৃত্য ও অভিনয় দিয়ে প্রাণ দান করে কলাকার তাদের রসোত্তীর্ণ করে তোলেন।

সিরিয়ান ক্রিশ্চান সমাজের রক্ষণশীলতার নানান তীব্র সমালোচনা বইটিতে আছে। যার মধ্যে স্ত্রী স্বাধীনতার অভাব ও অত্যন্ত 'আনক্রিশ্চান' বর্ণ বিদ্বেষএর

বিষয়ে অরুন্ধতী রায় সোচ্চার। এই বর্ণ বিদ্বেষ বাস্তব জীবনে আজও কতখানি উগ্র বুঝতে পারি যখন দেখি অরুন্ধতীকে আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে অন্ত্যজ জাতীয় পুরুষের সঙ্গে সম্ভ্রান্ত সিরিয়ান ক্রিশ্চান মহিলার অবৈধ প্রণয় বর্ণনা করবার দায়ে। সহোদর ভাইবোনের অবৈধ মিলন সম্বন্ধে নীরব থেকে কেবল মাত্র বর্ণসংকর প্রেমের ব্যাপারেই অশ্লীলতার আরোপ দেখে মনে হয়, অশ্লীলতাটা অজুহাত, জাত্যভিমানই মামলা দায়ের করবার আসল কারণ। অবশ্য বাজার দখল করার কৌশল হিশেবে, বকলমে একটা অশ্লীলতার বা ধর্মীয় অবমাননার মামলা লাগিয়ে দেওয়া খুবই কার্যকরি হয়। তার উদ্দেশ্যমূলক প্ররোচনা, ব্যবসার খাতিরে প্রকাশকদের কাছ থেকে আসাও আশ্চর্য নয়। অনেক সময়ে আবার লেখক লেখিকার ক্ষেত্রে তাতে হিতে বিপরীত উপস্থিত হতে দেখা যায়। যার বিখ্যাত উদাহরণ সালমান রুশদি বা তসলিমা নাসরিন। বইয়ের কাটতি এবং লেখকের বিষয়ে কৌতূহল অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে বেড়ে যায়।

দিদিমা, মাম্মাচি অনেক গুণের অধিকারিণী। বেহালায় পাশ্চাত্য সঙ্গীত বাদনে তাঁর রীতিমত প্রতিভা। স্বামী রিটায়ার করবার পর একটি জ্যাম জেলি আচারের অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা তিনি গড়ে তোলেন। অরুন্ধতী রায়ের মামার বাড়ীর পদবী 'পালাট'। '৬৯ সালে অনেক শিশি বিখ্যাত 'পালাট পিকলস' আমি কিনে খেয়েছি। মামার বাড়ি 'আইমেনেম' স্থানটির নাম উপন্যাসে বদলানো হয়নি। পদবীটা অবশ্য পাল্টে করা হয়েছে 'আইপ' এবং আচারের কারখানার নাম 'প্যারাডাইস পিক্‌লস'।

বেবি কোচাম্মা যৌবনে এক অল্প বয়সী আইরিশ পাদরির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। হতাশ প্রেমের তাড়নায় তিনি সন্ন্যাসিনী হয়ে যাবার উদ্দেশ্যে ধর্ম সম্প্রদায় পরিবর্তন করে রোমান ক্যাথলিক হয়ে যান। প্রবেশ করেন একটি কনভেণ্টে। অল্প দিন পরে তাঁর বৈরাগ্যের অবসান হয়। পিতৃগৃহে ফিরে আসার পর স্বধর্মত্যাগ ও পণের অভাব এই দুই কারণে তাঁর ভাগ্যে আর বর জোটেনি। পণ প্রথা সিরিয়ান ক্রিশ্চান সমাজের একটি দুর্লক্ষণ। বহু সিরিয়ান ক্রিশ্চান মেয়েদের পণের অভাবে বিয়ে হয় না। ব্যর্থ জীবনের পরিতাপে বেবি কোচাম্মার স্বভাব হয়ে ওঠে তিক্ত পরশ্রীকাতর ও প্রতিহিংসাপরায়ণ। গল্পের ট্র্যাজিক পরিণতির জন্য তাঁর চরিত্রের এই প্রবণতাগুলি অনেকাংশে দায়ি।

বংশের উত্তরাধিকারী, 'আঙ্কল চ্যাকো' উচ্চ শিক্ষার জন্য রোডস স্কলার হিশেবে অক্সফোর্ড যান। ছাত্রাবস্থায় তিনি একটি পাব্-এর ওয়েট্রেসকে বিয়ে

করে ফেলেন ও তাদের একটি মেয়ে হয়। বিয়েটা কিন্তু টেকেনি। চ্যাকো একা দেশে ফিরে আসেন মগজ ভর্তি প্রগতিশীল বাম পন্থী সমস্ত ধ্যানধারণা নিয়ে। মায়ের ঘরোয়া ব্যবসার ভার গ্রহণ করে মনোনিবেশ করেন সেটিকে বাড়াতে ও আধুনিক করতে। শুরু হয়ে যায় ব্যাবসার অবনতি।

চ্যাকোর বোন আম্মু উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র। অল্প বয়সে কলকাতা বেড়াতে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় সে এক বাঙালী চা-বাগিচার ম্যানেজারকে বিয়ে করে। দুঃখের বিষয় মদ্যপ স্বামীর সঙ্গে তারও বেশি দিন ঘর করা সম্ভব হয়নি। দুই যমজ সন্তান, ছেলে এস্থা ও মেয়ে রাহেলকে নিয়ে তাকেও মায়ের আশ্রয়ে ফিরে আসতে হয়েছিল।

অরুন্ধতী রায়ের মা, মেরী রায় কোট্টায়াম শহরে অত্যন্ত সুপরিচিত। তিনি 'কর্পাস ক্রিস্টি' নাম দিয়ে অধুনাবিখ্যাত স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। অন্য একটি কারণে তিনি আরও স্মরণ যোগ্যা। শাহ বানু যখন খোরাকি আদায়ের জন্য মামলা দায়ের করে বিখ্যাত হন, মোটামুটি সেই সময়ে বঞ্চিতা সিরিয়ন ক্রিশ্চান মেয়েদের পিতৃ সম্পত্তিতে সমান অধিকার দাবি করে মেরী রায় মামলা করেন এবং সেই মামলা জিতে সিরিয়ান ক্রিশ্চান মহিলা সমাজের এক চিরস্থায়ী পরিবর্তনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করে দেন। আম্মুর যে অসহায়া নির্যাতিতা ছবি আমরা উপন্যাসে পাই তার সঙ্গে মেরী রায়ের ব্যক্তিগত ইতিহাসের, এক বিবাহ ব্যাপার ছাড়া, বিশেষ মিল পাওয়া যায় না।

চ্যাকোর স্ত্রী মার্গারেটএর দ্বিতীয় স্বামী এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। চ্যাকো চিরকালই মার্গারেটএর সঙ্গে বন্ধু ভাব বজায় রেখেছিল। সে নিঃসঙ্গ সদ্য বিধবা মার্গারেট,ক সান্ত্বনা দেবার জন্য ক্রিসমাস উৎসব আইমেনমে কাটাবার আমন্ত্রণ জানায়। মার্গারেট রাজি হয়ে মেয়েকে নিয়ে ভারতবর্ষে বেড়াতে আসে। এস্থা, রাহেল আর সোফি-মল তিনজনের এক অবিচ্ছেদ্য জুটি সৃষ্টি হয়। তারা মাঠে ঘাটে নদীতে মহানন্দে খেলে বেড়ায়।

ভেলুথা বলে একটি অন্ত্যজ চরিত্রই হচ্ছে উপন্যাসের নামানুসারী GOD OF SMALL THINGS/'মুদলালি' বা মালিক পক্ষের সংসারের সঙ্গে বংশানুক্রমে কিছু অচ্ছুত জাতির খিদমদগার যুক্ত থাকা এক চিরাচরিত রীতি। ভেলুথার বাবা তেমনি আইপদের সংসারে যুক্ত ছিল। ভেলুথও সেই আওতাতেই মানুষ। নিচু জাতে জন্ম হলে কি হবে ভেলুথা যেমনি সুপুরুষ, তেমনি তার নানান বিষয়ে অসাধারণ দক্ষতা। বয়সে সে আম্মুর চাইতে অল্প ছোট। ছেলে

বেলা থেকেই তার মালিকের এই সমবয়সী কন্যার প্রতি প্রতি এক ধরনের বিশেষ আনুগত্য ও গুণমুগ্ধতা ছিল। নিজের হাতে নানান খুঁটিনাটি জিনিস তৈরি করার অসামান্য পারদর্শিতা ছিল কিশোর ভেলুথার। সে তার সৃষ্টির অজস্র উপঢৌকন সুযোগ পেলেই আম্মুকে উপহার দিত। ছেলেটির বুদ্ধি ও তাৎপরতা দেখে আম্মাচি ভেলুথাকে পুণ্যান কুঞ্জু প্রতিষ্ঠিত অচ্ছুতদের ইস্কুলে পড়াশোনা করার সুযোগ করে দেন। পরে এক জার্মান সাহেবের কাছে শিক্ষানবিশী করে জাতিতে 'পারাভান' বা নারকেল রসের শুঁড়ি হওয়া সত্ত্বেও ভেলুথা হয়ে ওঠে এক পারদর্শী সূত্রধর। কল কব্জা যন্ত্র পাতি বিষয়েও ছিল তার সহজাত দক্ষতা। লোকে বলতো অচ্ছুত না হলে ভেলুথা একজন সেরা ইঞ্জিনিয়ার হতে পারতো। প্যারাডাইস পিকলসএর সমস্ত মেশিনপত্রের দায়িত্ব ছিল ভেলুথার হতো। মালিক কন্যার সঙ্গে ছেলেবেলাকার এই আদানপ্রদান খানিকটা আকস্মিক ভাবে পরিণত হয় এক দুর্বার প্রেমে যার অবধারিত সমাপ্তি মর্মান্তিক ও বিধ্বংসি।

নদীমাতৃক কেরল, আমাদের পূর্ব বঙ্গের মত। সেখানকার অধিবাসীদেরও জলের সঙ্গে আশৈশব সখ্যতা। ডিঙি নৌকা নিয়ে ছোট ছোট মেয়েদের নদীতে খালে-বিলে যথেচ্ছ বিচরণ করতে হামেশাই দেখা যায়। রাহেল একটি পরিত্যক্ত ডিঙি নৌকা আবিস্কার করেছিল। তাদের পরম বন্ধু ভেলুথাকে ধরে দুজনে সেটি সংস্কার করিয়ে নেয়। তারপর ভাই বোন নৌক চড়ে প্রায়েই নদীতে পাড়ি দিতে আরম্ভ করে। তাদের আম্মুও ওই একই নৌকা করে ভেলুথার অভিসারে যেতোরাত্রে। To love by night the man her children loved by day'।

মেমসাহেবের মেয়ে সোফি সাঁতার জানতো না। ঘটনার রাত্রে ভীষণ বৃষ্টির দরুন নদীতে অনেক জল এসে গিয়েছিল। পশ্চিম ঘাট থেকে নেমে আসা শান্ত নদীগুলি বৃষ্টিতে সহসা খামখেয়ালি হয়ে ওঠে। তিনজন মিলে নদী পার হতে যাওয়ার সময় ডিঙি উল্টে গিয়ে সফি ডুবে মারা যায়। এস্থা ও রাহেল আত্ম-গোপন করে একটি পরিত্যক্ত কুঠি বাড়িতে। যে বাড়িটি হয়ে উঠেছিল তাদের দিনের বেলার খেলবার জায়গা ও রাত্রে তাদের মায়েরও অভিসারের গন্তব্য স্থল।

ঘটনাক্রমে সেই একই বর্ষার রাতে ভেলুথার বাবা নিজের ছেলের অনাচারের কথা আবিস্কার করে ছুটে যায় মালকান্ এর বাড়ি। সব শুনে, বিভিন্ন মনস্তত্ত্বের দ্বারা চালিত হলেও কুটিল ননদ ও বিভ্রান্ত ভাজ একজোট হয়ে, আম্মুকে ঘরে তালা বন্দী করে রাখে। বেবি কোচাম্মা ছোটেন পুলিশে ভেলুথার নামে ডায়েরি

করতে। অভিযোগ করেন ভেলুথা তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রিকে বলাৎকার করেছে ও তিনটি শিশুকে অপহরণ করেছে। পরশ্রীকাতরতা ও ভেলুথার হাতে এক কাল্পনিক অবমাননার জন্য প্রতিহিংসার মনস্তত্ত্বও তাঁর মধ্যে কাজ করতে থাকে। পুলিশ শিশু দুজনকে উদ্ধার করে এবং ভেলুথাকে গ্রেফ্‌তার করে। পুলিশের নির্যাতনে ভেলুথার মৃত্যু হয়।

সোফির ফিউনারাল-এর উপলক্ষ্যে আম্মু বন্দি দশা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। অনুষ্ঠান শেষ হতেই তিনি সোজা থানায় গিয়ে জানান বলাৎকার এর অভিযোগ মিথ্যা। তিনি স্বেচ্ছায় ভেলুথার কাছে যান। মিথ্যা সাক্ষ্যের ফলে গ্রেফ্‌তার হয়ে এক জন নির্দোষ ব্যক্তির পুলিশ হেপাজতে মারা যাওয়াতে মহা গোলমেলে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। পুলিশ অফিসার ও বেবি কোচাম্মা ষড়যন্ত্র করে কোনও রকমে নিজেদের বাঁচান। কার্যসিদ্ধি করা হয় মৃতপ্রায় কয়েদি যে ভেলুথা এস্থাকে দিয়ে সেই তথ্যটি সনাক্ত করিয়ে নিয়ে।

অপরপক্ষে আইপদের সুউচ্চ বংশ গৌরব'ক ধুলিসাৎ করা এবং সোফির মৃত্যুর জন্য শাস্তির দায় ভাগ করে নিতে হয় আম্মু ও তার ছেলে মেয়েকে। আম্মু পিতৃগৃহ থেকে বিতাড়িত হন। যমজ ভাই বোনকে আলাদা করে ফেলাই শ্রেয় বিবেচনা করে, সাত বছরের এস্থাকে তার নিজের বাবার কাছে ফেরৎ পাঠানো হয়।

বালক এস্থা সবটুকু না বুঝলেও সে ঠিকই বুঝেছিল যে, পাকে চক্রে সে তার পরম বন্ধু ভেলুথার প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতার দোষে দোষী। পিতৃগৃহে নির সন কালে, হয়তো প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে সে স্বেচ্ছায়, সাধারণ চাকর বাকরের মত ঘরের কাজ করে যৌবন কাটাতে থাকে। তার বাবা ও বিমাতা অস্ট্রেলিয় দেশান্তরী হবার সময়ে তেইশ বছর পর, এস্থাকে ফের মামার বাড়ি ফেরৎ পাঠান। অনেক আগেই আশ্রয়চ্যুত ভগ্ন স্বাস্থ্য আম্মুর এক হোটেল ঘরে নিঃসঙ্গ মৃত্যু হয়েছে। রাহেল বাড়ি ছেড়ে বেছে নিয়েছে যাযাবর জীবন।

এস্থা আইমেনম ফিরে সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ মৌণী হয়ে যায়। লোকের কাছে সে পাগল। এস্থার ফেরার খবর পেয়ে রাহেল তার আমেরিকা প্রবাস থেকে অইমেনম ফিরে আসে। মৌণী ভাইয়ের সঙ্গে পুনর্বার সংযোগ স্থাপনা করে অবৈধ মিলনে। সময়ের হিসেবে এইটিই বইয়ের শেষ ঘটনা। অবশ্য বইয়ের শেষ পাতাগুলি জুড়ে আছে আম্মুর সঙ্গে ভেলুথার মিলনের বর্ণনা।

সেই প্রসঙ্গে শিরোনাম—শিকারি এক মফস্বলের মোক্তার অশ্লীলতার মামলা

বুজু করে বইটিকে আরও বিখ্যাত করে তুলেছেন। মামলা নিষ্পত্তির খবর এখনও এসে পৌঁছয়নি। অমরা শুধু জানি বুকার প্রাইজ জেতার পর GOD OF SMALL THINGS ক্রমাগত লণ্ডন টাইমস ও নিউ ইয়ক টাইমএর জনপ্রিয়তার তালিকায় ধাপে ধাপে উঠে যাচ্ছে। প্রখ্যাত সাময়িক পত্রিকা 'নিউ ইয়র্কার' স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে ভারতীয়দের লেখা ইংরিজি সাহিত্যর ওপর এক বিশেষ সংখ্যা বার করে। সেখানে GOD OF SMALL THINGS এর পুস্তক পরিচয় দিতে গিয়ে জন আপডাইক অরুন্ধতীর বইটিকে বলেছেন 'Tiger Woodsian debut'! বিরুদ্ধ সমালোচনাও যে হয়নি তা নয়। গত বছরের বুকার জুরির নেত্রী কারমেন ক্যালিল বি-বি-সি'র এক টেলিভিশন আলোচনায় বইটিকে সরাসরি বললেন "execrable,"—অখাদ্য! কমনওয়েলথএর এই সেরা পুরস্কার খাস ইংরেজ বা পারতপক্ষে অন্যান্য সাহেবদের বদলে ভুইফোড় নেটিবরা জিতে নিচ্ছে বলে অনেকে ক্ষোভ চেপে রাখতে পারেননি। কেউ কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে ছাড়েনি যে বুকার পুরস্কার তার শীর্ষ স্থানীয় মর্যাদার আসন থেকে শীঘ্রই ঝরে পড়বে। অন্যপক্ষে এ-বছরের বুকার প্যানেলএর চেয়ার-পারসন, গিলিয়ান বিয়ার, বইটির প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত: With extraodinary linguistic inventiveness Arundhati Roy funnels the history of south India through the eyes of seven-year old twins The story she tells is fundamental as well as local। নিরপেক্ষ সৎ প্রতিক্রিয়ারও অভাব নেই। গার্ডিয়ান পত্রিকার অ্যালেক্স ক্লার্ক পাপাচির 'মথ' এর ইমেজটির ঘুরে ফিরে যে প্রয়োগ বইয়েতে আছে তাকে বলেছেন, 'delicately achieved'। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে ওই একই কৌশল প্রয়োগ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন 'in a rather clumsy and confused way Ray also relates···to issues of history, politics and ends up making some rather tenuous connection!' এই সমস্ত নিন্দা-প্রশংসার বিষয়ে দুনিয়ার তাবৎ মেট্রোপলিসগুলিতে প্রকাশকদের আয়োজিত প্রচার অভিযান মঞ্চে অরুন্ধতীর বুদ্ধিদীপ্ত অথচ বিনয়ী প্রতিক্রিয়া, তাঁকে আরও জনপ্রিয় করে তুলছে—'I was lucky! The result might have been different if there was a different panel of judges'

অরুন্ধতী রায় ও তাঁর বইটি সম্বন্ধে নানান বিতর্কে আসর সরগরম। তার

মধ্য তিনটি প্রধান। অশ্লীলতা, অনুকরণ দোষ ও তাঁর রাজনীতির বিষয়ে অভিযোগ।

বইটির রাজনীতি-সম্বন্ধে স্বয়ং ই-এম-এস মন্তব্য করেছেন বলে ব্যাপারটা খানিকটা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর মতে, অরুন্ধতী কমিউনিজমএর নিন্দা-পরিহাস করেছেন বলেই তাঁর লেখা নিয়ে বুর্জোয়া দেশ গুলিতে এত মাতামাতি।

লেখিকার গৃহত্যাগ, যাযাবর জীবন, গোয়ার সৈকতে পর্যটকদের মধ্যে ফেরি করে বেড়ানো, দিল্লীর ঝুপড়ীগুলিতে বাস ইত্যাদি যতই প্রচার করা হোক না কেন, অরুন্ধতী পাক্কা বুর্জোয়া। কেরালার নামকরা একটি বড় ঘরে তিনি মানুষ। শিক্ষাদীক্ষা বড়লোকদের ইস্কুল কলেজে। বর্তমান অবস্থান দক্ষিণ দিল্লীর অভিজাত ইংরিজি ভাষা বিদেশী কেতার সমাজে। তাঁর world view তাঁর সামাজিক প্রেক্ষাপটের দ্বারাই সচেতন বা অবচেতন ভাবে নিয়ন্ত্রিত। তবে তিনি কমিউনিজমকে বিদ্রূপ করেছেন বললে ভুল বলা হবে। আসলে তাঁর ব্যঙ্গের লক্ষ্যস্থল হল পার্টির ভেতরের ও বাইরের কমিউনিস্ট ভেক ও ধ্বজাধারী প্রতিনিধি-স্থানীয় কিছু চরিত্র। নাম করে বলতে গেলে মালিক পক্ষের চ্যাকো ও পার্টির দাদা পিল্লাই। দুজনেরই চিত্রায়ন সাহিত্যের নিরিখে সার্থক। অপরপক্ষে বর্ণ-বিদ্বেষের শহীদ, ভেলুথা, উপন্যাসে যাকে দেবতার আসনে বসানো হয়েছে, সেই GOD OF SMALL T ING:-কে লেখিকা তুলে ধরেছেন সক্রিয় সৎ পার্টি সদস্য হিসেবে। তার বিষয়ে বইয়ের অন্যতম ইতিবাচক চরিত্র আম্মুর চিন্তার খেই ধরে অরুন্ধতী বলেছেন—'She hoped that it had been him that Rahel saw in the march She hoped it had been him that had raised his flag and knotted arm in anger She hoped that under his careful cloak of cheerfulness, he housed a living, breathing anger against the smug, ordered world that she so raged against' সমাজ বদলানোর প্রতিবাদী মিছিলে যে ঝাণ্ডার কথা বলা হয়েছে তা কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসিস্টএরই পতাকা অপর পক্ষে বইটিতে পুলিশের অনাচার, স্ত্রী—স্বাধীনতার অভাব, বর্ণবিদ্বেষ ইত্যাদির প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ সমালোচনা অবিমিশ্র ভাবে নির্মম। পাড়া পলিটিক্সএর সঙ্গে যাদের ন্যূনতম পরিচয় আছে তাদের কাছে পিল্লাইএর মত পাড়ার দাদা (সে তিনি যে পার্টিরই ধ্বজাধারী হোন না কেন) এবং টমাসএর মত থানার বড়বাবু নিশ্চয় অপরিচিত নয়।

ই-এম-এস-এর কন্যা নাকি পিতার নাম নিয়ে মিথ্যা তথ্য পরিবেশন করার অভিযোগে মানহানির মামলা করবেন চিন্তা করছেন। না করাই ভাল, কারণ বইয়ে আসলে আছে হোটেলওলারা কিরকম ই-এম-এসএর নাম বেচে ব্যবসা বাড়াবার ফিকির করছে তার প্রতি কটাক্ষপাত। 'The Hotel People liked to tell their guests that the oldest of the wooden houses, with its air-tight, panelled storeroom which could hold enough rice to feed an army for a year, had been the ancestral home of Comrade E M S 'Namboodiripad "Kerala's Mao Tse-Tung" they explained to the uninitiated So it was then, History and Literature enlisted by commerce Kurtz and Karl Marx joining hands to greet rich guests ' [p 126] বাক্যগুলির প্রাঞ্জলতার অভাবের জন্য পাঠকদের মধ্য যে অর্থবিপত্তি ঘটেছে তার জন্য লেখিকাকেই দায়ী করতে হয়।

কমিউনিজম ও ধর্ম এই দুইএরই জগৎ উদ্ধার করার শক্তি সম্বন্ধে অরুন্ধতীর কোনও আস্থা নেই। তিনি কমিউনিজমকেও আর একটি ধর্মের পর্যায় ফেলে বলেন, 'Another religion turned against itself Another edifice constructed by the human mind, decimated by human nature. [p 287] হয়তো বুদ্ধদেব বসুর মূল্যবোধ অনুযায়ী আপামরজনকে অরুন্ধতীও বলেন 'আধ ঘণ্টা নারীর আলস্যে আরও বেশী পাবে!' আর তাঁর মত সৃজনশীলতার বিশেষ গুণে যারা গুণান্বিত, তাদের চরম সিদ্ধি শিল্প সাধনায়।

অনেকে GOD OF SMALL THINGS-এর রচনায় মার্কেজ ও রুশদির প্রভাব ও তাদের নামের সঙ্গে জড়িত 'জাদু বাস্তবতার' অনুকরণ দেখতে পেয়েছেন। আমাদের চোখে কিন্তু বইটির মধ্য ম্যাজিক্যালএর তুলনায় ক্লাসিকাল রিয়েলিজম-এর লক্ষণ গুলিই অতিমাত্রায় প্রকট বলে মনে হয়েছে।

লেখিকার বিষয়ে প্রচলিত গালগল্পের মত তাঁর গল্প বলার ঢংটিও নানান্ নানান্ দৃষ্টি কোণ থেকে আকর্ষণীয়। সময়ের একমুখী ধারাকে উল্টে পাল্টে লেখিকা যেন ছিনিমিনি খেলেছেন। সাত বছরের শিশুদের মানসিকতা দিয়ে দেখা জগৎ থেকে হঠাৎ হঠাৎ পরিণত মনের বিচার বিশ্লেষণের মধ্য কাহিনীর বিন্যাস অনায়াসে বিচরণ করেছে। তবু গল্প বলা এগিয়েছে স্বচ্ছন্দ গতিতে।

উপন্যাস দানা বেঁধেছে পাশ্চাত্য সঙ্গীতের কারুকৌশল অনুসরণ করে কতকগুলি সযত্নে প্রথিত leitmotifএর উপাদানে। এই leitmotif-গুলির বারে বারে পুনরাবির্ভাব ঘটে অপ্রত্যাশিত ভাবে। এবং প্রতিবার তাদের প্রকাশ ঘটে গূঢ়তর ব্যঞ্জনা নিয়ে। বইয়ের শেষ পাতায় পৌঁছে এই সমস্ত ইতস্তত বিক্ষিপ্ত leitmotifগুলি পাশ্চাত্য সঙ্গীতের 'ফিনালে'র মত এক গভীর জটিল অনুরণনে গ্রথিত করার প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা আছে। এই leitmotifএর সূত্রগুলি কাঁথা সেলাইএর ফোঁড়এর মত গল্পের আপাতদুর্বল ছন্নছাড়া বিস্তারকে একটা বাঁধুনির মধ্যে ধরে রাখবার যে প্রযত্ন লেখিকা করেছেন তা অসফল হয়নি। মনে করিয়ে দেয় মার্সেল প্রুস্তএর রচনা কৌশলের কথা। এ ছাড়া বইটির অবিসম্বাদিত সফলতা কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রের চিত্রায়ণে, যাদের মধ্য, পাড়া-পলিটিশিয়ান পিল্লাই ও কোট্টায়াম পুলিশ থানার বড়বাবু টমাস বিশেষ ভাবে উল্লেখনীয়।

শুধু সময়ের বহতা নিয়ে যথেচ্ছাচার ছাড়া অরুন্ধতী রায়ের রচনা-পদ্ধতিতে, বিশেষ করে চরিত্রচিত্রায়নে উনিশশতকীয় উপন্যাসের রিয়ালিজমএর সঙ্গে মূলগত কোনও পার্থক্য নেই বলা যায়। মার্কেজ, রুশদি প্রমুখের ভেলকিবাজির চমকে গভীর জীবন সত্যগুলিকে ফুটিয়ে তোলার চাইতে, অরুন্ধতী রায় স্তাঁদাল, টলস্টয় ইত্যাদির ধারায় 'psychological preparation for action' এর অনুগামী। তাঁর সৃষ্ট ভেলুথা চরিত্রটির সঙ্গে 'Le Rougeet a Noir' এর জুলিয়েন সরেলএর গুণাগুণের ও পরিণতির অনেক মিল। জুলিয়েনএরও জন্ম নিম্ন বর্গের গরিব ঘরে, এবং সে অসাধারণ মেধার অধিকারী। তারও এক বিবাহিত অভিজাত মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক জন্মায় এবং শেষ পর্যন্ত তাকেও প্রাণ দিতে হয়। অরুন্ধতী নিশ্চয় বার বার আত্মপক্ষ সমর্থনে যেমন বলেছেন, এক্ষেত্রেও বলবেন, তিনি খুব একটা বই পড়ুয়া নন, এ সমস্ত বইয়ের সঙ্গে তাঁর তেমন পরিচয় নেই। আমাদের উদ্দেশ্য অনুকরণের অভিযোগ আনা নয়, ঔপন্যাসিক হিসেবে লেখিকার ধারণা ও পরম্পরা অনুসন্ধান করা। ভেলুথার চিত্রায়ণ যথেষ্ট জীবন্ত হলেও উপন্যাসে যে সমস্ত নীতি ও আদর্শের ধ্বজা বহন করবার জন্য তাকে খাড়া করা হয়েছে তার "objectiue correlative" হিসেবে, সে সমস্ত ভার সম্পূর্ণ বহন করার মত শক্ত কাঠামো ভেলুথা চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে আমরা পাইনি। আম্মুর সঙ্গে তার আশৈশব সম্পর্কের ডিগবাজি, পরিবর্তন কষ্টকল্পিত। জুলিয়েন সরেল ও মদাম দি রেনালএর সঙ্গে তুলনা করলে হয়তো বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

নিঃসন্দেহে God of Small Things হৃদযবিদাবী দুঃখেব এক বিষাদময কাহিনী। কিন্তু তাবই মধ্যে অরুন্ধতী বায এমনভাবে ক্ষুবধার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও অনাবিল হাস্যরসেব অবতাবণা কবেছেন যে বিষন্নতা বোঝা হযে ওঠে না।

বিদেশী মিডিযাব 'হাইপ'এব ধুযো ধবে দেশেব মিডিয়াব হুক্কা-হুয়া শুনলে যাঁরা মনেব জানালায সজোবে কবাট লাগান, তাঁদেব বলবো, বইটি পডলে হতাশ হবেন না। অবুন্ধতীব সাফল্য শোভা দে'ব ধবনেব নয় ববং তা তাঁব পূর্বসূবি কমলা দাস, বা সমসাময়িক বাপসি সিধওয়া, অমিতাভ ঘোষ, বিক্রম চন্দ্র, বোহিণ্টন মিস্ত্রী ইত্যাদিব সঙ্গে তুলনীয। নিছক পয়সা বানানো বা সস্তা নাম কেনাব উদ্দেশ্যে অবুন্ধতী কলম ধবেননি, লেখিকার মূল প্রেবণা সৎ শিল্পীর অন্তবেব তাগিদ। বইটিব পবিশ্রমসাধ্য মুনশিয়ানা (অনেকেব মতে অতি-মুনশিযানাব) মধ্যে তাব ভূবি ভূবি সাক্ষ্য রযেছে।

আজ ইংবিজিকে আমবা আমাদেব প্রধান প্রধান ভাষাগুলির মত একটি সর্বভাবতীয নেটিভ ভাষা হিসেবে আত্মস্থ কবেছি। স্কটিশ, আইরিশ, আমেবিকান, ওযেস্টইণ্ডিযান বা আফ্রিকান ইংবিজিব মত Indian English ইংরিজি ভাষার একটি স্বতন্ত্র ডাযালেক্ট। ইংলণ্ডএব মহারাণী, বিবিসি, বা অক্সব্রিজএব বাচনভঙ্গীব মুখাপেক্ষী নয়। ইংলিশম্যানদেব থেকে বেশি সংখ্যক ভাবতবাসীব তা মুখেব ভাষা। দেশেব ছাপা বেচাব বাজারেই Indian Englishএব এমন চাহিদা যে নামি দামি বিদেশী প্রকাশকবা দবজা ঠেলাঠেলি কবছে। ইংবেজ সাম্রাজ্য হাবিযেছে। কিন্তু তার ফেলে যাওয়া ভাষা, ভাঙা গডাব মধ্য দিযে সমানেই তাব অধিকাব বিস্তাব করে চলেছে।

কবীব বলেছেন 'সংস্কৃত কূপ কা পানি, ভাষা বহতা নীব।' ইংবিজি ভাষাব সবচাইতে সৃষ্টিশীল ধাবাটি আজ বযে চলেছে প্রাক্তন উপনিবেশগুলির মধ্য দিযে, যে উপনিবেশগুলির ওপর একদিন জোব কবে চাপানো হযেছিল বাজভাষা। বাজ্য গেছে কিন্তু ভাষা ভাঙা গডাব মধ্য জাতিব অন্তবে গভীবে স্থান কবে নিযেছে। তার তুলনায King's English কূপ কা নীব বললে অত্যুক্তি হবে কি?

আমাদেব বিশ্বাস ইংবিজি ভাষার ধাবাবাহিক ইতিহাস ভবিষ্যতে যখন লেখা হবে, তাব অনেকখানি জুড়ে থাকবে বর্তমান প্রজন্মের ভাবতীয় লেখকবা। মাতৃভাষার মতই তাদের কাছে ইংরিজি আব বিজাতীয ভাষা নয। তাদেব কলমে Indian English নিজেদেব প্রাদেশিক চেতনার ধারক ও বাহক হয়ে উঠেছে। অবুন্ধতী বায়ের The God of Small Things এই ধাবারই একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

অবুন্ধতী রায়, গড্ অব্ স্মল থিংস, ইণ্ডিয়া লিংক দাম ৩৯৫ টাকা।

জয়ন্ত ঘোষ

বাংলা থিয়েটারের বৃত্তান্ত

আমাদেব ইতিহাসেব কাছে সমস্ত দায় যে আমরা ঠিকঠাক পালন কবতে পারি, তেমন অহংকার সম্ভবত কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই পোষণ কবেন না। বরং কখনো কখনো যে আমবা ইতিহাসপুরুষেব কাছে এমন বিনীত নিবেদন জানাতে পারি যে, অন্তত একটি স্মরণীয দাযকে ঠিকঠাক মনে বাখতে পেবেছি, তেমন ক্ষেত্রে নিজেদেব কিঞ্চিৎ গ্লানিমুক্ত বলে বোধ হয। কেননা অন্যথায তা হতে পাবত গভীব লজ্জা ও পবিতাপের বিষয। যে প্রসঙ্গে এ কথাগুলি এত প্রাসঙ্গিক হযে উঠল, তা হল বাংলা প্রসেনিযাম থিযেটাবেব দুশো বর্ষপূর্তি। এ সম্পর্কে বিস্মবণ স্বভাবতই সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালীমাত্রেবই কাছে হতে পারত অমার্জনীয়, যেহেতু, বহুকাল যাবৎ আমবা আমাদেব নাট্যসংস্কৃতিব ঐতিহ্য বিষযে অহংকারে অভ্যস্ত।

একথা অনস্বীকার্য যে, এমন দাযপালন এখনো আমাদেব দেশে সম্ভব হতে পাবে নির্দিষ্ট উপলক্ষে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা সংগঠনেবই উদ্যোগে। বলা বাহুল্য এধবণেব কোনো উদ্যোগের পেছনে কাজ কবে নির্দিষ্ট তাগিদবোধ। বর্তমান ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাবা স্পষ্ট জানিযেছেন সেই তাগিদটিব কথা। তাঁদেব ভাষায় "বাংলা প্রসেনিযাম থিযেটাবেব দুশো বছবের সেই ঐতিহ্যকে স্মরণীয কবে বাখাব জন্য "পুবাতনী নাট্য সংস্থা" একটি নাটোৎসবেব মাধ্যমে নাট্যোন্নয়ন মূলক কযেকটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই মহাগ্রন্থ প্রকাশ সেই কর্মসূচির একটি অঙ্গ বিশেষ।"

এমন একটি স্মবণীয় প্রকাশনা যে সম্ভব হতে পেবেছে, তাব পেছনে কাজ করেছে সমাজের বিভিন্ন স্তরের অজস্র মানুষের স্বতোস্ফূর্ত সহানুভূতি। এমনকী এই মহাগ্রন্থ প্রকাশেব 'সম্পূর্ণ' দায়িত্ব সানন্দে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন যে 'প্রবীণ গ্রন্থপ্রেমিক ও বিশ্বকোষ প্রকাশনীর কর্ণধাব শ্রী পার্থ সেনগুপ্ত' তিনিও নিশ্চয তা করেছেন বাংলাব সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আন্তবিক অকৃত্রিম সহানুভূতির প্রেবণাতেই সে বিষযে সন্দেহ নেই।

ফলে, এমন এক "মহাগ্রন্থের' বিষয নির্বাচনেব ক্ষেত্রে উদ্যোক্তাবা যে কেবলমাত্র বাংলা রচনাব ভেতবেই সীমাবদ্ধ থাকেন নি তা একই সঙ্গে তাঁদের

দায়বোধ ও সচেতনতাকেই চিহ্নিত কবে। কারণ, কলকাতাব কোনো নাট্যবিষযক সংকলনগ্রন্থ কেবলমাত্র বাংলা ভাষাতেই সীমাবদ্ধ থেকে সম্পূর্ণ সার্থক হতে পাবে না। ফলে, এমন ক্ষেত্রে হিন্দী ও ইংরিজি বচনার অর্ন্তভুক্তি স্বাভাবিক বলেই গণ্য হতে পাবে।

আগেই উল্লেখ কবা হয়েছে, প্রত্যক্ষ বা পবোক্ষে বাংলার অসংখ্য মানুষেব আন্তবিক শ্রম ও প্রয়াস বযেছে পুরাতনী নাট্যসংস্থা ও তাব আলোচ্য প্রয়াস গুলির পেছনে। তাতে যেমন বয়েছেন সুভাষ চক্রবর্তীব মত বিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় মানুষ, রয়েছেন সুধী প্রধান ও পবিত্র সবকারের মত বাংলা নাট্যসংস্কৃতিব ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্মানিত মহাজন, বা আরো এমনি অনেকে যাঁদেব প্রত্যেকেব ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখও তাঁদেব সদিচ্ছা ও প্রযাসের আন্তরিকতার কাবণে নিষ্প্রয়োজনও বটে, যেহেতু অন্যথায এমন একটি স্মবণীয় প্রকাশ কখনোই সম্ভব হত না।

বস্তুত 'বিশ্বকোষ পবিষদেব' উদ্যোগে ও বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব গণেশ মুখোপাধ্যাযের সম্পাদনায় এই সংকলনগ্রন্থটি যে হযে উঠতে পাবল নানা দিক দিযে অত্যন্ত স্মবণীয, তাব পেছনে সংস্কৃতিমনস্ক কলকাতাবাসী মাত্রেবই যে সোৎসাহ প্রেবণা রয়েছে, তা কলকাতাবাসী হিশেবে আমাদের অস্তিত্বকে যে কিছুটা নন্দিত করে, সে বিষযে সন্দেহ নেই।

প্রথমেই আমাদেব দৃষ্টি আকর্ষণ কবে গ্রন্থপবিকল্পনাটি। বিষয-নির্বাচন বা লেখক নির্বাচন পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে যেমন একদিকে কাজ করেছে অত্যন্ত উদাব দৃষ্টিভঙ্গি, আবাব অন্যদিকে বিষযটি সম্পর্কে সম্পাদকেব গভীব অভিনিবেশ ও জ্ঞানেব পবিচয আমাদেব বহু ক্ষেত্রেই মুগ্ধ করে, সে কথা স্বীকাব কবে নেযা সঙ্গত। বিষয়-নির্বাচক ও লেখক নির্বাচন উভয ক্ষেত্র সম্পর্কেই কথাগুলি প্রযোজ্য।

এখানে যেমন রযেছে প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র, অজিতকুমাব ঘোষ, ক্ষেত্র গুপ্ত, বিষ্ণু বসু বিশিষ্ট মাননীব একাডেমিশিযান, তেমনি আবার বযেছেন বনফুল, মোহিত চট্টোপাধ্যায, কিবণ মৈত্র, মনোজ মিত্রেব মভ বিশিষ্ট নাট্যকার, তেমনি তার পাশে রযেছেন শ্যামল ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে তরুণ নাট্যকার প্রযোজক চন্দন সেনেব মত মানুষ। আবাব বয়েছেন কুমার রায, শোভা সেন থেকে শুরু কবে অশোক মুখোপাধ্যায, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমিত্র বসু প্রভৃতির মত নাট্যপ্রযোজনার নানা শাখায় অভিনয নাট্যকলা মঞ্চপ্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত

বিশিষ্ট কিছু মানুষ। এর বাইরেও রয়েছেন নাটক বা নাটমঞ্চের সঙ্গে কেবলমাত্র অনুরাগের বন্ধনে জড়িত এমন কিছু মানুষ যাঁদের অংশগ্রহণ এমন একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াসের গৌরব বাড়ায়। অমিতাভ দাশগুপ্ত, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সমরেশ মজুমদারের মত মানুষকেও যে সম্পাদক এমন একটি প্রয়াসের অংশীদার করে তুলতে পারেন এ তথ্য নিশ্চয় সম্পাদনাকর্মে তাঁর বিরল সামর্থ্যের দ্যোতক।

অবশ্য বর্তমান প্রয়াসটির প্রসঙ্গে বিষয় নির্বাচন ও সম্পাদনাকর্মে উদ্যোক্তাদের কৃতিত্বের পাশাপাশি আর কোনো কোনো বিষয়ও আমাদের অভিনিবেশ দাবি করে। বিশেষত মুদ্রণ পারিপাট্যে উদ্যোক্তাদের রুচির বিষয়টি উল্লেখ না করলে অন্যায় করা হবে। বর্তমান সংকলনটি কেবলমাত্র বিষয় নির্বাচন ও বিশিষ্ট নাট্যবিদদের রচনাতেই সমৃদ্ধ নয়, সমৃদ্ধতর সুন্দর অংকরণের গুণেও বটে।

সংকলনটির প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠাতেই রয়েছে দৃষ্টিনন্দন স্কেচ, কখনো বিশিষ্ট নাট্যকারের, কখনো বা কলকাতার অতীত বর্তমান নানা রঙ্গালয়ের। এই সুন্দর অলংকার পরিপাট্যেও যেমন একটিকে বিষয়টির ওপর সম্পাদকের কর্তৃত্ব নির্দেশ করে, তেমনি আবার এটাও জানিয়ে দেয় যে, রুচির নাটকের স্বার্থে এমনকি মিতব্যয়িতার নির্দেশ অমান্য করতে সাহসী হতে পারেন উদ্যোক্তারা। আমরা এমন এক প্রয়াসের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

শুভ বসু

গ্রন্থ : দুশো বছরের বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটার সম্পাদনা : গণেশ মুখোপাধ্যায় -প্রকাশনা : বিশ্বকোষ পরিষদ দাম—১৭৫ টাকা।

আধুনিক ভারতের রাজনীতি-জগতের হাল-হকিৎ ঃ একটি তথ্যপূর্ণ বিবরণ

"ইংবেজ সরকার তাঁদেব নিজেদেব দেশেব প্রশাসনিক কাঠামোর মতই দেশের প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলতে একদল সুবিধাভোগী, উচ্চবিত্ত, অভিজাত শ্রেণী তৈবী কবে। এই অভিজাত শ্রেণীব সন্তানেবা বিলেতে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে ভাবতে ফিরে এসে জাঁকিযে বসেছে বাজনীতিতে। "বিলেতি শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী এবং তাঁদেব পাশ্বর্চবেবাই সাম্রাজ্যবাদের সেবা কবে এসেছে অক্লান্তভাবে। ফলে ভারতবর্ষের মানুষেব ইংবেজ সাম্রাজ্যবাদেব বিবুদ্ধে বিদ্রোহেব আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ পায়নি। পাযনি অখন্ড ভাবতবর্ষেব স্বাধীনতাও। দেশবাসী পেযেছে খণ্ডিত মাতৃভূমি এবং তাব অভিশাপ ! ··

"ভাবতমাতাব সন্তানেব রক্তস্রোত, মাতৃজাতিব প্রতি বীভৎস পাশবিক অত্যাচাবেব মধ্যেই ইংবেজ বাজপুবুষের কাছে হাত পেতে জিন্না, জওহবলাল ক্ষমতা গ্রহণ কবেন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টেব তৈবী আইনেই জন্ম ভাবতবাসীব স্বাধীনতার অধিকাব, মাতৃভূমি ভাবতবর্ষেব অঙ্গচ্ছেদ। যা আজও ভাবতবর্ষ অধুনা উপমহাদেশের মানুষকে শান্তিতে মোটা ভাত খেতে দেযনি, পবতে দেযনি মোটা কাপড। দেয়নি সুখ ও শান্তিব আনন্দ নিকেতন।

"পরিবর্তে পেযেছে ধাপ্পা। পণ্ডিত নেহেবু পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী তুলে ভারতবর্ষেব স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিপথগামী কবেছেন। গান্ধীজী জেনে বুঝে চুপ করে থেকেছেন। এবং তা স্বীকাবও কবেছেন। যে মানুষেব জন্য স্বাধীনতা, সেই ভারতবর্ষেব লাখো লাখো মানুষেব বক্তস্রোত, হিংস্র পাশবিক অত্যাচাবে মা-বোনেব করুণ ক্রন্দনবোল, সর্বগ্রাসী ধ্বংসলীলা আব ভয়ঙ্কর গৃহদাহে দারুণ হাহাকাবের মধ্যেই তিনি ভারত শাসনেব অধিকাব অর্জন ঝবেছেন।

"তেমনি যে কমিউনিস্ট পার্টির ভাবতবর্ষের মাটিতে জন্ম হয়েছিল শ্রেণীহীন শোষণহীন, যুদ্ধহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলাব জন্য, সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিযে শোষক শ্রেণীকে উচ্ছেদ কবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল করার প্রতিশ্রুতিব মধ্যে, সাত দশক পরে দেখা গেল সেই দলের নেতৃত্ব সে পথ থেকে অনেকখানি দূরে সরে গিয়ে শোষক শ্রেণীর মিত্রের পরিচয়ে পরিচিত। যে দলের নেতাবা

শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী হওয়ার কথা। সেই দলের নেতাদের মাথায় শোভা পাচ্ছে বুর্জোয়া রাজনীতির শ্রেষ্ঠত্ব।...

"স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় রাজনীতিতে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় উঠে এসেছেন জয়ললিতা, করুণানিধি, ভি পি সিং, লালু যাদব, রামা রাও প্রমুখেরা। প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসতে পেরেছেন নরসীমা রাও। রাজনীতি তলিয়ে গিয়েছে সুবিধাবাদ, চাতুরী আর ব্যক্তি স্বার্থের চোরাবালিতে।"

গ্রন্থটির 'নিবেদন' অংশে বর্ণিত এই সকল প্রসঙ্গ নিয়েই নাড়ুগোপাল ঘোষ লিখেছেন তাঁর প্রায় আড়াইশো পৃষ্ঠার বই 'ভারতের বর্তমান রাজনীতি ও তার পটভূমি' (প্রকাশকাল: ১৯৯৬)। লেখক লিখেছেন "দেশপ্রেমিক চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চিন্তার জগতে যদি এ গ্রন্থ নতুন কোন প্রশ্নের সৃষ্টি করতে পারে তবেই আমার পরিশ্রম সার্থকতা লাভ করবে।" কিন্তু বইটি পাঠ করে মনে হয় লেখকের প্রত্যাশা পূর্ণ হয়নি। দু' একটি ক্ষেত্র ছাড়া বিদগ্ধ মহলে নতুন কোনও প্রশ্ন উত্থাপন করতে বইটি সক্ষম হয়নি।

অথচ আয়োজন কম ছিল না। অভাব ছিল না উপাচারের। প্রাক্তন রাজনৈতিক কর্মী ও বিশিষ্ট সাংবাদিক রূপে নাড়ুগোপাল বাবু অতি সযত্নে সংগ্রহ করেছিলেন ঔপনিবেশিক যুগ থেকে নরসিংহ রাও-এর আমল পর্যন্ত আধুনিক ভারতের আড়াইশো বছরের ইতিহাস থেকে বাছাই করা ঘটনাক্রম—যার একটি সংকলনগত তাৎপর্য ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই বলতে হচ্ছে ঘাটতি রয়েছে নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ ক্ষমতা, বাস্তব ইতিহাসবোধ ও সৃজনশীলতার। তাই একটি অতি প্রয়োজনীয় ও অবশ্যপাঠ্য গবেষণা গ্রন্থ রূপে স্বীকৃতি পাওয়ার অধিকারী ছিল যে প্রকাশনা—তাকে পরিণত হতে হয়েছে নেহাতই একটি 'পপুলার রাজনৈতিক কিস্সা'-তে। এটি পাঠকদের কাছে সত্যই দুর্ভাগ্যজনক।

অনেকক্ষেত্রে লেখকের সাংবাদিক সত্তা চাপা পড়ে গেছে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের দায়বদ্ধতায়। ফলে অনেক বিষয়ের প্রতিই নিজের অসূয়া তিনি গোপন করতে ব্যর্থ। কোনও কোনও বাচনভঙ্গী আবেগতাড়িত হয়ে সহনশীল ভব্যতার সীমাও অতিক্রম করেছে মনে হয়। যেমন পৃষ্ঠা-১০-এ-"শক্তের ভক্ত 'নরমের যম' কথাটা খাটে ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে পুরোপুরি। ঐ শ্রেণীর দুটি হাতের একটি থাকে গলায় আর একটি থাকে পায়ে। সুযোগ পেলে যেমন গলায় হাত দিতে তারা কাল মুহূর্ত দেরী করে না, তেমনি বেকায়দায় পড়লে পায়ে ধরতেও তাদের

আটকায় না। বিবেক-বুদ্ধিহীন, স্বার্থপর না হলে ব্যবসায়ী বা বণিক অথবা ফড়ে হওয়া যায় না। ইংরেজরা ঠিক সেইরকম একটি জাতি।” এই শেষ বাক্যটি কি স্বাধীনতালাভের পঞ্চাশ বছর পরেও না লিখলে নয়! শেক্সপীয়র তো ইংরেজই ছিলেন!

লেখকের রাজনৈতিক আনুগত্য তাঁর বিবেচনা শক্তিকে যে বেশ কিছুটা ঝাপসা করে দিয়েছে তার প্রমাণ পৃষ্ঠা ৯৪-তে। লেখকের মতে ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে পরাস্ত হয়েছিলেন তার প্রধান কারণ ছিল জরুরী অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত মধ্যবিত্ত ফাঁকিবাজ আমলা ও সরকারী কর্মচারীদের বিরূপতা এবং উত্তর ভারতের ছাপ্পা ভোট। পক্ষাবলম্বনেরও তো একটা সীমা আছে। একইভাবে ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিখণ্ডী করণের দায়ভাগ তিনি আগাগোড়া চাপিয়ে দিতে চেয়েছেন সংখ্যালঘু অংশটির উপর। এক্ষেত্রে অবশ্য লেখক হরিনারায়ণ অধিকারীর একটি গ্রন্থের পাতার পর পাতা পুনর্মুদ্রিত করেছেন—মার্কসবাদী' নামধারী কমিউনিস্ট পার্টির উপর 'প্রাক্তন কমিউনিস্ট' এই লেখক জাতক্রোধ গোপন রাখতে পারেন নি। তবে পৃষ্ঠা ৮৭-তে লেখকের ব্যক্তিগত অভিমত কিছুটা সুচিন্তিত ও আলোচনা যোগ্য। চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের (১৯৬২) পরিপ্রেক্ষিতে লেখক বলেছেন, “পার্টি নেতৃত্ব সেই সময় যদি 'পঞ্চশীলের' ভিত্তিতে সীমান্ত সমস্যার সমাধানের দাবীতে আন্দোলনের ডাক দিত তাহলে সেই আন্দোলন অবশ্যই জওহরলালের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থী (এবং অনেক ক্ষেত্রে বামপন্থীদেরও)-দমন নির্যাতন রুখতে পারতো।” এটা একটা ভেবে দেখার মতো কথাই বটে।

নাড়ুগোপাল বাবু সমকালীন ভারতীয় রাজনীতির অন্যান্য কয়েকটি প্রশ্নেও (এমন কি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও) আমাদের ভাবাতে চেয়েছেন। বাবরি মসজিদ ধ্বংস বা বি জে পি-র সাম্প্রদায়িক নগ্ন রূপ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা সফল হলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর একপেশে ভাব বইটির নির্দিষ্ট মানে উত্তরণের পক্ষে বাধা স্বরূপ। পাঠককে অতিরিক্ত কিছু ভাবাতেও তিনি যথেষ্ট সক্ষম নন। তথাপি ভারতীয় রাজনীতির হাল হকিকৎ ও ঘটনাক্রমের একটা চুম্বক বিবরণ এবং সেই সঙ্গে গ্রন্থ শেষে সংকলিত নির্দিষ্ট 'গ্রন্থপঞ্জী' সাধারণ পাঠককে বইটি পাঠে আকৃষ্ট করলেও করতে পারে।

সুস্নাত দাশ

ভারতের বর্তমান রাজনীতি ও তার পটভূমি। নাড়ুগোপাল ঘোষ। সাহিত্যায়ন, কলি-৯। পঞ্চাশ টাকা।

পরিচয়ঃ বিষয় সূচি

(পঞ্চম কিস্তি)

সবোজ হাজবা

বাংলা গল্প উপন্যাস আলোচনা

দেবেশ রায়	অশ্বমেধের ঘোড়া দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'অশ্বমেধেব ঘোড়া' গ্রন্থেব উপর আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭০
	নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	পড়শী (স্মৃতিচাবণ)	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭
দেবেশ রায়	স্মৃতিকথার খসড়া	ঐ
	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	
অশ্রুকুমার সিকদার	ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 'রাজসিংহ'	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৭৩
নরহবি কবিবাজ	'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র	আশ্বিন, ১৩৬৮
নির্মল গুপ্ত	বাংলা কাব্যে গদ্যরীতি ও বঙ্কিমচন্দ্র	বৈশাখ, ১৩৭৬
	মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	পত্র : অতুলচন্দ্র গুপ্তকে লিখিত	ভাদ্র, ১৩৭২
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ আদি পর্ব : 'মানিক গ্রন্থাবলী ১ম ভাগ' এর উপর আলোচনা	শ্রাবণ, ১৩৭০
	শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাব	
কুশল লাহিড়ী	শরৎ প্রসঙ্গ ঃ পুস্তক–পরিচয় আঃ পুঃ শবৎচন্দ্র চ্যাটার্জী হুমাযুন কবীব। শবৎচন্দ্রেব গ্রন্থবিবরণী অবিনাশ ঘোষাল। শরৎচন্দ্রেব টুকবা কথা– অবিনাশ ঘোষাল বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক	পৌষ, ১৩৭১
	সমবেশ বসু	
দেবেশ রায়	'আদাব' থেকে 'বিবর' সমবেশ বসু লিখিত 'বিবব' গ্রন্থের উপর আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭৩

। সুলেখা সান্যাল ।

বিদেশী উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক

গুস্তাভ ফ্লবেয়ার

নবেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	গুস্তাভ ফ্লবেয়াব ও আধুনিক উপন্যাসের সমস্যা	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪

গ্রীন, গ্রেহাম

সুধাংশু ঘোষ	গ্রেহাম গ্রীন : নির্মল কৌতুকের গল্প : গ্রেহাম গ্রীন লিখিত 'দ্য কমেডিয়ান' গ্রন্থের উপর আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭৩

ম্যান, টমাস

নবেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত	টমাস ম্যানেব শেষ প্রবন্ধ	ভাদ্র, ১৩৬৮

রাসেল, বার্ট্রান্ড

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়	পুস্তক পরিচয় : আঃ পুঃ শহরতলির শয়তান—বাসেল, বার্ট্রান্ড-অনু : অজিতকুমার বসু	অগ্রহায়ণ, ১৩৭০
রাসেল, বার্ট্রান্ড	অথ গ্রহলোকেব উদ্ভাসপর্ব	ফাল্গুন চৈত্র ১৩৭২

শলকোভ, মিথাইল

প্রদ্যোৎ গুহ	শলকোভ	আশ্বিন-কার্তিক ১৩৭২

ইতিহাস

ইতিহাসচর্চা

অনিল চক্রবর্তী	ইতিহাসেব বেসাতি	শ্রাবণ, ১৩৭২
দিলীপ বসু	ইতিহাসে বিজ্ঞান	শ্রাবণ, ১৩৭৬
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়	ইতিহাসে অবশ্যাম্ভাবিতা	শ্রাবণ, ১৩৬৩
মজানুর রহমান তরফদার	ইতিহাস লেখার সমস্যা	ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭৭
সব্যসাচী ভট্টাচার্য	দর্শকেব দারিদ্র ? বিজ্ঞানের বৈভব ? ই এইচ কাব লিখিত 'হোয়াট ইজ হিস্ট্রী' গ্রন্থেব উপর আলোচনা	শ্রাবণ, ১৩৭০

বালাবুশেভিচ, ভি	ভাবতীয ইতিহাসেব কযেকটি সমস্যা	চৈত্র, ১৩৭০
ভবানী সেন	ভাবতীয বিকাশের ধারা	শ্রাবণ, ১৩৭৬
	ভারতবর্ষ-ইতিহাস প্রাচীন যুগ	
দিলীপকুমার চক্রবর্তী	অধ্যাপক কোশাম্বী ও প্রাচীন ভাবতীয় ইতিহাস ঃ ডি ডি কোশাম্বী লিখিত 'দ্য কালচাব এ্যাণ্ড সিভিলিজেশন অব এনসেণ্ট ইণ্ডিয়া ইন হিস্টোবিকাল আউটলাইন'-গ্রন্হের উপব আলোচনা	ভাদ্র, ২৩৭৩
রণজিৎ দাশগুপ্ত	প্রাচীন ভাবতে দাস প্রথা	শ্রাবণ, ১৩৬৮
	ভারতবর্ষ-ইতিহাস-মধ্যযুগ	
অমিত গুপ্ত	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ পিপল্ এ্যাণ্ড পলিটিকিস ইন আর্লি মিডাইভ্যাল ইণ্ডিয়া—অসিতকুমার সেন	কার্ত্তিক, ১৩৭০
	ভারতবর্ষ-ইতিহাস-আধুনিক যুগ	
অমবেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র	ভারত-পাক যুদ্ধ ও শান্তি	ভাদ্র, ১৩৭২
গোপাল হালদার	লেখকেব কৈফিযৎ ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'চতুর্থ নির্বাচন প্রসঙ্গে' প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪
চিন্মোহন সেহানবীশ	জোট-নিরপেক্ষতাব পবরাষ্ট্রনীতি	শ্রাবব, ১৩৭০
জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়	রাজ্য এবং কেন্দ্র না কেন্দ্র বনাম বাজ্য	বৈশাখ, ১৩৭৬
দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	চতুর্থ নির্বাচন প্রসঙ্গে	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৪
প্রদ্যোৎ গুহ	বিদেশীব চোখে ভাবতেব সংকট	শ্রাবণ, ১৩৭৫
রণজিৎ দাশগুপ্ত	স্বাধীনতাউত্তব ভাবতের সামাজিক –অর্থনৈতিক বিকাশের রূপরেখা	কার্ত্তিক ১৩৭০
শিপ্রা সরকার	বিক্ষোভের রাজনীতি	বৈশাখ, ১৩৭৩
সুমিত সবকার	ভারতের রাজনীতি—বিচিত্র ধারা	শ্রাবণ, ১৩৭২
ছদ্ম (সুশোভন সরকার)		

লেখক	রচনা	সংখ্যা
মোহম্মদ শহীদুল্লাহ	পূর্ব পাকিস্তানের ঐতিহাসিক সংস্কৃতি	ঐ
রঘুবীর চক্রবর্তী	বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে	ঐ
রণমিত্র সেন	বাংলা দেশ বনাম পশ্চিম বাংলার বিপ্লবী বুলি	ঐ
রণেশ দাশগুপ্ত	শ্রেণী দৃষ্টিতে পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রামের চিত্তভূমি	ঐ
	ভিয়েতনাম-ইতিহাস-আধুনিক যুগ	
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র	আমেরিকা ও ভিয়েতনাম ঃ স্যারভিনা—ই গেটলু ম্যান সম্পাদিত 'হিস্ট্রী ওপিনিয়ন এ্যান্ড ডকুমেন্টস্ অন্ মেজর ওয়াল্ড ক্রাইসিস' গ্রন্থের উপর আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭৩
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র	ভিয়েতনামে শান্তি প্রতিষ্ঠা	চৈত্র, ১৩৭১
অমল দাশগুপ্ত	দিয়েন বিয়েন ফু	শ্রাবণ, ১৩৭৩
উলফ্, এরিক	আমেরিকার বুদ্ধিজীবী ও ভিয়েতনামের যুদ্ধ	ঐ
গৌতম চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য	জাগ্রত বিবেক	শ্রাবণ, ১৩৭৩
জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায	ভিয়েতনামের গেরিলাদের সঙ্গে	আশ্বিন, ১৩৭৫
ঐ	ভিয়েতনামেব স্বাধীনতা সেদিন আর এদিন	আষাঢ়, ১৩৭৬
তরুণ সান্যাল	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ ফাওনার ঃ ভিয়েতনামের স্পন্দন	আষাঢ়, ১৩৭৬
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	ভিয়েতনাম পরিচয়	ঐ
দক্ষিণ ভিয়েতনামের জাতীয়	মুক্তি ফ্রন্টের কর্মসূচি	ঐ
দিলীপ চৌধুরী	পুস্তক পরিচয় সবুজ অরণ্যের কাহিনী আ· পুঃ আপেকার, থা হার্বার্ট-মিলান টু হ্যানয়	আষাঢ়, ১৩৭৪

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বাঙালী মনীষী ও সমাজ সংস্কারক রামমোহন রায়	পৌষ, ১৩৭১
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র	রাজা রামমোহন সম্বন্ধে ঃ অমিয়কুমার সেন লিখিত 'রাজা রামমোহন রায ঃ দ্য রিপ্রেসেন্টেটিভ ম্যান" গ্রন্থের উপর আলোচনা	বৈশাখ, ১৩৭৬
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	রামমোহন ও তলস্তয়	আশ্বিন, ১৩৭১
সুনীল সেন	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ ভারতের শিল্পবিপ্লব ও রামমোহন— সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	আষাঢ়, ১৩৭১
ঐ	রামমোহনের অর্থনীতি চিন্তা	ভাদ্র, ১৩৭৩
হিরণকুমার সান্যাল	রামমোহন চরিত ঃ সেফিও ডবসন কোলেট লিখিত এবং দিলীপকুমার বিশ্বাস ও প্রভাত চন্দ্র গাঙ্গুলী সম্পাদিত 'দি লাইফ এ্যান্ড লেটার্স অব রামমোহন রায' গ্রন্থের উপর আলোচনা	শ্রাবণ, ১৪৭০
	স্বাধীনতা সংগ্রামী, জাতীয় নেতা বালগঙ্গাধর তিলক	
সুমিত সরকার, ছদ্ম (সুশোভন সরকার)	তিলক ও স্বাধীনতা আন্দোলন ঃ আই এম রাইসনাব এবং এম এন গোল্ডবার্গ সম্পাদিত 'টিলক এ্যান্ড স্ট্রাগল ফর ইন্ডিয়ান ফ্রিডম' গ্রন্থেব উপর আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭৩
	জওহরলাল-নেহেরু	

ননী ভৌমিক	স্তালিনের পর	শ্রাবণ, ১৩৬৩
	হো-চি-মিন	
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	হো-চি-মিন, তুমি বাঁচো ঃ বিয়োগ পঞ্জি	শ্রাবণ, ১৩৭৬
শঙ্কর চক্রবর্তী	হো-চি-মিন	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৬
হো-চি-মিন	যে পথে লেনিনবাদে এলাম	শ্রাবণ, ১৩৭৩
	মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবী	
	গোপাল হালদার	
গোপাল হালদার	রূপনারানের কূলে	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, আশ্বিন, কার্ত্তিক, অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৭০। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, চৈত্র, ১৩৭১ আশ্বিন-কার্তিক, অগ্রহাযণ, ১৩৭২
ঐ	একটি সাক্ষাৎকার ঃ গ্রহীতা ; চিত্ত ঘোষ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুনীল রায় চৌধুরী	পৌষ-মাঘ, ১৩৭৪
	মার্ক্সবাদী বুদ্ধিজীবী	
	ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	
অলোক মিত্র	অন্ধকার রাত্রি লেপে যাক	ভাদ্র, ১৩৭২
গিরিজাপতি ভট্টাচার্য	পুস্তক পরিচয়	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৭
	আঃ পুঃ ধূর্জটি প্রসাদ ঃ জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী-অলোক রায়	
	নীরেন্দ্রনাথ রায়	

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় রাসেল আর নেই পৌষ-মাঘ, ১৩৭৬

হেমিংওয়ে আর্নেস্ট

সমীক বন্দ্যোপাধ্যায় হেমিংওয়ে আত্মজীবনীর এক অধ্যায় ঃ কার্তিক, ১৩৭১

পুস্তক পরিচয়

আঃ পুঃ ঃ হেমিংওয়ে, আর্নেস্ট

এ মুভেবল ফিস্ট

ঐতিহাসিক

দামোদর ধর্মানন্দ কোশম্বী

পরিমল কান্তি ঘোষ দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী আশ্বিন, ১৩৭৩

দ্যুবয়, ই বার্গহাট

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ডরু ই দ্যুবয় ও নিগ্রো স্বাধিকারের দাবী অগ্রহায়ণ, ১৩৭০

ব্লক, মার্ক

সুশোভন সরকার ফরাসী ঐতিহাসিক মার্ক ব্লক আশ্বিন, ১৩৩৯

রবীন্দ্র চর্চা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-আলোচনা

অরবিন্দ পোদ্দার রবীন্দ্রনাথ ও দার্শনিক প্রত্যয় শ্রাবণ, ১৩৭৬

আনিসুজ্জামান রবীন্দ্রনাথ ঃ পূর্ববাঙলায় ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৭৭

গোপাল হালদার রবীন্দ্রনাথ ঃ গবেষণা ও পাঠভেদ ঃ পত্রিকা প্রসঙ্গ, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, রবীন্দ্র সংখ্যা (বর্ষ ৬৬, সং ৩–ব) পৌষ, ১৩৭১

ঐ পুস্তক পরিচয় কার্তিক, ১৩৭৬

আঃ পুঃ

চিঠি পত্র, ৭ম-৯ম সং

ঃ সঙ্গীত চিন্তা

ঃ রূপান্তর

রবীন্দ্রনাথ এ্যান্ড্রুজ পত্রাবলী ও বিশ্বভারতী প্রকাশিত আরো কয়েকটি বই

রবীন্দ্রনাথ ও বাঙালীর ঐতিহ্য ফাল্গুন, ১৩৬৮

দেবীপদ ভট্টাচার্য	ছান্দসিক রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রবোধচন্দ্র সেন সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের "ছন্দ" গ্রন্থটির উপর আলোচনা	শ্রাবণ, ১৩৭১

রবীন্দ্র চিত্রকলা

গোপাল হালদার	রবীন্দ্রপ্রতিভা ও রবীন্দ্র চিত্রকলা	শ্রাবণ, ১৩৬৮
হীরেন্দ্রনাথ রায়	রবীন্দ্রনাথ ও নন্দনতত্ত্ব	ফাল্গুন, ১৩৬৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ছবির দৃষ্টি ঃ সত্যেন্দ্র ঠাকুর ও সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পাদিত "চতুরঙ্গ" বৈশাখ ১৩৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত (শ্রীসিদ্ধিনাথ ঠাকুরের সৌজন্যে প্রাপ্ত)	কার্ত্তিক, ১৩৭১

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তা

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	পত্রাবলী, ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত, তাং শান্তিনিকেতন, ১৪ই আগস্ট, ১৯৩২	ভাদ্র, ১৩৭২

রবীন্দ্র সঙ্গীত আলোচনা

অজিত কুমার সেন	রবীন্দ্র সঙ্গীতে তান ও বাট	কার্ত্তিক, ১৩৬৯
অনন্তকুমার চক্রবর্তী	রবীন্দ্রনাথের গান ঃ সঙ্গীত প্রসঙ্গ	চৈত্র, ১৩৬৮
গীতাঞ্জলি দেব	রাজেশ্বরী দত্তের কণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত	কার্ত্তিক, ১৩৬৯
গুরুদাস ভট্টাচার্য	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানা দিক— অরুণ ভট্টাচার্য	বৈশাখ, ১৩৭৩
ধ্রুব গুপ্ত	রাজেশ্বরী দত্তের কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত	কার্ত্তিক, ১৩৬৯
শৈলেন ঘোষ	'রবীন্দ্র সঙ্গীতে তান ও বাট' প্রসঙ্গে	অগ্রহায়ণ, ১৩৬৯
সুচিত্রা মিত্র	ছন্দের অন্তরালে	পৌষ, ১৩৭২

হীরেন চক্রবর্তী	রবীন্দ্রসঙ্গীতের কয়েকটি দিক	শ্রাবণ, ১৩৬৯
	রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য চিন্তা	
অন্নদাশংকর রায়	কবির সঙ্গে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার	আশ্বিন, ১৩৬৮
অরুণ সেন	রবীন্দ্রনাথ, আধুনিকতা ও বিষ্ণু দে'র প্রবন্ধ ঃ বিষ্ণু দে লিখিত 'সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ও শিল্প সাহিত্যে আধুনিকতার সমস্যা' গ্রন্থের উপর আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	পত্রাবলী ঃ ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লিখিত ঃ মার্চ, ১৯২০	ভাদ্র, ১৩৭২
	রবীন্দ্রকাব্য-আলোচনা	
অশ্রুকুমার সিকদার	সম্ভাব্য নতুন 'সঞ্চয়িতার' খসড়া	আশ্বিন, ১৩৬৯
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথের উত্তর কাব্য	শ্রাবণ, ১৩৬৯
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	রবীন্দ্রনাথের 'কবিতা' বুদ্ধদেব বসু লিখিত, 'কবি রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের উপর আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭৩
	রবীন্দ্র নাটক-আলোচনা	
অলোক রায়	পুস্তক পরিচয় ঃ আঃ পুঃ হ্বাগনের ও রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য- বার্ণিক রায়	কার্ত্তিক, ১৩৭৬
দেবেশ রায়	নাটকের রবীন্দ্রনাথ ঃ শঙ্খ ঘোষ লিখিত 'কালের যাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক' গ্রন্থের উপর আলোচনা	পৌষ, ১৩৭৭
	রবীন্দ্র উপন্যাস-আলোচনা	
কার্তিক লাহিড়ী	'চতুরঙ্গে'র নির্মিতি ঃ আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সূচনা	কার্ত্তিক, ১৩৭৬
জবাভিতেল, দুশান	রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প	অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের অনিষ্ট	ভাদ্র, ১৩৭২
	রবীন্দ্রজীবনী	
গিরিজাপতি ভট্টাচার্য	'কবির সঙ্গে ফ্রান্স যাত্রা'	আশ্বিন, ১৩৬৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	অপ্রকাশিত চিঠি	পৌষ-মাঘ, ১৩৭৬
সতীশবঞ্জন খাস্তগীর	আইনষ্টাইন ও রবীন্দ্রনাথ	বৈশাখ, ১৩৭০
হিবণকুমার সান্যাল	আর এক বিজয়া	ভাদ্র, ১৩৭৫
	ববীন্দ্র পরিবার	
	দ্বারকানাথ ঠাকুর	
অমরদত্ত	দ্বারকানাথ ঠাকুরেব সমাজ চিন্তা	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭৬
	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব	
বিনয় ঘোষ	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব	মাঘ, ১৩৭১
	দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুব	
অমিত ঠাকুব	দিনেন্দ্রনাথ	কার্ত্তিক, ১৩৭১
	জ্যোতিবিন্দ্রনাথ ঠাকুব	
চিত্তরঞ্জন ঘোষ	জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : সুশীল বায লিখিত 'জ্যোতিরিন্দ্র নাথ' গ্রন্থেব উপব আলোচনা	ভাদ্র, ১৩৭০
	শান্তিনিকেতন-ইতিহাস	
অসীম রায	শান্তিনিকেতন, ১৯৬১	মাঘ, ১৩৬৮
পরিচয়	সংস্কৃতিসংবাদ : বিশ্বভাবতী সমাবর্তন উৎসব : শান্তিনিকেতনে এবারেব পৌষ মেলা	পৌষ, ১৩৭০
সুহৃৎ কুমার মুখোপাধ্যায়	গান্ধী পুণ্যাহেব গোড়ার কথা	ভাদ্র, ১৩৬৮
	আশ্রম সঙ্গী	
	এ্যান্ডুজ, সি এফ,	
এ্যান্ডুজ, সি এফ	পত্রাবলী :	আশ্বিন, ১৩৭১
ঐ	পত্রাবলী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত	কার্ত্তিক, ১৩৭১
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায	শতবর্ষের আলোয় দীনবন্ধু এ্যান্ড্রুজ	আশ্বিন-কার্ত্তিক, ১৩৭৭

সুধী প্রধান

"নব সাংস্কৃতিক আন্দোলন যাকে আমার বিবেচনায় সমাজতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন বলা উচিত তাব সঙ্গে আমার সম্পর্ক বাজনৈতিক জীবনেব জন্য ঘটে। ১৯২০-৩০ দশকে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবমন্ত্রেব যে প্রভাব ছিল তারই প্রভাবে আমি ৬ বছব বিনা বিচারে বন্দী থাকি এবং বন্দী জীবনে পড়াশুনা কবে মার্কসবাদে আকৃষ্ট হই। তারপর জেল থেকে বেবিয়ে মার্কসবাদী সাংবাদিকতা, শ্রমিক আন্দোলন করতে করতে সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে নিযুক্ত হই। প্রকৃতপক্ষে আমার যৌবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি এই আন্দোলনে কেটেছে। তাই আজ দলীয় রাজনীতির সম্পর্ক ছাড়লেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সম্পর্ক বয়ে গেছে—কাবণ যৌবনেব প্রতি মমতা থাকাই সাধারণের পক্ষে স্বাভাবিক।" [যাত্রিক-১৯৭২]

[নব সংস্কৃতি ও গণনাট্য প্রসঙ্গে। সুধী প্রধান]

রাজনৈতিক সম্পর্ক ছাড়লেও—সাংস্কৃতিক আন্দোলনেব সম্পর্ক তাব প্রযাণের বছবে—১৯৯৭ জুন মাসে অনুষ্ঠিত ২০০ বছবের বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটাব উদযাপন অনুষ্ঠানে রঙ্গণা রঙ্গমঞ্চে তিনি শুধু উপস্থিত থেকে আলোচনাই কবেননি—১৯৪৪ সালের ২৪ অক্টোবব শ্রীরঙ্গমে ভাবতীয় গণনাট্য সংঘেব উদ্যোগে বিজন ভট্টাচার্যেব 'নবান্ন' নাটকেব প্রথম অভিনযে কুঞ্জ সমাদ্দাবের চরিত্রচিত্রণকাবী সুধী প্রধান ১৯৯৭তেও ঐ নাটকে প্রধান এবা ভূমিকায় অভিনয করে তিনি তাঁর কথাকে মর্যাদা দিযে গেলেন—এ নজিব অল্পই মেলে।

অভিনেতা, নাট্যকাব বা সুরকার রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করাব কোনো কল্পনাই তাঁব কোনোকালে ছিল না। স্কুলে পড়ার সময়ই তিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। সে সমযে বিপ্লবীদের জীবনে—'মৃত্যু ছাড়া আর কিছু পাওয়ার নেই,—এ মন্ত্রে তিনিই দীক্ষিত হন। মনোমোহন পাঁড়ের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হওবার সুবাদে কলকাতায় থাকাকালে মনমোহন থিয়েটারের পিছনের দৃশ্য দেখে শিল্পী জীবনে আসার ইচ্ছা তিনি বর্জন করেন।

জেল থেকে ফিরে ডাক্তারী পড়ার সময় তাঁর এক হিতৈষী বন্ধুর চেষ্টায় তিনি গ্রামোফোন কোম্পানীতে গিয়ে নজরুল ইসলামের কাছে গান গেয়েছিলেন। তাঁর কথাই বলি—"তাই গান ও অভিনয়ের প্রাথমিক পরিচয় নিয়েও শিল্পী জীবন যাপনের অভিলাষ কোনদিন জাগার সুযোগ হয়নি। তাই বলতে আমার লজ্জা বা দ্বিধা নেই যে আমি সংস্কৃতি আন্দোলনে মার্কসবাদী বোধ নিয়েই এসেছি এবং যা কিছু করেছি তার আলোচনা মার্কসবাদের দৃষ্টিভঙ্গীতেই করা হবে।"

[নবসংস্কৃতি ও গণনাট্য আন্দোলন । সুধী প্রধান]

১৯৩৮ থেকে ১৯৪১ সালের ভারতীয় পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সাহিত্যিকদের মধ্যে যে সব ক্রিয়াকলাপ হয়েছিল, সুধী প্রধান তার প্রধান অংশীদার ছিলেন। ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত সারা ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের দ্বিতীয় অধিবেশনে বাংলাদেশে বুদ্ধদেব বসু, সমর সেন, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সুধী প্রধান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

১৯৩৭-৩৮ সালে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সর্বভারতীয় দ্বিতীয় অধিবেশন কলকাতায় হয়। ঐ অধিবেশনে বাংলাদেশের অনেক লেখক, হীরেন মুখোপাধ্যায়-সুধী প্রধান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিকতা, শ্রমিক আন্দোলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন সবকিছুই তিনি করেছেন মার্কসবাদী বোধ নিয়ে। এ ব্যাপারে তিনি পার্টি, প্রিয়জন কারো সঙ্গেই কখনও আপোষ করেননি।

দীনবন্ধু মিত্র যে প্রদীপ জেলেছিলেন—বাংলা রঙ্গ জগতের যে সব নাট্যকার শিল্পী ও কর্মীরা সেই পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছিলেন তাঁদের মধ্যে সুধী প্রধান অন্যতম। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে তিনি যেভাবে বিচার করতে[illegible] তা গভীরভাবে অনুধাবন করলে কোন্ প্রেক্ষাপটে তিনি আন্দোলনকে দেখতে[illegible] তা বোঝা যায়। বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বচ্ছ 'ধ্যান' ধারণ[illegible] নিয়ে সুদূরপ্রসারী সচেতন মার্কসবাদী দৃষ্টিতে সবকিছুর তিনি বিচা[illegible] করতেন। এ সম্পর্কে তাঁর লেখা থেকে একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। "উনবিং[illegible] শতাব্দীর সংস্কৃতি আন্দোলন যেমন ব্রিটিশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ফল[illegible] তেমনি বিংশ শতাব্দীর নব সংস্কৃতি আন্দোলন ও গণনাট্য আন্দোলন রু[illegible] বিপ্লবের প্রভাবজনিত। রুশ বিপ্লবের সাফল্য, ধনতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্কা[illegible] ফ্যাসিজমের উত্থান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে সারা দুনিয়ায় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে

নতুন চিন্তাব উদয় হয় এবং ম্যাক্সিম গোর্কি, রমা র‍্যাঁলা, আঁদ্রে জিদ, মালরো প্রভৃতির চেষ্টায় প্যারিসে বিশ্বলেখক সম্মেলন হয়—যার থেকে নানা শাখা তৈবীর প্রশ্ন আসে। লীগ অব আমেরিকান রাইটার্স, রাইটার্স ইন চায়না, ভাবতে প্রগতি লেখক সংঘ প্রভৃতি এই ঘটনার পর উল্লেখযোগ্য। স্মরণ কবা যেতে পারে ১৯৩৫ সালেব ২০শে আগষ্ট কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের ৭ম কংগ্রেসে জর্জি ডিমিট্রভেব ফ্যাশিজমের বিরুদ্ধে ইউনাইটেড ফ্রন্ট গড়ার নীতি গৃহীত হয়। এই নীতিব মধ্যে ছিল ফ্যাসিজমের বিবুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীব ঐক্য গড়াব প্রস্তাব এবং বুদ্ধিজীবী, যুব, মহিলা প্রভৃতি সংগঠন গড়া ও উপনিবেশগুলিতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী গণ ফ্রন্ট গড়ার নির্দেশ। শেষ এই নির্দেশটিকে আমি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে বলছি। [যাত্রিক। ১৯৭২]

সুধী প্রধান বলতেন—'গণনাট্য আন্দোলনেব কর্মীদের হতে হবে সংগ্রামে সমর্পিতপ্রাণ।

সুধী প্রধান নেই। নবান্নব কুঞ্জ সমাদ্দার চলে গেলেন। শ্রমিক সংগঠক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেব পুরোধা সুধী প্রধান প্রয়াত। তাঁকে প্রণাম।

১৯৯৭ব জুন মাসের এক সন্ধ্যায় বঙ্গণার মঞ্চে জিজ্ঞাসা কবেছিলাম—'সুধীদা, কেমন আছেন?' হেসে, পিঠে হাত রেখে বললেন—"এক পা বাড়িয়ে দিয়েছি—আর এক পা'র অপেক্ষা।"

ভাবিনি এত তাড়াতাড়ি দ্বিতীয় পা ফেলে চলে যাবেন!

নিমাই শূর

রণেশ দাশগুপ্ত

বঙ্গ সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে, এপার-ওপার, দুই বাংলার মেলবন্ধনকারী, প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী রণেশ দাশগুপ্ত গত ৪ঠা নভেম্বর কলকাতায় প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের বেশির ভাগ সময়টা কেটেছিল পূর্ব পাকিস্থানের স্বৈরশাসনে। বাল্যে তিনি ছিলেন রাঁচিতে। পড়াশুনার প্রথম পর্বে বাঁকুড়া ক্রিশ্চিয়ান কলেজ থেকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে বিতাড়িত হন। পরে বরিশালে বি, এম কলেজে ভর্তি হয়েও বামপন্থী কমিউনিস্ট আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের দরুণ পাঠ শেষ করতে পারেন নি।

চল্লিশ দশকের গোড়ায় সত্যেন সেন, সোমেন চন্দ প্রমুখ খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের নিয়ে ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত করেন, এবং সোমেন চন্দের হত্যার প্রায় দেড় বছর পর ১৯৪৩ এর ২৪ জুলাই তিনিও ফ্যাসিস্ত গুপ্ত ঘাতকদের দ্বারা আক্রান্ত হন। ঢাকা প্রগতি লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রতিরোধ পত্রিকার সম্পাদক রণেশ দাশগুপ্তের উপর নৃশংস আক্রমণের প্রতিবাদে নিখিল বঙ্গ ফ্যাসিস্ত বিরোধী শিল্পী ও লেখক সংঘের সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন সংবাদপত্রে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। দুঃখিনী বাংলা বর্ণমালাকে নিহত করার প্রয়াসে মত্ত পশ্চিম পাকিস্থানের স্বৈর শাসনের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন অগ্রণী সৈনিক, তাই শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যরা মুক্ত হয়ে তার মুক্তির দাবীতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এবং অবশেষে তিনি মুক্তি পান। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হলে তিনি গড়ে তোলেন সোভিয়েত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি।

আজন্ম বিপ্লবী, মুক্তিকামী, অকৃতদার এই মানুষটি মার্ক্সবাদী শিক্ষার আলোকে নিজের যুক্তি ও বিজ্ঞান দিয়ে সমস্ত ঘটনাকে বুঝতে চেয়েছিলেন। নিয়ন্ত্রণ করতে চেষ্টা করেছিলেন, ফলে বারংবার তাঁর মনন আক্রান্ত হয়েছে। সামরিক বাহিনীর হাতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান নিহত হলে তিনি দিশেহারা হয়ে যান। স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের তাড়নায় তিনি চিরকালের মত পরম

ভালবাসায় স্বদেশ ত্যাগ করে স্বেচ্ছা-নির্বাসন নেন কলকাতায়। প্রথমে এদিক ওদিক ঘুরে মানী-গুণীদের সাদর অভ্যর্থনা এড়ানোর ব্যক্তি-স্বভাবের দুর্লভ তাগিদে অবশেষে এণ্টালি-পদ্মপুকুরের লেনিন স্কুলে ঠাঁই নেন।

আত্মীয় স্বজন থেকে শুরু করে ওপার বাংলার অনেকেই, শুধু সাংস্কৃতিক আত্মীয়তার টানে তাঁকে নিতে আসেন। শেষ জীবনে একটু আয়াস দিতে চান। কিন্তু লেনিন-নামাঙ্কিত ঐ ছোট্ট ঘরটিই ছিল তাঁর প্রাণের আবেগ, মনের টান। হয়তো এর ভেতরেই লুকিয়ে ছিল দুর্জয়, চাপা অভিমান। স্ব ভূমিতে না ফেরার অভিমান। নয়তো মৃত্যুর কিছুদিন আগে ওপার বাংলার বেগম সুফিয়া কামাল, শামসুর রহমান সমেত সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের স্বদেশে ফেরার করুণ আবেদন কিভাবে হেলায় প্রত্যাখ্যান করেন!

আত্ম-নির্বাসিত রণেশ দাশগুপ্ত ছিলেন বাংলা সাহিত্যের ঋষিপ্রতিম। অনাড়ম্বর জীবনযাপনে অভ্যস্ত প্রচার বিমুখ এই বড় মাপের মানুষটির পাণ্ডিত্য ঈর্ষণীয়। তিনি শিক্ষিত উর্দুভাষীর মত উর্দু জানতেন। তাঁরই হাত ধরে আমরা ফয়েজ আহমেদ ফয়েজকে চিনি। মৃত্যুর আগেও তিনি নজরুল-কাব্যে উর্দুভাষার প্রভাব-বিষয়ে একটি গবেষণায় মগ্ন ছিলেন। ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে আঞ্চলিক সাহিত্য, স্বদেশ থেকে বিদেশ, সাহিত্য সংস্কৃতির বিশাল প্রান্তরে তার ছিল অবাধ যাতায়াত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কবি জীবনানন্দ দাশ ছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। তাঁর আপোষহীন সততা, দায়বদ্ধতা ও সম্মোহক ব্যক্তিত্ব কবি জীবনানন্দকেও প্রগতি লেখক আন্দোলনের অনুরাগী করেছিল। কবির বহু লেখায় বিশেষত উপন্যাসে এই আন্দোলনের ছায়াপাত আমরা লক্ষ্য করি।

তাঁর শেষ বই 'সাম্যবাদী উত্থান, প্রত্যাশা ঃ আত্মজিজ্ঞাসা' তাঁর সমগ্র জীবনের বিবর্তনের এক প্রতিফলন হয়তো উপসংহারও বটে। শেষ জীবনে বার্ধক্যজনিত ব্যাধি ও শারীরিক অক্ষমতা তাঁকে হয়তো কিছুটা কুণ্ঠিত করেছিল। কারণ আত্ম-কারণে কাউকে বিব্রত না করার অভ্যাস তাঁর সমস্ত জীবন ও সাহিত্য চর্চার অঙ্গ ছিল। বিলাসী জীবনযাপন ছেড়ে মুক্ত ঋষির মত জীবন সংগ্রামের ধ্যানে লিপ্ত থাকায় ছিল তাঁর জীবন দর্শন। তাই সুখী গৃহকোণে তাঁকে বাঁধার প্রয়াস তাঁর দর্শনের নিকট বড়ই বেমানান।

তিনি আমাদের মননের নায়ক। রাজনৈতিক সংগ্রামে সততার স্বপ্ন নায়ক। তাঁব ধ্যান ভঙ্গ কবার দাপাদাপি প্রয়াস কাম্য নয়।

তবুও উত্তরসূরীদের দায় থাকে। তাই মৃত্যুর পরও যেতে হয় বাজকীয় মর্যাদায় ওপার বাংলার। ভাষা আন্দোলনেব শহীদ বেদির নীচে হাজার হাজার মানুষেব ঢল নামে এই মহানায়ককে শেষ বিদায জানানোব জন্য। এই ভাবেই আমাদেব নাযককে আমরা সংক্রামিত করি সকলের চেতনায।

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

PARICHAY November '97–January 1998 Reg. No. 13273
WB/EC–265

পরিচয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

জন্মশতক সংখ্যা

প্রস্তুতি চলছে

সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর ঃ ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

 দাম ঃ পনের টাকা

পরিচয়

ফেব্রুয়ারি—এপ্রিল-১৯৯৮
মাঘ—চৈত্র—১৪০৪
৭—৯ সংখ্যা ৬৭ বর্ষ

প্রবন্ধ

গল্প

কবিতা গুচ্ছ

বিষয়সূচি

আলোচনা

পুস্তক পরিচয়

প্রচ্ছদ

দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক

অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

রঞ্জন ধর

কর্মাধ্যক্ষ

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

সম্পাদকমণ্ডলী

ধনঞ্জয় দাশ কার্তিক লাহিড়ী বাসব সরকার বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

শুভ বসু অমিয় ধর

উপদেশকমণ্ডলী

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অরুণ মিত্র মণীন্দ্র রায়

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় গোলাম কুদ্দুস

সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

প রি চ য়

১৯৫৬ সালে সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের ৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১ প্রকাশের স্থান—৩০ / ৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

২ প্রকাশের সময় ব্যবধান—মাসিক

৩ মুদ্রক—রঞ্জন ধর, ভারতীয়, ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭

৪ প্রকাশক— ঐ ঐ

৫ সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্ত, ভারতীয়, ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

৬ পরিচয় সমিতির সদস্যদের নাম ও ঠিকানা :—

১। গোপাল হালদার, (মৃত) ফ্ল্যাট-১৯ ব্লক এইচ, সি, আই, টি বিল্ডিংস ক্রিস্টোফার রোড, কলকাতা-১৪। ২। সুনীল কুমার বসু, ৭৩ এল, মনোহর পুকুর রোড, কলকাতা-২৯। ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলকাতা-১৯। ৪। হিরণ কুমার সান্যাল, (মৃত) ১২৪, রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক রোড, কলকাতা-৪৭। ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩, সার্কাস এভিনিউ কলকাতা-১৭। ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য (মৃত) ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭। ৭। সুপ্রিয়া আচার্য,- ২৭, বেকার রোড, কলকাতা-২৭। ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩, ফার্ণ রোড, কলকাতা-১৯। ১০। শীতাংশু মৈত্র, (মৃত) ১। ১। ১ নীলমণি দত্ত লেন, কলকাতা-১২। ১১। বিনয় ঘোষ (মৃত) ৪৭।৩, যাদবপুর সেনট্রাল রোড, কলকাতা-৩২। ১২। সত্যজিৎ রায়, (মৃত) ফ্ল্যাট ৮, ১।১ বিশপ লেফ্রয় রোড, কলকাতা-২০। ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায় (মৃত), ৪৮৭ এ, বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯। ১৪। হরিদাস নন্দী, ১৮।১।১১ গলফ ক্লাব রোড, কলিকাতা-৩৩। ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২ বি, সাদার্ণ এভিনিউ, কলকাতা-২৯। ১৬। শান্তিময় রায়, 'কুসুমিকা' ৫২ গরফা মেন রোড, কলকাতা-৩২। ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, (মৃত) পূর্বপল্লী, শান্তি-নিকেতন, বীরভূম। ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য (মৃত), ৯।১, কর্নফিল্ড রোড, কলকাতা-১৯। ১৯। নিবেদিতা দাশ (মৃত) ৫৩বি গরচা রোড, কলকাতা-১৯। ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় (মৃত), ৩ সি পঞ্চাননতলা রোড, কলকাতা-১৯। ২১। দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, (মৃত) ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতা ২০। ২২। শান্তা বসু ১৩।১এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৪। ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭২, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ২৪। ধীরেন্দ্র রায়, ১০৬, নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া। ২৫। বিমলচন্দ্র

মিত্র, ৬৩, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩। ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ ডি, ফিরোজ শাহ, রোড, নয়াদিল্লী। ২৭। সলিল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় ৫০, বামতন, বস, লেন, কলকাতা-৬। ৩৮। সনীল সেন, (মৃত) ২৪, বসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩। ২৯। দিলীপ বস (মৃত) ২০০ এল, শ্যামাপ্রসাদ মখার্জি রোড, কলকাতা-২৬। ৩০। সনীল মন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯। ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায ২, পাম প্লেস, কলকাতা-১৯। ৩২। হিমাদ্রিশেখর বস, ৯এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা ১৯। ৩৩। শিপ্রা সরকাব, ২৩৯।এ, নেতাজী সভাষ রোড, কলকাতা-৪০ ৩৪। অচিন্ত্য ঘোষ, হিন্দস্থান জেনাবেল ইনসিওরেন্স সোসাইটি লিমিটেড, ডি, বি, সি, রোড, জলপাইগড়ি। ৩৫। চিন্মোহন সেনানবীশ (মৃত) ১৯, ডঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯। ৩৬। রনজিৎ মখার্জি, পি, ২৬, গ্রেহামস লেন, কলকাতা-৪০। ৩৭। সব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতীয় দূতাবাস, ঢাকা, বাঙলাদেশ। ৩৮। অমল দাশগপ্ত (মৃত) ৮৬, আশতোষ মখার্জি রোড, কলকাতা-২৫। ৩৯। প্রদ্যোৎ গহ, (মৃত) ১।এ, মহীশর রোড, কলকাতা-২৬। ৪০। অচিন্ত্য সেনগপ্ত ৪৩, রাধামাধব সাহা লেন, কলকাতা-৭। ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায, ৫৫ বি, হিন্দস্থান পার্ক, কলকাতা ২৯। ৪২। দীপেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (মৃত) ৬১২।১, ব্লক-ও নিউ আলিপর কলকাতা-৫৩। ৪৩। গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২। ৪৪। নির্মাল্য বাগচি (মৃত) ফ্ল্যাট-বি-সি-৩, পিকনিক পার্ক, পিকনিক গার্ডেন রোড, কলকাতা-৬। ৪৫। তরণ সান্যাল, ৩১২, হরিতকি বাগান লেন, কলকাতা-৬। ৪৬। বিদ্যা মন্সী, ১।৩, গরচা ফার্স্ট লেন কলকাতা-১৯। ৪৭। বেদইন চক্রবর্তী (মৃত) ফ্ল্যাট ২, ১৬, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬। ৪৮। অমিয় দাশগপ্ত, (মৃত) ২, যদনাথ সেন লেন, কলকাতা-১২। ৪৯। সরেন রায়চৌধরী (মৃত), ২০৮, বিপিনবিহারী গাঙ্গলী স্ট্রীট, কলকাতা-১২।

আমি, রঞ্জন ধর, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে উপবে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনসারে সত্য।

রঞ্জন ধর

৩১-৩-৭৮

প্রত্যেক নবসাক্ষর জাতির গর্ব

বামফ্রণ্ট সরকারের নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গ্রামই সাক্ষর হয়েছে বা হতে চলেছে।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য প্রতি মানুষের অক্ষরজ্ঞান প্রয়োজন। আসুন, আমরা সবাই মিলে প্রতিটি ঘরে সাক্ষরতার প্রদীপ জ্বালিয়ে তুলি।

সাক্ষরতা প্রসারে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ—১১৯৫ / ৯৭-৯৮

ভারতের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, মুসলমান, শিখ, পার্সি, খৃষ্টানকে এক বিরাট চিত্তক্ষেত্রে সত্যসাধনার যজ্ঞে সমবেত করাই ভারতীয় বিদ্যায়তনের প্রধান কাজ। ছাত্রদিগকে কেবল ইংরেজি মুখস্থ করানো, অঙ্ক কষানো সায়ান্স শেখানো নহে! লইবার জন্য অঞ্জলিকে বাঁধিতে হয় দিবার জন্যও; দশ আঙুল ফাঁক করিয়া দেওয়াও যায়না, লওয়াও যায়না। ভারতের চিত্তকে একত্র সন্নিবিষ্ট করিলে তবে আমরা সত্যভাবে লইতেও পারিব, দিতেও পারিব।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি, এ ১১৯৫/৯৭-৯৮

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন
আর্থ সামাজিক অগ্রগতির লক্ষ্যে
বামফ্রন্ট সরকার

১৯৭০ সালে ১০০ ভিত্তি ধরে পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক গড় শিল্প উৎপাদনের সূচক ১৯৭৫ সালে যেখানে ১০২৭ এ ছিল ১৯৯৬ সালে সেই সূচক দাঁড়িয়েছে ১৫৫০ উপরে। বামফ্রন্ট সরকারের দুই দশকের শাসনকালে শিল্পোৎপাদনের এই হার বৃদ্ধিই একমাত্র কথা নয়। পণ্যের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সমগ্র জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতিই এই শিল্পায়ন প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য। শিল্পের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, বিভিন্ন অঞ্চল ও জেলায়, বিকাশ কেন্দ্র স্থাপন, বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের সঙ্গে কতকগুলি শিল্পক্ষেত্রকে বিশেষ নজর দেবার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে আছে পেট্রোকেমিক্যালস, ইলেকট্রনিকস্, লৌহ-ইস্পাত, ধাতব এবং অন্যান্য শিল্প। এ ছাড়াও কর্ম-সংস্থান মূলক বহু শিল্পর ক্ষেত্রেও যথেষ্ট জোর দেওয়া হচ্ছে।

প্রখ্যাত অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থাই পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়নে সরাসরি কাজ করছে। বৈদেশিক বিনিয়োগ ও প্রযুক্তি প্রস্তাব-গুলি টাকার অঙ্কে ৮০০০ কোটি টাকার উপর।

স্ব-নির্ভরতার লক্ষ্যকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে একটি ভার সাম্যমূলক অর্থনৈতিক অবস্থান আয়ত্ত করার লক্ষ্যে পশ্চিম-বঙ্গে শিল্পায়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই, সি, এ—১১৯৫। ৯৭-৯৮

রণেশ দাশগুপ্ত : প্রত্যয়ের মহীরুহ

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

পূব ছাড়া অন্য কোনদিকে কলকাতার আর বাড়ার উপায় নেই। পশ্চিমে গঙ্গা। গঙ্গারও অনেকখানি খেয়ে ফেলেছে কলকাতা। দক্ষিণে বাড়তে বাড়তে সুন্দরবনকে তাড়িয়ে ছেড়েছে সাগরের গায়ে। উত্তরে এগোতে এগোতে এদিক ওদিক দিয়ে পৌঁছে গেছে প্রায় বাংলাদেশের সীমান্তে। বাকি থাকে পূব। সেদিকেও বাংলাদেশ। সেদিকেই এগোচ্ছে এখন কলকাতা।

কলকাতার যে-অংশটা সাবেকী পূব, সেখানে একটা আধুনিক রাস্তার নাম এণ্টালী সি আই টি রোড। তোলা নাম সুন্দরী-মোহন অ্যাভিনিউ। এখন আর ততো আধুনিক নেই রাস্তাটা, বেশ পুরোনো এবং সেকেলে হয়ে গেছে। সেখানে, পদ্মপুকুরে, ছোট একটা মসজিদে গরীব মুসলমানরা, ও পাড়ারই বাসিন্দা তাঁরা, প্রায় সবাই উর্দুভাষী, নামাজ পড়েন।

মসজিদটার ঠিক গায়ে পি-৪৩ নম্বর বাড়ি। সেই বাড়িতেই থাকতেন, দীর্ঘদিন ছিলেন, রণেশ দাশগুপ্ত।

ছোটখাট একতলা বাড়িটা ঐতিহাসিক। কমিউনিস্ট আন্দোলন বা সংবাদ সম্পর্কে, এমনকি বাংলা সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণা করতে গেলে বাড়িটির কথা লিখতেই হবে। ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হয়ে গেলে ১৯৬৬ সাল থেকে সি পি আই এর মুখপত্র 'কালান্তর' দৈনিক হয়ে এই বাড়ি থেকেই প্রথম প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথমে তার সম্পাদক ছিলেন পার্টির রাজ্যকমিটির সম্পাদক ভবানী সেন। পরে সম্পাদক হন জ্যোতি দাশগুপ্ত। তিরিশের দশকের গোড়ায় রণেশ দাশগুপ্ত বরিশালে যে-কমিউনিস্ট গ্রুপের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা—সংগঠক ছিলেন, সেই গ্রুপেই, কিছু পরে যোগ দিয়েছিলেন জ্যোতি দাশগুপ্ত। বেশ কিছুদিন এখান থেকে প্রকাশিত হওয়ার পর 'কালান্তর' উঠে যায় পার্ক সার্কাসে, ৩০/৬ ঝাউতলা রোডে। সেখান থেকে বেরোতে বেরোতে মাঝখানে কিছুকাল বিরতির পর এখন আবার সেখান থেকেই বেরোচ্ছে।

পি-৪৩ সুন্দরী মোহন অ্যাভিনিউ থেকে 'কালান্তর' উঠে গেলে পার্টি সেখানে মার্কসবাদ চর্চার কেন্দ্র 'লেনিন স্কুল' গড়ে তোলে। সেই থেকে

সেখানে নানা ধবনেব সভাসমাবেশ, আলোচনা সভা, ওযার্কশপ ইত্যাদি হতে থাকে। বাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, জাতীয, আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে। 'কালান্তবে' এবং পবে 'লেনিন স্কুলে' তখন কোনো না কোন উপলক্ষে কে এসেছেন আব কে আসেন নি। এস, এ, ডাঙ্গে, বাজেশ্বর রাও, সবদেশাই, মণি সিং, খোকা বায, আবো কতো নেতা। ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ি, ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত, বিশ্বনাথ মুখার্জী গোপাল ব্যানার্জি, বেণু চক্রবর্তী গীতা মুখার্জিরা তো প্রায় প্রতিদিন আসতেন। বমেন মিত্র-ইলা মিত্র থাকেনই উলটোদিকে। সুশোভন সবকাব, গোপাল হালদাব, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায, সিদ্দেশ্বব সেন, নির্মাল্য বাগচী চিনমোহন সেহানবিশ নবহবি কবিবাজ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায, মণীন্দ্র রায, দেবেশ বায, অমিতাভ দাশগুপ্ত এবং আবো কতো কবি শিল্পী বুদ্ধিজীবী লেখক সাহিত্যিক মাঝে মাঝেই আসতেন। গোলাম কুদ্দুস, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, বঙ্গেশ্বর বায মধু ব্যানার্জি তো কালান্তবে আমাদের সামনেব বা পাশের টেবিলে বসেই কাজ কবতেন। আর প্রায নিযমিত আসতেন বিদেশী প্রতিনিধিরা, বুশ, ভিযেতনাম, পোলিশ জার্মান, হাঙ্গেবিযান, চেক এবং আবো কতো দেশেব।

যেমন কালান্তবে তেমনি লেনিন স্কুলে কিংবা পরিচযে নানা অনুষ্ঠানে নিযমিতই হাজির থাকতেন রণেশদা। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনম্র ভঙ্গিতে নীবব শ্রোতা হযেই থাকতেন তিনি। ১৯৮৩ সাল নাগাদ ওবিযেন্ট বো-ব কমিউন তাঁকে ছেড়ে দিতে হয়। তখন থেকে মাঝে মাঝে এবং ১৯৮৬ সাল থেকে পাকাপাকিভাবে লেনিন স্কুলই ছিল তাঁর ঠিকানা। সেখানেই পালিত হয় তাঁব শেষ জন্মদিন, ৮৬ তম, ১৯৯৭ সালেব ১৫ জানুয়াবি। উদ্যোক্তা ছিল তিনটি লিটল ম্যাগাজিন, কিবণশংকব সেনগুপ্তেব 'সাহিত্যচিন্তা', নীতিশ বিশ্বাসেব 'ঐকতান', সমবেন্দ্র সেনগুপ্তের 'বিভাব' এবং সোমেন ভ্রাতা কল্যাণ চন্দ ও আমাদেব মতো কিছু ব্যক্তি। সে সভায় সভাপতি ছিলেন গোলাম কুদ্দুস। উপস্থিত বিশিষ্টজনদেব মধ্যে ছিলেন বাজ্যেব মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস, সাংসদ গুরুদাস দাশগুপ্ত ও কালান্তব সম্পাদক সুনীল মুন্সী এবং কমলা মুখার্জী, বীবেন বায, ইলা মিত্র, সত্য ভট্টাচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এবং মঙ্গলাচবণ চট্টোপাধ্যায, সিদ্ধেশ্বব সেন প্রমুখ কবি লেখক ও বাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ। সকলেই বণেশদাব ভক্ত ও অনুবাগী। সেই সভাতেই রণেশদা তাঁর জীবনের শেষ ভাষণটি দেন।

॥ দুই ॥

রণেশ দাশগুপ্ত নিজেকে বলতেন 'ঢাকাইযা'। আদ্যোপান্ত ঢাকাইযাই ছিলেন তিনি। তাঁব জীবনেব শ্রেষ্ঠ বছবগুলি সর্ব অর্থেই শ্রেষ্ঠ, বিশ পেবোনো তারুণ্য থেকে মধ্য-ষাটের প্রৌঢত্ব পর্যন্ত—কেটেছে ঢাকায়, অন্ততঃ ঢাকাকে কেন্দ্র কবেই আবর্তিত হযেছে। জেলে যেতেও ঢাকা থেকেই গেছেন। ছাডা পেযেও ফিরেছেন ঢাকাতেই। স্বাধীনোত্তর ঢাকার প্রথম নির্বাচিত পৌরসভাব ২৫ জন নির্বাচিত কমিশনাবেব ২৪ জনই ছিলেন মুসলিম লীগেব। একমাত্র বিবোধী তাও আবাব কমিউনিস্ট, কমিশনাব ছিলেন বণেশ দাশগুপ্তই। আবাব একাত্তবে মুক্তিযুদ্ধেব সময যেমন নির্বাসনেব জীবনে গেছেন ঢাকা থেকে, তেমনি বাসায ফিরেছেন ঢাকাতেই, যদিচ হটুমন্দিরই তখন তাঁব বাসা।

ঢাকাতেই তিনি পেযেছিলেন পাবিবারিক জীবনেব শেষ স্বাদ।

বণেশদার জন্ম ডিব্রুগডে তাঁব মাতামহ প্রখ্যাত ডাক্তার কালীপ্রসাদ সেনেব গৃহে ১৯১২ সালের ১৫ জানুযাবি। তাঁব পিতৃদেব অপূর্ব দাশগুপ্ত ছিলেন তখনকাব দিনেব প্রখ্যাত ফুটবল খেলোযাড়। বণেশদার ভাষায় 'স্পোর্টিং ইউনিয়নেব ফবোযার্ড লাইনেব দুর্ধর্ষ খেলোয়াড'। খেলার সুবাদে চাকরি আর চাকবিব সুবাদে নানা জাযগায তাঁব জীবন কাটে। দীর্ঘ একটা পর্যায কাটে বাঁচিতে। তাঁর সঙ্গে তাঁব পবিবার এবং পুত্র রণেশরও।

কর্মজীবন শেষ হওয়াব আগেই তাঁকে অবসর নিতে হয়। ফুটবলের সংগঠক থাকলেও একটু বযস হতেই তিনি ভদ্রলোকেব খেলা ক্রিকেট খেলতে আরম্ভ কবেছিলেন। কিন্তু ততোদিনে সে খেলাতে এসে গেছে "বডিলাইন বোলিং"। লাল বঙেব বল কখনো হাতে, কখনো মাথায, কখনো চোখে লাগতে লাগতে তাঁর শাবীবিক হাল এমন হয যে আর চাকবিই কবতে পাবেন না। অকালেই অবসব নিতে হয। তাঁব অনুবাগীব দল প্রবাসেই পাকা বাসা বাঁধতে অনুবোধ কবেন তাঁকে। কিন্তু তিনি ততোদিনে প্রবলভাবে হোমসিক। ফিরে আসেন ঢাকায।

ঢাকায ফিবলেও 'দেশে' ফেবা তাঁর হয না। বিক্রমপুব, সোনাবঙে তাঁদেব আদি বাডি, ততোদিনে গিলে খেযেছে পদ্মা। ফলে ঢাকা শহরেই বাসা কবতে হয তাঁকে। বণেশদাও ততোদিনে ববিশাল পর্ব শেষ কবে ঢাকায, প্রগাঢ এক পারিবারিক পবিবেশে তাঁব দিন কাটতে থাকে।

১৯৫০ সালে উপমহাদেশে প্রায় সমগ্র পূর্বাঞ্চলে দাঙ্গা বেধে যায। বণেশদা

তখন জেলে। তাঁর এক মামা এযার ইণ্ডিয়ায় চাকবি কবতেন। বণেশদাব ভাষায় তিনি "আমার মাকে নিযে চলে আসেন (ভারতে) ভাই বোনেদেরও নিযে আসেন। ওবা তখন ইউনিভার্সিটিতে, স্কুলে পডছিল। · আমি জেল থেকে বেবিযে আব পাবিবাবিক জীবন যাপন কবতে পাবি নি।"

ঢাকাতেই রণেশদার কমিউনিস্ট জীবনের প্রকৃত স্ফুবণ ঘটে। কখনো প্রকাশ্যে কখনো আত্মগোপনে কখনো জেলখানায। সে স্ফুবণে যাঁদেব ভূমিকাব কথা তিনি বারবার স্মবণ করতেন তাঁদেব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মীরাট ষডযন্ত্র মামলাখ্যাত গোপাল বসাক, বক্সা ও অন্যান্য ক্যাম্পে বন্দি-দশায় দিন কাটানো নলীন্দ্র সেন এবং মণি সিং, খোকা বায প্রমুখ। নলীন্দ্র সেনেব কথা, তাঁব পাণ্ডিত্য ও জীবনাচবণেব কথা বলতে বলতে রণেশদা যেন প্রায় স্বাভাববিরুদ্ধ ভাবেই উচ্ছ্বাসিত হযে উঠতেন। (অনুসন্ধিৎসু পাঠক নলীন্দ্র সেন সম্পর্কে বিষদ জানতে চাইলে অমলেন্দু দাশগুপ্তব "ডেটিনিউ" গ্রন্থটি দেখতে পারেন)।

ঢাকাতেই রণেশদার লেখালিখি শুরু। মৃত্যুর পব তাঁব প্রথম লেখা 'গর্কিব পবিচয' প্রকাশিত হয অনুশীলন দলেব নলিনীকিশোব গুহ-র পত্রিকা 'সোনাব বাংলায' ১৯৩৬ সালে। তাঁব প্রথম গ্রন্থ "উপন্যাসের শিল্প রূপ"ও ১৯৫৯ তিনি ঢাকায় বসেই লেখেন।

তারপব একে একে তাঁব অনেক গ্রন্থই প্রকাশিত হয। তাঁব মৌলিক লেখাগুলিব মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "শিল্পীব স্বাধীনতাব প্রশ্নে" 'আলো দিযে আলো জ্বালা', 'রহমানের মা ও অন্যান্য', 'সেদিন সকালে ঢাকায' 'আযত দৃষ্টিতে আযত রূপ', 'একালেব কবিতাব মুক্তধাবা' 'ঢাকা থেকে লেখা' 'ল্যাটিন আমেরিকাব মুক্তিসংগ্রাম' 'সাজ্জাদ জহীর প্রমুখ'।

তাঁব অনুবাদকার্যের মধ্যে সম্ভবতঃ সবচেযে উল্লেখযোগ্য 'ফয়েজ আহমেদ ফযেজের কবিতা' (১৯৬৯)। সরাসরি উর্দু থেকে অনুবাদ। তিনিই প্রথম ফয়েজ, সাজ্জাদ জহীব প্রমুখ বিশিষ্ট উর্দু কবি লেখকদের সঙ্গে বাঙালী পাঠকেব পরিচয করিয়ে দেন। এ ছাড়াও তাঁর অনুবাদকর্মেব মধ্যে আছে সার্ত্রের 'দ্য কোযেশ্চেন', 'হেনরি এলিগের জিজ্ঞাসা' ইত্যাদি।

নানা ধরণের সম্পাদনা কর্মের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন আজীবন। হীবেন মুখোপাধ্যাযরা 'পরিচয়'কে কেন্দ্র করে যে-ধরণেব কাজ কলকাতায বসে কর-ছিলেন সেই কাজই চলছিল ঢাকাতেও। পূর্ব বাংলার প্রগতিশীল লেখকদের রচনার একটি সংকলন 'ক্রান্তি' প্রকাশিত হয ঢাকা থেকে। সোমেন

চন্দ, জীবনানন্দ, সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনার চারটি পৃথক সংকলনও সম্পাদনা করেন রণেশ দাশগুপ্ত।

এতোসব কাজের সবই তিনি করেন ঢাকা থেকে এবং ঢাকাকে কেন্দ্র করেই। কাজেই তিনি ঢাকাইয়া না হলে কেউই ঢাকাইয়া নয়।

তাঁর কয়েকজন সহযোদ্ধার সঙ্গে ঢাকাতেই তিনি গড়ে তোলেন প্রগতি লেখক সংঘ। এই সংঘের কাজকর্ম করতে করতে এবং তার আগে ও পরে, প্রকৃতপক্ষে তিরিশ-চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশক জুড়ে তিনি বহু প্রতিভাবান মানুষের সংস্পর্শে আসেন ও নানাভাবে তাঁদের প্রাণিত করেন। তাঁদের কেউ তাঁর চেয়ে বয়সে বড়, কেউ ছোট, কেউ সমবয়স্ক। তাঁর সেইসব সহযোদ্ধা, সহলেখক ও সহমর্মীর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সোমেন চন্দ, মুনীর চৌধুরী, সত্যেন সেন, জ্যোতির্ময় সেন, অজিত গুহ, বেগম সুফিয়া কামাল, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ, শওকত ওসমান, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, অশোক মিত্র, আবদুল মতিন, সরদার ফজলুর করিম, শহিদুল্লাহ কায়সার, পান্না কায়সার, অচ্যুত গোস্বামী, শামসুর রহমান, কবীর চৌধুরী, সরলানন্দ সেন, অমৃতকুমার দত্ত, গৌরীপ্রিয় দাশগুপ্ত, অনিল মুখার্জি, সাধন দাশগুপ্ত, মনোরম গুহঠাকুরতা, সৈয়দ নুরুদ্দিন, রণেন মজুমদার, এ. কে. এম. আহসান, আহমেদুল কবীর, মহম্মদ আমিন, সেলিনা হোসেন, অসিত সেন, সোমেন হোড়, দেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হেলেন করিম, নাজমুল করিম, সানাউল হক, সৈয়দ হাসান ইমাম, রমেন্দু মজুমদার, মফিদুল হক প্রমুখ। (আমার সমস্ত সদিচ্ছা ও সৎ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও অনেক গুরুত্বপূর্ণ নাম যে বাদ পড়ে গেল তা আমি জানি। এ আমারই অক্ষমতা। এর জন্যে আমার আক্ষেপের অন্ত নেই)।

রণেশদার ৮৬তম জন্মদিনের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী, অ্যাকাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক ও সাংসদ অশোক মিত্র বলেছিলেন, "...তখন আমাদের কাছে এই নামগুলি কিংবদন্তী, রণেশ দাশগুপ্তের নাম, সত্যেন সেনের নাম। জীবনে কতটুকু করতে পেরেছি, যতটুকু হতে পেরেছি তার পেছনে এঁদের একটা বড় ভূমিকা আছে। সেই কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্যেই আজকে এখানে এসেছি আমি।"

ওই অনুষ্ঠানে পশ্চিম বাংলার মন্ত্রী ও কমিউনিস্ট নেতা মহম্মদ আমিন তাঁর বাংলা-উর্দু অভিধানের একটি কপি রণেশদার হাতে তুলে দিতে গিয়ে বলেছিলেন, "রণেশদার সঙ্গে জেলে (রাজশাহী) না থাকলে, তাঁর কাছে

ইংরিজি ও বাংলাটা না শিখলে, এ অভিধান আমার লেখা হতো না।"

এইসব নাম এবং আরো কিছু নাম উল্লেখ করে কেউ যদি বলত, ওঁরা তো আপনার অনুগামী, আপনার দ্বারাই অনুপ্রাণিত বাক্যটি শেষ হওয়ার আগেই রণেশদা হাসতেন। হেসে বাধা দিতেন। বলতেন, "না, না, আমার অনুগামী নন ওঁরা—অনেককেই টেনে আনা গিয়েছিল তখন—ওঁরা প্রত্যেকেই প্রতিভাবান মানুষ।"

সেই প্রতিভাবানদের মধ্যে দু'জন ছিলেন রণেশদার হৃদয়ের মণিকোঠায়, সোমেন চন্দ ও মুনীর চৌধুরি, তাঁর সহযোদ্ধা, সহযোগী লেখক, শিষ্যপ্রতিম অনুজ ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এঁদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অমর হয়ে আছে বাংলাদেশের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক সেলিনা হোসেনের "নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি"তে।

সেলিমা হোসেন লিখছেন,

"একসময় সরলানন্দ, অমৃত, কিরণ অন্যদিকে চলে গেলে থাকে শুধু রণেশ আর ও, 'তুই আমার সঙ্গে চল রণেশ, আমার ওখানে থাকবি।' 'চল, আপত্তি নেই। পথে যখন নেমেছি তখন সব ঘরই আমার ঘর।' দু'বন্ধু রাস্তা কাঁপিয়ে হাসে। রণেশ ওর ঘাড়ে হাত দিয়ে হাঁটে। ...রণেশের মধ্যে আছে বয়স্কের গাম্ভীর্য, সোমেন ধীর, স্থির এবং তারুণ্যের দ্যুতিতে ঝলমলে।

রণেশ হাসতে হাসতে বলে, 'আচ্ছা সোমেন, আমরা কি কাউকে ভালবাসব না?' 'সময় কৈ এসব ভাববার?' সোমেনের উঁচু কণ্ঠের হাসিতে রাস্তার নিস্তব্ধতা ভেঙে যায়। রণেশ কথা বলে না।

..'আজ রাতে আমরা ঘুমুবো না রণেশ'। 'কেন'? 'তোকে সঙ্গে নিয়ে Illusion and Reality বইটা শেষ করবো, অর্ধেকটা পড়েছি।' 'ওটা তো আমি আগেই শেষ করেছি।' 'জানি। তোর কাছ থেকে কিছু কিছু জায়গা বুঝে নেবো।'—'তাই বলে সারারাত জেগে?'—'পড়তে পড়তে আমার তো রাত ফুরিয়ে যায়। আমি যে দিনের বেলা সময় পাই না।' 'তোর ধৈর্য আমাকে অবাক করে। তোকে দিয়েই হবে রে, সোমেন। আমাদের গণ-সাহিত্যে তোর লেখনী নতুন ধারা সংযোজন করবে।' 'বেশি বলে ফেললি।' 'একটুও বেশি না।' (পৃঃ ২০৫)

"..বয়সে রণেশ ওর চাইতে একটু বেশি বড় হলেও ওর সঙ্গেই সোমেনের প্রীতির সম্পর্ক বেশি। কেননা মার্কসবাদী সাহিত্যের পড়াশোনা রণেশের সবচেয়ে বেশি। ওর কাছে বইপত্রও আছে। গোপনে এনে পড়া যায়।"

(পৃঃ ২১০)

একই রকম বন্ধুত্ব মুনীরের সঙ্গেও। একই রকম অন্তরঙ্গতা। একইভাবে প্রাণিত করা। সেলিনা লিখছেন,

"ছিপছিপে লম্বা, শ্যামলা রঙের মুনীর লাজুক হাসে। সে বছরই সে হলের সেরা বক্তা হিসাবে প্রোভোস্টের কাপ পায়।—ছোটগল্প লেখক হিসেবেও বেশ নাম করেছে।—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তার গল্প শুনে বলেছেন, জিনিয়াস।—রণেশ একদিন হেসে বলেছিল, 'সাহিত্য আর রাজনীতি সহজ কথা নয়, মুনীর। ধরে রাখাটাই বড় কথা।' 'আমি পারব রণেশদা।' তারুণ্যে দীপ্ত মুনীর হটে যাওয়ার পাত্র নয়। আস্তে আস্তে ঝরে যায় তার পাথরের বোতাম লাগানো শেরোয়ানি। ঝরে যায় বাহ্যিক ফাঁপানো জৌলুষ। সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে অন্তর, বেগবান ধারায় বয় মননের নদী।"

(পৃঃ ২৪৩—৪৪)

'পারব' বলেছিলেন মুনীর। পেরেও ছিলেন।

রণেশের কাছ থেকে গ্রহণে তাঁর কোনো কুণ্ঠা ছিল না। "কদিন ধরে বেশ নাটকের জের চলছে। ক্লাশে, করিডোরে, চত্বরে সব জায়গায় পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা হয়। শুনতে ভালোই লাগে। একদিন পার্টি অফিসে রণেশকে ধরে বসে, 'রণেশদা, আপনি কিছু বলছেন না যে?' 'আমার কি মুখ ফুটে বলতে হবে?' 'বলুন না রণেশদা, আপনার সমালোচনা আমার কাজে লাগবে।' 'মুনীর, নাটকের মাধ্যমে আমাদের সমসাময়িক কালকে চিরকালীন সত্যে তুলে ধরতে হবে। বাস্তবের কষাঘাতে, বেদনার তীব্রতায় জীবনকে অর্থবহ করতে হবে। রচনার ক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তোমার সৃষ্টিশীল সৌকর্য বাড়াবে।'

'আপনার কথা আমি মনে রাখব রণেশদা'।" (পৃঃ ২৪৭)

শুধু তত্ত্বে নয় খোলামেলা আলোচনায় এবং বন্ধুত্বেও প্রগাঢ় সম্পর্ক ওঁদের মধ্যে। কোনো সংকীর্ণতা নেই রণেশের ভাবনায়। এমন কি প্রায় সব কমিউনিস্টেরই যে সংকীর্ণতা থাকে—পার্টিতেই এবং পার্টির সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়াতেই ব্যক্তির প্রকৃত বিকাশ ও মুক্তি—রণেশ তা থেকেও মুক্ত। আবার মুনীরেরও আত্মবিশ্লেষণ ও আত্মোপলব্ধিতে কোনো জড়তা নেই।

সেলিনা লিখছেন,

"ওর কথায় সবাই হেসেছিল। রণেশকে চুপ করে থাকতে দেখে মুনীর বলে, 'রণেশদা দুঃখ পেলেন?' 'না, ভাবছি তোমাকে পার্টিতে ধরে রাখা

অনাবশ্যক।' 'ভাষাকে কেন্দ্র কবে বাঙালিব জাগবণেব সময এখন। মানুষ আত্মআবিষ্কাবেই উন্মুখ। ওদেব পিপাসা মেটাতে হবে। স্বদেশ, স্বজাতিব কৃষ্টি, সংস্কৃতিব পবিচয তুলে ধরা আমাদেব কর্তব্য। তাই বক্তৃতাই সহজ মাধ্যম।'

"আমি তোমাব সঙ্গে একমত। সোমেন চন্দব সঙ্গে তোমাব একটা আশ্চর্য মিল আছে। সোমেন প্রচুব পডত। তুমিও পডো। দাঙ্গার পটভূমিতে ও লিখেছিল গল্প 'দাঙ্গা', তুমি লিখেছ নাটক 'মানুষ।' দুজনেই কমিউনিস্ট।' 'একটি জাযগায অমিল আছে, বণেশদা।' 'কী'? 'সোমেন মধ্যবিত্তেব বেডি অতিক্রম কবে সর্বহাবা হতে পেবেছিল। আমি মধ্যবিত্তেব মোহেব কাছে পবাজিত হযেছি।' 'না, ভুল। ঠিক বলোনি।' মুনীব একটু চেঁচিযে বলে, 'বণেশদা, I am not what I am?

'এ তোমাব যন্ত্রণাব কথা।' (পৃঃ ২৮৪)

অনুজ বন্ধুকে, সহযোদ্ধা লেখককে পার্টিব চাব দেযালেব শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে হবে, নইলে তাব সৃজনশীলতা ক্ষুন্ন হতে পাবে। আবাব তাব অন্তবের গভীবে যে যন্ত্রণা তাকে আশ্রয দিতে হবে, তাব উপশম কবতে হবে, নইলে সে বেপথু হযে যেতে পাবে। এমন গভীব কবে সহমর্মিতা দিযে ভাবা ও কবা শুধু বণেশ দাশগুপ্তেব পক্ষেই সম্ভব ছিল। আব সেই জন্যেই বণেশ-সোমেন-মুনীবের কর্মে, চিন্তায, বন্ধুত্বে, সংগ্রামে ও আবেগে কোনো ফাঁক ছিল না। আবেগেও তাঁবা এক সঙ্গে, সংগ্রামেও একই সাথে।

সেলিনা লিখছেন,

"কলকাতায় গিয়ে সোমোনেব একদম ভিন্ন অনুভূতি হয। 'ক্রান্তিব লেখকবা এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাবে ও নিজেও ভাবতে পারে নি। · কখনো এতো উচ্ছ্বাসে ও বিব্রত হযেছে। লাজুক হাসা ছাডা আব কিছু কবতে পারে নি। আনন্দে অহংকাবে বুক ফুলে উঠছিল বাববার। "পবিচয" পত্রিকাব সম্পাদক বললেন, 'তোমাব গল্পটি চমৎকার। সামনেব সংখ্যায ছেপে দেব।' সোমেন নিজেকে ধবে বাখতে পারে না। বাববারই মনে হয যেন উডতে উডতে ঢাকায চলে যায। বণেশকে বুকে জডিযে বলে, 'রণেশবে, আমবা অনেক কিছুই পাবি। মফঃস্বলে আছি বলে আমবা খাটো হয়ে যাই নি।' (পৃঃ ২৩৪)

সাফল্যের আনন্দে ও আবেগে যেমন, জেলখানার যন্ত্রণায ও সংগ্রামেব শপথেও তেমনি। সেলিনার ভাষায়, "আবাব একুশ, এবাব তেম্পান্ন। দেখতে

দেখতে বছব গডিযেছে। ঢাকা জেলেব দেওযানি নামের ছোট ঘবটিতে দিন কাটে মুনীবেব। অজিত গুহ তাকে প্রাচীন আব মধ্যযুগেব বাংলা সাহিত্য পডতে সাহায্য কবছে।...তেস্পান্ন'ব একুশ নতুন প্রেরণায উজ্জীবিত কবে। · বণেশেব কাছ থেকে গোপন চিঠি আসে মুনীবেব কাছে। নাটক লিখতে হবে। হঠাৎ কবে বুকটা খালি হযে যায ওর। অনেকক্ষণ বণেশেব চিবকুটেব ওপব থেকে চোখ ওঠাতে পাবে না। কটিমাত্র কথা, কিন্তু কি তাব শক্তি। কি তাব তেজ! শবীবেব প্রতি বোমকূপ দাঁডিযে যায। যেন মহাকালেব আহবান, মুনীব, এখনই সময, উঠে দাঁডাও, চেতনাকে শানিত কবো, স্মৃতি অমব কবে বাখো। পেন্সিলে লিখেছে বণেশ, মুনীব একুশকে অমব কবে বাখতে হবে। একুশকে কেন্দ্র কবেই আমাদেব সংগ্রাম শুরু হবে। শব্দটা মুনীব বাববাব আওডায, যাত্রা শুরু, যাত্রা শুরু! (পৃঃ ২৯২)

লেখা হয মুনীব চৌধুবিব নাটক 'কবব'। গোপনে তা চলে যায বণেশ দাশগুপ্তব সেলে। হযতো কিছু ঘষামাজা কবেন তিনি। গোপনপথে বেবিযে যায় বাইবে। তাবপব সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান জুডে শুরু হযে যায তুমুল কাণ্ড। একটি নাটক যে একটি জাতিব গভীব ও উত্তাল আবেগকে ধাবণ ও প্রকাশ কবতে পাবে, তাব জীবনমবণ যুদ্ধ এবং হযে ওঠাব সংগ্রামকে আলোক-ময কযে তুলতে পারে 'কবব তাব প্রমাণ।

সমগ্র দেশ জুড়ে ছডিযে পডা সংগ্রামেব দাবানলে ঝডেব বাতাস জুগিযে-ছিল মুনীব চৌধুবিব 'কবব' আর তাতে স্ফুলিঙ্গের ভূমিকা ছিল বণেশ দাশগুপ্তব-ব।

।। তিন ।।

"এক মাথা চুল, বুকঢাকা দুর্বশাদা দাডি। কৃশ কিন্তু দীর্ঘ দেহ-তিনি কাত হযে শুযে ছিলেন মেডিক্যাল কলেজেব এমার্জেন্সিব বিছানায। তাঁব একপাশে যন্ত্রণাব আর্তনাদ, অন্য পাশে মৃতেব মত সাদা মুখ। হলঘবময ধুলো, কফ, দুর্গন্ধ বক্ত আব কোলাহল। 'কেমন আছেন?' উত্তবে গোঁফেব আডালে শুধু হাসি ফোটে। ছোট ছোট দুটি চোখ ঝিকমিক করে ওঠে, যেন কৌতুকেই। ইনিই বণেশ দাশগুপ্ত। সাতষট্টি বছর ধরে বিরামহীন হেঁটে চলেছেন প্রতিবাদ আর বিদ্রোহেব পথে। পূর্ববাংলায কামউনিস্ট আন্দোলনেব পথিকৃৎদের অন্যতম। ষাট বছর ধবে সাহিত্যের আসবে বোধ আব বোধিব

চর্চা কবতে কবতে (বহু মানুষকে প্রাণিত কবতে কবতে) চলতে চলতে এখন এমাজের্ন্সিব ফ্রি বেডে শুযে আছেন কাত হয়ে। (জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়, আজকাল, ১৮ ফেব্রুযাব্রি ৯৭)।

বাংলা গদ্যসাহিত্যে সোনার কলমেব অধিকারী, 'পরিচয'-সম্পাদক আমাব বন্ধু ও অগ্রজ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শেষ ও শ্রেষ্ঠ উপন্যাস "বিবাহবার্ষিকী"তে (শাবদীয 'কালান্তব' ১৯৭৭) হুবহু রণেশ দাশগুপ্তেব আদলেই গড়েছিলেন এক আদর্শ মানুষ ও কমিউনিস্ট চবিত্র। তার বছব দুযেক আগেই, মুজিব হত্যাব পবে পবেই, তিনি ঢাকা ছেড়ে চলে এসেছিলেন কলকাতায়। দীপেন্দ্রনাথ চবিত্রটিব নাম দিযেছিলেন শত্রুঘ্ন। উপন্যাসেব নাযক মণিমোহন পার্টিব হোলটাইমার। তাব প্রেমিকা বউ কনককে বলছে, "কী মানুষ কনক—দেখলেও পুণ্য হয। সেই ত্রিশেব দশকে কমিউনিস্ট হয়েছেন। —ইংবেজ আমলে, পাকিস্তান হওযার পব কখনো জেলে, কখনো আণ্ডাব গ্রাউণ্ডে জীবন কাটিযে দিলেন।"

যাঁকে "দেখলেও পুণ্য হয" তিনি তাঁব ৮৬ তম জন্মদিবসের পবেই শুযে আছেন মেডিক্যালের এমার্জেন্সিতে যাব সাথে শুধু দান্তেব ইনফার্নোরই তুলনা চলে। অসুস্থ হযে মাথা ঘুরে বণেশদা পড়ে গেলে ডাক্তার তখুনি হাস-পাতালে নিযে যেতে বলেন। তাঁকে এস-এস-কে-এমে নিযে যাওযা হয। কমিউনিস্ট ও বামপন্থী পবিচালিত সরকাবেব সেই "ভদ্রগোছের হাসপাতালে"ব কর্তৃপক্ষ সোজা দবজা দেখিয়ে দেন। অতএব মেডিক্যালেব এমার্জেন্সিতে পড়ে আছেন তিনি, নবকেব প্রহবী পবিবৃত হযে।

"এটাই কি তাঁব প্রাপ্য"? তাঁব অনুবাগীবা যখন উত্তেজিত, অস্থিব, ঠোঁটে কৌতুকেব হাসি নিয়ে অচঞ্চল, নির্বিকাব শুধু তিনি নিজে। মাঝে মাঝে মনে হয দীপেন্দ্রনাথ কেন তাঁর চবিত্রটির নাম দিযেছিলেন শত্রুঘ্ন? বাম, লক্ষণ বা ভরত দিতে না চাইলে যুধিষ্ঠিব বা অর্জুন দিতে পাবতেন। ভীস্ম তো দিতেই পারতেন। তিনি কি তবে জানতেন, এইসব চবিত্রেব জন্যে অনিবার্যভাবেই অপেক্ষা করে থাকে উত্তবের শীত? উপেক্ষাব শীত?" (ঐ আজকাল ১৮ ফেব্রুযাবি, ১৯৯৭)

বণেশ দাশগুপ্ত কমবেশি দীর্ঘ সমযেব জন্যে মোট চাববাব কলকাতায আসেন। তিনবার আসেন বাধ্য হযে, একবার স্বেচ্ছায ও সানন্দে। প্রথমবাব আসেন ১৯৩০ সালে।

দেশ জুড়ে তখন চলছে আইন ভাঙার আন্দোলন। তাকে কেন্দ্র করে

বাঁকুড়ায় বিপুল আলোড়ন ঘটে যায় ছাত্রদের মধ্যে। তার পুরোভাগে ছিলেন রণেশ দাশগুপ্ত। তিনি তখন বাঁকুড়ার ক্রিশ্চিয়ান কলেজের ছাত্র। তারপর যা ঘটার তাই ঘটল। ব্রিটিশ রাজশক্তি তাঁকে বিতাড়িত করল বাঁকুড়া জেলা থেকে। তিনি এলেন কলকাতায়।

কিন্তু কলকাতার কোন কলেজ নেবে ওভাবে বিতাড়িত ছাত্রকে? সিটি কলেজ নিল। সিটিতে চিরকালই ব্রাহ্মদের আধিপত্য। রণেশদা ব্রাহ্ম পরিবারের সন্তান। তাছাড়া সেখানে তখন তাঁর কয়েকজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ও ছিলেন।

১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে এক সাক্ষাৎকারে ব্যাপারটা তিনি এইভাবে বলেন,

"রণেশ ঃ ওই ১৯30 সালে ১৬ জনকে তাড়িয়েছিল আইন অমান্য আন্দোলন হয়েছিল বিরাট—তখন আমি—তারপরে কলকাতায় ভর্তি হলাম। সিটি কলেজে। তখন তো সার্টিফিকেট নেই, অন্য কলেজ নেবে না। সিটি কলেজ তো ব্রাহ্মদের কলেজ। ঘাঁটি। আমাদের আত্মীয়স্বজনে ভর্তি ছিল, তাই বলল, ওসব লাগবে না তোমার—

জ. প্র. চ. ঃ আপনি তো বদ্যি এবং ব্রাহ্ম?

রণেশ ঃ হ্যাঁ (জোরে হেসে ওঠেন)।

[আরও কিছু কথার পর]

রণেশ ঃ —তখন ব্রাহ্মরা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী—ব্রজসুন্দর রায়—উনি আমার ভগ্নীপতি, জীবনানন্দ দাশ তো আমার জ্যাঠতুতো ভাই।

জ. প্র. চ. ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ।

রণেশ ঃ তা জীবনানন্দ দাশকে তো হেরম্ব মৈত্র কলেজ থেকে···মানে বলেছিলেন—

জ. প্র. চ ঃ কী বলছিলেন?

রণেশ ঃ বলেছিলেন তোমার এখানে চাকরি করা হবে না। ওই কবিতার যে · হয় এখানে চাকরি করো, নয় কবিতা লেখো।

বলা বাহুল্য কবিতা ত্যাগ করেন নি জীবনানন্দ দাশ এবং সিটি কলেজে পড়তে পড়তে রণেশ দাশগুপ্ত কমিউনিস্ট হয়ে যান।

রাজনীতিতে তিনি আসেন 'অনুশীলনে'র প্রভাবে। তিনি গুরু বলে

মানতেন হরিপদ দে-কে, যিনি একসময় আন্দামানে ছিলেন। পরে তিনি কালান্তর-এর ছাপাখানার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

ক'লকাতায় তখন 'অনুশীলনে'র একটা ঘাঁটি ছিল 'যুগবানী পাঠচক্র'। 'যুগবাণী' পত্রিকার সম্পাদক দেবজ্যোতি বর্মণ ('বিড়লাবাড়ীর রহস্য' লিখে বিখ্যাত হন) ছিলেন তার একজন কর্তা। সেখানেই প্রথম রণেশদা দেবজ্যোতি বর্মণের অনুবাদিত 'কার্ল মার্কসের জীবনী' পড়েন এবং অনুশীলনপন্থা ছেড়ে মার্কসপন্থী হয়ে যান। বাংলা ভাষায় ওইটিই প্রথম মার্কসজীবনী।

সিটি কলেজ থেকে আই-এসসি পাশ করে বরিশালে বি. এম. কলেজে চলে যান রণেশ। জীবনানন্দ দাশের পিতা সত্যানন্দ দাশ ছিলেন তাঁর জ্যাঠা-মশাই। তিনি ছিলেন বিশিষ্ঠ শিক্ষাবিদ ও প্রধান শিক্ষক। তাঁর কাছেই ছিলেন তরুণ রণেশ। রণেশের উপস্থিতি বরিশালের ছাত্রযুবকদের মধ্যে বিপুল আলোড়ন তোলে। তখনই তাঁরা গড়ে তোলেন প্রথম কমিউনিস্ট গ্রুপ। একাজে তাঁর প্রধান সঙ্গী ছিলেন বর্তমানে পশ্চিম বাংলার সিপি আই এমের তাত্ত্বিক নেতা সুধাংশু দাশগুপ্তের দুই ভাই, হিমাংশু দাশগুপ্ত ও কিশাণ দাশগুপ্ত ('পরে ট্রাম শ্রমিকদের নেতা) এবং মতি মৌলিক প্রমুখ। পরবর্তীকালে এই গ্রুপে এক ঝাঁক উজ্জল তরুণতর কর্মী যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মণিকুন্তলা সেন, বীরেন রায় (ভোলাদা), অমৃত নাগ, প্রমথ সেন, অমিয় দাশগুপ্ত (মহারাজদা), জ্যোতি দাশগুপ্ত, দেবেন্দ্র বিজয় সেন প্রমুখ।

দ্বিতীয়বার তিনি কলকাতায় আসেন দেশভাগের পর, ১৯৪৮ সালে। তখনও পাসপোর্ট প্রয়োজন হতো না। সেবার আসেন আনন্দে, তাঁর ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে। রণেশদারা ছিলেন নয় ভাইবোন। বোনদের মধ্যে চতুর্থ সুমনার বিবাহ স্থির হয় তাঁর বন্ধু সোমেন হোড়ের মধ্যস্থতায়। রণেশদার পক্ষে বাড়তি আনন্দের কারণ, পাত্র নগেন দাশগুপ্ত ছিলেন আন্দামান ফেরত রাজবন্দী। অল্পদিন আগেই মুক্ত হয়েছেন।

তৃতীয়বার রণেশদা আসেন ঝড়ের দিনে, রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়, ১৯৭১ সালে। এসে প্রথমে উঠেছিলেন কড়েয়া রোডে তাঁর জ্যাঠতুতো দাদা লোকসেবক সংঘের নেতা ও পূর্বতন যুক্তফ্রণ্ট সরকারের মন্ত্রী বিভূতি দাশগুপ্ত-র ফ্ল্যাটে।

কিন্তু ততোদিনে তিনি কমিউনে বা একা অথবা 'আত্মগোপনের আশ্রয়ে থাকতে থাকতে এমন আত্মনির্ভরশীল হয়ে গেছেন যে কোনো পরিবারে থাকতে হলেই তাঁর ভয় করে, 'ওদের বোঝা হয়ে যাচ্ছি না তো ?' ফলে কড়েয়া রোডের

আশ্রয় ছেড়ে তিনি কমরেডদের কাছে চলে আসেন। তার পর পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন সত্তা পেয়ে গেলে মুক্ত বাংলাদেশে ফিরে যান তাঁর অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করতে।

চতুর্থবার এবং শেষবারও বটে, তিনি কলকাতায় আসেন ১৯৭৫ সালে মুজিবহত্যার ঠিক পরেই। মৃত্যুর আগে আর ফিরে যান নি। তিনি শুধু বঙ্গবন্ধুর জেলসঙ্গী পুরোনো ও ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং অগ্রজ বন্ধুই ছিলেন না, স্বাধীন বাংলাদেশে কমিউনিস্ট পার্টি ও মুজিবর রহমানের মধ্যে প্রধান যোগসূত্রও ছিলেন তিনি।

ফলে, তখন তাঁর কলকাতায় চলে আসাটা ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক।

॥ চার ॥

ঠিক করে দেখেছিলাম তাঁকে, প্রথম? কোথায় দেখেছিলাম? ১৪৪ নং লেনিন সরণিতে, শিল্পীসাহিত্যকদের বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম সংহতি সংগঠনের দপ্তরে? নাকি 'পরিচয়'-এর আড্ডায়? দুটিরই প্রধান ছিলেন দীপেন্দ্রনাথ। ১৯৭১ সালে, নাকি ১৯৭৫-এ? যতোদূর মনে পড়ে 'পরিচয়ে'ই। দীপেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, চেনো এঁকে? নামটা বলেছিলেন শুধু। আর কিছু বলার প্রয়োজন ছিল না। বিনয় ও ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা রণেশদা উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। শাদা ফুলশার্ট এবং পাজামা পরা মানুষটি কতো উঁচু তা বুঝতে অসুবিধা ছিল না। মাথাটা আপনিই ঝুঁকে পড়েছিল। প্রণাম করেছিলাম। প্রবল প্রতিবাদ করেছিলেন তিনি। কিন্তু মুখে সেই হাসিটি লেগে ছিল। সেই হাসিই যেন বয়স ও কৃতির সব পার্থক্য ঘুচিয়ে দিয়ে স্নেহের টানে টেনে নিয়েছিল কাছে।

পঁচাত্তরে এসে গোড়ার দিকে তিনি ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রবীন কমিউনিস্ট ও কালান্তরের সাংবাদিক বঙ্গেশ্বর রায়ের সঙ্গে। তারপর বাস করতে থাকেন ৪/৩ এ নং ওরিয়েণ্ট রো-তে, পার্ক সার্কাস ময়দানের গায়ে। সেখান থেকেই বেরোত 'শান্তি-স্বাধীনতা-সমাজতন্ত্র' নামে পত্রিকাটি। সেখানে তিনি, জ্যোতি দাশগুপ্ত প্রমুখ কমিউন করে থাকতেন। হাতে হাতে নিজেরাই সব করে নিতেন। কেমন করে আছেন, কী খাচ্ছেন, কে রান্না করছে এসব জানতে চাইলে যেন মজা পেতেন রণেশদা। কল্যাণ চন্দের স্ত্রী শিপ্রা চিন্তিত হয়ে একবার এসব জানতে চেয়ে শুনেছিলেন, কেন? আমি নিজে হাতে রুটি করি, খুব ভালো হয়, রীতিমতো গোলও হয়।

একদিন এসে দেখে যেও ! তাবপব, একটু ইতস্ততঃ করেই যেন, যোগ কবে-ছিলেন, একদিন এসে খেয়েও যেতে পাবো ।

১৯৮৩ সালে তাঁকে চলে আসতে হয পদ্মপুকুবে, 'কালান্তর' দপ্তবের একটি ঘবে ।

সেখানে তখন 'লেনিন স্কুল' । লেনিন স্কুল যতোদিন সচল ছিল ততো দিন ছিল একবকম । লোকজন আসত, কাজকর্ম আলাপ আলোচনা চলত, বাড়িটাব দেখভাল, মেরামতি হতো । তাবপব ? কেমন কেটেছিল তাঁর জীবনেব শেষ দিনগুলি, লেনিন স্কুলে ?

তাঁব মৃত্যুর পব 'কালান্তব'-এ লেখা হযেছিল "স্যাঁতসেতে প্রাযান্ধকার ঘব । একখানি তক্তপোষেব ওপর কাগজপত্র আর বইযে আবৃত হয়ে তাঁর বেশিরভাগ সময কাটত ।"

তাঁব মৃত্যুব তিনমাস আগে লিখেছিলাম, •"রণেশ দাশগুপ্ত এখন ভালোই আছেন ইংবিজি বছবেব শুবুতে মৃত্যু এসেছিল নিশ্চিতভাবেই । কিন্তু বণে ভঙ্গ দিতে হযেছে তাকে, আপাতত এ যাত্রায । মানুষটা তো বণেশ দাশগুপ্তই । হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেযে বালিগঞ্জ—পলতা কবে, পুত্র-কন্যাবং আপনজনদেব কাছে কিছুকাল কাটিযে আবাব ফিবে এসেছেন তাঁব পুরোনো ডেবায, সি-আই-টি-বোডে লেনিন স্কুলে ।

"ভালোই আছেন বণেশদা ! বৃষ্টির জোব বাড়লে যতীন আর তাব বউ ধবাধবি কবে তাঁর চৌকিটা ঘর থেকে বেব কবে আনে । বাইবে, হলঘবেব সেই জাযগাটায পেতে দেয যেখানে ছাদ থেকে তেমন জল পড়ে না । ঘবেব ভেতর ছাদ থেকে জল পড়ে জমিযে । ঘরেব জানলা তো মহাকাশ । বণেশদা চৌকিতে পা তুলে বসে থাকেন ! শুযেও থাকেন পা ছড়িযে । কেউ এলে বসে বসে গল্প করেন । পড়েন, টুকটাক লেখেন আব এন্তাব ভাবেন ।" (এই সময ওই অবস্থাতেই রণেশদা আকাশবানীব অনুবোধে নেতাজিব ওপব একটি ভাষণ প্রস্তুত করছিলেন এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়েব ফরমাযেসে নজবুলেব লেখায আববী ফার্সি ও উর্দু শব্দেব ব্যবহাব নিয়ে একটি বড প্রবন্ধ লেখাব তোড-জোড কবছিলেন ।)

"অধ্যাপিকা মালবিকা চট্টোপাধ্যায বণেশদাব কলকাতাব এক ভক্ত। সেদিন তিনি রণেশদাব জন্যে মাছ রান্না কবে নিযে গিযেছিলেন । তাঁব ধারণা অন্য কিছু নিযে গেলে বণেশদা সবাইকে খাইযে দেন । বান্না কবা মাছ তো খেতেই

হবে তাঁকে।···চৌকিব একপাশে বসে, চাবপাশ দেখতে দেখতে মালবিকা বলেন, 'এখানে এত জল, এই জলে···'জল ? কোথায জল ?' শিশুব বিস্ময়ে জানতে চান রণেশদা।·

হলঘবময জল জমে থাকা জল, এমনকি বৃষ্টির জল সম্পর্কেও মানুষ কতকিছু ভাবে, কতকিছু মনে হয তাব। রণেশদাবও হয।

"মোটেব ওপর কিন্তু ভালোই আছেন রণেশদা। আব ভালোই আছে এপাব বাংলাব অভিজ্ঞ কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদেব সবকাব" (আজকাল ১ আগস্ট ১৯৯৭)।

এই অবস্থাব মধ্যেও একদিনেব জন্যেও থেমে থাকে নি রণেশদার মননেব চর্চা। একেব পব এক লেখা বেবিযেছে তাঁব কলম থেকে। প্রকাশিত হযেছে 'কালান্তব', পরিচয', 'মূল্যাযন' 'সাহিত্যচিন্তা'-র মতো নানা পত্র-পত্রিকায।

সেই সব লেখা থেকে কিছু কিছু নিযে ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় "সাম্যবাদী উত্থান—প্রত্যাশা ঃ আত্মজিজ্ঞাসা"। কলকাতা থেকে প্রকাশিত এটিই তাঁর প্রথম ও একমাত্র বই। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ২২ বছর একটানা তিনি কলকাতায ছিলেন। কতো লিখেছেন। অথচ পার্টি বা পার্টিব মানুষজন পবিচালিত কোনো প্রকাশনা তাঁব কোনো গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যোগ দেখায নি। এ ব্যাপাবেও দীপেন্দ্রনাথেব সঙ্গে তাঁর খুব মিল।

প্রায এক অমানবিক পরিবেশেব মধ্যে বাস কবতে কবতেও মননেব কী অসামান্য কাজ কবা যায, মানুষ কবতে পাবে, রণেশ দাশগুপ্তের এই গ্রন্থটিব সূচীপত্রে একবাব চোখ বোলালেই তা উপলব্ধি কবা যায।

তাঁর 'স্বদেশ জিজ্ঞাসা' কতো ব্যাপক ও গভীব তা বোঝা যায় এই নামেব অধ্যাযটি দেখেই। এখানে তিনি আলোচনা করেছেন বিদ্যাসাগব, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, লালন ফকিব, বাহুল সাংকৃতাযন প্রমুখ মহাজনদেব নিযে। 'সাম্যবাদী উত্থান প্রত্যাশা' অধ্যাযে আছে 'ভলগা থেকে গঙ্গা ঃ মহালগ্নেব মহাগ্রন্থ' অপবাজিত উপন্যাসে কমিউনিস্ট চবিত্র, 'জীবনানন্দেব মার্কস লেনিন কমিউনিস্টবা' মতো অসাধাবণ কিছু প্রবন্ধ। সেই সঙ্গেই আছে বিজন ভট্টাচার্য ও ঋত্বিক ঘটককে নিযে লেখা 'দুই আধুনিক মাতৃতন্ত্রী 'সাম্যবাদী নাট্যশিল্পী।'

এবই পাশাপাশি আছে কিছু তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসার উত্তব সন্ধানে খোলামনে লেখা আশ্চর্য কিছু নিবন্ধ, 'সাম্যবাদী 'উত্থান ঃ প্রত্যাশা আত্মজিজ্ঞাসা'-ব

মশাল নেভে নেভে, নেভে না', 'দেখেছি, ভেবেছি, বুঝেছি', আদিবাসী বিদ্রোহের শিল্প রূপ সন্ধান'। গ্রন্থের শেষ অধ্যায় 'আন্তর্জাতিক জিজ্ঞাসা'। সেখানে দুটি উজ্জ্বল প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছেন মার্কেজ এবং ল্যাটিন আমেরিকা মুক্তি সংগ্রামের ঔপন্যাসিক ভালেহো কার্পেন্টিয়ার।

প্রথম অধ্যায়ের একটি নাতিদীর্ঘ কিন্তু মূল্যবান প্রবন্ধ 'বাংলাদেশের নয় এ মধুর খেলার রচয়িত্রীরা'-র কথা আলাদা করে বলতেই হয়। এটি পাঠককে বিশেষতঃ এপার বাংলার পাঠকের মনকে রীতিমতো আলোকিত করে। এ-প্রবন্ধে বাংলাদেশের কয়েকজন প্রবীণা ও নবীনতর লেখিকা ও তাঁদের লেখা নিয়ে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার সঙ্গে আলোচনা করেছেন রণেশ দাশগুপ্ত। তাঁদের মধ্যে আছেন বিশের দশক থেকেই বিশিষ্টা কবি বেগম সুফিয়া কামাল, তরুণ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা 'রুমীর আম্মা' নামে খ্যাতা ও আদৃতা'' এবং 'নয় এ মধুর খেলা,' 'একাত্তরের দিনগুলি,' 'বিদায় দে মা ঘুরে আসি' 'জীবনের স্রোত বহে নিরবধি' ইত্যাদি গ্রন্থের রচয়িত্রী বেগম জাহানারা ইমাম। তরুণতরদের মধ্যে আছেন তসলিমা নসরিন, মতিয়া চৌধুরি ('দেয়াল দিয়ে ঘেরা') মালেকা বেগম ('নারী আন্দোলনঃ সমস্যা ও ভবিষ্যৎ' 'সূর্য সেনের স্ত্রী পুষ্পকুন্তলা') সেলিনা হোসেন ('কাঁটাতারের প্রজাপতি' 'ভালবাসা প্রীতিলতা)' ভাষা আন্দোলনের এক পরিচালক ও মুক্তিযুদ্ধের শহীদ, বিশিষ্ট কমিউনিস্ট নেতা এবং উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'সংশপ্তক' এর লেখক শহিদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার ('মুক্তিযুদ্ধ ঃ আগে ও পরে') সৈয়দা মনোয়ারা খাতুন '(স্মৃতির পাতা') রোকেয়া রহমান কবীর '(সন্তনারীর কাহিনী ঃ গ্রামবাংলার রেখা চিত্র' প্রমুখ।

কলকাতার জনঅরণ্যে ওই পরিবেশে একাকী জীবন যাপন করতে করতে মাঝে মাঝে কোনো আক্ষেপ কি নড়েচড়ে উঠত 'ঢাকাইয়া' রণেশদার বুকের ভেতর ? ঢাকা থেকে দূরে থাকার জন্যে ? এই প্রবন্ধটি তিনি শেষ করেছেন এইভাবে ঃ "আরও যাঁদের লেখা বই সংগ্রহ করতে পারি নি, তাদের কথাও এই ৯২ তে দুই বাংলায় উঠবে এই প্রত্যাশা নিয়ে আমাদের ভাষ্যটি শেষ করছি শহীদ সেলিনা পারভিনকে স্মরণে এনে "যাঁকে বাংলাদেশে অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে এক কাতানে হত্যা করা হয়েছিল। একটি আবেদন রাখছি এই এই সঙ্গে তাঁর লেখাগুলি নিয়ে বই চাই।"

।। পাঁচ ।।

কিছুদিন আগে ক্যালকাটা ইনফর্মেশন সেণ্টারে বাংলাদেশের বইয়ের প্রদর্শনী হয়ে গেল। সেখানে রণেশ দাশগুপ্তের কোনও বই ছিল না। সত্যেন সেনও ছিলেন না। ··কথাটা বলতে গিয়ে সোমেন চন্দ-র ভাই সাহিত্য প্রেমিক কল্যাণ চন্দ-র গলাটা ধরে আসে। কিন্তু বণেশেব সামনে কথাটা উঠলে তাঁব ঠোটে শুধু সেই "কৌতুকের হাসিটুকু ফুটে ওঠে" (আজকাল ১৮ ফেব্রুযাবিতে ১৯৯৭)।

আবেকটি "তুচ্ছ" ঘটনা।

" বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধেব সময অনেক নেতাব মতোই খান সেনা আব বাজাকাবদেব হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে পালাতে হযেছিল বণেশদাকেও। •••মুজিবহত্যাব পব আবার যাঁদেব পালাতে হযেছিল, তাঁদেব মধ্যে ছিলেন তিনিও। গতবছব....মুক্তিব রৌপ্যজয়ন্তী উৎসব হযে গেল। আমন্ত্রণ পেয়ে কতোজন ঢাকায গেলেন। 'আপনার কাছে এসেছিল আমন্ত্রণেব চিঠি' ? হাসি দিযে যখন আব কিছুতেই সাবা যায় না তখন বালিশেব তলা থেকে বেব কবে আনেন চিঠিটা।" (ঐ)।

উৎসব কমিটির সুভেনিব সাবকমিটি তাঁব কাছে চেযেছিল একটি লেখা, মুক্তিযুদ্ধেব স্মৃতিকথা। কতো শ' যেন শব্দের মধ্যে।

চিঠিটি দেখাতে দেখাতে রণেশদাব মুখে, ঘন গোঁফ ও দাড়ির আড়ালে ফুটে উঠেছিল বিজয়ীর হাসি।

উপেক্ষাব এইসব শীত তিনি সইতেন কেমন করে? কেমন করে বজায বাখতেন তাঁব মুখের হাসি? কেমন কবে এর মধ্যেও কবে যেতেন নিজের কাজ নির্বিকাবে? আসলে তিনি ছিলেন আদ্যোপান্ত 'সেকেলে মানুষ' এবং বাঙাল।

'মেডিয়াব ক্ষমতা' শব্দদুটি জানাই ছিল না তাঁর। দুটি কাজ কবার পরেই তাকে বিশটি করে রটাবার টেকনোলজি ছিল তাঁব একেবারে অজানা। আত্মপ্রচাব শব্দটি ছিল তাঁর স্বভাবের বিপরীত মেরুর অধিবাসী। ফলে অনেকেই 'ভুলে যেত' তাঁকে। হয়তো অনেকের বিবেক তাড়িত হতো তাঁকে মনে বাখলে। তাঁর জীবনযাপন ও মননকর্মের দৃষ্টান্তে কেউ কেউ হয়তো ছোট হযে যেতেন নিজের কাছে।

দীপেন্দ্রনাথের উপন্যাসের নায়ক মণিমোহন বলছে, "এতো যে ঘনিষ্ঠতা আমার সঙ্গে, এতো গল্প, জানতেও পারি নি সোমেন চন্দের হত্যার পরে উগ্র

জাতীয়তাবাদীরা শত্রুঘ্নদাকেও হত্যার চেষ্টা করেছিল। মৃতজ্ঞানে ফেলে দিয়ে যায়। পঁচাত্তর সালে পুরোনো জনযুদ্ধ ঘাঁটতে ঘাঁটতে হঠাৎ চোখে পড়ল তারাশংকর, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখের বিবৃতি। তারাশংকরের শবানুগমনের সময় দীর্ঘ পথ হাঁটতে হাঁটতে কতজন কতো স্মৃতিচারণ করলেন। শত্রুঘ্নদা তখন কলকাতায়। সমস্তটা পথ আমার পাশে নীরবে হেঁটেছিলেন।"

নীরবে হাঁটাই ছিল রণেশদার প্রকৃতি।

কিন্তু তিনি জোরটা পেতেন কোথায় ? সব কষ্ট ও উপেক্ষার শীতকে জয় করার এমন প্রবল প্রত্যয়ের উৎসটা কী ?

'বিবাহবার্ষিকীর' নায়িকা কনক জানতে চেয়েছিল, "এতো জোর কোথায় পান ?" মানমোহন বলেছিল "পান বিশ্বাস থেকে, জ্ঞান থেকে, মানুষ থেকে।"

।। ছয় ।।

একথা বলা অন্যায় হবে কলকাতায় তিনি বিস্মৃত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বন্ধু, সহযোদ্ধা, আত্মীয়-স্বজন, অনুরাগীরা ছিলেন তাঁর পাশে। বাংলাদেশে তাঁদের সংখ্যা অনেক। এপার বাংলাতেও ছিলেন।

বাংলাদেশ সরকারের মনোভাব—নিরপেক্ষভাবে সেখানকার সাহিত্যিক, কবি, শিল্পী, বুদ্ধিজীবীরা বারবার চেষ্টা করেছেন তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কখনো এককভাবে, কখনো যৌথভাবে।

"রণেশদার মন ভালো আছে। বাংলাদেশ থেকে এসেছে চমৎকার এক প্রাণের ডাকের চিঠি, যেমন চিঠি শুধু ওপার বাংলার বাঙালিরাই লিখতে পারেন। চিঠিটা পাঠিয়েছেন ১৮৩ জন কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সমাজসেবী। সকলেই রণেশদার গুণমুগ্ধ ভক্ত। চিঠির তারিখ ২৫ জুন, ৯৭। ঠিক সতেরো সপ্তাহ আগে (১৮ ফেব্রুয়ারি, ৯৭)—একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। রণেশদা তখন মেডিক্যালের এমার্জেন্সিতে। লেখাটির শিরোনাম ছিল 'রণেশ দাশগুপ্ত ঃ উপেক্ষার শীতে প্রত্যয়ের মহীরুহ।'—'এখন রণেশদার মন ভালো আছে। থাকবে না ? অমন চিঠি এসেছে তাঁর প্রায় সমগ্র জীবনের কর্মভূমির, সৃষ্টি-ভূমির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের কাছ থেকে। কলকাতার গুমোট গরমে ভিড় ঠেলে ঠেলে

হাঁটতে হাঁটতে বারবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছিলাম বুক পকেটে চিঠিটার কপি। মনে হচ্ছিল এটা যেন আমারই চিঠি। মনে হচ্ছিল যেন আমার লেখা অক্ষর-গুলোর বুকভরা অভিমানেরই উত্তর এই চিঠি। হয়তো আদৌ তা নয়, তবু মনে হচ্ছিল—চিঠির লেখকদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠছিলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল ওঁদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করতে। ঈদের আলিঙ্গনের মতো, বিজয়ার আলিঙ্গনের মতো!" (আজকাল ১ আগস্ট ৯৭)।

লেখাটির চার কলাম জোড়া শিরোনাম ছিল, "বাংলাদেশ থেকে ঐতি-হাসিক চিঠি, রণেশ দাশগুপ্তকে।"

সে চিঠির একটি অংশ : "—আপনাকে বাংলাদেশের বুকে প্রত্যাবর্তনের জন্য আমরা গোটা দেশবাসীর পক্ষে আকুল আবেদন জানাচ্ছি। আপনার প্রত্যাবর্তনকামী নাগরিকজনেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সভায় মিলিত হয়েছিল এবং সমবেত সকলজনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আমরা আপনার সমীপে উপস্থিত হয়েছি।"

তখন যাওয়া হয়নি রণেশদার।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতেই হলো তাঁকে। ছ' মাসের মধ্যেই। মৃত্যুর পর।

॥ সাত ॥

মৃত্যুর আগে শেষ মাসটি তাঁর কাটে বরাহনগরে, তাঁর এক অনুরাগী রতন বসুমজুমদারের ফ্ল্যাটে। অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে সেখান থেকে আনতে হয় হাসপাতালে। এবার এস-এস-কে-এমেই। পেসমেকার বসাতে হয়। ভালোই ছিলেন। দেখতে গিয়ে দেখি আই-সি-সি-ইউ-এর যে-বিছানাতে আট বছর আগে আমি ছিলাম সেখানেই শুয়ে আছেন রণেশদা। শরীরটা কেমন অবশ, ছোট হয়ে গেছে। ডাক্তার নার্সরা প্রাণপণ করেছেন। কিন্তু সমস্যা, রণেশদাকে খাওয়ানো যাচ্ছে না কিছুতেই। ঘোরের মধ্যেও তাঁর প্রতিবোধ ভাঙে, সাধ্য কার? আমি ডাক্তারকে ঠাট্টা করলাম,

আয়ুব খান পারে নি, আপনারা পারবেন কী করে?

পারতে গিয়েই কাল হলো। 'ফোর্স' ফিডিং করতে গিয়ে

একটু খাবার শ্বাসনালীতে ঢুকে গেল। বহু চেষ্টা করে, বারবার 'সাক' করেও, সে খাবার আর ফিরিয়ে আনা গেল না। ৪ নভেম্বর ৯৭, মঙ্গলবার, দুপুর বারোটা কুড়ি মিনিটে এক অসামান্য হৃদয় স্তব্ধ হয়ে গেল।

পরের দিন তিনি আদুরে সন্তানের মতো ফিরে গেলেন বাংলাদেশে। যাওয়াটা সহজ হয়নি। রাষ্ট্রযন্ত্র দৈত্য হয়ে পথ আগলে দাঁড়ালো। প্রশ্ন উঠল, ইনি কোন দেশের নাগরিক? ভারতীয় হলে কেন যাবেন বাংলাদেশে? তাও আবার মৃত্যুর পর? আর যদি বাংলাদেশী হন তবে ওঁর পাসপোর্ট, ভিসা, কাগজপত্র কোথায়? সেসব ছাড়া এদেশে এলেন কী করে? এদেশে এতোদিন রইলেন কীভাবে? রণেশদার অনুরাগীদের ক্ষোভ যত বাড়ে রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রতিনিধিরা ততোই স্মিত হেসে নতুন নতুন ফ্যাকড়া বাঁধান। শেষ পর্যন্ত তাঁর অনুরাগী, সাংসদ গুরুদাস দাশগুপ্তর আবেদনে দিল্লী থেকে সাড়া দিলেন তাঁর আর এক অনুরাগী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত। প্রধান মন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরালও এগিয়ে এলেন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বেগম হাসিনাও পিছিয়ে থাকলেন না। সব জট খুলে গেল। রণেশদার শেষযাত্রা শুরু হলো মেঘনা-পদ্মা-বুড়িগঙ্গার দিকে।

তার আগেই সেখানে আবার 'জাতীয় কমিটি' গড়া হয়েছে তাঁর জন্যে। এবার তাঁর শেষ যাত্রা পরিচালনার জন্যে। কবীর চৌধুরি তার সভাপতি, হাসান ইমাম সম্পাদক। হাসান কলকাতায় এসে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন রণেশদাকে। তখন লিখেছিলাম, "বাংলাদেশ তাঁকে ফিরিয়ে নিল মায়ের স্নেহে, তাঁকে দিল রাজার মর্যাদা" (আজকাল ১৫ নভেম্বর ৯৭)।

৬ নভেম্বর বুড়িগঙ্গার তীরে শ্যামপুরে পোস্তাগোলা শ্মশানে আগুনে মিশে গেলেন রণেশ দাশগুপ্ত, আমাদের রণেশদা, যেভাবে একদিন তাঁর চোখের সামনেই মিশে গিয়েছিল তাঁর তরুণ সুহৃদ সোমেন চন্দ। সে তখন "মাত্রই বাইশ।" রণেশদার বুকের গভীরে আগুন কোনদিন নেভেনি, বরং দিনে দিনে বেড়েছে মুনীর চৌধুরি থেকে সেলিনা পারভিন পর্যন্ত অনেক মহৎ প্রাণের শহীদত্বে। দীপেন্দ্রনাথের মতো তাঁর মরমী সুহৃদের অকাল মৃত্যুতে (৪৬ বছর বয়সে)।

সে আগুনের একটা ছবি আমরা পাই সেলিনা হোসেনের "নিরন্তর ঘণ্টাধ্বনি"তে।

"দোরগোড়ায় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব, জাপানের ভারতবর্ষ আক্রমণের প্রস্তুতি, সোমেনের মৃতদেহ নিয়ে বন্ধুরা শ্মশানে যাচ্ছে। অনেকের সঙ্গে সঙ্গী হয়েছিলেন বংকিম মুখার্জি ও জ্যোতি বসু। দাউ দাউ আগুন জ্বলছে, নিস্তব্ধ সবাই। টপটপ পানি ঝরছে, মুখে শব্দ নেই। সকলের বুক জুড়ে দাউ-দাউ চিতার আগুন। অমৃত ছুরির ফলা দিয়ে দেয়ালে লিখল: 'সোমেন

চন্দ : আমাদের প্রিয় সংগ্রামী লেখক।' আস্তে আস্তে নিভে আসে চিতার আগুন। রণেশ বিড়বিড় করে, মাত্র বাইশ, বাইশ বছরে নিঃশেষিত হলো সোমেন। সোমেন। অমর, সোমেনের মৃত্যু নেই। হঠাৎ করেই ডুকরে কেঁদে ওঠে রণেশ এবং একটু পরেই দু'হাত মুঠি করে উপরে তুলে বলে, সোমেন অমর, মৃত্যুহীন সোমেনের প্রাণ। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীরা গলা মেলায়।···যুদ্ধের দরুণ ব্ল্যাক আউট চলছে, অন্ধকারে মোড়া ঢাকা শহরের রাস্তা, আরো অন্ধকার মানুষের হৃদয়ে শুধু নক্ষত্রমণ্ডলী জ্বলজ্বল করে মুক্তির ইশারা নিয়ে। রণেশ আচ্ছন্নের মতো পথ চলে। মুখে একটাই লাইন, মাত্র বাইশ, বাইশ বছরে শেষ" (পৃঃ ২৪১)।

সে আগুন কখনো নেভেনি। মৃত্যুর ছায়া এসে তাঁকে ঢেকে দেওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত রণেশ দাশগুপ্তের হৃদয়ে আগুন ছিল, আগুনের জ্বালা ছিল। আক্ষেপ শুধু, শেষ বাইশটা বছর—বাইশই—আশ্চর্য—সে আগুন ওপার বাংলা কাজে লাগাতে পারে নি, আর এপার বাংলা লাগায় নি। এতে ক্ষতি কার ?

ঋণস্বীকার : রণেশ দাশগুপ্ত, সেলিনা হোসেন, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হেলেন করিম, কল্যাণ চন্দ, বীরেন রায়, (ভোলাদা) মফিদুল হক। 'রণেশদার ভাষা'য় উল্লিখিত অংশগুলি তাঁর সাক্ষাৎকার (ডিসেম্বর ১৯৯৬) থেকে নেওয়া। 'আজকালের' উদ্ধৃতিগুলি লেখকের প্রবন্ধের অংশ।

———

লালন মেলার সূচনা : কিছু স্মৃতি ও বিস্মৃতির কথা

মানিক সরকার

ঊনবিংশ শতকে প্রধানত বাংলার গ্রামীণ জীবনে মানবমৈত্রী ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিতে নিবেদিত লোককবি ফকির লালন। রামমোহন বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখরা বাঙ্গালীর নতুন চেতনার পথিকৃৎরূপে স্বীকৃত। এই স্বীকৃতি ও সম্মান লালনকে দিতে হয়। তাঁর বাউলগানে মনুষ্যত্বের জয়গান রয়েছে, ধর্মীয় সংকীর্ণতা জাত-পাতের ভেদাভেদ ইত্যাদির বিরুদ্ধে তিনি বাংলার কৃষক এবং কৃষিজীবী সমাজকে জাগরিত ও অনুপ্রাণিত করেছেন। লালনের তথ্যনির্ভর যথার্থ মূল্যায়ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এই নিবন্ধ লালন-মূল্যায়নের দিকে প্রসারিত হবে না। লালনের স্মরণে ও বরণে এ বঙ্গে লালন মেলার প্রবর্তন হয়েছে। সে বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর মহকুমার সাজাদিয়ার্র নিকটে আসাননগর-ভীমপুর বৃহৎ গ্রাম দুটির প্রান্তিকে কদমখালিতে লালনের মৃত্যুশতবর্ষে ১৩৯৭ বঙ্গাব্দে (১৯৯০) ১ কার্তিক এই মেলার প্রবর্তন এবং লালনবেদী স্থাপিত হয়, ৮ম বর্ষ পূর্ণ হয়ে ৯ম বর্ষে মেলাটির প্রস্তুতি চলেছে। এই মেলা পশ্চিমবঙ্গের একটি গৌরব। এটি লালন গানের মেলা, হাজার হাজার শ্রোতার সমবেত হবার মেলা, উভয় বঙ্গের বাউল—ফকিরদের মিলনের বেসরকারি মেলা। লালনের পদচারণার স্মৃতির সঙ্গে মেলার স্থান নির্বাচনের কোন সম্পর্ক নেই, তা আমাদের জেনে রাখা ভাল।

লালন মেলার ভাবনা কোন পথ ধরে আমার অন্তরের মানুষটিকে স্পর্শ করেছিল, তা বলবার কোন উপায় নেই। তবে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের জন্মশত বর্ষে বর্তমানে ওপার বাংলার 'হারামণি' বৃহৎ গ্রন্থের রচয়িতা আমাদের সম্মানীয় বিশিষ্ট লোক-সংস্কৃতিবিদ্ প্রয়াত ডঃ মুহম্মদ মনসুর-উদ্দিন পাঁচজন লালন প্রশিষ্য কে নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁকে এবং তাঁদের নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগে তখন লোক-সংস্কৃতি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক পদে আমি কর্মরত ছিলাম। এই সম্বর্ধনার স্থান নদীয়ার কৃষ্ণ-নগরকে বেছে নিয়েছিলাম। নদীয়া জেলার তথ্য ও সংস্কৃতির বিভাগের শাখা

এবং লোক-সংস্কৃতি পবিষদ এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ কবেছিলেন। কৃষ্ণনগবে সি. এস. এস. বিদ্যালযেব বিশাল উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে এই নাগরিক সম্বর্ধনাব আযোজন হয। এই অনুষ্ঠানে ক্ষীণ কণ্ঠে জেলাব সবকাবি প্রশাসন এবং কৃষ্ণনগব বাসীদের কাছে আমাব ভাষণে প্রস্তাব রেখেছিলাম, "বাউল শ্রেষ্ঠ লালন শা' ফকিবেব স্থাযী স্মৃতি বক্ষার্থে আপনাবা অনুগ্রহ করে কিছু কবলে লালনের প্রতি সমগ্র বাঙ্গালীব অশেষ ঋণেব কিছু স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব হবে।" সেদিন জেলা প্রশাসন এবং মধ্যবিত্ত কৃষ্ণনগববাসী এ প্রস্তাবে কর্ণপাত কবেছিলেন কিনা তাব কোন প্রমাণ মেলে নি। এমনি কৃষ্ণনগরেব চিন্তকেবা কোন গুরুত্ব সেদিন দিযেছিলেন কিনা তাবও কোন প্রমাণ নেই। এ নিযে আর কোন উচ্যবাচ্য হতে দেখা যায নি। তবে সেদিন অনুষ্ঠান শেষে শ্রদ্ধেয মনসুবউদ্দিন সাহেব বলেছিলেন, "প্রস্তাবটি উত্তম।"

এই লেখকেব কেন যেন এখন মনে উঁকি মাবে এখনকার বুদ্ধিজীবী বা চিন্তকদেব একটি বড অংশ ব্যক্তি স্বার্থেই অধিক মগ্ন, নিজেকে নিযেই অধিক ব্যস্ত থাকেন। দেশেব সেবা, সাধাবণ মানুষেব কল্যাণকর্মে নিঃস্বার্থভাবে কিছু কবা, সমগ্র সমাজেব মঙ্গলব্রতে ব্রতী হওযাব মহৎ ভাবনায এঁবা কতটা আন্তবিকভাবে ভাবিত সে সম্পর্কে একটি বড প্রশ্নসূচক চিহ্ন এসে উপস্থিত হয। এ নিযে বাংলাব সমগ্র চিন্তক সমাজেব গভীব ভাবে চিন্তা করাব সময এসেছে। সামাজিক দায় ও দাযিত্বকে তাঁরা যদি উপেক্ষা করেন, তবে সমাজ তাঁদেব গ্রহণ কববে কেন? চিন্তকেরাও সামাজিক শক্তি, চিন্তা ও চেতনাব আলোকবর্তিকা, তাঁবা মানবিক সম্পদ। যাই হোক, এ স্বতন্ত্র আলোচনাব বিষয। এখানে উল্লেখ কবা হল মাত্র। লালন মেলা সূচনাব আগে এই লেখক মতামত প্রার্থনা কবে বহু চিন্তককে পত্র দিযেছিলেন, উত্তব পেযেছিলেন গোটা কযেকমাত্র। যাই হোক কৃষ্ণনগরে লালন ফকিবকে নিযে কিছু হল না। তবে লোকসংস্কৃতিব একটি উৎসবেব প্রদর্শনীতে কৃষ্ণনগরেব মৃৎশিল্পীব দ্বাবা নির্মিত সুন্দব একটি লালন মূর্তি প্রদর্শিত হল। বাংলার জেলাসদব গুলিব চরিত্র বড বিচিত্র। একে চেনা এবং জানা সহজে যায না। এব আকৃতিও বিচিত্র। একমাত্র কোচবিহার সদব এব মধ্যে ব্যতিক্রম। তাও একদা কবদ বাজ্য ছিল বলে হযতো ক্ষমতা হস্তান্তব এবং দেশ ভাগের পব এব আকৃতি-প্রকৃতি স্বভাবে নানা বং এসেছে। সে বংযের সমাবোহে সদব শহবেব গঠন শৈলী জনবসতি, সংস্কৃতি প্রকৃতি সর্বত্র নযন-নন্দন হয নি।

সর্বত্রই জোড়াতালি, পাঁচ মেশালি আদর্শ পৌবজীবন এখানে নেই, এ নিযে সামগ্রিক কোন ভাবনা-চিন্তা আছে কি ? এব জন্যেই হযতো লালন কৃষ্ণনগবে কোন মর্যদা এ কালে পান নি। অথচ এই নদীযা জেলাতেই তাঁর প্রধান কর্ম ও নর্মভূমি ছিল।

(২)

দিনটি ছিল ১৮ মার্চ ১৯৯০। শ্রী স্বপন ভৌমিক এবং শ্রী সুশান্ত হালদাব মহাশযেব অনুবোধে আহত অবস্থায আমাকে মাজদিযা হযে কদম খালিতে যেতে হয়। কদমখালি শ্মশানের সংলগ্ন পবিত্যক্ত জমিতে আমান নগর-ভীমপুবেব গুটি কযেক মধ্য বযস্ক যুবক আটেব দশকেব গোডাব দিকে খানা-খন্দ বুজিযে চাব চালাব একটি ঘব তুলে নিভৃতে তত্ত্বমূলক আলোচনা, দেহতত্ত্বমূলক গান, লালনের গান কবতেন ; এর অনুষঙ্গও কিছু হযতো কিছু ছিল। এবা যোগমাযা কালি মন্দির নির্মাণ কবলেন। স্থাপিত হল স্বপন বিশ্বাসেব নির্মিত মাটির শ্বেত কালিমূর্তি। এঁবা নামগানেব আযোজন কবতেন, বালক ভোজন দিতেন। এঁদেব সহধর্মীরা এ সমস্ত কাজে অংশ নিতেন। এদিন বাউল প্রসঙ্গে আলোচনা সভা এবং বাত বাউল গানেব আসব বসানব ব্যবস্থা প্রথম কবলেন।

আমি সুশান্ত দুপুরে পৌঁছিলাম। ৮ টায সভা আবম্ভ হল। আমি সভাপতি এবং ডঃ সুধীর চক্রবর্তী প্রধান বক্তা। বক্তৃতা আরও ২।১ জন দিযেছিলেন সেদিন। ডঃ চক্রবর্তী বক্তৃতা দিযেই চলে গিযেছিলেন। দুপুবে সভাব আগে স্বপন ভৌমিক আমাকে সুকুমাব সবকার, স্বপন বিশ্বাস প্রমুখেব সঙ্গে পরিচয কবিযে দিযেছিলেন। স্বপন বিশ্বাস একজন জাত শিল্পী, তাঁর কিছু শিল্পকর্ম ওখানে আছে। সুকুমার সবকাব কর্মী এব সংগঠক। এঁরা দুজনে "দোস্ত" ছিলেন। আমাননগবে উভযেব বাডি। ভীমপুবেও কিছু যুবক ছিল, সেদিন তেমন পবিচয হতে পাবে নি। স্থানটি বড় মনোবম, নিজেদেব শ্রমে তৈরী স্থান গাছ-গাছালিতে ঢাকা। লেখকেব মনকে আকর্ষণ করেছিল। তা কদমখালিতে গডে তোলা প্রাকৃতিক পবিবেশ দেখে তৃপ্তি পেযেছিলাম। মুগ্ধ হযেছিলাম। ভেবেই নিযেছিলাম ছেলেবা রুচি সম্মত। স্বপন বিশ্বাস, সুকুমাব সবকাবের মধ্যে লালন গানের প্রতি আকর্ষণ দেখে সভাপতিব ভাষণে ওখানে লালন মেলা এবং একটি বেদী

স্থাপনেব প্রস্তাব প্রকাশ্য সভাতেই বাখলাম। মঞ্চ থেকে নেমে আসাব পব ওখানকাব কর্মী বন্ধুরা মেলাব প্রস্তাবে উৎসাহিত হযে বলে উঠল "আপনি আমাদের পবিচালিত করলে এ কাজ আমরা করতে পাবব।" আমি আনন্দিত, উৎসাহিত হযে বললাম "আগে একদিন ঘরোযাভাবে বসাব এবং আলোচনা ও মত বিনিমযেব জন্য ব্যবস্থা কব।"

ওরা বললে, "আমরা তো প্রতিদিনই সন্ধ্যায ওখানে বসি।" আনন্দচিত্তে ফিবে এলাম। মাথায একরাশ চিন্তার বোঝা বইল। বিষযটি যে বেশ সিবিযাস হযে উঠল তা অনুভব কবলাম। সুশান্ত হালদাব এবং যতীন্দ্রনাথ বাযকে বললাম।

শ্রীস্বপন বিশ্বাস লিখেছে, "মানসিক দিক দিযে আমরা প্রস্তুত ছিলাম। আমাদের অভাব ছিল প্রবীণ এবং দক্ষ, বিশ্বস্ত একজন কাণ্ডাবীর। আমবা তার অপেক্ষায ছিলাম, এবং ঠিক সমযে আমরা কাণ্ডাবীরূপে আমাদের সভাপতি শ্রীমানিক সবকার মহাশযকে পেলাম" ('মানুষ বতন', মেলা স্মাবক 'গ্রন্থ', পৃষ্ঠা—'৭৮)।

(৩)

ফিবে এলাম। বাংলাব নবীন-প্রবীন বিজ্ঞ-জনের নিকট থেকে লালন মেলা সম্পর্কিত আমাব চিঠিব উত্তবে প্রাপ্ত চিঠিগুলি আবাব পড়ে নিলাম এবং একত্রে সেগুলি বেখে দিলাম। বাংলাদেশের অন্যতম লালন গবেষক ডঃ আবুল হাসান চৌধুরীর সম্পাদিত লালন বিষযক একটি গ্রন্থ 'হিতকরী' পত্রিকায (১২৯৭ সনের ১৫ কার্তিক, ১৮৯০ খৃষ্টাব্দেব ৩১ অক্টোবব) প্রকাশিত 'মহাত্মা লালন ফকীব' শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়লাম। লালনকে 'মহাত্মা' সম্মানে ভূষিত করা হযেছে একশত আঠাব বৎসর পূর্বেই। তাঁব মৃত্যু দিন ১ কার্তিক, ১২৯৭ বঙ্গাব্দ ভোর পাঁচটা।

পবে জেনেছিলাম সর্বজন শ্রদ্ধেয শ্রীঅন্নদাশঙ্কব রায মহাশয আনন্দ-বাজাব পত্রিকায লালনেব বিতর্কহীন মৃত্যুর শতবর্ষ দিবস পালন কবার আবেদন ইতোমধ্যে প্রকাশ কবেছেন। লালনের মৃত্যুশতবর্ষে এবাব কিন্তু কবা যায কিনা সে সম্পর্কে আমাব পবিচিত বন্ধু এবং সুধীজনেব নিকট পুনরায চিঠি লিখলাম। বার/তের জন উত্তর দিলেন; তার মধ্যে শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়, শ্রী সুধী প্রধান, ডঃ অরুণ বসু, ডঃ দুলাল চৌধুরী, ডঃ রতন

নন্দী, শ্রীপুলকেন্দু সিংহ, কোচবিহার থেকে ডঃ দিগ্বিজয় দে সরকার, বাঁকুড়া থেকে শ্রীশৈলেন দাস, জয়নগর মজিলপুর থেকে শ্রীপ্রতীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ ছিলেন। আমার চিঠি সমস্ত জেলাগুলিতেই ২।১ খানা করে গিয়েছিল। চিঠির প্রাবল্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ নড়ে বসলেন। অবশ্য সংস্কৃতি অধিকর্তা মহাশয়কেও চিঠি দিয়েছিলাম। মন্ত্রীমহোদয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। এখানে উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ সরকার লালনের মৃত্যু শত বর্ষে শ্রেষ্ঠ লোক শিল্পীদের জন্য লালন পুরস্কার ঘোষণা করেন। এটা আমার নিকট আনন্দের বিষয়।

ঘরোয়া বৈঠকের কথা বলে এসেছিলাম, তা এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতে হল। মাজদিয়া হয়ে আমি ভীমপুরে করুণাময় বাবুর বাড়িতে প্রবল বর্ষণের মধ্যে উঠলাম, সেখান থেকে জগবন্ধু দত্ত মশাই কদমখালিতে নিয়ে গেলেন। শ্রীমতী মঞ্জু সরকার কৃষ্ণনগর হয়ে ভীমপুর বাজারে গিয়ে কদমখালির কোন হদিশ না পেয়ে বর্ষণসিক্তা হয়ে বগুলায় ফিরে এলেন। চারচালা ছনের ছাউনি ছোট ঘরটিতে বৈঠক হল, হল মত বিনিময়, প্রেরিত এবং প্রাপ্ত চিঠিগুলির কথা জানান হল। 'লালনের মৃত্যু শতবর্ষ দিবসের কথাও জানালাম। ঠিক হল ১৭ জুন মন্দির প্রাঙ্গণে সাধারণ সভা হবে। বৈঠক থেকে ফিরে আসবার সময় 'দুই দোস্ত' স্বপন ও সুকুমার বললেন "কি কি করতে হবে তার একটা ছক তৈরী করে আনবেন।" ন' জনকে আহবায়ক করে সভা ডাকা হল, তিনশত কার্ড ছাপান হল, তা বিলিও হয়ে গেল।

১৭ জুন সভাটি বেশ বড় হল। ওই আকারের সভা আর হতে দেখিনি। সভার সূচনায় 'হিতকরী' পত্রিকায় প্রকাশিত "মহাত্মা লালন ফকীর" শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়া হল। শ্রোতারা মন দিয়ে শুনলেন। শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন কৃষক এবং কৃষিজীবী মানুষ। বেশ কয়েকজন মহিলাও ছিলেন প্রকৃত বাউল গানের তাত্ত্বিক ভিত্তিভূমিতে কৃষি বাউল গানের মর্মার্থের মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর মহাশয়ের "বাউল গান ও দুদ্দুশাহ" গ্রন্থের ভূমিকায় মূল্যবান দীর্ঘ আলোচনা করেছেন।

বাংলা ভাগের পূর্বে লালনের আখড়া সেঁউড়িয়া কুষ্ঠিয়া মহকুমার মধ্যে ছিল, কুষ্টিয়া ছিল নদীয়া জেলার অন্যতম একটি মহকুমা। কাঙ্গাল হরিনাথ (মজুমদার) এবং তাঁর সম্পাদিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কুষ্টিয়ায় একটি বিদ্বৎ সমাজ গড়ে উঠেছিল। এই সমাজে জলধর সেন মীর

মোশাবফ হোসেন প্রমুখ ছিলেন। কলকাতার বিদ্যুৎ সমাজ, গ্রাম বাংলাব উদীযমান চিন্তক সমাজ তখন লালন-পালন কবাব ক্ষেত্রে তেমন উৎসাহী থাকলে সমগ্র অখণ্ড বাংলার চিন্তা ও কর্মের ফসল অন্যরূপ হতে পাবত বলে এই লেখক বিশ্বাস কবে। কলকাতা দিযেছে অনেক, গ্রাস করেছে কম নয, সম্ভবতঃ বেশী। নগব ও গ্রামেব বিবোধ আছে বিশ্বেব বিভিন্ন দেশে, ভাবতেব সকল রাজ্যে। কিন্তু কলকাতা এবং গ্রাম বাংলার ব্যবধান বড়ই প্রকট। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রাযেব এ বিষযে মূল্যবান আলোচনা আছে। তাঁব আলোচনাব সূত্রে প্রবাদ বাক্যেব মত একটি বাক্য হযে বযেছে—সমগ্রদেহেব বক্ত মুখমণ্ডলে জমা হলে তাকে স্বাস্থ্যবান বলা যায় না। যাক ওই প্রসঙ্গ।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ এবং ক্ষমতা হস্তান্তবেব সময কুষ্টিযাব বহু পবিবাব উদ্বাস্তু হযে আসাননগব-ভীমপুব এবং তাব আশেপাশে এসে নতুন বসতি স্থাপন কবেন। এদেব অনেকেব নিকট লালন ফকিবের নামটি পরিচিত। লালনেব প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তি এঁরা পোষণ কবেন। তাঁদেব পিতৃ-পুরুষেব বহুকালের বাসভূমিব মানব প্রেমিক লালনের প্রতি প্রগাঢ অথচ সুপ্ত আকর্ষণ ওখানকাব বাসিন্দাদের অনেকেব মধ্যে লুকিযে আছে। লালন তাঁদেব মনকে টানে, লালনেব গান তাঁদের হৃদযকে স্পর্শ করে। লালনকে নিযে কদম খালিব ওই স্থানটি কিছু কবতে ষাচ্ছে তাতে ওই স্থানটিও নতুন মাত্রা পেল। তাই সভায ভিড সেদিন স্বাভাবিক ছিল, মেলায় প্রতিবৎসর উপচে পড়া ভিডেব অন্যতম কাবণও এটি।

সভায সাত দফা কর্মসূচী পেশ কবি সভাব সভাপতি এবং অন্যতম আহ্বাযক হিসাবে,

(১) ১ এবং ২ কার্তিক ১৩৯৭ মহাত্মা লালন ফকিবের তিবোভাব শতবর্ষ পশ্চিমবঙ্গেব নদীযাব কদমখালিতে পালন কবা হবে, (কদমখালি বলে ওখানে কোন গ্রাম, এমন কি পাড়া পর্যন্ত নেই, আছে একটি শ্মশান),

(২) লালনের একটি প্রতিকৃতি ও লালন বেদী স্থাপন কবা হবে। সম্ভব হলে বর্তমান বাংলাদেশেব কুষ্টিযা জেলাব সেঁউ-ডিযায অবস্থিত লালন সমাধি থেকে মৃত্তিকা সংগ্রহ কবে লালন বেদীতে রাখা হবে (আদি সমাধিব অস্তিত্ব নেই এখন),

(৩) লালনেব নামে এই বছব "লালন মেলাব" প্রবর্তন কবা হবে,

(৪) মানব মৈত্রী এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা লালন মেলা নিবেদিত হবে। দু'রাত ব্যাপী লালন গীতেব আয়োজন করা হবে,

(৫) একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশ এবং লালন বিষয়ক গ্রন্থেব প্রদর্শনী হবে;

(৬) বাংলাদেশেব লালন ধারা বাউল-ফকিবদের আমন্ত্রণ জানিযে এ মেলায উভয বঙ্গে বাউল-ফকিবদের সমবেত করার চেষ্টা হবে,

(৭) বাউল-ফকিরদের সমস্যা এবং তাব সমাধান শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করা হবে।

আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে এই কর্মসূচী গৃহীত হয়। শ্রীস্বপন ভৌমিক ৫০ হাজাব টাকাব সম্ভাব্য আয-ব্যযেব প্রস্তাব পেশ কবেন, সভায তা অনুমোদিত হয।

এই সভা থেকেই মহাত্মা লালন ফকিব তিবাভাব শতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি গঠিত হয। পববর্তী বৎসব থেকে এই সমিতিব নাম পবিবর্তন কবে 'পশ্চিমবঙ্গ বাজ্য লালন মেলা সমিতি' বাখা হয। উদ্‌যাপন সমিতিব কর্মকর্তা সভা থেকেই মনোনীত হয—সভাপতি এবং সাধাবণ সম্পাদক যথাক্রমে মানিক সবকাব এবং সুকুমাব সবকাব, এবং সহ সভাপতি সুশান্ত হালদাব, যতীন্দ্রনাথ বায, সহ-সম্পাদক স্বপন ভৌমিক এবং সলিল বিশ্বাস হন। একটি উপদেষ্টা মণ্ডলী গঠিত হয—তাতে শ্রীঅন্নদাশঙ্কব বায, ডঃ অবুণ বসু, পুলকেন্দু সিং, জেলা সভাধিপতি এবং জেলা শাসক, স্থানীয বিধাযক প্রমুখকে রাখা হয। শ্রী বায মহাশয এবং ডঃ বসুর সঙ্গে মেলা বিষযক পূর্বেই পত্রালাপ হয়েছিল আমাব। এঁদেব আন্তরিক উৎসাহই আমার পাথেয ছিল।

কর্মসূচী গৃহীত হলেও তাকে কর্মক্ষেত্র বূপায়ণেব জন্য লালন মেলার কর্মনীতি গ্রহণেব প্রয়োজন হযে পড়ে। প্রথম সাধাবণ সম্পাদক শ্রীসুকুমাব সবকারের সম্পাদকীয প্রতিবেদনে বর্ণিত আছে "...গণতান্ত্রিক কর্মপদ্ধতি (সমিতিতে) অনুসৃত হয। সভাপতি মহাশযের পরামর্শ গ্রহণ কবে উদ্‌যাপন সমিতি নিচে বর্ণিত (কর্ম) নীতি পালন কবে সকল কাজ পবিচালনা করেন ঃ

"(ক) সমিতিব ঐক্যমত সিদ্ধান্ত কার্যকরী করতে হবে। কোন (মৌলিক) বিষযে দ্বিমত বা বহুমত দেখা দিলে তা যেমন বর্জন করা হবে না, তেমনি গৃহীত বলে সিদ্ধান্ত হবে না; আলোচনা স্তরে তা বেখে দিতে হবে, আলোচনা এবং অভিজ্ঞতাব মাধ্যমে তা মীমাংসিত হবে।

(খ) জাতপাত, ভেদ চিন্তা, দলীয় রাজনীতিকে (সেলাম) কোন প্রকারে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। আস্তিক-নাস্তিক, ঈশ্বরবাদী নিরীশ্বব বাদী সকলেরই সমমর্যাদা, সমঅধিকার থাকবে। এ-বিষযে কোন তিক্ততা সৃষ্টি কবা চলবে না। সকলের উপবে মানুষকে স্থান দিতে হবে ঃ

মানুষেব ধর্মপালন কবতে হবে, লালনেব 'মনুষত্ব' অন্তব দিযে অনুসবণ কবতে হবে। (একটি) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে একে (উদ্‌যাপন সমিতি) গণ্য কবতে হবে। মানব মৈত্রী ও সম্প্রীতিব একটি কেন্দ্র বলে মান্য কবা হবে।

(গ) জনসাধাবণেব নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থেব নিখুঁত হিসাব বাখতে হবে, বসিদ্ বই-এ অর্থ সংগ্রহ কবতে হবে। প্রতি-বৎসর বিধিবদ্ধ (হিসাব পবীক্ষককে) দিযে হিসাব পবীক্ষা কবাতে হবে।

(ঘ) একটি স্থাযী (সাংস্কৃতিক) প্রতিষ্ঠান গঠনেব প্রতি দৃষ্টি বাখতে হবে।

(ঙ) সর্বপ্রকাব মাদকদ্রব্য বর্জন সর্বাগ্রে কবতে হবে।

(চ) আশ্রমেব পরিবেশ ক্রমান্বযে মাধুর্যমণ্ডিত কবে তুলতে হবে।"

কদমখালি কুঁড়ি থেকে ফুল ফোটাব দিকে পা ফেলল। লালন মেলা একটি গ্রামীণ জীবনে নতুন মাত্রা বা নিউ ডাইমেনশানে উত্তবণের পথ ধরল। প্রস্তুতিব কাজ চলতে লাগল। সহধর্মিনী মঞ্জুকে নিযে তখন প্রতি সপ্তাহে একবাব কবে যেতে আবম্ভ করলাম। কর্মী আছে, কর্মীদেব মধ্যে উৎসাহ আছে, আবেগ ও আন্তবিকতা আছে। কিন্তু মেলা যে কী ভাবে হবে, মেলার অনুষ্ঠান সূচীতে কি থাকবে সে সম্পর্কে কদমখালিব কোন কর্মীরই স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এ বিষযে সকলেই বহুলাংশে আমার উপর নির্ভরশীল।

উদ্‌যাপন সমিতিব নিযমিত সভা হতে লাগল। গ্রামীণ জীবনেব সাবল্যেব পাশাপাশি নানা প্রকাবেব জটিলতা, ব্যক্তি বিশেষেব উদাবতাব সঙ্গে সংকীর্ণতা আমাব চোখে পডছিল। ছোট বিষয নিযে বৃহৎ বিতর্ক কানে আসছিল। তাই সমবেত আলোচনাব পথ ধবলাম।

সমিতির ১ ভাদ্র ১৯৯৭'ব প্রথম আবেদন পত্র দীর্ঘ কবে লিখলাম। পাঁচ হাজাব ছাপান হল, চাহিদাব প্রাবল্যে আবও দু'হাজাব পুণর্মুদ্রন হল। বুঝলাম আবেদনটি গ্রামীন চিত্তকে নাডা দিয়েছে। কোন ধর্মীয মেলা না হওযা সত্ত্বেও এই নাড়া আমাদেব উৎসাহিত করল। উল্লেখ্য, এই আবেদন পত্রেই 'কদমখালি বাউল আশ্রম' প্রথম নামকবণ হল। আশ্রমের সেদিন দুটি মূল খুঁটি—সুকুমাব এবং স্বপন বিশ্বাস ছিল। আরও অনেকেই ছিল, তাদেবও ভূমিকা গৌণ নয়। খেটে খাওযা দবিদ্র কর্মীরাই আশ্রমে প্রধান শক্তি। আমবা চাকুবীজীবী বাবুবা সভায যাই। কিন্তু আশ্রমকে ও'বাই নিত্য আগলে বাখেন, সভায এঁরা নীবব, কর্মে অত্যাধিক তৎপর।

১ কার্তিক ১৩৯৭ র আগেব বাতে বেদী এবং লালন প্রতিকৃতি হযে গেল। প্রতিকৃতিটি স্বপন নিজেই কবল, বেদীব নকসাটিও তার। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। ছোট্ট লালন বেদীটি বাংলাব স্থাপত্য শিল্পে কিছুটা অভিনব, অতি মনোবম। শিল্পীব সৃজনশীলতাব সাক্ষ্য বযেছে। শিল্পী স্বপনেব সৃজন-শীলতাব মর্য্যাদা আমি সর্বদাই দিযে যাব। যেমন সুকুমাবকে বলব—ভাল সংগঠক, সমস্ত দিকে দৃষ্টি বেখে কাজ কবে।

যে অনুষ্ঠান সূচী তৈবী কবেছিলাম কার্তিকেব আগেব বাতে ছাপিয়ে আমাদেব হাতে এল। অনুষ্ঠসূচীটিই বর্ণাঢ্য এবং মনোজ্ঞ একটি চিত্র হযে ওঠে সেদিকেই অধিক দৃষ্টি রেখেছিলাম।

মেলাব প্রাক্ সন্ধ্যায 'পশ্চিমবঙ্গ পুতুল নাট্য সংঘ' লালনেব জীবনী প্রদর্শিত কবলেন। ডঃ তুষাব চট্টোপাধ্যায সংহত ভাষণ দিলেন। মেলাব আমেজ অনেকটা যেন এল।

উদ্‌যাপন সমিতিব কর্মকর্তা, সদস্য-সদস্যগণ অনেকেই আশ্রমে বাতে বযে গেলেন। নামের তালিকা দিতে হলে অনেকটা স্থান নিতে হয। একটি নাম কবতেই হবে, বাংলা দেশেব লালন প্রশিষ্য আজমত শা ফকিরেব উদ্‌যাপন সমিতি। ব্যক্তিগত ভাবে আমি, আমাব সহধর্মিনী তাঁব কাছে অপবিসাধ্য ঋণে ঋণী, বিনম্র মস্তকে এব স্বীকৃতি দেওযা যেতে পাবে। লালনের বেশ কিছু গানের তিনি মূল্যবান তাৎপর্য বুঝিযে দিযেছেন। এখন তিনি প্রযাত।

আমাদেব অনেকেব কাছেই বিস্মৃত। অথচ মেলাব সূচনাব আগে থেকে আশ্রমে তিনি থেকেছেন, লালনেব সুবে লালনেব গানও নিযেছেন কযেকজনকে শিক্ষাও দিযেছেন। আমাদেব মধ্যে বেইমানও আছে, যাবা ঋণকে স্বীকাব করতে জানে না, কাবো অবদানকে মসীলিপ্ত কবতে চায়। এবা কিন্তু বিবেকেব দংশনে দংশিত হয, তুষানলে জ্বলে। অতি সংগোপনে বলি বাংলায 'বর্ণচোবা' বলে একটি শব্দ আছে।

বাতে কাবো তেমন ঘুম হল না। 'মাঙ্গলিক' অনুষ্ঠান ১ কার্তিকেব প্রতুষে ৪-৪৫ মিনিটে। মাঙ্গলিকব' কথা ওখানে অভাবিত। ৪-৪৫ মিনিটে আশ্রম থেকে মাঙ্গালিকে বিসমিল্লা খাঁব সানাই'র সুব আকাশ তবঙ্গে তবঙ্গাযিত হল। কী আনন্দ। শ্মশানেব পবিত্যক্ত ভূমিতে নবপ্রাণেব মালঞ্চ হল। মৃত্যুতেই যে মানুষের শেষ নয, তা মনে জেগে উঠল। লালন যেন আসছেন আমাদেব মাঝে শ্বেত বসন পবে এই অনুভূতিব স্পর্শ অনেকেব মধ্যে পেলাম। সকল মানুষেব মধ্যেই আবেগ অনুভূতি আছে। কিন্তু তাব গতিমুখ ভিন্ন হয। ঘুমন্ত চিত্তেব জাগবণের জন্য ভোবেব আবেশে সানাইযেব সুব এনে-ছিলাম। গণপতিকে মনে মনে ধন্যবাদ জানালাম।

কাবণ মাঝ বাতে ও কোন জাযগা থেকে সানাইব ক্যাসেটটা জোগাড কবেছিল।

সকলে ঠিক ভোব পাঁচটায লালনের মৃত্যুর সময় বেদীব সামনে এসে আমি তাব দ্বাব উদ্ঘাটন কবলাম এবং মাথা নত কবে দাঁডালাম লালনেব স্মবণে!

২ মিনিট মৌনেব পব বজনীগন্ধার মালা একে একে লালন প্রতিকৃতিতে সকলেই দিলেন। মালা দিযে আমাদেব শ্রদ্ধানিবেদনেব পব পাঁচজন বাউলেব পাঁচখানি লালনের গান হল, গঙ্গা জল দিযে গঙ্গা পূজাব মতো। মেলার শুভাবম্ভ ভোবেব আকাশ দেখে দিল, সূর্য উঠল, আশ্রমেব বনবীথিব হৃদযেব স্পন্দন স্পন্দিত হল তা অনুভব কবলাম।

দুপুবে আলোচনা সভা হল। ডঃ তুষাব চট্টোপাধ্যায মূল্যবান আলোচনা কবলেন, লালন গীত বিকৃত যে কবা হচ্ছে তাব প্রতি সকলকে সচেতন হতে অনুবোধ জানালেন।

সন্ধ্যায ১০০টি প্রদীপ বেদীব চাব পাশে জ্বলে উঠল। আশ্রমিকেবাই এব দাযিত্ব নিযে ছিলেন। মাটিব প্রদীপ তাঁবা নিজ হাতেই বানিযেছিলেন। তাঁদেব মধ্যে প্রমীলা, ননীবালা নেই আব আমাদের মধ্যে।

এরপর লালন গানের আসর বসল, উদ্বোধন করলেন শান্তিনিকেতনের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শ্রী শান্তিদেব ঘোষ। লালন এবং রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক আলোচনা করলেন। শ্রোতাদের একটি ক্ষুদ্র অংশে এ আলোচনা শোনার মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত ছিলেন না। শিক্ষা নিলাম গানের আসরে ভাষণ অচল। অবশ্য আসর বসাতে আমাদের বিলম্ব হয়েছিল।

বাউল গ্রামের এই আসরে গান আরম্ভ হবার আগে স্মারক গ্রন্থটি গ্রন্থ সম্পাদক সুশান্ত হালদার বাংলাদেশের লালন প্রশিষ্য প্রবীণ আজমত শা' ফকিরের হাতে তুলে দেওয়ার পর উদ্বোধন হল।

রাতব্যাপী লালনের গান হল, শত শত নর-নারী আসরে সমবেত হলেন, তাঁরা দেহতত্ত্বমূলক লালনের গান শুনলেন।

এই আসরেই উভয় বঙ্গের, এখন বলতে হয় উভয় সার্বভৌম রাষ্ট্রের বাউল ফকিরেরা লালনের গানে গানে সম্প্রীতি ও মৈত্রীর বন্ধনকে দৃঢ় করলেন। ১৯৪৭ সালে বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছিল, বাংলার বাউল গানকে লালন, দুদ্দুশাহ প্রমুখের গানকে দু'ভাগ করা যায় নি।

মানুষের জীবনে, তার গতির ছন্দে গতি এবং রক্ষণশীলতা মিলে মিশে থাকে। চিন্তার মুক্তি কথাটি সহজ, কিন্তু মুক্তচিত্ত হওয়া অত্যন্ত কঠিন। এর জন্য নিরলস প্রয়াস, সমগ্র সামাজিক ও ব্যক্তি জীবনে প্রয়োজন। লালন গানের মর্মার্থ এখানেই।

লালন বেদীতে আমরা 'মানুষ সত্য' খোদাই করে রেখেছি। যে কোন মানুষ? সেকি পচাপুকুরের শেওলা জমা জলে ডুব দেওয়া মনুষ না বহমান নদীর জলে স্নাত মানুষ? সে কি শুধুই দিনগত পাপক্ষয়ের গণ্ডিবদ্ধ খণ্ডিত মানুষ, না বিশ্বচরাচরে যে মানুষের হৃদয় সতত প্রসারিত সেই অখণ্ড মানব?

গত সাতটি বছর হাজার হাজার নর-নারীর অন্তরে
এই প্রশ্ন জাগানই লালন মেলার বড় অবদান।

———

নারী মর্য্যাদার প্রতিফলন সাহিত্যে

অজিত কুমার রাহা

ইদানীং নারীব মর্য্যাদা ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বত্র একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। এই সচেতনতা প্রত্যক্ষ করা যায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আন্দোলন দানা বাঁধছে নারীব অবহেলিত অবস্থা অবসানে। শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নাবীদেব অবস্থার একটু উন্নতি হলেও সমস্যাব ব্যাপকতার প্রেক্ষাপটে তা যথেষ্ট নয। বিশ্বেব প্রায় সর্বত্রই সুরু হযেছে হৈচৈ। আমাদেব এখানে পঞ্চাযেত, পৌবসভা ও পৌব প্রতিষ্ঠানে নাবীদের প্রতিনিধিত্ব যেমন পৃথকভাবে স্বীকৃত হয়েছে তেমনি তোড়জোড় চলছে কেন্দ্রীয ও রাজ্য আইনসভায যথেষ্ট পবিমাণ নারী প্রতিনিধিত্ব সম্প্রসারণেব।

যাহোক নারীদের অবহেলিত জীবনে স্বাধিকাব ও মর্য্যাদা মর্মান্তিকভাবে যে অবস্থায় পরিণত হযেছে তা একদিনে হয়নি ঃ সমাজ জীবনের ক্রমবিকাশের ধারাব সঙ্গেই এই করুণ পবিণতি জড়িত। সুতবাং সাহিত্যে নারীর মর্য্যাদার প্রতিফলন আলোচনা করবার আগে দেখতে হবে এই অবস্থা সৃষ্টির কাবণ।

মানব সমাজের বিকাশেব ধাবা সম্পর্কে ঐতিহাসিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা সকলে একমত নন্। মর্গান, বাখোফেন থেকে সুরু করে মার্কস এঙ্গেলস্ প্রমুখ সমাজ বিবর্তনেব ধাবা বিভিন্ন দিক থেকে বিশ্লেষণ কবেছেন। এই বিকাশ ঘটেছে স্তবে স্তবে ও ধীবে ধীরে।

মানব সমাজ গঠনের প্রথম কারণ প্রকৃতি। প্রকৃতিগত কারণেই অনিবার্য্য হযে ওঠে মানুষের পাবস্পবিক সহযোগিতা। সহজাত প্রবৃত্তি ও যুক্তিসিদ্ধ প্রয়াসেব ফলেই নরনারী পাস্পরিক সাহচর্য্যের ও সহযোগিতাব মধ্য দিযেই সংঘবদ্ধ জীবন গঠন কবে ও সমাজবদ্ধ হয।

সমাজ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নবনারীব অবস্থান কিভাবে পালটাতে থাকে তা দেখা দবকাব ঃ সমাজ বিজ্ঞানে সমাজের বিকাশকে পাঁচটি স্তবে ভাগ কবে দেখান হয়েছে, এই পাঁচটি স্তর হল—সমাজ বিকাশেব (১) আদিম সাম্যবাদী স্তর, (২) দাস প্রথাব স্তর, (৩) সামন্ততান্ত্রিক স্তর, (৪) পুঁজিতান্ত্রিক স্তর এবং (৫) সমাজতান্ত্রিক স্তর।

সমাজের আদিম অবস্থায় নিরাপত্তাবোধের অভাবে মানুষ খাদ্য অন্বেষণে ঘুরে বেড়াত যাযাবরের মত বন-বনান্তরে। এই অবস্থায় বিভিন্ন সময়ে খাদ্য উপকরণে বিভিন্ন জিনিষ ব্যবহৃত হত। এই সময়ে কেবল নারী ও পুরুষের শ্রম বিভাগ ছিল, প্রশ্ন ছিল না পুরুষের আধিপত্যের। গৃহস্থালী ছিল সাম্যতন্ত্রী। কিন্তু বিবাহ বলে কিছু ছিল না এ সমাজে। যা ছিল তাকে বলা যেতে পারে সমষ্টি বিবাহ। একগামী পরিবার বলে কিছু ছিল না। অর্থাৎ একটি লোকের একটি স্ত্রী এমন কোন পারিবারিক ব্যবস্থা ছিল না। একদল লোক একদল নারী বিবাহ করত। ফলে কোন নির্দ্দিষ্ট নারীর নির্দিষ্ট স্বামী ছিল না। সন্তানের নির্দিষ্ট পিতা ছিল না। কিন্তু মাতা নির্দিষ্ট থাকায় গৃহস্থালীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল মায়ের কর্তৃত্ব। শিশু পরিচিত হত মায়ের পরিচয়েই। নারী শোষণ, পীড়ন ও মর্য্যাদাহানিকর কোন কিছু তখন ছিল না।

এরপর দাস সমাজব্যবস্থায় নারী পুরুষের সম্পর্কের চিত্রটি পাল্টে যায়। উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের জন্যই এই পরিবর্তন। নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয় এই পরিবর্তন। এই স্তরেই সুরু হয় পুরুষের প্রাধান্য। এই স্তরেই মাতৃধারার পরিবর্তে এল পিতৃধারা। সন্তান সন্ততিরা পিতার পরিচয়েই পরিচিত হতে লাগল এবং পেতে লাগল পিতার গোত্র। এই স্তরে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উদ্ভব ঘটে। ফলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণে নিজ পুত্র সম্পর্কে সুনিশ্চিত হবার প্রয়োজনে নারীর ক্ষেত্রে প্রবর্তন করা হল একগামীতা। কিন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে একগামীতা বলবৎ করা হয়নি। তাদের যৌনজীবনের স্বেচ্ছাচারে বাধানিষেধ ছিল না। নারীর মর্য্যাদাহানিকর অবস্থান সমাজ-জীবনের এই স্তর থেকেই সুরু।

সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী অধীনতা আরও সম্প্রসারিত হয়। এই স্তরে বিবাহ-বন্ধন আরও শক্ত হয়। তবে বিবাহ-বন্ধন ভাঙতে পারত কেবলমাত্র স্বামী। এ সমাজ-ব্যবস্থায় কেবল নারীদের জন্যই ছিল এক-গামীতা। তার অর্থ স্ত্রীর একটি নির্দিষ্ট স্বামী থাকবে। পুরুষের ক্ষেত্রে বহুপত্নী থাকতে পারত। উপরন্তু পুরুষের ক্ষেত্রে বাধা ছিল না অন্য নারী ভোগ করবার। কঠোর সতীত্ব বজায় রাখতে হত নারীদের বেলায়। এই ব্যবস্থায় একগামী পরিবারের লক্ষ্য পুরুষের আধিপত্য, উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রের পিতার সম্পত্তি লাভ, নারীর সতীত্ব এবং গণিকাবৃত্তির প্রচলন অবারিত।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাব পববর্তী স্তব শুবু হল পুঁজিতান্ত্রিক স্তব। এখানে বিজ্ঞানেব নতুন নতুন আবিষ্কাবেব ফলে নতুন অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠে। শিল্পাশ্রিত সমাজই-এব বৈশিষ্ট। কিন্তু সমাজেব পবিবাব প্রথাব দিক হতেও এই সমাজ-ব্যবস্থাব বৈশিষ্ট লক্ষণীয। এখানেও বিবাহ প্রথায় স্বীকৃত হয পুবুষেব আধিপত্য। একগামীতা ও গণিকাবৃত্তির প্রচলন পাশাপাশি দেখা যায। অবশ্য এখানেও একগামীতা কেবল নাবীদেব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। পুবুষেব ব্যাভিচাবী হওযা নিযম বিবুদ্ধ হল না। পুত্র কন্যা পবিচিত হতে লাগল পিতাব পবিচযেই। উত্তবাধিকাব সূত্রে পুত্রই পাবে পিতাব সম্পত্তি। অবশ্য কালক্রমে এব কিছু বদবদল ঘটেছে কোথাও কোথাও, কিন্তু নারীব স্থান পুবুষেব সমান নয। এই স্তবেও দেখা যায নাবীব উপব পুবুষেব আধিপত্যেব প্রতিষ্ঠা।

এবপব সমাজতান্ত্রিক স্তব। এই স্তবে পুবুষ ও নাবী উভযেই যেহেতু উৎপাদন কার্যে অংশগ্রহণ কবে এবং গৃহস্থালীকেও কর্মসূচীব অন্তর্ভুক্ত কবা হয, সেইহেতু পবিবাবেব বাবস্থাপনায স্বীকৃত হয পুবুষ ও নাবীব সমান অধিকাব। এখানে একগামীতা পুবুষ ও নারী উভযেব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এবং গণিকাবৃত্তি অচল। এবই উন্নত বৃপ সাম্যবাদী ব্যবস্থা। তবে সমাজতান্ত্রিক সমাজেব সুবু বেশীদিন হযনি। একে মুখোমুখি হতে হযেছে অনেক চ্যালেঞ্জেব এবং বহু পবীক্ষা-নিবীক্ষা চলেছে। ফলে এ সম্পর্কে সুনিশ্চিত চিত্র অপেক্ষমান। সুতবাং দাস সমাজ থেকে পুঁজিপতি সমাজ অবধি নাবীব যে অবস্থান তাবই প্রেক্ষাপটে আলোচনা কবা সঙ্গত।

পুঁজিতান্ত্রিক স্তবে নাবীব বন্ধন দশা কিছুটা শিথিল হলেও নাবীব সমাজ জীবন অমর্যাদায ও হীনমন্যতায ভবপুব। কোথাও কোথাও উদাবনৈতিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদী আবহাওযায নাবীমুক্তি আন্দোলন সুবু হয। আবার বাস্তব কাবণেও বাজনীতি ও প্রশাসনে নাবীব অংশগ্রহণ ঘটে! ফলশ্রুতি হিসাবে নাবীদেব কার্যাধিকাব অনেক দেশে স্বীকৃত হয। তবে মৌল সমাজ জীবনে নাবীব মর্যাদাহীন অবস্থা বযেই গেছে। আপাত দৃষ্টিতে উচ্চশিক্ষায শিক্ষিত, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীব গর্বে গবীযান নাবীদেব যদি কেউ মনে কবেন নাবী জীবনেব সব অপমানেব অবসান ঘটেছে অপেক্ষাকৃত প্রগতিশীল পুঁজিতান্ত্রিক সমাজে, তবে তাবা ভুল কবেন। বার্নাড শ তাঁব Mrs Waren's Profession নাটকে স্পষ্ট তুলে ধবেছেন সেটা। মিসেস ওযারেনেব কন্যা ভিবার অক্সফোর্ডে শিক্ষা ও ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠা সম্ভব হত না যদি না তার

মা অর্থ উপার্জন করতেন স্খলিত জীবনের বিনিময়ে। পুঁজিবাদী সমাজে নারীদের সত্যিকারের স্বাধীন সত্তা আছে কিনা সে ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন অনেকে। শ যেমন বলেছেন এ সমাজে বিবাহ আইনসিদ্ধ বেশ্যাবৃত্তি। প্রচুর বিত্ত ও ভোগের মধ্যে থাকলেও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাবে পুঁজিবাদী সমাজে নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার খুব মূল্য নেই পুরুষের কাছে। বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "Marriage and Morals'এ বলেছেন—Married Women and Prostitutes alike make their living by means of their Sexual Charms, and do not therefore only yield when their own instinct prompts them to do so."

সুতরাং দাস সমাজ থেকে সুরু করে পুঁজিবাদী সমাজে নারীদের মর্য্যাদা ও স্বাধীনতা যে ক্ষুন্ন হয়েছে তা অবশ্যই স্বীকার্য্য। তবে সাহিত্য জগতে দৃকপাত করলে দেখা যাবে যে বরণীয় সাহিত্যিকেরা তাদের সুগভীর অন্তদৃষ্টির দ্বারা নারী জীবনের সহজাত অন্তর্নিহিত মর্য্যাদাবোধকে নিপুণ ভাবে তুলে ধরেছেন তাদের সাহিত্য সৃষ্টিতে। সে সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমেই উল্লেখ করা যায় সাহিত্য জগতের মহীরূহ টলষ্টয়ের 'Resurrection' উপন্যাসটি যেখানে সুন্দর ভাবে তিনি নারী মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠা করেছেন। রাশিয়ার সামন্ততান্ত্রিক সমাজে বর্ষয়সী জমিদারণী দুই বোনের বাড়ীতে গোশালায় কাজ করত এক বিধবা। ঐ বিধবার অবিবাহিত মেয়ের গর্ভজাত একটি কন্যা-সন্তান তিন বছর বয়সে মাতৃহারা হলে ঐ জমিদারণীদ্বয়ের কাছে থেকে যায়। মেয়েটি ওখানে সুখে স্বচ্ছন্দে ও আরামের মধ্য দিয়ে বড হয়ে ওঠে। কিন্তু যখন সে ষোড়শী তখন নেখলিউদৎ নামে ঐ দুই বৃদ্ধ জমিদারণীদ্বয়ের ভাইপো এলো পিসীদের বাড়ী বেড়াতে। ভাইপোটি ধনী প্রিন্স এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। ওখানেই ঐ প্রিন্স এবং ষোল বছরের কাতিউশার মধ্যে প্রথম দর্শনে ঘটে নিষ্পাপ প্রেমের উৎপত্তি। এর বেশী নয়। কিন্তু দু'বছর বাদে ঐ ভাইপো আবার এলো পিসীদের বাড়ী। নিজের রেজিমেন্টে যোগ দেবার আগে ওখানে সে চারদিন থাকে। কিন্তু যাবার আগে রাত্রে সে ভুলিয়ে ভালিয়ে কাতিউশার কুমারীত্ব অপহরণ করে। ক'মাস পরে কাতিউশা বুঝতে পারে সে সন্তানবতী। ফলে জমিদারণীদ্বয়ের আশ্রয় তার ঘুচল। এরপর দশ বছর নানা বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে তার স্থান হল গনিকালয়ে। সেখানে অন্যায় ভাবে এক খুনে মামলায় জড়িত হয়ে

বিচার ব্যবস্থার নানা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তার নির্বাসন হয় সাইবেরিয়ায়। ঐ মামলার বিচারের সময় ঐ ধনী প্রিন্স জুরীদের একজন ছিলেন। আদালতে সে দেখা পেল আসামীরূপে কাতিউশাকে—তখন তার নাম মাসালভা। নিজের অপকর্মের ফলে কাতিউশার এই দুর্দশা সেটা বুঝতে পেরে সুরু হয় তার বিবেক দংশন। নানাভাবে সে চেষ্টা চালাতে থাকে মাসালভাকে উদ্ধার করবার। এই সময় সুরু হয় তার জীবনের পরিবর্তন। অতীত জীবনের নানারকম অপকর্মের থেকে বেরিয়ে এলে নিজেকে প্রায়শ্চিত্ত করে আত্মশুদ্ধির ভিতর দিয়ে সুরু হয় তার পুনরুজ্জীবনের যাত্রা। ফলে সে মাসালভাকে বিয়ে করে তার করুণ জীবনের পরিসমাপ্ত ঘটাতে চায়। মাসালভা তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানকরে। সে ভুলতে পারিনি তার অতীত জীবনের ভালবাসার অপমান। বিয়ের প্রস্তাবের মধ্যে সে ভালবাসার চেয়ে করুণার আভাস পায়। করুণা সে চায় না। সুতরাং সে বেছে নিল আত্ম-নির্ভরতা ও আত্ম-সম্মানের আশ্রয়। সাইবেরিয়ার আর এক নির্বাসিতের সেবায় সে থাকতে চাইল। এই চরিত্র চিত্রণে টলষ্টয় নারীর আত্মমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করেন।

আবার নারীর স্বাধীনতার স্বীকৃতি দেখা যায় আর এক স্বনামধন্য রুশ সাহিত্যিক ইভান বুনিনের সেই প্রসিদ্ধ 'Love for a night' (একটি রাত্রির ভালবাসা) গল্পে। গল্পটি ছোট। ভল্গার উপর দিয়ে চলেছে একটি স্টীমার, ডেকে এসে দাঁড়ায় একটি মেয়ে ও একটি পুরুষ। পুরুষটি লেফটেনান্ট। ঐ ডেকেই তারা পরস্পরকে প্রথম দেখে। মনোরম পরিবেশের মধ্য দিয়ে স্টীমারটি যখন চলছিল তখন ঐ নারী ও পুরুষটি কেমন যেন পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ষ্টীমারটি জেটিতে লাগাবার আগে লেফটেনান্ট মেয়েটিকে ওখানে নামতে অনুরোধ করলে মেয়েটি রাজী হয়। ওরা ষ্টীমার থেকে নেমে রাত কাটায় হোটেলের একটি ঘরে। ওরা সারা রাত ধরে উপভোগ করে। পুরুষটি এই আকস্মিক অপ্রত্যাশিত ভালবাসায় আপ্লুত। এই ভালবাসাকে সে জীবনভোর ধরে রাখতে চায়। রাতে বার বার মেয়েটির নাম জানতে চায়। মেয়েটি কিছু না বলে এড়িয়ে যায়। পরের দিন মেয়েটি সেই ষ্টীমারে করে চলে যায় তার গন্তব্য স্থলে। যাবার আগে সে পুরুষটিকে বলে যায় তাকে যেন বহুবল্লভা নারী তিনি মনে না করেন, কেননা গতরাতে যা ঘটেছে তা তার জীবনে কোনদিন ঘটেনি, ঘটবেও না আর কখনো। এটা একটা বুদ্ধি-হীনতার ব্যাপার। লেফটেনান্ট যেন এটাকে সারা জীবনের সম্বল মনে না করেন। তার স্বামী আছে ও তিন বছরের একটি মেয়ে আছে। সেই

সুখেব সংসাবে সে যাচ্ছে। এটাকে একটা ক্ষণস্থাযী সর্দি'গর্মি'ব গোছেব কিছু হযেছে মনে কবতে হবে।

এই গল্পেব মাধ্যমে ইভান বুনিন চিবাচবিত নাবীব ক্ষেত্রে শুধু যে একগামীত প্রবর্তিত তাব বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিযেছেন, একগামীতা লঙ্ঘন কবে পুরুষ যদি তাব সংসাব ঠিক বাখতে পাবে তবে নাবীব কেন সে স্বাধীনতা থাকবে না ? এতে মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হওযাব প্রশ্ন নেই।

নাবীব মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠায যুগান্তকাবী নাট্যকাব ইবসেনেব অবিস্মবণীয নাটক 'A Doll's House' (একটি পুতুলেব সংসাব)-এব বক্তব্য অভূতপূর্ব। নাটকটিতে প্রথমে দেখা যায নাযিকা নোবাব প্রতি যেন তাব স্বামীব অফুবন্ত ভালবাসা। স্বামী হেলমাব প্রথমে যখন আইনজ্ঞ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে তখন আক্রান্ত হয কঠিন বোগে। কিন্তু ভাল চিকিৎসা কববার মত সম্বল তাব ছিল না। নোবা স্বামীকে সুস্থ কবে তোলাব জন্য ক্রুগষ্টার্ড নামে এক ব্যক্তিব কাছ থেকে নিজেব বাবাব নামে অর্থ ঋণ কবে। বাবাব হঠাৎ মৃত্যু হওযায এ বিষযে কিছু আইনগত ত্রুটি থেকে যায়। কিন্তু স্বামীব প্রতি গভীব ভালবাসা ও অনুবাগ থাকায ও দিকটা নজবে আসে না নোবাব। স্বামী সুস্থ হযে পববর্তীকালে সুপ্রতিষ্ঠিত হয একটি ব্যাঙ্কেব ম্যানেজাব পদে। তাবপব ঘটনাব ঘাত-প্রতিঘাতে দেখা যায অর্থনৈতিক অনটনের ফলে ঐ ব্যাঙ্কে কাজ কবত ক্রুগষ্টার্ড। কিন্তু নোবাব এক পবিচিত বিধবা মহিলাকে ব্যাঙ্কে কাজ নেবাব জন্য সিদ্ধান্ত নেওযা হয ক্রুগষ্টার্ডকে ববখাস্তেব, কিন্তু যে ব্যাপাবটা চাপা ছিল তা ব্যবহাব কবে ক্রুগষ্টার্ড প্রতিশোধ হিসাবে। ঐ ঋণেব ব্যাপাবে ত্রুটি ছিল তা উল্লেখ কবে নোবাব বিরুদ্ধে জালিয়াতিব অভিযোগ এনে আদালতে বিচাব চাইবে বলে সে নোবাকে জানায একটা চিঠিতে। চিঠিটা হেলমাবেব হাতে পড়ে। আব তখনই প্রকাশ পায তাব বিসদৃশ আচবণ। স্ত্রীব একনিষ্ঠ ভালবাসাকে অবজ্ঞা কবে নোবাকে জানিযে দেয জালিযাতি, দুর্নীতি-পবাযণ নাবীকে সে দিতে পাবে না স্ত্রীব মর্য্যাদা। এমনকি ছেলে মেযেকে অমন মাব কাছে ঘেষতে দেবে না। তবে নিজেব সামাজিক মর্য্যাদা অক্ষুণ রাখতে তাব গৃহে স্থান হতে পাবে নোবাব। এদিকে সেই পবিচিত মহিলা মিসেস্ লিন্ডা নোবাকে যথেষ্ট ভালবেসে বলে হস্তক্ষেপ কবেন এ ব্যাপাবে। ঐ মহিলা ও ক্রুগষ্টার্ডেব মধ্যে অনুবাগেব সম্পর্ক ছিল প্রাক্ বিবাহ জীবনে। তিনি প্রচাব ঘটিযে ক্রুষ্টগার্ড কর্তৃক আব একটি চিঠি পাঠিযে সব দাবী তুলে নেবাব উল্লেখ কবে পাঠিযে দেবাব ব্যবস্থা কবেন সঙ্গে দলিলটি পর্য্যন্ত। এই চিঠিটা

পাওয়া মাত্র কিন্তু প্যাল্টে যায় হেলমারের চেহারা। তখন স্ত্রীকে নিয়ে আবার পুরানোদিনের মধুর জীবনযাপনের অভিপ্রায় জানায়। এও বলে যে এই ব্যাপারটাকে যেন ভাবা হয় একটা দুঃস্বপ্ন মাত্র। নোরা কিন্তু বুঝে ফেলে স্বামীর সংসারে তার অবস্থানটি নিছক একটি পুতুলের ছাড়া কিছুই নয়। স্বামীর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সে বলে এখানে ছিল সে কেবলমাত্র চিত্ত-বিনোদনের সামগ্রী হয়ে। স্বামী তাকে প্রকৃত ভালবাসেনি। বিয়ের আগে বাবার সংসারে সে যেমন ছিল একটি পুতুল মাত্র তেমনি বিয়ের পরে স্বামীর ঘরেও সে পরিণত হয় একটি পুতুলে। এই পুতুলের সংসারে সে আর থাকবে না। সে নিজের পায়ে দাড়াবে। স্বামীর কোন সাহায্যও সে গ্রহণ করবে না। নিজের মর্য্যাদা ও সম্মানের সাথে আট বছরের বিবাহিত জীবনে ছেদ টেনে স্বামী ও সন্তানদের ছেড়ে গভীর অন্ধকার রাতে গৃহত্যাগ করে কোথায় যেন চলে গেল নোরা। সেক্সপীরিয় নাটকের মতো নোরার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কিন্তু এই বিয়োগান্ত নাটকের সমাপ্তি ঘটেনি। পাঠকের মনে এরূপ সমাপ্তিতে কম সৃষ্টি হয় নি ঘনীভূত বেদনা। এই নাটকে ইবসেন নারীর মর্য্যাদাবোধকে চিরস্থায়ী করে তুলেছেন।

বার্নাড শ'এর Pilgrim নাটকটি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। তিনি কেবল মাত্র নারী মুক্তি আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন না। তিনি তার সাহিত্য সৃষ্টিতে নারীর মর্য্যাদার দিকটি তুলে ধরেছেন সব সময়। উক্ত নাটকটিতে দেখা যায় অধ্যাপক হিসংস পরিবেশ ও সামাজিক সুযোগ সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতেই মানুষের শিক্ষাদীক্ষা রুচি প্রভৃতির হেরফের ঘটে এটা প্রতিপন্ন করবার জন্য রাস্তার একটি কিশোরী ফুলওয়ালীকে বাড়ী এনে তাকে গড়ে তুলতে লাগলেন শিক্ষা-দীক্ষা রুচির আদব কায়দায়। ক্রমে সেই কিশোরী যখন সব কিছু আয়ত্ত করে একটি বিদুষী নারীতে পরিণত হল তখন অধ্যাপক তার প্রতি আকৃষ্ট হন। তখন বিবাহ করবার ব্যাপারে এক বন্ধুকে দিয়ে নারীটির কাছে প্রস্তাব করেন বন্ধুটি কিন্তু ঐ ফুলওয়ালীর সঙ্গে যাতায়াতে মর্য্যাদাসহ আচরণ করত বলে তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করত মেয়েটি। এই প্রস্তাব তুলতেই কিন্তু মেয়েটি জানায় অধ্যাপক বরাবর তার সঙ্গে ফুলওয়ালীর মতই আচরণ করেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন। বন্ধুটিকে সে কিন্তু জানায় যে তিনিই বরং তার সঙ্গে মহিলার মতই আচরণ করে ও এবং ভবিষ্যতেও সর্বদা করবেন। সুতরাং মর্য্যাদার প্রশ্নে অধ্যাপককে প্রত্যাখ্যান এবং বন্ধুটিকে আমন্ত্রণ নারী মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই এর এই প্রয়াস।

'The Good Earth পার্ল বাকেব বিখ্যাত উপন্যাস। লেখিকা এই উপন্যাসে প্রধানত সমাজতান্ত্রিক চীন সমাজের কৃষকদেব দুঃখ-দুর্দশাময় জীবনের বর্ণনা কবেছেন। প্রাকৃতিক বিপর্যয এবং সামন্ত-প্রভুদেব নানাবিধ অত্যাচাবে জর্জ্জবিত ঐ সমাজেব অনেক কৃষক কিন্তু জমিব এবং জমি থেকে ফসল উৎপন্ন করবাব উন্মাদনাব মধ্যে থাকত। এবকম কৃষক ওযাংলঙ এবং তাব স্ত্রী ওলান। জীবনযুদ্ধে সব সময পাশাপাশি থেকে ফসল উৎপাদনে যেমন তাবা আনন্দিত হয়েছে তেমনি তৃপ্ত হযেছে সন্তান-সন্ততি সৃষ্টিতে। ঘটনাব পবম্পবায ওযাংলঙ ধনী কৃষক হযে ওঠে। এ ব্যাপাবে তাব স্ত্রীর অবদান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ক্রমে সেই সমাজেব কু-অভ্যাসে আকৃষ্ট হযে পড়ে ওয়াংলাঙ এবং একটি বহুবল্লভা নাবীব সঙ্গে জডিযে পডে তাকে রক্ষিতা হিসাবে নিজেব বাডীতে এনে আলাদাভাবে বাখে। একদিন ঐ বক্ষিতাটিব সুখ-সুবিধাব দিকে নজব দেবার জন্য বলে ওলানকে। যে ওলান সর্বদা দুঃখ কষ্টেব মধ্যে সংসাবে নীববে সুখেব জন্য কাজ কবে গেছে সেদিন সে কিন্তু স্বামীব মুখের উপর বলেছিল যে এ বাডীতে সে অন্তত ক্রীতদাসীর ক্রীতদাসী নয়। সত্যিই ত এই সংসাবে সে কর্ত্রী। বিনম্র শিক্ষ-দীক্ষাহীন নাবীব সুপ্ত মর্যাদাবোধ সেদিন ব্যক্ত হযেছিল। পার্ল বাকেব এই অবদান অতুলনীয।

বিদেশী সাহিত্যেব মত আমাদেব বাংলা সাহিত্যেও এব যথেষ্ট নজির আছে। কযেকজন সাহিত্যিকদেব অবদান এ ব্যাপাবে উল্লেখ কবা যেতে পাবে। প্রথমেই মনে পডে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমেব প্রয়াস। বঙ্কিমচন্দ্র অনেকের কাছে কেবলমাত্র রক্ষনশীল হিসাবেই বিবেচিত হন। কিন্তু নাবীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠায তাব অবদান অনেক প্রগতিশীলদেব হাব মানায। বঙ্কিমেব যুগে বঙ্গীয সমাজ ছিল সামন্ততান্ত্রিক কুসংস্কাবাচ্ছন্ন সমাজ। সেই পুরুষ প্রধান সমাজে নাবীদেব মর্যাদাহীন জীবন যাপন কবতে হ'ত, কিন্তু বঙ্কিম তাব বচনার কযেকটি নাবী চবিত্র সৃষ্টি কবে নাবীব মৌল মর্য্যাদাবোধকে প্রতিষ্ঠা কবে গেছেন। তাঁব বিষবৃক্ষ উপন্যাসে সূর্যমুখীব স্বামীব গৃহত্যাগ ঘটনায ধ্বনিত হয়েছে বহুবিবাহে নাবীব মর্য্যাদা হীনতার প্রতিবাদ। কুন্দনন্দিনী বিধবা বলেই যে তাব সঙ্গে নগেন্দ্রনাথেব বিবাহে সূর্যমুখীর যে অপরাধ তা কিন্তু নয। সে কুমাবী হলেই এই বিবাহে প্রথমা পত্নীকে যে অপমান কবা হয তাব প্রতিবাদে স্বামীব গৃহত্যাগ। আবাব আইনসিদ্ধ হলেও বিধবাকে ভালবেসে সব সময বিযে কবা হয না। সেটা নারীব পক্ষে মর্য্যাদা

হানিকর। কুন্দনন্দিনী বুঝেছিল নগেন্দ্রনাথের তার প্রতি আকর্ষণ ভালবাসার আকর্ষণ নয় বরং রূপ মোহ মাত্র। তাই মর্য্যাদা বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থেকে আর তাকে সঙ্গদান করতে চায় নি।

পুরুষ প্রধান সমাজে নারীর ন্যূনতম যুক্তিযুক্ত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপে যে মর্য্যাদা ক্ষুন্ন হয় কোন আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন নারী যে সেটা বরদাস্ত করতে রাজী নয় বঙ্কিম কপাল কুন্ডলা গ্রন্থে স্পষ্ট দেখিয়েছেন। ননদের হিতার্থে গভীর রাতে বনের মধ্যে কিছু শিকড় পাতা আনবার স্বাধীনতায় স্বামীর হস্তক্ষেপকে তার প্রতি অবিশ্বাস বলে মনে হওয়ায় কপালকুন্ডলা স্পষ্ট বলেছিল যদিস্ত্রীলোকের বিবাহদাসত্ব বলে সে জানত তাহলে বিবাহ সে করত না। স্বামীর অবিশ্বাস, সন্দেহ ও সংশয় প্রসূত নীচতা ও সঙ্কীর্ণ মনের জন্য তার গৃহত্যাগ করে কপালকুন্ডলা ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এ এক অপূর্ব প্রচেষ্টা।

কৃষ্ণকান্তের উপন্যাসে ভ্রমরের চরিত্র অঙ্কনে বঙ্কিম নারীর মর্য্যাদা ও আত্মসম্মান স্থাপনে যে নিদর্শন স্থাপন করেছেন তা এ যুগের অনেক প্রগতি-শীল মহিলাকে হার মানায়। ভ্রমরের গভীর ভালবাসা ও অফুরন্ত ভক্তি থাকা বত্বেও স্বামী গোবিন্দলাল যখন রোহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয় তখন কিন্তু সে স্ত্রীর বিশ্বাস যোগ্যতা হারায়। এত বড অবমাননা সেকালের গৃহ বধূ ভ্রমর সহ্য করে নি। সে বিদ্রোহী হয়ে স্বামী বিচ্ছেদ ঘটায়। তখনকার-দিনে পাপ না হলেও মর্য্যাদার প্রশ্নে তা বাস্তবায়িত হয়।

এরপর উল্লেখ্য রবীন্দ্র সাহিত্য। রবীন্দ্র সাহিত্য কেবল সুকুমার গীতি-মাধুর্য্য, ভাব কল্পনার লীলা, প্রেম, পূজা ও প্রকৃতির অভিনব অভিব্যক্তিই নয়, এ সাহিত্য উপেক্ষা করেনি বাস্তব জীবনকে। আমাদের সমাজে নারীর অবহেলিত বন্ধন দশার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও মুক্তির প্রয়াস এ সাহিত্যে প্রতি ফলিত। আর্থিক ও সামাজিক বিবর্তনের ফলে নারীর মূল্য বর্তমান যুগের আবিষ্কার। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতে পাশ্চাত্য দেশে এর সূরু হলেও বিবর্তনের স্রোতধারা আমাদের সমাজ জীবনকেও নাড়া দেয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে ঘটেছে তার প্রতিফলন। কবির চিত্রাঙ্গদা নাটকটিতে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে সে কারণে বলা হয়েছে স্ত্রী কেবল স্বামীর মনমুগ্ধকর জীব নয়, চিত্ত বিনোদনের সামগ্রী নয়, নয় স্বামীর চরণাশ্রিত। অকারণে দেখি স্ত্রী হিসাবে চিত্রাঙ্গদা স্বামী অর্জুনকে বলছে যদি সঙ্কটের পথে তুমি পাশে রাখ, যদি তোমার দুরুহ চিন্তায় আমায় অংশ দাও, তোমার কঠিন ব্রতের সহায় হতে

যদি অনুমতি কব এবং যদি সুখে দুঃখে আমায সহচবী কর তবে পাবে আমাব পবিচয, আধুনিক নারীব এব বেশী আব কি বলবাব আছে ? আমাদেব বদ্ধ সমাজেব জীর্ণ সংস্কাবের বিরুদ্ধে 'বলাকা' কবিতায যা ধ্বনিত ববীন্দ্রনাথেব ছোটগল্পেও তা ধবা পড়ে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবোধেব আভাস 'হৈমন্তী' গল্পে পাওয়া যায। কিন্তু এব জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা দেখতে পাই 'স্ত্রীব পত্র' গল্পে। পনেবো বছব বিবাহিত জীবনে মেজ বৌ মৃণাল তাব শ্বশুর বাডীব গতানু-গতিক বক্ষণশীল চালচলনে ঠিক খাপ খাওযাতে পাবছিল না। কিন্তু বড় জাব মা মবা বোনেব এ বাড়ীতে আসাব পব যে অনাদব ও অবিচার তাব প্রতি কবা হয এবং শেষ পর্যন্ত তাব মৃত্যু ঘটে তখন মৃণাল বিদ্রোহ ঘোষণা কবল। পুবী থেকে চিঠিতে জানাল যে সে আব ও বাড়ীতে ফিববে না। নাবীব মর্য্যাদাবোধও স্বাতন্ত্র বক্ষাব জন্যই এই সিদ্ধান্ত। 'স্ত্রীব পত্র' গল্পে নাবীব যে মহিমা ঘোষিত হযেছে তাবই প্রতিধ্বনি কবিব কবিতাযও লক্ষ্য কবা যায। এ ব্যাপাবে বিশেষ করে উল্লেখ কবা যায 'পলাতকা'-ব 'মুক্তি' কবিতাটি।

নাবীকে নিযে বোমান্টিক প্রেম ও শ্রদ্ধাব ছডাছডি আমাদের সাহিত্যে যথেষ্ট লক্ষ্য কবা যায। কিন্তু এব অন্তবালে যে বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা আত্মগোপন কবে আছে, 'স্ত্রী পত্র' 'গল্প ও মুক্তি' কবিতা আমাদেব সেই সামাজিক প্রথাকে গোপনীযতা থেকে টেনে বেব কবেছে।

তথাকথিত 'বাবু' কালচাবেব সমাজে নাবীব সম্মান ও মর্য্যাদা কিভাবে অবহেলিত হ'ত ববীন্দ্রনাথ সেটা দেখিয়েছেন তাঁব 'মানভঞ্জন' গল্পে। ধনী পুত্র গোপীনাথ প্রথমে সুন্দবী স্ত্রী গিবিবালাব প্রতি আকৃষ্ট হলেও পববর্তী-কালে লম্পটে পবিণত হয। থিযেটাবেব এক অভিনেত্রী লবঙ্গেব প্রতি আকৃষ্ট হযে স্ত্রীকে উপেক্ষা ও অপমান কবে। এই অপমান ও অনাদরে গিরিবালা কিন্তু মৃত্যুববণ কবেনি। স্বামীব গৃহত্যাগ কবে নিজে সফল অভিনেত্রী হযে একদিন অভিনযেব সময সম্মুখবর্তী গোপীনাথেব প্রতি চকিত বিদ্যুতের ন্যায অবজ্ঞাপূর্ণ তীক্ষ্ন কটাক্ষ নিক্ষেপ কবে তাব প্রতিশোধ নেয। মর্য্যাদা-বোধ হতেই এই বিদ্রোহ। ববীন্দ্রনাথ তাঁব গল্পে ও উপন্যাসে বিভিন্ন নাবী চরিত্রকে স্বাতন্ত্রবোধে চিত্রিত কবেছেন। 'শেষ কথা'-ব অচিবা, 'বিকাব'-এব বিদ্যা, 'শেষেব কবিতা'ব লাবণ্য ও 'গোবা'ব সুচরিতা এবা সকলেই কিন্তু স্বাতন্ত্রবোধে উদ্দীপ্ত। 'যোগাযোগ'-এ কুমুদ প্রতিকূল অবস্থাব মধ্যে কিন্তু যতটা সম্ভব স্বাতন্ত্রবোধকে রক্ষাব চেষ্টা কবেছে।

নারীব প্রতি শরৎচন্দ্রের সশ্রদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী, সহৃদয় অনুবাগ, সচেতন

সমবেদনা ও সুগভীর ভালবাসা তার সাহিত্য সৃষ্টিতে দ্বিধাহীনভাবে প্রকাশ করেছে নারীর অন্তর্নিহিত মর্য্যাদাবোধকে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কয়েকটি চরিত্র এ ব্যাপারে উল্লেখ্য। প্রথমেই মনে পড়ে তার 'বামুনের মেয়ে' উপন্যাসটি। এই উপন্যাসে তুলে ধরা হয়েছে প্রিয় ডাক্তারের (মুখুজ্জে) মেয়ে সন্ধ্যার চরিত্রটি। সরল সাধাসিধা মানুষ প্রিয় ডাক্তার বড় কুলীন বলেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কুলীন প্রথার শিকার ছিলেন প্রিয় ডাক্তার। বহু পত্নীর অধিকারী বয়স্ক কুলীন ব্রাহ্মণ মুকুন্দ মুখুজ্জের পুত্র বলেই পরিচিত ছিলেন প্রিয় ডাক্তার। কিন্তু ঘটনার পরম্পরায় প্রমাণ হয়ে যায় তার মায়ের অজান্তে সে কিন্তু ভূমিষ্ট হয় মুকুন্দ মুখুজ্জের প্রতিনিধি হীরু নাপিতের সঙ্গে সহবাসের ফলে। এই ঘটনা উন্মোচনের বহু পূর্বে প্রিয় ডাক্তারের বিয়ে হয় বড় কুলীন ঘরের মেয়ের সঙ্গে। তাদের কন্যা সন্ধ্যা, এদিকে আবার গ্রামের উদার, উচ্চশিক্ষিত ছেলে অরুণের সঙ্গে সন্ধ্যার একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অরুণ ব্রাহ্মণ হলেও উঁচুদরের নয় এবং সে বিলাত ফেরত বলে কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রাম্য সমাজে সে পতিত। ঘটনার গতি প্রবাহে দেখা যায় সন্ধ্যার এক কুলীনের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়। পাত্রটি কিন্তু নেশাখোর এবং অপদার্থ। বিয়ের আসরেই গ্রামের ধনী লম্পট গোলক চাটুজ্জের চক্রান্ত করে হীরু নাপিতকে সঙ্গে করে এনে প্রিয় ডাক্তারের জন্ম বৃত্তান্ত ফাঁস করে দেয়। বিয়ের পিঁড়ি থেকে বর উঠে যাবার ফলে ভেঙ্গে যায় বিয়ে। সন্ধ্যা উদভ্রান্তের মত অরুণের কাছে ছুটে গিয়ে আবেদন জানায় তাকে উদ্ধারের। হতচকিত অরুণ সময় চায় একটু ভাববার। সন্ধ্যা ফিরে যায়। তারপর তার বাবা যখন চিরতরে গ্রাম ছেড়ে বৃন্দাবনে যাবে বলে বাড়ী থেকে বের হয় তখন সন্ধ্যা বাবার সঙ্গী হয়। এই সময় অরুণ এসে জানায় সে সন্ধ্যাকে গ্রহণ করবে বলে ঠিক করে ফেলেছে। সন্ধ্যা আর রাজী হয় না এবং অরুণকে বলে বিয়ে করা ছাড়া মেয়ে মানুষের আর কিছু করবার আছে কিনা সেইটা জানতেই যাচ্ছে বাবার সঙ্গে। এই প্রত্যাখান নারী মন হতে উৎসারিত মর্য্যাদাবোধ হতেই সম্ভব।

শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাসের অভয়ার চরিত্রটি অবশ্যই উল্লেখ্য। রমণীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য হিন্দু সমাজের কু-সংস্কারাচ্ছন্ন রীতি-নীতির বিরুদ্ধে অভয়ার বিদ্রোহ ঘোষণা আধুনিক অনেক রমনীকে উজ্জীবিত করবে। তার স্বামী বিয়ের কিছু পরেই চাকুরী করতে বর্মায় যায়। কিছুদিন পরে আর যোগাযোগ ছিল না স্ত্রী সঙ্গে। অভয়া তার মা মরে যাবার পর অসহায়

দিশেহাবা হয়ে গ্রামেব বোহিনী দাদাকে নিয়ে স্বামীর খোজে বর্মায যায। জাহাজে শ্রীকান্তেব সঙ্গে ওদেব পবিচয। অভযাব স্বামীটি কিন্তু ওদিকে বর্মায যাবাব পব সে দেশেব একটি রমণীকে বিয়ে কবে ছেলেমেযে সহ সেখানে বাস কবতে থাকে। শ্রীকান্তের সহাযতাব স্বামীটিব খোঁজ মেলে। চাকুবী যাবাব ভযে স্বামী অভযাকে গ্রহণ কবে এবং অভয়াও সতীন নিযে ঘব কবতে বাজী হয। এদিকে বোহিনীব অভযাব প্রতি ছিল অন্তহীন ভালবাসা। তা জেনেও সাডা দেযনি অভযা। কেননা বিবাহিত হিন্দু বমণীব স্বামী বর্ত্তমানে তাঁব ঘবকন্না কবা শ্রেয মনে কবেই সে চলে এসেছে দেশ ছেডে। কিন্তু স্বামীব ঘবে তাব স্থান হল না। হীন, অমানুষ ও বর্বব স্বামীটি বোহিনীব সঙ্গে বর্মায চলে আসাব অভিযোগে নির্মমভাবে বেত্রাঘাত কবে গভীব অন্ধকাব বাতে অভযাকে একাকী বেব কবে দেয ঘব থেকে। নিবুপায হযে সে ফিবে আসে বোহিনীব কাছে এবং দৃঢ সিদ্ধান্ত নেয। সেখানে একদিন শ্রীকান্তব সঙ্গে দেখা হলে সে জানতে চায যে একগাছা বেতেব জোবে স্ত্রীর সমস্ত অধিকাব কেড়ে নিযে স্বামী যখন তাকে অন্ধকার বাতে একাকী ঘরেব বাব কবে দেয তাব পবেও বিবাহেব বৈদিক মন্ত্রেব জোরে স্ত্রীব কর্তব্যেব দাযিত্ব বজায থাকে কিনা। সে আরও বলে বোহিনীর গভীব ভালবাসাকে অস্বীকাব করে তার সমস্ত জীবনটা পঙ্গু করে দিযে আব সে কিনতে চায না সতী নাম। শুধু তাই নয তার ও রোহিনীব এই নিষ্পাপ ভালবাসার সন্তানেরা মানুষ হিসাবে জগতে কাবো চেযে ছোট হবে না। সেই সমযেব প্রেক্ষাপটে অভযাব মত নারী চবিত্র সৃষ্টিব মধ্য দিযে শবৎচন্দ্রেব নারীর স্বাধিকার ও মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠাব প্রযাস বিস্মযে অভিভূত কবে আধুনিক সমাজকে।

শবৎচন্দ্র আবও অনেক ক্ষেত্রে নাবীব সততা ও মর্য্যাদাকে তুলে ধরেছেন। যেমন শ্রীকান্ত উপন্যাসেব তৃতীয়খণ্ডে গঙ্গামাটিতে সুনন্দার চবিত্র সৃষ্টিতে। অপরকে বঞ্চিত কবে ভাশুবের সংসাবেব স্বচ্ছলতা ও প্রাচুর্য যখন জানতে পাবে তখন সেখানকাব অন্নগ্রহণ অস্বীকাব কবে স্বামী পুত্র নিয়ে বাডী ছেডে চলে যায। কু-সংস্কার ছিন্ন গ্রামেব এই তবুণী বধুটি সততা, ধর্ম ও ন্যাযেব মর্য্যাদা বক্ষাকল্পে নিদাবুণ দুঃখ কণ্ট বহন কবতে কুণ্ঠিত হযনি। এই দৃঢচেতা শব্দটি সব মেনে নিযেছে নিজেব সহজাত মর্য্যাদাবোধ হতে। 'নিষ্কৃতি' গল্পেব শৈলব চবিত্রটি এ ব্যাপাবে উল্লেখযোগ্য। এসব চবিত্র ছাড়াও শবৎচন্দ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের 'রাজলক্ষ্মী, 'দেনাপাওনার ষোড়শী প্রভৃতি নারী চরিত্রেব মধ্য দিযে দেখিযেছেন যে দুঃখ দুর্দশা ও নানাবিধ

প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রান্ত করে তারা তাদের মর্য্যাদাবোধকে অক্ষুন্ন রেখেছেন। তাঁর 'শেষ প্রশ্ন' উপন্যাসের কমলের চরিত্রটি এ ব্যাপারে অভূতপূর্ব।

শরৎচন্দ্রের পর বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর, বনফুল, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাহিত্যকেরা এ বিষয়ে পিছিয়ে থাকেননি। বর্তমানে ত যুগের দাবী মেনে নিয়ে আধুনিক সাহিত্যিকেরা এগিয়ে চলেছেন তাঁদের সৃষ্টির কাজে।

———

বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টের কবিতায় অসম ছন্দ-মিল

সমীর দাশগুপ্ত

বের্টোল্ট ব্রেখ্‌টের প্রথম দিকের কবিতায়, বাল্লাদ্‌-এ, সাবেকি মিল ও ছন্দের বিরুদ্ধে কোনো ঘোষণা নেই। বরং চেনা জানা মাত্রাবৃত্ত পঞ্চপদী আয়ামবিক্‌কে আশ্রয় করেই তাঁর প্রাথমিক যাত্রা। যদি বা দু-একটি পদ্যে মিল পরিহার করেছেন, ছন্দ সেখানে আঁটোসাটো। আবার, যেমন 'মৃত সৈনিকের বালাদ'-এ, ছন্দ অবিন্যস্ত কিন্তু মিল ঠিকঠাক। তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় তাই সাবেকি ধরণে গানের সুর বসাতে ব্রেখ্‌টকে কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় নি। কিন্তু পঞ্চপদী আয়াম্‌বিক্‌কে ব্রেখ্‌ট শিগগিরই বর্জন করলেন। এবং এই বর্জন করার ইতিহাস থেকে আমাদের গভীর শিক্ষা নেবার আছে।

ব্রেখ্‌ট তাঁর প্রথম যৌবন থেকেই মানুষের সামাজিক জীবনের অভ্যন্তরীণ নানা অসঙ্গতি লক্ষ করেছেন, কিন্তু তাঁর কাব্য অনুশীলনের প্রাথমিক পর্যায়ে সে-অসঙ্গতির রাজনৈতিক প্রসঙ্গ সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ থেকেছেন। ফলে, প্রধানুগ পদ্যের রূপবন্ধ সম্বন্ধে তাঁর তৃপ্তি-অতৃপ্তিও অনেককাল পর্যন্ত বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করে নি। র‍্যাঁবো-র সংহত গদ্য-কাব্য ব্রেখ্‌টকে উদবেজিত করেছিল, তার প্রমাণ আছে। এবং গদ্য-পদ্যের আত্মীয়তা সম্পর্কিত চৈতন্য ব্রেখ্‌টের মনে এক ধরণের প্রতিবাদও এনে দিয়েছিল,—পঞ্চপদী মাত্রাবৃত্তের 'তৈলাক্ত মসৃণতা'-র বিরুদ্ধে সংহত, উত্তোলিত কোন বাচনভঙ্গীর প্রয়োজন তখনই তিনি অনুভব করেছিলেন। এ-কথাও তিনি বুঝেছিলেন যে ছন্দ-কে হয়তো কোনো-না-কোনো ভাবে পদ্যের শরীরে ধ'রে রাখতে হবে, যদিও সে ছন্দ গতানুগতিক গজ-ফুট-ইঞ্চি মাপা ছন্দ নয়। গতানুগতিক ছন্দ পদ্যের প্রত্যেকটি বাক্যকেও, লাইনকে স্তবককে একটি স্পন্দনে বেঁধে রাখে, নির্বিশেষ একাকার ক'রে দেয়, অথচ ছন্দহীন শরীরও শরীর নয়—পেটেপিঠে সমতল, সমতাল। এই চৈতন্য ব্রেখ্‌টকে যে আঙ্গিকে নিয়ে গেল তার প্রথম চমকপ্রদ প্রকাশ তাঁর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালীন "জর্মন স্যাটায়ার্স"-এ। এই পর্যায়ের কাব্যে আছে এক ধরণের মিলহীন অসম-ছন্দ।

সামাজিক বক্তব্য এবং বিশ্লেষণের এক শক্তিশালী বাহন হিসাবেই ব্রেখট

কবিতাকে দেখেছেন—যে-কারণে প্রায়শই তাঁর কবিতাকে তাঁর নাটকের বাইরে এনে পূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না। তিনি বাচনভঙ্গী এবং বক্তব্যের সম্পর্ক নিয়ে ভাবিতে ছিলেন, ভাষায় প্রযুক্তিকৌশলই তাঁর প্রধান সমস্যা। কী ভাবে বললে, যা বলছি তার অর্থ ও উদ্দেশ্য সরাসরি শ্রোতার মগজে ঢুকবে ব্রেখ্‌টের। পদ্ধতির এটাই মূল ব্যাপার।

ব্রেখ্‌ট বলতেন, যে ব্যক্তি কথা বলছে তার মনের গূঢ় ইঙ্গিত যেন তার সম্পূর্ণ বাক্যের বাচন ও ন্যাসে বিধৃত থাকে। তবেই সেটা কথা বলা। লুথর যে ভাবে কথা বলতেন, ব্রেখ্‌টের ভাষায় তা হচ্ছে অপরের ঠোঁট-মুখ লক্ষ্য ক'রে কথা বলা। বাইবেলের বাক্যবিন্যাসেও এ-রকম প্রত্যক্ষ ইঙ্গিতময়তা লক্ষণীয়।

আর গেষ্টিকেরই গুণে লুক্রেসিয়াস শুধু যে বক্তার মনোভাব স্পষ্ট করতে পারছেন তাই নয়, কথা বলতে বলতে বক্তা যে-ভাবে তাঁর ইঙ্গিতের পরিবর্তন ঘটাচ্ছেন তাও যেন ধরিয়ে দিচ্ছেন।

এখন, মানুষ যে ভাবে সাধারণত কথা বলে তার ছন্দ যেমন স্বাভাবিক, মানবিক, তেমনই লক্ষ্য করা যাবে যে সে-ছন্দ অসম—প্রথানুগ পদ্যাঙ্গিক নয়। একজন উত্তেজিত কিংবা বিপন্ন ব্যক্তি ছুটতে ছুটতে এসে যে কথা বলছে, পঞ্চ-পদী আয়াম্‌বিকে তার কী চেহারা ফুটবে? বক্তার এই যে শারীরিক অস্থি-রতা তার অসম-ছন্দে প্রকাশ পাচ্ছে, আমাদের সামাজিক পরিবেশেও তো প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে তেমনি অনুভূতির অসমঞ্জস প্রকাশ নিহিত। সামাজিক রাজনৈতিক চেতনা যতই ব্যক্তির চারিদিকে ঘিরে ধরছে ততই কি তার বাচন-ভঙ্গী সেভাবে অবিন্যস্ত, দ্বন্দ্বময় অথবা অসম হয়ে যাচ্ছে না? পদ্যের চলার ধরণ তাহলে কী ক'রে অপরিবর্তিত থাকবে? ব্রেখ্‌ট বহুভাবে লক্ষ্য ক'রে দেখেছিলেন তাঁর পরিপার্শ্বে নানা স্তরের লোক নানা পরিস্থিতিতে যে ভাবে স্বাভাবিক বাচনে তাদের ভাব ব্যক্ত করে, কবিরা তার সঙ্গে সম্বন্ধ না রেখেই পদ্য লিখে চলেন। তাঁদের পদ্যের প্রকরণেও আঙ্গিকে তাই প্রয়োজনের ছোঁয়া কোথাও নেই। মিছিলের স্লোগানে, যুদ্ধের কুচকাওয়াজে, পথচারী ফিরি-ওলার ডাকে, সাবেকি নিগ্রো জ্যাহে তাই খুঁজে পাওয়া যায় স্বাভাবিকতার ছন্দ, যা তার প্রয়োজনের উৎস থেকেই অসমতাল—তার ঝোঁক কোথাও বেশি,

কোথাও নগণ্য। এই উপলব্ধি থেকেই ব্রেখ্‌টের অসম ছন্দেব জন্ম। এবং কাব্যের ছন্দকে জীবনেব পবিবর্তমান ছন্দের সঙ্গে অন্বিত করাব প্রস্তাবেই ব্রেখ্‌টের কাব্যবিপ্লব পূর্ণতা পেয়েছে।

অসম ছন্দ-মিলেব প্রয়োজন সম্বন্ধে ব্রেখ্‌ট নিজের একাধিক ছোটবড়ো প্রবন্ধে আলোচনা কবেছেন। এবং সেই প্রসঙ্গেই বুঝিয়ে দিযেছেন তাঁর কবিতা কেমন ভাবে পড়া উচিত। ব্রেখ্‌টের নিজেব কথাতেই ব্যাপাটা ব্যক্ত করা যাক, কাবণ তা থেকে আবও একটি সংশ্লিষ্ট বিষয বোধগম্য হবে। এই বিষয়টি হচ্ছে ব্রেখ্‌টের কবিতা অনুবাদেব সমস্যা। আমার নিজেব করা অনুবাদ সবই ইংবেজি ভাষান্তরের অনুগামী, যে ভাষান্তরে কবিতাগুলির অন্যতর বৈশিষ্ট্য এবং সৌকর্য যদিবা অল্পবিস্তর ধরা পড়েছে, জর্মন কবিব অসম ছন্দ-মিলেব পবিচয় সেখানে পাওয়া প্রায অসম্ভব। তা পেতে হলে ব্রেখ্‌টীয ধবনে মূল জর্মন কবিতা পড়তে হবে—যা একমাত্র জর্মন ভাষায় ব্যুৎপত্তি ছাড়া অকল্পনীয। আমি নিজের সাধ্যমতো ব্রেখ্‌টের নানা পর্যাযেব কবিতা অনুবাদ কবাব চেষ্টা করেছি, যাব কিছু সাম্প্রতিক উদাহরণ এই নিবন্ধেব সঙ্গেও গ্রথিত হল। বলাই বাহুল্য, এই সব অনুবাদে উপবোক্ত ব্রেখ্‌টীয় কাব্য বৈশিষ্ট্যেব প্রতিফলন ঘটানো সম্ভব হয নি। সুতরাং, বিষযটি সম্বন্ধে ব্রেখ্‌ট নিজেই প্রসঙ্গান্তরে যা লিখে বোঝাবাব চেষ্টা করেছেন তা এখানে উল্লেখেব দাবি বাখে বলে মনে কবি। নিচের নিবন্ধটি মূল জর্মন বযান থেকে সবাসবি অনুবাদ (অধ্যাপক দিলীপ ঘোষ-কৃত) বলে সেটাই অবিকৃতভাবে রাখা সমীচীন মনে কবেছি। এখানেও যেটা লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে যে ডযেচ্‌ল্যান্ড কবিতাটিব প্রথম স্তবক সম্বন্ধে ব্রেখ্‌টের সপ্রশংস ব্যাখ্যা ছাড়া তাব কাব্যবস বাংলা অনুবাদে সামান্যই অনুমান কবা সম্ভব। সরাসরি ভাষান্তবেব প্রাথমিক সমস্যাটাই এত মৌলিক এবং অনতিক্রম্য।

আমার মতে কেমন করে কবিতা পড়া উচিত

তোমরা আমাব কবিতা নিযে নাড়াচাড়া করছ। প্রাযই অনেকে আমার কাছে জানতে চায ; তাছাড়া অভিজ্ঞতা থেকেও জানি ছোটবেলার আমরা কত কম উপভোগ কবি পড়াব বই-এব কবিতাগুলোকে , তাই আমি কয়েক ছত্র লিখতে চাই, আমাব মতে কেমন করে কবিতা তৃপ্তির সংগে পড়া যেতে পাবে —এ বিষয়ে।

কবিতা সবসময়ই ক্যানারি পাখির কূজনের মত নয়। ঐ পাখির গান সুন্দর, কিন্তু তার বেশী আর কিছু নয়। ভেতরের সৌন্দর্য্যকে বের করে আনার জন্য কবিতাকে কিন্তু থেমে থেমে পড়তে হয়। উদাহরণ হিসেবে আমি উল্লেখ করছি ইয়োহানেস এ্যার বেশারের 'ডয়েচলাণ্ট' গানটির প্রথম স্তবকটির কথা; ওটা তোমরা নিশ্চয়ই হান্স আইসলারের দেওয়া সুরে গেয়েছো।

স্বদেশ, আমার যন্ত্রণা,
গোধূলিতে ঢাকা,
আকাশ, আমার গাঢতর নীল আকাশ,
তুমিই আমার শান্তি।'

এর মধ্যে কি আছে যা' সুন্দর ?

এই কবি তাঁর স্বদেশকে বলেছেন 'গোধূলিতে ঢাকা'। গোধূলি হল দিন ও রাতের মাঝখানের একটি সময়, অথবা রাত ও দিনের, যখন আলো হারিয়ে যায় অন্ধকারে অথবা অন্ধকার আলোয়। এ হ'ল সেই ধূসর মুহূর্ত যাকে ফরাসীরা 'Enter chien et loup', যার জার্মান হ'ল 'Zwischen Hund und wolf', সেই সময় যখন মানুষ ভালোর থেকে মন্দকে পৃথক করতে পারে না। এইরকম এক গোধূলিকে প্রত্যক্ষ করেছেন কবি তাঁর নিজের দেশে যখন ফ্যাসিজম ও অমানুষিকতার অন্ধকার যায়-যায় এবং সমাজবাদের প্রত্যুষ আসন্ন। এই জন্যই কবির কাছে তাঁর স্বদেশ 'স্বদেশ, আমার যন্ত্রণা' এবং একই সঙ্গে 'তুমিই আমার শান্তি'। আর সবসময় তাঁর চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে আছে তাঁর স্বদেশের সৌন্দর্য্য যার কথা রয়েছে তৃতীয় পংক্তিতে ('আকাশ, আমার গাঢতর নীল আকাশ')। এই সৌন্দর্য্য অনাহত এমনকি নেকড়ের রাজত্বেও।

এই হ'ল কবিতাটির মর্মবাণী। এবং এ সুন্দর কেননা কবির অনুভূতি গভীর ও মহৎ, কেননা কবি তাঁর দেশকে ভালবাসেন—যন্ত্রণায় যখন অশুভের শাসন, এবং সুখে যখন শুভ প্রতিষ্ঠিত।

এবং যথেষ্ঠ সৌন্দর্য রয়েছে কবির বলার ভঙ্গির মধ্যে। 'স্বদেশ, আমার যন্ত্রণা'—কথাটা এর থেকে ভাল করে বলা সম্ভব নয়, যেমন সম্ভব নয় ভালতর করে বলা "তুমিই আমার শান্তি'। এ যেন এমন কোন লোক যে শোকে আক্রান্ত এবং আচ্ছাদিত কালো পোষাকে, সেই লোক যাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে কেন তার যন্ত্রণা এবং সে বলছে উত্তরে 'আমার দেশ এখন ঘাতকদের

কবলে'। আবার একই সঙ্গে, এ হল এক উৎফুল্ল এবং সঙ্গীত মুখব মানুষ, উৎফুল্ল ও সঙ্গীতমুখর কেননা আমাব দেশ গড়া হযেছে শান্তি দিযে। অর্থাৎ, এই মানুষটিব মুখ অন্যান্য মানুষেব মুখেব ওপবে নির্ভরশীল। 'শান্তি' শব্দটি বিশেষভাবে সুন্দব, অতি পরিচিত এই কথা, তবু এতে বযেছে এক নতুনত্বের ছাপ কেননা এমনি কবে এ কথাটাকে আগে কেউ কোনদিন ব্যবহার করেনি। 'আকাশ, আমাব গাঢতব নীল আকাশ' ও সুন্দব, কেননা এ উচ্চারিত এক আশ্চর্য্য নম্রতায। কবির প্রযোজন শুধু 'নীল' কথাটার, (আর সেই ব্যবহৃত হ'ল কথাটি অমনি) উজ্জ্বল হয়ে উঠল আকাশ। এবং ভাবী সুন্দব এই কবিতাটির ছন্দ, তাতে রয়েছে এক বিশাল তৃপ্তির প্রতিভাস। এমন কি না বুঝেও যদি তোমবা এ কবিতাটাকে পড তাহলেও তোমরা বুঝবে আসল কথার মর্ম ; এবং বিশেষভাবে সহজ হয়ে উঠবে সমস্ত ব্যাপাবটা যদি তোমরা এটাকে গেয়ে ওঠ আইস্‌লাবে দেওয়া সুন্দব সুরে।

আশা করছি, খানিকটা চুলচেরা বিচার কবে এ কবিতার কোন রসহানি আমি ঘটাইনি। গোলাপ তাব সম্পূর্ণতায় সুন্দর, তবু তাব প্রতিটি পাপড়িবও সৌন্দর্য আছে। এবং আমি বিশ্বাস করি, যদি ঠিকমত পড়া যায তাহলে কবির সত্যি তৃপ্তিব খোবাক হয়ে উঠতে।

একমাত্র দ্বিতীয় বিষয়টিই

এটা ধ'বে ফেলেছি ঃ শুধু সুখী লোকদেরই
সবাই পছন্দ করে। তাদের কণ্ঠস্বর
কানে ভালো লাগে। তাদের মুখশ্রী আনন্দ জাগায়।

উঠোনের অষ্টাবক্র গাছ
অনুর্বর জমিকে শাপান্ত করে, অথচ
পথ-চল্‌তি লোকেরা গাছকেই ঠাট্টা করে, এবং
যথার্থই।

নৌকোর সবুজ হাল আর ঝিলিমিলি পাল ধ্বনিতে

অদৃশ্য হয়ে যায়। সবকিছুর মধ্যে
আমার চোখে থাকে শুধু ধীবরের জোড়াতালি জাল।
কার কথা আমি লিখবো—
কুঁড়েঘরে রমণীর ঝুলে-পড়া দেহ?
তরুণীর কুচযুগ
উষ্ণ, সে তো চিরকালই ছিলো।

আমার কবিতায় ছন্দ
মনে হয় একটা নিছক অভ্যাস
আমার মনের মধ্যে বোঝাপড়া করছে:
মঞ্জরিত আপেলতরুর খুশি
আর বাড়ির চুনকাম-মিস্ত্রির কথাবার্তার বিভীষিকা।
কিন্তু একমাত্র দ্বিতীয় বিষয়টিই
আমাকে টেনে নিয়ে যায় আমার লেখার টেবিলে।

নির্বাসনের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধীয় চিন্তা

১. দেয়ালে পেরেক ঠুকো না
জামাটা চেয়ারের ওপর ফেলে রাখো
ক'টা দিনের জন্যে আর কেন মাথা ঘামাও?
কাল তুমি ফিরে যাবে।

ছোট্ট চারাটা জল আর নাই পেলো
চারাটা লাগানোই বা কেন?
ওটা একটা সিঁড়ির সমান লম্বা হবার আগেই
তুমি খুশিমনে এ জায়গা ছেড়ে চ'লে যাবে।
পথচারী কেউ সামনে পড়লে চোখের ওপর টুপিটা টেনে নিও।
অজানা ব্যাকরণের পৃষ্ঠা উল্টে কী লাভ?
যে সংবাদ তোমাকে ঘরের দিকে টানছে

অন্তরঙ্গ ভাষাতে সে সংবাদ লেখা।

কড়িবরগা থেকে চটা উঠে আসছে
(বাধা দেবাব চেষ্টাই কোরো না)
জবরদস্তিব দেয়াল যাবে গুঁড়িয়ে
একদিন যা সীমান্তে ছিলো উদ্ধত খাড়া—
ন্যায়ের পথ বোধ ক'রে।

২. দেয়ালের পেবেকটা দ্যাখো, যে পেরেক তুমি গেঁথেছিলে।
তুমি কবে ফিরে যাবে ভাবছো ?
তোমাব হৃদয়ে তুমি কী বিশ্বাস কবো শুনতে চাও ?

দিনেব পর দিন
তুমি মুক্তিব জন্যে খেটে চলেছো
তোমাব ঘবের মধ্যে বসে তুমি লিখে চলেছো
তুমি তোমাব কাজ সম্বন্ধে সত্যিই কী ভাবো জানতে চাও ?
উঠোনের কোণে ঐ ছোট্ট বাদামগাছটার দিকে তাকিযে দ্যাখো
যাব জন্যে তুমি বালতিভবা জল বোজ টেনে নিযে যাও।

তৃতীয় স্তব

গ্রীষ্মের মধ্যদিনে তোমরা পুকুরে ছিপ ফেলে তুলে নাও
আমার কণ্ঠস্বব।
আমাব শিরায তীব্র মদিরা ধাবা, মাংসল দুই হাত।
দিঘির জলে ভিজে ভিজে আমাব চামড়া এখন তামাটে,
বাদাম ডালের মতো মজবুত আমাব শরীর,
বমণীরা জেনে নাও আমি উত্তম শয্যাসঙ্গী।
বক্তিম সূর্যালোকে পাথরেব উপর শুযে
বাজাতে ভালোবাসি গীটাব,

পশুদের অন্ত্র দিয়ে তৈরি সে যন্ত্রের তার,
গীটারটা তাই বেজে ওঠে জন্তুরই মতো, আর
টুক্রো গানের কলিগুলিকে কড়মড়িয়ে চিবোয়।

জুলাইয়ের দিনে আমার সঙ্গে প্রণয় খেলা আকাশের,
তার নাম রেখেছি ছোট্ট ছেলে নীল,
উজ্জ্বল বেগনী রঙের শরীর,
আমার প্রতি আসক্তি তার, সেটা পুরুষ-প্রেম।
অথচ সে বিবর্ণ হয়ে ওঠে যখন আমি সেই
প্রশু-অন্ত্রকে নিষ্পেষণ ক'রে চলি
আর বিস্তীর্ণ ক্ষেতের লাম্পট্যের নকলে মেতে উঠি
এবং রমনরত গাভীদের শীৎকার বেজে ওঠে
আমার গীটারে।

আমার মা-কে

যখন তিনি ফুরিয়ে গেলেন শেষে
আর ওরা তাঁকে কবরে শুইয়ে দিল,
ফুটে-ওঠা ফুলের আর প্রজাপতির ঝাঁকে
গুঞ্জরিত সেই পরিবেশ…
তাঁর দেহ এত ক্ষীণ যে মাটিতে সামান্যই
পড়েছিল চাপ।
ভাবি, কতটা যন্ত্রণা তাঁকে অতটা নির্ভার
করে দিয়েছিল!

দুঃসময়ের প্রণয়গীতি

আমাদের মধ্যে ভাব-ভালোবাসা ছিল সামান্যই,
তবুও অন্য দম্পতিদের মতোই আমরা করেছি রমন,

আর রাত কেটে গেছে পরস্পরের বাহুতে মাথা রেখে,
চাঁদকে মনে হয় নি তোমার চেয়ে অপরিচিত।

আর আজ তোমাকে যদি হঠাৎ দেখি বাজারে,
আর দুজনেই কিনি মাছ, তাতে ঘটে যেতে
পারে কলহ ঃ
আমাদের মধ্যে ছিল না মনের টান
রাতে যখন ঘুমিয়েছি পরস্পরের বাহুতে মাথা রেখে।

হলিউড

রোজগারের ধান্দায় রোজ রোজ
বাজারে যাই—যেখানে মিথ্যার বেসাতি ;
কপাল ঠুকে আমার জায়গাটুকু ক'রে নিই
বিক্রেতাদের দলে।

নূতন কালের বেশে

হঠাৎ করে নূতন যুগের শুরু হয় না
ঠাকুর্দা বেঁচে ছিলেন এ-কালের জগতেই,
আমার নাতি হয়তো টিকে থাকবে
পুরোনো সময়ের জঠরে।

নতুন মাংসের কাবাব খাওয়া হয় পুরোনো কাঁটা দিয়ে।

প্রথম তৈরি মোটরগাড়ি নয়,
আদ্যিকালের ট্যাঙ্কও নয় ওগুলো,
আমাদের ছাদের উপরে উড়ে-যাওয়া প্লেন গুলি
প্রাচীন কালের নয়,
বোমাগুলোও তা নয়—

নবতম বেতার যন্ত্রে বেজে চলেছে পুরোনো সব
বোকা কথা,
এর মুখ থেকে ওর মুখে ছড়িয়ে পড়ছে
জ্ঞান গম্ভীর বুকনি।

শেষের কবিতা

কবর শিলায় উৎকীর্ণ থাক এই ক'টি শেষ কথা
(যদিও তা এক অনাদৃত ভগ্ন ফলকমাত্র):

এই গ্রহ ভেঙে খান খান হবে, ধ্বংস হবে
তাদেরই হাতে যাদের জন্ম দিয়েছে এই গ্রহই—

একসঙ্গে বাঁচার উপায় হিসেবে আমরা
ভেবে বের করেছিলাম বড়ো জোর ধনতন্ত্রকে ;
আর পদার্থবিজ্ঞানের বেলা আমরা চিন্তা
করতে পেরেছি আরেকটু বেশিই :
একসঙ্গে মরার উপায়।

অনায়াসে

দ্যাখো কী অবলীলায়
প্রবল নদী দু-পাড়ের মাটি ভেঙে ভেঙে চলে,
ভূমিকম্পের অলস হাত
মাটিকে উথাল-পাথাল করে,
প্রলয়ংকর আগুন অনায়াসে বাড়ায় হাত
শহরের অগুণতি অট্টালিকার গায়ে,
আর তাদের গ্রাস করে নেয় অফুরন্ত অবসরে।
কী মসৃণ খাদক !

একটি চৈনিক সিংহমূর্তি

দুর্জনেরা ভয় পায় তোমার নখরগুলি, আর
যাবা ভালো তারা চোখ ভরে দ্যাখে তোমাব মোহন রূপ,
এই একই কথা শুনতে পেলে
খুশি হব
আমাব কবিতা সম্বন্ধেও।

ভাগ করে নাও আমাদের জয়োল্লাসকেও

আমাদের পরাজয়েব ভাগ নিযেছিলে,
এবার ভাগ করে নাও
আমাদের জয়োল্লাস।
অনেক চোবাপথ থেকে আমাদের সতর্ক করে দিয়েছিলে,
যে-সব পথে আমবা তথাপি হেঁটে গেছি।
তুমি কিন্তু আমাদের সঙ্গেই হেঁটেছ।

দূরদর্শিতার ফলশ্রুতি

দেখছি তুমি ঘোরাতে চাইছ তোমাব গাড়িটা
সেই একই জায়গায় ফের—
যেখানে তাকে আগে ঘুরিয়েছিলে
আর সেখানকার মাটিটা ছিল নিটোল

এখন সে-চেষ্টা ক'ব না, মনে বেখো—
একবার যেখানে গাড়ি ঘুবিযেছিলে,
মাটিতে বসে গেছে চাকার গভীর ছাপ ;
এখন সেখানে তোমার গাড়ি আটকে যাবে।

যোগ্যতমের টিকে থাকা

জানি এটা নিতান্ত ভাগ্যের ব্যাপার—
অনেক বন্ধুর মৃত্যুকে পেরিয়ে আমি টিকে আছি,
কিন্তু কাল রাত্রে স্বপ্নে শুনতে পেলাম তারা
আমাব সম্বন্ধে বলছে ঃ 'যোগ্যতমের উদ্বর্তন'—
আমার নিজেব উপর ঘৃণা জাগল।

সব কিছুই বদলে যায়

সব কিছুই তো বদলে যায়। তোমাব শেষ নিঃশ্বাস থেকে
ফেব শুরু কবতে পার তোমার জীবন।
কিন্তু যা হয়ে গেছে তা হয়েই গেছে। যে জল
একবাব সুরাপাত্রে ঢালা হয়ে গেছে
তা ছেঁকে ফেলে দেওযা যাবে না।

যা হয়ে গেছে তা হয়েই গেছে। যে জল
একবাব সুবাপাত্রে ঢালা হয়ে গেছে
তা ছেঁকে ফেলে দেওয়া যাবে না। অথচ
সব কিছুই বদলে যায়। ইচ্ছে হলে
ফেব শুরু কবতে পাব তোমাব শেষ নিঃশ্বাস থেকে।

——

ফেভারেট জ্যাকি

শিবাশিস দত্ত

তিন দিন টানা মুষল বৃষ্টির পর জল থৈ-থৈ কবছে চারদিক। লো ল্যাণ্ড। এ জমিতেই হুড়মুড় করে গজিয়ে উঠেছে একটার পর একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি। সারি দেওয়া ফ্ল্যাটবাড়িগুলো হাঁটুজলে ডুবে আছে। জল সরবার জাযগা নেই। অগভীর ড্রেন, কোথাও কোথাও ড্রেন কাটার কাজ এখনও শেষ হযনি। বন্যার জলেব মত জল দাঁড়িযে আছে। নিঝুম, নিস্তব্ধ ফ্ল্যাট বাড়িগুলো ভুতুড়ে বাড়ির মত মনে হয। যেন কোন গণ্ডগ্রামের বন্যার্ত মানুষ আশ্রয পেযেছে মাথা উঁচিযে থাকা অট্টালিকায়। সমস্ত মানুষ ঘরবন্দী, যেন জেলখানায় আশ্রয় নিযেছে শহুরে মানুষ।

চৈতালী চারতলার ফ্ল্যাটে বসে টানা বৃষ্টিব দৃশ্যটা দেখেছে। জানলার গ্রীলে চোখ রেখে আন্দাজ করল জল সবে যাবাব কোন লক্ষণ নেই। বৃষ্টিব ওপব বৃষ্টি। জল হু হু কবে বাডবেই। নীচতলায ফ্ল্যাটবাড়ির প্রবেশদ্বারেব মুখেব সিঁড়িগুলো জলে ডুবে গেছে। ঘব থেকে বের হবাব কোন উপায নেই। শনিবার, ববিবার পেবিযে আজ সোমবার। শুক্রবার থেকে বৃষ্টি শুরু হযেছে। আজ সোমবার বুবাইযেব স্কুল কামাই হবে। আরও কদিন হবে কে জানে? অরুণ হাঁটু অবধি প্যাণ্ট গুটিযে অফিস বেবিযেছে। চৈতালী শনিবাব একটা রিকসায় চেপে বাজাবে গিযেছিল। কাজের জিনিসগুলো কিনে নিযে ফ্ল্যাটে ঢোকার পর আব বেরোতে পাবেনি। জানালায চোখ বেখে দাঁড়িযেছিল চৈতালী। রিক্সা চোখে পড়ে কিনা। কেউ নেই। এখন ঘরে বসেই সময কাটাতে হবে।

পুষি চৈতালীব খাটে শরীর এলিযে শুয়ে আছে। চৈতালী বেড়ালটাকে ঘবে এনেছে বছব তিনেক আগে। জ্যাকি তার আগে থেকেই আছে। অরুণেব ফেভাবিট স্প্যানিযেল। কুকুব আব বেড়াল একসঙ্গে অরুণ আব চৈতালীব সংসাবে আশ্রয় পেযেছে। জ্যাকি আর পুষির একসঙ্গে থাকার ব্যাপাবটাতে অরুণ আপত্তি করেছিল। যেদিন পুষি ঘরে ঢুকল সেদিনই অরুণ চৈতালীকে বলেছিল, আবাব বেড়াল ঢোকালে ঘরে। দুটোকে সামলাতে পাববে? দুটোতে মিলে যদি কখনো ঝগড়া করে? যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে যায়? অবশ্য জ্যাকি তেমন নয। অরুণ জ্যাকিকে ফেবার কবে কথাগুলো বলেছিল। চৈতালীর

এসব কথা ভাল লাগেনি। ঘরময় আরশোলা, ইঁদুরের ছড়াছড়ি—পুষি ছাড়া এসব আপদ দূর করবে কে? পুষির স্বভাবটাও কত মিষ্টি, কেমন ধবধবে সাদা। ও আমার পাশে চুপটি করে ঘুমোয়। কখনও বিরক্ত করে না। এ কি তোমার জ্যাকি! কথাগুলো একটানে শুনিয়ে চৈতালী পুষির এণ্ট্রিটাকে ম্যানেজ করেছিল। অরুণ আর কথা বাড়ায়নি। তারপর থেকেই জ্যাকি আর পুষি কর্তা গিন্নীর পেট ডগ আর পেট ক্যাট হয়ে আছে। বছর খানেক আগে বুবাইয়ের ডিপথেরিয়া অসুখের সময় অরুণ চীৎকার চেঁচামেচি করে বাড়ী মাথায় করেছিল। রীতিমতো উদ্বেগ আর উত্তেজনার মেজাজে সুর চড়িয়ে অরুণ বলেছিল, চৈতালী, এর পরেও বেড়াল পুষবে? ডিপথেরিয়া রোগটা তো বেড়াল থেকেই হয়। এরকম জেদ ভাল নয়। জ্যাকি আর পুষি এক নয়। পুষি পুষি করে আর বিপদ ডেকে এনো না। চৈতালী অরুণের কথায় কান দেয়নি। ডিপথেরিয়া হলেই এরকম সিদ্ধান্ত নিতে হবে? বুবাইকে একটু সাবধানে রাখতে হবে যাতে রোগের বিপদ না আসে। এসব কথা মনের মধ্যে আওড়ে নিয়ে চলছিল চৈতালী। বুবাই সুস্থ হয়ে ওঠার পর অরুণের কথার জবাব দিল। কুকুরের কামড়ে তো র‍্যাবিস হয়। র‍্যাবিস তো আরও বিপজ্জনক। বিড়ালের কামড়েও র‍্যাবিস হতে পারে। কিন্তু এরকম শোনা যায় কম। অরুণ আর কথা বাড়াল না। চৈতালী ভাবল, মোক্ষম জবাব হয়েছে। অরুণ জ্যাকির ঘাড়ে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, জ্যাকি কখনও কামড়ায় না। বিশ্বস্ত চৈতালীও আর কথা বাড়ায় নি। মনে মনে জেদ ধরল জ্যাকি যদি থাকে পুষিও থাকবে। অরুণও ভাবল বাড়তি কথা বলে শুধু অযথা অশান্তি। প্রসঙ্গ চাপা দিল অরুণ। তবু মনের মধ্যে খচখচানিটা থেকে গেল। জ্যাকি আর পুষির মধ্যে যদি ঝগড়া বাঁধে কখনও?

টানা বর্ষা যে শহরের মানুষকে এমন অচল করে দিতে পারে এ অভিজ্ঞতা চৈতালীর ছিল না। বন্যাকবলিত গ্রামের মানুষের মত চৈতালীর ফ্ল্যাটবন্দী দিন কাটছে। সমস্ত যোগাযোগ ও সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে নির্জন দ্বীপের চেহারা নিয়েছে চৈতালীর ফ্ল্যাট। টেলিফোনটাও বিকল হয়ে আছে। ঘরে বুবাইয়ের দুরন্তপনা। তার ওপর জ্যাকি আর পুষি। জ্যাকি চারদিন ঘরের বাইরে বেরোয়নি। অরুণ জ্যাকিকে নিজে রোজ সকালে রাস্তায় বেড়ায়। এখন ঘর-বন্দী হয়ে জ্যাকি বড্ড বেশি উসখুস করছে। ভেতরটাতে কেমন ছটফটানি আর অস্বস্তি নিয়ে ঘর বারান্দায় অনবরত পাক খাচ্ছে জ্যাকি। পুষি আলসে ঘুমে

জড়িয়ে ছিল। হঠাৎ খাট থেকে লাফ মেরে মাটিতে পড়ল। আচমকা জ্যাকির মধ্যে কেমন বদমেজাজ খেলে গেল। পুষির ওপর একটা চাপা রাগ জমে ছিল জ্যাকির। ক্ষ্যাপা জন্তুর আক্রমণ নেমে এল পুষির ওপর। চৈতালী বুবাইকে নিয়ে পাশের ঘরে হাতের লেখা প্রাকটিস করাচ্ছিল। আওয়াজ শুনে ছুটে এল। আক্রোশ আর ক্রোধে জমাট হয়ে থাকা জ্যাকি ততক্ষণে আছড়ে কামড়ে পুষির দফা রফা করে দিয়েছে। পুষি কাতরাচ্ছে। খানিক বাদেই পুষি মারা গেল। জ্যাকি সুড় সুড় করে এগিয়ে আশ্রয় নিল সোফার নীচে।

চৈতালী এক উদ্ভট নির্জনতায়, জলের আতঙ্কে, বিষন্ন ও ভয়ার্ত হয়ে দিন কাটাচ্ছিল। সমস্ত ঘটনায় কেমন বোবা হয়ে গেল চৈতালী। জ্যাকির পাষণ্ড আচরণের কথা ভাবতে ভাবতে ক্রোধ চালান হয়ে গেল অরুণ পর্য্যন্ত। এখন চৈতালী কি করবে? বাইরে চারদিকে জলে, ঘরের মেঝেতে মরা বেড়াল-চৈতালীর ভেতরটা কেমন ধুকপুক করতে লাগল। মায়ার কথা মনে পড়ল চৈতালীর। মায়া এখনও আসেনি। কাজের লোক এ সময়ে যদি না আসে তো জ্বালা আরও বাড়বে। মরা বেড়াল কোথায় ফেলবে চৈতালী? মায়া এলে একটা সুরাহা হয়। কাজ সেরে বাড়ি ফেরার সময় মায়াকে বলবে, একটা থলেতে পুষিকে ভরে নিয়ে বাইরে দূরে কোথাও যেন ফেলে দিয়ে আসে। সবকথা ভাবতে ভাবতে মাথা ধরে এল চৈতালীর। শরীরটা যেন টাল খাচ্ছে। সোফায় গুম হয়ে বসে পড়ল চৈতালী।

ডোরবেলের শব্দ হল। মায়া ঢুকল ঘরে। চৈতালী মিনতিমাখা স্বরে বলে উঠল, মায়া আজ তোর বেশি কাজ নেই। কাল খিচুড়ি রান্না হয়েছে। আজও তাই। বাসনপত্র বেশী নেই। তুই চটপট কাজ সেরে মরা পুষির একটা গতি কর ভাই। কি বিপদে পড়েছি দ্যাখ। নিষ্ঠুর জ্যাকিটার কাণ্ড বুঝলি! চৈতালীর গলায় স্বর অদ্ভুত শোনাল। উত্তেজনায় কখনও গলার স্বর প্রবল শোনাচ্ছে কখনও আতঙ্কে কেমন মিইয়ে যাচ্ছে।

নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়ে চৈতালী বলল। তুই বাড়ী যাবার সময় এই পলিথিনের ব্যাগটায় পুষিকে নিয়ে যাস। দূরে কোথাও ফেলে দিবি। মাটি চাপা দিয়ে দিবি। কাক, চিল যেন না ঠোকরায়। আর এ ব্যাগটা ধর। ড্রামে যে গমগুলো আছে এ ব্যাগে ভরে নে। বড় ব্যাগ, অসুবিধে হবে না। গম ভাঙিয়ে বাড়ি নিয়ে চলে যাবি। ঘরে একগাদা গম জমেছে। রুটি

খাবাব লোক নেই। তুই বুটি বানিযে খাস।

মাযাব হাতে একটা খালি ব্যাগ ছিল। কাজ সেরে মায়া গম বড় ব্যাগে ভর্তি করল। হাতেব খালি ব্যাগটা বড ব্যাগে বেখে একটা পলিথিনেব ঝোলায় মরা বেড়ালটা ঝুলিয়ে সিঁড়ি বেযে নামতে নামতেই ব্যাগের ভাব আন্দাজ কবল মাযা। একতলায নেমে বিড়াল ব্যাগটা একটু দূরে সবিয়ে বেখে বড ব্যাগের গম খালি ব্যাগে ভরতে শুরু কবল। দুটো ব্যাগে সমস্ত গম ভাগ হযে যাওযায় দুহাতে ব্যাগ বইবার কোন অসুবিধে হল না। মাযা তাড়াহুড়োয় গমের দুটো ব্যাগ দুহাতে নিয়ে জল ঠেলতে ঠেলতে বেবিয়ে গেল। বিডাল ব্যাগ পডে বইল নীচতলার সিঁড়ি বারান্দার পাশে।

রাতে বৃষ্টির তেজ বাড়ল। অরুণ অফিস থেকে ফিবে জল ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ফ্ল্যাট বাডিব দোবগোড়ায পৌঁছে দেখল মবা বেড়াল। আবছা অন্ধকারে পুষিকে ভালভাবে চেনা গেল না। ঘবে ঢুকেই চৈতালীকে বলল, নীচে দবজাব সামনে মবা বেড়াল ভাসছে। চমকে উঠল চৈতালী। মাযা তবে এখানেই ফেলে দিয়ে গেছে। অরুণকে সমস্ত ঘটনা বলল চৈতালী।

জ্যাকি সোফাব নীচেই বসে ছিল। অবুণ বলল, জানো চৈতালী জ্যাকি কিন্তু বেশ অনুতপ্ত। সোফার নীচে কেমন কুকঁডে বসে আছে। তুমি মিছিমিছি জ্যাকিব ওপব রাগ কবছ। ফ্ল্যাট বাডিতে থাক। আত্মবক্ষাব জন্যও তো জ্যাকিব কথাটা তোমাব ভাবা উচিত। একটা বেড়াল পুষে কি একটা কুকুবের ভরসা পাওযা যায? যা ভেবেছিলাম তাই হযেছে। জ্যাকির সঙ্গে পুষি কখনও লড়তে পাবে?

জল বাডছে। মরা বেড়াল ফ্ল্যাটবাড়ির দোরগোডায়। পুষি ভাসছে। চৈতালী আতঙ্কে কেমন থতমত খেযে অবুণকে বলল, এখন মরা বেড়ালের একটা গতি কব। ফ্ল্যাটবাডিব লোকজন তো আমাকেই দোষ দেবে। পুষিকে তো অনেকেই চিনত। দেখেশুনে বলবে একে জলে ভাসছি, তাব ওপর মবা বেডাল ভাসিযে দিযেছে জলে। অবুণ চৈতালীর উদ্বেগ আর ভযার্ত চাহনিতে ওব মনেব অবস্থাটা আঁচ কবল। নিরুদ্বেগ স্ববে বলল, তুমি এত দুশ্চিন্তা কবো না। বাতটা পাব হোক। কাল সকালে যা হোক কবা যাবে। চৈতালী অবুণের কথা একরকম বাধ্য হয়ে মেনে নিল।

পরদিন সকাল বেলা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই অরুণ দু' চারজনেব গলাব আওয়াজ শুনতে পেল। আর বলবেন না ভাই, ফ্ল্যাটে মানুষ বাস কবে না কুকুব-বেডাল? শিক্ষিত লোক বলেই তো জানতাম। মরা বেড়াল

ঘরেব সামনে ফেলে গেছে। কাণ্ডটা ভাবুন একবার। অরুণের কানেব ভেতব যেন আগুনেব হলকা বযে যাচ্ছে। অরুণ দাঁতে দাঁত চেপে নীরব মেজাজে সিঁড়ি দিযে নেমে গেল। নীচে নেমে জল ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে গেল বড রাস্তার দিকে। পৌরসভার কর্মী মণ্টু ড্রেন খুঁচিযে জল বেব কববাব কাজে নিযুক্ত লোকজনের তদারকি করছিল। অরুণ নার্ভাস হযে ছুটতে ছুটতে মণ্টুব সামনে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, ভাই মণ্টু, একটা মরা বেড়াল আমাদের ফ্ল্যাটের সামনে ভাসছে। তুমি যদি ডোমকে একটু খবর দাও তো মণ্টু ঘামকপালে ঝাঁঝি গলার স্ববে বলল, হুঁ গঙ্গায মবা মানুষের লাশ ভাসে দুদিন, চারদিন—কারও মাথাব্যথা হয় না, আর এ তো মবা বেড়াল। মশাই আমাব কি চারটে হাত? আমি কি ডোম? দেখছেন না একটা কাজ করছি। অরুণ জিভ কাটার ভঙ্গিমায় খানিকটা গদ গদ কণ্ঠে বলল, রাগ করোনা মণ্টু। আমি সেকথা বলিনি। ছিঃ তুমি ডোম হতে যাবে কেন? তুমি আমাবই মত একজন সার্ভিসম্যান। মণ্টু মুখে পানপবাগ ঢেলে বলল, ডোম কোথায় পাবেন? ডোমপট্টি উঠে গেছে। গঙ্গার ধারের ডোমপট্টি উচ্ছেদ হয়ে গেছে একথা জানেন? অন্য জায়গা থেকে মেথব ধরে আনতে হবে।

অরুণ সব শুনে হতাশ হল। মলিন মুখ নিয়ে ফিরে এল ফ্ল্যাটে। ঘরে ঢুকতেই চৈতালী বলল, এবাব একটু বিশ্রাম নাও। জল ঘাঁটতে ঘাঁটতে চোখ ভারী হয়ে গেছে। গ্রীল বারান্দায় চেযার টেনে পাশাপাশি বসল অরুণ আব চৈতালী। জলমগ্ন নীচতলার উঠোনে চোখ মেলে আছে দুজনাই। তিন-চাবটে চ্যাঙড়া ছেলে জলে দাপাদাপি কবছে। ওদের চোখ পড়ল মরা বেড়াল-টাব ওপব। একজন মজা করে পুষিকে টানতে টানতে জলেব মধ্যে হেলেদুলে হাঁটছে। অন্যেবা দৃশ্যটাতে মজা পেযে হৈ-চৈ করছে। ছেলেদের হাতে নাচতে নাচতে মরা বেড়াল কিছুক্ষণের মধ্যেই অদৃশ্য হল। অরুণ আর চৈতালী হাঁফ ছেড়ে বাঁচল যেন।

অরুণ ঘরে ঢুকে এবার সোফায বসল। জ্যাকিকে ডাকল, জ্যাকি, এদিকে এস। জ্যাকি মেঝেতে শবীব রেখে মাথা আর গলা সোফাব বাইরে বাব করল। অরুণের দিকে নটি বয়ের মত তাকিয়ে আছে জ্যাকি। অরুণ চৈতালীকে ডেকে বলল, দেখছ, কনফেসন। দোষ করেছে বলে কেমন জবু-থবু হযে মেঝেতে পড়ে আছে। ও তো কথা বলতে পারে না। চাহনিতেই বুঝিয়ে দিচ্ছে অন্যায় হয়ে গেছে। চৈতালী তোমায় বলেছিলাম না জ্যাকি

অনেক রিজনেবল্। দেখছ তো ওর চোখমুখ। এবার থেকে জ্যাকিকে একটু ফেবার কর। জ্যাকির প্রয়োজনটা অনেক বেশী। মানুষের ওপর আজকাল কোন ভরসা নেই। জ্যাকির ওপর তুমি ভরসা করতে পার। পুষির সঙ্গে ক্ল্যাশটা একটা অ্যাকসিডেণ্ট। জ্যাকিকে ভুল বুঝো না।

চৈতালী জলমগ্ন উঠোনটার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে আছে। ভাবছে, সারভাইভ্যাল অব দি ফিটেস্ট। জ্যাকির শক্তি বেশী, কাজেই ও সারভাইভ করতে পারল। পুষি দুর্বল, ওকে তাই মরতে হল। জলে ভেসে গেল পুষি। সরল জ্যাকি দুর্বল পুষিকে ঘায়েল করল। এর পরেও ভালবাসতে হবে জ্যাকিকে? অরুণের কথা শুনে এ কাজ চৈতালী করবে?

বুবাই গত কালের ঘটনার পর কোন কথা বলেনি। সবকিছু লক্ষ্য করছিল। এবার জ্যাকিকে টানতে টানতে সোফার নীচ থেকে বার করল। ওর পিঠে চেপে বলল, মা, মা, আমার ঘোড়া। জ্যাকি, স্টার্ট। এই ঘোড়া ছোট, ছোট, জোরে।

জ্যাকি বুবাইকে পিঠে নিয়ে ঘর-বারান্দা ঘুরতে লাগল। চৈতালীর চোখ বেয়ে একফোটা জল গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। জ্যাকি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চৈতালীর ঘর।

———

ধাত্রী

স্বপ্না গুপ্ত

একখানা মাঝারি সাইজের এল্যুমিনিয়ামের হাড়ি, খানকতক থালা, তেলকালি মাখা বিছানাপত্তর আর হাড়জিড়জিড়ে এক পাটি বগলে এসে উঠল গালিফ্ স্ট্রিটের ট্রামডিপোর পেছনটায়। একটু আগের খেদিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নয়া বাসভূমিতে ইঁট জড়ো করে সূত্রপাত করল নতুন সংসারের। হাতে হাতে ডেরা গুছিয়ে তুললো ওরা। কাঠ-কুটো ছিলই সংগ্রহে। খুন্নিবৃত্তির প্রধানতম উপাদান চালের পুঁটলি বগলে থাকলে বাকিটা হয়ে যায় তুড়ি মেরে। ঘুটি ছুটল জলের খোঁজে। ঘুটির মা দয়া উনুনে কাঠ-কুটো সাজাতে ব্যস্ত। আগু, পুঁটি বাবু হয়ে বসে বাবার পাতা পাটিতে। বিছানাপত্তর গোছগাছ করে উনুনের অদূরে বসে আয়েশে বিড়ি ধরালো ওদের বাবা। সে চোখ ঘুরিয়ে দেখে নেয় চারিদিকটা। ডান হাতে বড় রাস্তা। এখন রাস্তার চোখে ঘুম নেমে আসছে যেন। বাঁদিকে সারি সারি হকার ঝুপড়ি। ঝুপড়িগুলোর মাঝে অল্পবিস্তর খালি জায়গা। রাতের খাওয়া সেরে ওখানেই ঘুমানো যাবেখন। হিমেল হাওয়া ঠেকানো যাবে তবু কিছুটা।

শুকনো কাঠ ধোঁয়া উগড়ে দপ করে জ্বলে উঠল। রাতের ইজেলে আগুনের পতাকা। ঘুটির আনা জলে ভাত বসিয়েছে দয়া। গুটি গুটি সবাই এসে বসল চারধারে। কাঠকুটোদের সার্থক দহন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছুরিত আলো চারটে উপোশী মানুষের চোখে মুখে এঁকে দেয় দেওয়ালী রাতের ফুলঝুড়ি। চালের দানাগুলোর লম্ফঝম্প শুরু হয়ে গেছে। মনগুলোও নাচছে সেই তালে তালে। বাতাসের ডানায় ভর করে ভাত-গন্ধ ঢুকে পড়ছে ওদের মজ্জায়। চেতনায়। দমে যাওয়া মনগুলো নববিশ্বাসের নিশানের সামনে বসে তখন হাসছে অম্লান হাসি। মায়ের গা-ঘেঁষে বসে আছে ঘুটি। ঘুটির ঘুটে নিয়ে কারবার—তাই ওই নাম। ঘুটের মত গোলগাল রুক্ষ মুখ—লালচুলের ঝুঁটি মাথায়। মায়ের ডান হাত। বয়সের খবর ঘুটি রাখে না। সাত কিম্বা আট। চাল গলেছে—ভাত রেডী। ঠক্ করে হাঁড়িটা নামায় দয়া। হাঁড়ি নামিয়ে বুকে মুখ গুঁজে বসে রইল সে। পেটেরটাও বুঝি বেড়িয়ে আসতে চায় এই মুহূর্তে। ওরা গুটি গুটি হাড়ির চারধারে এগিয়ে

এসে বসল। পাত পড়েছে চারখানা। হাতটা ভাতের হাঁড়িতে ঢোকাতেই পেটেরটা খামচিয়ে দিতে শুরু করল। অন্ধকার হাতড়ে অনুচ্চারিত শব্দে বলতে চাইছে ঃ

চালাকী পেয়েছ? আমি পড়ে থাকব অন্ধকূপে? এলোপাতাড়ি হাত পা চালাচ্ছে। মাথা ঠুকছে দেওয়ালে দামালটা। জীবন জলের পুকুর তোলপাড় করে কুল ভাঙ্গলো বুঝি বা। মায়ের শীর্ণ দেহটাকে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করার শক্তি রাখে সেই শক্তিধর। উঃ মাগো। নীল হয়ে আসা মুখটা হাঁটুতে গুঁজে ব্যথা গেলার চেষ্টা করে দয়া। ঘুটির বাবা ওরা মায়ের দিকে একবার দৃষ্টি ফেলে ভাতের হাড়ির জিম্মা নিল। ভাবখানা তার এমন যেন ও কিস্সু নয়। অভিজ্ঞতায় খামতি নেই তার ও ঘুটি, ভাগু, পুঁটি, একই দৃশ্য। ঘুটি! উনুনে জল চাপা দেখি। খানিক গরম জল দে তোর মাকে। ঘুটি ঝিমিয়ে পড়া উনুনে ছাইয়ের গাদায় আগুন খোঁজে। তলানী আগুন মিলল। কাঁধাভাঙ্গা ডেকচিটাতে জল ভরতে গিয়ে দেখল—ফুটো বাল্টির জল গেছে ততক্ষণে মাটির পেটে বেশিটাই। তলানী জলটুকু ডেকচিতে ঢেলে বসিয়ে দিল উনুনে। ঘুটির বাবা খাওয়া সেরে জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে পড়ল। বাকিগুলোকে ডানপাশে বাঁপাশে নিয়ে। এখন দয়ার গোঙ্গানী বুঝি কানে যাচ্ছে শুধু একজনের। সয়শয়া নিয়ে বসে থাকে ঘুটি। আকাশ প্যাভেলিয়ান বুঝি দর্শকে ঠাসা চেয়ে আছে জ্বল জ্বল করে। আজ রাতের পালা এবার শুরু। ঘুমচোখে চাঁদও দেখছে ঘুটির ধাত্রী হয়ে ওঠা। দয়া জানে চেঁচিয়ে লাভ নেই। হিতে বিপরীত হবে। লোক জড়ো হবে। সে দাঁতে দাঁত দিয়ে ব্যথা গিলতে থাকে। ধাত্রীর জ্ঞানের পরিধি সীমিত। জলভাঙ্গা কুলভাঙ্গার ব্যাপারটা তার অজানা। দয়া যখন সময়ের কোলে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে সময়ের অপেক্ষা করছে, ঠিক তখনই শোনা যায় ফুটপাথের ও প্রান্তে কিসের যেন সোরগোল। ব্যাপারটা দেখতে হয়। অনুসন্ধিৎসায় উঠে বসল ঘুটির বাবা। চার পাঁচ জন খাঁকি উর্দী পরা মানুষ আর মস্ত এক দাঁতালো মেশিন। দেখে ওরা হা! ঝুপড়িগুলোকে ভাজা মাছের মাথার মত কুড়মুড়িয়ে চিবোচ্ছে। নিয়নের মায়াবী আলোয় মেশিন যখন মুখ খোলে, আকাশের দিকে চেয়ে দাঁত কপাটি বের করে যেন বলে ওহে আকাশ! আজ তোমায় দেব 'দৃষ্টি মোচ্ছব'। দেখছো কি? আকাশ থেকে নেমে আসি নি আমি। মানুষের যে হাত গড়ে ঝুপড়ি, সে হাত আবার গড়ে ঝুপড়ি ভাঙ্গার মেশিন দানো।

বাবাব পিছু পিছু গেঁড়িগুঁড়ি গুলোও এসে দাঁড়িয়েছে। 'দৃষ্টিমোচ্ছব' কি শুধু আকাশেব ? ঘুটিদেবও। লাঠি মেবে, লাথি মেবে ভাঙ্গচুড কবে যখন হান্নাগুলো—পত্তব, ফলমূল বাস্তায গডিযে পডে। ওডা ভাঙ্গা সংসাব কুডিযে বাডিযে ববাবব দৌড দেয। কিন্তু মেশিনেব ঝুপডি গেলা ? দেখছে এই প্রথম। গালিফ্ স্ট্রিটেব যেন অসমযে ঘুম ভাঙ্গালো। জনাকযেক পুলিশ কনেস্টবল এসে দাঁড়িয়েছে ঘুটিদের ডেরাব হাত দুযেক দূরে। হাঁডি কুডি নিযে কেটে পডাই বুদ্ধিমানের কাজ ঠাউরেছে ঘুটিব বাবা। হাতে হাতে দিন গুজরানেব জিনিসপত্র নিযে বাবাব দেখাদেখি ওরা উল্টো দিকে দিল দৌড। শুধু ঘুটি বইল দাঁড়িযে মাযেব কাছে। জোবালো টর্চেব আলোব ফোকাসে ধরা পডল এক অভিনব দৃশ্য। ছাই ভর্ত্তি উনুন। পাটিতে শাযিত আলু-থালু এক দেহ। ঘাডখানি ঈষদ্ বাঁকা। দাঁড়িযে আছে ঘুটি মাকে আড়াল কবে। সার্চলাইটের জোরালো আলোর বৃত্তে তির্যক প্রশ্ন হযে দাঁড়িযে আছে ঝুপডি। 'পালা এখান থেকে তোরা। নইলে · ।' একটা কর্কশ কণ্ঠস্বব ধেযে এল।

চোখদুটো জবলে উঠল ঘুটির। ভাষা তাব শুধু মনে আব চোখে। ঘুটি জন্ম থেকে বোবা। মিল আছে তাব আব এক জনেব সাথে নাম তার ঘাটি।

দযাব গোঙ্গানীব সুব পুলিশদেব টেনে আনে ঝুপডির আডালে প্রসূতির সামনে। আঁধাব-পর্দা দুলছে আতুব ঘরেব প্রবেশ পথে। টর্চের আলোয দেহটা কুঁকডে ওঠে।

—প্রহ্লাদবাবু! মধুসূদন দত্ত ডাক দিল। এদিকটা বাদ দিযে অপবেশন চালু বাখুন। তাবপব কি ভেবে ফিবে দাঁড়ালেন।

—তোব বাবা কোথায ?

ঘুটি নীবব। ঘাড কাত কবে দাঁড়িযে।

মধুসূদন দত্ত জিপে গিযে উঠল। চাবি ঘুবিযে ইঞ্জিনটা স্টার্ট কবল। ঘবঘব শব্দ। একে পাবা যা, কি ভেবে ইঞ্জিনটা বন্ধ কবে অলস ভাবে দেহটা সিটে এলিযে দিল। 'অপাবেশান মিড্নাইট' চলছে অদূবে। চোখ দুটো ছুটে চলেছে ঝুপডি ডিঙ্গিযে অনেক অনেক দূবে। দৃষ্টিপথ এখন অবাধ। চল্লিশটাব মত ঝুপড়ি গুনীতিতে ছিল। 'অপাবেশান' ভোব বাতেব মধ্যে সম্পূর্ণ কবতেই হবে। সেবকমই নির্দেশ আছে।

আনন্দনগবী ঘুমোচ্ছে। মধুসূদন দত্তের চোখেব সামনে ভেসে ওঠে বিগতদিনেব ঝাপসা হযে আসা এক দৃশ্য।

'প্যারাডাইস' নার্সিং হোমেয কেবিনেব বাইরে সে-বাতে জেগে বসেছিল একজন। আশা অপাবেশন থিযেটারেব দেওয়াল ফুঁড়ে দৌড়ে আসবে এক আকাঙ্ক্ষিত ডাক—ওযাঁ · ওযাঁ ঘুম তাডাতে অস্থিব পাযচাবি শুরু কবেছিল কান ছিল খাড়া। কখন যেন কল্পনায় সে ডাক শুনতে শুনতে ঘুমে ঢলেও পড়েছিল। জেগে উঠে শুনেছিল অন্য কথা, নীলিমা জন্ম দিযেছে এক মৃত শিশুব। শিশুর মাথায কোঁকড়া চুল! এখুনি যেন জেগে উঠে ডাক দেবে ও যাঁ বলে। বছব দুয়েক কেটে গেল। দুঃস্বপ্নেব বাত ফিকে হল। নীলিমা নতুন করে স্বপ্ন বুনছিল। গোলাপী উলের টুপিটা দেখিযে বলেছিল এই দেখো! সুন্দব হযেছে না? নতুন আশায আবাব মধুসূদনেব অধীব অপেক্ষা। নীলিমা বলেছিল, ছেলে হলে নাম বাখবো বুবুল। আব মেয়ে হলে? মধুসূদন জিগ্যেস কবেছিল হেসে। নীলিমাব উত্তব—মধুলিমা! এবাবও অপেক্ষা। অপারেশান থিয়েটাবেব দেযাল ফুঁড়ে নিশ্চযই এবাব ঝাঁপিযে পডবে সেই সুব—ও · য়াঁ! আমি এসেছি! করিডোরটাও যেন চুপচাপ দাঁড়িযেছিল সেদিন মধুসূদনের পাশে। নিথব নিঃস্তব্ধতাব মাঝে শোনা যায সিস্টাবদেব হাঁটাচলার সুব। কই কেউ তো এগিযে এসে বলল না। ইপ্সিত সেই কথাটা—এভরিথিং ইজ অলরাইট। আব সেই সুরটা? সমযেব দুস্তব সাগবে বুঝি হাবিয়ে গেছে। ঢেউ হযে আছড়ে পড়া হল না বেলাভূমিব বুকে।

—স্যাব! প্রহ্লাদ বাবু ডাক দিল। অপাবেশান কম্প্লিট স্যাব। ভোর হতে আব দেবি নেই। আজকেব মত কাজ শেষ।

—প্রহ্লাদ বাবু! ডাক দিল মধুসূদন দত্ত।

—স্ববটা যেন এক স্বপ্নোত্থিতের।

—বলুন স্যাব।

—আমাব সাথে আসুন। লেট মী টেক এ রাউণ্ড।

—অপারেশান প্ল্যানমাফিক হয়েছে স্যার। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। জিপ থেকে নেমে মধুসূদন দত্ত দৃঢ় পদক্ষেপে এগিযে গেলেন। একটু আগে যে নাটকটি মঞ্চস্থ হযেছিল, নাম যার 'মিডনাইট অপারেশান' সেই নাটকেব শেষ অঙ্ক বুঝি এখন বাকি। মঞ্চে দিন গুজরানের আসবাব ছড়ানো

ছিটানো। মুখ থুবড়ে পবে ঝুপড়ি! নির্দেশকের ধীব পদক্ষেপে মঞ্চে প্রবেশ। চোখজোড়া কি যেন খুঁজছে!

—স্যার। চলুন এবাব ফেরা যাক। ডেব্রিসগুলো হটিযে ফুটপাথ পরিস্কাব করে দিতে বলেছি। আপনি ক্লান্ত, যু্য নীড বেস্ট স্যার।

মধুসূদন দত্ত দাঁড়িয়ে আছে নিযন আলোর বর্তিকায়। আবর্জনাব মাঝে উঁচিযে আছে হাজার প্রশ্ন। ভোরের উঁকিঝুঁকি এক শীতলতা বযে নিয়ে মনটাকে আবেশী করে তোলে। মঞ্চে যা দেখতে পেলেন না, সে ছবি ফুটে উঠল তাঁব মনেব ধূসর মঞ্চে। ডেব্রিসের ধারে বসে আছে 'অপাবেশান মিডনাইট' নাটকের পার্শ্ব-চবিত্র দয়া। কোলে তাব শিশু। মাথাভর্তি কৃষ্ণ কালো চুল। মূক ধাত্রী চেযে আছে অপলক! দিনমণিব উষ্ণ স্পর্শে শিশু আড়মোডা ভেঙে ডাক দিল ও…যাঁ·· ও যাঁ! শিশুর বন্ধ মুঠিতে লেখা আছে 'সিটি অফ্ জয়'-এর নতুন অঙ্গীকার!

———

মুখোমুখি কঠিনেরই জিজ্ঞাসা

সিদ্ধেশ্বর সেন

'এমন মানবজমিন রইল পতিত'

তবে, এ-ঋতুতেই আতুর হল
বীজ

মন তুমি
রইবেও প'ড়ে অনাবাদী পতিত, এমন
মানবজমিন !

ভাবো তুমি, মন

ধ্বংসের শরীরে, বাকলে,
ফাট ধরা
শীতে

তবু, বসন্তেও
শিলা ফেটে অঙ্কুরোদ্গম,
হয় নাকি

মুখোমুখি—
কঠিনেরই জিজ্ঞাসা ॥

বড়দিন

অমিতাভ দাশগুপ্ত

গল্‌গোথার দিকে চলেছে যিশু, তার
সামনে হাহাকার পিছনে হাহাকার,

চলেছে যিশু কাঁধে নিজের ক্রুশ বয়ে,
ক্লান্ত শিরাগুলি তোলে না টংকার,
খিদেয় তৃষ্ণায় রাত্রি ভেসে যায়,
গল্‌গোথার যিশু চলেছে অসহায়।

পেরেকে গাঁথা তার দুখানি করতল
ফোটায় ফোঁটা ফোঁটা শোনিতে কিংশুক,
জোয়ারে দুলে উঠে রাতের কালো জল
দিয়েছে ধুয়ে তার রৌদ্রে চাটা মুখ,
কাঁটার মুকুটের রক্তমাখা দাঁতে
কপাল চিরে গিয়ে দেখায় হাড় মাস,
পেরেক গাঁথা হাতে, পেরেক গাঁথা বুকে
শীতের রাতে পোড়ে চৈত্র-বৈশাখ,
গল্‌গোথার দিকে চলেছে যিশু, তার
সামনে হাহাকার, পেছনে হাহাকার।

আত্মবিলাপ

শুভ বসু

লালনের আমলের ভোর আজ তামাদি হল কি অবশেষে ?
মানুষ, রাত্রির কাছে চুপিসারে একা যদি যাও,
তাহলে অবশ্য দেখবে, ধ্বংসস্তূপে আকীর্ণ প্রান্তরে,
শকুনের পাখসাটের তালে তাল দিয়ে বহু বামন মর্কট
মহানন্দে শাশ্বতের মুমূর্ষার চারপাশে উৎসব মাতাল, ভাবে
অষ্টবসু অতঃপর বশংবদ হয়ে শুধু সংকীর্তন শোনাবে তাদের।
ধ্বংসস্তূপগুলি থেকে পোড়া পোড়া মানুষের গন্ধ উঠে এলে
চাপা হিংস্রতায় জ্বলে নিশীথ শাসকদের জান্তব আনন।

আমরাতো কত যত্নে লালন করেছি স্বপ্ন, ভারতবর্ষ !
পিতামহদেরও সাধ জেগেছিল বসুধার সাথে কুটুম্বিতার,
সেই এষনাই আমাদের মাটি যত্নে লালন করে গেছে, আর
সাধনার যত অঙ্কুর নীল আকাশের দিকে জেগে উঠে কত লালন চেয়েছে,
চারপাশে স্তূপ হওয়া ভাঙনের তাণ্ডবের চিহ্ন পড়ে আছে,
পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া তার ফাঁক ফোকরের থেকে উঠে আসে, আর
সেই সাথে আমাদের প্রতারিত পরম্পরার আর্তি ভাসে।

আমরা সে কান্না তবু শুনেও শুনি না, দৈনন্দিনের রসে মজেযেতে যেতে
চেতনা হয়েছে বয়ে তৃপ্তি ভারাতুর, তার ফিটফাট প্রসন্নতার
মসৃনতায় পিছলে পিছলে সরে সরে সরে যায়
নদ নদী বন বন্দর জুড়ে ব্যথাজর্জর কাতর প্রাণের আর্তি।

আলসেমি ছেড়ে তবে করে আর অঙ্কুশে পাবে সম্বিত আমাদেরও
ভুলে থেকে থেকে লুপ্তপ্রায় বিবেক?
এর-ওর ঘাড়ে দায়ভাগগুলি চাপিয়ে নিজেকে বেশ
সম্বিতবান ভাবার খোয়ার ঘুচবে ?
দাও আমাদের প্রাণে সেই সংবেদন দিব্য পূর্ণ মানবিক,
সকলের বেদনাকে এই বুকে অনুভব করার আনন্দ,
আদি ক্রৌঞ্চটির দুঃখে সদ্য-ঋষি বাল্মীকির বেদনার চূড়ান্ত মুগ্ধতা !

এই কথাকটি ছাড়া আজ আর অন্য কোন প্রার্থনা সঙ্গত ?

নদী

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

সামাল সামাল জলের দামাল খরস্রোতে ভাঙল বুঝি মাটির বাঁধ !
ঐ জল কোনো নিয়ন্ত্রিত নর্দমায়
সেমিকোলোন বা দাড়ি কমায়
থামতে থামতে এগিয়ে যায় না,
রাস্তাঘাটকে ভাসায় না—
এক ধাক্কায় বাড়ির কাঁচা ভিতকে নাড়ে এ জল্লাদ।
সবাই বলছে নদীর কূলে ঘর বেঁধো না—বাঁধবে কোথায়
ভুবন চাষী ধর্মমাঝি রফিক জেলে ?
এদের ফেলে
নদীই বা যায় কোন্ পথে আর—
ভালোই আছে মন্দে আছে যাহোক একটা ধন্দে আছে জুটছে আহার ঃ
সাতপুরুষের হাড় পোঁতা যে খামখেয়ালী নদীর সোঁতায়।

রক্তকরবীর দেশ থেকে

সমরেশ মণ্ডল

বহুকাল মাটির কোনো পরিপাক ঘটেনি
তাই বাতাসে আজ অকাল বৃষ্টির গন্ধ
পাচন শেষে ঘটে গেছে অঙ্গার ক্রিয়া
যা রক্তকরবীর দেশ থেকে তুলে আনা গম্ভীর নিনাদ।

ক্লেদহীন রক্ত মালঞ্চ থেকে একদিন আবার
শ্রমে সিক্ত হয়ে পরিশ্রমী মানুষ প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠবে।
একদিন আবার বহুকালের পৃথিবী থেকে
উন্মুখ হয়ে উঠবে যাবতীয় প্রকাশ
যার আশ্রয়তলে খুঁজে পাবো আট ঘণ্টার লড়াই

বিশ্রামের মধ্যেও যেখান থেকে ঘোরে স্বপ্নের চাকা
উত্থিত হয় তাল তাল কালোহীরা।

এসব তো কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়
লিখে যাওয়া ছাড়া কবিদের কোনো
বিপ্লব নেই, নেই সত্যিকার নিজস্ব ঠিকানা

যখন বহুকাল হোল মাটির কোনো পরিপাক ঘটেনি ॥

কাদাজল, ইলেট্রনিক্স

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

পোড়ো বাড়িটির কথা আগে, তারও আগে ভাত
তারপরে, বহু পরে, কম্পিউটার ··
যেমন মাঠের চাই কাদাজল, লাঙ্গল কর্ষণ
তারও পরে আমাদের জীবন রোপন···
পায়ের নিচের মাটি তৈরি হোক আগে
আগে হোক বসতি স্থাপন।
তারপর গানগুলি ভাসাও ওড়াও
যেরকম খুশি ব্যবহার করো তারযন্ত্র, ইলেকট্রনিক্স
কেউ কোনও ভৎর্সনা করবে না
তোমার স্পর্শ বাঁচিয়ে চলবে না কেউ।
হে অন্তরতম, ঝড়ে পড়ো পড়ো
বাড়িটির কথা ভাবো আগে
ভাবো, ভাত জুটবে কিসে।
তারপরে, বহু পরে, ঘরে বাজবে টেলিফোন··
টিভির উল্লাস···

এখনও বসে আছ

বিশ্বনাথ কয়াল

এখনও বসে আছ, থাক।
হলুদ পড়চা দেখিয়ে উঠোনে বেড়া দিয়েছিলে
এখন আমার প্রাসাদ কার্নিশ জুড়ে অ্যান্টেনা
তোমার জমি, দালান ব্রহ্মাণ্ড সব হাতের মুঠোয় রিমোট কন্ট্রোলে।

পিতামহের গড়া জানলার ফাঁকে
এক টুকরো আকাশ পাঁচিলে ঢেকেছিলে
দেখ কোটি নক্ষত্রের সাথে ভেসে আছি
মুহূর্তে ঘুরে আসি সাত সাগরের, তীর।

পাড়া বেপাড়ায় কাঁপন ধরিয়ে ডাক এসেছিল,
আমাদের সাথে এসো, চলো যুদ্ধ যাত্রা করি
পথে অজানা আত্মীয় অপেক্ষায় আছে।
হৃদয়, বাসনা, বিদেশ স্বদেশ, দিগন্ত ওপার এপার।

তুমি চিরকাল দলিলে তত্ত্ব-তাগিদে ব্যস্ত যখন
যাও
জোর পাহারা দাও—
দুপাশে দুবিঘা ও হালের বলদ।
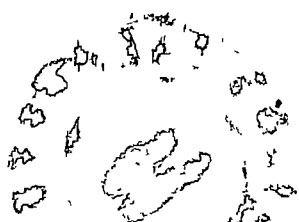
সেল্‌স ম্যান

প্রবালকুমার বসু

একজন সাবান বিক্রি করছে
আর একজন জমি
একজন মুরগি বিক্রি করছে
আর একজন বস্তু
আমি নিজেকে বিক্রি করছি

সকাল থেকে উঠে একটু একটু করে
বেচে ফেলেছি
কাউকে কাউকে দেখেছি বিলিয়ে দিতে
আমি দানধ্যানের মধ্যে নেই
পুরোটা বেচা হয়ে গেলে ফিরে আসছি
একটুও অবশিষ্ট না রেখে
পরদিন সকালের আগে তৈরি করে নিচ্ছি আবার

প্রতিদিন বেচে যাচ্ছি
কিনছে না কেউই

দুর্গালতা

মন্দার মুখোপাধ্যায়

আগে কি চিনেছি তোমায় দেখেছি কখনো—
নরম নিভৃত নারী—স্বপ্নেও কোনো একবার !
উধাও উদাস চোখে—দূরের ঝিলের মন
মিশে যাও মেঘের আবেশে ঃ
চাঁদকুচি হীরে ফুল, দুর্গালতা নিয়ে
সাজাও নীরাকে—
অপাঙ্গ হলুদ আহা শাড়িটিতে ঢেকে
আঁচলে লুকিয়ে মোছো
মেহগনি—ও কার টেবিল ?
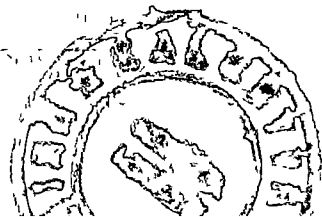
ভাদ্রের গরমে
বিছানার এককোণে পড়ে থাকা
দোসুতী শালের আলগা প্রলেপ দেখে
কেঁপে ওঠো ভয়ে হিম—
জবর কাকে ছুঁয়ে গেল।
খোলা ছাদে এক ঘুমে
খুব আলগোছে ?
কে তুমি আশ্চর্য নারী—দুর্গালতা ফুল!
আমাকে শেখাও এত মুগ্ধ ভালোবাসা—
তীব্রতায় ধরে থাক—
নীরব দুহাতে চুপিচুপি দগ্ধ যত ছিন্ন অনুভব ঃ
আর কাঁদ একা একা—
যক্ষের হৃদয়ে পুড়ে শুধু
অনন্ত মাধুরী এক নীরা হবে বলে ॥

এই আলো, এত অন্ধকার

মধুছন্দা ভট্টাচার্য

হয়ত স্থবির অন্ধকারে
কৃষ্ণকাজল গ্রাম
ছিদ্রবিহীন বন্ধ দ্বারে
ছোটাচ্ছে কালঘাম।
দ্বার খোলে না দ্বার খোলে না
সু-সভ্যতার আলো
সূর্যমুখীর ফুল তোলে না
অন্ধ নিশার কালো।
হয়ত স্থবির হয়ত স্থবির
কালোর রুদ্ধতাই
ঝাঁ-চকচক সোনার ছবির
আলোর শুদ্ধতাই

জন্মালনা আদর্শতে

প্রদর্শনই সার

অপব্যয়-এব অশ্রুখাত-এ

শুষ্ক সিক্ততাব।

জীবন যাদেব কৃষ্ণভ্রমব

শীতল দীঘিব জল

তাদের জন্যে উষ্ণ খবব

সে-কোন ধাঁধার ছল

তেলের সঙ্গে জল মেশে না

শহর-অজের ঢেউ

উন্নয়নের কাজ যে-সেনা

স্রোতেই ফেবার কেউ

অন্তরেতে ঘাটতি যে তাই

হযনা দিন বদল

যন্ত্রে পোড়া মন্ত্রণা ছাই

ব্যর্থ খুড়োব কল।

চৈত্র ঝড়ে তাও উড়ে যাক

তিক্ত হা-হুতাশ

বিশ্বাসেতেই আঁকড়ানো থাক

নিঃস্ব এই বাতাস

জবানবন্দী অ-লেখা বয

পাযের তলায ভাঁটি

সঙ্গীবিহীন সঙ্গীনতায

একলা এ-পথ হাঁটি।

পাঞ্জাবী কবিতা

উপসাগর

প্রভজ্যোৎ কৌর

[কবি-পরিচিতি ঃ প্রথিতযশা পাঞ্জাবী কবি ও গল্পলেখিকা শ্রীমতী প্রভজ্যোৎ কৌর ১৯২৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এ পর্যন্ত একুশটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন। ছয়টি গল্পসংগ্রহ (তিনটি পাঞ্জাবী ভাষায় ও তিনটি হিন্দিতে), ছয়টি শিশু সাহিত্য, ছয়টি সাধারণ বই, তিনটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ ফরাসি, ড্যানিশ, বেলজিয়ান, পার্সী ও উর্দু ভাষায় অনূদিত হয়েছে। 'পাব্বি' কাব্যগ্রন্থটির জন্য তিনি ১৯৬৪ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছিলেন। তিনি অনুবাদকর্মেও নিপুণা। পনেরটি বই অন্যান্য ভাষা থেকে পাঞ্জাবী ভাষার অনুবাদ করেছেন।]

এটাই প্রথম রাত নয় নিদারুণ মনস্তাপের
পূর্ববর্তী রাতগুলিতেও বেদনা ঘাঁটি গেড়ে বসেছে।
এখন আমার শক্তি নেই
সাহসও নেই,
এমনকি তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের আবেগপূর্ণ আগ্রহও
নেই, প্রিয়তম।

সকল আকাঙ্ক্ষা আবেগ শ্বাসরুদ্ধ হয়েছে
থিতিয়ে পড়েছে।
একটি সরল মসৃণ পথ,
তারা রাতলেছে—
প্রতি পদক্ষেপে যন্ত্রণাভোগ করছে লুকোচ্ছে ,

নড়াচড়া না করা, তারা বলে, আমার পক্ষে ভাল।
সহজ ও মসৃণ এটা হতে পারে।
আকাঙ্ক্ষার ঘূর্ণমানতাকে এত জোরে ঠেলা দিয়েছি
এত কঠিনভাবে, এটা ছিল একটা শক্ত,
একটি নির্দয় ধাক্কা।

জীবনেব সিঁডি বেযে চলা
একটি ছোট্ট বাডতি চাপ
এবং একটি ধাপ ভেঙে গেছে
ঝুলে আছে সেখানে
যন্ত্রণাকাতব দৃষ্টিতে ওটা যেন
চেযে আছে আমাব দিকে।
শোক কেন, আমি বলেছিলাম,
পেছন ফিবে তাকাবাব জন্য কেন বিরক্ত কবো—
যা হবাব হবে।

সময এক বিস্তৃত মহাসমুদ্র
জীবন, একটি ছোট্ট উপসাগর—
সমযে সমযে নৌকো ঢোকে
নোঙব কবতে আব পণ্যদ্রব্য খালাস কবতে।

তাডাতাডি কবে, আমাকে ভাবমুক্ত হতে হবে,
শীগ্‌গিবই আমাকে জিনিস জমা করতে হবে
বাণিজ্য ইজ বাণিজ্য, তাবা বলে
কঠিন কঠোব সংকেতে।
উপেক্ষিত আমি কেনাবেচাব চুক্তিকে আঘাত কবেছি—
এখন আব অনুতাপ কবে কি হবে ?

জীবনপাত্র
আঘাতে কানায কানায পূর্ণ
হাডে হাডে ব্যথা
এটা নিশ্চিত, কোন উত্তেজনাই আমার পক্ষে ভাল নয
না কোন মানসিক আন্দোলন
আব না আবেগ-ঝটিকা।

দুঃখ দুর্ভাবনা উৎকণ্ঠা ?

যদি তারা এসে আমাব দরজায় কড়া নাড়ে
বলব ঃ "এখন নয !
শক্তি নেই
সাহসও নেই।
অন্য কোন সময়ে
আসতে পাবো।"

—অনুবাদ ঃ প্রমীর রুদ্র

তার জন্যে

রেনুকা পাত্র

আমি তাকে সবচেয়ে ভালবাসি।

তাকে
আলোব ভিতর ডেকে আনি
নিবু নিবু অন্ধকাব ছুঁয়ে
সে আমার মাথাব কাছে এসে বসে
কথা শোনে,
তারপব যেখানে যাবার নয়
সেখানেও যেতে হবে জেনে
সে বলে ঃ দেবতার কপট ভাষণ
আমাকেও বুঝে নিতে হবে ?

তাবপর, পার্থিব টুকিটাকির পব
বন্ধুত্ব আর সৌন্দর্যের নিজস্ব
ঠিকানায এক পা এক পা করে হেঁটে
আমি তাব জন্য বকুল আর
কেয়ার গন্ধ বিলোই।

খুশির গান

বিশ্বজিৎ রায়

শুভ্র হোক চক্রবাল, রাত কাটুক বিবমিষাব
অন্তহীন নীরবতায় ভঙ্গ হোক পাষাণভার,
দিগ্বিদিক্ ছড়িয়ে যাক খোলা কপাট—খুশির গান
রঙ লাগুক, সুর বাজুক নেচে উঠুক হৃদয় প্রাণ।

বিপ্লবেব তর্ক থাক 'বিপ্লব'-ই আজ ক্লিশে
অন্যপথ অন্যপথ নয় শুধু বিষে-সীসে,
সংসদেব কেনাবেচায় মানুষ আজ ভগ্নপ্রাণ—
তাজা তরুণ আপনারাই অচলতায় পথ দেখান।

পরিচয় প্রকাশিত রচনার নির্বাচিত বিষয়সূচী

সরোজ হাজরা

পঞ্চম কিস্তি

।। শ্রাবণ, ১৩৭৮—আষাঢ়, ১৩৮৮ ।।

[৪-৬ সংখ্যা ৬৭ বর্ষে প্রকাশিত পরিচয় বিষয়সূচী পঞ্চম কিস্তির পরিবর্তে "চতুর্থ কিস্তির" শেষাংশ পঠিত হবে।]

বিষয় সূচীর প্রথম সারিতে লেখকের নাম, বর্ণানুক্রমিক ভাবে সাজানো। দ্বিতীয় সারিতে বিষয় এবং তার অধীন আখ্যা শিরোনাম এবং তৃতীয় সারিতে পরিচয়ের প্রকাশ কাল। এই ধারার কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে কবি, সাহিত্যিক ঔপন্যাসিক, শিল্পী, অভিনেতা, গায়ক, নাট্যকার ও জীবনীর ক্ষেত্রে। সেখানে মূল বিষয় বিভাগের বা উপবিভাগের অধীন বর্ণানুক্রমিক ভাবে আলোচিত ব্যক্তির নাম সাজানো হয়েছে এবং তাকেই একটি বিষয়রূপে গণ্য করা হয়েছে।

বিষয়সূচীতে ব্যবহৃত সংকেতচিহ্নগুলি ঃ

অনুঃ	অনুবাদক বা অনুলেখক
পুঃ মুঃ	পুনর্মুদ্রণ
আঃ পুঃ	আলোচিত পুস্তক
সং	সংকলক
সঃ	সম্পাদক

বিঃ দ্রঃ পরিচয়ের অনেকগুলি সংখ্যাই স্থানীয় সংগ্রহে না থাকায় এবং সে ক্ষেত্রে কেবলমাত্র অন্যত্র সংগৃহীত সংগ্রহ সূচীর প্রতিলিপিগুলির উপর নির্ভর করতে বাধ্য হওয়ায় সঠিক বিষয়সূচী নির্ণয়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটা অসম্ভব নয়। এ বিষয়ে পাঠক বর্গের নির্দেশ অনুযায়ী পরবর্তীকালে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা যেতে পারে।

লেখক	বিষয় ও আখ্যা	পরিচয়েব প্রকাশ কাল
	শিবোনাম	
	।। সামযিক পত্র ।।	
	। পবিচয-ইতিহাস ।	
অবুণ মিত্র	প্রসঙ্গঃ পরিচয—৪৫ বৎসর পূর্তিঃ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি।	কার্ত্তিক ১৩৮৩
গিরিজাপতি ভট্টাচার্য	জন্ম দিনঃ বিবিধ প্রসঙ্গ।	ঐ
গোপাল হালদার	পবিচযেব ৪৫ বৎসর	ঐ
জি. অধিকাবী	প্রসঙ্গ পবিচয ঃ ৪৫ বৎসর পূর্তি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি।	ঐ
নীহাবরঞ্জন বায	প্রসঙ্গ ঃ পবিচয ঃ ৪৫ বৎসব পূর্তি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি।	ঐ
বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	প্রসঙ্গঃ পবিচয় ঃ ৪৫ বৎসব পূর্তি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযকে লেখা চিঠি।	ঐ
বিমল চন্দ্র ঘোষ	প্রসঙ্গ ঃ পরিচয ঃ ৪৫ বৎসর পূর্তি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযকে লেখা চিঠি।	ঐ
বিষ্ণু দে	প্রসঙ্গ পবিচয়—৪৫ বৎসর পূর্তি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি।	ঐ
শ্যামল কৃষ্ণ ঘোষ	পবিচয়-এর আড্ডা	শারদীয় ১৩৮৭
সুকুমাব সেন	প্রসঙ্গ পবিচয ৪৫ বৎসর পূর্তি	কার্ত্তিক, ১৩৮৩
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	বিষ্ণু দে-কে লিখিত সুধীন্দ্রনাথের চিঠিব তৃতীয ও শেষ অংশ পত্র পরিচয—অবুণ সেন।	

সুশোভন সরকার	প্রসঙ্গ ঃ পরিচয় ৪৫ বৎসর পূর্তি দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা চিঠি।	ঐ
ঐ	দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা	অগ্রহায়ণ ১৩৮৫

॥ সাংবাদিকতা ॥

সিদ্ধার্থ রায়	সংবাদ-প্রবাহ ও চৈতন্যের বৈকালী	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৬

॥ বাজেয়াপ্ত গ্রন্থ ॥

দেবব্রত মজুমদার	বাজেয়াপ্ত বাঙলা পুস্তক ও সাময়িক পত্র (১৯২০-১৯৩৬)।	মাঘ, ১৩৮৩

॥ দর্শন-সাধারণ ॥

। মনোবিজ্ঞান ।

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	মনস্তত্ত্ব ও ফলপ্রসূ আচরণ ; কোলম্যান, জেমস লিখিত সাইকলজি এ্যাণ্ড এফেক্টিভ বিহেভিয়র গ্রন্থের উপর আলোচনা।	ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৮৩ ও বৈশাখ, ১৩৮৪

॥ ভারতীয় দর্শন ॥

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়	পুস্তক পরিচয়। আঃপুঃ ট্র্যাডিশন মডার্নিটি অ্যাণ্ড ডেভলপমেণ্ট এস. এন. গাঙ্গুলি	কার্ত্তিক, ১৩৮৬
সুনীল মিত্র	ভারতীয় দর্শনের ঐতিহ্য বিচার ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'হোয়াট ইজ লিভিং এ্যাণ্ড হোয়াট ইজ ডেড্ ইন ইণ্ডিয়ান ফিলসফি' গ্রন্থের উপর আলোচনা।	ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮৩ বৈশাখ, ১৩৮৪

॥ ধর্ম ॥

। হিন্দু ধর্ম ।

চিত্র ভানু সেন	নীরদ চৌধুরীর হিন্দুধর্ম, নীরদ	শ্রাবণ-আশ্বিন

	চৌধুরী লিখিত 'হিন্দুইজম্' গ্রন্থেব উপব আলোচনা।	১৩৮৬

॥ সমাজতত্ত্ব ॥

। সমাজ ও সংস্কৃতি।

গোপাল হালদাব	সংস্কৃতিব সদর্থ।	শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮৬

। নগবায়ন।

সুনীল মুন্সী	কলকাতাব নগব বিন্যাসেব মূলবূপ	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৬
ঐ	ব্যাবণ হসমানেব নগর উন্নয়ন চিন্তা	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮৪

॥ বাষ্ট্র নীতি ॥

। ফ্যাসিবাদ।

অবন্তী কুমাব সান্যাল	ফ্যাসি বিবোধী দশক, বাংলায়	পৌষ-মাঘ, ১৩৮৬
বোধায়ন চট্টোপাধ্যায়	মধ্যবিত্ত মানসিকতা ও ফ্যাসিবাদেব স্ববূপ।	শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮২
বণজিৎ দাশগুপ্ত	ফ্যাসিবাদেব ঐতিহাসিক ও সামাজিক উৎস।	শ্রাবণ-ভাদ্র আশ্বিন ১৩৮২

। মার্কসবাদ।

অবুণা হালদাব	পুস্তক পবিচয়। আঃ পুঃ ভবানী সেনেব লিখিত বচনা সংগ্রহ, সঃ শিবশঙ্কব মিত্র।	অগ্রহায়ণ ১৩৮৬
ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	মার্কস এব বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব।	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৮
প্রদ্যোৎ গুহ	মাওবাদ বনাম মার্কসবাদ।	শ্রাবণ-ভাদ্র আশ্বিন ১৩৮২
সবোজ ভৌমিক	মার্কসীয দর্শন ও শ্রীঅরবিন্দের সমাজবাদ	জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪

সুনীল মিত্র	ফ্রেডারিক এঙ্গেলস : প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও ডায়েলেকটিক পদ্ধতিব ধারা।	কার্ত্তিক ১৩৮৪

। সমাজতন্ত্রবাদ ও সাম্যবাদ।

দিলীপ বসু	পশ্চিম ইউরোপে কমিউনিজম।	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮৪
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	লেনিন শতাব্দী	মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৮৫
হীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	মানুষেব অধিকাব ও সমাজবাদ	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮৫

॥ অর্থনীতি ॥

॥ শ্রম ও শ্রমিক ॥

। নারী শ্রমিক।

বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়	কাজের মেযেবা	আষাঢ়, ১৩৮৪
ঐ	সেলাই ও শিশি।	কার্ত্তিক, ১৩৮৪
ঐ	কাজের মেয়েরা	পৌষ, ১৩৮৪
		অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫
		পৌষ, ১৩৮৫

। শিশু শ্রমিক।

বেলা বন্দ্যোপাধ্যায়	শিশু বর্ষ : শিশু শ্রম।	শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৬

॥ ভূমি অর্থনীতি ॥

। জমিদারী প্রথা।

শ্যামলেন্দু সেনগুপ্ত	পুস্তক পবিচয় : আঃ পুঃ দ্য পেজেন্ট্রী অব বেঙ্গল-আব সি ডাট, উইথ এ্যান ইন-ট্রোডাকশন বাই নবহরি কবিরাজ	অগ্রহায়ণ ১৩৮৭

॥ ভাবতেব শিল্প অর্থনীতি ॥

রণজিৎ দাশগুপ্ত	পুস্তক পরিচয় : আঃ পুঃ দি হাউস অব টাটা—সুনীল কুমার সেন।	অগ্রহায়ণ ১৩৮৩

॥ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও শান্তি আন্দোলন ॥

দিলীপ বসু	অ্যাটমীয় কূটনীতি।	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮২

॥ শিক্ষা ॥

। শিক্ষা-পশ্চিমবঙ্গ।

দেবেশ রায়	নীহাররঞ্জন রায়, সুকুমার সেন, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমীপেষু	অগ্রহায়ণ ১৩৮৭

॥ সমাজে নারীর স্থান ॥

সাত্র জ্যাঁ পল	সাত্র-বো ভোয়া আলাপ ; সাক্ষাৎকার : সিমন দ্যবো ভোয়ার ফোশেচনখ্ জ্যাঁ পল সাত্রে ; অনুবাদক দেবেশ রায়। আরো দেখুন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অধীন নারী মুক্তি আন্দোলন	পৌষ ১৩৮৩ চৈত্র ১৩৫৩

॥ ভারতের বিভিন্ন সমাজ ও সামাজিক সমস্যা ॥

। অস্পৃশ্যতা।

অন্নদা শঙ্কর রায়	সবার নিচে সবার পিছে	শারদীয়, ১৩৮৪

॥ ভাষাতত্ত্ব ॥

গোপাল হালদার	নয়াভাষাতত্ত্ব ও চোমস্কির পথ ; পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ রিফ্লেক্শন অন্ ল্যাঙ্গুয়েজ বাই নোয়াম চোম্স্কি।	জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ১৩৮৭

। ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা।

গোপাল হালদার	বিধান পরিষদে প্রদত্ত বক্তৃতা (২রা জুলাই ১৯৫৮) পুঃমুঃ রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে	পৌষ-মাঘ ১৩৮৬

। বাংলা ভাষা ও ভাষা সমস্যা।

অনিমেষ কান্তি পাল	বাংলা উপভাষা চর্চার ত্রিধাবা।	পৌষ-মাঘ ১৩৮৬ (গোঃ হাঃ সম্মান সং)
মনীন্দ্র কুমার ঘোষ	সাহিত্যেব হট্টগোলে	শাবদীয ১৩৮৭

। আসামেব ভাষা ও ভাষা সমস্যা।

আশিস সান্যাল	আসামেব ভাষা সমস্যা ও সমাধানের সূত্র।	কার্ত্তিক-অগ্রঃ ১৩৭৯

॥ বিজ্ঞান ॥

প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়	বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সমাজ	মাঘ, ১৩৮৩
শংকব চক্রবর্তী	দানিকেন ও মানুষের বুদ্ধি।	শ্রাবণ-ভাদ্র আশ্বিন ১৩৮২
ঐ	মহাবিশ্বে আমবা কি নিঃসঙ্গ	ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৮

। জ্যোতির্বিজ্ঞান।

বনগার্ড-লেভিন, ভ জি	বিক্রমাদিত্যেব নববত্নে আর্যভট্ট অনুপস্থিত কেন, বিজ্ঞান প্রসঙ্গ।	অগ্রহায়ণ ১৩৮৩

। প্রাণীতত্ত্ব।

অবুণা হালদার	পুস্তক পবিচয়।	আষাঢ, ১৩৮৪
গোপাল হালদার	আঃ পুঃ বাংলার কীট পতঙ্গ—গোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য।	

॥ নন্দনতত্ত্ব ॥

অশোক ভট্টাচার্য	নন্দনতত্ত্ব ও জীবন ঃ মার্কসবাদী লেনিনবাদী বিচাব, কুলিকোভা, আই ও জিস এ সম্পাদিত "মার্কসিস্ট লেনিনিষ্ট অ্যাসথেটিকস এ্যান্ড লাইফ" শীর্ষক প্রবন্ধ সংকলনেব উপব আলোচনা।	সমালোচনা সং ফাল্গুন চৈত্র, ১৩৮৩, বৈশাখ ১৩৮৪
ঐ	বুপকলা প্রসঙ্গে গোপাল হালদার; বেভোলিউশনাবী আর্ট-এ্যা সিম্পোজিয়াম	পৌষ-মাঘ, ১৩৮৬

	গ্রন্থের গোপাল হালদার লিখিত ভূমিকাব উপর আলোচনা।	
দেবেশ বায	মার্কসবাদী নন্দন, না,নন্দিত মার্কসবাদ	জৈষ্ঠ, ১৩৮৪
পূর্ণেন্দু পত্রী	মোনালিসা।	শারদীয ১৩৮৭ অগ্রহায়ণ ১৩৮৭

। চিত্রকলা-ইতিহাস।

অশোক ভট্টাচার্য	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ পাল-যুগেব চিত্রকলা—সবসীকুমাব সবস্বতী।	পৌষ, ১৩৮৫
নীহাররঞ্জন রায়	মুঘল চিত্রকলা ঃ অনুচিন্তন	শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮২
ঐ	ভাবতীয জীবনে ও মননে শিল্পের স্থান অনুবাদক সত্যজিৎ চৌধুরী।	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৬ কার্ত্তিক ১৩৮৬
নীহারবঞ্জন বায	ভাবত শিল্প ও ধর্ম ঃ কুমাবস্বামী স্মৃতি বক্তৃতা, অনু ঃ সত্যজিত চৌধুরী ও সিদ্ধার্থ বায।	শাবদীয ১৩৮৭

। শিল্পকলা-প্রদর্শনী।

অভিজিৎ সেনগুপ্ত	শিল্পমেলা, ১৯৮০, ববীন্দ্রসদন, বিবিধ প্রসঙ্গ।	ফাল্গুন, ১৩৮৬

। চিত্রকলা ও চিত্রশিল্পী।

। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুব।

সত্যজিৎ চৌধুবী	শিল্পে পুববোজ্জীবনবাদ ও অবনীন্দ্রনাথ।	পৌষ ১৩৮৩

। কমল কুমাব মজুমদার।

নিখিলেশ দাস	কমলকুমাব মজুমদারের চিত্রকলা ঃ চিত্রকলা প্রসঙ্গে	ফাল্গুন, ১৩৮৬

। যামিনী বায়।

যামিনী বায়	চিঠিপত্র ঃ কাজেব ভিতব দিযে জানা, নিজেকেও জানা,' সম্পাদনা, অবুণ সেন।	ভাদ্র-আশ্বিন (শাবদীয) ১৩৮৪

। শান্তনু মণ্ডল।

বিষ্ণু দাস	শিশু শিল্পীব প্রকৃতি প্রেম।	পৌষ, ১৩৮৪
	বিদেশী চিত্রকলা ও চিত্রশিল্পী।	
	পিকানো, পাবলো।	
অশোক ভট্টাচার্য	পিকাসোর শিল্প চিন্তা	শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৬

। রঁদা।

পূর্ণেন্দু পত্রী	রঁদার আলোয একটা দিন	শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৬

॥ ভারতীয ভাস্কর্য ও ভাস্কব ॥

। প্রদোষ দাসগুপ্ত।

অজিতকুমার দত্ত	তাৎক্ষনিকেব নব ব্যঞ্জনা : প্রদোষ দাশগুপ্তের সাম্প্রতিক ভাস্কর্য।	শারদীয়, ১৩৮৭

॥ স্থাপত্য শিল্প ॥

। মন্দির শিল্প।

অরুণ সেন	পুস্তক-পবিচয়। আঃ পুঃ ম্যকাচ্চন, ডেভিড "লেট মিডাইভাল টেম্পলস্ অব বেঙ্গল, অবিজিন এ্যান্ড ক্ল্যাশিফিকেসন"	পৌষ, ১৩৮৩
ঐ	লেখকের উত্তব, অশোক সেন লিখিত সমালোচনাব উত্তব, পাঠক গোষ্ঠি।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪
অশোক সেন	ডেভিড ম্যাক্কাচ্চন-এর লেখা পুস্তকের উপব অরুণ সেনের প্রবন্ধের বিষযে আলোচনা।	জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৪

॥ সঙ্গীত ॥

রাজেশ্বব মিত্র	সঙ্গীত প্রসঙ্গ	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮৬

। ভারতীয সঙ্গীত।

কার্ত্তিক লাহিড়ী	ভারতীয সঙ্গীত চিন্তা, পুস্তক পরিচয়	শ্রাবণ, ১৩৮৭

। লোক সঙ্গীত।

নীহাব বড়ুয়া	যৈবনের ঢলবে বন্ধু : ভাওযাইয়া অঞ্চলেব কবিদের চোখে যৌবনের রূপ।	শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৬

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	নাট্য বিশ্ব ঃ নাট্যভাবনা ; পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ নাট্যচিন্তা ঃ শিল্প জিজ্ঞাসা— দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।	অগ্রহায়ণ ১৩৮৭
	। নাটক ও নাট্যাভিনয় ।	
উষা গঙ্গোপাধ্যায়	তুঘলক, বেগম কি তাকিয়া, আধে অধুরে, মুখ্যমন্ত্রী ; অনামিকা কলা সঙ্গম আয়োজিত নাট্যোৎসব ; ৯-১৯ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯, কলকাতা।	পৌষ ১৩৮৫
দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	অভিনয়ের গতি ও ছন্দ।	মাঘ, ১৩৮৩
	। বাংলা নাটক ।	
কেয়া চক্রবর্তী	সাতে নেই পাঁচে নেই।	ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮৪
শৈবাল চট্টোপাধ্যায়	অরক্ষিত মানুষ	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫
ঐ	তবু যুদ্ধ	পৌষ, ১৩৮৪
	। বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয় ।	
অরুণ সেন	পাপ পুণ্য ; টলস্টয়ের নাটক 'দ্য পাওয়ার অব ডার্কনেস' অনুসরণে, প্রযোজনা, 'নান্দীমুখ' বাংলা রূপান্তর ও নির্দেশনা ঃ অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস। ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯।	পৌষ, ১৩৮৫
কেতকী কুশারী ডাইসন	ভোমা ঃ একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতা	আষাঢ় ১৩৮৪
জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়	মহাকালীর বাচ্চা ঃ প্রযোজনা, থিয়েটার ওয়ার্কশপ, পরিচালনা, বিভাস চক্রবর্তী ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৯।	পৌষ, ১৩৮৫
প্রসূন দাশগুপ্ত	'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত'-এর মঞ্চরূপায়ণ।	মাঘ-চৈত্র ১৩৮৪
শুভ বসু	'নান্দীকারের' ফুটবল ঃ প্রযোজনা নান্দকীয়, পরিচালনা ; রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪

শুভাশিস গোস্বামী	নামজীবন ঃ নাট্যকার নির্দেশক ঃ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, জানুয়ারী, ১৯৭৯ কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ।	পৌষ, ১৩৮৫
শৈবাল চট্টোপাধ্যায়	নরক গুলজার নাটক ঃ মনোজ মিত্র ; নির্দেশনা, বিভাস চক্রবর্তী।	আষাঢ় ১৩৮৪

। বাংলা নাটক ও নাট্যকার ।

। চিত্তরঞ্জন ঘোষ ।

মলয় দাশগুপ্ত	নীলের আলা ঃ চিত্তরঞ্জন ঘোষের লেখা 'গল্পের পালা' নাটকের আলোচনা।	ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৮৩

। শম্ভু মিত্র ।

সিদ্ধার্থ রায়	চাঁদ বণিকের পালা , বিবিধ প্রসংগ।	কার্ত্তিক, ১৩৮৬

।। প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ ।।

চিন্মোহন সেহানবীশ	ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক আন্দোলন ঃ কয়েকটি পুরনো ছবি।	শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮২
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	কর্ত্তব্য সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল ; ১৩৫৬-এর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যায় পরিচয়ে প্রকাশিত 'প্রগতি সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রন।	ঐ

। খেলা ধূলা ।

নৃপতি পাল	কসমস ও কলকাতা	শারদীয়, ১৩৮৪

।। সাহিত্য তত্ত্ব ।।

অ্যাডরনো, থিওডোর	কমিটমেণ্ট, অনুবাদকঃ প্রমীলা মেহতা ঃ মার্কস্বাদ ও সাহিত্য, আলোচনা সংকলন ৩।	ফাল্গুন, ১৩৮৬
গিনজবার্গ, লিদিয়া	মার্কসবাদ ও শিল্প সাহিত্য , আলোচনা সংকলন ঃ সাংস্কৃতিক কাঠামোয় সাহিত্য বিচারের স্থান ; ভূমিকা—পরিচয় সম্পাদক। অনু ঃ প্রমীলা মেহতা।	কার্ত্তিক, ১৩৮৬
দেবেশ রায়	লেখকের দায় ! সময় ও ব্যক্তি ঃ পুস্তক	অগ্রহায়ণ,

	পবিচয। আঃ পঃ সাংস্কৃতিক আন্দোলন ; অতীত ও বর্তমান ঃ সংকলন— গণতান্ত্রিক লেখক ও কলাকুশলী সম্মিলনী।	১৩৮৭
পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়	মধ্যবিত্ত সংকট ঃ শাস্ত্র বিবোধী ভাবনা চিন্তা	শ্রাবণ-ভাদ্র আশ্বিন, ১৩৮২
সত্যপ্রিয় ঘোষ	সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ও লুকাকস্	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৮

॥ ভাবতীয় সাহিত্য-আলোচনা ॥

সাহিত্য এ্যাকাদেমি	পূর্বাঞ্চলীয় কথা সাহিত্য সেমিনাব, ন্যাশনাল লাইবেবী, কলকাতা ; ১ লা— ৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭ ; প্রতিবেদক ঃ অমলেন্দু চক্রবর্তী।	মাঘ, ১৩৮৩

॥ প্রাদেশিক সাহিত্য ॥

। হিন্দী গল্প উপন্যাস।

ইব্রাহিম শবীফ	জমির শেষ টুকবো।	পৌষ, ১৩৮৪
বসন্ত কুমার	জীবন; হিন্দী থেকে অনুবাদ— বিশ্বজিত সেন।	কার্তিক, ১৩৮৪

। হিন্দী উপন্যাস-আলোচনা।

গোপাল কৃষ্ণ শর্মা	হিন্দী উপন্যাসে সমাজবাদী চেতনা।	পৌষ ১৩৮৫

। হিন্দী উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক।

। যশপাল।

রণেশ দাশগুপ্ত	'দেখেছি, ভেবেছি, বুঝেছি ঃ যশপাল নিখিত, 'দেখা, সোচা ও সমঝা,' কহানীকে রূপমে, অপবীতি ঘটনায" গ্রন্থেব উপর আলোচনা।	ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৮৩

॥ ওড়িষ্যাব কাব্য ও কবি ॥

। ভীম ডোয।

সত্যেন সেন	ওড়িষ্যাব সাধক কবি ভীম ডোয।	ফাল্গুন, ১৩৮৬

॥ বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যতত্ত্ব ॥

অশ্রু কুমার সিকদার	'চারি দিকে নবীন যদুর বংশ'	শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮২
ঐ	'চাবিদিকে নবীন যদুব বংশ' পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যাযেব প্রবন্ধের সমালোচনা।	কার্ত্তিক, ১৩৮৩
বুশতী সেন	বর্তমান কিশোর সাহিত্যঃ কিছু দৃষ্টান্ত, কিছু সমস্যা।	শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৬

॥ কাব্যতত্ত্ব ॥

পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ কাব্যতত্ত্বঃ এ্যাবিষ্টটল। ভূমিকা—অনুবাদ ও টীকা—শিশির কুমাব দাশ।	পৌষ, ১৩৮৪

। বাংলা কাব্য—আলোচনা।

মাণিক চক্রবর্তী	কবিতার নানা ফর্মঃ পুস্তক পবিচয় আঃ পুঃ বাংলা দীর্ঘ কবিতা—দেব কুমার বসু (সঃ)	শ্রাবণ, ১৩৮৭

॥ বাংলা কাব্য ও কবি ॥

। অমিয চক্রবর্তী।

অমিতাভ বসু	অমিয চক্রবর্তী—ইদানীং ; পাঠক গোষ্ঠি, শিব শম্ভু পাল লিখিত প্রবন্ধেব সমালোচনা।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪
শিবশম্ভু পাল	অমিয চক্রবর্তী—ইদানীং। অমিয় চক্রবর্তী লিখিত 'অনিঃশেষ' কাব্য গ্রন্থেব উপর আলোচনা।	ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৮৩, বৈশাখ, ১৩৮৪,

। অরুণ মিত্র।

শুভ বসু	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ শুধু বাতের শব্দ নয—অবুণ মিত্র	পৌষ, ১৩৮৫

। গোবিন্দ দাস।

অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ উনিশ শতকেব নিষিদ্ধ গ্রন্থ ও কবি গোবিন্দ দাস—কুমুদ কুমার ভট্টাচার্য।	কার্ত্তিক, ১৩৮৪

।। বাংলা কাব্য ও কবি ।।

। বিষ্ণু দে ।

অমিতাভ দাশগুপ্ত	ঈপ্সা : কবিতার নিবিড় পাঠ	বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮৬
অরুণ কুমার সরকার	সন্দীপের চর, পুঃ মুঃ ('কবিতা' আশ্বিন, ১৩৫৫)	বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮৬
অরুণ সেন	বিষ্ণু দে'র কবিতার পাঠান্তর; 'ঘোড়- সাওয়ার, 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা'।	শারদীয়, ১৩৮৭
অশোক সেন	আরম্ভ ও তারপর	বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮৫
কল্যাণ সেনগুপ্ত	সংবাদ মূলত কাব্য ঃ কাব্য সমালোচনা	বৈশাখ আষাঢ়, ১৩৮৫
গোপাল হালদার	রুচি ও প্রগতি, পুমুঃ (জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪)	বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৬
চিত্ত ঘোষ	যম ও নেযনা ঃ কবিতার নিবিড় পাঠ।	বৈশাখ-আষাঢ়,১৩৮৬
জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়	তুমি শুধু পঁচিশে বৈশাখ ঃ পুমু ঃ (অগ্রনী, শারদীয, ১৩৬৫)	ঐ
দেবেশ রায়	চৈতন্যের সহোদর ঃ পরিচয় ও বিষ্ণু দে	ঐ
ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	'চোরা বালি, পুঃ মুঃ (পরিচয়, বৈশাখ, ১৩৪৫)	ঐ
নন্দিনী আল্‌হেলাল	সেই অন্ধকার তাই ঃ পুস্তক পরিচয সমালোচনা।	ঐ
পার্থ প্রতিম বন্দোপাধ্যায়	ইতিহাসে ট্রাজিক উল্লাসে ঃ পুস্তক পরিচয সমালোচনা	ঐ
বিষ্ণু দে	বিষ্ণু দে রচনা পঞ্জী ; সংকলক অরুণ সেন।	ঐ
বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত	শব্দের অন্তঃশীল ঃ "ঈশাবাস্য দিবা-নিশা" কাব্যগ্রন্থ প্রসঙ্গে।	বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৬
বুদ্ধদেব বসু	সাতভাই চম্পা ; পুঃ মুঃ ('কবিতা' আষাঢ়, ১৩৫২)	ঐ

মনীন্দ্র বায়	অন্বিষ্ট ঃ পুঃমুঃ (নতুন সাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৭)	বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৬
রঞ্জিত দাস	চিত্ররূপ মত্ত পৃথিবীর ঃ পুস্তক সমালোচনা।	ঐ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	'উর্বশী ও আর্টেমিস'; কাব্যটি সম্পর্কে বিষ্ণু দে-কে লেখা একটি চিঠি।	ঐ
শঙ্খ ঘোষ	রাত্রি (স্তামং ন দিগদ্) ঃ 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কবিতার নিবিড় পাঠ।	ঐ
সত্যজিৎ চৌধুরী	বিষ্ণু দে চর্চা ঃ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায ও লিখিত 'কোমল গান্ধারে বিষ্ণু দে' গ্রন্থের উপর আলোচনা।	'ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৮৩
সমর সেন	পূর্ব লেখ। পুঃ মুঃ (অবণি ৪ঠা সেপ্টেম্বব ১৯৪২)	বৈশাখ-আষাঢ়, ১৯৪২
সিদ্ধেশ্বব সেন	সত্তা-সংকট, আগে পরে জিজ্ঞাসা ; 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত, কবিতা প্রসঙ্গে।	ঐ
সুতপা ভট্টাচার্য	উত্তরে থাকো মৌন ঃ গ্রন্থ সমালোচনা	বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৮৫
ঐ	নৈবাশ্যের পারাপারে ক্ষযহীন আশা বিষ্ণু দে লিখিত 'চিত্রবূপ পৃথিবীব' কাব্যগ্রন্থের উপর আলোচনা।	ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৮৩, বৈশাখ ১৩৮৪
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত	নাম বেখেছি কোমল গান্ধার ঃ বিষ্ণু দে-কে লেখা চিঠি।	বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৮৬
সুনীল কুমাব নন্দী	নব প্রতিষ্ঠায় ঃ কবিতার নিবিড় পাঠ।	ঐ
হীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	বিষ্ণু দের শ্রেষ্ঠ কবিতা ঃ পুঃমুঃ (পবিচয, পৌষ, ১৩৬২)।	ঐ

। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অমিতাভ দাশগুপ্ত	পুস্তক পরিচয। আঃ পুঃ বীবেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা।	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭

। মনীন্দ্র রায।

অমিতাভ দাশগুপ্ত	পুস্তক পরিচয় ঃ দীর্ঘ কবিতা, দেশকাল আঃ পুঃ মনীন্দ্ররাযের কাব্য সংগ্রহ।	ফাল্গুন, ১৩৮৬

। শঙ্খ ঘোষ ।

অমিতাভ দাশগুপ্ত	হাসপাতালে বাজনা ; শঙ্খ ঘোষের 'বাবরের প্রার্থনা' কাব্য গ্রন্থের উপর আলোচনা।	ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৮৩, বৈশাখ, ১৩৯৪

। সুকান্ত ভট্টাচার্য ।

রণেশ দাশগুপ্ত	সুকান্ত কাব্যের ভবিষ্যৎবাদী আধুনিকতা।	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩

। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ।

পরিচয়	'কাল, মধুমাস' ঃ বিবিধ প্রসঙ্গ।	

। বাংলা কাব্য-ইতিহাস ।

অরুণ সেন	কবিতার দশ বছর	সমালোচনা সং ১৩৮৭

। সাঁওতালি কবিতা ।

অরুণ সেন	বাঁশির পাহাড় ; ডব্লু জি আর্থার লিখিত 'দি হিল অব ফ্লুটস ঃ লাইফ লাভ এ্যান্ড পোইট্রি ইন ট্রাইব্যাল ইন্ডিয়া ; এ পোর্ট্রেট অব সাঁওতালস্।	ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮৩, বৈশাখ ১৩৮৪

। ইংরেজী ভাষায় লেখা বাঙালী কবির কাব্য ও কবি ।

। তরু দত্ত ।

সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	তরু দত্ত ঃ আত্ম জিজ্ঞাসার দর্পণে—বাঙালী তরুণী	পৌষ, ১৩৮৪

। বাংলা গল্প উপন্যাস ।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়	কাপুরুষ	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৮
অধীর বিশ্বাস	ভাগাড়	ফাল্গুন, ১৩৮৬
অমল আচার্য	ডুমুরের দিনরাত	পৌষ, ১৩৮৩
অমলেন্দু চক্রবর্তী	তথাপি, বেঁচে আছে।	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮৪
ঐ	নচিকেতা জানিতে চাহিলেন	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৮

অমলেন্দু চক্রবর্তী	মানসাঙ্কের হিসেব।	শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৬
অমিয় ভূষণ মজুমদার	চলিয়াছ।	শারদীয়, ১৩৮৭
ঐ	মহিষকুণ্ডার উপকথা	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৬
ঐ	রাজীব উপাখ্যান	ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৮
অসিত ঘোষ	সোনার চেয়ে দামী।	শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮২
অসীম রায়	তবমুজ।	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৮
ঐ	নবাব ক্লাইভ।	শারদীয়, ১৩৮৭
ঐ	ভ্যাবা চাকা।	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮৪
ঐ	লখিয়ার বাপ	শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮২
ঐ	শৈলাবাসে একা	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৬
আফসার আমেদ	জনস্রোত, জলস্রোত।	কার্ত্তিক, ১৩৮৬
আবুবকর সিদ্দিক	ফজবালি হেঁটে যায়।	পৌষ, ১৩৮৪
আশীষ বর্মন	যবনিকার আগে।	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫
কার্ত্তিক লাহিড়ী	দশরথ	শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৬
কেশব দাশ	অসমৃদ্ধ	ফাল্গুন, ১৩৮৬
ঐ	সংকেত।	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৬
গুণময় মান্না	কস্মৈ দেবায়	ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮৪
ঐ	সাব	শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮২

চিত্তরঞ্জন ঘোষ	অভিমন্যু	ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৮
ঐ	জীয়ান পালা	শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮২
ঐ	সই	শারদীয়, ১৩৮৭
জাতক রাণা	'হগ্‌দরি সীটের পো'	কার্ত্তিক, ১৩৮৪
জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়	ফুলমতী	শারদীয়, ১৩৮৪
জ্যোৎস্নাময় ঘোষ	কাজি সাহাব	শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮২
দরবেশ ছদ্ম	ইরান জার্নাল ঃ তাব্রিজে	কার্ত্তিক ১৩৩৬
দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	গগনঠাকুরের সিঁড়ি।	মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮৫
দেবেশ রায়	মূর্তির মানুষ	শারদীয়, ১৩৮৪
ঐ	সাইক্লোনের চোখ	শারদীয়, ১৩৮৭
প্রবীর নন্দী	গিরগিটি	কার্ত্তিক, ১৩৮৬
রবেন গঙ্গোপাধ্যায়	যুদ্ধ	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৮
বিজয়া রাজাধ্যক্ষ	বিদেহী	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪
বিমল কর	গ্লানি	শারদীয়, ১৩৮৪
বিশ্বনাথ বসু	মহালয়ার রীতি	শারদীয়, ১৩৮৭
ভবানী সেন	উদয়পুরের উপকথা।	কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯
মনীন্দ্র চক্রবর্তী	খোয়াড়	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪
মহাশ্বেতা দেবী	দ্রৌপদী	শারদীয়, ১৩৮৪
ঐ	ধরমারু	শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৬
মানিক চক্রবর্তী	দয়ার আগে কি পরে	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩
ঐ	শীতের রাতে শোওয়া	শারদীয়, ১৩৮৪
মিহির সেন	আলোয় শুদ্ধ	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৮

রামকুমার মুখোপাধ্যায়	নিমাই বিশ্বাসের বৌ মেয়ে, আলসেশিয়ান ও পাইপ।	ফাল্গুন, ১৩৮৬
শঙ্কর বসু	পাতাল জরিপ	শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৬
ঐ	বাদার গল্প।	কার্ত্তিক, ১৩৮৩
শচীন বিশ্বাস	বন্যা ও লাবণ্য	কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯
সত্য ঘোষাল	উপক্রমনিকা	ভাদ্র-আশ্বিন, ১২৮৪
সমরেশ বসু	অতঃপর	শারদীয়, ১৩৮৭
ঐ	উৎপাত	শারদীয়, ১৩৮৪
ঐ	নিষিদ্ধ ছিদ্র	শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮২
সমরেশ বসু	মরেছে প্যালগা ফরসা।	শারদীয়, ১৩৮৬
সুদর্শন সেনশর্মা	দাম্পত্য	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭
সেলিমা হোসেন	হিজলদাগায ভবা	আষাঢ় ১৩৮৪
সৌবি ঘটক	নিদ্রা হাবা	কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৯
ঐ	বুদ্ধিজীবীদের আরও কেচ্ছা	শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮২
ঐ	যন্ত্রণা	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৮

॥ বাংলা গল্প-উপন্যাস আলোচনা ॥

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়	গল্পেব সত্তর দশক।	সমাঃ সং ১৩৮৭
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	সত্তরেব দশকের বাংলা উপন্যাসের প্রকৃতি।	ঐ
	আরো দেখুন "মতামত"	শ্রাবণ, ১৩৮৭

। বাংলা উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক।

সবোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	বর্ণভেদেব চবিত্র নির্ণয়ে বাঙালি ঔপন্যাসিক।	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৬
কিবণশঙ্কর সেনগুপ্ত	অচিন্ত কুমার সেনগুপ্ত	কার্ত্তিক, ১৩৮৩
জ্যোতিপ্রকাশ	অবিরাম যুদ্ধের চেনামুখ : অমলেন্দু	ফাল্গুন-চৈত্র,

চট্টোপাধ্যায়	চক্রবর্তী লিখিত 'অবিরত চেনামুখ, গল্পের উপর আলোচনা।	১৩৮৩, বৈশাখ, ১৩৮৪
আশীষ বর্মন	উপন্যাসে আত্মজিজ্ঞাসা ও অহমিকা। অসীম রায়ের লেখা 'একদা ট্রেনে' উপ-ন্যাসের উপর আলোচনা।	ঐ
দেবেশ রায়	সমালোচনায় আত্ম জিজ্ঞাসা ও অহমিকা' পাঠক গোষ্ঠি, আশীষ বর্মন লিখিত প্রবন্ধের সম্পর্কে আলোচনা	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪
প্রণবেশ বায়	অসীম রায়ের 'জবানবন্দী' পাঠক গোষ্ঠি।	পৌষ, ১৩৮৩
কার্ত্তিক লাহিড়ী	ত্রিদিবার আধুনিকতা	পৌষ-মাঘ, ১৩৮৬
দেবেশ রায়	উপন্যাস ও আত্ম জিজ্ঞাসা	ঐ
মণীন্দ্র রায়	সমকালীন বিচার ঃ 'একদা'; পুঃ মুঃ	ঐ
বণেশ দাশগুপ্ত	অনন্য 'ত্রিদিবা'	ঐ
অমিতাভ দাশগুপ্ত	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ 'জতুগৃহ', 'ঈশ্বর পাটনী' ও 'বেহুলা'—চিত্ত সিংহ	কার্ত্তিক, ১৩৮৪

। তারাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায়।

গোপাল হালদার	বাঙলা উপন্যাস পাঠের ভূমিকা ঃ তারাশঙ্কর। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	পৌষ, ১৩৭৬
প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য	ঔপন্যাসিকের আত্মপবিচয় এবং আত্ম সংগঠন ঃ তারাশঙ্কব।	শাবদীয়, ১৩৮৭
অশোক সেন	খুন সমাজে, সংসারে ঃ দেবেশ রায় লিখিত 'মানুষ খুন করে কেন' উপ-ন্যাসের উপর আলোচনা।	ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৮৩, বৈশাখ, ১৩৮৪
অমল আচার্য	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ সছিদ্র জল ও তৃতীয় মেরু নির্মল আচার্য।	অগ্রহায়ণ ১৩৮৪
আশিষ মজুমদার	কমলাকান্ত, কয়েকখানি ইংরেজি বই এবং প্রসঙ্গত।	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

গোপাল হালদার	উপন্যাস পাঠের প্রস্তুতি ঃ বঙ্কিম রচনা সংগ্রহের' ভূমিকা থেকে গৃহীত।	শ্রাবণ-ভাদ্র আশ্বিন, ১৩৮২
নির্মল ঘোষ	বঙ্গদর্শনের বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙালি রেনেসাঁস।	কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ ১৩৭৯
গোপাল হালদার	বাঙলা উপন্যাস পাঠের ভূমিকা ; সাহিত্যঃ বিভূতিভূষণ।	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩
রুশতী সেন	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ অলস ভ্রমণ বিমল কর সহ ভূমিকা—	আষাঢ়, ১৩৮৪
পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ ন হন্যতে —মৈত্রেয়ী দেবী	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩
গোপাল হালদার	বাঙলা উপন্যাস পাঠের ভূমিকা ; শরৎ-চন্দ্র ঃ হৃদয়গ্রাহী উপন্যাস	কার্ত্তিক, ১৩৮৩
পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়	উপন্যাসের উপাদান ঃ শরৎচন্দ্র ঃ গৃহদাহ।	আষাঢ়, ১৩৮৪
সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়	কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ঃ নারায়ণ চৌধুরী লিখিত 'কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের উপর আলোচনা।	ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৮৩, বৈশাখ, ১৩৮৪
আশীষ মজুমদার	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ কাগজের বৌ—শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।	পৌষ, ১৩৮৫
অশ্রুকুমার সিকদার	আধুনিক এপিক—'ঢোঁড়াই চরিত মানস'।	শারদীয়, ১৩৮৭
রমেন্দ্র বর্মন	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ সতীনাথ ভাদুড়ী ঃ সাহিত্য ও সাধনা— গোপাল হালদার।	কার্ত্তিক, ১৩৮৬
রুশতী সেন	পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ বিন্ধকরো —সুরজিৎ দাশগুপ্ত	কার্ত্তিক, ১৩৮৪

।। বিদেশী সাহিত্য ।। । জার্মান সাহিত্য ।

লেমান, এইচ ও	জার্মান গণতান্ত্রিক সাধারণতন্ত্রের সাহিত্য	কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৭৯
হাইনে, হেনরিখ	"লুটেশিয়া'র মুখবন্ধ"	ঐ

। জার্মান গল্প উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক ।

তবুণ সান্যাল	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ সেয়ার্স, অ্যানা বেনিটোস ব্লু এ্যান্ড নাইন আদার স্টোরিস	আষাঢ়, ১৩৮৪

॥ রুশ সাহিত্য ॥

। রুশ উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক ।

দেবেশ রায়	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ লিও টলস্টয়েব শয়তান ; অনুঃ বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়	কার্ত্তিক, ১৪৮৬
মাযো ভিতুস্কি দুশান পেত্রোভিচ	তলস্তয়েব সঙ্গে কয়েক বছর ; ১৯০৪-১৯১০।	পৌষ, ১৩৮৫

॥ ইতিহাস চর্চা ॥

তরুণ সান্যাল	ভবিষ্যতের সমাজ ঃ এক কল্প কাহিনী ডানিয়েল বেল লিখিত "দ্য কামিং অব পোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি এ ভেনচার ইন্‌ স্যোসাল ফোরকাস্টিং" গ্রন্থেব উপব আলোচনা।	সমা সং ১৩৮৭
রাম বসু	টয়নবীর অভিজ্ঞতা ঃ আর্নল্ড টয়নবী লিখিত 'এক্সপিরিয়েন্সস' গ্রন্থের উপর আলোচনা।	ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৮৩, বৈশাখ, ১৩৮৪
রুদ্রাংশু মুখোপাধ্যায়	পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ 'দি রাইটিং অব হিস্ট্রি—থাপার, হরবনস্‌ মুখিয়া এবং বিপান চন্দ্র।	মাঘ, ১৩৮৩
সিদ্ধার্থ উপাধ্যায়	ইতিহাস কংগ্রেসেব সিদ্ধান্ত ভুবনেশ্বব, ২৬-২৮, ডিসেম্বব, ১৯৭৭)	পৌষ ১৩৮৪
সুশোভন সরকাব	প্রগতিশীল ইতিহাস চর্চাব উপর 'হিন্দুত্বেব' আক্রমণ।	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

॥ ইউবোপ ইতিহাস—আধুনিক যুগ ॥

। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ—ইতিহাস ।

দিলীপ বসু	এ্যাটমীয় কূটনীতি।	শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮২

শোভনলাল দত্তগুপ্ত	গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের পটভূমিকায় দ্বিদলীয় রাষ্ট্র ব্যবস্থায় তাৎপর্য।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪
সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	ভাবতের বৈচিত্র ও দুই পার্টি ব্যবস্থা।	ঐ
সৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	বামপন্থার সেদিন ও এদিন।	আষাঢ়, ১৩৮৪

॥ ভারতের জাতীয় আন্দোলন ॥

নরহরি কবিরাজ	বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নতুন ব্যাখ্যা ঃ অনিল শীল লিখিত 'দ্য ইমার্জেন্স অব ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যালিজম্' গ্রন্থের সমালোচনা।	সমাঃ সং ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮৩, বৈশাখ ১৩৮৪
ফণিভূষণ রায়	ভারতীয় রাজনীতির কয়েক দশকঃ তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জী ; অরুণ ঘোষ সঙ্কলিত ইণ্ডিয়ান পোলিটিক্যাল মুভমেণ্ট ১৯১৯-১৯৭১ এ্যাসিস্টেমেটিক বিবলিও-গ্র্যাফি গ্রন্থের উপর আলোচনা।	সমাঃ সং ১৩৮৪ বৈশাখ ১৩৮৪

। ভারতের জাতীয় আন্দোলন বিপ্লবী যুগ।

অভ্রঘোষ	জাতীযতাবাদী আন্দোলন ও প্রবাসীর হাওযা ঃ গোপাল হালদাবের চোখে।	পৌষ-মাঘ, ১৩৮৬
চিন্মোহন সেহানবীশ	রাজদ্রোহ আমদানিব কাহিনী ঃ প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের কথা।	ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৮৪

। ভারতের কৃষক আন্দোলন।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়	সাম্রাজ্য ও কৃষক বিদ্রোহঃ পুস্তক পরিচয় আঃ পুঃ ষ্টোকস, এরিখ দি পেজেণ্ট এ্যাণ্ড দি বাজ ঃ ষ্টাডিজ ইন এ্যাগ্রা-রিয়ান সোসাইটিজ এ্যাণ্ড পেমেণ্ট রেবেলিয়ন ইন্ 'কোলোনিযাল ইণ্ডিয়া	ফাল্গুন, ১৩৮৬

॥ বাংলা-ইতিহাস-আধুনিক যুগ ॥

অভ্র ঘোষ	সমাজ, ইতিহাস, আর্থিক ও অন্যান্য প্রসঙ্গে। আরো দেখুন 'মতামত' শ্রাবণ, ১৩৮৭।	সমাঃ সং ১৩৮৭
বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য	বাঙালীব রুশচর্চা। কেশব চক্রবর্তী	ফাল্গুন-চৈত্র

	লিখিত ভারতবর্ষ কথাঃ বাঙালীর রুশচর্চা" গ্রন্থের উপব আলোচনা।	১৩৮৩ বৈশাখ, ১৩৮৪

। বাঙলার জাতীয় আন্দোলন।

গৌতম চট্টোপাধ্যায়	বাঙালা দেশে স্বদেশী আন্দোলনঃ সুমিত সরকার লিখিত 'দি স্বদেশী মুভমেণ্ট ইন্ বেঙ্গল' (১৯০৫-১৯০৮) গ্রন্থের উপব আলোচনা।	ঐ

।বাংলার জাতীয় আন্দোলন যুদ্ধোত্তর যুগ।

গৌতম চট্টোপাধ্যায়	এস তবে আজ বিদ্রোহ করি	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮৪

। বাংলার কৃষক আন্দোলন।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলার কৃষক সংগ্রামঃ সুনীল সেন লিখিত 'বাঙলাব কৃষক সংগ্রাম' গ্রন্হের আলোচনা।	ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮৩ বৈশাখ ১৩৮৪

। কলকাতা—স্থানিক ইতিহাস।

পার্থ প্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায	পুস্তক পবিচয। আঃ পুঃ ক্যালকাটা মিথ এ্যাণ্ড হিষ্ট্রি—এস এন মুখার্জী।	কার্ত্তিক, ১৩৮৪
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	কলকাতা নিয়ে।	শ্রাবণ-ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮৬

। বোলপুর-স্থানিক ইতিহাস।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়	ভুবননগব এড়িযে বিপোর্টাজ	শারদীয় ১৩৮৪

। বাংলা দেশ-ইতিহাস।

অবুণা হালদার	বাংলা ও বাংলাদেশঃ পুস্তক পরিচয়।	ফাল্গুন ১৩৮৬
রণেশ দাসগুপ্ত	এক চিলতে কালো কাপড়।	ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৮

। চীন-ইতিহাস।

শিবানী শঙ্কব চৌবে	চীন দেশের বাজনীতি ও ভিয়েতনাম	পৌষ, ১৩৮৫

। ক্যাম্পুচিয়া-ইতিহাস।

শোভনলাল দত্তগুপ্ত	কাম্পুচিয়া প্রসঙ্গ	শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৬

। ভিয়েতনাম-ইতিহাস ।

দেবেশ রায়	পুস্তক পরিচয় । আঃ পুঃ ডেন, বার-বারা ও সিলভাব আবুইন সম্পাদিত 'দি ভিয়েতনাম সঙ বুক'	পৌষ, ১৩৮৫

। দক্ষিণ-আফ্রিকা-ইতিহাস ।

কৃষ্ণ ধর	কালো মানুষের অধিকার ঃ শুমা আলেক্‌সনী সম্পাদিত "এ্যাপরাটাইডঃ এ কালেকশনস্‌ অব রাইটিংস অন্‌ সাউথ আফ্রিকান বেসিজিম" ।	সমাঃ সং ১৩৮৩-৮৪

॥ জীবনী ॥

। সমাজ সংস্কারক ও স্বাধীনতা সংগ্রামী ।

প্রদীপ রায়	রামমোহনের বিলাত গমনের উদ্দেশ্য ও ফল	পৌষ, ১৩৮৪
সুধীরকুমার করণ	রামমোহন ও বাদানুবাদ প্রসঙ্গ	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪
সুনীল সেন	গিবির জীবন স্মৃতি, ভি ভি গিরির লেখা "মাই লাইফ এ্যাণ্ড টাইম" গ্রন্থের উপব আলোচনা ।	ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৮৩ বৈশাখ, ১৩৮৪

॥ মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী ॥

অনিলকুমাব কাঞ্জিলাল	গোপাল হালদার ঃ স্বনাম পুরুষো-ধন্য, সম্পাদনা ও প্রতি লিখন—ধনঞ্জয় দাশ ।	পৌষ-মাঘ, ১৩৮৬
অভ্র ঘোষ	জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও 'প্রবাসীর হাওয়া' ঃ গোপাল হালদারের চোখে ঃ পবিশিষ্ট । প্রবাসীতে প্রকাশিত গোপাল হালদাবের রচনাপঞ্জি ।	পৌষ-মাঘ, ১৩৮৬
অরুণ সেন	নতুন সংস্কৃতি, নতুন নিরিখ , সংস্কৃতির রূপান্তরে'র কয়েকটি উক্তিব অনুস্মৃতি ।	ঐ
আশীষ মজুমদার	আত্মকথা ঃ দেশকাল কথা	ঐ
গোপাল হালদায়	কয়েকটি বক্তৃতা ঃ বিধান পরিষদে প্রদত্ত শিক্ষা প্রসঙ্গে, পুঃ মুঃ	পৌষ-মাঘ ১৩৮৬

গোপাল হালদার	কয়েদীর আকাশ, পুঃ মুঃ	ঐ
ঐ	জীবনপঞ্জির রূপরেখা ঃ তথ্যপঞ্জি	ঐ
ঐ	'পরিচয়'-এ প্রকাশিত রচনাবলির পঞ্জি ১৯৩১-১৯৭০, প্রবীর গোপাল রায় সংকলিত, সংযোজন, রামকুমার মুখোপাধ্যায়। সংস্কৃতি ; না বিকৃতি ; বিমলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'মেঘনা' সাহিত্য সংকলনে প্রকাশিত (বৈশাখ, ১৩৫৪) প্রবন্ধ ; পুঃ মুঃ	ঐ
দেবেশ বায়	ভূমিকা ঃ পবিচয় সম্পাদকীয, গোপাল হালদার, সম্মান সংখ্যা।	ঐ
প্রশান্ত কুমার দাশগুপ্ত	ভাষাতত্ত্ব চর্চায় গোপাল হালদাব	ঐ
বমেন্দ্র বর্মন	বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চা, যুগ-বিভাগ, গোপাল হালদার।	ঐ
সিদ্ধেশ্বর সেন	সমগ্রের সত্য ঃ গোপাল হালদারের সঙ্গে সাক্ষাৎকাব।	ঐ
সুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায	বাহাত্তব উত্তীবিতে।	ঐ
অরুণ কৌল	কলকাতায় এক লেখকেব খোঁজে।	দীপেন্দ্রনাথ স্মরণ সং মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮৫
অবুণা হালদার	স্মৃতির প্রদীপ ভাসানো।	ঐ
অসীম রায়	দীপেন্দ্রনাথেব চেষ্টা	ঐ
কুমার বায়	দীপেন্দ্রনাথ	ঐ
গোপাল হালদাব	আত্মার দীপ্তি	ঐ
জ্যোতি দাশগুপ্ত	যেমন করে আমার চেনা।	ঐ
জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়	দীপেন্দ্রনাথ ঃ আন্দোলন ও সংগঠনে।	ঐ

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	এক জনের নাম দীপেন্দ্রনাথ।	ঐ
ঐ	দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংগে সাক্ষাৎকার। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেব গবেষণা পরিষদের পক্ষে নেওয়া, তাং ২৫· ৮· ৭৫	ঐ
ঐ	রচনাপঞ্জি ঃ সংকলন দেবেশ রায়	ঐ
ঐ	দীপেন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জী ; পরিশিষ্টে সংযোজন, সংকলন—মালবিকা চট্টো-পাধ্যায।	ঐ
ননী ভৌমিক	দ্বিতীয কিশোর।	ঐ
পবিচয়েব কর্মিবৃন্দ	দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায ঃ সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য।	ঐ
বিষ্ণু দে	দীপেন	ঐ
ভীষ্ম সাহনি	দীপেনবাবু—কিছু স্মৃতি ; অনু ঃ শৈবাল চট্টোপাধ্যায়	ঐ
মহাশ্বেতা দেবী	দীপেন	ঐ
মৃণাল সেন	দীপেন	ঐ
সন্‌জীদা খাতুন	সম্ভবতঃ নিশ্চয়ই	ঐ
সমরেশ বসু	মুখোমুখি।	ঐ
সরলা বসু	দীপেন আমার জন্য পরিচযে লিখেছিল, আমি ওব জন্য পরিচযে লিখছি।	ঐ
সুশোভন সবকার	দীপেন।	ঐ
অমবেন্দ্র প্রসাদ মিত্র	হিরণ সান্যাল ঃ যেমনটি মনে হয়েছিল।	মাঘ-চৈত্র, ১৩৮৪
মিতীশ রায	আনন্দস্মৃতি ঃ হিরণকুমারের চিঠি।	মাঘ-ফাল্গুন, ১৩৮৪
গিরিজাপতি ভট্টাচার্য	আমাদের হাবুল	মাঘ-চৈত্র, ঐ

শ্যামল কৃষ্ণ ঘোষ	হিরণ।	১৩৮৪
সুশোভন সরকার	হিরণকুমার সান্যাল ঃ স্মৃতিচারণ; অনুলিখন, কবিতা সিংহ।	ঐ

। সাম্যবাদী নেতা ও কর্মি।

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	মণি সিং-এর জীবনের একটি অধ্যায়।	ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৮
সোমনাথ লাহিড়ী	উত্তরণ।	শারদীয়, ১৩৮৪

। আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী নেতা' ও বুদ্ধিজীবী।

দিলীপ বসু	মুক্তিপথিক ঃ রজনী পাম দত্ত।	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৭৮
দিলীপ মুখোপাধ্যায়	নো পাসারান ঃ ইবারুরি, ভো লোবেস লিখিত ঃ লা পাসিও নারিয়ার আত্মজীবনী।	সমাঃ সং ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮৩, বৈশাখ, ১৩৮৪

। ফরাসী চিন্তাবিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী।

। রুশো, জ্যাঁ, জ্যাক।

অমলেন্দু বসু	রুশো ; বিবিধ প্রসঙ্গ।	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫

। অর্থনীতিবিদ।

রণজিৎ দাশগুপ্ত	মরিস ডব ঃ বিয়োগপঞ্জী	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩

।। ভাষাতত্ত্ববিদ ।।

গোপাল হালদার	বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যে মুহম্মদ আব্দুল হাই ঃ আজাহারউদ্দীন খানের লেখা "বাঙলা-সাহিত্যে মহম্মদ আব্দুল হাই" গ্রন্থের উপর আলোচনা।	সমাঃ সং ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৮৩ বৈশাখ ১৩৮৪
ঐ	সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি চিত্র	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮৪
সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়	বহুভাষিতা, ভাষাতত্ত্বের চর্চা এবং হরিনাথ দে	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

তপতী মুখোপাধ্যায	জ্যোতিবিন্দ্র মৈত্র স্মরণে।	মাঘ-চৈত্র ১৩৮৪
দিলীপ বসু	নবজীবনেব শিল্পী	মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮৪
পদ্মনাভ দাশগুপ্ত	বজ্রেব স্বরলিপি, ইন্দিবা সঙ্গীত শিক্ষাযতন প্রকাশিত জ্যোতিবিন্দ্র মৈত্রেব লেখা 'নবজীবনেব গান' ও অন্যান্য গ্রন্থেব উপব আলোচনা।	
প্রণতি দে	"তবু মনে বেখ"	মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮৪
প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায	বটুকদাব স্মৃতি	মাঘ-চৈত্র ১৩৮৪
বিজন ভট্টাচার্য	বটুক ছিল সেই আপন জন।	ঐ
বোধাযন চট্টোপাধ্যায	বটুকদা ঃ স্মৃতি নয শুধু, অপবাজেয শিল্পী।	মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮৪
মণীন্দ্র বায	গানেব ভিতব দিযে যখন।	মাঘ-চৈত্র ১৩৮৪
বঘুনাথ গোস্বামী	নবজীবনেব মুখ চুমে	মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮৪
বথীন্দ্র মৈত্র	জ্যোতিবিন্দ্র 'বটুকদা' আমাব সেজদা আমাব আবাল্য সহচব।	মাঘ-চৈত্র ১৩৮৪
বাজ্যেশ্বব মিত্র	জ্যোতিবিন্দ্র স্মবণে	মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮৪
সবসিজ সেনগুপ্ত	যে বটুকদা আমাদেব খুবই পবিচিত ছিলেন।	ঐ
সাধন দাসগুপ্ত	মধুবংশী বিবেকেব প্রস্থান	মাঘ-চৈত্র ১৩৮৪
বাজ্যেশ্বব মিত্র	মবমী শিল্পী ও জীবন জিজ্ঞাসু দিলীপ কুমাব।	শাবদীয, ১৩৮৭

দেবব্রত বিশ্বাস	গাওয়া না গাওয়া	শ্রাবণ-ভাদ্র আশ্বিন, ১৩৮২
কার্ত্তিক লাহিড়ী	সঙ্গীত ও সাধনা ঃ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ	কার্তিক ১৩৮৪
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র	যদি মনে পড়ে	শাবদীয়, ১৩৮৪

। গণসংগীত শিল্পী ।

দিলীপ বসু	পল বোবসন ঃ বিয়োগপঞ্জী	ফাল্গুন ১৩৮৬

।। লোকগীতিকার কবিয়াল ।।

সাধন দাশগুপ্ত	কর্ণফুলিব কবিয়াল	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৫
ববীন্দ্র মজুমদাব	শেখ গুমানী দেওয়ান ; বিয়োগপঞ্জী	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৩

।। বাংলা যাত্রা ও পালা রচনাকাব ।।

আশুতোষ ভট্টাচার্য	পালা সম্রাট ব্রজেন্দ্র কুমাব দে	কার্ত্তিক, ১৩৮৩

। বাংলা নাট্যমঞ্চ ও নাট্য অভিনেত্রী ।

অমলেন্দু চক্রবর্তী	কেয়া চক্রবর্তী ঃ বিয়োগ পঞ্জী	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪
চিত্তবঞ্জন ঘোষ	ফুলেব মশাল ।	ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩৮৪

।। গণনাট্যকার এবং অভিনেতা।।

অবুণ মিত্র	বিজন ।	মাঘ-চৈত্র ১৩৮৪
দিগিন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বাংলা নাটকেব শ্রেণী চবিত্র বদলে বিজনের ভূমিকা	ঐ
বিজন ভট্টাচার্য	বিজন ভট্টাচার্যেব অপ্রকাশিত রচনা ।	মাঘ-ফাল্গুন ১৩৮৪
মৃণাল সেন	দুইটি মৃত্যু কিছু শিক্ষা	ঐ
বণেশ দাশগুপ্ত	বিজন ভট্টাচার্য ঃ ববেণ্য বিপ্লবী লোকায়ত নট ও নাট্যকাব ।	

।। বাংলা নাট্যমঞ্চ ও মঞ্চ পরিচালক ।।

কুমাব রায়	সতু সেন ঃ আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ	ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৮৩

অমিতাভ দাশগুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত "সতু সেনের আত্মস্মৃতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ আলোচনা।

॥ কবি, সাহিত্যিক-জীবনী ॥

। উর্দু কবি-পারভেজ সাহেদী।

রণেশ দাশগুপ্ত — পারভেজ স্মরণে। — শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৬

। উর্দু উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক।

রণেশ দাশগুপ্ত — কৃষণ চন্দর ঃ বিয়োগপঞ্জী। — মাঘ, ১৩৮৩

॥ হিন্দী উপন্যাস ও ঔপন্যাসিক ॥

পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় — ফণীশ্বর নাথ রেণুর ছদ্ম, (ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) বিয়োগপঞ্জী। — আষাঢ় ১৩৮৩

॥ বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যিক ॥

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত — অচ্যুত গোস্বামী (১৯১৮—১৯৮০) বিবিধ প্রসঙ্গ। — ফাল্গুন, ১৩৮৬

কৃষ্ণ ধর — পরিমল গোস্বামী ঃ বিয়োগপঞ্জী — কার্ত্তিক ১৩৮৩

জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায় — বনবিহারী মুখোপাধ্যায় সংযোজন। — অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭

সুকুমার মিত্র — বনবিহারী মুখোপাধ্যায় ঃ একটি বিস্মৃত নাম। — ফাল্গুন, ১৩৮৬

। বাঙালী কবি।

দেবেশ রায় — পুস্তক পরিচয়। আঃ পুঃ বাবু বৃত্তান্ত—সমর সেন। — কার্ত্তিক, ১৩৮৬

লতিকা বসু — পরমাত্মীয় — পৌষ, ১৩৮৩

॥ বিদেশী কবি ও সাহিত্যিক ॥

নেরুদা পাবলো — পাবলো নেরুদার অনুস্মৃতি, অনুবাদ ঃ দিলীপ মুখোপাধ্যায়। — কার্ত্তিক ১৩৮৩

কৃষ্ণ ধর — আঁদ্রে মালরোব (১৯০১—১৯৭৬) বিয়োগ পঞ্জী।

। ববীন্দ্র চর্চা ।

। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব—আলোচনা ।

অন্নদা শঙ্কব বায	রবীন্দ্রনাথ ও আবুল ফজল ।	শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৮৬
গোপাল হালদাব	ববীন্দ্রনাথ টেগোর, এইট মে, ১৮৬১ মিডেল আগস্ট, ১৯৪১ ঃ ববীন্দ্র জন্য শতবর্ষ উপলক্ষে কলকাতায 'ববীন্দ্র শতবার্ষিকী—শান্তি উৎসব' এব জন্য লিখিত বচনা , পুমুঃ	পৌষ-মাঘ, ১৩৮৬
সুকুমারী ভট্টাচার্য	পুস্তক পবিচয । আঃ পুঃ অনিল কুমার মুখোপাধ্যায সংগ্রথিত "ববীন্দ্র চেতনায উপনিষৎ"	অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭

। রবীন্দ্রনাথেব সমাজচিন্তা ।

বুশতী সেন	যজ্ঞনাথেব মই ।	শাবদীয, ১৩৮৭

। রবীন্দ্রনাথেব জাতীয ও আন্তর্জাতিক চিন্তা ।

অরুণ সেন	জন্মতীর্থ মানবতীর্থ পুস্তক পবিচয । আঃ পুঃ তীর্থ দর্শনেব পঞ্চাশ বছব , সংকলন ও সম্পাদনা—শৈলেন চৌধুরী ।	অগ্রহাযণ ১৩৮৭
গোপাল হালদার	ববীন্দ্রনাথের মানবতা , পু মুঃ	পৌষ-মাঘ, ১৩৮৬
চিন্মোহন সেহানবীশ	পুস্তক পরিচয । আঃ পুঃ বন্দী হত্যা, বন্দী মুক্তি ও ববীন্দ্রনাথ দিলীপ মজুমদার ।	পৌষ, ১৩৮৫

। ববীন্দ্র সংগীত—আলোচনা ।

পুর্ণেন্দু পত্রী	গানেব ববীন্দ্রনাথ ঃ শঙ্খ ঘোষেব লেখা' এ আমির আবরণ' গ্রন্থের উপব আলোচনা ।	সমাঃ সং ১৩৮৭
শঙ্খ ঘোষ	কবে কোন গান—২ , প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায লিখিত "গীত বিতান	ঐ

	কালানুক্রমিক সূচী, ২য খঃ' গ্রন্থেব উপব আলোচনা।	
শান্তা সেন	ববীন্দ্রসঙ্গীত প্রদর্শনীঃ সংগঠক 'ইন্দিবা' ৮ই মে ১৯৭৭, কলকাতা তথ্যকেন্দ্র।	জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৪
সবোজ বন্দ্যোপাধ্যায	রবীন্দ্রগীতবাণীব চিত্রকল্প ঃ প্রকৃতি।	শারদীয ১৩৮৭
	। ববীন্দ্রকাব্য—আলোচনা।	
সুতপা ভটাচার্য	আত্মহনন থেকে আত্মোত্তবণ ঃ ববীন্দ্রনাথেব 'গীতালি'' কাব্যগ্রন্থেব উপব আলোচনা।	শ্রাবণ, ১৩৮৭
ঐ	'বাত কত হ'ল' ঃ শিশুতীর্থ কাব্যের উপব আলোচনা।	শাবদীয, ১৩৮৭
	। ববীন্দ্রনাটক—আলোচনা।	
সত্য ঘোষাল	বাঙলা নাটকে ববীন্দ্রনাথ ও 'বক্তকববী'	অগ্রহাযণ ১৩৮৩
	। ববীন্দ্র গল্প উপন্যাস আলোচনা।	
প্রশান্তকুমাব দাশগুপ্ত	গল্প-স্বল্প, পুস্তক পরিচয। আঃ পুঃ ববীন্দ্রনাথ ঠাকুরেব গল্প স্বল্প।	শ্রাবণ, ১৩৮৭
	। ববীন্দ্রজীবনী।	
গোপাল হালদাব	ইট ওযাজ হিজ সিটি ঃ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড দৈনিক পত্রিকায লিখিত সম্পাদকীয , পুঃ মুঃ	পৌষ-মাঘ, ১৩৮৬

———

চেতনা সম্পর্কে অনুসন্ধান

সুজয় ঠাকুর

বহু কালেব ইতিহাসে, মানুষেব শত শত প্রজন্ম কালীন বিশ্বাস, যে, আমাব চেতনা, আমার নানান ধরনেব ভাবাবেগ, আমার সুখ-দুঃখ বোধ, বিশ্বেব সমস্ত অন্য কিছু থেকে বিশেষ ভাবে আলাদা। এটা বাস্তবিক আশ্চর্য জনক যে 'আমি' বলতে যা কিছু তা কেবল আমাদের মস্তিষ্ক কোষগুলির সম্মিলিত কাজ। ফ্রান্সিস ক্রিকেব 'আশ্চর্য জনক প্রকল্প' বইটিতে তাই বলা হয়েছে। (The Astonishing Hypothesis The scientific Search for the Soul : Francis Crick : 1994 : Touch-stone Books).

বইটি 1994 সালে প্রকাশিত যা খুব পুরনো নয়। মনে হয় যথেষ্ট সমসাময়িক ধারণা এতে পাওযা যাবে। এবং বইটির শেষে একটি বেশ বিস্তাবিত পুস্তক তালিকা দেওযা যা ইচ্ছুক পাঠককে গভীবতব অধ্যয়নে সাহায্য কববে।

বইটি চেতনা বা সজ্ঞানতার বহস্য সম্পর্কে লেখক বলেছেন চেতনার পবিভাষা দেওয়াব চেষ্টা উনি কবেন নি। সমস্যাটি শক্ত এবং কোন শক্ত সমস্যাব সমাধান কথাব মানে নিযে তর্ক কবে হয় না। যে যেভাবে বোঝে সেভাবে বুঝে কাজ কবতে হয। কিছু ব্যক্তিগত ভাল লাগা ধারণা, যা পরে ভুল প্রমাণিত হতে পাবে, ধবে নিয়ে এগতে হবে, তবে নিজেকে সংশোধন কবতে হতে পাবে তার জন্য ববাবর প্রস্তুত থেকে।

মনেব বিষযে জানা অসম্ভব তা ধবে বসে থাকা উচিৎ নয। বিজ্ঞানেব ইতিহাস বহুবাব দেখিযেছে, যা মনে হত জানা অসম্ভব, তা জানা গেছে।

লঘুকবণ বাদ : (লঘুকবণবাদ), প্রধাণ প্রণালী যা পদার্থ বিদ্যা, বসাযন এবং আণবিক জীববিদ্যাব অগ্রগতিতে ব্যবহাব করা হয়েছে। অথাৎ কোন জটিল তন্ত্রকে তার অংশ সমূহেব গুণাগুণ ও সেগুলোর এক অন্যেব উপব প্রভাব অধ্যযন কবে পবীক্ষা কবা হযেছে। ক্রিকের মতে এই লঘুকবণ বাদেব পথই এমন সুবুদ্ধিপূর্ণ পথ যা অনুসবন করে চলতে হবে যতক্ষণ না কোন পবীক্ষা-মূলক যুক্তি বলে যে এ প্রণালী পরিবর্তন কবা দরকাব। যে গঠনতন্ত্রে একাধিক স্তর বা শ্রেণী আছে সেখানে লঘুকরণ বাদের পন্থা একেব

পর এক কয়েকবার ব্যবহার করতে হতে পারে।

স্তর বা শ্রেণী বা উঁচু-নীচু কাঠামো কিন্তু কোন চরম প্রাকৃতিক জিনিষ নয়, মানুষের তৈরি বিভাজন। বিজ্ঞানের বিবর্তনে এরকম বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে সেটা আগে সঠিক স্তর-বিন্যাস মনে হত পরে তা পরিবর্তন করতে হয়েছে।

স্নায়ু কোষীয় সহগ ঃ চেতনার বিভিন্ন ধরণ (বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়া, সংবেদন, চিন্তা বা কার্য) বোঝার জন্যে সেগুলোর সঙ্গে কোন্ কোন্ স্নায়ুকোষ নিকটভাবে জড়িত তা জানা দরকার। বলা হয় সেগুলোর 'স্নায়ুকোষীয় সহগ' (Neural correlates) জানা দরকার।

স্বাধীন সঙ্কল্প ঃ স্বাধীন সঙ্কল্প (Free will) এর ধারণাকে লেখক অভিনব, আলাদা কিছু মনে করেন না। বলেন এ বিষয়টিকেও বিভিন্ন মস্তিকাংশের গুণাগুণ এবং আন্তঃ প্রভাব হিসেবেই অধ্যয়ন করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে সম্ভবত নির্ধারক নিয়ম থাকা সত্ত্বেও আরম্ভিক অবস্থার প্রতি অতি-সংবেদন জনিত ভবিষ্যৎ কথন অসমর্থতা (deterministic chaos) এখানে কাজ করে।

মস্তিষ্ক অধ্যয়নের সাধারণ কথা ঃ কোন প্রাকৃতিক গঠনতন্ত্র, প্রাণী বা প্রাণীর অঙ্গ, নিখুঁত ভাবে সর্বোত্তম নির্মাণ নয় কারণ তা পূর্ব পরিকল্পিত সৃষ্টি নয়। মস্তিষ্ক সম্বন্ধেও এ কথা খাটে।

মস্তিষ্কের অনেকগুণ এমন যা সমগ্রের অংশগুলোর যোগফল মাত্র নয় বরং সেগুলোর এক অন্যের প্রতি প্রভাবের উপর জটিলভাবে নির্ভর (emergent)।

ক্রিয়াবাদী বিজ্ঞানীরা (functionalists)। মস্তিষ্কদ্বারা প্রক্রিয়াকৃত তথ্যকে কেবল অধ্যয়ন করেন, তার স্নায়ু কোষগত বিশদ বর্ণনকে অগ্রাহ্য কোরে। এ দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু অসম্পূর্ণ। প্রাথমিক উচ্চতর-স্তর বিবরণ গুলোকে বিশদ স্নায়ুকোষীয় তথ্যদ্বারা কোষীয় এবং আণবিক স্তরে (in cellular and molecular levls) যাচাই করা দরকার।

চেতনার অধ্যয়ন ঃ লেখক, ও তাঁর চেতনা-বিষয়ক কাজের সহকর্মী ক্রিস্টফ কখ্, মনে করেন কোন একই ধরনের বা কতগুলি একই ধরনের স্নায়ু কোষীয় ক্রিয়ার উপর চেতনার বিভিন্ন অবয়ব ভিত্তি করা। কেবল দৃষ্টিগত সচেতনতা ছাড়া চেতনার অন্য ধরন এখন বিচার্য ধরা হচ্ছে না।

বর্তমানে এটা জানা, কেমন ভাবে মস্তিষ্কের দৃষ্টি সম্পর্কিত অংশ দৃষ্টি-

ক্ষেত্র (visual field) কে বিভিন্ন অংশে ভেঙে ফেলে। কিন্তু এটা আমরা এখনো জানিনা কেমন কোরে মস্তিষ্ক এগুলিকে পুনর্বার সংযুক্ত করে এমন উচ্চস্তরে সংগঠিত এবং যেমন দরকার তেমন মনযোগ (attention) সংবলিত দৃশ্য উপস্থাপিত করে। আমাদের আগেকার এবং বহু আগেকার পূর্ব পুরুষদের অভিজ্ঞতা বংশাণু (gene) গুলোতে নিহিত। এগুলোকে এবং নিজের জীবন কালের অভিজ্ঞতা ব্যবহার কোরে মস্তিষ্ক দৃশ্য-নির্মাণ করে। চক্ষু-ইন্দ্রিয় অপ্রত্যক্ষ (implicit) তথ্য মাত্র দেয়। এই তথ্যকে ব্যক্তভাবে প্রকাশ করে পরবর্তী ব্যাপক ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

মন সংযোগ সম্বন্ধে লেখক বলেছেন, যে সব ঘটনাতে মন সংযোগ নেই সেগুলি মস্তিষ্ক ছেঁকে দিচ্ছে বটে কিন্তু কোনো একটা স্তরে সেগুলো গ্রথিতও হচ্ছে। এবং মন সংযোগের সব রকম ধরনেতেই ইচ্ছাকৃত এবং অনৈচ্ছিক দুরকম উপাদান থাকা সম্ভব।

যখন কোনো কিছুকে মনে করার কাজ চলে সংশ্লিষ্ট স্নায়ু কোষগুলি মাথার কোনো জায়গাতে সরাসরি কাজ করে। অনেক বেশী সংখ্যক স্মৃতি অস্ফুট ভাবে সঞ্চিত থাকে এবং সামান্য উদ্দীপনা মাত্রে পুনরুৎপাদিত হতে পারে। স্মৃতিগুলি নিহিত হয় স্নায়ুকোষগুলির সংযোগস্থল (synapse) গুলিতে পরিবর্তন এবং অন্যান্য পরিমাত্রাতে পরিবর্তনের দ্বারা। মস্তিষ্কে ক্ষতিগ্রস্ত রুগীদের নিরীক্ষা থেকে মনে হয় যে স্বল্প-স্থায়ী স্মৃতিই চেতনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

<u>কিছু সাধারণ তথ্য</u>ঃ প্রান্তস্থ স্নায়ুকোষ, যে গুলি সরাসরি বহির্জৎ বা বিভিন্ন শরীরাংশের সাথে সঙ্কেত বিনিময় করে, সমগ্র স্নায়ুকোষ সংখ্যার খুব ছোট ভগ্নাংশ। স্নায়ুকোষগুলির বেশীর ভাগ, স্নায়ুতন্তের ভিতরে প্রক্রিয়াশীল। আমাদের মস্তিষ্কের প্রায় চল্লিশ শতাংশ বিভিন্ন কোষের মধ্যে যোজক গুলিতে ঠাসা।

যদিও গুরু মস্তিষ্কের বহিঃস্তরের নব-আস্তরণে (Neo cortex-এ) বা প্রধান অংশে, উচ্চ মানসিক ক্রিয়াগুলি সম্পর্কে কিছু স্থানীয়করণ আছে। তবে অনেকগুলি আলাদা বহিস্তরীয় অংশ কাজ করলে তবেই বেশীর ভাগ মানসিক ক্রিয়া হয়। মস্তিষ্কের চিত্র সম্পূর্ণ পরিষ্কার নয় তবে এটা নিঃসন্দেহ কয়েক বছর আগেও যতটা ছিল এখন তার বেশী।

যদিও স্নায়ুকোষ গুলি বিভিন্ন ধরনের তবে সব গুলির গঠন একই

সাধাবণ কাঠামোব উপর ভিত্তি কবা। অন্য কোষেব মতন স্নাযু কোষেবও বংশাণুগুলি ডি. এন. এ দিযে গঠিত, এবং ক্রোমোজোমেব রূপে গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে, কোষেব কেন্দ্রকেব মধ্যে অবস্থান কবে। সব বংশাণু প্রত্যেক কোষে কার্যবত হয না। একটি স্নাযুকোষ বহু অন্য স্নাযুকোষ থেকে বৈদ্যুতিক স্পন্দন রূপে তথ্য পায। সে স্পন্দন গুলিব জটিল যোগ তৈবি হযে এটি আবাব বহু অন্য স্নাযুকোষকে বৈদ্যুতিক স্পন্দন পাঠায। কোষেব দেহ নির্গত হযে এই বৈদ্যুতিক স্পন্দন স্নাযুতন্তু (axon) বেযে অন্য স্নাযু-কোষে যায। একটি স্নাযু কোষের শাখা (dendrite) ও স্নাযুতন্তু মস্তিষ্কেব বেশ কযেক স্তব অবধি প্রসাবিত থাকতে পাবে। স্নাযুতন্তুতে বাহিত বৈদ্যুতিক প্রভাব বিদ্যুতাবিষ্ট অণু দ্বাবা।

বিভিন্ন স্নাযু কোষেব সংযোগ স্থল একটি সাধারণ বৈদ্যুতিক যোজনেব মত নয। সংযোগ স্থলেব মধ্যে থাকা ছোট ফাঁকেব এপাব-ওপাব ব্যাপ্তাযিত (diffused) হযে কতগুলি ক্ষুদ্র বাসাযনিক কণিকা পববর্তি স্নাযুকোষে বৈদ্যুতিক বিভব (potential) পবিবর্তিত কবে। এই প্রেবণ প্রক্রিযা বাসাযনিক হবাব একটা গুরুত্বপূর্ণ ফল হল যে বিশেষভাবে তৈবি কবা বিভিন্ন বাসাযনিক পদার্থ, ভ্রম-উৎপাদন কাবক হিসেবে কিংবা চিকিৎসাব জন্য প্রযোজ্য ঔষধ হিসেবে ব্যবহার্য।

স্নাযুকোষ গুলিব কার্যপ্রক্রিযা জানাব জন্য জীবন্ত মানব মস্তিষ্কেব উপবও যে পবীক্ষা-নিবীক্ষা দবকাব তাব জন্য কেবল প্রযুক্তিগতই নয ববং প্রায নীতিগত সমস্যাবলীও সামনে এসে পড়ে।

অক্ষিপট (retina), কেবল মাত্র কাঁচা তথ্য প্রেবণ কিন্তু করে না ববং তথ্যকে কিছুটা প্রক্রিযা অনন্তব রূপান্তবিত কবে পাঠাযে। এটাকে মস্তিষ্কেব ছোট অংশ বলা চলে এবং নব-আস্তবণ (Neo-cortex) অধ্যযন কবাব চেযে অক্ষিপট অধ্যযন সহজতব।

স্নাযবীয জালিকা : পৃঃ ১৫৬ তে শ্রেষ্ঠ স্তন্যপাযী প্রাণীবর্গ (primates) এব মস্তিষ্কেব যোজন গুলিব বর্তনী চিত্র দেওযা হযেছে। এখানে প্রত্যেকটি লাইন একাধিক সংযোগেব প্রতীক এবং সঙ্কেত যে দুদিকেই যাচ্ছে আসছে তাব দ্যোতক।

অতি সবলীকৃত স্নাযুকোষ জাতীয় কিছু একককে বিশেষ ভাবে যোজন কবে তৈবি কবা সমাবেশকে স্নায়কীয় জালিকা (neural network)

বলা হয়। এগুলোকে স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন ভাগেব আদল তৈবি, কাজে লাগা বস্তু নির্মাণ এবং মস্তিষ্ক কার্যেব নানান তত্ত্ব পবীক্ষা কবাব জন্যে ব্যবহাব কবা হয়।

একটি বিশেষ এ ধবণেব জালিকা, হফ্‌ফীল্ড জালিকা, শেখা জিনিসকে পুনবুৎপাদিত করাব প্রক্রিয়াব নকল কবতে পাবে। একটা চমৎকাব প্রদর্শন সেজনস্কি ও বোজেনবার্গ ১৯৮৭ সালে দিয়েছেন যেখানে তাঁদেব জালিকা (Net talk), লিখিত ইংবাজি থেকে কথ্য ইংবাজি উৎপন্ন কবলে শিক্ষা প্রক্রিয়াব নানান গুণাগুণ এই জালিকা দ্বাবা পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

অনেক স্নায়ুকোষ জাতীয় জালিকাতে হোলোগ্রাম (Hologram)এব কিছু গুণ আছে। এ গুলোও পুবো চিত্রটিকে একটি অংশ দ্বাবা পুনবৎপাদিত কবতে পাবে এবং একই সাথে কয়েকটি চিত্র ধরে বাখতে পাবে। তবে বিশদ গাণিতিক বিশ্লেষণ দেখিয়েছে যে এবকম জালিকা এবং হোলোগ্রাম গাণিতিক বুপে ভিন্ন। তা ছাড়া মস্তিষ্কের মধ্যে হোলোগ্রাফ জাতীয় কোন কিছুব চিহ্ন নেই।

কতকগুলি স্পষ্ট আলাদা ধবনের জালিকা ঠিক একবকম গুণ প্রকাশ কবেছে। মস্তিষ্কেব যে অংশ বিবেচনা কবা হচ্ছে সেখানকার আসল স্নায়ুকোষ এবং অণু অধ্যয়ন কবে পাওয়া তথ্য ছাড়া সেগুলিব মধ্যে কোনটা বাস্তবেব সঙ্গে বেশী মেলে তা স্থিব কবা সম্ভব নয়।

পবিগণকেব সঙ্গে তুলনা ঃ স্নায়ুকোষ গুলিব জটিল যোজনেব ফলে সমগ্র স্নায়ুতন্তুটি অসমানুপাতিক (Non-livear) হয়ে দাঁড়ায়। অর্থাৎ প্রান্তিক ফল প্রবিষ্ট পবিমাণগুলিব উপব সবল পাটিগণিতেব নিয়ম অনুযায়ী নির্ভব কবে না। পবিগণক (Computer) এব সঙ্গে মস্তিষ্ক মেলে বটে তবে তুলনাটা খুব বেশীদূব নিয়ে গেলে নানান অবাস্তব তত্ত্বেব জন্ম হয়। সাধাবণও পবিগণকেব কার্য অনুক্রমিক (Serial), অর্থাৎ একটাব পব আবেকটা। মস্তিষ্কেব কাজ কিন্তু প্রচণ্ডভাবে সমান্তবাল অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি কার্যরত। (প্রায় দশলক্ষ স্নায়ুতন্ত্র প্রতি চোখ থেকে মস্তিষ্কে তথ্য প্রেবণ কবে। এই জন্যেই কয়েকটি স্নায়ুকোষ নষ্ট হলে মস্তিষ্ক কর্মে তফাৎ হয় না।

আলোচকেব মনে হয় কৃত্রিম-বুদ্ধি-কার্যেব (of A. I. work) প্রধান ঝোঁক প্রাকৃতিক মস্তিষ্ক কার্যাবলী অধ্যয়নেব দিকেই হওয়া উচিৎ কৃত্রিম মানব তৈরি করাব দিকে নয় বলা নিষ্প্রয়োজন। একই বিজ্ঞানকে মানুষেব কল্যাণে বা অকল্যাণে, দুভাবেই ব্যবহাব কবা সম্ভব। পাছে অকল্যাণে

ব্যবহৃত হয বলে বিজ্ঞান প্রগতিকে বন্ধ করলে সভ্যতার প্রগতিকেও রুদ্ধ কবা হবে। প্রধান দরকাব হল সমগ্র মানব সমাজেব প্রতি মমত্ববোধ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি বিদ, রাজনৈতিক কর্মী, সবকাবী কর্মচাবী সবাব। আইন কবে অন্তত বিজ্ঞান দুর্প্রযোগ সমস্যাব সমাধান হবে না। তবে আশার কথা হল দুর্প্রযগেব বিরুদ্ধে চেষ্টা এবং লডাই করাব লোকেরও অভাব হবে না কাবণ প্রকৃত বুদ্ধিমত্তা সুবুদ্ধিব দিকেই চালিত কবে।

<u>বন্ধন সমস্যা ঃ</u> লেখক বলেছেন দেখা একটি অনেকাংশে সমান্তবাল প্রক্রিযা কিন্তু সর্বোপরি একটি মনোযোগীয় (Attentional)" প্রক্রিযা আছে যেটি অনুক্রমিক। সমস্তটার সঙ্গে একটি অর্কেস্ট্রাব তুলনা দেওযা যেতে পাবে। কনডাক্টাব সব আলাদা আলাদা বাদকদেব সমান্তবাল কাজের অনুক্রমিক নির্দেশনা বত।

একটা বিশেষ মুহূর্তে দৃষ্টি ক্ষেত্রের কোন একটি বিশেষ বস্তুব সঙ্গে সংশ্লিষ্টর আকার বঙ গতি ও অন্য ইন্দ্রিযগ্রাহ্য গন্ধ, স্পর্শ এবং এ ছাডা বিগত অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত স্মৃতি আছে। এই সমস্ত বিভিন্ন সংকেতকে এক সঙ্গে সংগঠিত করা (অর্থাৎ অনেকগুলি স্নাযুকোষেব একটি একক হিসেবে কাজ কবা) কে সচবাচব "বন্ধন সমস্যা (binding problem) বলা হয।

<u>মন্তব্য ঃ</u> লেখক স্বীকাব করেন যে যদিও বহু সম্ভাব্য বিদ্যাব ধারা ও কবণীয পবীক্ষা-নিবীক্ষা আছে তবে কোন বিশেষ বিচার-শৃঙ্খলকে বেছে নেওযাব মত সাক্ষ্য এখনো পাওয়া যায নি। গবেষণাব সম্মুখ ক্ষেত্রে চলা প্রায ঘন বনে পথ হাঁতডানোর মত বিডম্বনাময চলা। উনি বলেছেন আমাদেব উদ্দেশ্য মস্তিষ্কেব সব রকম আচবণ ব্যাখ্যা কবা যাব মধ্যে আছে সঙ্গীত সম্পর্কিত অন্য শিল্প কলা সম্পর্কিত, অতীন্দ্রিযবাদ সম্পর্কিত, গণিতচর্চা সম্পর্কিত, উপলব্ধি এবং স্বজ্ঞান (intuition), সৃষ্টিকার্য, সৌন্দর্যোপলব্ধি। যদি এখনই চেষ্টা আবম্ভ করা যায তা হলে একবিংশ শতাব্দিতে নিশ্চয সাফল্য পাওযা যাবে।

———

রবীন্দ্রচর্চার নতুন দিক

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বহু বই লেখা হয়েছে, এখনও লেখা হচ্ছে। খুব ছাত্রপাঠ্য না হলে সেই সব আলোচনা বই থেকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে নানা কথা জানা যায়, কিন্তু সব বই সমান মানের হয় না। এ রকম অজস্র বইয়ের মধ্যে দু-একটা হাতের কাছে এলে নড়ে চড়ে উঠতে হয়। জ্যোতির্ময় ঘোষ প্রণীত 'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ' তেমন একটি বই। বইয়ের নাম দেখে কিছুতেই আঁচ করা যায় না বইটির বিষয় কি হবে। কিন্তু একবার পড়তে শুরু করলে বইটির প্রথম প্রশ্নবোধক বাক্য "আপনি কি উপন্যাস পড়েন?" জানিয়ে দেয় বইটির বিষয় কি হতে চলেছে, আর তাঁর বলার বা লেখার ভঙ্গিটি কোনো বাধা তৈরী না করে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে নিয়ে যায় বিষয়ের মুখে, মুখ পেরিয়ে খোদ বিষয়ের মধ্যে। 'চোখের বালি'-র সূচনায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন,"…'চোখের বালি' উপন্যাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। সাহিত্যের নব পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো।" জ্যোতির্ময় ঘোষ সঠিক ভাবে বলেছেন এটি 'চোখের বালি' লেখার প্রায় চল্লিশ বছর পর রবীন্দ্রনাথের ফিরে দেখা, "তখনই 'চোখের বালি' স্বকৃত মূল্যায়নে তাঁর পক্ষে বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন বহুলাংশে সম্ভব হতে পারল।" কিন্তু এর পরই লেখক 'চোখের বালি' বাংলা সাহিত্যে আকস্মিক বা অভিনব কি না তা পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। জ্যোতির্ময় নানা লেখা ও চিঠিপত্র বিশ্লেষণ করে বলেন, "·চোখের বালিতে তদানীন্তন প্রচলিত উপন্যাসের ধরণে 'ঘটনা পরম্পরার বিবরণ' নেই তা নয়, যদিও বিশ্লেষণ করে, তাদের 'আঁতের কথা' বের করে দেখানোর চেষ্টাও লক্ষণীয়। এবং এই চেষ্টাও 'চোখের বালিতে'ই যে প্রথম হলো, তা-ও বলা পুরোপুরি সঙ্গত হয় না। কারণ, চেষ্টা তো প্রথমবধি অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই চলছিল। সেইজন্য, 'চোখের বালি'কে 'আকস্মিক' বললে পুরোপুরি ঠিক বলা চলে না।" এ-মন্তব্য সম্পর্কে আমরা একমত। আবার যখন বলেন "রবীন্দ্রনাথ তাঁর উত্তরসূরীদের দ্বারাও ভাবিত এবং প্রাণিত ও।" তখনও জ্যোতির্ময়

ঘোষ আলটপকা মন্তব্য কবেন না, তিনি দেখিযে দেন, খুব সংক্ষেপে যে "ববীন্দ্রনাথ উপন্যাস দুটিব জন্য যে সূচনা লিখে দিযেছিলেন, সেই সূচনা অংশগুলিতে এমন কোনো কোন মন্তব্য তিনি করেছেন, যেগুলিতে তাঁব উত্তবসূবী দেশী-বিদেশী কথাসাহিত্যিক ও সমালোচকদেব দৃষ্টিভঙ্গিব চমৎকাব আত্তীকরণ লক্ষণীয়।" এব সমর্থনে তিনি সুধীন্দ্রনাথেব দুটি এবং ধূর্জটি প্রসাদের 'অন্তঃশীলা'-ব একটি উক্তি উদ্ধাবও করেন।

ববীন্দ্রনাথ উপন্যাসে উপযুক্ত পুবুষ চরিত্র খুঁজছিলেন, কাবণ তিনি জানতেন "আমাদেব দেশে পুবুষেবা গৃহপালিত, মাতৃলালিত, পত্নীচালিত।" 'চোখেব বালি'-ব নাযক মহেন্দ্র তো তেমনই এক বঙ্গীয পুবুষ, বিনোদিনী-ব কাছে তাব পৌবুষ ম্লান হযে যায। 'বউঠাকুবাণীব হাট' উপন্যাসেব প্রতাপাদিত্য পৌবুষদীপ্ত হযে সে শেষপর্যন্ত যান্ত্রিক নির্মমতাব প্রতিচ্ছবি", তাকে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নাযক বলা যায না। জ্যোতির্ময ঘোষ ঠিকই বলেন, "কবুণা' থেকে 'নৌকাডুবি' পর্যন্ত ববীন্দ্র উপন্যাসের নাযকেরা 'পঞ্চভূত'-এব 'নবনাবী' বচনায় ববীন্দ্র ব্যাখ্যাও গতানুগতিক বঙ্গীয সন্তান, পৌবুষেব সঙ্গে যাবা নিঃসম্পর্কিত।" নাযকেব সন্ধানে ববীন্দ্রনাথকে অপেক্ষা কবতে হয 'গোবা' অব্দি। 'গোবা'-তে "নাযকচবিত্রে সমকালেব বড মাপেব কোন ব্যক্তিত্বেব সুস্পষ্ট প্রতিবিম্বন লক্ষিত হলো।" অনেকেব মতে এই বডমাপেব ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন বিবেকানন্দ, নিবেদিতা। কেউ মনে কবেন গোবাব চবিত্র পবিকল্পনায পাওযা যায ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায এবং বন্ধুবান্ধবের আদল "সমগ্র বাংলা আখ্যান সাহিত্যেও এই প্রথম কোনো বচয়িতা এমন একজন বা তিনজন বা নিজেকে নিযে এমনকী মোট চাবজন চোখে দেখা সমকালেব সমাজ ইতিহাসেব ব্যক্তি ও তাঁদেব ব্যক্তিত্ব মিশিয়ে একজন নাযককে সৃষ্টি কবলেন।" অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন গোবাব চবিত্র তাঁব মাথা থেকে বেবিযেছে, শ্রীযুক্তা হেমন্তবালাকে তিনি জানান, "গল্পটা ফোটোগ্রাফ নয। যা দেখেছি যা জেনেছি তা যতক্ষণ না মরে গিযে ভূত হয, একটাব সঙ্গে আরেকটা মিশে গিযে পাঁচটায মিশে দ্বিতীযবাব পঞ্চত্ব পায, ততক্ষণ গল্পে তাদেব স্থান হয না।" তবু প্রশ্ন ওঠে 'চাব অধ্যায' রচনাব সময ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যাযেব স্মৃতি কি কোন ভাবে প্রেবণা জাগায নি তাঁব মনে? আব অশ্চর্যেব ব্যাপাব 'চাব অধ্যায'-এব পব ববীন্দ্রনাথ তেমন কোন উপন্যাস লেখেননি আব হযত বাস্তবে তিনি খুঁজে পান নি তেমন নাযককে। এসবেব বাইবে আলোচ্য বইযে রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, নিবেদিতাব সম্পর্ক বিষয়ক আলোচনাটি

পাঠক-কে নানাভাবে সমৃদ্ধ কবে। এই প্রসঙ্গে বোমা বঁলাব কথা এসে পড়ে। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ববীন্দ্রনাথেব অনীহা লক্ষ্য কবে বঁলা ব্যথিত হয়েছিলেন, জ্যোতির্ময় ঘোষ লেখেন, "বিবেকানন্দব সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব সম্পর্কটি মনস্তাত্ত্বিক পবিভাষায় Love hate reletionship যদি বলা যায়, খুব বেশি ভুল বলে মনে হয় না।" এ অধ্যায়টি সুবিস্তৃত এবং আকর্ষণীয়ও বটে।

'নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ' ভিড়ে হাবিযে যাওয়াব মত বই নয়। যাঁবা বাংলা উপন্যাস নিযে আলোচনা করবেন, ববীন্দ্র-উপন্যাসেব তাৎপর্য সন্ধানে মগ্ন হবেন, তাঁদের কাছে এটি একটি মূল্যবান বই বলে বিবেচিত হবে। ভাষাব স্বাচ্ছন্দ্যে, যুক্তি ও বিশ্লেষণেব শাণিত প্রয়োগে বইটির উপস্থাপনায় এক নতুন মাত্রা আসে। বইটি ঘিরে বিতর্কও সৃষ্টি হতে পাবে, আব যে সমালোচক বিতর্ক সৃষ্টি করতে পাবেন, তাঁকে প্রশংসা কবা ছাড়া উপায় থাকে না আমাদেব। রবীন্দ্রনাথ নায়কেব সন্ধানে বেবিয়ে পড়েছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু লেখক জ্যোতির্ময় ঘোষ নিজস্ব যুক্তি ও ভঙ্গিতে এক আখ্যান বচনা করেন, যা উপন্যাসেব মতই জীবনের তাৎপর্য সন্ধানী, এবং তিনি আমাদেবও সহযাত্রী কবে নেন তাঁব এই অনুসন্ধানে। এখানেই বইটি আকর্ষক হয়ে ওঠে পাঠকেব কাছে।

কার্তিক লাহিড়ী

"নাযকের সন্ধানে ববীন্দ্রনাথ" জ্যোতির্ময় ঘোষ

। ত্রিদীপ প্রকাশনী। সত্তব টাকা

বেলা অবেলার গান

গ্রন্থটি তিনটি বিভাগ ও মোট তেবটি প্রবন্ধে বিধৃত। আমবা বিষয় বৈচিত্রেব জন্য প্রবন্ধকযটি যথাক্রমে আলোচনা কববাব প্রযাস কববো।

ক. প্রাক—রবীন্দ্রসঙ্গীত

১। মার্গ সঙ্গীতেব উৎপত্তি ও বিবর্তন

প্রবন্ধটি একটি পাণ্ডুলিপিব সমালোচনা। প্রবন্ধকাব জানেন না পাণ্ডুলিপিটি ইতিমধ্যে গ্রন্থাকাবে প্রকাশিত হযেছে কিনা। যদি আদৌ তা না হয়ে থাকে, এবং সেটাই সম্ভব, তবে বিষযটি নিতান্তই সেই পাণ্ডুলিপিব বচয়িতা ও প্রবন্ধকাবেব মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আলোচ্য প্রবন্ধের পাঠকদের সেই পাণ্ডুলিপিটি পাঠ করবাব সুযোগ না থাকায সমগ্র বিষযটি তলিযে বোঝবাব সুযোগ নেই।

প্রবন্ধকাব গ্রন্থকাবের (পাণ্ডুলিপি বচযিতাব) বক্তব্যকে সংক্ষিপ্ত কবেছেন এবং পাঠকবর্গকে আশ্বস্ত কবেছেন যে সে বক্তব্যকে তিনি অন্তত জ্ঞাতসাবে বিকৃত কবেন নি। পাঠক হিসেবে এতে আশ্বস্ত না হয় হওযা গেল কিন্তু এই সংক্ষেপীকবণেব মধ্য দিযে পাণ্ডুলিপিধৃত সেই 'মার্গসংগীতেব উৎপত্তি ও বিবর্তনেব' মত একটি দুঃসাধ্য গবেষণাব অনুবর্তী হওযা সম্ভব হবে কি ?

লেখক নিজেও পাণ্ডুলিপি বচযিতার সিদ্ধান্তকে তাঁব 'জ্ঞানবুদ্ধিমতে অভিনব' বলে মন্তব্য কবেছেন। লেখকেব এ মন্তব্য ব্যঙ্গোক্তি কিনা আমরা জানি না। যদি তাই হয তবে লেখক কী উদ্দেশ্যে এ নিয়ে এতখানি শক্তি ব্যয কবলেন তা বোঝা গেল না।

যাই হোক, এ বিষযে আমাদেব মতামত উহ্য রাখাটাই আমরা সমীচীন বোধ করলাম।

২। লোক সঙ্গীতের ব্যবহার

হেমাঙ্গ বিশ্বাসেব 'লোকসংগীত সমীক্ষা : বাংলা ও আসাম' বইটিব 'একটি বিশেষ মত সম্পর্কে বিশেষ মন্তব্য' নিবেদনেব উদ্দেশ্য নিযে প্রবন্ধটিব অবতাবণা।

প্রবন্ধকাব লিখেছেন 'হেমাঙ্গ বাবু এদেশেব সংগীতশাস্ত্রীদেব আহ্বান জানিযেছেন জনতাব দববাবে যেতে।' শ্রীবিশ্বাসের এই উক্তিব পবিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধকার কতকগুলি প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রস্তাবগুলি যুক্তিযুক্ত।

এবপব 'বর্তমান ও ভবিষ্যতের শিল্পপ্রযাসে তাব (লোকসংগীতেব) প্রযোগ ও ব্যবহারের সম্ভাবনার দিক' আলোচনা কবতে গিযে হেমাঙ্গবাবু

বলেছেন (প্রবন্ধে উল্লেখ) এ কাজের দায়িত্ব নিতে পারেন লোকসংগীতের শিল্পীরাই, অন্য কেউ নয়।' প্রবন্ধকার প্রশ্ন তুলেছেন, 'সেক্ষেত্রে সংগীত শাস্ত্রীদের দায়িত্ব কোথায় ? আমাদেরই বা কর্তব্য কি ? আমরা কি কেবল নীরব শ্রোতা ?'

এখানে 'আমাদেরই' বলতে প্রবন্ধকার বোধ হয় শ্রোতাসাধারণের কথাই উল্লেখ করেছেন। তা যদি হয় তো আমাদের বক্তব্য হোল—শ্রোতা হিসেবে শ্রবণ করাটাই আমাদের প্রাথমিক কর্তব্য। তবে নীরব শ্রোতা না হয়ে আমরা নিশ্চয় সোচ্চারও হতে পারি, পালন করতে পারি গ্রহণ ও বর্জনের দায়িত্ব। বস্তুত শ্রোতাই শিল্পোৎকর্ষ বিচারের কষ্টিপাথর।

হেমাঙ্গবাবু প্রথমে সংগীতশাস্ত্রীদের আহ্বান জানালেও পরে লোকসংগীত শিল্পীদের কাঁধেই এ দায়িত্ব অর্পণ করতে চেয়েছেন। আমরা তাঁর এই মতের বিশেষ পক্ষপাতী। 'লোকসংগীতের প্রয়োগ বা ব্যবহারের সম্ভাবনার দিকে' সংগীতশাস্ত্রীদের বিশেষ দায়িত্ব আছে বলে আমরাও মনে করি না। এ কাজ সৃজনশীল শিল্পীদের।

গ্রন্থকার আবার একই সঙ্গে প্রশ্ন তুলেছেন, 'আমাদের হৃতমান আধুনিক সংগীতের সম্ভাব্য পুনরুজ্জীবনের কর্মকাণ্ডে লোকসংগীত আমাদের কোন কাজে লাগবে ?' আমাদের প্রশ্ন, ওটা (আধুনিক সংগীতের সম্ভাব্য পুনরুজ্জীবন) কি লোকসংগীতের একটা কাজ ? লোকসংগীত যিনি কাজে লাগাবেন (যেমন রবীন্দ্রনাথ লাগিয়েছেন) দায়টা তাঁর, লোকসংগীতের নয়।

পরিশেষে সংগীতে চারস্বর বা ততোধিক স্বরের প্রয়োগ সম্পর্কে যে সকল বিতর্ক তোলা হয়েছে সে বিষয়ে আমাদের সংক্ষিপ্ত মতামত হোল, লোক-সংগীতের ক্ষেত্রে চতুঃস্বর বা তদূর্ধ্বস্বরের প্রয়োগ আছে, থাকবেও। তবে চতুঃস্বারিক সুরকে অন্তত এই মুহূর্তে সরাসরি 'শাস্ত্রের' (অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সংগীতের) অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। প্রবন্ধলেখক নিজেই প্রশ্ন করেছেন, 'এতে কি সুরবিহারের সুযোগ সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে ?' আমাদের উত্তর, ঠিক তাই। তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন—'এ নিয়ে কি কোনো পরীক্ষা হয়েছে ?' আমাদের জবাব, পরীক্ষা নিয়তই চলছে। কোনো এক গুণী সৃজনশীল শিল্পী যদি কোনো একদিন একটি চতুঃস্বারিক সার্থক ও সফল রাগ নির্মাণ করে আমাদের উপহার দেন—সেইদিনই শুধু এই পরীক্ষার 'চূড়ান্ত' হয়েছে বলা যাবে, তার আগে নয়।

প্রবন্ধকার বলেছেন, 'শাস্ত্রের (অর্থাৎ শাস্ত্রীয় সংগীতের) পরিধি সমস্ত ধরনের দেশী সুরকে ধারণ করার মত প্রশান্ত হবে না কেন ?' আমরা বলি, ধারণ করেই আছে। শাস্ত্রীয়সংগীতের স্বরমণ্ডলী অগ্রাহ্য করে মৌলসুর রচনা সেইজন্যই এত কঠিন। রবীন্দ্রনাথও একথা স্বীকার করেছেন। খাঁচাটা

এড়ানো গেলেও বাসাটা তারই বজায় থাকে—এ তাঁরই উক্তি।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, প্রবন্ধকার শাস্ত্রীয়সংগীত বোঝাতে মার্গসংগীত কথাটা ব্যবহার করেছেন। আরো অনেকেই করেন, দেখেছি। আমাদের মতে এটি পরিহার করলেই ভালো হয়—কারণ 'গন্ধর্বসংগীত বা মার্গসংগীত' বলে এক সংগীতধারা প্রচলিত ছিল বলে মনে করা হয়। সে সংগীত এখন লুপ্ত এবং তার স্বরূপও অজ্ঞাত।

৩। রামনিধি গুপ্ত ও বাংলা গানের ঐতিহ্য।

স্বল্পপরিসরে লিখিত অতি চমৎকার একটি সুখপাঠ্য রচনা। তথ্য ও মূল্যবান মতামতের জন্য প্রবন্ধকার বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

৪। বন্দেমাতরমের সুর।

তথ্যসমৃদ্ধ রচনা। এ বিষয়ে প্রবন্ধকারের উদ্যম বিশেষভাবে প্রশংসার যোগ্য। অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষকের কাছে তাঁর সংগৃহীত এইসব তথ্য যে বিশেষ আদৃত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৫। যদুভট্ট।

নিধুবাবু উত্তরকালে যতটা আলোচিত যদুভট্ট ততটাই বিস্মৃত। প্রবন্ধকার তমসায় আচ্ছাদিত সেই কিম্বদন্তী সংগীত নায়কের ওপরে যথাসাধ্য আলোকপাত করে আমাদের বিশেষ উপকার করেছেন। এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

(খ) রবীন্দ্র সঙ্গীত

৬। ব্রহ্মসংগীত ও রবীন্দ্রনাথ।

সমগ্র উনিশ শতকব্যাপী বঙ্গীয় পুনর্জাগরণের বিশাল প্রেক্ষাপটে আলোচিত একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা। বাংলা দেশের সংগীত ইতিহাসে ব্রহ্মসংগীতের উদ্ভব ও বিকাশের ধারাটি অতি সুচারু ভাবে আলোচিত হয়েছে। রবীন্দ্র-ব্রহ্মসংগীত পর্ব সম্পর্কে লেখকের মতামতগুলি বিশেষ মূল্যবান।

প্রবন্ধের উপসংহারে বলা হয়েছে, 'প্রাক-রবীন্দ্র ব্রহ্মসংগীত রবীন্দ্র প্রতিভারই এক অপরিহার্য পটভূমি। আর, রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব যে ব্রহ্মসংগীত সেটাও যে তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপের বিশেষ সহায়ক হয়েছিল সে বিষয়ে আর সন্দেহ কী!'

আমরা লেখকের সঙ্গে একমত।

৭। বাউল, রবীন্দ্রনাথ, আমরা।

প্রবন্ধটি রবীন্দ্রসংগীতের একটা বিশিষ্ট দিকের (বাউল অঙ্গ) একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাস। লেখকের বিচার, বিশ্লেষণ ও রসজ্ঞতা আমাদের মুগ্ধ করেছে।

৮। রবীন্দ্রনাথের গানে আধুনিকতা।

'আধুনিকতা'ব যে সংজ্ঞাই দেওয়া যাক আমাদেব তাতে বিশ্বাস নেই। আমবা 'প্রাগ্রসবতা' কথাটাব পক্ষপাতী, অবশ্য প্রচলিত রাজনৈতিক অর্থে নয়। 'ববীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ভাঙনে ও সৃষ্টিতে'—ধূর্জটিবাবুব এই মন্তব্যটি অত্যন্ত অর্থগর্ভ। 'ভুলতে ভুলতে' অর্থাৎ অস্বীকার করতে কবতে যাব সৃজনে তিনিই প্রাগ্রসব এবং সেই অর্থে 'আধুনিক'।

লেখকের বিশ্লেষণেব সঙ্গে আমাদেব দ্বিমত নেই।

৯। ববীন্দ্রনাথ ও ধূর্জটিপ্রসাদের সংগীত ভাবনা।

ববীন্দ্রনাথের সাথে ধূর্জটিবাবুব সাংগীতিক বিতর্ক এক উপভোগ্য বস্তু।

সমস্ত আর্টেব মত সংগীতেও থামতে জানাব ওপরে রবীন্দ্রনাথ যতই গুরুত্ব আবোপ কবুন, ধূর্জটিবাবু তাকে স্বীকাব কবেন না। 'নদী কি কখনো তার স্রোতের প্রাচুর্যে লজ্জিত হয়?' তাঁর এই মোক্ষম জবাবেব পর ববীন্দ্রনাথ কি জবাব দিয়েছিলেন আমাদের জানা নেই। আমাদেরও মত—গীতি কবিতায় থামাটা যতখানি জরুরী, মহাকাব্যে ততখানি নয়। ভাবতবর্ষের এক একটি বাগ এক একটি মহাকাব্য। থামার নিরিখে তাব বিচাব চলে না।

দুপক্ষেব এই আলাপচারি পুনর্লিখনেব জন্য লেখককে ধন্যবাদ।

১০। ববীন্দ্রনাথেব দুটি গান : একটি আলোচনা।

বাগপরিচয় থেকে সুরু কবে দুটি গানেব আদ্যন্ত সুদীর্ঘ স্বাবিক বিশ্লেষণ পাঠককে ক্লান্ত কবে তোলে। এ লেখা স্ববজ্ঞানসম্পন্ন সংগীতজ্ঞ পাঠকেব উদ্দেশ্যে বচিত বলে ধবে নিলে (অন্যথায় এতো অবণ্যে বোদন মাত্র) এই বিস্তাব অনাবশ্যক মনে হয়। আমবা অবশ্য এই সুবিস্তৃত বিশ্লেষণেব গুণগত মান নিবে কোনো প্রশ্ন তুলছি না। ববং লেখকেব সিদ্ধান্তেব সঙ্গে আমবা অনেকাংশে একমত।

তথাপি, 'প্রখব তপনতাপে' গানখানিব বিশ্লেষণ সম্পর্কে আমরা একটা কথা না বলে পারছি না। ভীমপলশ্রী ও মুলতান ভাব ও রসের দিক থেকে 'কগনেট' না হলেও এমনকি স্বরেব দিক থেকে বিভিন্ন হলেও, এই দুই বাগেব গঠন ও চলনে একটা সাদৃশ্যতা আছে। সেটা হযতো কাজে লেগে থাকবে। তবে আমাদেব মতে গানখানিতে ভীমপলশ্রী সামান্যই। কেবল গানেব মুখটি ছাড়া আর কোথাও তার অস্তিত্ব নেই। এতে ভৈববী আছে, হযতো কাফীও। মুলতানেব ক্লান্ত বিষন্ন সুরই এ গানে প্রাধান্য পেয়েছে। গানেব ভাবটিও তাই।

এ প্রসঙ্গে প্রকৃতি পর্যায়ের 'নাই রস নাই' গানখানি তুলনীয়। সে গানেও বার বার শুদ্ধ মধ্যম দিয়ে উত্থান আছে, (জ্রুমপনস) আবার ভৈরবীও স্পষ্টতর (দ্বিতীয় অন্তরায়)। তথাপি এ গানখানা যে মূলতানের সুরের ওপরে দাঁড়িয়ে আছে তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না।

(গ) দ্বিজেন্দ্রলাল ও অন্যান্য সংগীত।

১১। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান ও সাংগীতিক প্রতিভার মূল্যায়ন। লেখকের সঙ্গে আমাদের মতের অমিল নেই।

১২। আধুনিক গান।

সাধারণভাবে লেখকের সঙ্গে আমরা দ্বিমত পোষণ করি না। তবে 'তাই একটা প্রতিষ্ঠানগত প্রতিরোধ ব্যবস্থা বোধ হয় আজও অত্যন্ত জরুরী' —তাঁর এই মতের সঙ্গে আমরা সহমত পোষণ করি না। আমরা শ্রোতা ও কালের ওপরে এই ভার অর্পণ করতে চাই।

১৩। গণসংগীত ঃ সংগঠন শিল্পী শিল্প।

উল্লেখযোগ্য ইতিহাস চর্চা এবং ভালো বিশ্লেষণ। "পরাধীন ভারতের প্রগতিশীল নেতারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্যাসীবাদের বিপদ সম্পর্কে যতোটা সচেতন, দেশের পরাধীনতা সম্পর্কে ততটা অবহিত নন। রবীন্দ্রনাথের মতো দিগন্তবিস্তারী প্রতিভার মহত্ব উপলব্ধি করতে তাঁরা বার বার ব্যর্থ হয়েছেন।"

লেখকের উপরোক্ত মতের প্রথম অংশ সম্পর্কে আমরা সামান্য ভিন্নমত পোষণ করি। আমাদের ধারণা, সেই মুহূর্তে পৃথিবীতে সব চেয়ে বড় বিপদ ছিল ফ্যাসীবাদ। এ বিপদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী উপনিবেশিক শক্তিগুলি (বৃটেন, ফ্রান্স ইত্যাদি) বা সমাজবাদী রাশিয়ার পক্ষে যতখানি সত্য ছিল ঠিক ততখানিই সত্য ছিল মুক্তিকামী এশিয়া আফ্রিকার দেশ ও জনগণের কাছে। ঠিক সেই সময় জাতীয় মুক্তির প্রশ্নটির চেয়ে ফ্যাসিবাদের বিপদ সম্পর্কে অধিকতর সচেতনতাটাই ছিল ঐতিহাসিক। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে উক্তিটি বোধ হয় সত্য। অথচ কিমাশ্চর্য—রবীন্দ্রনাথ নিজে ওই কালে একজন পরম ফ্যাসীবিরোধী যোদ্ধা। অন্তিম দিনগুলিতেও তাঁর সেই সচেতনতা শ্লথ হয় নাই—এ কথা আমাদের অজানা নয়।

বইটি সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য মোটামুটি পেশ করা গেল। তবে এখানে বলে রাখা ভালো, আলোচ্য গ্রন্থটি কয়েকটি ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী গ্রন্থের সমালোচনা। সুতরাং বর্তমান লেখককে গ্রন্থ-সমালোচনার সমালোচন করতে হয়েছে। গ্রন্থকার যে গ্রন্থের সমালোচনা করেছেন বা যে সব

reference উদ্ধার করে আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন সেই সব গ্রন্থ বর্তমান সমালোচকেব নাগালের বাইরে। কাজেই স্বাভাবিক কারণেই এ আলোচনা হয়তো আংশিক বা একদেশদর্শী হয়ে থাকবে। অনিবার্য অজ্ঞতা প্রসূত কোনো অবিচার যদি ঘটে থাকে তবে সেটা মার্জনীয় হবে, এটাই ভরসা।

হরিপদ সোম

গানেব ভেলায বেলা অবেলায ঃ অনন্ত কুমাব চক্রবর্তী।

প্রাইমা পাব্‌লিকেশনস্‌ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

সেই কালো দিনগুলি

কোনও এক অখ্যাতনামা অল্পবযসী ব্যাঙ্গচিত্রীব আর্টওয়াক দেখে চমকে গিযেছিলাম। শ্রীলালকৃষ্ণ আদবানীব ফোটোগ্রাফ থেকে মুখেব কাটআউট তৈরী করা হয়েছে। সেটিকে সেঁটে নিযে তার ওপব চালানো হযেছে নানান কাবিগরি। সব চাইতে প্রথম চোখ পড়ে মিশকাল মুখেব ওপব ধবধবে সাদা গোঁফের প্রতি। সন্দেহ হয বজবঙ্গবলীব সঙ্গে একটা সাদৃশ্য জানবাব জন্য মুখটাকে অস্বাভাবিক কালো কবা হযেছে। টাক ও কপাল তুলির পোঁচে ঢেকে দেওয়া হযেছে পাট করা হিটলাবি টেৌবিতে। তাব বঙও ধবধবে সাদা। বিচিত্র মেকআপ সত্ত্বেও আদবানীজীকে চিনে নিতে একটুও দেবী হয না। গেরুয়া বং-এব গলাবন্ধ বেঁটে আচকানেব আস্তিনে ওঁ লেখা পট্টি মাবা। খাকি যোধপুর পাজামার ওপব ঘোড়া-বুট চাপিয়ে "মাইন ফুবাব"-এর ধড়া চুডোর সার্থক স্বদেশীকবণ করা হযেছে। কপালে বক্ত চন্দন দিযে বিশাল "ওঁ" লিখে তিলক কাটা। হাল ফ্যাশনের টি-শার্ট-এর কাযদায জামার বুক জুড়ে এক ছবি। হনুমান হাঁটু গেড়ে এসে বুক চিরে দেখাচ্ছেন ধনুকধারী রাজা রামকে। শ্রীরামদেব বামে সীতা কিন্তু অনুপস্থিত। ব্যাঙ্গ চিত্রেব নাযক অবিকল বামের দৃপ্ত ভঙ্গীমায় হাতে কি ধরে আছেন তা নিয়ে প্রথমে ধাঁধাঁ লাগে। একটু ঠাহর করলে বোঝা যায় বিশুদ্ধ ভারত নাট্যম-এব মুদ্রায় যে বস্তুটি অস্ফালন কবছেন সেটি তাঁর নিজের ল্যাজী লাঙ্গুল-শীর্ষে বিরাজমান "ভাগোয়া ঝাণ্ডা"।

আর এক আজব ঘটনা দেখেছিলাম শেক্সপিয়ব সবণী লাউডন স্ট্রিটের

মোড়ে। আধ ময়লা গেঞ্জি ও হেঁটো ধুতি পরা এক টিকিধারী সাদা সাহেব আর থ্রি-পিস স্যুট পরা মিশ কাল দিশী সাহেব মুখোমুখি দাঁডিযে। সাহেবেব মুখ শুকনো, বোধকবি নিবামিষ আহাবে। আর কাল সাহেব রুমাল দিয়ে তেল চুকচুকে টাকের ঘাম মুছছেন। সাচ্চা সাহেবেব প্রশ্ন শুনতে পাইনি। কিন্তু ভাবতে ইচ্ছে করে, ভাঙা ভাঙা বাংলায শুধোচ্ছেন 'ইস্কন মণ্ডিরটা কোঠায বল্‌টে পাবেন ?" কাল সাহেবেব বিশুদ্ধ বেঙ্গলী মিডিযাম ইয়াংকি উচ্চাবণে ওজস্বিনী উত্তব কানে এল," জাস্ট গো বাউণ্ড দ্য ব্লক এ্যাণ্ড অ্যাস্ক এনিবডি।

উপবোক্ত ঘটনা দুটি আলোচ্য বইগুলি পড়বার সময়ে বাব বাব আমার মনে পডছে।

KHAKI SHORTS AND SAFFRON FLAGS বইটি ৬ই ডিসেম্বব ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হওয়াব মুখে মুখে ছাপা হয। অবশ্য প্রকাশ লাভ কবে তাব অনতিকাল পডে ১৯৯৩ সালে। লেখকবা নিজেদেব বিষযে বলেছেন যে তাঁবা হচ্ছেন "a group of visibly westernised secular people"। প্রথম পাতাব পরিচিতি থেকে জানতে পাবি তাঁবা ইংবিজি ও ইতিহাস-এব অধ্যাপনা করেন এবং দিল্লী বিশ্ব-বিদ্যালযেব সঙ্গে যুক্ত। সকলেই বাঙালী এবং নিঃসন্দেহে বামপন্থী।

বহু সাক্ষাৎকাব ও দলিল দস্তাবেজ ভিত্তি কবে রাষ্ট্রীয স্বয়ং সেবক সংঘ ও সংঘ পবিবার-এর প্রতিষ্ঠা বিকাশ ও বর্তমান অবস্থানের নিবিড় ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তাঁরা। বইটি Tract of the Times গ্রন্থমালাব প্রথম নিবেদন। সাধাবণ সম্পাদক ভূমিকায মন্তব্য কবেছেত RSS ও VHP বর্তমান "হিন্দুত্ব" বাজনীতিব চালিকা শক্তি। এই 'হিন্দুত্বেব দুটি মুখঃ "On the one hand it has sought to present a gentle face, symbolised in L. K. Advani's beatific smile, on the other hand it has projected an angrily agressive savagely sectarian face expressed in the speeches of Sadhvi Ritambara and Uma Bharati,..... (একটি স্লোগান-এর ভাষায, ইযে ভারত কে নারী হায / ফুল নহি চিনগাবি হায় !")...আমাদেব কার্টুন-শিল্পি উপবোক্ত "হিন্দুত্বেব" দুটি মুখেব মধ্যে কোনও তফাৎ কবেন নি। "অব কি বারি / অটলবিহাবী" আস্তা ভোট জেতাব পব Khaki shorts, saffrom flags আবাব প্রাসঙ্গিক হযে উঠেছে।

অপবপক্ষে স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছব পূর্তি উপলক্ষে সুপরিচিত ঔপন্যাসিক ও সাংবাদিক শশি থাবুব-এব রচিত INDIA: FROM MIDNIGHT TO MILLENIUM, ইউনাইটেড ফ্রণ্ট সবকার পড়ে

যাওয়ার ঠিক আগে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর "হিন্দুত্ব" সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টি ভঙ্গীর ফসল। আত্মপরিচয় সূত্রে লেখক বলেছেনঃ "I was born in London, brought up in Bombay, went to high School in Calcutta, attended College (St Stephens) in Delhi and received my doctorate in the United States ..I am simultaneously a keralite (my geographical state of origin) malayali (my linguistic cultural affiliation) Hindu (my religious faith) Nair (my caste)—and so on, and in my interactions with other Indians each or several of these ingredients may play a part (p 14) থাকব অকপট স্বীকার করেছেন তিনি মাতৃভাষা বলতে পারলেও লিখতে পড়তে পারেন না। তিনি U N'র সঙ্গে বহু বছর যুক্ত। ছাত্রাবস্থা থেকে নিউ ইয়র্ক, সিঙ্গাপুর, জেনিভা ইত্যাদি শহরে প্রবাসী হয়ে থাকা সত্ত্বেও দেশের মাটির সঙ্গে দেড় বছর অন্তর ছুটি কাটানোর সম্পর্ক অটুট রেখেছেন। বর্তমানে তিনি মহা-সচিব কেফি আন্নান-এর Executive assistant।

চাকরির সুবাদে যে ভুরি ভুরি Computerised Statistics তাঁর আঙুলের গোড়ায় থাকে তার অজস্র প্রয়োগও তিনি করেছেন। তাঁর লেখা-যোখা চলে হপ্তা শেষে ছুটির দিনে। সাহিত্য সৃষ্টি করেন নিজের মতই ইংরেজি ভাষী ভারতবাসীদের জন্য বিদেশী বাজার এর দিকেও নজর রেখে। তাই ফিরোজ গান্ধীর বিষয়ে তাঁকে Time ম্যাগজিন-এর ঢং-এ বলতে হয় "No relation of the mahatma."

১৯২৫ সালে বিজয়া দশমীর দিনে নাগপুর শহরে ডঃ বি. কে. হেগড়েওয়ার পাঁচজন বন্ধুকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। নাগপুর একেবারে ভারতবর্ষের জ্যামিতিক কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত। আঞ্চলিক রেষারেশি বন্ধ করতে এবং পক্ষপাতহীন ভাবে দেশের ঐক্যকে অটুট রাখবার জন্য গান্ধিজী নাকি একবার বলেছিলেন, না হয় নাগপুরকেই রাজধানী করা হোক।

আর একটি তথ্য ফিরে স্মরণ করবার মত। মাত্র মাস দুই পরে কয়েক শত মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কানপুর শহরে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির গোড়া পত্তন হয়। দেশের সরে জমিনে এইটাই সর্বপ্রথম কমিউনিষ্ট পার্টি। সম্পূর্ণ ভিন্ন হলেও নিজ নিজ ইডিয়লজিতে প্রতিষ্ঠিত ও ক্যাডারভিত্তিক এই দুই সংগঠনের অগ্রগতির তুলনামূলক আলোচনা অনেক-কিছুর ওপর আলোকপাত করবে।

পুস্তক পরিচয়

ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন , "Congregate and pray together for fifteen minutes every day, and Hindu Socicty will become an invincible Society"। হেগড়েওয়ার রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকসঙ্ঘেব কার্যক্রমে নিবেদিতার উপদেশের এক ধবণের বাস্তব রূপ দেন। তবে সঙ্ঘেব আরও বুনিযাদি তত্ত্বগুরু হলেন ভি. ভি. (বা "বীব) সাভারকার। তিনি আদেশ কবেছিলেন "Hinduize politics and militarize Hinduism। তাঁব গুরুবাণীতে প্রকৃত হিন্দু বলে নির্দেশ করেছিলেন শুধু সেই দেশবাসী-দেরই যাদেব "পিতৃভূমি" তথা "পুণ্যভূমি" দুটিই হিন্দুস্তানী। হজ পুণ্যার্থিবা এক কোপে বাদ পড়লেও দেশেব বৌদ্ধবা কিন্তু এই সঙ্ঘেব আওতায় আসেন। "বন্দেমাতরম" যাদেব বীজ-মন্ত্র, যারা "ভারত মাতা কি জয়" দিযে সভা শুরু ও শেষ কবতেন তাদেব পক্ষে ভারতমাতার অঙ্গনকে "Fatherland" বলে নির্দিষ্ট করা খুবই দ্যোতক।

হেগড়েওযাব ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য বর্ণের মধ্যবিত্ত ঘরের বার থেকে পনের বছবেব ছেলেদেব নিযে সংগঠনেব কাজ আরম্ভ করেন। ছেলেদেব ভোরবেলা সূর্য প্রণাম ও প্রার্থনার পর ছোবা তলোযাব লাঠি চালানো শিক্ষা দেওয়া হতো। কাবাডি, খো-খো ইত্যাদি দিশি খেলার মাধ্যমে শবীব চর্চা ছাড়াও "বৌদ্ধিক" সভায বাণা প্রতাপ. শিবাজী প্রমুখ যে সমস্ত হিন্দুরা মুসলমান-দেব সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা কবেছিলেন তাদের বীবত্বের কাহিনী ঘুরিযে ফিরিযে বার বাব শোনানো হতো।

শীঘ্রই নতুন নতুন "শাখা" প্রবর্তনেব জন্য এক "প্রচারক" গোষ্ঠীর প্রযোজন দেখা দেয। শাখাগুলিব পবিচালনার জন্য এক এক জন করে "সংঘচালক" নির্দিষ্ট করা হয। সবার ওপবে বিরাজ কবতেন" সবসংঘ-চালক স্বযং হেগডেওযাব। তিনি সকলেব কাছে যে ধবণেব একান্ত আনুগত্য দাবী কবতেন ওকে "একচালক-অনুবর্তিতা" বলে অভিহিত কবা হতো। সংঘেব আর্থিক মেরুদণ্ড ছিল ছোট খাট বাবসাযী চাকুবে ও বণিক সম্প্রদায লেখকবা যাদেব "বাণিযা" বলে নির্দিষ্ট কবেছেন। আজও নাকি তাদের সমর্থনই সংঘ পবিবাবেব ভিত্তিভূমি। টাকা পযসাব ওপব সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল "সব-সংঘচালক"-এব। তিনি হিসেব পত্র দাখিলের ধাব ধাবতেন না।

তিবঙ্গা পতাকা নয, "ভাগোযা" ঝাণ্ডা ছিল স্বযং সেবকদেব জাতীয় পতাকা। স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে তাঁবা নিজেদেব তফাৎ রাখতেন। "Hegdewar wanted his RSS to remain primarily 'cultural,' pursuing more long term goals through quiet but sustained physical-cum-ideological training of cadares [124]। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ নয, মুসলমানবাই ছিল স্বয়ং সেবকদের প্রকৃত প্রতিপক্ষ।

সম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামায বহু সময়ে স্বযং সেবকদেব সক্রিয ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। "Demonstratively aloof from the 1942 upsurge, violently active during the 1946-47 riots [the RSS is] suspected by many of complicity in the murder of Gandhi [p 25] · "at least three independent commissions have found RSS inspiration behind anti-muslim and anti-christian riots · through long term and sustained propaganda. [120"]

হেগডেওযার মাবা যাবাব আগে আসাম উডিষ্যা ও কাশ্মির ছাড়া প্রায সমস্ত দেশ থেকে আগত স্বযং সেবকদেব এক শিক্ষা শিবিব হয। হেগড়েওয়াব তাঁব শেষ ভাষণে তাদেব বলেছিলেন· "I see before my eyes today a miniature Hindu Rashtra [p. 125"]। গোলওযালকাব এব প্রায় সমসাময়িক লেখাতে পাই "Germany has shown us how wellnigh impossible it is for races and cultures, having difference going to the roots, to be assimilated into one united whole, a good lesson for us in Hindustan to learn and profit by [p 26]" এই উক্তিতেই ''হিন্দুত্বব" "পিতৃভুমি"ব প্রেবণা এবং মানে খুঁজে পাওযা যাবে।

হেগডেওযাব-এব পব "সব-সংঘচালক" হন যথাক্রমে গোলওযালকব ও বালাসাহেব দেওবাস, তাঁদের অধিনাযকত্বে ; "the mumber of shakhas went up from 8,500in 1975 to 11,000 in 1977 ; it had risen to 20,000 by 1982, expanding particularly in the four southern states where it had been negligible, Home Ministry Report in 1981 estimates the number of regular participants at about one million, and finacial contributions from members amounted to over Rs 10 million annually, [p. 53"]

১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয বিশ্ব হিন্দু পবিষদ। এই সংস্থার "হিন্দুত্ব", স্বযং-সেবকদেব চাইতেও উগ্রপন্থী। সাধু, সন্ত, মহান্ত, পুজারী ও অনাবাসীদেব পর্যন্ত বিশ্ব হিন্দু পবিষদেব মধ্যে সামিল কবে নেওযাব কৃতিত্ব গোলওযালকবের।

সংঘ পরিবার শাখায়-প্রশাখায আজ এক বিরাট গোষ্ঠী। ভারতীয মজদুব সভা, দ্র, ভি· বি, পি, শিব সেনা, বজবং দল, বিশ্ব হিন্দু পবিষদ এবং রাষ্ট্রীয স্বয়ং সেবক সংঘ সকলেই "হিন্দুত্বে"র ধ্বজাধারী। "হিন্দুত্বের" রাজনৈতিক

মুখপাত্রগুলি যথা হিন্দু মহাসভা, জন সংঘ নানান ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে আজ ভারতীয় জনতা পার্টির রূপ পরিগ্রহ করেছে। ১৯৮৪ সালে ভাজপা লোক সভায় মাত্র দুটি আসন পেয়েছিল। আজ তারা নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা না পেলেও সংসদে সর্ববৃহৎ দল হিসেবে দ্বিতীয়বার সরকার গঠন করেছে। এদের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের দ্রুত গতিবেগ হিটলার এর নাৎসি পার্টি ও জিন্নার মুসলিম লিগ-এর সঙ্গে তুলনীয়।

এবারের নির্বাচনের সময়ে সি· পি· আইএর নেত্রী গীতা মুখোপাধ্যায় বাজপেয়ীজীকে (ও দলের অন্যান্য নেতাদের) দক্ষ ও শ্রদ্ধেয় বলে অভিনন্দিত করে তার পর জুড়েছিলেন, "But he is a prisoner of the RSS." "আজকের বিশিষ্ট ভাজপা নেতাদের মধ্যে অটল বিহারী বাজপেয়ীর মত, লাল কৃষ্ণ আদবানী, দীন দয়াল উপাধ্যায়, সুন্দর সিং ভাণ্ডারী সকলেই আদি যুগের স্বয়ংসেবক। (নাথুরাম গোড়সেও RSS এর বিশিষ্ট স্বয়ংসেবক ও সংগঠক ছিলেন।)

বাম দলগুলি এতদিন কংগ্রেসকে প্রধান শত্রু বলে ভাজপার সঙ্গেও হাত মেলাতে পেছপাও হয়নি। তার পরেই কেবল মাত্র ক্ষমতার লড়াই-এর খাতিরে কংগ্রেসের সঙ্গে সমঝওতা করে ফেলে নিজেদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে। যারা বর্তমান নির্বাচনের ফলাফল হিন্দুত্বের ঢালাও সমর্থন না ভেবে ক্ষমতা-সীন দলগুলির প্রতি অনাস্থা ও পরিবর্তনের জন্য মতদান বলে বিচার করেছেন তাঁরা ভুল করেন নি। বিধানসভার ফলাফলগুলিও এই মতেরই সমর্থন করে। আশা করা যায় বামপন্থিরা "হিন্দুত্বে"র তুলনা মূলক প্রভাব বিস্তার ও মতদাতাদের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করে সৎ ভাবে সংগঠনের কাজে নিযুক্ত হয়ে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি করতে উদ্যোগী হবেন।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের "Hindu identity" আরো প্রখর। মনে রাখা ভাল রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবকদের খুঁটি যেমন ছিল 'গো-বলয়ের বানিয়া সম্প্রদায়" তেমনি সংঘ পরিবারের সবচাইতে উগ্রপন্থি সংগঠন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ-এর অর্থাগম হয় অনাবাসীদের বিদেশী মুদ্রায়।

৬ই ডিসেম্বর ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংস করা হয়। ঠিক তার আট মাস পরে ৬ই আগষ্ট ওয়াশিংটন ডি· সিতে এক আন্তর্জাতিক সমাবেশ আয়োজন করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। উপলক্ষ্য ১৯৯৩ সালে বিবেকানন্দর চিকাগো বক্তৃতার শতবর্ষ পূর্তি। নাম দেওয়া হয় World

Vision 2000 ।" পনের হাজার ডেলিগেট (বেশীর ভাগ অনাবাসী রাজধানীর দুটি মহার্ঘ্য হোটেলে জমায়েত হন। স্বদেশবাসীর প্রতি উদাত্ত বানী পাঠানো হয় "গর্ব সে বোলো হাম হিন্দু হাঁয় !"

উপরোক্ত সমাবেশের বর্ণনা দিয়ে শশি থারুর সংঘ পরিবার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর এক পরম্পরা লব্ধ হিন্দু ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও আস্থা নিবেদন করেছেন। তাঁর নিজের ভাষাতে "The proponents of Hindutwa have not understood that in one sense Hinduism is almost the ideal faith for the twenty first century ; a faith without apostasy, where there are no heretics to cast out ·· a faith that is eclectic and non doctrinaire, responds ideally to the incertitudes of a post modern world ··it cannot be the Hinduism that destroyed a mosque, or the Hindutwa spewed in hate filled speeches by communal politicians ! তিনিও চিকাগো বক্তৃতার সুদীর্ঘ উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন ; It has to be the Hinduism of Swami Vivekanada [129"]। তাঁর মতে Hinduism একটা "culture" তাকে "religion" বলা যায় না। "হিন্দু" শব্দটাই আসলে বিজাতীয়। আলেকজাণ্ডার তথা বাবর সকলেই সিন্ধু নদের পরপারের মানুষদের "সিন্ধু" শব্দের এই অপভ্রংশ দিয়ে চিহ্নিত করতেন। মজার বিষয় সেই সিন্ধু নদই আজ এক অন্য দেশ পাকিস্তানের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে। থারুর নিজেকে "লিবারাল" হিন্দু বলেন। বলেন···"we are secular not in the sense that we are irreligious, but we believe religion should not determine public policy ।"

লেখক থারুর একজন রাজনৈতিক সাংবাদিক ও ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাত। তাঁর "হিন্দুত্ব" কি ধরণের রাজনীতির সমর্থক সে দিকে নজর ফেরানো যাক। বই-এর মধ্যে তিনি স্বদেশের ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব ইত্যাদি আলোচনা করেছেন চারটি বিতর্ককে কেন্দ্র করে। ১। উন্নয়ন বনাম গণতন্ত্র। ২। কেন্দ্রিকরণ বনাম বিকেন্দ্রিকরণ। ৩। ধর্ম নিরপেক্ষতা বনাম মৌলবাদ। ৪। 'স্বদেশী' বনাম বিশ্বায়ন।

আশ্চর্য নয় নেহেরু-গান্ধী বংশের দিল্লীর ওপর আধিপত্যের প্রসঙ্গ বইএর অনেক খানি জুড়ে আছে। আমাদের মনে হয় নেহেরু-গান্ধী বংশকে হাইফেন

যুক্ত না করে পাঠান ও মোগলদের রাজত্ব কালের মত আলাদা করে ফেলা উচিত। তফাৎ করতে বলছি কারণ, বংশের আদি পুরুষ মোতিলাল ও শ্রেষ্ঠ পুরুষ জহরলাল সম্বন্ধে যতই সমালোচনা হোক না কেন, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আদর্শের অবমূল্যায়ন অথবা দুর্নীতির আরোপ তেনাদের ওপর কেউ কোনদিন করেননি।

নেহেরুর রাজনীতি চারটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে উল্লেখ করেছেন থারুর। ১। গণতন্ত্র, ২। ধর্ম নিরপেক্ষতা, ৩। জোট নিরপেক্ষতা, ৪। সমাজতন্ত্র। প্রথম দুটি থারুর সমর্থন করেন এবং শেষ দুটির বিষয়ে বিশেষ করে সমাজতন্ত্রের বিষয়ে মন্তব্য করেছেন···The fourth was disastrous condemning the Indian people to poverty and stagnation engandering inefficiency, red-tapism, and corruption on a scale rarely rivalled elsewhere" পূর্ব এশিয়ার বাঘা বাঘা অর্থনীতিগুলির তুলনা মূলক সুখ্যাতি করতে লেখক অনেক চোখা চোখা বুলিতে শান দিয়েছেন। বই বেরোবার ছ'মাস না যেতে যেতেই সেই সব ব্যাঘ্রদের জাঁতা কলের ইঁদুরের মত অবস্থা দেখে থারুর সাহেব কি বলেন জানতে ইচ্ছে করে।

দেশে যখন ছাত্র ছিলেন তখন সদ্য সদ্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁকে এক সাক্ষাৎকার দেন। সেই আবেশে তিনি আমেরিকায় অধ্যয়নকালে প্রথম প্রথম বিদেশী সহপাঠীদের কাছে "জরুরী অবস্থা চালু করার পক্ষ সমর্থন করতেন। কিন্তু বেশী দিন লাগেনি তাঁর ইমার্জেন্সির স্বরূপটা চিনে নিতে। ইন্দিরার বিষয়ে তিনি টিপ্পনি শুনিয়েছেন ঃ "···her genuine conviction were some where to the left of self interest-"

জেনিভা শহরে তরুণ নতুন প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী তার সততা, সারল্য ও আধুনিক মনোভাবের প্রকাশে থারুরকে সম্পূর্ণ বিমোহিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু তার বিষয়েও শুনিয়েছেন "গলি গলি মে শোর হায় / রাজীব গান্ধী চোর হায়।"

থারুর পূর্ণতম সমর্থন পেয়েছেন নরসিংহ রাও, মনমোহন সিং, চিদাম্বরম প্রমুখ যারা আমেরিকার নেতৃত্বের কাছে নিজেদের স্বাধীন বিচার বুদ্ধি গচ্ছিত রেখে বিশ্ব ব্যাঙ্ক, IMF, GATT ইত্যাদির একান্ত অনুগত হয়ে দেশের বাজার-এর কাছা খুলে দিচ্ছেন। ওই পথেই নাকি দেশের প্রকৃত মুক্তি।

থারুর লিখেছেন "15th August 1947 was a birth that was also an abortion [p-19] তার দুটি কারণ। প্রথমটা অবশ্য দেশ ভাগ হয়েছিল বলে। কিন্তু তার চাইতেও বড় কথা আমরা স্বাধীন ভারতে

সমাজতন্ত্র আনবাব সংকল্প নিযেছিলাম। মৌলবাদী হিন্দুত্ব আব গোঁড়ামিব গণ্ডি থেকে বেবিযে এবং থারুর কথিত "বিবেকানন্দীয হিন্দুত্ব" তার মার্কিণমুখাপেক্ষী অর্থনীতিব কবল থেকে মুক্তি লাভ কবে সকলেব কাঙ্খিত এক নতুন জন্ম আনতে পাববে কি ?

থারুর তাঁব মলয়ালী "মাতৃভূমি" কেরল ও স্ত্রীর জন্মভূমি পশ্চিম বাংলাব গুণগানে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। কেরলেব শিক্ষা, (বিশেষ করে স্ত্রী শিক্ষা), স্বাস্থ্য জন্মনিযন্ত্রন ইত্যাদির মান তুলনা কবে বলেছেন "Kerala has in short all the demographic indicators commonly associated with developed countries at a small fraction of the cost আর একটি উপমাও দিযেছেন "if America is a melting pot Kerala is a thali, a selection of sumptuous dishes in different bowls, both tastes different and does not necessarily mix with the next but belong together to the same plate and they complement each other in making the meal satisying [p 76]।

পশ্চিম বাংলার বিষযে বলেছেন—"land reforms and decentralised development have improved efficiency and generated agricultural growth above the national averages and there may be lessons for other states [p 92 ।" লক্ষণীয় বামফ্রণ্ট তথা পঞ্চাযেত ইত্যাদিব ভূমিকার কোনও আলোচনাই কবেন নি। আরও বলেছেন·· "the hospitalitey of Communist state government of West Bengal to foreign private capital is now a byword though the annual trips of its marxist chief minister Jyoti Basu may have more to do with his wish to escape the heat of the Calcutta summer. [p. 85]

ঔপন্যাসিক থারুব গল্পেব আঙ্গিকে আকর্ষণীয ভাবে কতকগুলি বক্তব্য উপস্থিত কবেছেন। অনাবাসীদেব মনে দেশ ছাড়ার বিষয়ে নানান জটিলতা থাকে। বালজী বলে এক মালযেশীযাবাসী ও পেরেরা বলে এক গোযনিজ বিদেশ থেকে নির্লজ্জ ভাবে দেশের দৈন্য দুর্দশার নিন্দা করার জন্যে কঠোব সমালোচনা কবে বলেছেন "India is a highly developed country of the past in an advanced state of decay what it does not need, as it tries to rise to its challenges is the contempt and contumely of those who have left India ।"

আর একটি মনোজ্ঞ কাহিনী হচ্ছে এক মেধাবী অচ্ছুত বালক চার্লিস-এর

পরিণতি। আমার বাড়িতে ছুটি কাটাতে যাবার সময়ে তিনি কড়া নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও চার্লিস-এর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। বহুদিন পরে একবার অনাবাসী থারুর কেরালায় ছুটি কাটাচ্ছিলেন। তাঁর স্বল্প শিক্ষিত জ্ঞাতি ভাই-এর অনুরোধে তিনি কালেক্টর সাহেবের কাছে তার হয়ে দরবার করতে রাজি হন। সেখানে গিয়ে অবাক ও যারপরনাই আনন্দিত হন দেখে যে কালেক্টর সাহেব হচ্ছেন তাঁর অচ্ছুত ক্রিশ্চান বন্ধু চার্লিস। এমনি এক এক করে চার্লিসরা নিজেদের অধিকার বুঝে নেবে ভেবেই থারুর সন্তুষ্ট। বিশ্বনাথ প্রতাপ সিং-এর মত গদির বিনিময়ে মণ্ডল কমিশন-এর সর্তগুলি লাগু করার মত দৃঢ় পদক্ষেপের তিনি তেমন পক্ষপাতি নন।

★ ★ ★

সমাজ পরিবর্তনের পুরোধা ভেবে যাদের ওপর এতদিন আশা ও আস্থা ছিল তাদের নৈতিক হঠকারিতা দেখে দুটি ক্লাসিক আধুনিক উপন্যাস-এর দিকে নজর যায়। উপন্যাস দুটি হল গাব্রিয়েল গার্থিয়া মার্কেজ-এর "শত বর্ষের নিঃসঙ্গতা" এবং জর্জ অরওয়েল এর "পশুদের খামার।" দুজনেই বক্তব্য উপস্থিত করতে বাস্তবানুগ স্যাটায়ার-এর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ব্যবহার করেন নি। তাঁরা অবলম্বন করেছেন জাদুবাস্তব ও রূপক আঙ্গিক-এর বক্রোক্তি। মার্কেজ-এর বই-এর প্রধান চরিত্র Colonel Buendia তাঁর আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে কোনও দিন বিচ্যুত হননি। তাঁর সহযোদ্ধারা যখন ক্ষমতায় আসার জন্য গভর্মেণ্ট ও চার্চ-এর সঙ্গে নানান সমঝওতা করে চলেছে তখন Colonel আপোসহীন ভাবে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। শত চেষ্টাতেও যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে পরাস্ত করতে না পেরে এক কালের সহযোদ্ধাদের মধ্যস্থতায় তাঁর কাছে দূত পাঠানো হল যুদ্ধশান্তির প্রস্তাব নিয়ে। দৌত্যের প্রস্তাবনা ছিল·· "first that he revise the revision of property title in order to get back the support of the liberal land owners. They asked secondly that he renounce the fight against clerical influence in order to obtain the support of the catholic masses. They finally asked that he renounce the aim of equal rights for natural and illegitimate children in order to preserve the integrity of the home. সব শুনে Colonel Buendia যা উত্তর করলেন তা আমাদের ফাঁকা আদর্শ ও কেনা বেচার রাজনীতির কালে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। "THAT MEANS ALL THAT WE ARE FIGHTING FOR IS POWER।" অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে 'নয়মাত্মা (জড়বাদীদের ক্ষেত্রে যে কোনও সিদ্ধি) বলহীনেন লভ্য।'

অরওয়েলএর বই-এর সমাপনও ফিরে স্মরণ করবার মত। পশুদের খামার এর মালিক পক্ষ মানুষ জাতের বিরুদ্ধে এক সময় নেতৃত্ব দেয় শুওররা। ক্ষমতায় আসার পর সেই শুওররাই মালিকদের পাকা বাড়ির বাসিন্দা হয়ে যায়। ক্রমে মানুষদের সঙ্গে তাদের আদান-প্রদান এমনই বেড়ে যায় যে মানুষরা পুনরায় খামার বাড়িতে আনাগোনা আরম্ভ করে দেয়। ওদিকে অন্যান বিপ্লবী জন্তু জানোয়ারদের অবনতি হতে হতে অবস্থা দাঁড়ায় যথাপূর্বম। শেষ পর্যন্ত একদিন মালিকদের বাড়ির জানালার শার্শিতে নাক লাগিয়ে ওরা দেখে শুওররা পেছনের পায়ে দাঁড়িয়ে ওঠে মানুষদের হুইস্কি দিয়ে আপ্যায়ন করছে। শুওরদের দেখাচ্ছে মানুষদের মত আর মানুষদের মনে হচ্ছে শুওর।

উপরোক্ত বর্ণনা ও মন্তব্যগুলি মার্কেজ ও অরওয়েল আদর্শের প্রতি অনাস্থার বশে করেননি। তাঁদের উদ্দেশ্য হল আদর্শ বিচ্যুতির বিপদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা। আজ আমরা আশার দৃষ্টি মেলে আছি দক্ষিণ তথা বর্তমান বাম রাজনীতির চৌহদ্দির বাইরে আমাদের দেশে যে বৃহৎ অথচ অসংবদ্ধ তৃতীয় শুভশক্তি বিরাজ করে তার অভ্যুত্থানের প্রতি।

—জয়ন্ত ঘোষ

I. KHAKI SHORTS AND SAFFRON FLAGS

A Critique of the Hindu right by Tapan Basu / Pradip Dutta / Sumit Sarkar / Tanika Sarkar / Sambuddha Sen Orient Longman Rs. 35

II. INDIA : FROM MIDNIGHT TO THE MILLENIUM by Sashi Thoroor

Viking / Penguin India Rs. 400

আধুনিক গল্প ও লেখকের দায়বদ্ধতা

সাম্প্রতিক সাহিত্য রচনার শ্রেণী বিভাজনে দায়বদ্ধ সাহিত্য নামে একটি যুগ্মবদ্ধ শব্দ খুব পরিচিতি লাভ করেছে। গল্প-উপন্যাস রচনার প্রেক্ষিত হিসেবে শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। একজন লেখক সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের ধারাগুলি সম্পর্কে কতটা ওয়াকিবহাল —সমাজ পরিবর্তনের মূলসূত্রগুলো তার রচনায় কতটা তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে—একজন দায়বদ্ধ সাহিত্যিকের রচনায় তার প্রতিফলন ঘটে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়, নীচু তলার শোষিত শ্রেণীর মানুষের আর্তি ও সংগ্রামের চিত্র উন্মোচিত হয়ে থাকে তাঁদের লেখায় ও শিল্পকর্মে।

গল্পকার ব্রজেন মজুমদারের 'দোস্তালীর গল্প' গ্রন্থটি অবশ্যই প্রগতি সাহিত্য ভাবনার সঙ্গী বলে দাবি করতে পারে। ১১-টি গল্প নিয়ে এই গ্রন্থ। 'মুখার্জী বনাম মুখুজ্জে' গল্পটি যেন লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর মূর্তপ্রকাশ। একটি ছোট হোটেলের মালিকানা বদল হয়ে শেষপর্যন্ত স্টার হোটেলে রূপান্তর—এই কাহিনীর অন্তরালে রয়েছে শ্রেণীসচেতনতা যার প্রকাশ ঘটেছে মুখুজ্জে বামুনের উপলব্ধ অভিজ্ঞতায়—"আমি একজন শ্রমিক। শ্রমিকের তো কোন জাত নেই স্যার।" গল্পগুলির মধ্যে লেখক শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব আওড়াননি, কিন্তু গল্পের টানাপোড়েনে তা অনিবার্য সত্য হয়ে উঠেছে। 'তুমিও' তে পরমেশ একটি দড়িবদ্ধ পাঁঠার অবস্থার মধ্য দিয়ে পৌঁছে যায় এমনি এক সত্যে—নানা ঘটনায় আত্মবিশ্লেষণ ও তার উপলব্ধি "সাম্যবাদী আমি—আজীবন বলতে পারি। কিন্তু হতে পারি না সম্ভবত একবারও।" মধ্যশ্রেণীর মানুষের এমনি চুলচেরা শ্রেণী বৈশিষ্টগুলির বিশ্লেষণে গল্পগুলি ঋদ্ধ, কিন্তু শ্রেণীতত্ত্ব কখনো ভার হয়ে ওঠেনি বিষয়-বস্তুর আত্মীকরণে। 'হোলী' গল্পে মুনিয়া মেথরাণীর সংগ্রাম কিম্বা 'সামনে শিকারী' গল্পে চম্পা নাম্নী কাজের মেয়ের বেঁচে থাকার জীবন-সংগ্রাম, সবই সহৃদয় হৃদয় সংবেদ্য। অন্য ধরণের দুটি গল্প—'অচেনা মানুষ' কিম্বা 'দোস্তালীর গল্প'—মানবচরিত্র রহস্য আবিষ্কারে লেখকের পার-দর্শিতা উল্লেখযোগ্য।

ব্রজেন মজুমদারের ভাষা বিষয়ানুগ, গল্প কথনের উপযোগী। গল্পগুলির রচনাকাল বিগত তিন দশক, ফলে একজন বাস্তববাদী লেখকের সৃজনকর্মে স্বাভাবিকভাবেই বিধৃত হয়েছে ঝড়ো সত্তর দশকের রক্তাক্ত সংগ্রামের পটভূমি। বিষয়বস্তু যাই হোক, বলা ও রচনা শৈলীর সুনিপুণ প্রয়োগে গল্পগুলি রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে।

গোবিন্দ ভট্টাচার্য মূলত কবি। কিন্তু তিনি গল্পও লেখেন। 'মানুষ মূলত বহুরূপী' তাঁর বারোটি গল্পের সংকলন। পদ্য ছেড়ে কেন গদ্য? লেখছেন কথায় "জীবনের সব দেখাতে তেমনভাবে কবিতায় ফোটাতে পারিনি, সম্ভবত কেউই তা পারে না। এই গ্রন্থের গল্পগুলিতে সব অস্ফুট উচ্চারণ বাঙময় করতে চেয়েছি মাত্র।" জীবনের নানা বৈপরীত্য তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। তিনি ভুলতে পারেন না গ্রামজীবন আবার নির্দ্বিধায় গ্রহণ করতে পারেন না জটিল নাগরিক জীবনকেও। তাই গ্রামীন সারল্য ও নাগরিক জটিলতার নানা অভিঘাত গল্পগুলির মধ্যে ক্রিয়াশীল রয়েছে। প্রথম গল্প অর্থাৎ 'মানুষ মূলত বহুরূপী' এই নামেই সংকলন গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে। চিকিৎসা ব্যবসায়ী রাধানাথের জীবনদর্শনকে ভিত্তি করেই গল্প। রাধানাথ স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুত্রবধূর উপর নির্ভর করতে গিয়ে দেখলেন তারা কেবল টাকাটাই দেখছে। একদিন রাধানাথ উপলব্ধি করলো "সমাজটা আস্তে আস্তে কয়লাখনির মাটির মতো কালো হয়ে যাচ্ছে," এবং তাই "আমি আজ দারুণ স্বার্থবাদী ···এই বুড়ো বাপ তোদের এক কানাকড়িও দিয়ে যাবে না। কেবল দিয়ে যাবে খুব যত্নে ফলানো অসহ্য যন্ত্রনার কিছু তাজা বীজ।" আত্মকথনের ঢঙে লেখা এই গল্পটির মতো আরো কয়েকটি গল্প রয়েছে সেগুলোর রচনারীতি একইরকম। 'পাগলা ঘন্টি'তে নায়কের দারিদ্রকণ্টকিত জীবনে চাকরী এলো, অর্থাৎ—"বাবা নিজে মরে আমাকে এই সুযোগটা দিয়ে গেল।" সে কাজে যোগ দিয়ে দেখলো সেখানে অদ্ভূত নিয়ম, কেউ মারা গেলে অফিসে ঘণ্টা বাজে আর যান্ত্রিক শোক পালনের মাধ্যমে পৌঁছে গেলো শহুরে জীবনের এক নির্মম সত্যে "কোনটা সুখ কোনটা দুঃখ এই অনুভূতির তাপাঙ্ক এখন শূন্য ডিগ্রীতে।" জবাই হতে আসা নির্লিপ্ত ছাগলের সঙ্গে মিল খুঁজে পান লেখক "মানুষ কি ক্রমাগত এই নির্লিপ্ততার শরীক হয়ে যাচ্ছে।" 'সাপ' গল্পটিতে নির্বাস ও পর্ণা ভালোবেসে বিয়ে করা এক দম্পতি, নাটকে অভিনয়ের মাধ্যমে যারা এক হয়েছিলো, একদিন সেই নাটকই নিয়ে এলো বিচ্ছেদের বাতাস। নিঃসঙ্গ পর্ণার অনুভব "বাইরে গভীর বর্ষার রাত। ভেতরে ভ্রষ্ট অ্যালবাম, পুরনো কাগজের স্তুপ আর পর্ণার অস্তিত্বব্যাপী দ্বিতীয় জীবনচিহ্ন একটি সাপ।" প্রায় সব গল্পেই রয়েছে জীবনের ক্ষতচিহ্ন। গল্পের পাত্র-পাত্রীরাও এই ক্ষতচিহ্ন নিয়ে জীবন কাটাচ্ছে—"তিলতিল নপুংসক মৃত্যুর মধ্য দিয়ে যেতে যেতে মানুষ এক বিস্ফোরণের দিকে এগুচ্ছে। 'সন্দীপের দুই জন্ম' গল্পে জীবনে সফল কৃতী সন্দীপ দিদির মৃত্যুশয্যায় দাঁড়িয়ে উপলব্ধি করে পিছনে ফেলে আসা জীবনের সার সত্য—যে জীবন থেকে সে এখন লক্ষ যোজন দূরে—এখন কিঞ্চিত মদ্যপান না করলে সন্দীপের ঘুম আসে না। শেষ গল্প 'মধু ও তার নিশান' বেশ বড় এবং গল্পটিতে লেখকের নিজস্ব 'নিবেদন' এর স্বীকৃত সত্য ফুটে উঠেছে। বাড়ির ছাদে মধু

একটি নিশান উড়িয়ে দিল। নিশানের রঙ সাদা। সাদা মানে সূর্যের সব রঙ মিলে নিশানের এই রঙ। ওর বিশ্বাস এই সাদা কাপড়ের টুকরোর উপর রোদ্দুরের আসল রঙ ফুটে উঠবে। পঁচাত্তরেই মধুর ছোখে ছানি পড়েছে—তার কাছে ফ্যানটাসি আর বিশ্বাসের জগত মিলেমিশে এক হয়ে গেছে, তবু আকাশে ছড়ানো-ছিটানো মেঘে সামগ্রিক শঙ্খের ঔজ্জ্বল্য। একদিন সেই ঔজ্জ্বল্য নিহত হয় বোমার ঘায়ে—মধুর সাদা নিশানকে দেয় এফোঁড় ওফোঁড় করে। বিলের জলে ভাঙা উড়োজাহাজ, আর ভাসমান মৃতদেহ। আসলে গোবিন্দ ভট্টাচার্যের সব গল্পই মূলত স্বপ্নভঙ্গের। যদিও লেখক মনে করেন "মানুষকে তো স্বপ্নই চালায়। তোমার কোন স্বপ্ন নেই, তুমি চলবে কি করে।" (আমি ও আমার আত্মা) অবশ্যই প্রশংসা করতে হয় পদ্য লেখকের গদ্যের। ভাষা সহজ কিন্তু কাব্যময়, আর তাই, বিরাট কোন জীবনদর্শনের স্বপ্ন না থাকলেও গল্পগুলি দ্রুত পড়ে ফেলা যায়। চিত্রকল্পাশ্রয়ী নির্ভর ভাবনার কবিকে চিনতে অসুবিধে হয় না। সব শেষে একটি কথা, মানুষ কি সত্যিই মূলত বহুরূপী? তবে এখানে বহুরূপী মানুষকে নয়, আমরা দেখি, মুখোশের আড়ালে মানুষেরই মুখ। প্রণবেশ মাইতি কৃত প্রচ্ছদ শোভন।

অদ্বৈত মল্লবর্মন (১৯১৪—১৯৫১) রচিত 'রাঙামাটি' একটি ছোট উপন্যাস। শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক সহমর্মিতায় ফসল এই সুমুদ্রিত বইটি। প্রকাশকের মতে আজো প্রাসঙ্গিক বলেই বইটি প্রকাশিত হয়েছে। ধারাবাহিকভাবে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'চতুষ্কোণ' পত্রিকায় ১৩৭১ সনে।

'রাঙামাটি' উপন্যাসটির মূলে রয়েছে গ্রামীন সরলতার সঙ্গে শহুরে জীবনযাত্রার আত্মিক দ্বন্দ্ব। পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহ গ্রামের মানুষকে শহরে টেনে আনে, কিন্তু সে একদিন অনুভব করতে পারে, নগরে দেহ আছে, প্রাণ আছে, কিন্তু হৃদয় নেই। রেণুকার নজর নাগরিক জীবনের চাকচিক্যের প্রতি। কিন্তু আজীবন শহরে বাস করা চিকিৎসক নবকুমার তাকে বোঝান—"যে স্বর্ণযুগের লোভে আপনি সেখানে যেতে চাচ্ছেন তা সত্যিই স্বর্ণ নয়।" কিন্তু প্রথমে রেণুকা তাঁর কথা বিশ্বাস করেনি, পরে নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তার উপলব্ধি ঘটে নাগরিক জীবনের কৃত্রিমতাসম্পর্কে অবশেষে নায়ক-নায়িকার মন জানাজানির পর্ব শেষ এবং উপন্যাসেরও সুখ সমাপ্তি।

বলতে দ্বিধা নেই, উপন্যাসটিব মধ্যে কিংবদন্তী লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মনকে খুঁজে না পেলেও লেখকের গ্রামজীবনেব প্রতি যে অনুরাগ তা ভালোই লাগে। আন্তবিকতা গুণে বাস্তবানুগ জীবন ও মানবিক সম্পর্ক রূপায়নে লেখককে সফলই বলা যায়। সহজ সবল অনাড়ম্বর ভাষা। চবিত্রগুলি গল্পের প্রয়োজনে এসেছে, তবে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্বল।

—মৃনাল দত্ত

১। দোস্তালীব গল্প। ব্রজেন মজুমদার। লেখক সমাবেশ। কুড়ি টাকা।

২। মানুষ মূলত বহুরূপী। গোবিন্দ ভট্টাচার্য। পত্রপুট। চল্লিশ টাকা।

৩। বাঙামাটি। অদ্বৈত মল্লবর্মন। পুঁথিঘর। পঁযত্রিশ টাকা।

দীপেন্দ্রনাথ স্মরণ সংখ্যা

'পবিচয' পত্রিকাব দীপেন্দ্রনাথ স্মবণ সংখ্যাব পব, 'শিলাদিত্য' পত্রিকায বিমল কবেব 'আমি ও আমাব তরুণ লেখক বন্ধুবা'-তে দীপেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ এসেছিল। তাবপব বচনাসংগ্রহে দেবেশ বাযেব ভূমিকা। অর্থাৎ ১৯৭৯-ব জানুযাবি-তে মৃত্যুর পব দীপেন্দ্রনাথ এইটুকুই আলোচিত হযেছেন—অবশ্যই আবো অন্য পত্রপত্রিকায তাঁকে নিয়ে লেখা বেরোতে পাবে। কিন্তু না জেনেও এটুকুই নির্দ্বিধায় লেখা যায়, যে তাও কোনো পবিপূর্ণতা দেযনি। সুতবাং এই বৃত্তে দীপেন্দ্রনাথকে নিযে একটি বিশেষ সংখ্যা সর্বদাই উৎসাহেব বিষয।

দীপেন্দ্রনাথ বিষযে তাঁব সমকালীন সহযাত্রীদেব স্মৃতি, সাহিত্যকর্মেব আলোচনা এবং দীপেন্দ্রনাথেব সাক্ষাৎকাব, তাঁব গল্প, বিপোর্টাজ-এব পুনর্মুদ্রণ ও কযেকটি চিঠির সঙ্গে তাঁব বচনাপঞ্জি-ব মুদ্রণে দীপেন্দ্রনাথেব ব্যক্তিত্বকে একটি পূর্ণবযবে ধাবণ করেছে এই সংখ্যা।

সন্দীপ দত্ত, দীপেন্দ্রনাথেব যে 'কালপঞ্জি'টি তৈবী করেছেন, তা-তো দীপেন্দ্রনাথেব মানসিকতা ও ব্যক্তিত্ব তৈবি হয়ে ওঠার পরিচয় দেখা যায। যে জন্য এই সমসাময়িক 'ঘটনাপ্রবাহ' ও গ্রন্থপ্রকাশের তালিকা—তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হযেছে, গল্প আব বিপোর্টাজের পুনর্মুদ্রণেব সমান্তরালে। অবশ্য

এখানে রিপোর্তাজ-এর নির্বাচন নিয়ে একটু প্রশ্ন থাকে যে তাঁবা যদি তাঁর বিখ্যাত রিপোর্তাজ 'নো পাসাবণ'টি পুনর্মুদ্রিত করতেন, বা অপব কোনো সংকট দীর্ণ সময়ে লেখা রিপোর্তাজ যেমন ভিয়েতনাম নিযে কোনো লেখা বা পার্টির 'ক্রম-বিভাজন' পর্বের কোনো লেখা উদ্ধৃত কবলে, স্মৃতিচারণা ও আলোচনার পবিসরকে বোঝা সহজ হত। তবে উদয়শংকব রায়কে লেখা চিঠি, এবং সাক্ষাৎকারেব পুনর্মুদ্রণ, যেন বা দুই দশকের দূরত্ব ভেঙে আজকে পাঠকেব কাছে ও আজকেব সমযেব পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয, দীপেন্দ্রনাথেব ব্যক্তিত্বেব দীপ্তি, কণ্ঠস্বরের অভিঘাত যার প্রয়োজন ছিল।

> "কলকাতা শহব তাব অসামান্য ঐতিহ্য, প্রচণ্ড বৈচিত্র্য....কটা উপন্যাসে কলকাতা শহবটা আসে···এখানে তাহলে বোধ হয় দেখার মধ্যে ফাঁকি বা ফাঁক থেকে যায়। যাব ফলে আমরা কলকাতার বাইরের তো জানিই না, এমন কি কলকাতাকেও ভালো করে জানি না, আব আমি বলতে চাই যে জনপ্রিয় উপন্যাসেব ছক জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসাবে যখন লেখককে পবিচালিত করে তখন এই ধরনেব ব্যাপার গুলি ঘটতে বাধ্য, এই।"
>
> —সাক্ষাৎকার / দি, কা, পৃ, ৩৩৮

দীপেন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনার আলোচনায আসাব আগে এইটুকু উদ্ধৃত করতে হল, তাঁর বোধশক্তিব অন্তর্লীন ভালোবাসা আব অভিমানের ব্যক্তিগত পাঠ হিসেবে। দীপেন্দ্রনাথ ছক-এ বিশ্বাস কবতেন না। ক্রমাগত পবীক্ষা-পরিবর্তন-রীতিব বদলের সন্ধান কবেছেন। তাই তাঁকে নিযে যে কোনো পর্যাযের আলোচনায যদি কোনো ছক এসে যায তা দুঃখের। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্যের 'তৃতীয ভুবন সম্ভাব নির্মিতির সূচনা'—বা বীতশোক ভট্টাচার্যের 'ভাষাদর্শ ও মতাদর্শ : একটি অসম্পূর্ণ খসড়া' এই নামগুলিই কিছুটা ভয ধবায় যে তা হযতো কোনো খরখরে অ্যাকাডেমিক আলোচনা পবীক্ষার প্রশ্নেব উত্তবেব ঢং-এ লেখা। তবে স্বস্তি যে, অন্তত এই দুটি লেখাব কোনোটিই সেই গোত্রেব নয়। বিশেষত বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য যেভাবে, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থেকে নৈর্ব্যক্তিকতায গিয়ে উপন্যাসটিকে আলোচনা করেছেন তা উপভোগ্য যেখানে তাঁর মতে, সেই 'তৃতীয ভুবন' তাঁর পববর্তী আখ্যানকার্যেব একটি 'পাঠ' হয়ে উঠেছে তাঁব ভাবনার পবিণতি আব বহমান সময়ের অনিবার্যতায। বীতশোক ভট্টাচার্যের প্রবন্ধে দীপেন্দ্রনাথের ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য আর চিন্তন-

রীতির নিজস্বতা আলোচিত হয়েছে। শুভঙ্কর ঘোষ; অরুণ সেন, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্তকুমার ঘোষাল, সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকেই খুবই সঙ্গতভাবে দীপেন্দ্রনাথের সময় ও তাঁর সেই সময়কে বুঝবার, প্রকাশ ও ও প্রতিবাদ করবার বা মুখোমুখি থমকে থাকার নিরন্তরতাকে আলোচনা করেছেন আখ্যানকর্মের 'ব্যক্তিগত' দৃষ্টির পাঠে। এই নিজস্বতা থাকায় লেখাগুলি এক-ঘেয়ে পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হয়ে যায়নি। বরং অনেকগুলি দরজা জানলা খুলে দিয়েছে। যেমন, শোকমিছিলে পার্টির থেকে 'কমিউনিস্ট' চরিত্রের বিচ্যুতিকে সময় ও পটের বহমানতায় খুঁটিয়ে বলেছেন পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় শোকমিছিল'-এর বিশেষ্যভূমিতে। শুভঙ্কর ঘোষ আলোচনা করেছেন ছোট-গল্প নিয়ে অরুণ সেনের পুনর্মুদ্রণ বা দেবেশ রায়ের পুনর্মুদ্রিত আলোচনাও ওই গল্প আর উপন্যাসে সময়ের বীভৎসতাকে কেন্দ্র করেই লেখা। সুমিতা চক্রবর্তী, জয়ন্ত কুমার ঘোষাল ও আমিনুল হকের লেখায় দীপেন্দ্রনাথের প্রবণতা ও বিশ্ব-উপন্যাসধর্ম আধুনিকতা-পুরাণ প্রসঙ্গ বিশ্লেষিত হয়েছে, কিন্তু তার বিন্যাসে অ্যাকাডেমিক আলোচনার রীতি কিছুটা বিব্রত করে। কিন্তু তার বাইরে, তার 'মূল্য' আছেই। সত্যজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আলোচনা করেছেন, 'বিবাহবার্ষিকী নিয়ে, যা চিন্তার প্রকরণে পাঠককে আকাঙ্ক্ষিত উত্তেজনা দিতে পারে। তুষার পণ্ডিতের লেখাটি বেশ খোলামেলা যার বিষয় 'আগুনের কণা মায়াবী গ্রীবা'য় অন্বিত দীপেন্দ্রনাথের চরিত্ররা।

'অনুজ' প্রজন্মের সাহিত্যিক হিসেবে, রামকুমার মুখোপাধ্যায় ও অমর মিত্রের অভিমত এবং নাট্যব্যক্তিত্ব দেবাশিস মজুমদারের লেখা সংকলিত হয়েছে স্বতন্ত্র গুরুত্বে। এবং তার সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে এক অভিনব বীক্ষণ সমকালীন সৃজনশীলদের দৃষ্টিতে দীপেন্দ্রনাথ তাঁর প্রেরণা তাঁর উত্তরাধিকার পত্রিকার পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়েছে, সাহিত্য আকাদেমির পূর্বাঞ্চলীয় শাখার সম্পাদক নির্মলকান্তি ভট্টাচার্যকে, বাংলা আকাদেমির সচিব সনৎ কুমার চট্টোপাধ্যায়কে, 'অশ্বমেধের ঘোড়া' নিয়ে ছবি করতে চাওয়া শংকর ভট্টাচার্যকে, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, রফিক উল ইসলাম, সঞ্জীবন চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ রায়, সোহারাব হোসেন, সনৎকুমার সরদার নিখিলরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, স্বপ্না গুপ্ত, সঞ্জয় ঘোষ, মুর্শিদ এ এম ও শরদিন্দু সাহাকে।

কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'সাংবাদিক দীপেন্দ্রনাথ' ও কিন্নর রায়ের

দীপেন্দ্র নাথেব রিপোর্টাজ সময়ের উজ্জ্বল দলিল' অত্যন্ত হতাশ করা লেখা।

দীপেন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ তবু পত্রিকার শ্রেষ্ঠ অংশ যার জন্য সম্পাদক এবং আমন্ত্রিত সম্পাদকের কাছে কৃতজ্ঞ থাকতে হয তা হল স্মৃতিচারণা। রাম বসু, তরুণ সান্যাল, কার্তিক লাহিড়ী, অমিতাভ দাশগুপ্ত, দেবেশ বায, জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায, সুপ্রিয গুহ, অশোকবঞ্জন সেনগুপ্ত, মালবিকা চট্টোপাধ্যায় এবং চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায স্মৃতিতে ব্যক্তি দীপেন্দ্রনাথ মুদ্রিত স্কেচ বা পূর্বদৃষ্ট ফোটোগ্রাফ-এব ফ্রেম থেকে বেরিয়ে এসে চলাফেরা কবেন পাঠকের সামনে। আব স্কটিশচার্চ, ইউনিভাসিটি, পরিচয় দপ্তব—কলেজ ষ্ট্রিট-এর টোপোগ্রাফি যাব জানা তিনি তো একটা অসাধাবণ তথ্যচিত্রই দেখতে পান। বিশেষ করে তরুণ সান্যাল ও জ্যোতিপ্রকাশেব লেখা, দেবেশ রাযেব স্মৃতিচাবণ পাঠককে ভীষণভাবেই আক্রান্ত কবে, আপ্লুত কবে।

সম্পাদনায কযেকটি ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই তা নয, মুদ্রণপ্রমাদও আছে—দুটি সম্পাদকীয নিযেও বিবুদ্ধ বক্তব্য লেখা যায, কিন্তু যে শ্রম ও নিষ্ঠায, যে অনুবাগে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হযেছে, তার প্রতি শ্রদ্ধাবোধেই সেই সব ত্রুটিব স্খালন ঘটে যায। কাবণ পাঠকেব পক্ষ থেকে এ প্রযাসেব জন্য কৃতজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু জানানোব নেই। —সুমন ভট্টাচার্য

দিবাবাত্রিব কাব্য ঃ দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায সংখ্যা

সম্পাদক ঃ আফিফ ফুযাদ / আমন্ত্রিত সম্পাদক ঃ সাধন চট্টোপাধ্যায

জনপদ কথা ঃ কালনা, কিরাতভূমি-জলপাইগুড়ি

মানুষের বহু যত্নে তাদের জীবন যাপন প্রক্রিযার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে গড়ে ওঠে এক একটি জনপদ। জনপদের প্রাচীনত্ব তাই বহু প্রজন্মের মানুষের যাপিত জীবনের সাক্ষ্য বহন কবে। তার যেমন থাকতে পাবে পাথুবে প্রমাণ, তেমনই থাকতে পাবে জনপদবাসীব জীবনের বহতা ধারায বহু কালেব অবদানের ছাপ, তাদের বিশিষ্ট হয়ে ওঠার কাহিনী। সব জনপদ সম্পর্কেই কথাটি প্রযোজ্য।

১. গাঙ্গেয ব-দ্বীপেব যে অঞ্চল একালে অম্বিকা কালনা নামে পরিচিত, তারই প্রাচীন নাম ছিল 'অম্বুয়া'। ব-দ্বীপ অঞ্চল বলেই দক্ষিণবঙ্গের ভূগোল আব ইতিহাস প্রথম থেকেই এক ধাবায় সুস্থিত বিকাশের সুযোগ পায়নি। তাব স্থান পরিবর্তন ঘটেছে, যাব সঙ্গে তাল বেখে মানুষদেব সরতে হয়েছে, অনেকটা একালেব ঠিকানা বদল করাব মতো। তবে সেকালে অঞ্চলকে কেন্দ্র কবেই স্থান নাম গডে উঠতো বলেই স্থান পবিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষেব জীবনের সব অনুষঙ্গ বদলে যায নি। তবু যদি কিছু স্থান মাহাত্ম্যে বদলে গিযেও থাকে, বহুশত বছরেব ব্যবধানে তাদেব সবকিছু সনাক্ত করার উপায নেই।

অম্বুযাব ইতিহাস অনুসন্ধানে একেবাবে গোডাব যুগের যে ধাবণা কবা যায সেখানে তিরুমালা লিপির ভৌগোলিক নির্দেশ থেকে বোঝা যায 'কালনাব পূর্ব প্রান্তেই সাগব ছিল'। বিজ্ঞানের ভাষ্যেও পলিমাটির স্তর পবম্পবা বিশেলষণ করে আম্বুযার সমুদ্র তীরবর্তী অবস্থানের ধাবণা দৃঢ হয। স্বভাবতই যখন থেকে অভিযাত্রী দল সমুদ্রের ওপারে কি আছে জানার নেশায় ঘবছাড়া হয়েছে, তাদেবই আবিস্কাবেব সূত্রে কযেক শতকের মধ্যেই গড়ে উঠেছে প্রাচীন যুগে বিভিন্ন জনপদের মধ্যে লেনদেনের সম্পর্ক। সভ্যতাব ধাবাগুলি এই ভাবেই মোহানায এসে মেশে, সমৃদ্ধ কবে জনপদেব জীবন। প্রাচীন অম্বুযা ছিল একটা সামুদ্রিক বন্দর, পত্তন যেখানে দেশ বিদেশের আনাগোনাকে কেন্দ্র কবে শুধু পত্তন এলাকা নয়, আশে পাশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলও একটা ভিন্নতব বিকাশেব সুযোগ পেযে ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের যুগে প্রাচীন অম্বুযা একটি কৃষি ভিত্তিক গ্রাম সমাজে উন্নত মানেব জীবন ও জীবিকা নিযে শান্তিতে ছিল, তেমন প্রমাণ বযেছে।

পূর্ব ভারতেব এই অঞ্চলে যে একটা জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী সাধকদেব বীতিমতো যাতাযাত ছিল তাব প্রমাণ জৈন 'আচাবঙ্গ সূত্র' এবং বৌদ্ধ জাতক-কথায রযেছে। একে পত্তনভূমি তাব উপব জৈন ও বৌদ্ধ প্রভাব থেকে লেখক একটা সিদ্ধান্তে এসেছেন যে সম্ভবতঃ এখানে বণিক কুসীদদেব অবস্থান যথেষ্ট ছিল যা যুগোত্তব সামাজিক পট পবিবর্তনে একটা বিশেষ দিককে চিহ্নিত কবে (পৃঃ ৪০)। সমগ্র বাঢ বঙ্গেব জনজীবনেব উপব যে তাব প্রভাব পডেছিল, সেই ধারণাও এই সূত্রে করা যায়। বাংলা সাহিত্য যাকে চর্যাপদেব কাল বলে সাহিত্যেব সেই আদি যুগে এই সব বৌদ্ধ গান ও দোঁহায

যেসব জাতি ও জনজাতির নাম পাওয়া যায়, তারা ছিল এই অঞ্চলের জন-বসতির বিশিষ্ট অংশ, হয়তো বা গরিষ্ঠ অংশ। তাদের জীবনধারাও ছিল উত্তরবঙ্গের জীবনধারা থেকে স্বতন্ত্র। দক্ষিণরাঢ়ে ব্রহ্মণ্য প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার সঙ্গে এই সব জনজাতি সমাজে অন্ত্যেবাসী হয়ে পড়ে ঠিকই. কিন্তু অম্বুয়ার বহুশত বছরের সমাজ ও সংস্কৃতিতে তাদের ছাপ রেখে যায় অপরিবর্তনীয় ভাবে। অম্বুয়ায় জৈন প্রভাবে বিশেষতঃ দিগম্বর গোষ্ঠীর প্রভাবে স্থানীয় তন্ত্রসাধনার ধারা নানা ভাবে বদলায়। তার পরিণতি হলো 'বামাচার' ও 'বীরাচার (পৃঃ ৫১)। কান্যকুব্জ থেকে বাংলায় ব্রাহ্মণ বিশেষতঃ সাগ্নিক ব্রাহ্মণদের আমদানী করার কথায় ইতিহাসের সত্য যদি তেমন নাও থাকে তবু এই বহুল প্রচলিত কাহিনীর মধ্যে সামাজিক সত্য অবশ্যই আছে যে ব্রহ্মণ্য ধর্ম এই অঞ্চলে পুনঃপ্রতিষ্ঠার আয়োজন বেশ তোড়জোর করে সুরু হয়েছিল তার থেকে বোঝা যায় গুপ্ত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টায় রাজশক্তি ও ধর্মশক্তি কিভাবে হাত মেলায়।

ব্রহ্মণ্য প্রভাবে ধীরে হলেও সুনিশ্চিতভাবে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জনবসতির সামাজিক বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটায়, যা একাল পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ আছে। তখন থেকেই সুরু হয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সহায়তায় শাস্ত্রীয় বিধানের কঠোরতর প্রয়োগ যা নিম্নবর্গের মানুষদের দারিদ্র্য দুর্দশাজাত কারণে উদ্ভূত নানা উপসর্গকে পাপ আর অনাচার বলে চিহ্নিত করে তাদের অস্পৃশ্য পর্যায়ে ঠেলে দেওয়া। আপাতঃ দৃষ্টিতে সেকালের রাজশক্তি এইসব সামাজিক বিধানের আওতায় পড়তো ঠিকই, কিন্তু তাদের রেহাই পাওয়ার পথও বিধান দিয়ে বাতলে দিত এইসব দানস্বত্ব ভোগী পণ্ডিতকুল। অম্বুয়ায় লোকধর্ম আর সপ্তগ্রামে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সমৃদ্ধ হতে থাকলে তাদের সংঘাতও মাঝে মাঝে অনিবার্য হয়। শেষ পর্যন্ত ঘটে যায় এক সমন্বয়, যাতে অম্বুয়ার সুপ্রাচীন যুগাদ্যা দেবী ব্রাহ্মণদের পূজিতা মহাকালী হয়ে ওঠেন।

অম্বুয়া নাম অম্বু বা জল থেকে আগত, এই অর্থে সমুদ্র থেকে এই অঞ্চলের উদ্ভব এই ব্যাখ্যা যেমন প্রচল তেমনই নানা দেবদেবীর সহাবস্থানভূমি বা পুণ্য ভূমি হিসেবে অম্বুয়াকে চিহ্নিত করার চেষ্টাও হয়েছে। তার সঙ্গে পরে কালনা নামটির সংযুক্তির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে কল্যাণকর বাসভূমি অর্থে কালনা শব্দটি চালু হয়েছে। সবটা মিলে মানুষের সুখে শান্তিতে বসবাসের পুন্যভূমি, এটাই হলো অম্বিকা কালনা নামের তাৎপর্য। এই অঞ্চলের গ্রামগুলির নামে 'ক' এর আধিক্য দেখিয়ে কেউ কেউ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন

শক্তিসাধনায় 'ক' অক্ষরটি এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তাই সমগ্র অঞ্চলে মানুষের ধর্মসাধনার একটা বিশিষ্ট পরিচয় তুলে ধরে (পৃঃ ৭৩)।

অম্বুয়া'র ইতিহাস আলোচনায় দেখা যায় সুলতানী আমলের বাংলায়, চৈতন্যযুগে, চৈতন্য পরবর্তীকালে এই অঞ্চল বাঙালির সমাজ ও সংস্কৃতি জীবনবৃত্তে বরাবরই বিশিষ্ট হয়ে আছে। ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা নিয়ে বাড়াবাড়ির পাশাপাশি অনাচারের যে ধারা বহমান থাকে মধ্যযুগের অম্বুয়ার ছড়ায় গানে তাঁর প্রমাণ রয়েছে (পৃঃ ১০১) এটাও সামাজিক ছবি, তবে সমৃদ্ধির নয় অবক্ষয়ের। অম্বুয়া অঞ্চলের ইতিহাসের সঙ্গে বর্ধমান রাজ-পরিবারের সম্পর্ক প্রায় গোড়া থেকেই গড়ে উঠতে দেখা যায়। এই রাজ-পরিবারের আদিপুরুষ ঘনশ্যাম কাপুর বর্ধমানে বসতি গড়েন ১৬১০ খৃষ্টাব্দে। গঙ্গাতীরে অম্বুয়া পুণ্যভূমি নাম তখন সুদূর বিস্তৃত। রাজমাতা ব্রজকিশোরী দেবী ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে এই অঞ্চলের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁরই দানে প্রত্যক্ষভূমিকায় অম্বুয়ার মন্দির নগরী নাম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এই বর্ধমান রাজবংশ এখানে বহু মন্দির নির্মাণ করেছেন, সংস্কার করেছেন আরো অনেক প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরের।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বাংলায় রাজবৃত্তে পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অম্বুয়ার জীবনেও তার ছাপ পড়ে গভীরভাবে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এখানকার মানুষ কতোটা দুর্দশাগ্রস্ত হয়েছিল, তখনকার বাজারদরের একটা তুলনামূলক হিসেবে সেটা বোঝা যায় (পৃঃ ১৪৫)। অম্বিকা কালনা অঞ্চলে ঠ্যাঙারে বাহিনী, ডাকাতদের কথা, দেশের নানা জায়গা থেকে ঠগীদের এসে এই এলাকায় নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ার কথা, উনিশ ও বিশ শতকের বহু বিশিষ্ট মানুষের আত্মজৈবনিক রচনায় পাওয়া যায়। (পৃঃ ১৫৯—১৬৬)।

ইতিহাসে কালনার নিজের আত্মপরিচয়ে বিশিষ্ট হয়ে ওঠার কতো কথা, কতো কাহিনী আছে তার বিরাট একটা দলিলচিত্র তুলে ধরেছেন তরুণ গবেষক তরুণ ভট্টাচার্য তাঁর 'কালনার ইতিহাস' গ্রন্থে। বহুমুখী জীবন ধারার একটা বর্ণাঢ্য পরিচয় গবেষক তরুণ ভট্টাচার্য দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে, যার জন্যে আঞ্চলিক ইতিহাসে অনুসন্ধিৎসু সমস্ত মানুষ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন। কি নেই তাঁর গ্রন্থে রাজচরিত মালা থেকে কায়স্থ কুলীন সংবাদ, লৌকিক জীবনকথা, উৎসব, জীবনযাত্রা, আমোদ প্রমোদ খেলাধুলার কথা, নাটকের দল, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কথা, চিকিৎসা ব্যবস্থা, রোগভোগ এমন কি পতিতা পল্লীর কথাও বাদ যায়নি সামাজিক জীবন পরিচয়ে। কালনা

এলাকায় গুরুবাদ থেকে ধর্মজীবনের উত্থান-পতন, কীর্তন, মেলা থেকে কৃষ্ণযাত্রা, নিশিকুটুম্ব কাহিনী থেকে ডাকাতি ও ত্যাগেব যুগলবন্দী, কুটীব-শিল্প থেকে সূচীশিল্প, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, স্কুল কলেজ থেকে ক্রীড়া আলেখ্য সব কিছুব যথাসাধ্য একটা আকরগ্রন্থ রচনা কবেছেন তরুণ ভট্টাচার্য। তাব জন্যে যে অশেষ শ্রম, নিষ্ঠা ও গবেষণা তাঁকে কবতে হযেছে তাব স্বাক্ষব বযেছে তিন শতাধিক পৃষ্ঠাব এই বড়ো মাপেব গ্রন্থে। সাধু প্রচেষ্টার সার্থক ফসল 'কালনাব ইতিহাস'।

তবু এই স্বল্প পরিসব আলোচনাব শেষে বলা দরকাব বলে মনে কবি বইটি আগাগোড়া লেখাব পব কিছুটা সম্পাদনাব প্রয়োজন ছিল। তাতে তথ্যের ভাব সুবিন্যস্ত হতো। তরুণ লেখকের কাছে আবেকটা অনুবোধ কালনাব ইতিহাস'-এর একটা লঘু সংস্কবণ প্রকাশ করুণ, তাতে বৃহত্তব পাঠক সমাজ উপকৃত হবেন। তাঁব নিষ্ঠা দেখেই একথা বলাব ভবসা কবতে পাবা যায়।

২· পান্ডববর্জিত কিবাতজনদেব দেশ কিবাতভূমিব একাংশেব আধুনিক নাম জলপাইগুড়ি। জেলা পবিচিতিতে জলপাইগুড়ি অর্বাচীন ১৮৬৯ সালে তাব সৃষ্টি ইংরাজদেব প্রশাসনিক তাগিদে। মোগলযুগে বাজস্বদপ্তবেব কাগজপত্রে পূর্বভাগ চাকলা নাম পাওযা যায, যাব বর্তমান এলাকা জলপাই-গুড়ি থানা অঞ্চল। আব মোগল প্রশাসনেব নথিতে পাওযা যায ফকীব গঞ্জ থানাব নাম, যা এখনকাব জলপাইগুড়ি থানা। জেমস বেনেলেব ম্যাপেই সর্ব প্রথম জলপাইগুড়ি নাম পাওযা যায, সেটা ১৭৭৯ সালেব কথা। বর্তমানে ২৮ লক্ষ মানুষেব বাসভূমি জলপাইগুড়ি তাব সব বাসিন্দাব জন্ম কিম্বা পিতৃ অথবা মাতৃভূমি নয, তবে সকলেব একান্ত নির্ভব আশ্রয়ভূমি। সেই পবিচয় তাদেব অস্তিত্বেব পরতে পবতে মিশে গেছে। ১৯৯৪ সালে জেলা জলপাই-গুড়িব ১২৫ বছব পূর্তি উপলক্ষে 'উত্তব সাবনি' সাহিত্য পত্রেব বিশেষ উদ্যোগে আব বহু মানুষেব আন্তবিক প্রচেষ্টায একটা বিবাট সংকলনগ্রন্থ প্রকাশিত হযেছে। এই আলোচনা সেই সংকলনগ্রন্থ নিযে যদিও সামযিক পত্রেব স্বল্প পরিসরে ১২৫ জন লেখকেব প্রায ১২৫ টি বিষয নিযে তথ্যপূর্ণ কিন্তু আবেগ থেকে লেখা নিবন্ধগুলিব একটা খুব সংক্ষিপ্ত রূপ বেখা দেওযা সম্ভব নয। সংকলন সম্পাদক অববিন্দ কর, সম্পাদনা সহযোগী আনন্দ গোপাল ঘোষ ও গোপা ঘোষ পাল চৌধুরী এই সুবিপুল কর্মকান্ডকে যে ভাবে পবিণতির দিকে টেনে নিতে পেবেছেন, শুধু সেটাই একটা দীর্ঘ

আলোচনাব বিষয় হতে পাবে। নিজে এই জেলার মানুষ এবং তাব জীবনেব সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অসংখ্য ঘটনাব সঙ্গে যথেষ্ট পবিচয় না থাকলে কোন আলোচকেব পক্ষেই বিষয়টিব উপবে সমানভাবে কোন আলোচনা কবা সম্ভব নয়। কাবণ সেখানেও দবকাব বিশেষজ্ঞতার।

সংকলন গ্রন্থটি বিষয় গৌববে কতোটা সমৃদ্ধ এবং ঈর্ষনীয় তার প্রধান বিভাগগুলির নামোল্লেখ থেকেই সেটা বোঝা যাবে। যেমন প্রাক কথা, ভূ-প্রকৃতি আর্থ—সামাজিক, শিক্ষা, চা-বাগিচা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, সমীক্ষা, আন্দোলন, ব্যক্তি ও পবিবাব, বিবিধ, থানা পরিচয়, এবং মোট বাবোটি শিবোনামে বাংলায় লেখা বিবাট প্রবন্ধ সমষ্টি ছাড়াও বয়েছে একটি মনোজ্ঞ ইংবাজি ভাষায় বচিত বিভাগ যেখানে উন্নয়ন ও উন্নয়ন প্রশাসনেব দৃষ্টিকোণ থেকে বচিত আবো দশটি নিবন্ধ বয়েছে। সংকলকরা প্রায় জেলাব একটি সমসাময়িক গেজেটিয়াব বচনাব দৃষ্টিকোণ থেকে যে গ্রন্থটিব পবিকল্পনা কবেছিলেন তাতে আব কোন সংশয় থাকে না। এহেন মহৎ সংকল্পেব সার্থক রূপায়নেব জন্যে তাঁদেব পাঠক বর্গেব অকুণ্ঠ প্রশংসা প্রাপ্য।

প্রাক কথা অংশ হলো ইতিহাসে জলপাইগুড়িব আলোচনা অংশ যেখানে গত তিন চাবশ বছবেব উত্তববঙ্গেব ইতিহাস প্রাধান্য পেয়েছে। বাংলায় উপনিবেশিক শাসনেব যুগে বাজ্য ও ব্যবসা বাণিজ্যেব বিস্তাব প্রচেষ্টা কেমন হাত ধবাধরি কবে চলেছিল উনিশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধে তাবই এক মনোজ্ঞ কাহিনী বয়েছে এই অংশে। এই জেলাব ইতিহাসেব সঙ্গে কোচবিহাব বাজ্য ও বাজবংশেব নিবিড় যোগ বিশেষ আকর্ষনীয়। তবে এই অংশেব নজবকাড়া বিষয় হলো জেলাব পুলিশ প্রশাসনেব একশ পঁচিশ বছব ও বিবর্তনেব কাহিনী। পুলিশ প্রশাসনেব নজব এই সীমান্তবর্তী জেলাব যে বিশেষ ভাবে থাকবে সেটা সহজেই অনুমান কবা যায়। প্রাক্ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা উত্তবকালে পুলিশ প্রশাসনেব দৃষ্টিভঙ্গি এই জেলাব সমাজ সংস্কাব থেকে রাজনৈতিক আন্দোলনকে কি চোখে দেখতো, শুধু আইন ও শৃঙ্খলা বক্ষাব দায়িত্ব পালন অথবা অন্যকিছু তাব অন্তরঙ্গ পবিচয় থাকলে বীবেন্দ্র কিশোব বায়েব এই নিবন্ধ স্মবণীয় হয়ে থাকতো। ফকিবগঞ্জ থেকে জলপাইগুড়ি নিবন্ধে গ্রাম্য যে সব ছড়া ও গানেব উল্লেখ কবেছেন তৈয়ব চৌধুরী সেখানে মঙ্গল কামনায় তিস্তা বুড়ীব পুজোব কথা বলা হয়েছে। বাংলার কোন জেলায় প্রধান নদীব উদ্দেশ্যে জনবসতিতে পুজোব প্রচলন আছে কিনা এই আলোচকেব জানা নেই। যদি কোথাও না থেকে থাকে তাহলে সামাজিক চিত্রেব বিশিষ্ট দিক হিসেবে তাব উল্লেখ যেমন দবকাবি, তেমনই দরকাব হলো জেলাব কোন বিশেষজ্ঞের বিস্তাবিত আলোচনা।

ভূ-প্রকৃতিব আলোচনা মুখ্যত বিশেষজ্ঞদের এক্তিয়ার যদিও তার মধ্যে

জেলার খনিজ সম্পদ, নদনদী বিশেষতঃ জেলার দীঘি নিয়ে আলোচনায় উমেশ শর্মা একটা স্বতন্ত্র মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গে বাস্তু-ভিটা নির্মাণে লোককথায় উল্লিখিত খনার বচন, 'পূবে হাঁস, পশ্চিমে বাঁশ, উত্তরে গুয়া দক্ষিণে ধুয়া' যদি সত্যিই বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকে তাহলে অনুমান করতে হয় এখানকার গ্রাম জীবন বহুকাল ধরেই ধান জান সমৃদ্ধ ছিল। সুবীর সরকারের জেলার পরিবেশ অবক্ষয় সম্ভাব্য প্রতিকার নিয়ে আলোচনা খুবই কালোপযোগী।

জলপাইগুড়ি জেলার আর্থ সামাজিক চালচিত্রের আলোচনা নানা কারণেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দেশবিভাগের পর তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিপুল সংখ্যক উদ্বাস্তুর আগমন। তাঁরা জেলার জনবিন্যাসে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন, কৃষি সহ অর্থনৈতিক কাজকর্মে রূপান্তর ঘটিয়েছেন এমন কি লোকায়ত সংস্কৃতির ধারাকেও নানা দিক থেকে উজ্জীবিত করেছেন। জেলার কৃষিও সম্ভাবনা এবং আর্থ সামাজিক ইতিহাস নিয়ে মন্তব্য করার মধ্য দিয়ে যথাক্রমে তুষারকান্তি দে ও রণজিৎ দাশগুপ্ত সুন্দরভাবে তার একটা রূপ রেখা তুলে ধরেছেন। জলপাইগুড়ি জেলার জোতদার সমাজ নিয়ে হরিপদ রায়ের আলোচনা প্রভূত তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে জোতদার আধিয়ার সম্পর্কের মধুর দিকের যে সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন সারা পশ্চিম বাংলার প্রেক্ষিতে সেই সিদ্ধান্ত বিতর্কিত হতে বাধ্য। তবে জলপাই-গুড়ি জেলার যদি বিশেষ কোন দিক থেকে থাকে, তাহলে কথাটি স্বতন্ত্র। স্থানীয় কৃষক আন্দোলনের নেতা ও কর্মীরা তার সুবিচার করতে পারেন। লোকায়ত বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে গোবিন্দ রায়ের আলোচনা বেশ মনোজ্ঞ। সামাজিক সংহতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে বোঝা যায় লোকায়ত বিচারের বিশেষ অবদান ছিল। কিন্তু উদ্বাস্তু আগমনে জনবিন্যাসে পরিবর্তন আর চা-বাগানের কাঁচা পয়সার অর্থনীতি সেই সংহতিকে কেবল গুঁড়িয়ে দেয়নি, তাকে ক্লেদাক্ত করে দিয়েছে। মনি ভূষণ রায় রাজবংশী সমাজ ও বিবাহ নিবন্ধে এমন অনেক সমাজতাত্ত্বিক উপাদানের যোগান দিয়েছেন, যার আকর্ষণ জেলার বাইরের লোকের কাছে খুব বেশি। একই কথা বলা যায় অশোক কুমার রায়ের আদিবাসী সমাজের বিবাহ নিবন্ধ সম্পর্কে। জলপাইগুড়ি জেলায় মাড়োয়ারী সমাজ নিবন্ধে নারায়ণ চন্দ্র সাহা যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে বোঝা যায় মহাজনী কারবারে পুঁজি লগ্নী করে প্রভূত উপার্জন করলেও তাদের অনেকেই জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে পড়ায় তার জনজীবনের সঙ্গেও একাত্ম হয়ে পড়ে এবং বহিরাগতের মানসিকতা ছেড়ে জেলার কল্যাণেও ভূমিকা নেয়। শিব তপন বসুর উনিশ শতকের অধিবাসী ও জীবনযাত্রা পাঠককে অতৃপ্ত রাখে। রাজবংশী সমাজে পরিবর্তন নিয়ে শীতাংশু চক্রবর্তী সুন্দর আলোচনা করেছেন যদিও রাজবংশীদের নিয়ে অন্য

আলোচনাগুলির সঙ্গে একটু সুসম্পাদিত হলে পাঠকদের উপকারে আসতো। জেলার অন্যতম প্রধান ব্যবসা কাঠ এর বনসম্পদের দৌলতে স্বাভাবিক কারণেই গড়ে উঠেছিল। কিন্তু নির্বিচার গাছ কাটা ও কাঠ রপ্তানী চলতে থাকলে ব্যবসার রমরমে অবস্থা থাকবে কি? রুক্মিনী ভট্টাচার্য সময়োপযোগী আলোচনা করেছেন।

জেলার শিক্ষাচিত্র নিয়ে বীরেন্দ্র প্রসাদ বসু ও গোপা ঘোষ পাল চৌধুরী তথ্যবহুল আলোচনা করেছেন। সুজাতা রবারী মাদ্রাসা ও চতুষ্পাঠী নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তার গুরুত্ব জেলার বাইরেও রয়েছে। চতুষ্পাঠীর স্বাভাবিক অবস্থায় সারা দেশের অবস্থার প্রতিফলন। কিন্তু মাদ্রাসা প্রসঙ্গটি আলাদা। মাদ্রাসা শিক্ষা ধর্মীয় শিক্ষা নয়, দেশের সাধরণ শিক্ষার অন্তর্গত সেটাই খবর। জেলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রসার কেন দরকার প্রদীপ নন্দী স্বল্প পরিসরে সেই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

জলপাইগুড়ি জেলার অর্থনীতিতে চা শিল্পের অবদান বিশেষত বাঙালীদের অবদান বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। বাঙালিদের এই শিল্পে ব্রতী করেন আচার্য জগদীশ চন্দ্রের পিতা ভগবানচন্দ্র বসু। ইংরাজ চা-করদের মতো পুঁজি লগ্নি ও বাজারের সুবিধা বাঙালিদের ছিল না। তবু প্রাক ও স্বাধীনতা উত্তরকালে বাঙালি উদ্যোক্তারা স্যার রাজেন মুখার্জি এবং মুখ্যমন্ত্রি বিধান রায়ের আনুকূল্যে যে প্রতিকূলতা কাটাতে পেরেছিলেন সেটা উল্লেখ্য ঘটনা। জেলার চা শিল্প সম্পর্কে কামাখ্যা চক্রবর্তী চা-বাগান শ্রমিকদের জীবন ও সংস্কৃতি নিয়ে সমীর চক্রবর্তী, মহিলা শ্রমিকদের সম্পর্কে তপন দেব, সনৎ চট্টোপাধ্যায়ের সুন্দর আলোচনা সংকলনকে সমৃদ্ধ করেছে। জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ব্যায়ামচর্চা, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা ও খেলাধুলা সম্পর্কে ডাঃ অনুপম সেন, কমলেশ বিশ্বাস, অশোক রায় ও মলয় মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা সংকলনকে পূর্ণতা দিতে সাহায্য করেছে।

জলপাইগুড়ি জেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিভাগে মোট চোদ্দটি নিবন্ধে একটা নিটোল চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। শৈলেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে এই জেলার অবদান আলোচনায় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা', উপন্যাস, অসীম রায়ের 'গরালবাড়ি' গল্প, ননী ভৌমিকের 'হটা বাহার', দেবেশ রায়ের প্রধান সাহিত্য কর্ম, 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত', সমরেশ মজুমদারের 'কালবেলা', জেলার সাহিত্য আন্দোলনের প্রতিফলিত চিত্র কার্তিক লাহিড়ির 'শনি' প্রভৃতি উপন্যাস এককথায় তাঁদেরও অন্য অনেকের সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমি জলপাইগুড়ি স্মরণ করিয়ে দিয়ে বিশেষ দায়িত্বশীল সাহিত্যকর্মীর ভূমিকা পালন করেছেন। সাহিত্যে আড্ডার সৃজনশীল অবদান নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন জেলার অন্যতম বিশিষ্ট লেখক

নির্মলেন্দু গৌতম, ষাট দশকের আড্ডা নিবন্ধে। জেলার অন্যতম জনগোষ্ঠী বাভাদেব সাংস্কৃতিক জীবন নিয়ে সুনীল পাল ও রেবতী মোহন সাহার অন্তবঙ্গ চিত্র প্রশংসনীয় উদ্যোগ। জেলার কুশান গান ও তাব আঙ্গিক নিয়ে শ্যামাপদ বর্মন, সংগীতচর্চার সেকাল ও একাল প্রসঙ্গে সমবেন্দ্র দেব বায়কত এবং ভাওয়াইযা প্রসঙ্গে সম্পাদক অববিন্দ কব যে আলোচনা করেছেন জেলার সাংস্কৃতিক পবিমণ্ডল নখদর্পনে না থাকলে সেই আলোচনা সম্ভব নয। তাঁবা সমস্ত পাঠকেব কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন। বস্তুত লোকায়ত সংস্কৃতিব ধাবাকে এই জেলা কতোভাবে সমৃদ্ধ কবেছে তারই পরিচয রযেছে আলোচনাব ছত্রে ছত্রে। এহেন জেলায যে সাহিত্যেব চর্চায় পত্র পত্রিকা, অনু পত্রিকা নানা শহব থেকে প্রকাশিত হবে, হতে বাধ্য, সাহিত্য আলোচনার নানা বৈঠক বসবে বিদগ্ধজনেব উদ্যোগে তারও বিস্তারিত খবব রয়েছে কযেকটি নিবন্ধে। পবিতোষ দত্ত 'চলমান জলপাইগুড়ি' কিছুটা নস্টালজিযাব মধ্য দিয়ে বহতা জীবনেব যে ধাবাকে সংক্ষেপে হাজির কবেছেন সেটাও মনে রাখাব মতো।

সমীক্ষা বিভাগেব সবকটি আলোচনা অশেষ মূল্যবান। জনবিন্যাস গ্রামীন জনবসতি গ্রাম নাম বিশেষ করে গুড়ি, বাডী কাটা শব্দগুলি নামেব শেষে কেন যুক্ত হলো তাব একটা ব্যাখ্যা দিযে বিষযটির জেলাগত স্বাতন্ত্র্যকে ফোটাতে চাওয়া হযেছে। এই বিভাগে 'বেচারাম কেনারাম' নিবন্ধটিব পবিকল্পনা এবং লেখক অপূর্ব ঘোষের উপস্থাপনার মধ্যে একটা অভিনবত্ব আছে।

জেলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেব ইতিহাস (১৮৬১—১৯৯৪) নিবন্ধে আনন্দ গোপাল ঘোষ ও বত্না বায ঘোষাল যে রূপরেখা ধবেছেন সেটা পড়ে আবো জানাব আকাঙ্খা জাগে। আনন্দ বাবুর বকসা বন্দি শিবিরের আলোচনা মনে বাখাব মতো। জেলার মন্দির শিল্প, প্রত্ন নিদর্শন, মসজিদ ও মঠের কথা বহু মানুষের কৌতূহল মেটাবে। জেলার স্বরণীয় ব্যক্তিত্ব ও ববনীয পবিবাব বিভিন্ন রাজ পরিবাবের কথা, জেলার মানুষদের কাছে অতি পবিচিত হলেও বৃহত্তর বাঙালি সমাজের কাছে তার স্বতন্ত্র আবেদন আছে ভবিষ্যতে এই জেলাব কোন চিন্তাশীল মানুষ যদি তার সামাজিক ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন তাহলে এই ব্যক্তি ও পবিবার কথা আকবগ্রন্থ হিশেবে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য প্রমাণিত হবে। সকলের নামোল্লেখ করা সম্ভব নয বলেই সাধারণ ভাবে বলা দরকার গভীর নিষ্ঠায লেখকরা ন্যস্ত দাযিত্ব পালন করেছেন। জেলার আন্দোলন গুলির কথাও এইসূত্রে এসে পড়ে, যা এমনিতেই একটা স্বতন্ত্র পুস্তিকা হতে পারে। চারুচন্দ্র সান্যাল মহাযের রচনা 'জলপাইগুড়ি শহরের একশো বছর' পুর্ণমুদ্রণ করে সংকলকরা এই গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধি করেছেন।

থানা পরিচয় অংশটি সংকলনকে একটা বিশিষ্ট মাত্রা দিয়েছে। যাঁরা এর

পরিকল্পনা করেছেন এবং যাঁরা প্রতিটি থানার পরিচয়ে যথাসাধ্য তথ্যের যোগান দিয়েছেন সেটাই এজাতীয় গ্রন্থের একটা নতুন দিক হতে পারে। প্রতিটি থানা এলাকার জনজীবনের দৈনন্দিন চিত্র থেকে সুরু করে তাদের আন্দোলন ও সংগ্রামের কথা সমাজ ও সংস্কৃতির কথা, বেঁচে থাকার আয়োজন নানা বাধা ও বাধা অতিক্রমের কাহিনী যা এই অংশে আভাসিত সেটা সংকলন গ্রন্থের সম্পদ বলে মনে হতে পারে।

সব শেষে যে অংশটি ইংরাজিতে লেখা তার বেশির ভাগই জেলার প্রশাসন ও অন্যান্য কাজের ভারপ্রাপ্ত নানা মানুষের রচনা। সেই আলোচনার বিচার স্বতন্ত্র, যদিও তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য। সম্পাদক মণ্ডলী, লেখকরা সমস্ত পাঠক সমাজের প্রশংসা পাওয়ার দাবি অক্লেশে করতে পারেন।

তবু আলোচক হিসেবে এই কর্মদক্ষ উদ্যোক্তা ও সম্পাদক মণ্ডলীর কয়েকটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা জরুরী বলেই মনে করি। যেমন—

(১) এই সুবিপুল আয়োজনের মধ্যে জেলার সামাজিক স্তর বিন্যাসের দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে। শুধু সমকাল নয় তার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ও তার মধ্য থেকেই ফুটে ওঠে। জেলার সমূহ পরিচয়ে সেটাও জরুরী প্রসঙ্গ।

২। জেলার মুসলমান সম্প্রদয়ের উপর স্বতন্ত্র একটি আলোচনার অভাব লক্ষ্য করেছি। সাম্প্রদায়িক চেতনার দৃষ্টিকোন থেকে বলছি না তাদের বিশিষ্টতার জন্যেই সেই আলোচনা দরকার ছিল। ব্যক্তি হিসেবে বহু মুসলমানের বিশিষ্ট অবদানের স্বীকৃতি আছে, মাদ্রাসা শিক্ষার কথাও বলা হয়েছে সবিস্তারে, তাহলে এই সম্প্রদায় নিয়ে একটা স্বতন্ত্র আলোচনা বোধহয় প্রাসঙ্গিক ছিল।

বহুজনের মিলিত প্রচেষ্টায় এই সার্থক উদ্যোগের প্রেক্ষিতেই এই প্রত্যাশা জাগে, অন্যথায় হয়তো তা বলার দরকার হতো না। আশা করা যায় অদূর কিম্বা দূর ভবিষ্যতে যখন সমগ্র জেলাকে কেন্দ্র করে এই রকম কোন মহৎ প্রচেষ্টা হবে তখন হয়তো সেই উদ্যোগের কর্মকর্তারা এই ঘাটতি পূরণে চেষ্টা করবেন। সেটা সমকালের বিষয় না হয়ে ইতিহাসের বিষয় হয়ে গেলেও তার একটি প্রাসঙ্গিকতা থাকবে। —বাসব সরকার

১। কালনার ইতিহাস, তরুণ ভট্টাচার্য মাতৃকা প্রকাশনী মধুবন, কালনা বর্ধমান পৃঃ ৩১৫+পরিশিষ্ট পৃঃ ৪৮, দাম একশ টাকা

২। কিরাত ভূমি, জলপাইগুড়ি জেলা সংকলন (১৮৬১—১৯৯৪)
সম্পাদক ঃ অরবিন্দ কর, উত্তর সরণি সাহিত্য চক্রের পক্ষে প্রকাশিত, পৃঃ ৮০৫, দাম দু'শ টাকা।

স্বাধীনতা পঞ্চাশ

'স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর' শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত একটি সংকলন গ্রন্থ যেখানে বহুজনের দৃষ্টি কোণ থেকে দেশ ও জাতির ইতিহাসের পাঁচ দশক মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রবন্ধকাররা বিশিষ্টজন, স্বক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং মননশীলতার জন্যে বাঙালি সমাজে প্রসিদ্ধ। তাঁদের প্রত্যেকেরই একটা বক্তব্য আছে, যা প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে তাঁরা স্পষ্ট ভাষায় ও ভাবে বলেছেন।

সংকলন গ্রন্থের প্রথম ও শেষ রচনা এমন দুজন বাঙালির যাঁদের জীবনের প্রায় প্রথমার্ধ কেটেছে প্রাক্-স্বাধীন ভারতে আর দ্বিতীয়ার্ধে এই পাঁচ দশকের ইতিহাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে। তাঁরা হলেন যথাক্রমে অন্নদাশংকর রায় ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর আলোচনায় তাই প্রাক-স্বাধীনতা পর্বের কথা দেশ, সমাজ, মানুষ, রাজনীতি ও আন্দোলনের কথা, দেশ বিভাগের দায় ও দায়িত্বশীলতার কথা বারে বার গত পাঁচ দশকের জীবনে কোথায় কতোটা প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল সেই দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এটা হলো অনেকটা ছায়াছবির দৃশ্যমান ঘটনাবলীকে ফ্ল্যাসব্যাকে দেখানোর মতো একালকে সেকালের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা।

অন্নদাশংকরের 'পঞ্চাশ পূর্তির পূর্বে' এমন এক নিবন্ধ যেখানে একটা বেদনার্ত বিদগ্ধমন গত পাঁচ দশকে যা হয়েছে সেই সব অনাকঙ্খিত ঘটনাগুলি কেন ঘটলো তার কিছু কারণ তির্যক ভঙ্গিতে উল্লেখ করে বর্তমানের চালচিত্রের দুঃসহ দিকগুলি ছোট ছোট মন্তব্য প্রকট করে তুলেছে। এই আলোচনায় তার দু একটা উল্লেখ করা দরকার ঃ 'ভারতের মাটিতে যদি ভবিষ্যতে ফ্যাসি-জম জন্মায় তো ধর্মের নামেই জন্মাবে। আমাদের জনগণ ধর্মপ্রাণ বলেই ভাবনা।' (পৃঃ১৫) এই হিন্দুধর্ম বা হিন্দুইজম শব্দটি ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে কেউ ব্যবহার করে নি। হিন্দুত্ব শব্দটি তো আরও অর্বাচীন। এটি বিংশ শতাব্দীর। (পৃঃ ১৭)

'ভারত গ্রেট পাওয়ার হতে চলেছে। মিলিটারি পাওয়ার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পাওয়ার। অথচ গ্রামগুলোতে না আছে পানীয় জল, না আছে আধিব্যাধির চিকিৎসা-ব্যবস্থা না আছে প্রাথমিক শিক্ষা, না আছে চাষ ছাড়া কোন জীবিকা ... ভারত হয়ে উঠছে এক সোনার ঠাকুর যার মাটির পা। উঁচু মহলের দুর্নীতি আর নিচু মহলের ক্রাইম একে টলিয়ে দেবে' (পৃঃ ১৬)। অন্নদাশংকর একটা প্রশ্ন তুলেছেন 'আমরা স্বাধীনতা কি স্বাধীনতার জন্যেই চেয়েছিলুম ? না, চেয়েছিলুম নতুন ব্যবস্থার জন্যে। ইংরেজিতে যাকে বলে New order' (পৃঃ ১৮)।

'প্রভাত এসেছে মেঘের সিংহবাহনে' হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই

নিবন্ধে একজন দেশাভিমানী মুক্তবুদ্ধি কমিউনিস্টের দৃষ্টিকোণ থেকে পাঁচ দশকেব ঘটনা বিশ্লেষণে গান্ধী, গান্ধী-উত্তর 'পূর্বে' দেশে ও বিদেশে ভাবত নামক ভূখণ্ডের যে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রিক পরিচয় দলমত নির্বিশেষে সকলেব গর্ব ও মর্যাদাব বিষয় তারই এই নিপুণ চিত্র তুলে ধরা হযেছে। কমিউনিস্টদের বক্তব্য কোথায় সঠিক আব, কোথায় ভুল ছিল, আর দেশেব শাসকবর্গের মনে বল্লভভাই থেকে অনেক নেতা এমন কি নেহরু পর্যন্ত যে বিদ্বেষ ও ক্রোধ ছিল কমিউনিস্টদেব সম্পর্কে তারই একটা রূপরেখা পাওয়া যায এই আবেগ দীপ্ত নিবন্ধে। কমিউনিস্টবা যে ইতিহাসেব সমতালে চলাব চেষ্টা কবেছে তাবই একটা 'বর্ণময় চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন। ডায়ালেকটিকের জটিল সম্পর্ক তা দেশের নেতৃত্ব কোনদিন বোঝেনি কেবল তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়ায নীতি গ্রহণ ও শাসন চালিযেছে হীরেন্দ্রনাথ তার কিছু নমুনা দেওযাব চেষ্টা কবেছেন। সেই একই বিভ্রম ঘটে কমিউনিস্টদের ক্ষেত্রেও। হীবেন্দ্রনাথেব নিবন্ধের key words হলো গোবিন্দ দাসেব গানেব সেই বিখ্যাত পংক্তি "আমাব তুমি জন্মভূমি কার বা বাখো ডর ?"

'ভারতে গণতন্ত্রের সমস্যা ও সম্ভাবনা' সুপ্রিম কোর্টেব প্রধান বিচারপতি এ এম আহমুদি'র জাকিব হুসেন স্মৃতি বক্তৃতা মালা এবং 'সংসদীয প্রথা ও ভাবতের গণতন্ত্র' প্রবীণ সাংসদ ও প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রি ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের মবলঙ্কাব স্মৃতি বক্তৃতাব অনুবাদ। এই দুটি অনূদিত নিবন্ধ সংকলন গ্রন্থকে বিশিষ্ট করেছে। বিদ্বজন মহলে বহু আলোচিত ও উল্লেখিত এই দুটি নিবন্ধের আলোচনা আপাততঃ নিস্প্রযোজন।

'ভারতের প্রশাসন ঃ স্বাধীনতার পূর্ব ও পরে' প্রবীন সিভিলিয়ান ও বিশিষ্ট প্রবন্ধকার অশোক মিত্রর মনে বাখার মতো আলোচনা। সিভিলিয়ান হিসেবে ১৯৪২ সালে ক্রিপস প্রস্তাব থেকে সুরু কবে ১৯৮৪ সালেব ৩১ অক্টোবর ইন্দিবা গান্ধীব নিধন পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালপর্বকে লেখক খুব কাছের থেকে যেভাবে দেখছেন ক্ষমতাব কেন্দ্রে নানা দায়িত্বশীল পদে কর্মরত থাকার সুবাদে 'তাবই একটা অন্তরঙ্গ চিত্র এই নিবন্ধ। গোড়াতেই তিনি বলে নিয়েছেন ঘটনার পরতে পবতে তাঁর মনে যে সব আলোড়ন ঘাত-প্রতিঘাত ঘটেছিল ভুলচুক্ যাই থাক্ তাব পুনরাবৃত্তি কবাই তাঁর উদ্দেশ্য। এই অন্তবঙ্গ আলোচনায তিনি যে সব চরিত্র চিত্রণ করেছেন তাব মধ্যে আছেন আম্বেদকর, জিন্না, নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী। সেই চিত্রণেব কোন রূপরেখা দেওযাও এই আলোচকেব পক্ষে বিরাট ঝুঁকির ব্যাপার, কারণ তা নিজে পড়া ও উপলব্ধিব বিষয়। তবু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার জন্য উল্লেখ কবা যেতে পাবে একটি মন্তব্য ঃ 'আটাশবছর ধবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যখন নিজেব ঘরে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হবার উদ্দেশ্যে মালিক হবার একান্ত চেষ্টায় এক নাগাড়ে

লড়াই করে চলেছেন তখন এখানে পূর্ব ভারতের অধিকাংশ রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গও গয়ংগচ্ছ কেন্দ্র নির্ভর নাবালক অবস্থায় নিশ্চিন্তভাবে কালপাত করছিল (পৃঃ ১২৬)। সাম্প্রতিক বাঙলাদেশে ধনবণ্টনে প্রকট বৈষম্য দেখেও অশোক বাবুর মনে পড়েছে ১৯৪১ সালে বরিশালে শোনা একটা লোকপ্রবাদের কথা ঃ গত বছর আমার পদবী ছিল মোমিন (জোলা), এবছর চাষে লাভ করে আমার পদবী হয়েছে খান, খোদা দেন তো আসছে বছর হবে শেখ, আর খোদার দোয়ায় অবস্থা আরো ভাল হলে হবো সৈয়দ (পৃঃ ১২৭)। জাতগর্বী হিন্দুরা যদি শোনেন একথা তাহলে সকলের মঙ্গল। তাহলে বীরেন্দ্র শাসমলের মতো সুদক্ষ প্রশাসককে জাতে কেয়ট বলে কলকাতা পুরসভার অধ্যক্ষ না করার মতো অন্যায়ের আর পুনরাবৃত্তি করতে হবে না।

হোসেনুর রহমানের 'ভারত বিভাগ' একটি আবেগ তাড়িত রচনা যেখানে লেখক এই জিজ্ঞাসা তুলেছেন, দেশভাগের পঞ্চাশ বছর পরে কেন নির্মোহ ভাবে দেশভাগ কি কারণে এড়ানো সম্ভব হয়নি সেই আলোচনা করার অনিচ্ছা কিম্বা অক্ষমতা আমাদের আগামী দিনের জীবন যাপন কে বিঘ্নিত করতে পারে, সে বিষয়ে আমরা আদৌ সচেতন আছি কিনা? আবদুর রউফের উদ্বাস্তু সমস্যার খতিয়ান একটি মূল্যবান নিবন্ধ যেখানে পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতার প্রথম দুই দশকে উদ্বাস্তুদের ঢল নামা রউফ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। অবিভক্ত ভারতের খণ্ডিত দুই অংশে যারা স্বেচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছায় উদ্বাস্তু হয়ে পড়েছিলেন তাদের জীবন ও সমস্যার একটা সহৃদয় ও বিবেকী চিত্র লেখক তুলে ধরেছেন। দাঙ্গায় হিন্দুত্বের উন্মাদনায় জীবন অনিশ্চিত হয়ে উঠলেও কেন ভারতীয় মুসলমানরা আর পাকিস্তানে উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়ার কথা ভাবতে পারে না রউফের এই বক্তব্য মনে রাখার মতো।

সংকলনে নানা বিষয়ের অন্তর্ভুক্তির তাগিদে সম্পাদক 'ভারতের বৈষয়িক উন্নয়ন ঃ একটি খতিয়ান' 'স্বাধীনভারতে শিল্পোদ্যোগের চালচিত্র' 'ভারতের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা' শিরোনাম যথাক্রমে রাখাল দত্ত, অমূল্য কুমার চক্রবর্তী ও অজিত নারায়ণ বসু প্রমুখ বিশেষজ্ঞদের যেসব আলোচনা গ্রহণ করেছেন সেখানে সবাই স্বল্প পরিসরে বিবেচ্য বিষয়ের একটা রূপরেখা দিয়েছেন। তাদের নিয়ে এই আলোচকের পক্ষে কোন মন্তব্য অসমীচিন। একই কথা প্রযোজ্য ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ঃ সিংহাব-লোকন' , উৎপল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতের উত্তর স্বাধীনতা চারণকলা' অজিত কুমার দত্ত'র 'স্বাধীনোত্তর ভারতে শিল্পচিন্তা ও চর্চা, সুদিন ভট্টাচার্যে'র শিক্ষার অগ্রগতি প্রসঙ্গে, সুভাষচন্দ্র সরকারের 'স্বাধীন ভারতে সংবাদ পত্র ও সংবাদমাধ্যম', গোপীকান্ত ঘোষ রচিত 'স্বাধীন ভারত বর্ষে'র| সাহিত্য' রবীন-

বল ও সবিতেন্দ্র নাথ রায়ের বাংলা প্রকাশনার পঞ্চাশ বছর প্রভৃতি নিবন্ধে এই সংকলন গ্রন্থে বিষয় সমাবোহ বোঝা যায়। দেশেব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কেমন আছে, বিশেষত আজকের যুগে যা নিয়ে মাঝে মাঝে দুঃশ্চিন্তা হলেও মানুষের জানা শোনা নিতান্ত কম সেই অভাব কিছুটা পূরণ করবে অশোক কুমাব রায়ের সাধারণ তন্ত্রেব সীমান্ত রক্ষীবর্গ নিবন্ধ। স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে শ্রমিকসমাজ নিযে কান্তিস্মেহতার নিবন্ধ একন্তভাবে একজন গান্ধীবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। ট্রেড ইউনিযন আন্দোলনের বিভিন্ন দিক কতোটা তারমধ্যে প্রকাশিত হতে পাবে, তা নিযে বিতর্ক থাকা অস্বাভাবিক নয। সুধীন সেনগুপ্ত রচিত 'স্বাধীন ভাবতে বিজ্ঞান সাধনা' বিজ্ঞানেব অগ্রগতির নানা দিক তুলে ধরেছে যাব মূল্যান করা বিশেষজ্ঞদেব কাজ।

'সাম্যেব পথে ভারতের মেযেবা' 'মুসলিম মেযেদের না-সমস্যা, হ্যাঁ-সমস্যা যথাক্রমে অঞ্জলি বসু ও কেযা চক্রবর্তী এবং নার্গিস সাত্তার বচিত অপাবিসীম গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। বস্তুতঃ তাদেব নিয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা দরকাব। তেমনই এক নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ লিখেছেন সজল বসু 'ব্রাত্যজনেব চেতনা ও আন্দোলন' শিবোনামে যা সংকলনেব বিষযবস্তুতে নতুন মাত্রা যোগ কবেছে। 'বাংলা সাহিত্যে মেযেবা গত পঞ্চাশ বছরে রচনায সমরেশ মজুমদার যে মত প্রকাশ কবেছেন তাব ইঙ্গিত পাঠকদের পবিতৃপ্ত কববে। স্থানাভাবে এই সব লেখা নিয়ে কোন কথাই বলা সম্ভব হলো না যেটা গভীর পবিতাপেব বিষয।

সম্পাদক শৈলেশ কুমাব বন্দ্যোপাধ্যায জহরলাল নেহরুর ঐতিহাসিক বক্তৃতা Tryst with destiny শিবোনামে যে নিবন্ধ বচনা কবেছেন তাতে নিযতির সঙ্গে অভিসার আমাদেব কোথা থেকে কোথায নিযে এসেছে এই পঞ্চাশ বছবে তাবই এক মনোজ্ঞ বিববণ আছে। ক্ষমতা হস্তান্তরেব পটভূমি থেকে সুরু কবে গণপরিষদে সংবিধান রচনা, অর্থাৎ আমাদেব প্রত্যাশা আর প্রত্যাশা পূরণেব বাজনৈতিক ও আইনগত ব্যবস্থা গঠনেব পব থেকে কি পাওযা গেল আর কতোটা অপূর্ণ থেকে গেল এবং কেন, তারই এক বস্তুনিষ্ঠ চিত্র তুলে ধবাব চেষ্টা হযেছে এই নিবন্ধে। গণতন্ত্রেব বাস্তবরূপ কেবল মাঝে মাঝে ভোটেব দিনে লাইনে দাঁড়িযে ভোট দেওযা, এদেশের মানুষ নিষ্ঠাব সঙ্গে এই পঞ্চাশ বছব সেকাজ কবে এসেছে। গণতন্ত্রের অর্থ তাব বেশি কিছু একথা জানাব সুযোগ বহু মানুষের জীবনেই আসেনি আব ইদানীং তো সেই লাইনে দাঁডানোব কষ্টটুকু কবা থেকে অব্যাহতি দেওযার হিড়িক দেখা যায নানা বাজ্যে। ক্ষমতাব বিকেন্দ্রীকরণ ঘটলে পবিস্থিতি বদলে যাবে কিনা, সেটাও একটা অনিশ্চযতা।

বাজনৈতিক মূল্যবোধের চূড়ান্ত অবক্ষয় সাংস্কৃতিক জীবনে ভোগবাদী

মানসিকতার দাপাদাপি অর্থনীতিতে গতিহীনতা নেতৃত্ব থেকে আমলাতন্ত্র যথাক্রমে দল থেকে প্রশাসনে এমন একটা আত্মমগ্নতার সূচনা করেছে যা ব্যক্তি আর ছোট ছোট গোষ্ঠীর বাইরে দেশ ও দেশের মানুষের কথা ভাবতে অনভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। লেখক গান্ধীবাদী সমাজকর্মী বিদগ্ধ মানুষ। তিনি এই সাম্প্রতিক চিত্রকে বলেছেন 'এসব সংক্রান্তি কালের লক্ষণ'। নিয়তির সঙ্গে যে অভিসারের সূচনা হয়েছে স্বাধীন ভাবতে পঞ্চাশ বছরে, পরবর্তী অর্ধ শতাব্দীতে তার ভিন্নদিকে মোড় নেওয়া সম্পর্কে লেখক গভীর আশাবাদী। সংক্রান্তি কাল তো পরিবর্তনেরই দ্যোতক। সেই আশা তিনি পাঠকদের মনে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন।

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর একটি মূল্যবান সংকলন যার জন্যে সম্পাদক শৈলেশ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর সহযোগী লেখকরা এবং প্রকাশক 'মিত্র ও ঘোষ' সংস্থা সাধুবাদ পাবেন। বাঙালি পাঠকের হাতের কাছে এই সংকলন ঠাঁই করে নেবে তেমন আশা সহজেই করা যায়।

—বাসব সরকার

স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর ঃ সম্পাদনা শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, দাম একশ টাকা।

আশীষ মজুমদার

দীর্ঘ, কষ্টকর ও দুরারোগ্য রোগভোগের পর অকালে আমাদের মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন আশীষ মজুমদার। স্বভাবত মননপ্রবণ, সাহিত্যপ্রাণ এই মানুষটিকে যাঁরাই চিনতেন, তাঁরা তাঁর এই অকাল প্রয়াণের বেদনা সহজে ভুলতে পারবেন না। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ে যেকোনো উদ্যমে বা প্রয়াসে সদা উৎসুক এই মানুষটির স্বল্পবাক, নিরহংকার, সদা সৌজন্যপ্রবণ, বন্ধু-বৎসল, শিক্ষকতায় সমর্পিত প্রাণ ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যাঁরাই এসেছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই মনে হবে এই অকালপ্রয়াণের ঘটনা তাঁদের প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ক্ষতি তো বটেই, এমনকি তার চেয়েও বেশি ক্ষতি সাহিত্য ও সংস্কৃতির নির্দিষ্ট ক্ষেত্রটিতে। নিরন্তর মননে চিন্তনে অভ্যস্ত সেই সংস্কৃতি চেতনার জগতে আশীষ মজুমদারের বিয়োগ নিঃসন্দেহে অপূরণীয় ক্ষতি বলেই প্রতিভাত হবে। ফলে, তাঁদের প্রত্যেকের চেতনায় '৯৮ সালের ১২ তারিখে মধ্যরাত হয়ে থাকবে স্থায়ী এক মর্মান্তিক ও অপূরণীয় ক্ষতির স্মৃতিচিহ্ন।

আজীবন মার্কসীয় সংস্কৃতির চেতনায় লালিত আশীষ মজুমদার নিজেকে সর্বার্থে ওই চেতনায় উদ্বুদ্ধ একজন কর্মী বলেই বিবেচনা করতেন। ফলে তেমন যেকোনো উদ্যমে ও কর্মে তিনি ছিলেন নিরন্তর উৎসুক। বিষ্ণু দের প্রেরণায় 'সাহিত্য পত্র' প্রকাশিত হলে তিনি স্বভাবতই সেই নন্দনের একজন কর্মী ও সংগঠক হিসেবে এগিয়ে। এলেন তেমনি 'পরিচয়' 'বারোমাস' প্রভৃতির সঙ্গেও নিজের আন্তরিক সাহিত্যপ্রীতির তাগিদে অন্বিত হয়েছেন তাঁর জীবনের বিভিন্ন পর্বে।

বিশেষত যৌবনে তাঁর সাহিত্যপ্রীতি ও মনন চিন্তনের প্রাণভোমরাই ছিল 'সাহিত্যপত্র'। বিষ্ণু দের প্রেরণায় 'সাহিত্যপত্রের' শেষ দিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন ওই পত্রের অন্যতম কর্ণধার ও প্রেরণাস্থল। তাঁর বসতবাটিই হয়ে

উঠেছিল 'সাহিত্যপত্রের' ঠিকানা। তাঁকে খুব গভীরভাবে যাঁরাই দেখেছেন তাঁদেরই স্মৃতিতে চিরজাগরূক থাকবে একজন 'সাহিত্যপত্র'-কর্মী হিসেবে তাঁর প্রায় নিরন্তর উদ্যোগ ও উদ্যমের কথা।

স্বভাবতই পঞ্চাশ ষাট সত্তর দশকের একজন নিষ্ঠাবান, উদ্যমী 'রাজনীতি চেতন সংস্কৃতি আর সংস্কৃতি চেতন রাজনীতির' নিরন্তর অনুরাগীর কাছে 'পরিচয়' পত্রিকা ছিল এক অত্যন্ত স্বাভাবিক আশ্রয়। বলাই বাহুল্য দশকের পর দশক সময়কাল তিনি নিজেকে 'পরিচয়'-এর একজন বলেই মনে করতেন। সে অনুরাগ অক্ষুণ্ণ ছিল তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। ফলে, তাঁর অকাল প্রয়াণে পরিচয় হারাল এক আপনজন, যিনি পত্রিকার যেকোনো প্রয়োজনে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসতেন সহায়তায়,—তা অর্থকরী হতে পারে, হতে পারে সাংগঠনিক কোনো প্রায় দৈনন্দিন দায়িত্ব পালন, বা হতে পারে প্রুফ দেখার মত আপাততুচ্ছ কিন্তু অত্যন্ত কষ্টকর কোনো কাজ।

বিশেষত আমরা যারা পরিচয়ের কর্মী হিসেবে তাঁকে কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি দীপেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বা দেবেশ রায়ের সম্পাদনার আমলে বা এমনকি হালে নব্বই-এর দশকেও, তাঁকে দেখেছি কী অদম্য নিষ্ঠায় তিনি নীরবে পালন করেছেন তাঁর ওপরে ন্যস্ত যে কোনো দায়—তার পেছনে যেমন ছিলো না কোনো জাহির করার প্রবৃত্তি, তেমনি ছিলো না 'আমার মূল্যবান সময় তোমাদের দিলাম,—আমার মহিমা ধ্যান করো'—এমন কোনো স্বাভিমানের লালন।

বিশেষত পরিচয়ের সমস্ত কর্মীরই মনে পড়বে বিগত দশকে বইমেলার দিনগুলিতে তাঁর অজস্র সাংসারিক ঝামেলা ঝক্কির মধ্যেও প্রায় নিত্য সপরিবারে হাজির থেকে তিনি কীভাবে 'পরিচয়' কর্মীদের মনোবল যোগাতেন, তার স্মৃতি।

আমরা গভীর নীরবতায় সে স্মৃতির তর্পন করব আজ। আশা করব, স্বার্থ বোধহীন আত্মবিলুপ্তির যে ঐতিহ্য তিনি রেখে গেলেন তাঁর আজীবন কর্মে ও স্বভাবে, আমরা যেন তার ভেতর থেকে সন্ধান করে নিতে পারি,

নিরন্তর এক প্রেরণা, যা হয়ে উঠবে আমাদের ভবিষ্যতের পাথেয়।

জীবন আর পৃথিবীর অনতিক্রাম্য নিয়মেই আজ আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন আশীষ মজুমদারজী। পেছনে রেখে গেলেন পত্নী প্রতিমা মজুমদার, পুত্র অভীক, কন্যা অদিতি, পুত্রবধূ নীলাঞ্জনাকে। তাঁদের সান্ত্বনা দানের ধৃষ্টতা দেখাবো না নিশ্চয়। শুধু চাইব আশীষ মজুমদার যে নীরব ও ছেদহীন আত্মবিলোপের নিষ্ঠাবান সাধনার ইতিহাস রেখে গেলেন তা যেন আগামী দিনগুলিতে ক্রমশঃ আরো অর্থবান হয়ে উঠে তাদের শোকজয়ের স্থায়ী প্রেরণা যোগাতে পারে।

—শুভ বসু

অক্টাভিও পাজ্

জ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

ব্রজবিলাস দাস

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

শান্তি মিত্র

পরিচয়

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা ঃ ৬০ টাকা

ডাকে ঃ ৭৫ টাকা

'পরিচয়'-এর গ্রাহক হোন।

PARICHAY February-April 1998. Reg. No. 13273
W. B. / EC—265

পরিচয়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মশতক সংখ্যা

সম্ভাব্য লেখক সূচী: সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় দেবেশ রায় সুতপা ভট্টাচার্য তপোধীর ভট্টাচার্য পল্লব সেনগুপ্ত কার্তিক লাহিড়ী বাসব সরকার পরমেশ আচার্য বিমল মুখোপাধ্যায় রমেন্দ্র বর্মণ অচিন্ত্য বিশ্বাস সুমিতা চক্রবর্তী রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সম্পাদনা দপ্তর: ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর: ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

পরিচয়

মে—জুলাই ১৯৯৮
বৈশাখ—আষাঢ় ১৪০৫
১০—১২ সংখ্যা ৬৭ বর্ষ

তারাশঙ্কর সংখ্যা

স্মৃতিচারণ

প্রবন্ধ

সম্পাদনা দপ্তব ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

বঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা বোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

সম্পাদকীয় প্রতিবেদন

১৩৫১—৫২ সালে 'পরিচয়' পত্রিকায় তারাশঙ্করের 'অভিযান' উপন্যাস ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরিচয়ের তৎকালীন সম্পাদক শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদার তারাশঙ্করকে সম্মান-দক্ষিণা বাবদ সামান্য অর্থ দিতে চেয়েছিলেন। এবার তাঁরই ভাষায় বলা যাক, "তারাশঙ্কর বললেন, টাকাটা রাখুন। ওটা আমার হয়ে পরিচয়-এ জমা দেবেন—পত্রিকাটা ভালো করে চালান।" —এই শুভেচ্ছার কথা 'পরিচয়' সবসময়ই মনে রেখেছে। তারাশঙ্কর শতবার্ষিকী সংখ্যা প্রকাশের বর্তমান পরিকল্পনাও বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যিকের প্রতি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিরই নিদর্শন।

এই সংখ্যার পাঠকেরা লক্ষ্য করবেন যে এখানে গতানুগতিক তারাশঙ্কর সমালোচনার পথ অনুসৃত হয় নি। অ্যাকাডেমিক আলোচনাতেও আমাদের আগ্রহ ছিল না। প্রতিষ্ঠিত সমালোচকেরা অনেকেই তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টি-ভঙ্গিতে তারাশঙ্কর সাহিত্যের অভিনব বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর উপন্যাসের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকাটিও অনেক লেখকের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। 'স্মৃতিচারণ' পর্বটি সংযোজিত করতে পেরেও আমরা গর্বিত।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষ থেকে আমাদের দুজনের ওপর এই বিশেষ সংখ্যাটি সম্পাদনার যুগ্ম-দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সকলের আন্তরিক সহযোগিতায় সংকলনটি যথা সময়ে বের করা সম্ভব হয়েছে। তাই সংশ্লিষ্ট সকলেই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

সম্পাদকমণ্ডলীর পক্ষে
কার্তিক লাহিড়ী
২০. ৭. ৯৮ বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

ঐক্যই শক্তি

"বহুর মধ্যে ঐক্য উপলব্ধি
বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন—
ইহাই ভারতবর্ষের অন্তর্নিহিত ধর্ম।"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ১৯৭৫। ৯৮

শত্রু যখন সাম্প্রদায়িকতা
প্রতিবাদ না করাই তখন অপরাধ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ-১৯৭৫ । ৯৮

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পায়ন এগোচ্ছে নতুন গতিতে

- পরিকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা
- অপর্যাপ্ত বিদ্যুৎ শক্তির যোগান
- নতুন লগ্নীর অনুকূল পরিবেশ
- সরকারের তরফ থেকে পরামর্শ ও সহায়তা

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই সি এ—১৯৭৫। ৯৮

আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

আসানসোল

আবেদন

১। বাড়ীর বা রাস্তার কল যেখানেই দেখবেন পরিশ্রুত জল পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তৎক্ষনাৎ সেটির কল (Bib-Cock) বন্ধ করে দিয়ে অপচয় রোধ করুন।

২। রাস্তার ধারে যেখানে যেখানে সরবরাহের Stand-Post আছে, সেখানে কল (Bib-Cock) না থাকলে পৌর নিগমে খবর দিন।

৩। কল অথবা Main Pipe থেকে Pump লাগিয়ে জল টেনে নেওয়া প্রতিরোধ করুন। পৌরনিগমে খবর দিন।

৪। বে-আইনীভাবে কেউ বাড়ীতে জলের সংযোগ নিয়ে থাকলে এই অফিসে খবর দিন।

৫। যে সব স্থানে ট্রাকের সাহায্যে জল পাঠানো হয় সেখানেও জল ভরার সময় যেন বেশী জল অপচয় না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখুন।

বামাপদ মুখোপাধ্যায়
মেয়র

তারাশঙ্কর ঃ সমকাল ও উত্তরকালের দৃষ্টিতে

সংকলন ও সম্পাদনায় ঃ

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

সমকাল ঃ

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায, প্রবোধকুমার সান্যাল, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায, প্রেমেন্দ্র মিত্র, মন্মথনাথ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায, অহীন্দ্র চৌধুরী, ইন্দ্র দুগার, গোপাল হালদার, বনফুল, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু প্রমুখ ।

উত্তরকাল ঃ [সম্ভাব্য লেখকসূচী]

অচিন্ত্য বিশ্বাস, অরূপকুমার দাস, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, আশিস দে, উদয়কুমার চক্রবর্তী, উদয়চাঁদ দাস, করুণাসিন্ধু দাস, কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায়, কাননবিহারী গোস্বামী, কৃষ্ণা বসু, গুণময় মান্না, চন্দ্রমল্লী সেনগুপ্ত, জ্যোতির্ময় ঘোষ, দিব্যজ্যোতি মজুমদার, দীপক মুখোপাধ্যায, নন্দদুলাল বণিক, পল্লব সেনগুপ্ত, প্রভাতকুমার দাস, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায, বরুণ চক্রবর্তী, বাঁশরী রায়চৌধুরী, বিমল কুমার মুখোপাধ্যায, বিপ্লব চক্রবর্তী, বিষ্ণু দাস, বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র দত্ত, মীনাক্ষি সিনহা, মানস মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, রত্না বসু, রাম বসু, শতঞ্জীব রাহা, শেখর সমাদ্দার, সত্যবতী গিরি, সনৎ মিত্র, সন্দীপ দত্ত, সমরেশ বসু, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুবীর মুখোপাধ্যায, সুমিতা চক্রবর্তী, সুস্নাত দাশ, স্বাতী ঘোষ, হর্ষ দত্ত, হিমাদ্রিশংকর বন্দ্যোপাধ্যায প্রমুখ ।

প্রকাশনায় ঃ

রত্নাবলী

১১, ব্রজনাথ মিত্র লেন

কলকাতা-৯

অরুণা হালদার

গৌরী আয়ুব

স্মৃতিচারণ—১

তারাশঙ্কর বাবু

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বাবুকে কবে এবং কোথায প্রথম দেখেছিলাম তা ঠিক মনে কবতে পাবছি না। সম্ভবত তাঁবই বাড়িতে, যখন তিনি থাকতেন আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে পুরোনো অমৃত বাজাব পত্রিকা অফিসেব লাগোয়া অঞ্চলে। আর একেবারে পাশাপাশি থাকতেন শিল্পী যামিনী রায়। ১৯৩৯ নাগাদ সমযে যামিনী বাবু আমাব প্রযাত পিতাব একটি ছবি এঁকে দিযেছিলেন। তখন 'অযেল-পেন্টিং একেবারে ছেড়ে দেওযা সত্ত্বেও ছবি আঁকতে আঁকতে পাশের বাড়ির বারান্দায় দাঁড়ানো তাবাশঙ্কব বাবুকে বুঝি জিজ্ঞাসা কবেন মুখেব আদল ঠিক আসছে কিনা। কারণ হল যে যামিনীবাবু নিজে আমার বাবাকে দেখেন নি, একেবারে নিছক সহজাত সহৃদয়তায় ফটোগ্রাফ থেকেই আঁকছিলেন, আব তাবাশঙ্কর বাবু আমার বাবাকে বেশি না জানলেও কযেকবার দেখে-ছিলেন! সামান্য একটা ঘটনা, আমার অথচ মনে এটা জেগে আছে।

বাগবাজাবেব গলিব মধ্যে তারাশঙ্করের ভাড়া কবা বাড়িতে বেশ কয়েক বাব গিয়েছি, একা কিম্বা চিন্মোহন সেহানবিশ কিম্বা বিষ্ণু দের মতো বন্ধুকে সঙ্গে নিযে। বিষ্ণু বাবু এবং আমারও সঙ্গে তারাশঙ্কর বাবুর হৃদ্যতা বেশ সহজ ভাবে বেড়ে উঠেছিল, বেশ মনে বয়েছে ওঁব একটা কথা (যেটা সম্ভবত যামিনী বাবুব প্রভাবে ওঁব চিন্তায ঢুকেছিল) যে আমাদের মধ্যে নাকি আছে কতকটা পুবোনো কেতাব "শীল" (শব্দটির ব্যাখ্যা দুরূহ!)। চিনুবাবুব অমাযিক ব্যবহাবে তারাশঙ্কর বাবু এমনই মুগ্ধ হযেছিলেন যে নিজহাতে "আমার কমরেড" বলে সম্বোধন কবে একটা বই চিনুবাবুকে উপহাব দেন। কেউ যেন ভেবে বসবেন না যে তারাশঙ্কর বাবু 'কমুনিস্ট' বনে যেতে বসেছিলেন। মার্কস-এঙ্গেল্স, লেনিন-স্টালিন সম্পর্কে তাঁর বিপুল শ্রদ্ধা ছিল সন্দেহ নেই; মানুষেব মহত্ত্বকে অভিবাদন জানাতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত ছিলেন না। কিন্তু কমুনিস্ট জীবনদর্শন তিনি গ্রহণ করতে পাবেন নি; কমুনিস্ট বিশ্ববীক্ষা ("World view", 'weltanschuung") যে তাঁকে কিছু পরিমাণে মোহিত করেছিল জানি, তবু ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষটির

সামীপ্য সব চেয়ে বেশি ছিল গান্ধীচিন্তার দিকে। মাঝে মাঝে দেখেছি তাঁকে নিয়ে আলোচনার চেষ্টায় কম্যুনিজ্‌ম্‌ ও কম্যুনিস্টদের বিষয়ে তাঁর মনোভাব বিষয়ে একপেশে সিদ্ধান্তের ঝোঁক। আমি শুধু বলতে পারি যে ১৮৪০-এর দশকে কার্ল্‌ মার্ক্‌স্‌ স্বয়ং যে "পার্টি'র কথা বলেন—"The Party in the grandest historical sense of the term"—সেই ইতিহাস ঋদ্ধ সজ্জন সমবায়ে তারাশঙ্কর বাবুর স্থান স্বচ্ছন্দে নিরূপিত হয়ে রয়েছে।

১৯৩৬-৩৭ সালে সদ্যস্থাপিত প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে "প্রগতি" শীর্ষক যে সংকলন প্রকাশে আমার অবিস্মরণীয় (অথচ বহুকাল ধরে বিস্মৃত) কর্মসহচর ও বহুগুণান্বিত মনস্বী সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তখনও তারাশঙ্কর বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। তখন বোধ হয় কলকাতায় তিনি মাঝে মাঝে আসতেন আর তাঁর দেখা পাওয়া যেত তৎকালে বহুখ্যাত সজনীকান্ত দাস-এর "শনিবারের চিঠি" বৈঠকে। সুরেন বাবুর বোধ হয় একটু-আধটু যাতায়াত সেখানে ছিল, কিন্তু আমার একেবারে ছিল না। "প্রগতি" সংকলনটির (১৯৩৭) কিছু ঐতিহাসিক (হয়তো সঙ্গে সঙ্গে অল্প একটু সাহিত্যিক) মূল্য এখনও আছে আর একেবারে অচিরে তা হারিয়েও যাবে না।

কম্যুনিস্ট পার্টি তখন সারা দেশে 'বে-আইনী'। কাজকর্মে হাজার ব্যাঘাত। প্রগতি লেখক সংঘের সংগঠন বলে কিছু তখন প্রায় নেই। সুরেন বাবুর ব্যাগ আর আমার কাছে এলোমেলো ভাবে রাখা কাগজপত্রই সম্বল। তবু ভাগ্যি যে তখন ছিলেন তরুণ অনিল কাঞ্জিলাল-এর মতো সাহিত্যপ্রেমী ও বিদ্যানুরাগী ছাত্র কমরেড। এদেরই নিয়ে কাজ চালানো। রিপন কলেজে বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মতো লেখকের অকুণ্ঠ সহায়তা সহজেই মিলেছিল (ঐ কলেজেরই প্রমথবিশি মহাশয় সংঘকে আমল দিতেন না)। সুরেনবাবু তবু একদিকে শান্তি-নিকেতন আর অন্যদিকে 'শনিবারের চিঠি'র আড্ডায় বিচরণ করতে পারতেন। আমি পার্টির নানা কাজে 'কাজী' হয়ে (ছাত্র আন্দোলন, পার্টিপ্রচার, জনসংযোগ ইত্যাদি) প্রগতি লেখক আন্দোলনে যতটা সময় আর ভাবনাচিন্তা দেওয়া দরকার তা দিতে পারতাম না মোল্লার দৌড় মস্‌জিদ অবধি'—তাই

একদিকে 'পরিচয়'-এর বৈঠক আর একদিকে সেদিনের আনন্দবাজার পত্রিকার বর্মণ স্ট্রীটস্থ নড়বড়ে অথচ সদাকর্মচাঞ্চল্যে মুখরিত অফিস ছিল আমার চৌহদ্দি। আশ্চর্য লাগবে যে ১৯৪০-৪১ পর্যন্ত আনন্দবাজার পত্রিকায় আমাদের স্বচ্ছন্দ যাতায়াত, সেখানে আমাদের 'পৃষ্ঠপোষক' হলেন স্বনামধন্য সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। আর তাঁরই পার্শ্বচর হিসাবে অরুণ মিত্র, নৃপেন চক্রবর্তী, সুকুমার মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য প্রভৃতি প্রতিভাকে (নাম বাদ পড়ে যাচ্ছে বলে মার্জনা চাইছি) একেবারে প্রগতি লেখক আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে পেলাম। রবীন্দ্রসকাশে যাবার মহামূল্য সুযোগ তখন মিলেছিল; প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেও একাধিক বার গিয়েছি কবির কাছে, কিন্তু তখন তো একেবারে 'বালখিল্য' অবস্থা।

যাইহোক, তারাশঙ্করবাবুকে প্রথম সাক্ষাৎ থেকেই কেমন যেন আপনজন মনে হয়েছিল। তিনিও সহৃদয়তার পরাকাষ্ঠা ছিলেন। দুনিয়া জুড়ে ফ্যাসিস্ট মানবিকতাকে রোধ করার লড়াইয়ে তাঁকে, ছোটখাট মতভেদ সত্ত্বেও, পুরো-পুরিই পেয়েছিলাম আর সহযোগিতা বাড়ল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে। মনে পড়ছে বাগবাজারে তাঁর বাসা বাড়িতে আমাদের ডেকেছিলেন তাঁর 'একোন পঞ্চাশৎ' জন্মদিনে, যেখানে একান্ত আত্মীয় ছাড়া বড় কেউ ছিলেন না। তাঁকে সর্বদা মূলগতভাবে আমাদের (অর্থাৎ সমাজবাদ-সাম্যবাদে বিশ্বাসীদের) সহযাত্রী বলে প্রমাণ করার কিছু চেষ্টা হয়েছে জানি, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। কম্যুনিস্ট পার্টির চেয়ে কংগ্রেসের প্রতি ছিল তাঁর নাড়ির টান, কিন্তু তাঁর ছিল সেই মহানুভবতা যার ফলে আমাদেরও তিনি 'কোল' দিয়েছিলেন।

তাঁর 'মন্বন্তর' উপন্যাসটির ইংরিজি অনুবাদ করেছিলাম 'Epochs' End' নাম দিয়ে। উপন্যাসটা আমার বাছাই নয়, আর অনুরোধটা গ্রন্থ-কারের কাছ থেকে আসে নি, এসেছিল তাঁর ও আমার স্নেহভাজন প্রয়াত সাহিত্যপ্রেমী গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের কাছ থেকে। বোম্বাইয়ের Kutub Publishers (যারা ছিল আমার বন্ধু) তরজমাটি গৌরীশঙ্করের 'মিত্রালয়'-র কাছ থেকে কিনে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু গৌরী রাজি হয় নি, যদিও পরে সে লিখেওছে যে আর্থিক দিক থেকে লাভের সম্ভাবনা তখন সে হারিয়েছিল! তারাশঙ্করবাবুর 'তারিণী মাঝি' ও 'নারী ও নাগিনী'-র ইংরিজি তরজমা করেছি। প্রথমটির বেশ কিছু সমাদর মিলেছে। আমি

অন্যত্র লিখেছি যে প্রগতি লেখকসংঘের প্রথম থেকে প্রধান পুরুষ মুলকরাজ আনন্দ কলকাতা থেকে 'তারিণী মাঝি', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যাত্রা-বদল' (সুধীন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ) প্রভৃতি কিছু লেখা ইয়োরোপে প্রকাশের জন্য নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোথায় যেন সেগুলো হারিয়ে যায়। 'তারিণী মাঝি' কে বা কারা ইয়োরোপেই উদ্ধার করে ছাপিয়ে ছিলেন বলে হদিস মিলেছিল, অন্য লেখাগুলি আজও বেপাত্তা। এমন ঘটনা ঘটে আমাদেরই শৈথিল্য আর সংগঠনক্ষমতার সম্পূর্ণ অভাবের ফলে।

যাইহোক আমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'পঞ্চগ্রাম' (হয়তো বা 'গণদেবতা-র) থেকে দু'একটি পরিচ্ছেদ অনুবাদ করি। যদিও সেসব লেখা হারিয়ে গিয়েছে। আমার মনের সাধ ছিল কিন্তু সাধ্য ছিল না 'কবি'-র মতো অপরূপ সুন্দর কাহিনীর অনুবাদ করতে! তারাশঙ্করবাবু আমাকে বলে-ছিলেন (মণীষী সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় চেয়েছিলেন) 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র মতো অসামান্য, বিশ্ববিজয় সম্ভাবনামণ্ডিত রচনাটিকে ইংরিজি রূপ দিতে। রাজি হতে পারিনি। কারণ অমন একটি কাহিনীকে যথাযোগ্য সৌষ্ঠব সহকারে উপস্থাপিত করা আমার সাধ্যের একেবারে বাইরে। 'সপ্তপদী'র তরজমা একবার তারাশঙ্কর চেয়েছিলেন কিন্তু আমার মন সায় দেয় নি, বইটি পড়িও নি।

বাগবাজারের পাট উঠিয়ে টালায় জলের ট্যাঙ্কের সুশীতল ছায়ায় নিজস্ব সুনির্মিত গৃহে যখন তারাশঙ্কর এলেন, তখনও মাঝে মাঝে সেখানে দেখা হয়েছে। দেখতাম মানুষটির সহজ সবল সহৃদয় ব্যক্তিত্বে কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। হাবভাবে, কথাবার্তায়। মনের গড়নে গ্রামের একটা ছাপ, তবু প্রকৃত বিদগ্ধ নাগরিকতায় কোনো ছেদ নেই। নগ্নগাত্রে, গলায় মালার মতো "তেজোহীন ব্রহ্মণ্যের নির্বিষ খোলস" পৈতেটি ঝুলোনো, ঘরের মেঝেতে বসে সামনে 'ডেস্ক'-এর উপর কাগজ রেখে লেখা মানুষটিকে চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছি। কিছুকাল, হয়তো রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়, মাতলেন ছবি আঁকা নিয়ে। মনে আছে কৌতুক করেছি বলে যে শেষকালে তিনিও 'ঋষি' হয়ে উঠছেন! হাসিতে যোগ দিতেন—তবে মনে হয় যে মাঝে মাঝে প্রবল-ভাবে সংসারী এবং হয়তো কিছু পরিমাণে 'গ্রাম্য' মানসিকতার শরিক হয়েও সঙ্গে সঙ্গে একটা স্তরে তিনি ছিলেন 'ঋষি'। আর শাশ্বত ভারতবর্ষের দুঃখ অথচ গৌরবের পরম্পরা বহন করার মতো চিত্তবৃত্তির গহন ঐশ্বর্যের অধিকারী

ছিলেন বলে তাঁকে দেখেছি সোভিয়েট ভূমির তাশ্‌খন্দ ও অন্যত্র আফ্রো-এশীয় লেখক সমাবেশে অসংকোচে ঋজ্ব ভাষণ দিচ্ছেন। কিছ্ব পরিমাণে প্রতিকূল অবস্থাতেও পূর্ণ মর্যাদা নিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন।

রাজ্যসভায় কিছ্বকাল সদস্য যখন ছিলেন তখন মাঝে মাঝে যোগাযোগ হত। তবে প্রকৃত প্রস্তাবে সংসদীয় আবহাওয়ায় তেমন স্বস্তি বোধ করেন নি। করাও স্বাভাবিক ছিল না। সেই সময় একবার তাঁর একটি ছোট্ট চিঠি আমাকে অভিভূত করে ফেলেছিল। তখন আমাদের মধ্যে বহ্বদিন অদর্শনের ব্যবধান ঘটে গেটে গেছে; কোনো কোনো বিতর্কিত বিষয় নিয়ে পার্টির সঙ্গেও তাঁর মানসিক দূরত্ব বেশ খানিকটা বেড়েছে। তব্ব হঠাৎ তিনি ভেবেছেন আমার মতো একজনের কথা আর জানাচ্ছেন যে আমাকে তিনি স্বপ্নে দেখেছেন। শিল্পপ্রতিভার শীর্ষাবস্থিত একজনের যে এমন মানবমমতা, এমন মনোমুগ্ধকর সৌহার্দ্য, তা আজকের এই দুর্বহ, দুর্বৃত্তায়িত দুনিয়াতে যেন মানুষের মহিমা বিষয়ে বিশ্বাসকে ফিরিয়ে দেয়।

অনেক কথাই বলা হল না, তব্ব শেষ করি এই বন্ধ্বকৃত্য।

স্মৃতিচারণ—২

বাংলার মুখ

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

'পাথরের দেবমূর্তি' ভেদ করে দেবতার আবির্ভাবের কথা যেমন গল্পে আছে তেমনি ভাবেই এই পাপপুণ্যের রক্তমাংসের দেহধারী মানুষগুলির অন্তর থেকে সাক্ষাৎ দেবতাকে বেরিয়ে আসতে দেখেছি।"

—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে কোন যথার্থ বা নূতন কথা লিখি এমন সাধ্য আমার নাই। উপন্যাসের প্রকৃতি বা বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কিছু বলিবার যোগ্যতাও আমার বড় নাই। সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে যদি কিছু সাহিত্য চর্চা করিয়া থাকি তাহার মধ্যে উপন্যাসের স্থান প্রায় নাই। কলেজে প্রবেশ করিবার পূর্বে উপন্যাস পড়িবার সুযোগ পাই নাই। উপন্যাস পড়া বারণ ছিল। তের বছর বয়সে লুকাইয়া লুকাইয়া কপালকুণ্ডলা পড়িয়াছিলাম। মনে আছে পড়া শেষ হইবার পরেও বইখানিকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম, কারণ, উহার মধ্যে এত দুঃখ যে উহাকে দূরে রাখিয়া সেই দুঃখ এড়াইতে চাহিয়াছিলাম। পাঠক, তুমি শুনিয়া আশ্চর্য হইবে যে ছ' বছর কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার যত পাঠ্যপুস্তক ছিল তাহার মধ্যে উপন্যাস ছিল মাত্র দুইখানি। আই. এতে George Eliot-এর Silas Marner, আর বি. এতে Dickens এর A tale of two cities। এম.এ-তে একখানিও উপন্যাস পড়িতে হয় নাই। যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজিতে শিক্ষক হইলাম তখন উপন্যাস সম্বন্ধে আমি অজ্ঞ। আর অধ্যাপনার প্রথম বার বছর কোনো উপন্যাস পড়াইতে হয় নাই। অধ্যাপনার ত্রয়োদশ বৎসরে যখন Henry Fielding এর Joseph Andrews পড়াইতে হইল তখন হঠাৎ যেন উপন্যাস সম্বন্ধে চিন্তার একটা পথ খুঁজিয়া পাইলাম। উপন্যাস সম্বন্ধে যে সব বই পড়িলাম তাহাতে কিন্তু সেই পথের খোঁজ পাই নাই। Fielding এর একটি উক্তিতে যেন বিষয়টি সম্বন্ধে এক নূতন সূত্রের সন্ধান পাইলাম। Fielding বলিলেন যে তাঁহার উপন্যাস এক ধরনের মহাকাব্য—Epic in prose। কথাটি আমার মনে ধরিল। Macaulay-এর লেখায়

পড়িয়াছিলাম 'As civilization advances poetry almost necessarily declines।' এখানে Macaulay poetry বলিতে epic poetry কথাই বলিয়াছেন। রমেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর একটি প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন —মহাকাব্যের সঙ্গে সভ্যতার অহিনকুল সম্পর্ক। এই দুইটি উক্তির সত্যতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ-ই তখন হয় নাই, ভাবিয়াছি মহাকাব্য বিশেষভাবে প্রাচীনকালের সৃষ্টি। পরবর্তীকালে, বাল্মীকি কৈ, বেদব্যাস কৈ, হোমার কৈ, ভার্জিল কৈ। মহাকাব্যেব কথা এক বৃহৎ কথা। তেমন বৃহৎ কথা একালে আর কে শুনাইবে। কিন্তু Fielding একটি নূতন কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন উপন্যাস একালেব মহাকাব্য, সে মহাকাব্য গদ্যে রচিত।

ইহার পর আমাদের কালে উপন্যাসের এই epic ধর্ম্ম স্পষ্ট করিযা তুলিলেন কেমব্রিজেব বিশিষ্ট অধ্যাপক E. M. W. Tillyard তাঁহার দুইখানি গ্রন্থে —The Epic Strain in Nostromo এবং The English epic and its background। Tillyard-এব সঙ্গে কেম্‌ব্রিজে আমার দেখা হইয়াছিল। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে ভাবতবর্ষে এখনও পদ্য-বন্ধে epic রচনা সম্ভব হইতে পাবে, কারণ ভারতবর্ষে এখনও একটি বিবাট প্রাচীন tradition প্রাণবন্ত। তবে Tillyard-এর উপন্যাসতত্ত্বের মূল কথা ভিন্ন। তাঁহার কথা এই যে উপন্যাস আধুনিক কালের মহাকাব্য। প্রাচীন মানুষ মহাকাব্যে পাইতেন সে যুগের সকল কথা। আধুনিক মানুষ উপন্যাসে পাইতেছেন এযুগেব সকল কথা।

এই কথা কযটি বলিলাম ইহা বুঝাইতে যে আমি তারাশঙ্করেব উপন্যাস গুলিকে বাঙ্গালী জীবনেব মহাকাব্য বলিযা মনে করি।

এখন প্রশ্ন হইব এই যে তারাশঙ্করের উপন্যাসে এবং ছোট গল্পে যে সত্য সুন্দব হইযা উঠিয়াছে সেই সত্য তিনি কিভাবে উপলব্ধি করিলেন। এই প্রশ্নের উত্তর আমবা তারাশঙ্কবের তিনশ পৃষ্ঠাব 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে পাইতেছি। এই গ্রন্থখানি তাবাশঙ্করের সাহিত্যপ্রতিভাব একখানি নির্ভরযোগ্য ভাষ্য। ইহাতে আমরা তারাশঙ্করের হৃদয়ের সংবাদ পাই। যে হৃদয দিযা তিনি বঙ্গদেশের হৃদযের কথা শুনিয়াছেন সেই হৃদয়ের সকল অনুভূতি সকল উপলব্ধির কথা এই গ্রন্থে বিধৃত।

এখানে একটি ব্যক্তিগত কথা উল্লেখ না করিয়া পারিতেছি না। তারাশঙ্করকে আমি চিনিতাম। তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল। তাঁহার সান্নিধ্য

বহুবার বহুস্থানে পাইয়াছি। তারাশঙ্কর সম্বন্ধে আজ আমার অনেক কথাই মনে পড়িতেছে। সেই সব কথা বিশেষ অর্থপূর্ণ বলিয়াই মনে করি। আর তাঁহার নীরবতাও যেন তাহাকে চিনিতে সাহায্য করিত। কোন বৈঠকে সাহিত্য সম্বন্ধে অথবা তাঁহার নিজের সম্বন্ধে কতগুলি কথা বলিবার অভ্যাস তাঁহার ছিল না। কোন আড্ডাতেই তাঁহাকে কথক ঠাকুর বলিয়া মনে হয় নাই। কিন্তু তাঁহার কথার মধ্যদিয়া আমি যেন তাঁহার অন্তরের নিবিড় পরিচয় পাইয়াছি। প্রথম সাক্ষাতের কথাই প্রথমে বলি। ১৯৩৯ সালে তাঁহার সঙ্গে বাগবাজারে তাঁহার গৃহের সামনেই প্রথম কথা হয়। ইহার কিছু পূর্বেই আমি তাঁহার তিনখানি গ্রন্থ **Hindusthan Standard** পত্রিকায় **review** করিয়াছিলাম—রাইকমল, জলসাঘর এবং আগুন। আমি আর তাঁহাকে সেকথা বলিলাম না। মনে হয় review তিনটিতে লেখকের প্রশংসা ছিল বলিয়া তিনিও ইহার কোন উল্লেখ করিলেন না। কিন্তু সেদিন তাঁহার আলাপে এবং আচরণে আমি তাঁহার ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাইলাম। আমরা যখন কথা বলিতেছিলাম তখন ঐ বাগবাজার অঞ্চলের অধিবাসী নির্মল কুমার বসু সাইকেলে পথ অতিক্রম করিতেছিলেন। তারাশঙ্কর বাবু তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন আপনার লেখা পড়ছি, চমৎকার চালিয়ে যান। একজন প্রতিবেশীকে এমন উৎসাহ এইভাবে কাহাকেও দিতে দেখি নাই। আসলে তিনি যে উৎসাহ দিতেছেন তাহাও মনে হইল না। মনে হইল তিনি তাঁহার মনের আনন্দটাই সরলভাবে প্রকাশ করিলেন। ইহার পর নির্মলবাবু আমাকে একদিন বলিয়াছিলেন যে তিনি সাইকেলে চড়িয়া তারাশঙ্করের সম্মুখ দিয়া চলিলেই তারাশঙ্কর বলিতেন 'চালিয়ে যান'। নির্মলবাবু রসিক মানুষ ছিলেন। তিনি আমাকে বলিলেন তারাশঙ্কর বাবু তাঁহাকে সাইকেল চালাইতে বলিতেছেন না লেখা চালাইতে বলিতেছেন তাহা তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। তারাশঙ্কর অবশ্যই নির্মলবাবুর সুন্দর রচনার কথা ভাবিয়াই ঐরূপ বলিতেন।

ইহার পর যাহা ঘটিল তাহা বলি। তারাশঙ্কর বাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রবিবাবু আপনি মানুষ দেখিতে চান? আমি কথাটির অর্থ প্রথমে বুঝি নাই। বনমানুষ দেখিতে চাহি কিনা কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কিন্তু মানুষ দেখিবার কথাটি বুঝিলাম না। ইহার পর তারাশঙ্কর বলিলেন যদি মানুষ দেখিতে চান তাহা হইলে আমার প্রতিবেশী চিত্রকর

যামিনী রায় মহাশয়কে দেখিযা আসুন। যামিনী বাবু তখন এক বিশিষ্ট চিত্রকব। ১৯৩৬ সালে তাঁহার চিত্রাবলীর এক exclusive exhibition সমবায় ম্যানশনে হইয়া গিয়াছে। একজন বড় চিত্রকব তো একজন বড় মানুষ হইতেই পারেন। তাবাশঙ্কব আমাকে বলিলেন যামিনী বাবু যে একজন মহৎ চবিত্রেব মানুষ তাহার এক প্রমাণ তিনি গতকাল পাইযাছেন। 'সুমিত্রাব অপমৃত্যু' নামে একখানি উপন্যাসের মলাটের ছবি যামিনীবাবুকে আঁকিতে বলা হইযাছিল, অপমৃত্যু' কথাটি তুলি দিয়া লিখিবার সময় তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই ব্যাপারেব মধ্যে তাবাশঙ্কর বাবু যামিনী বাযের মহৎ হৃদযেব পরিচয পাইলেন। আমি বুঝিলাম এই প্রতিভাবান লেখক তাঁহার চাবিদিকে যাহা দেখেন বা যাহা শোনেন তাহার মধ্যে একটি অর্থ খুঁজিযা পান। অর্থাৎ এই মানুষটিব কাছে জীবন অর্থপূর্ণ এবং সেই জীবনই তিনি তাঁহার রচনায় ফুটাইরা তুলিতেছেন।

ইহাব পর একদিন বিকালে কর্ণওযালিশ ষ্ট্রীটে মহেশ ভট্টাচার্যের হোমিও-প্যাথি ওষুধের দোকানের বারান্দায় তারাশঙ্কর বাবুর সঙ্গে বসিয়াছিলাম। নানাকথা হইতেছে, এমন সময এক চা ওয়ালা আসিয়া উপস্থিত। একটি ক্ষুদ্র লোহাব চুল্লির উপরে একটি সুন্দর ঘষামাজা পিতলের কলসীতে চা টগবগ কবিযা ফুটিতেছে। চা ওয়ালার স্কন্ধে একটি ঝোলায় কতগুলি মাটীর পাত্র। তাবাশঙ্করবাবু চাঁওযালাকে ডাকিয়া আমাদের দুই জনকে দুই পাত্র চা দিতে বলিলেন। দেখিলাম ওনার দৃষ্টি ঐ চুল্লির উপরে স্থাপিত। পিতলের কলসীটির উপর নিবদ্ধ। মানুষ যেমন বিস্মযাবিষ্ট হইযা নক্ষত্র খচিত নৈশ গগনেব দিকে তাকাইযা থাকেন তারাশঙ্কর বাবুও যেন সেই বকম নিবিষ্ট হইযা এই কলসীটির দিকে তাকাইযা আছেন। কোন ক্ষুদ্র বস্তুই যেন তাঁহার কাছে ক্ষুদ্র নহে। চা পান করিতে করিতে তিনি চা-ওযালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাব দেশ কোথায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহার সঙ্গে চা বিক্রেতার এক নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হইল। চা পান শেষ হইলে তিনি আমাকে বলিলেন লাভপুরের এক দুঃস্থ যুবক কলিকাতায় এই ভাবে চা বিক্রয কবিয়া তাঁহার বিধবা মা এবং ছোট ভাইকে প্রতিপালন করেন। তবে এই ছেলেটি বাঙালী নহে, এ বিহারের লোক। ইহাব পর ইহারা রাত্রে কোথায বাস কবে সেবিষয়ে তাঁহাব অনুমানের কথা বলিলেন, বুঝিলাম তারাশঙ্কর বাবু এক জীবনমুখী জীবনসন্ধানী মানুষ। জীবন সম্বন্ধে

তাঁহাব অনুভূতি গুলি একত্র হইযা তাঁহাকে অনেক কথা বলে, তাঁহার মনো জীবন গড়িয়া তোলে।

আব একদিন তারাশঙ্করবাবুব সঙ্গে দেখা রঙমহল বেষ্টুরেণ্টে। সন্ধ্যা হইযা আসিযাছে। তিনি একপাত্র চা লইযা বসিযা আছেন। আমি তাঁহার পাশে বসিযা কথা আরম্ভ কবিলাম। মনে হইল তিনি তাঁহার কোন গল্প এই বঙমহলেব কর্তৃপক্ষকে দিয়াছেন এবং তাহাবা কাহিনীব কিছু পবিবর্তনের প্রস্তাব দিয়াছেন। তাবাশঙ্কববাবু বলিলেন, সাহিত্যসৃষ্টির একটা মর্যাদা আছে। নাটকীযতার জন্যে কাহিনীব পবিবর্তনে তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। একটি হৃদয়বান মানুষেব চাবিত্রিক দৃঢতার পরিচয় পাইলাম।

ইহাব পব যেই ঘটনাটিব উল্লেখ কবিব সেটি একটু অস্বস্তিকব। একবাব তাবকেশ্বরেব একটি সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিবাব জন্য আমবা অনেকেই একত্র হইযাছি। আমাব কম্পার্টমেণ্টে ছিলেন তারাশঙ্করবাবু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায এবং বিজনবিহাবী ভট্টাচার্য। একটি প্রশ্ন উঠিল। প্রশ্নটি এই যে শবৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যাযেব উপন্যাসে এবং ছোট গল্পে বঙ্গদেশেব সকল শ্রেণীর মানুষেব কথা আছে কিনা। সুনীতিবাবু দেখিলাম শবৎচন্দ্রেব ভক্ত। তিনি বলিলেন শরৎচন্দ্রেব বচনায আমবা সকল বাঙ্গালীর কথাই পাইযাছি। বিজন-বাবু সাহিত্যেব অধ্যাপক এবং শবৎচন্দ্র এবং তারাশঙ্কব দুই জনেবই বচনাব সংবাদ বাখেন। কিন্তু তিনি নির্বিবোধী মানুষ, তর্কে যাইতে চাহিলেন না। তাবাশঙ্কবও এবিষযে বেশী কথা তুলিলেন না। কিন্তু সাহস কবিয়া একটি কথা বলিলেন। তিনি বলিলেন শবৎচন্দ্রেব উপন্যাসে ও গল্পে বঙ্গদেশেব সকল শ্রেণীব নব-নাবীব উপস্থিতি নাই। তিনি অবশ্য একেবাবেই দাবী কবিলেন না যে তাঁহাব রচনায তিনি বঙ্গদেশেব সকল শ্রেণীব মানুষের কথাই বলিযাছেন। সুনীতিবাবু মনে কবিলেন যে তাবাশঙ্কববাবুব ইহাই অনুক্ত দাবী যে তিনি লেখক হিসাবে সর্বদর্শী। সুনীতিবাবু প্রাণবন্ত মানুষ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কোন বঙ্গীয় লেখকেব কলমে গবাদি পশুও মানুষ হইযা উঠিযাছে। অবশ্য উনি শরৎচন্দ্রেব মহেশ গল্পটির কথাই বলিতে চাহিযাছেন। তাবাশঙ্কব বিবাদ বাড়াইলেন না, একেবাবে নীবব রহিলেন। এই নীববতা আমাকে অভিভূত করিল।

মিত্র ও ঘোষ-এর বইয়ের দোকানে তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে অনেকবার দেখা হইযাছে। কিন্তু অনেক লোকের মধ্যে বিশেষ কোন কথা হয নাই। একদিন

বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের আড্ডায় আমি প্রশ্ন করিলাম, আপনাদের মধ্যে কে কবে বাড়ী করিয়াছেন এবং এই ব্যাপারে কে প্রথম। একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক দাবী করিলেন শরৎচন্দ্রের পর তিনিই প্রথম এই শহরে লেখকের আয় হইতে গৃহনির্মাণ করিয়াছেন। তারাশঙ্করবাবুর টালার বাড়ী তখন বেশ পুরাতন হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই গৃহ-নির্মাণ ব্যাপারে তিনি কোন Priority দাবী করিলেন না। তারাশঙ্করবাবুর বিবাগী মনের পরিচয় পাইলাম।

তারাশঙ্করের জন্মশতবার্ষিকী আগামী ২৩শে জুলাই উদ্‌যাপিত হইবে। এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশের বহু মণীষী তাঁহার সাহিত্য প্রতিভার নানা দিক লইয়া আলোচনা করিবেন! তাঁহার উপন্যাস এবং ছোট গল্পের বৈশিষ্ট্য কোথায়, লেখক হিসাবে তাঁহার অনন্যতা কোথায়—এই সকল প্রশ্ন লইয়া আমাদের দুই দেশের শ্রেষ্ঠ সমালোচকরা গভীর আলোচনা করিবেন। তারাশঙ্কর সম্বন্ধে এপর্যন্ত আলোচনাও কম হয় নাই। এই আলোচকদের মধ্যে শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমি শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি। অধ্যাপক হরপ্রসাদ মিত্র মহাশয়ের "তারাশঙ্কর" গ্রন্থখানিও আমি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। ইহার পর আমি তারাশঙ্কর সম্বন্ধে কোন নূতন কথা বলিতে অক্ষম। তবে তারাশঙ্করের প্রতিভা সম্বন্ধে একটি প্রশ্ন বোধ হয় উত্থাপন করিতে পারি। অবশ্য সেই প্রশ্নের সার্থক উত্তর বোধহয় যথাযথভাবে উপস্থিত করিতে পারিব না, আমার প্রশ্নটি হইল এই যে তারাশঙ্করের সমগ্র রচনায় জীবনের যে সত্য এমন সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে সেই সত্যের উৎস কোথায়? প্রশ্নটি বোধহয় তারাশঙ্করের প্রতিভার চরিত্র সম্বন্ধেই একটি জিজ্ঞাসা। 'তুমি কেমন করে গান কর হে গুণী'—এই প্রশ্ন একটি মূল প্রশ্ন। তোমার শক্তির উৎস কোথায়? তোমার ভাবের, তোমার ভাষার, তোমার কল্পনার, তোমার বক্তব্যের আধার কোথায় খুঁজিয়া পাইব? তোমার বিশেষ একটি কাহিনীর প্রশংসা করিতে পারি, তোমার রচনারীতির উৎকর্ষ দেখিয়া মুগ্ধ হইতে পারি। কিন্তু তোমার প্রতিভার স্বরূপ কি করিয়া বুঝাইব? এই প্রশ্নের উত্তর তারাশঙ্করের সমগ্র রচনার মধ্যে নিহিত। তাঁহার ব্যক্তিত্বের মধ্যেও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতে পারি। তারাশঙ্করের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যেমন তাঁহার গ্রন্থগুলি আবার পড়িতেছি, তেমন তাঁহার ব্যক্তিত্বের কথাও স্মরণ করিতেছি। তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া, তাঁহার সঙ্গে

কথা বলিযা, তাহাব চবিত্রেব যে বস্তুটি আমাকে আকৃষ্ট করিযাছিল তাহা হইল তাঁহাব অনুভূতি প্রবণতা। যে কোন শ্রেষ্ঠ লেখকেব উপলব্ধিব মূলে এই অনুভূতি। সূক্ষ্ম বিচাবশীলতা, গভীর চিন্তাশীলতা প্রভৃতি সব কিছুব উৎস এই অনুভূতি। শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদেব সিদ্ধান্তের মূলেও এই অনুভূতি। যেখানে অনুভূতি নাই সেখানে কোন ভাব নাই, কোন চিন্তা নাই, কোন সৃষ্টি নাই।

যে সব গান কেবল আমাদের হৃদয স্পর্শ করে না, যেন আমাদের অস্থি-মজ্জায প্রবেশ কবিযা আমাদেব অভিভূত কবে। সেসব গানের উৎস কোথায ? বামপ্রসাদেব 'চিনি হওয়া ভাল নয বে মন চিনি খেতে ভালবাসি'— এমন একটি গানের কলি কোথা হইতে আসিল ? ইহাকে তো ঠিক কলম দিযা ভাবিযা চিন্তিযা লেখা একটি লাইন বলিয়া মনে হয় না। কথাটি শুনিযা মনে হয যেন ইহা আকাশ বাতাস হইতে ধ্বনিত হইতেছে। প্রভাত সূর্যের স্পর্শে ঘনশ্যাম দূর্বাদলে যেমন শিশিরকণা হীরকচূর্ণের মত দ্যুতিময়, এই কথা কয়টি যেন সেই রকম প্রাকৃতিক বিধানে এমন ভাবময়, এমন উজ্জ্বল। আব স্বভাবতই সুবেশ। এমন হয় না যে লেখক ভাবে ধনী ভাষায দবিদ্র। ইতালীয় দার্শনিক Benedetto Croce বলেন, 'All Poetry is born expressed'। ভাব ও ভাষা পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের মত একাত্ম এই কথা কালিদাসও বলিয়াছেন। আমাদের প্রশ্ন হইল এই যে ভাব ও ভাষা একত্রে যে কাব্য বস্তুব সৃষ্টি করে তার উপাদান কি ? এ বিষযে কিছু গ্রন্থ অবশ্যই পড়িযাছি। কিছু চিন্তাও হয়তো কবিয়াছি। কিন্তু art-এব সৃষ্টিতত্ত্ব আমার কাছে রহস্যই হইযা বহিল। এ বিষযে আমার তত্ত্বজ্ঞান নাই।

কিন্তু সাধারণ পাঠক হিসাবে একটি কথা বলিতে পারি! সেই কথাটি এই যে সাহিত্যের মূল বস্তু অনুভূতিঃ আমরা যাহাবা লেখক নহি, আমাদের কোন গভীব শুদ্ধ অনুভূতি যদি হয় আর সেই অনুভূতি যদি আমবা কোন চিঠিতে প্রকাশ করি তাহা হইলে সেই চিঠিখানিও সাহিত্য হইযা উঠিতে পারে। যেখানে অনুভূতি নাই সেখানে সাহিত্যও নাই। তাবাশঙ্করের গল্প উপন্যাস পড়িযা আমাব মনে হইয়াছে যে ইহা এক গভীব অনুভূতিব জগৎ। সেই অনুভূতি যেমন গভীর তেমন স্বচ্ছ। তাহার চবিত্র, কাহিনী যেন চোখেব সামনে জ্বলজ্বল করিতে থাকে। সেই জগৎ আমাব কাছে এত স্পষ্ট যে আমি যেন তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি। আমাব

মনে হইয়াছে এই অনুভূতি বড কোমল। ইহাব মধ্যে কোন উগ্রতা নাই! এই কোমলতা বাংলা সাহিত্যেব এক বৈশিষ্ট্য। আমাদের লোক-সাহিত্যের সুবও এই করুণ কোমল সুব। গ্রামবাংলাব কাব্য কাহিনীব এই tenderness একালের বাঙ্গালী পাঠকদের কাছে একটু বেশী sentimental বলিযা মনে হইতে পারে। আমি বলি এই ভাব মহৎ সাহিত্যের ভাব। বামায়ণ-মহাভাবতও বড কম sentimental নহে। এই প্রসঙ্গে আমাব এক গ্রাম্য কবির দুইটি লাইন মনে হইতেছে। কন্যা বিবাহের পর প্রথম শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে। নৌকায বাজনা বাজিতেছে। মা ঘাটে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছেন। নৌকা বাঁক নিলে মা যখন অদৃশ্য হইযা গিযাছেন তখন কন্যা বলিতেছেন—থামাও বে ভাই ঢাক ঢোল, কাঁসব ঝন্ঝনি। ধীবে ধীবে বাও গো মাঝি যেন মায়েব কান্দন শুনি। আজকাল যেন আমাদেব বাংলা সাহিত্যে এই মায়ের ক্রন্দন বড় শুনিনা। নানাবকম আওযাজ শুনি, এই আওযাজটি শুনিনা।

এই সূত্রে বলিতে পাবি তাবাশঙ্কবের উপন্যাস আমাদেব কালেব বাঙ্গালী জীবনের মহাকাব্য। মহাকবিব অন্তর্দৃষ্টি লইযা তিনি আমাদের জীবনেব সকল দিক দেখিযাছেন, আমাদের দেখাইযাছেন।

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলিতেন, এক বিস্ময়বোধই সকল জ্ঞানেব দুয়ার। আমবা শঙ্কবাচার্যের অদ্বয়তত্ত্বকে এক কঠিন তত্ত্ব বলিযাই জানি। কিন্তু সেই তত্ত্বে বোধহয শঙ্করেব অশ্রুজল পাথব হইযা হীবক খণ্ডেব দ্যুতি লাভ কবিযাছে। আজ আমাদেব দর্শনেব দৈন্য আসলে অনুভূতির দৈন্য। যে যুগ সাহিত্যে বড়, সে যুগ দর্শনেও বড। দুই-এবই উৎস এক গভীর অনুভূতি। সাহিত্য অনুভূতির সরল রূপ। দর্শন অনুভূতিব গাঢ় রূপ।

পাঠক বলিবেন শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক তাঁহাব বিচাববুদ্ধি দিযা সমাজেব গতি প্রকৃতিব সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ কবেন। তিনি বস্তুমুখী। তাঁহার পক্ষে ভাবাবিষ্ট হওযা সম্ভব হইতে পারে না। এক শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক অবশ্যই বিচারশীল, তিনি অবশ্যই বিশ্লেষণমুখী। কিন্তু তাঁহার এই সকল চিন্তা, বিচারশীলতা, সব কিছুরই উৎস জীবন সম্বন্ধে তাঁহাব গভীব অনুভূতি। উপন্যাসে আমরা যাহাকে realism বলি তাহাব সঙ্গে অনুভূতির কোন বিবাদ নাই। বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক Flaubert তাঁর একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন যে তিনি অনেক সময কাঁদিতে কাঁদিতেই লিখিতেন—'I had moved myself to tears in writing revelling deliciously in the emotion of my own conception'। আমাদেব আদিকবি বাল্মীকিও এক গভীর দুঃখবোধ হইতেই তাঁহার প্রথম শ্লোকটি রচনা করিয়াছিলেন। তারাশঙ্কবের মধ্যেও এক গভীর দুঃখবোধ আমি লক্ষ্য করিয়াছি। তাঁহার অনেক চবিত্র, অনেক কাহিনী তিনি যেন সজল নয়নে দেখিযাছেন। ঔপন্যাসিকেব এক বডগুণ সম্বন্ধে Arnold Benett বলিয়াছিলেন, A Christ-like all embracing Compassion'।

তাবাশংকরের নানা গল্প এবং উপন্যাস হইতে উদ্ধৃতি উপস্থিত করিয়া আমাব এই কথাগুলির যাথার্থ্য প্রমাণ কবি এমন সময় বা সাধ্য আমাব নাই। আর ক্ষুদ্র একটি প্রবন্ধে এই আলোচনা সম্ভব হইবে না। আমি কেবল দুই-একটি রচনার উল্লেখ কবিতে পাবি। আমি মনে করি ১৯২৮ সালে প্রকাশিত তাবাশংকবেব প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি" তারাশংকবেব সাবা জীবনের সাহিত্যকর্মের এক সার্থক গৌবচন্দ্রিকা। ইহাব প্রায ষোল বৎসব পরে প্রকাশিত তাবাশংকবেব এক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'কবি' গ্রন্হখানিকে 'চৈতালী ঘূর্ণি'ব দোসর বলিবা গ্রহণ কবিতে পাবি। চৈতালী ঘূর্ণি গ্রন্হের কয়েকটি লাইন উপস্থিত না কবিবা থাকিতে পারিতেছি না। ইহা তারাশংকরেব স্টাইলেব এক বিশেষ নিদর্শন ঃ

'অনাবৃষ্টিব বর্ষায খব বৌদ্রে সমস্ত আকাশ যেন মরুভূমি হইযা উঠিযাছে,

সাবা নীলিমা ব্যাপিযা—একটা ধোযাটে কুযাশাচ্ছন্ন ভাব। মাঝে মাঝে উত্তপ্ত বাতাস, হু হু করিযা একটা দাহ বহিযা যায।'

এই দুই ছত্র পড়িযা বুঝিলাম যে স্টাইল কেবল শব্দেব কারুকার্য নহে। Longinus বলিয়াছেন স্টাইল মহাপ্রাণ মানুষেব মহৎ উচ্চাবণ। তারা-শংকরেব এই লাইন কযটি আমি এক নিবিড অনুভূতির প্রকাশ হিসাবে গ্রহণ কবিযাছি।

আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন যে তাবাশংকবের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কোনটি তাহা হইলে বেশ বিব্রত বোধ কবিযা কোন উপন্যাসটি ছাডিযা কোন উপন্যাসটি উল্লেখ করিব ঠিক কবিতে পাবিব না। তিনখানি উপন্যাসেব কথা আমায বিশেষ কবিযা মনে হইবে। ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯) কালিন্দী (১৯৪০) এবং 'গণদেবতা' (১৯৪২)। বলিতে ইচ্ছা হয যে গণদেবতাই তাবাশংকবেব শ্রেষ্ঠ উপন্যাস শ্রেষ্ঠ কীর্তি। গণদেবতাকে বলা হয রাঢেব কাহিনী, আমি বলি সার্থক রাঢের কাহিনী বলিযাই ইহা আবার মানুষেব কাহিনী। এই উপন্যাসখানিকে গদ্যে রচিত একখানি epic বলিযা গ্রহণ করিতে পারি। বিচিত্র মানুষ এবং বিচিত্র ঘটনার মধ্যদিযা তারাশংকর আমাদের গ্রাম্যজীবনেব মূল সমস্যাগুলি উপস্থিত কবিয়াছেন। এখানে এই উপন্যাস সম্বন্ধে শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যাযের একটি স্মবণীয় উক্তি উপস্থিত কবিতেছি 'দূব পূর্ব দিক্-চক্রবালে দিগন্তবিস্তৃত কুয়াসাব মধ্য দিযা অরুণোদযের ঈষৎ আভাস এই মৃত্যুপথযাত্রী সমাজেব সম্মুখে আশাব ক্ষীণতম বশ্মিব ন্যায় প্রতিভাত হইযাছে।' তাবাশংকবের অনুভূতিব গভীরতাব কথা বলিযাছি। এই উপন্যাসে সেই অনুভূতির বিশালতা প্রত্যক্ষ করিলাম।

———

স্মৃতিচারণ—৩

তারাশঙ্কর স্মরণে

মণীন্দ্র রায়

আমাব বর্তমান যা শবীবের অবস্থা তাতে গুছিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখা অসম্ভব। সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক হচ্ছে সমৃতিভ্রংশ। হাতেব কাছে বই পত্রও নেই, যা বলতে চাই তা যথাযথ কিনা তা যাচাই করা সম্ভবও নয। ফলে শ্রদ্ধেয সাহিত্যিক তারাশংকব বন্দ্যোপাধ্যায়েব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে লেখা কিছুটা খাপছাডা হতে বাধ্য। পাঠক মার্জনা করবেন।

তাবাশংকর বাবু যখন সূর্যসেন স্ট্রীট-মহাত্মা গান্ধী রোডেব সংযোগ স্থলে একটি হোটেলের কোনাচেব দোতলাব ঘবটায় বসবাস করছিলেন এবং সাবাদিনই লেখালেখি করছিলেন, তখন থেকেই আমি তাকে চিনি।

তাব কারণ হলো তাব বড় ছেলে সনৎকুমার আমি যে কলেজে পড়তাম, অর্থাৎ রিপন কলেজে পড়তাম যখন, যখন এক ইয়ার আগে পড়ত। তারাশংকরের ভাবী জামাতা শান্তিশংকর মুখোপাধ্যায় ছিল আমার সহপাঠী। তাদেব সঙ্গে গিযেই তারাশংকরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়।

২

বুদ্ধদেব বসু তাব অ্যান একর অফ গ্রিনগ্রাস বইটিতে লিখেছেন, তাবাশংকরেব লেখা যেন রাইটার্স নোটবুক। He has manythings to write but he does not know how to write. তারাশংকব বাবু অনেক কিছু জানেন, কিন্তু তিনি জানেননা কিভাবে লিখতে হয়। আমি এই বক্তব্যব সঙ্গে একমত নই। 'অগ্রদানী'ব মত গল্প কিংবা "নারী ও নাগিনী", "দেবতাব ব্যাধি" ইত্যাদি গল্প এই প্রথম শ্রেণীব গল্পকাবরাই লিখতে পাবেন। উপন্যাসেব দিক থেকে "আগুন" 'হাঁসুলি বাঁকেব উপকথা' "নাগিনী কন্যাব কাহিনী'—যা প্রথম শ্রেণীব রচনা।

ববীন্দ্রনাথ যে সত্যটা ধরেছিলেন যোগাযোগ উপন্যাসে, সেই সত্যটা ধবেছিলেন তাবাশংকব তাঁব জলসাঘরে, পডন্ত অভিজাত জমিদার এবং উঠতি মূল্যহীন ব্যবসায়ীর সংঘাত স্পষ্ট কবে ধরেছিলেন। হাঁসুলি বাঁকের উপকথায় বনওযারী আর করালীর মধ্যে যে সংঘাত সেটা শুধু ব্যক্তিগত নয়

-জীবন যাত্রার ধরনও জীবিকার মধ্যেও তা প্রতিফলিত।

৩

স্মৃতি থেকে লিখছি ফরাসী ঔপন্যাসিক বালজাক্ সম্বন্ধে এঙ্গেলস বোধহয় একবার লিখেছিলেন তাঁর সমস্ত মন অভিজাত শ্রেণীর দিকে আবদ্ধ। যেহেতু তিনি বড় সাহিত্যিক বাস্তবকে তিনি উপেক্ষা করেন নি। প্রায় অশ্রু পাত করে বলেছিলেন তোমরা ধ্বংস হবে। এ যেন অচিরাগত ফরাসী বিপ্লবের পদধ্বনি।

লেনিনও এইরকম টলস্টয় সম্বন্ধে বলেছিলেন, তিনি অভিজাত শ্রেণী সম্বন্ধে সবই জানেন, তারা যে ধ্বংস হবে তাও তাঁর জানা। তাঁর রচনাতেই বিপ্লবের পদধ্বনি শোনা যায়। তিনি মহান্ সাহিত্যিক, তাঁর হয়তো নেই বিপ্লব বোধ, কিন্তু সত্যকে তিনি গোপন করেন নি। বিপ্লব যে হবে, তাও তিনি বলেছিলেন। এভাবে চললে যে বিপ্লব হবে তাও তিনি গোপন করেননি।

তারাশঙ্কর অবশ্যই বলজাকও নন টলস্টয়ও নন। প্রাদেশিক এই বাংলা ভাষা সাহিত্যে তাঁর স্থান খানিকটা ওদের মতই। তাঁরও সহানুভূতি ছিল পড়ন্ত জমিদারদের দিকেই, তবে তাঁরা যে টিকবে না তাও তিনি লিখে গেছেন।

যে লেখক নিজের যুগের মর্মকাহিনী, যুগসত্যকে বিভিন্ন চরিত্রের, পাত্রের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পারেন তিনি বড় লেখক বৈকি।

৪

তারাশঙ্কর বাবুর সম্বন্ধে ব্যক্তিগত কথা অনেক বলতে পারতাম। শুধু একদিনের একটা ঘটনার উল্লেখ করি। আমার সেই সময়কার কর্মক্ষেত্র অমৃত পত্রিকা অফিসে গিয়ে জানি তারাশঙ্কর বাবু ফোন করে জানিয়েছেন, "আমি সাহিত্য এ্যাকাডেমি পুরস্কার পেয়েছি।" তক্ষুনি গিয়ে যেন তার সঙ্গে দেখা করি। আমি যাওয়া মাত্রই তারাশঙ্কর বাবু উঠে দাঁড়িয়ে জড়িয়ে ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "তোর পাওয়াতেই শান্তির পাওয়া"। আমার সহপাঠী, শান্তিশঙ্কর তাঁর জামাতা, তখন মৃত। তাঁর আবেগের গভীরতা দেখে আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম।

———

তারাশঙ্করের 'নীল সরস্বতী'

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ এক ॥

প্রথমে ভদ্রপঞ্চজনেব কাছে আমাব এই তারাশঙ্কব-কথাব নামকরণটি ব্যাখ্যা কবি। কৌল ধাবায় তাবাশঙ্কব তান্ত্রিক বংশেব সন্তান। নিজ জীবনে নিদাবুণ অভিজ্ঞান সংকটেব কালে দীক্ষা নেবাব জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন। তারাশঙ্কবেব কুলগুবু তারাশঙ্কবকে বলেছিলেন 'শক্তিতন্ত্রে তোমায় দীক্ষা নিতে হলে তাবা মন্ত্রে নিতে হবে। শক্তিতন্ত্রে তাবাই হলেন সবস্বতী। তারাব অপব নামই হল 'নীল সবস্বতী'। সাধাবণ্যে এবং লৌকিক বিচাবে সবস্বতী বিদ্যাব দেবী, গানেব দেবী, বীণাবাদিনী তিনি। আমাব আলোচ্য বিষয় তাবাশঙ্করেব গল্পে উপন্যাসে গানেব ব্যবহাব। অন্যার্থে নীল বেদনার বঙ, নীল অশেষেব রঙও বটে। যে গানগুলি তাবাশঙ্কর তাঁব গল্পে উপন্যাসে ব্যবহাব করেছেন, সে গানগুলি কোনটাই খুশিযাল গান নয, গান-গুলি বেদনাব। ভুবনপুবেব হাটে লাভ লোকসান খতিযে দেখার মধ্যে যে বেদনা, গানগুলি যেন সেই বেদনাব নীল পাপড়ি। 'নীল সবস্বতী' নামটি আমি সেই অর্থে ব্যবহার কবেছি।

'তাবাশঙ্কব' এই নামটি উচ্চাবণ কবাব সঙ্গে সঙ্গে সাধাবণ ভাবে মনেব মধ্যে জেগে ওঠে একটা ভূচিত্র—রাঢ ভূমির রুক্ষপ্রান্তব, উঁচুনিচু গ্রাম পথ, দুবন্ত মযুবাক্ষী, গৃহকন্যা কোপাই, শালমহুযাব জঙ্গল, তন্ত্র ও বৈষ্ণবতাব লাল এবং পীত নীলেব পাশাপাশি অবস্থান, দুর্দান্ততাব ঐতিহাসিক অধ্যাযেব অবসানে অবসন্ন জমিদাবতন্ত্র কেবল বলছে পডম পডম, আখডাবাসী বোষ্টম, বৈবাগী, ঝুমুব কবি—এই মাটির সঙ্গে জডানো বিচিত্র টাইপ ও ব্যক্তি স্বরূপেব সঙ্গে পথ চলা। গ্রামেব সংসার জীবনের মাঝখান দিযে চলতে চলতে কাঁকুবে মাঠেব আবক্তিম উচ্চাবচতায নেমে পড়া—একতারার সঙ্গে মিলিযে বসিকদাস বাবাজির গান ঃ

হায় কোন মহাজন পাবে বলিতে
আমি পথেব মাঝে পথ হারালাম ব্রজে চলিতে।

এই গানটি দিযেই আমি আমাব কথা শুবু কবি। রসিকদাস বাউল 'রাইকমল' উপন্যাসের চবিত্র। উপন্যাসটির পূর্বে তারাশঙ্কর একটি গল্প লিখেছিলেন তেরশ ছত্রিশ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'কল্লোল' পত্রিকায়। বৈষ্ণবী কমলিনী বাংলা সাহিত্যে অভূতপূর্ব। কিন্তু গল্পটিতে উদ্ধৃত গানটি

নেই। এই গল্পবীজ এবং অধিকতর বিস্তারিত অভিজ্ঞতা ও রসকল্পনার পরিণাম 'রাইকমল' উপন্যাস। উপন্যাসের প্রথম পরিকল্পনাতেও কি গানটি ছিল? মনে হয় না। শিশির ভাদুড়ী রসজ্ঞ গুণগ্রাহী মানুষ। 'রাইকমল' উপন্যাস তিনি কিনে পড়ে নিয়েছিলেন। তারাশংকরকে বলেছিলেন—'ভালো জিনিস—বাংলার মাটির খাঁটি জিনিস। ভালো হবে। হ্যাঁ আমি ওই রগ বাবাজির ভূমিকাটি নেব।' মহাউৎসাহে যুবক লেখক দেশে চলে গেলেন 'রাইকমল'কে নাট্যরূপ দেওয়ার জন্য—একখানি গানও রচনা করে ফেললেন প্রথম দৃশ্যের জন্য—রসিকদাস বাউল রাইকমলের গ্রামে এসে পড়েছেন—কণ্ঠে ওই গান। গানটি প্রাথমিক গল্পরূপে ছিল না—চরিত্রের টানে, অন্তর্গূঢ় নাটকের আকর্ষণে গানটি তৈরি হয়ে গেল। এই ব্যাপারটি আমার বর্তমান আলোচনার কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের নাটকে গান—নাটকীয় গান নয়, তা চরিত্র-ভাষা, তা অনিবার্য এবং অপরিহার্য। গানগুলি বাদ দিলে নাটকের কাঠামো শিথিল হয়ে যায়। এ নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা এর আগে গুণী ব্যক্তি করেছেন। একটা ছোট্ট কথা, কিন্তু আলাদা কথা, এখানে বলার আছে। আমার গান আগে আগে যায় আমি তার পিছনে পিছনে যাই এ শুধু বাউলের কথাই নয়, বাংলা ভাষারই এটা মুখ্য বৈশিষ্ট্য। যখন তা কোনো প্রকার সুরে ফেলা গান নয়, তখনো তা সুরেলা হবার জন্য আকুল। রসকলি গল্পে প্রত্যক্ষ গান অতি অল্প। মাত্র দুই পংক্তি গান দুবার ব্যবহৃত হয়েছে।

> লোকে কয় আমি কৃষ্ণ কলঙ্কিনী
> সখি, সেই গরবে আমি গরবিনী—

কিন্তু সংলাপে মাঝে মাঝে গদ্যের কথ্য চালেও লেগেছে সুরের দোলা। যেমন ঃ

'তা আমার কাছে রসকলি কাটা শিখবে বউ?

গোপিনী কহিল, শেখাবে? দেখো, ঠিক তোমার মতনটি হওয়া চাই।

মঞ্জরী কহিল, তাই শেখাব কিন্তু ধৈরয ধরে থাকা চাই। পারবে তো?

গোপিনী কহিল, পারব, কিন্তু তোমার সময় হবে তা? বলি আসবে কখন? রসময়রা ছাড়বে তো?

'মঞ্জরী এবার ঠোকর দিয়া কহিল, আমার রসময়রা নয় অসময়ে এসে সময় দেবে।' এই যে কথাশৈলী-এর মধ্যে আলো ফেলছে বাংলা কবিওয়ালাদের গানের ভাষা, আবার তার সঙ্গে মিশে আছে চৈতন্যপরবর্তী ভক্তি আন্দোলনের ধারাস্নাত সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের স্নিগ্ধ আভা। বৈষ্ণব পদাবলী থেকে নেওয়া 'ধৈরয' শব্দ 'ধৈরয ধর চিতে মিলব মুরারি।'

॥ দুই ॥

তারাশঙ্করের গল্পে গান যখন ব্যবহার হয়েছে, তখন তা গল্পের কাহিনী ভাগের যুগল বন্দীর সহচর হিসাবে দেখা দেয়নি। গল্প আর গান সেখানে অবিচ্ছেদ্য। 'তমসা' আর 'তৃষ্ণা' এই দুটি গল্প আমাদের বিষয় প্রসঙ্গে পৃথক বিশ্লেষণের দাবি রাখে। প্রথমে উল্লেখ্য 'তমসা' গল্পের প্রারম্ভিক পটভূমি। ব্রাঞ্চ লাইনের নিরূপকরণ একটি ইস্টিশন। লাল কাঁকর বিছানো মাটির সঙ্গে সমতল প্লাটফর্ম। প্লাটফর্মের কোলে পয়েন্টিং করা ছোট একখানি ঘরে স্টেশন রুম, বাকিটা একটা টিনের শেড। সকালে আপ ডাউন দুটো ট্রেন। গল্প যখন শুরু হল তখন ট্রেন দুটি চলে গিয়েছে। জনবিরল সেই স্টেশনটিতে যাত্রী হিসাবে অপেক্ষা করছে একটি খেমটা নাচের দল। দুটি তরুণী, একটি বুড়ি ঝি, তিন জন পুরুষ. একজন হারমোনিয়ম বাজায়, একজন বেহালা, অপরজন তবলা। মেয়ে দুটির মধ্যে একটি দীর্ঘাঙ্গী, কালো। সে সেখানেই বসে চুল বাঁধছে। অপরটি সুন্দরী সে ঘুমোচ্ছে একখানি বেঞ্চে। অত্বর ভঙ্গিতে আশপাশের কথা সেরে নিয়ে লেখক এবার মূল চরিত্রকে আসরে নামালেন ঃ

> একটি অন্ধ ছেলে বসে আপনমনেই ঢুলছিল। কুৎসিত চেহারা। চোখদুটো সাদা, সামনের মাড়িটা অসম্ভব রকমের উঁচু, চারটে দাঁত বেরিয়ে আছে, হাত পা গুলো অপুষ্ট, অশক্ত। পরনে একখানা মোটা সুতোর খাটো কাপড়। মাথার চুলের পিছন দিকটা অত্যন্ত বিশ্রী ভাবে ছোট করে ছাঁটা।

লক্ষণীয় তারাশঙ্কর দুবার ব্যবহার করেছেন প্রায় সমার্থবাচক দুটি শব্দ 'কুৎসিত' এবং 'বিশ্রী'। এতক্ষণ যে পটভূমির বর্ণনা তিনি দিয়েছেন, সিগারেট মুখে হারমোনিয়াম বাজিয়ের চোখে তা নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন স্থান। দেখবার কিছু নেই। এই, ইংরাজিতে যাকে বলে ফিচারলেস, প্লাটফর্মে চৈত্রের প্রতপ্ত প্রহর তাকে পাঁচঘণ্টা কাটাতে হবে। সহসা প্লাটফর্মের বাইরে পায়চারি করতে করতে সে শুনতে পায় কোকিল ডাকছে, তার পরেই পিউ কাঁহা, চোখ গেল, কি বিপদ ভেড়া ডাকছে, চিড়িয়াখানা নাকি! কৌতূহলের টানে সে ফিরে আসে স্টেশনে—ও হরি! ও অন্ধ ছোঁড়াটা! এখনো পর্যন্ত হারমোনিয়ম বাজিয়ে যুবকটির অবাক হয়ে যাওয়া মেজাজ ও কণ্ঠস্বরটা ব্যবহার করে তারাশঙ্কর বুঝিয়ে দিলেন, তমসার জগতে চির নির্বাসিত ওই কুরূপ অন্ধ কিশোর দৃশ্যের সকল ঘাটতি পূরণ করেছে শ্রুতি এবং স্বরের সাহায্যে। যুবকের এবার বিস্মিত হবার পালা অন্য কারণে। অন্ধ ছেলেটির গানের গলা

খুব মিঠে—বসিকও বটে, গান শুনে বোঝা যায। ডুবকি বাজিযে ছেলেটি ধবেছে ঃ

চোখেব ছটা লাগিল
তোমাব আযনা বসা চুড়িতে
মবি মরি বলিহাবি—চোখে যে আব
সইতে নাবি
ঝিকিমিকি ঝিলিক নাচে
হাতেব ঘুবিশফিরিতে।

ছেলেটি গানে আপতত বর্ণনা কবে চলেছে একটি দৃশ্যের জগৎ। এবার শোনা গেল কথকেব কণ্ঠস্বর। তিনি জানালেন গাযকের গাযকী ঢঙেব কথা। কুরূপ ছেলেটির উপুড় হযে বসা। তালে তালে দোলা, দন্তুব মুখে একমুখ হাসি। স্টেশন কুলিব দল তাব দিকে ফিবে বসেছে। সেই দীর্ঘাঙ্গী কালো মেযেটিব বেণীবিন্যাস থেমে গিযেছে, যে সুন্দবী মেযেটি ঘুমোচ্ছিল তাব ঘুম ভেঙে গেছে, সকৌতুক প্রসন্ন দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আছে, বুড়ি ঝিয়েব পান চিবুনো বন্ধ হযে গেছে। অন্ধ ছেলেটি বুঝতে পারে শ্রোতাদের উপর তাব গানের প্রভাব। সে এবার দৃশ্যেব জগতেব কথা ছেড়ে ডুব দেয় শ্রুতির জগতে ঃ

রিনিঠিনি বিনিঠিনি চুড়ি আবাব তোলে ধ্বনি
আমাব প্রাণের ব্যাযলা (বেহালা) বাজে তোমার চুডিব ছড়িতে।

ছেলেটি নিজেব সুবে নিজেই বিভোর। 'মাতন লেগেছে' তাব। ক্রিযাপদটি রাঢেব কীর্তন সংস্কৃতিব দান। গান দ্রুত লযে প্রবেশ করছে এবার স্পর্শেব জগতে। যাব ঘুম ভেঙে গিযেছিল বিস্মযে সে এবার উঠে বসেছে ঃ

হায হায আমি যদি হতাম চুড়ি
কাঞ্চন নয, কাচ-বেলোযাবী
থাকতাম তোমার হাতটি বেড়ি 'জেবন' সফল করিতে
হায় হায থাকত না খেদ মরিতে।

লক্ষণীয কালো এবং ফবসা দুটি মেযেব কোনটিবই আমবা নাম জানিনা—লেখক আমাদেব জানাননি। ছেলেটি এবাব শ্রোতাদের সহর্ষ বসগ্রহণে পবিতৃপ্ত শিল্পীব আত্মবিশ্বাস নিযে বলে—'পানমন সমর্পন কবে গাইলে মোহিত কবে দিতে পাবি।' এবাব মেযে দুটি খিল খিল কবে হেসে উঠল। ছেলেটি মলিন্দকে বলে, 'মেযেছেলেতে হাসছে। ভদ্দর লোক লয ?' কী কবে সে জানল তাও বলে, গলাব 'রঙ্গ ('আওযাজ) থেকে, মিষ্টি সুবাস থেকে',

চুড়িব শব্দ থেকে সে বুঝেছে। এও বুঝছে সোনার চুড়ি—কাঁচেব নয, অনেকক্ষণ থেকে তাব অনুমান এ পথে সক্রিয থেকেছে। আমবা যাবা গল্প শুনছি তাবা এবাব জানতে পাবলাম ছেলেটি এই গানটিই তখন বেছে নিযেছিল কেন। মেযে দুটিব হাসিব শব্দে উচ্চকিত অন্ধ ছেলেটি জিজ্ঞাসা কবল, ঠাকবুণবা আপনাবা হাসলেন কেনে। মুখবা কালো মেযেটি বলল, যে আমবা নই অন্যলোকে। ছেলেটি এবাব গানেব জগৎ থেকে অলঙ্কাব টেনে এনে চমৎকাব উত্তব দিল · শিঙেতে বাঁশি বাজে না ঠাকবুণ, ক্যানেস্তাবায তবলাব বোল ওঠে না। এবাব মেযে দুটির বাক্যহারা হযে যাবাব পালা। আমবা যাবা তাবাশঙ্কব-লভ্য সংলাপের বসগ্রাহী তারা আব একবাব বলিহাবি দিলাম। এবাব গল্পকাব আমার্দেব সামনে এগিযে দিলেন গল্পেব দ্বিতীয প্রধান চবিত্র ওই সুন্দবী তবুণীকে। একটু আগে সে বেঞ্চে ঘুমোচ্ছিল। ঘুম ভেঙে যে গান শুনেছে। তারপব ছেলেটিব মনোজ্ঞ আলঙ্কাবিক উত্তবে স্পৃষ্ট ও অভিভূত হযেছে। এখন তাব মুখে মৃদু হাসি —'কিন্তু সে হাসিব চেহাবা যেন ভিন্ন বকমেব'। সে হাসি একমাত্র সেই নাবীব পক্ষেই সম্ভব, যে ভিতব থেকে হাসে, কবুণা আর স্নেহ আব সহানু-ভূতি মেশানো স্ববে মেযেটি জিজ্ঞাসা কবল—'আমবা হেসেছি বলে তুমি বাগ কবছ নাকি ?' আমবা এইবাব অনেক খবব পাবো। জানব ছেলেটিব নাম পঙ্ক্ষী। জানব নামকবণেব ইতিহাস। জানব কেন তাব ভিক্ষাবৃত্তি। মেযেটিব সহৃদয প্রশ্নেব উত্তবে এই কদাকাব ছেলেটি তাব অতি অকিঞ্চিৎকব জীবনকথা বলে গেল সংক্ষেপে। অন্যদিকে এও আমবা জানতে পারলাম, এই সুন্দবী মেযেটি বিখ্যাত গাযিকা —গ্রামোফোন ডিস্‌কে তাব গান বাজাবমাত কবেছে। পাশেব লোকজনেব কাছে এ কথা শুনে পঙ্ক্ষী একটু থতিযে গেল। তাহলে তো গান গেযে সে প্রগলভতা কবে ফেলেছে। গাযিকা বলল, তুমি তো খুব ভাল গান গাইতে পাব। ভাবি সুন্দব গলা তোমার। এ কথায পঙ্ক্ষীব অভিভূত হযে যাবাব কথা—এ তো আব পাঁচজনেব কথা নয, বসগ্রাহী ও বস-দক্ষ বলে যাব পবিচিতি আছে, এ যে তাব কাছে পাওযা স্বীকৃতি। তাবপবে বেশ 'কিছুটা' কিন্তু কিন্তু কবে পঙ্ক্ষী জানিযে ফেলল মেযেটিব কাছে তাব অনিবার্য দুবাকাঙ্ক্ষা—'আপনি একটি গান যদি গাইতেন'। ততক্ষণ স্টেশন চত্বব নির্জন। অন্য মেযেটি হাবমোনিযম বাজিযে ছোকবাটিকে নিযে স্নানেব উদ্দেশ্যে গেছে, খাবাব বেলা হযেছে, সবাই দোকানপাট বন্ধ কবে খেতে চলে গেছে। নাবীসুলভ স্বাভাবিক সাবধানতায় মেযেটি তাব হাতেব দু আঙুল অন্ধেব চোখেব সামনে নাড়ছিল। কতখানি অন্ধ পবখ কবে দেখছিল। মেযেটি বলল—গান শুনবে ? অন্ধ পঙখী মাটিতে হাত বুলিয়ে মেয়েটির পদপ্রান্ত ছুঁযে বলল—আপনাদের চবণ কোথা পাবো বলেন ? গানই বা-

শুনব কি করে ? তবে—একটু নীরব থেকে সেই অন্ধ উপরের দিকে মুখ তুলে বলল—সাধ তো হয়। মনিষ্যি তো বটে। মেয়েটির করুণা হল ? খেয়াল হল ? তারাশঙ্কর যা-ই বলুন, আমার মনে হয় লোভ হল। একজন যথার্থ শিল্পীর কাছে একজন সত্যকার শিল্পী নিজের শক্তির পশরা খুলে দিতে চায়। কিন্তু হারমোনিয়ম যে চাপা পড়ে রয়েছে। পঙ্কী বলল—হারমনি থাক। আপনি এমনি গান। আস্তে আস্তে গান। রোদ বেজায় চড়েছে। শুধু গলায় আস্তে গান। ভারি ভাল লাগবে। কল্পনাটি মেয়েটির সকল দ্বিধা ঘুচিয়ে দিল। টমাসমানের Tristan গল্প হের স্পিনেলের অনুরোধে সেই যক্ষ্মা রোগাক্রান্ত তরুণী বিচলিত হয়েছিল, বলা ভাল সেও স্পৃষ্ট হয়েছিল হের স্পিনেলের জ্বালানো কল্পনার আগুনে। শিল্পের শুদ্ধতা প্রকৃত সমজদারের মনে যে বিস্ময় সৃষ্টি করে সেই তো পুরস্কারের সোনার মুকুট। মৃদু গলায় 'তমসা' গল্পের নামহীনা গায়িকা চরিত্র গান শুরু করল ঃ

কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি।
কভু পথের পরে কভু নদীর ধারে
চেয়ে চেয়ে ক্ষয়ে গেল আমার
কাজল পরা জোড়া আঁখি।

পঙ্কী হের স্পিনেল নয়, সুতরাং সে ভাবতে পারে না How find, how bind this bliss so far remote from partings torturing pangs ? Ah, gentle glow of longing, soothing and kind, oh, yeilding sweet sublime, oh raptured sinking into the twilight of eternity ! Thow Isolde Tristan I, yet no more Tristan, no more Isolde ··পঙ্কী কি জানে এ গান মাথুর রসের কথা ? সে কি জানে যার জন্য এই অনন্ত প্রতীক্ষা সে আর কোনোদিন ফিরবেনা—'পঙ্কীর সর্বাঙ্গ যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। মস্তিষ্কের মধ্যে শিরায় উপশিরায় ওই গানের ধ্বনি ঝঙ্কার বীণের বহুতন্ত্রী ঝঙ্কারের মত ধ্বনি তুলে সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে তার। সে বলল তার ভাষায় 'জেবন ধন্য হল আমার ঠাকরুন'। 'একটা পেনাম করব আপনকাকে, ভারি সাদ হচ্ছে।' মেয়েটির মনে হল এমন প্রণাম সে কখনো পায়নি। নীরবে সে দাঁড়িয়ে থাকল। একাধিক গল্প আছে তারাশঙ্করের যেখানে আমরা দেখতে পাই অতীব কুদর্শন পুরুষ ও সৌন্দর্য প্রতিমা নারীর সহাবস্থান। হয়তো 'শাপমোচন' গল্পটির কথা এখনি অনেকের মনে পড়বে। অন্যদিক থেকে মনে পড়বে টমাস মানের Little Herr Friedemann। কিন্তু 'শাপমোচন' বা 'লিট্‌ল ফ্রীডমান-এর সৌন্দর্য

নিয়তির দ্বারা লাঞ্ছিত ট্র্যাজিক কঠিন করুণ পরিণাম তমসা-য নেই। থাকার কথাও নয়। ক্রিডমান তাব সৌন্দর্যের অধীশ্বরীর কাছে মাটিতে বসে পড়ে কোলে আর্ত মাথাটা বেখেছিল। তমসা-য পঙ্ক্ষী প্রণাম কবল মেয়েটির পাযে মাথা বেখে—'সে পা সবিযে নিলেনা। ধূলিধূসব দিগন্তেব দিকে অর্থ-হীন স্থিব দৃষ্টিতে চেযে সে চুপ করেই দাঁড়িয়েছিল'। 'ওঠ' 'ওঠ'—মৃদু গলায মেযেটি বলছে। পঙ্ক্ষী উঠল—পঙ্ক্ষীর চোখেব জলে ভিজে মেযেটিব পাযেব আলতা অশ্রুেব মুখময লেগেছে। গলায নাকে, কপালে, ঠোঁটে মুখময লাল বঙ। অন্যেবা হাসল। এই মেযেটি হাসলনা—সে বলল, মুখটা মোছ, পঙ্ক্ষী বলল—থাকুক আজ্ঞে। এই মেয়েটিও স্নান কবতে গেল, সঙ্গে সব থেকে নিবাপদ পথ প্রদর্শক, যাব দর্শক হবাব কোনই সম্ভাবনা নেই, পঙ্ক্ষী। এবাব পঙ্ক্ষী অবাক কবে দিল মেযেটিকে—নিজেব জীবন কথা বলতে বলতে সে থেমে গেল। হঠাৎ বলল—আপনাব গানেব ওই টুকুন ভারি সোন্দব—বলতে বলতে সে অবিকল ঠিক সুরে গেযে উঠল—

ঘবকন্না সব ভুলে যাই ছুটে যে আসি।
আমাব গা ঘষা হয় না, কেশ বাঁধা হয না
আবো হয না কত কি।

গল্পেব কাহিনী ভাগ এখানেই প্রায শেষ। আমাদেব জানা হল না মেয়েটিব নাম। জানা হল না যে সুগন্ধী সাবানটি গান শোনালে তাকে দেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওযা হয়েছিল, সে সাবান আব পঙ্ক্ষীকে দেওযা হযেছিল কিনা। নিশ্চয না। মেয়েটিব কণ্ঠেব গান অবিকল পঙ্ক্ষী তুলে নিযেছে দেখে বিস্মিত মেযেটিব হাত থেকে সাবানটা পড়ে গেছে—এই মাত্র জানি। সাবানেব চেযে অনেক বড জিনিস পঙ্ক্ষী তখন পেযে গেছে। মাঝখানে একটা ব্যাপাব ঘটেছে। এব গান ও, ওব গান এ শিখে নিযেছে।

ট্রেন চলে গেল। পঙ্ক্ষীর জীবন উদাস হযে গেল—লবণ হাবিয়ে গেল। সে জংসন স্টেশনে চলে গেল। বর্ধমান বড শহব। যেতে ভয কবল। টেলি-গ্রাফের পোস্টে কানবেখে সে বলে—টবে টক্কা টবে টক্কা, হ্যালো ঠাকবুন, বর্ধমানেব ঠাকবুন। আমি পঙ্ক্ষী। গান গাইছি আমি। 'ও তোব তরে কদম তলায চেযে থাকি।' ধীরে ধীবে দিনে দিনে প্রতীক্ষা শুকিয়ে যায। মনে পডাটাও মবে যেতে থাকে। একেবাবে কি মবে যায? তা হযতো যায না, মনে পড়ে তবে তেমন 'আকুলি' কবে ওঠে না। 'আকুলি' শব্দটি লেখক বাঢেব মাটি থেকে কুডিযে নিযেছেন। শুধু একদিন আবাব একটু দোলা লাগল। বর্ধমানেব ঠাকবুণেব গলায গানখানি সে শুনতে পেল। প্রথমে ঠাকরুণের

নিজের গানটি, তারপরে নিতাই কবিয়ালের কাছে শেখা দিদি ঠাকরুনকে শিখিয়ে দেওয়া তার গান 'চোখের ছটা লাগল'। কিন্তু না—সে হল দিদি ঠাকরুনের গ্রামোফোনের রেকর্ডের গান। দিদিঠাকরুন সশরীরে নয়। দিন আরো চলে গেল। পঙ্কীর মাথার চুল সাদা হয়ে গেল। সামনের দাঁত পড়ে গেল। তীর্থস্থানে সে ভিক্ষা করে। গান আর তেমন গায় না। যেদিন ভিক্ষা কম জোটে সেদিন গায় 'কালা তোর তরে' গানটি। একজন বয়স্কা মহিলা ও পুরুষ সামনে এসে দাঁড়ায়। পুরুষটি বলে গান একখানা গেয়েছিলে বটে, হাটে মাঠে বাটে ছড়িয়ে গেছে। মহিলাটি অন্ধকে একটা আধুলি দেন। অন্ধপঙ্কী হাত বাড়িয়ে মহিলার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে—না স্পর্শেরও কোনো স্মৃতি নেই। দুজনেই ভুলে গেছে, ভুলে যে গেছে সে কথাও ভুলে গেছে। শুধু হারায়নি গানটি। আধুলিটা চলবে কিনা পরখ করে পঙ্কী উঠে পড়ে। পাখি ডাকছে। সন্ধ্যা হল। ঘটনাবিরল, নির্মিতি কৌশল বিমুক্ত এই গল্প বাংলা সাহিত্যেও এক অসাধারণ গল্প। গান এখানে গল্পের আত্মিক অভিজ্ঞান। নির্মিতিকৌশল বিমুক্ততাই এর প্রধান আঙ্গিক রীতি।

॥ তিন ॥

তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতার ও কল্পনার রাজযোটক সাযুজ্য ঘটেছে যে সব প্রধান উপন্যাসে 'কবি' তাদের অন্যতম। বই আকারে প্রকাশের পর বইটির রসসিদ্ধি নিয়ে মতভেদ দেখা দেয়। বনফুল বইটি ধরতে পারেন নি। মোহিতলাল বইখানির রসগ্রাহী আলোচনা লিখেছিলেন। শিবরাম চক্রবর্তী মনে করেছিলেন বইখানি নোবেল প্রাইজ পাওয়ার উপযুক্ত। পরিমল গোস্বামী বলেছেন 'কবি বিশুদ্ধ প্রেমের গল্প।' 'কবি' গ্রন্থাকারে প্রকাশের পর অর্ধশত-কেরও (১৯৪২ / মার্চ) অধিককাল আজ আমরা পেরিয়ে এসেছি। দূরত্বের প্রেক্ষণী ব্যবহার করলে এখন মনে হয় নিতাই কবিয়ালের নিজেকে ভেঙে ভেঙে গড়ে নেবার কাহিনী এই উপন্যাস। ভারতবর্ষের চারজন মহৎ কবির একজন ছিলেন রাস্তার মস্তান, আরেক জন জারজ, আরেক ছিলেন অজমূর্খ, অন্যজন গোটা ছয়েক স্কুলে ঘুরেও কোথাও স্থায়ী হননি, বোধ হয় দেখে নিচ্ছিলেন স্কুল কেমন আদপেই হওয়া উচিত নয়। দেবী সরস্বতীর বর লাভে এরা ধন্য। ভারতীয় পুরাণ অনুযায়ী এই দেবীর এক হাতে বীণা, এক হাতে পুস্তক। শেষোক্ত ব্যক্তি দেবীর দুহাতের দানই পেয়েছেন, আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে অত বড় কবিও নেই, অত বড় কম্পোজারও নেই। জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে তারাশঙ্কর এই কথা উপলব্ধি করেছেন যে কিম্বদন্তী গুলির মধ্যে ধৃত রয়েছে এক চিরকালীন সত্য। ছক ভাঙ্গা মানুষেরই হাতে থাকে

কবিতার কলম। ছক-বন্দী মানুষ নূতন উপলব্ধির জনক ও রূপায়ক হতে পারে না। ইংরেজ শাসনে স্বভাব-অপরাধী বলে ছাপ মারা ডোম সমাজে নিতাই হল সেই মানুষ যে শুনতে পেয়েছিল অন্য দিগন্তের আহ্বান। 'বিশুদ্ধ প্রেমের গল্প নয়' 'কবি' উপন্যাস, নিতাই কবিয়ালের 'হয়ে ওঠার' গল্প। তার প্রত্যেকটি গানের ইতিহাস আছে। সে ইতিহাসের মূল কথা হল নিতাইয়ের নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে গড়া, গড়তে গড়তে ভাঙা। এর জন্য তারাশঙ্করকে আয়ত্ত করতে হয়েছে এক নিজস্ব নৈরাত্ম্যসিদ্ধি। 'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে' গানটির দ্বিতীয় পংক্তির জন্মকথা এখানে স্মরণ করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তারাশঙ্করের 'আত্মকথা'থেকে আমরা জানি দ্বিতীয় পংক্তিটি কী হবে, তার নানা রকম বয়ান তারাশঙ্কর ভেবেছিলেন। কিন্তু কোনটাই তাঁর কাছে লাগসই বলে মনে হচ্ছিল না। তারাশঙ্কর বলেছেন সেগুলো তারাশঙ্করের লেখা পংক্তি হয়ে যাচ্ছিল, হতে হবে নিতাইয়ের পংক্তি। প্রথম পংক্তিটির মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন বিষাদ আছে—দ্বিতীয় পংক্তিটিকে এমন হতে হবে, যাতে বিষাদকে ছাপিয়ে ফুটে উঠতে পারে জীবনের, সুন্দরের উজ্জ্বল আনন্দ—এবং সর্বোপরি তা একান্তভাবে নিতাইয়ের হওয়া চাই। সুতরাং গল্পের ভিতর থেকে দ্বিতীয় পংক্তিটি স্বয়ম্ভূত হওয়া দরকার। যামিনী রায় এই গানের প্রথম কলিটি শুনে মুগ্ধ হয়ে তারাশঙ্করকে উৎসাহিত করেছিলেন। তারাশঙ্কর প্রথম ভেবে ছিলেন, 'কালো চোখের তারায় তবে আলো এমন হাসে কেনে', তারপরে ভেবেছিলেন, 'কালাচাঁদের কোলের লাগি সোনার রাধা কাঁদে কেনে'। কিন্তু কোনোটা মনে ধরল না। তারপর এই চূড়ান্ত পংক্তিটি এল—'কালোকেশে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে'। এল গল্পের নিজস্ব নিয়মে। নিতাইয়ের কৃতিত্বে গর্বিনী ঠাকুরঝির মুখ চোখে। তখনো দ্বিতীয় পংক্তিটি অজাত ঃ

উত্তেজনায় ঠাকুরঝির মাথার কাপড় খসিয়া গেল।

নিতাই মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, বা—বা—বা—ভাবি মানিয়েছে তো ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝির রুক্ষ কালো চুলের এলো খোঁপায় এক থোকা টকটকে রাঙা কৃষ্ণচূড়া ফুল। লজ্জায় মেয়েটি সচকিতা হরিণীর মত তাহার খসিয়া পড়া ঘোমটাখানি ক্ষিপ্র হস্তে, দ্রুত ভঙ্গিতে মাথায় তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু নিতাই একটা কাণ্ড করিয়া বসিল, সে খপ করিয়া হাতখানি ধরিয়া বলিল—দেখি। দেখি! বা—বা—বা। মেয়েটি লজ্জায় অধোমুখ ও কাঁদো কাঁদো হইয়া গেল, বলিল—ছাড়ো। ছাড়ো।

কিন্তু ঠাকুরঝি রাগ করেনি। লজ্জা-বিবর্ণ তার মুখখানি যেন কচি

পাতার উপব কাঁচা বোদেব ঝিলিমিলি। উপমাটি তারাশঙ্কবের। এখানে তাবাশঙ্কবেব শক্তিমত্তার মূল বহস্যেব তিন স্তর সম্বন্ধে একটা কথা বলা দরকার—গল্প, চরিত্র, কবিত্ব। গল্প তাব চরিত্রের জন্য তারাশঙ্কব হাত পেতেছেন তাঁব পর্যবেক্ষণ আর অভিজ্ঞতার কাছে—কিন্তু কবিত্ব? এ সবটাই তাঁব নিজেব। ঠাকুবঝি বিদায় নিল সেদিনেব মত। কিন্তু নিতাইয়ের মনে দ্বিতীয চবণটি এসে গিয়েছে—'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে। কালো কেশে বাঙা কুসুম হেরেছে কি নয়নে'। একটা অপ্রাসঙ্গিক কথা এখানে না বলে পাবছি না। সমবেশ বসু—'পবিচয'-এর বন্ধু এবং আমারও বন্ধু, এই গানটি বড় চমৎকাব গাইতেন—ফিল্মে ব্যবহৃত গানেব সুর তাঁব পছন্দ হযনি। নিজের দেওয়া সুবে আখর দিযে তিনি গাইতেন। আমাদেব দুর্ভাগ্য যে সে গান আমরা টেপ রেকর্ডারে তুলে বাখতে পারিনি।

আগেই বলেছি 'কবি'-র প্রত্যেকটি গান নিতাইযের জীবন পথেব এক একটি মাইলস্টোন। নিতাই তাব বংশ পরম্পবার বাঁধন ছিঁড়ে নিজেব পথ ধরতে চায। স্বোপার্জিত সত্তায চিহ্নিত হতে চায। তখনো সে পথ খুঁজে পাযনি। শুধু সে এইটুকু জানে রাত্রিব অন্ধকার তাব মামার রক্তে যে বুদ্বুদ সৃষ্টি করে, তা থেকে মুক্তি পেতে হবেই। মেলা, যাত্রা, কবিব আসব, 'আলোকোজ্জ্বল' উৎসবমুখব রাত্রির মধ্যে যদি সমস্ত জীবনটা কাটিযা যায, তবে বড় ভাল হয'—নিতাইযেব কণ্ঠস্ববকে লেখক যদিও নিজের ভাষায মুড়ে দিযেছেন, তথাপি দিশা খুজে বেডানো একাকী নিতাইকে খুঁজে পাওযা যায তার এই সমযেব বাঁধা এক বাউল ঢঙেব গানে ঃ

সেই মেলাতে কবে যাব
ঠিকানা কি হাযবে!
যে মেলাতে গান থামে না
বাতেব আঁধাব নাইবে।
ও বসময় ভাইবে।

এই গানেব পবেব ঘটনা চণ্ডীমাযেব মেলায ঘটনাচক্রে নিতাইযের গান বাঁধা, কবিগানেব আসরে অনেক মানুষের সামনে দাঁড়ানো। 'কালো যদি মন্দ তবে' গানটি তাব পরেব ঘটনা। গানটিব একটি আলাদা তাৎপর্য আছে। ঠাকুবঝিকে কালো বঙের খোঁটা দিযেছে বাজা। বঙেব খোঁটা ঠাকুবঝিব নবম মনে ক্ষোভ এবং অভিমান-স্তব্ধতা সৃষ্টি করেছে, তাব ফলেই তার দ্রুত প্রস্থান—ঘটনাটি নিতাইকে পীড়িত কবেছে। গানেব প্রথম পংক্তিটি ঠাকুবঝির হযে

রাজাকে বলা—সবাইকে বলা। বর্ণাভিমানেব মধ্যে যে মিথ্যাটুকু বযেছে তাকে ধবিযে দেওয়া প্রথম পংক্তির উদ্দেশ্য—পরোক্ষ উদ্দেশ্য ঠাকুবঝিকে সান্ত্বনা, তাকে মানসিক প্রত্যয় যোগান। দ্বিতীয় পংক্তিটি এসব কিছুই নয় —তা একান্ত ভাবে রূপ ও সৌন্দর্যমুগ্ধ প্রেমিকের আবতি। এই পংক্তিটির আলোয় নিতাই নিজেকে দেখতে পেল।

আমি আগে বলেছি তারাশঙ্করেব গল্প নির্মিতির উপবিকাঠামোয যে কবিত্ব তা গল্পকে সপ্রাণ ও বেগবান কবে তোলে। 'কবি' উপন্যাসে সেই শক্তি উপন্যাসের জমিকে সবস স্নিগ্ধ করে তুলেছে—নিতাইযের গানের ফুল ফুটেছে সেই মাটিতে। যেমন কযেকটি বলছি ঃ

(ক) ঠাকুরঝিব কোমল কালো আকৃতিব সঙ্গে তাহাব প্রকৃতির একটা ঘনিষ্ঠ মিল আছে, সঙ্গীত ও সঙ্গতের মত।

(খ) ঠাকুবঝি যেন কাজল দীঘিব জল। ছটা ছড়াইয়া পডিলে সঙ্গে সঙ্গে ঝিকমিক কবিযা উঠে। আবাব মেঘ উঠিলে আঁধাব হয, কে যেন কালি গুলিযা দেয়।।

(গ) হাবখানিব ছোঁযায বুকেব ভিতরটা তাহাব থবথর কবিয়া কাঁপিতেছে, বসন্তদিনে দুপুবের বাতাসে অশবথ গাছেব নতুন কচিপাতাব মত।

(ঘ) বর্ষার জলো হাওযাব মাতামাতিব উপব ছডাইয়া পডা গুবু-গম্ভীর মেঘের ডাকেব মত বলিলে অন্যায হইবে না, কারণ নিতাইযেব গলাখানি তেমনই বটে।

ঙ) বর্ষাব রস পবিপুষ্ট ঘনশ্যাম পত্রশ্রীব মত তাহার সে মুখখানি মুহূর্তে মুহূর্তে পবিবর্তিত হইযা হেমন্ত শেষের পাতাব মত পাণ্ডুব হইযা আসিল।

শেষতম উদ্ধৃতিটি ব্যথাহত ঠাকুবঝি প্রসঙ্গে ব্যবহৃত চিত্রকল্প। বসন প্রসঙ্গে চিত্রকল্পটি পবে অধিকতব বিষণ্ণ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করবে। নিতাই নিজেব চাদবেব সঙ্গে বসনেব আঁচলেব খুঁট গাঁটছডা হিসাবেই বেঁধে দিচ্ছে। নিতাই বলছে, 'আমি যদি আগে মবি, তবে তুমি সেদিন খুলে নিও এ গিঁট; আর তুমি যদি আগে মর, তবে সেই দিন আমি খুলে নোব গিঁট। বসন্তের মুখ—

খানি মুহূর্তে পাল্টে গেল—'ঠোঁট দুইটা, শীত শেষেব পাণ্ডুর অশ্বত্থ পাতা উতলা বাতাসে যেমন থবথব কবিযা কাঁপে, তেমনি করিয়া কাঁপিতে লাগিল।' দুটি চিত্রকল্পেরই vehicle ও tenor প্রায এক। কিন্তু ঠাকুরঝিবৃত্ত ও বসনবৃত্তেব মধ্যে যে মাত্রাগত ও গুণগত পার্থক্য সেটাই দুটি চিত্রকল্পকে স্বতন্ত্র কবেছে।

একটা গান নিতাই তার সঞ্চীযমান অভিজ্ঞতাব প্রথম অধ্যাযে বেঁধেছিল। জনতাব জন্য নয, তাব নিজেব জন্য—

আমি ভালবেসে এই বুঝেছি সুখেব সাব সে চোখেব জলে বে।
তুমি হাস আমি কাঁদি বাঁশি বাজে কদমতলে বে।।

রাঢভূমিব লোকমানসে বাধা-ধারণা গডে তুলেছে প্রেমিকা নারীর প্রত্ন-প্রতিমাব আধাব। এ গান যখন নিতাই বচনা কবেছে, তখনো সে মহাজন পদকর্তাদেব কথা শোনেনি। একথা সে শুনবে তাব জীবনে বসন-অধ্যাযে! নিবক্ষব ছিল ঠাকুরঝি। বসন নিবক্ষব ছিল কি? অন্তত গান যে লিখতে হয় একথা সে জানে এবং তাব গানেব খাতাব কথা সে নিজেই বলেছে। নিতাইযেব বলিষ্ঠ বাহুবন্ধনে নিষ্পেষিত ও রুদ্ধশ্বাস হতে হতে বসন নিতাইকে দিযে-ছিল বাযশেখবের সুবিখ্যাত পদেব মাধুর্যেব সন্ধান। চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি এবং বৈষ্ণব কবিদেব বসস্বর্গ থেকে আবাব বসনই তাকে নামিযে আনল নিধুব টপ্পাব মানবীয প্রেমে। নিতাই এভাবে দিগন্তেব পব দিগন্ত পাব হচ্ছে। ঝুমুর দলেব অভিজ্ঞতাব নানা সঞ্চয তাকে সমৃদ্ধ কবেছে। ঠাকুবঝিব বিষাদান্ত পবিণাম থেকে সে এসেছে মদিবতা-তীব্র বসনে। কিন্তু নিতাইযেব এই পানপাত্রটি ইতোমধ্যেই জীর্ণ। বসন যক্ষ্মা বোগাক্রান্ত। এতদিন সে বাঁচা মবা নিযে ভাবেনি। নিতাইকে ভালবেসে সে এবাব বাঁচতে চাইছে। নিতাইযের ঠাকুবঝি-অধ্যাযে প্রধান গানটি বূপেব আবতি। বসন-অধ্যাযে নিতাইযেব প্রধান গান—এই উপন্যাসে কেন্দ্রীয থীম-এব ধাবক সঙ্গীত জীবনের বিষাদ-মধুব উপলব্ধিব গান। তাবাপীঠ অট্টহাসেব মতো শ্মশান, কেন্দুবিল্বেব মতো বাউল-বৈষ্ণবেব আখডা বাঢ ভূমিতে এক দ্বান্দ্বিক জিজ্ঞাসা-কে ধবে বেখেছে—কে বেশি সত্য? ওই মাতৃবূপা দেবী? না, অনন্ত প্রেমতাপসী বাধা? এই দ্বন্দ্ব তাবাশংকবকে তথা নিতাইকে অর্পণ কবেছে এক জিজ্ঞাসাব পাত্র ঃ

এই খেদ আমাব মনে মনে
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে
হায, জীবন এত ছোট কেনে?

জীবন এবং মৃত্যু, অস্ত এবং উদয, শিকস্তি আর পয়স্তি—ভারতীয প্রকৃতি ও জীবন থেকে পাওয়া এই ডায়ালেকটিকসকে তারাশঙ্কর নানা ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছেন। আয়ুর সীমাবদ্ধতা আর প্রেমের সাধের অশেষত্ব গানটির মূল কথা। তবে ততোধিক বিস্ময়কর গানটির নাটকীয় উপস্থাপনা। ঠাকুরঝি তখন অনেকদিন হল জ্যোৎস্না ভরা রাতে বসনের কাছে নিতাইকে দেখে চলে গেছে। প্রচণ্ড মানসিক আঘাতে সে পাগল হযে গেছে। ঠাকুরঝির কথা নিতাইযের মনে পড়ে, প্রাযই মনে পড়ে। রাধাগোবিন্দ মন্দিরে চাদরে-আঁচলে গাঁটছড়া বাঁধার পর আরো মনে পড়ে। এখন সে ভাবে, ঠাকুরঝি তুমি দূরে থাক, ভাল থাক। কিন্তু বসন্তকে ভালবেসেই কি সে ভালবাসার পালা শেষ করতে পারবে? নাকি ভালবাসা অসমাপ্তই থেকে যাবে। আনমনে নিতাই মাঠে মাঠে ঘুরে বেড়ায। কেউ গিযে দলে ফিরিয়ে আনে। বসন বলে, সকাল থেকে মাঠে ঘুরে এলে খেতে দেতে হবে না? নিতাই বলে, 'ভারি ভাল কলি মনে এসেছে বসন। শোন'—বসন স্নানের তাগিদ দেয। নিতাই বলে, 'না, আগে শোন।' বলেই সে সুর ভাঁজতে শুরু করে 'এই খেদ আমার মনে মনে ··' 'মুহূর্তে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।' গান শুনে বসন্ত যেন পাথর হযে গেল। তার চোখে নামল জলের ধারা—

'—এগান তুমি কেনে লিখলে কবিযাল

—কেনে বসন?

ক্লান্ত বিষণ্ণ কণ্ঠে সে বলিল—আমি তো এখন ভাল আছি কবিয়াল—তবে তুমি কেনে লিখলে, কেনে তোমার মনে হল জীবন এত ছোট কেনে?'

গানটি তখনো পর্যন্ত অসমাপ্ত। বসনের মুখ দিযে যখন রক্ত উঠেছে তখন রোগশীর্ণ ক্লিষ্ট মুখে সে নিতাইকে বলল—'মরতে তো আমার ভয় ছিল না। কিন্তু আর যে মরতে মন চাইছে না।' তারপর হঠাৎ সে বলে উঠল—'আমি জানতাম কবিয়াল। যেদিন সেই গান তোমার মনে এসেছে—সেই দিনই জেনেছি আমি।

—কোন গান বসন?

—জীবন এত ছোট কেনে-হায!

ঝর ঝর করিযা সে কাঁদিযা ফেলিল।'

এ গান তখনো অসমাপ্ত। ঠাকুরঝি আর বসন এই দুজন নিতাইয়ের ক্রমবর্ধমান আত্মসম্বিতের অবলম্বন। প্রেমে সফলতা বলে কিছু নেই, বিফলতা বলে কিছু নেই। 'পৃথিবীতে প্রেম একবার মাত্র রূপ পরিগ্রহ করিযাছিল, তাহা বঙ্গদেশে'—রাধাভাবে ভাবিত সেই সন্ন্যাসীর অঙ্গাবরণ কিন্তু গৈরিক—প্রেমের রঙও বাউল বৈষ্ণবের কাছে তাই। ঠাকুরঝির প্রেমে রাধার ঐকান্তিকতা ছিল। বসনের প্রেম মানবীর প্রেম, তা বিষামৃত মধুর। বসন নিতাইকে

শুধু মন আর দেহ দিয়েছে তাই নয়, সে নিতাইকে দিয়েছে উন্নততর সাংস্কৃতিক স্তরের ঠিকানা। মহাজন পদাবলী, নিধুব টপ্পা, বিবাহিত জীবনের আশ্বাস, দেহের রহস্য, মনের আশ্বাস—কত কিছু। আরেকটু হলেই বসন সব পেয়ে যেত। কিন্তু তার জীবিকাগত নির্যাতি, তার দেহস্থ মৃত্যুবীজ তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল। মৃত্যুর প্রাঙ্মুহূর্তে অভিমানিনী বসন রাবেকের জন্য গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিমান জানিয়েছে। তারপর শেষ দৃষ্টি নিতাইয়ের মুখের উপর ন্যস্ত রেখে গোবিন্দের কাছেই জানিয়েছে ব্যাকুল জীবন-তৃষ্ণা—'গোবিন্দ, রাধানাথ, দয়া করো। আসছে জন্মে দয়া করো।' নিতাই ডাকল 'বসন'। বসন বলল—না। আর ডেকোনা। এর পরমুহূর্তেই বসন—মরণাঘাতে নিতাইয়ের কোলে ঢোলে পড়ল।

এইবার অসমাপ্ত গানটি সমাপ্ত হবার সময় এল। নিতাই জানেনা ঠাকুরঝির মৃত্যুর কথা। তখনো জানেনা। বসনের মৃত্যু সে চোখের সামনে দেখল। অগাধ বাসনা, অদম্য জীবনাসক্তি নিয়ে বসন মরেছে। চিতায় শায়িত তার দেহ থেকে মাসী খুলে নিল যেখানে যেটুকু সোনা ছিল। তারাশঙ্করের প্রায় প্রধান লেখায় জীবনচেতনা ও মৃত্যুচেতনা অর্ধনারীশ্বরের মতো বিজড়িত। তার প্রথম উদ্ভাসন 'কবি' উপন্যাসে। বসনের মৃত্যুর পর নিতাই ভাবছে ঃ

> মরণ সত্য সত্যই অদ্ভুত। গহনার উপর বসন্তর কত মমতা। সেই গহনা প্রৌঢ়া খুলিয়া লইল। বসন্ত একটা কথাও বলিল না। দেহের জন্য বসন্তের কত যত্ন। এতটুকু ময়লা লাগিলে সে দশবার মুছিত, এতটুকু যন্ত্রণা তাহার সহ্য হইত না—সেই দেহখানা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখের এতটুকু বিকৃতি হইল না।

এবার নিতাইয়ের মনে এই প্রশ্ন জাগল অচরিতার্থ জীবনের সব আকিঞ্চন মরণের পরে কি মেটে? ভাবতে ভাবতে গানটির বাকি কলিগুলি এসে গেল ঃ

জীবনে যা মিটল নাকো মিটবে কি হায় তাই মরণে—
এ ভুবনে ডুবল যে চাঁদ সে ভুবনে উঠল কি তা?
হেথায় সাঁঝে ঝরল যে ফুল হোথায় প্রাতে ফুটল কি তা?
এ জীবনের কান্না যত—হয় কি হাসি সে ভুবনে?
হায়? জীবন এত ছোট কেনে?
এ ভুবনে?

নিশ্চয বৈষ্ণবতার ছায়া পড়েছে বসন্তর কাছে শিক্ষিত নিতাইযেব গানে। কিন্তু মাথুবে পালা শেষ কবা যে বৈষ্ণবদেব নিষিদ্ধ। ভাবসম্মিলন না গাইলে পালা শেষ হয় না। মৃত বসন্তব স্মৃতি বুকে নিয়ে শ্মশানে বসে থাকল নিতাই। একবার তাব মনে হল বসন্ত এসেছে—নতুন তাব সাজ, নতুন তাব ভঙ্গি, নতুন তার কথা। এ এক অভিনব ভাবসম্মিলন। নিতাই নতুন গান বাঁধল ঃ

মবণ তোমার হাব হল যে মনের কাছে
ভাবলে যারে কেড়ে নিলে সে যে দেখি মনেই আছে
মনেব মাঝেই বসে আছে।
আমাব মনেব ভালবাসাব কদমতলা
চাব যুগেতেই বাজায সেথা বংশী আমাব বংশীওলা।
বিবহেব কোথায পালা—
কিসেব জ্বালা ?
চিকন কালা দিবসনিশি বাধায যাচে।

এবাব সে পেল এক পূর্ণতা। বসন্ত হাবায়নি।

বসন্ত অধ্যায় শেষ হতেই তাব জীবনেব দ্বিতীয অধ্যায শেষ হল। শান্ত ঠাকুরঝি এক অধ্যায়। সে যেন এক ছাযাবী দিঘিব কালো জল। সে ঘটিযে দিযেছিল তাব কবিত্বেব প্রত্যয। বসন্ত যেন উত্তবঙ্গ নদী—তার ঢেউযের ঠিক ঠিকানা নেই। এখনো পৌঁছানো বাকি। থিসিস অ্যাণ্টি-থিসিসেব পব সিন্থেসিস। নিতাই বিষাদ ধূসব মন নিযে কাশী চলে গেল। মথুবা সে গেল না। মাধুর্যলীলাব অবসানে ঐশ্বর্যলীলা তাকে টানে না। কাশী তার ভাল লাগল না। তখনি তাব মনে হযেছে কে ববে এ পববাসে। কিন্তু এমন কবে নয়, তার মত কবে। সে কবি—কম্যুনিকেট করতে না পাবলে সে বাঁচে কি করে। নিবাশ্রয় নিতাইকে আশ্রয দিযেছিলেন যে বাঙালি মহিলা তাঁর স্বদেশ স্মৃতিকথন, দেশোৎসুক্য নিতাইকে ঘবের ঠিকানা ধবিযে দিল। এদিকে বসন ঝাপসা হযে আসছে—জীবন এমনই, এখানে শোকেবও মৃত্যু ঘটে। তবু মনিকর্ণিকার ঘাটে ফেলে দিতে গিয়েও বসনের আংটিটা সে ফেলে দিতে পাবল না। নিজেব কড়ে আঙুলে সে পরে নিল। সে দেশে ফিরে এল। তার নিজজনেব কাছে, দেশেব ধুলোমাটির কাছে।

দে গো মা, দে মা সাড়া
তোব ঘর পালানো ছেলে এল বেড়িয়ে বিদেশ বিভুঁই পা।

তোব সাড়া না পেলে পরে মা কিছুতে যে মন ভবে না,

চোখের পাতায ঘুম ধবে না, বযে যায় মা জলের ধাবা।

দেশেব মাটিব সঙ্গে মানুষেব সঙ্গে যুক্ত হবার এই গান তাব মুক্তিব গান।

॥ চার ॥

গানকে তাবাশঙ্কব তাঁব কাহিনীতে নানা মাত্রায ব্যবহাব করেছেন। সুব ও সংসাবেব বিবোধ বিসম্বাদ তাঁর একাধিক গল্পে ব্যবহৃত যেমন—'হাবানো সুব', 'প্রসাদমালা' 'তৃষ্ণা' এবং আবো গল্প। আলাদা কবে উল্লেখ করতে হয 'তৃষ্ণা' গল্পটি। ক্ষুদিবাম চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ। সংসাব তাব অসচ্ছল। কিন্তু গান তাব প্রাণ। এজন্য মাযেব কাছে, স্ত্রীব কাছে তাকে কথা শুনতে হয। নামেব দল বিপন্ন হয। মা বলে, 'দোকানেব মহাজন এসেছিল বাবা। বলে গিযেছে অক্ষযতৃতীযাব দিন নতুন খাতা। বাকি সমস্ত টাকা মিটিযে না দিলে আব মাল দেবেনা।' স্ত্রী বলে—বলেছে নালিস করবে।' ক্ষুদিরাম কিন্তু তখন ভাবছিল অন্য কথা। দল ভেঙে যাচ্ছে। স্বদেশী গানের নতুন সংকীর্তনের জোযাবে ক্ষুদিবামদেব দল ভেঙে গেল। ভাঙত না যদি জেলেদের দলে নিত। কিন্তু কাযস্থ দে মশাই আপত্তি কবলেন। ক্ষুদিবাম বলল—'নামগানে তো জাতেব ভেদ নেই।' দে মশাই বললেন—'ছোঁযাছুঁযি, বাড়ি গিযে কাপড় ছাড়তে হবে।' বললেন 'সে হয না'। কিন্তু ক্ষুদিরামেব কল্পনায বযেছে ছেলেবা নাচছে দলেব পিছনে, গ্রামেব অস্পৃশ্যবা আসছে আরও একটু পিছনে ঘবেব দুযাবে দুযাবে মেযেবা দাঁড়িযেছে, পিছনে অবগুণ্ঠিতা বধূবা, পুরুষবা দাওযা থেকে পথে নেমে এসেছে, মৃদঙ্গ কবতাল সঙ্গতে সংগীত চলেছে। ক্ষুদিবাম বর্ণীয বাধা অতিক্রম করে জেলেদেব আসরে মূল গায়েনি কবতে চলে গেল। সারাগ্রাম ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরামের এহেন আচরণে ছিছি কবে উঠল। যাদেব ছুঁলে স্নান করতে হয, শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে। কিন্তু তখনকাব মতো সামাজিক বর্ণ-বাধা আব সাংসাবিক প্রতিকূলতার কাছে তাকে পিছু হটতে হল। তাবপব অনেক শান্তি হাবিযে, স্বস্তি হাবিযে, চাকরি ছেড়ে দুঃখ লাঞ্ছনা পাব হযে, মা হাবিযে, স্ত্রী হাবিযে শেষ পর্যন্ত বিপিন জেলেব ছেলেব ডাকে—আসলে গানেব ডাকে সুরের ডাকে, সাড়া দিযে ছেলে-দের দলে মূল গাযেনি কবে অসংকোচে গ্রাম ঘুরে এল ক্ষুদিবাম। সুরেরই ছিল এই বেড়া ভেঙে দেবাব ক্ষমতা। ক্ষুদিরাম বর্ণীয অভিমান মানতে চাযনি। কিন্তু ভাঙতে পাবছিল না। গানেব টান তাকে চালিত কবল ঠিক

সিদ্ধান্তেব দিকে। তাবাশঙ্করেব কাহিনীতে গান সকল ক্ষেত্রে কাঠামোয রঙিন সুতোর জোড় লাগিযেছে। আশ্চর্য সে জোড়। 'ভুবনপুরের হাট' লেখকেব এমন একটি উপন্যাস যা স্বল্প পঠিত, কিন্তু তাৎপর্যগভীর। খোকা ঠাকুব তথা নবু ঠাকুব ওস্তাদেব কাছে শিষ্যোচিত ব্যবহাব পায়নি। এক পথের বাউল তাকে গান শিখিয়েছে। বসন্তে সে অন্ধ হযে মালতীব কাছে এসেছে ঃ

> প্রাণেব বাধাব কোন ঠিকানা কোন ভুবনেব কোন ভবনে !
> বলতে পারে কোন সজনী কোন স্বজনে।
> ওরে
> কোন গেরামে কোন নগবে কোন বিপিনে কোন বিজনে !

মাটিতে জড়ানো মানুষগুলিকে তাবাশঙ্কব চিনেছিলেন—সে মাটি দিযে সেই সব মানুষেব চোখেব জলে ভিজিযে তিনি গড়েছেন তাঁব নীল সরস্বতী। গানগুলি সেই নীল সবস্বতীব দান। ভুবনপুবের হাটেব মালতীর গল্প আলাদা গল্প—তার ভাষাও পৃথক আলোচনাব বিষয। কিন্তু নবীন বাউলেব বা নবু ঠাকুবের গল্প এই গল্পেব সঙ্গে জড়ানো। সোনা আর গেরুযা রঙেব সুতোয জড়ানো। বাজনৈতিক কর্মী বসন্তদা নবুকে ভুবনপুরের হাটে নিযে এল। নিতাই কবিয়ালের মতো সে লুডোব ঘুঁটির মতো সব ঘর ঘুরে এবাব চিকে উঠল। অন্ধ বাউল পাযে ঘুঙুব বেঁধে নতুন বাঁধা গান ধরল ঃ

> ওরে ভুবনপুবের হাটে আমার গান গেযে যাই
> আমার প্রাণের ঝুলি উজাড় করে।
> আমাব দুখের বোঝা নামিযে দিয়ে সুখ নিয়ে যাই—
> প্রাণেব বসে তেষ্টা মেটাই কণ্ঠ ভবে।

ভূবনপুবেব হাট যে কিম্বদন্তীব উপর গড়া তাব সার কথা হল এই হাটে অবিক্রি কিছু থাকবে না। সুখেব দামে দুখ বিকোবে। দুখেব দামে সুখ। 'ভুবনপুরেব হাট' উপন্যাসেব প্রাবম্ভিক এই অংশটি যেন এই কথা বলছে ভুবনপুরেব হাট জীবনেব রূপক। একটা ব্যাপার লক্ষণীয, সুখ দুঃখেব এই প্যাবাডক্স ববীন্দ্রসম্ভব, 'জীবন এত ছোট কেনে' গানেও কি দূব থেকে ছাযা ফেলেনি 'মধুব তোমাব শেষ যে না পাই প্রহর হল শেষ' এই গান? কিন্তু ছায়া এখানে বড কথা নয। বড কথা হল জীবনানুরাগেব সাধর্ম্য। বড কথা হল তারাশঙ্করের দিক থেকে প্রভাবোদ্বেগ anxiety of influence —যা তাবাশঙ্কবের সব গানকে বেদনাব নীলকমলে স্বাতন্ত্র্যে অধিষ্ঠিত করেছে—তাঁব নীল সবস্বতীকে।

———

আত্মসংকট ও নিজস্বভূমি

(প্রসঙ্গঃ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গ্রামের চিঠি')

কার্তিক লাহিড়ী

"কারণ লেখক এক সত্যের কমাণ্ড ছাড়া অন্য কোন কমাণ্ডের অধীন নন। আমিও নই।" তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়

সব মানুষকে বোধহয় কোন একসময়ে জীবনের মৌলিক প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হয়। এ প্রশ্ন রত্নাকরকে ব্রহ্মার জিজ্ঞসার মত ("জিজ্ঞাসেন ব্রহ্মা পাপ কর কার লাগি। / তোমার এ পাতকের কে হইবে ভাগী॥") দ্বিতীয় জনের করা প্রশ্ন নয়, তা বঙ্কিমচন্দ্রর 'ধর্মতত্ত্ব'-র সেই প্রশ্নের মত ('এ জীবন লইয়া কি করিব ? লইয়া কি করিতে হয় ?') তেমন মর্মবিদারী, যার উৎস ব্যক্তির অন্তর্গত গহন নির্জনে কোথাও—একই সঙ্গে অমোঘ ও অস্তিত্ব বিপন্নকারী। ঊনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ বছর বয়সে এসে তারাশংকর এমনই প্রশ্নের সামনে এসে দাঁড়ান। ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে অস্তি নাস্তির টানাপোড়েনে আলোড়িত হতে থাকেন দারুণ ভাবে, ঐ অস্থিরতা ক্রমে প্রসারিত হয়ে এসে দাঁড় করায় এমন এক জায়গায় যেখানে "মনের অবস্থা ঝড়ো হাওয়া ঢোকা ফাটল ধরা বাড়ির মতো। একটা কান্না যেন অহরহ গুমরে গুমরে উঠছে। জীবনে কোন শান্তি নেই, সুখ নেই। ওই প্রশ্ন—কি চাই ? কে আমি ! কেন আমি অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্যটা কি ?" (আমার কথা, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদনাঃ শ্রী সবিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা, ১৪০২, পৃঃ ৩২)। মার্কস্-বাদের অন্য কোন তত্ত্ব বা সূত্রের সঙ্গে তাঁর বিরোধ না থাকলেও 'মার্কসবাদের নাস্তিকতার সূত্রটি আমাকে সূচের মত বিদ্ধ করত।" (ঐ, পৃঃ ৭৭) এর ফলেই হয়ত তিনি অস্তিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েন, আর জীবনকে অস্তি বলে ধরে নিতে গিয়ে তিনি বোঝেন, "বুদ্ধির অতিরিক্ত আরও অনেককিছু আছে। বুদ্ধি সেখানে অন্ধের মত হাতড়ায় সেখানে চৈতন্যই আমাকে চক্ষুর অগোচর, অদৃষ্ট অনেক কিছুর আভাসে দেয়।" (ঐ, পৃঃ ৭৭) মানুষ সৃষ্টি কেমন করে হয়েছে বুদ্ধি বা বিজ্ঞান তা বলে দেয় নির্ভুলভাবে, "কিন্তু মানুষ কেন হল"

—"এই 'কেন' জানতে গেলে খুঁজতে হবে সেই সকল 'কেন'র উৎসকে।" (ঐ, পৃঃ ৭৮)

এই উৎস জানাব জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন তারাশংকব, ব্যাকুলতা তাঁকে এমন বিচলিত ও উদভ্রান্ত কবে দেয় যে তাঁর মানসিক ভারসাম্য সম্পর্কে কাছের মানুষজন সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠেন। আর এ সময় এমন এক ঘটনা ঘটে যা বিপ্লবের মত, "এত কালের আমিব মধ্যে সেই আমি আর রইলাম না। এতকালেব জগৎ সেই জগৎও রইল না। সব বদলে গেল। ★ ★ ★ সংসারেব মধ্যে বাস কবেও আমাব বসত হল একান্তে।" (ঐ, পৃঃ ৮০) কিন্তু তাতেও স্বস্তি আসে না, বেদনা বাড়তে থাকে, তাব ফলে "লিখতে ইচ্ছে হয না। লিখি না। লেখা ছেড়েই দিলাম। বাড়ি থেকে বেব হওয়া বন্ধ কবলাম। বসে বসে ভাবি। আব কাঁদি। একলা কাঁদি। পুজাব সময কাঁদি।' (ঐ, পৃঃ ৮৯) এমন কি বিধানপবিষদের সদস্য পদেও থাকতে চাইছিলেন না, দু দু-বাব ইস্তফা দিতে চেষ্টা কবেন।

তবু এই দীর্ঘ এবং প্রসাবিত দুঃসমযে 'আবোগ্য নিকেতন' লেখা হয, আব মাত্র ছ-মাসেব ব্যবধানে উপন্যাসটি সম্মানিত হয় ববীন্দ্র ও সাহিত্য অকাদেমি পুবস্কারে। তাঁর আত্মিক সংকটেব দুর্যোগ তবু সহজে কাটার নয। 'ধর্মতত্ত্ব'-এব গুবু সাবাজীবন এ জন্য খুঁজে ফিবেছেন, এজন্য বহু শ্রম ও কষ্ট ভোগ কবেন, তার ফলে তিনি এইটুকু শেখেন যে "সকল বৃত্তিব ঈশ্ববানুবর্তিতাই ভক্তি, এবং সেই ভক্তি ব্যতীত মনুষ্যত্ব নাই।" (একাদশ অধ্যায, ঈশ্ববে ভক্তি)। গুবুব সিদ্ধান্ত অনেকেব কাছে অমান্য হতে পারে, কিন্তু প্রশ্নেব উত্তর তিনি নিজেই খুঁজে পেয়েছিলেন, কিন্তু তাবাশংকব নিজেব গহন থেকে সংকটমোচনেব কোন ইঙ্গিত পান নি, পেয়েছিলেন অন্য একজনেব, প্রবোধ বাবুব, কথায, "কথাটা আমার সমস্যার সমাধান কবে দিযেছিল।" (ঐ, পৃঃ ৯১)

এব ফলে "সেবাব কাশী থেকে ফিবে আমার জননীকে গুবু কবে তাঁব কাছেই আমি দীক্ষা নিযেছিলাম। ★★★ এবাব জীবন আমাব একটা সোজা পথ ধবল।" (ঐ পৃঃ ৯১)। তাবাশংকব শুধু সাহিত্যসৃষ্টি কবতে চাননি, "আমি জানতে চেযেছিলাম জন্ম-মৃত্যুব বহস্যকে—বাযোলজি ও মেডিকেল সাযেন্সেব পবও যা আছে তাই, তাকে অনুভব কবতে

চেয়েছিলাম।" (আমার সাহিত্য জীবন, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৪৩)।

কিন্তু লেখা থামিয়ে দিয়ে অজ্ঞাতকে জানার স্পৃহা অদম্য হলেও আবার এক আঘাতে তাকে নতুন পথ ছেড়ে পুরনো পথে ফিরে আসতে হয়—লিখতে শুরু করেন পুরোদমে।

শারীরিক ভাবেও তারাশঙ্কর বিশেষ সতেজ ও সবল ছিলেন না। প্রায়ই তিনি রোগাক্রান্ত হতেন। নিজের দেহের উপর আঘাত এসেছে বারবার, রক্তচাপের অনিয়মিত ওঠা-নামা কাবু করে দিতে থাকে, তবু বাইরের ডাকে সাড়া দিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন কিছু করার টানে, কিন্তু ১৯৬০-এর আগস্ট থেকে তাঁর জীবনে "বাইরের পালা-শেষের পালার শুরু। বহির্মুখী জীবনকে যেন আঘাতে পঙ্গু করে ঘরে ঢুকতে বাধ্য করেছে এক অদৃশ্য শক্তি। সে আঘাত নির্মম ও নিষ্ঠুর।" (আমার কথা, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৮৯)

অন্যদিকে আত্মিক সংকটের জমি তৈরী হতে থাকে আরেক ভাবে, হয়ত পাকাপোক্ত হয় তার ভিত। তারাশঙ্কর লাভপুর ছেড়ে কলকাতা চলে এসেছিলেন প্রধানত দুটি কারণে, "একটি হল আমার আত্মীয়বর্গের মধ্যে অনেকের বিশেষ করে যাঁরা বিত্তবান হিসেবে মর্যাদাবান প্রতাপশালী, তাঁদের অবজ্ঞার আঘাত।" (ঐ, পৃঃ ২০৬)। দ্বিতীয় কারণ ছিল নিজের সাহিত্যিক প্রকাশ ও সম্ভাবনা-র পথ প্রশস্ত ও সুদৃঢ় করা, অথচ সাহিত্য জীবনে সহ-যাত্রীদের সহৃদয়তা পেয়েছেন যৎসামান্যই, "অন্যদিক থেকে আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল, সেটি হল, কিছু লেখক ও সমালোচকের বেশ একটা গোছানো বা সুপরিকল্পিত পদ্ধতিতে আমার বিরূপতা করা বা বিরূপ মন্তব্য করে যাওয়া। এর সঙ্গে একআধজন প্রকাশক যোগ দিয়েছিলেন এইটে আরও দুঃখের কথা। অর্থাৎ সব দিক থেকে একটি অন্ধকার আমাকে কেন্দ্রে রেখে বৃত্তাকারে সঙ্কুচিত হয়ে কেন্দ্রের দিকেই এগিয়ে আসছিল।" (ঐ, পৃঃ ২৩৭)। এই অন্ধকারের অন্ত আছে নিশ্চয়, কিন্তু সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন জগতে সময় থেমে থাকে যেন, অনন্ত মনে হয় এই দুঃসহ চাপ, এর উপর বিয়োগ ব্যথা একজনকে উদ্বিগ্ন দিশেহারা করে দেয়ঃ "১৯৬২ সন আমার জীবনের চরম দুর্ভাগ্যের বৎসর। ★★★ এই বৎসর ফেব্রুয়ারি মাসে প্রথমেই গেলেন আমার সাহিত্য সাধনার জীবনের সর্বোত্তম সহযোগী—আমার উত্তর-সাধক, আমার প্রিয়তম বন্ধু সজনীকান্ত। ★ ★ তারপর অক্টোবরে গেলেন শান্তিশঙ্কর।"

স্পষ্ট বোঝা চলে, এসব ঘটনায় একজন সাধাবণ মানুষও কত বিপন্ন হতে পারেন, আব তাবাশঙ্কবেব মত আত্মসচেতন আবেগপ্রবণ মানুষ যে বিহ্বল হযে পডবেন, তা বলার অপেক্ষা বাখে না। কিন্তু বাস্তব এমনই নিবাসক্ত নৈব্যক্তিক নির্বিকাব এবং আকর্ষক যে তাব টানে এড়িয়ে যাওয়া মানুষেব পক্ষে অসম্ভব, তাই তাব অস্তি-নাস্তিব দ্বন্দ্ব, অসহ, পাবিবেশে পিষ্ট হওযা, বিযোগ ব্যথা ইত্যাদি ভুলতে হয, আব প্রয়োজনই তাঁকে মুখোমুখি এনে দাঁড কবায বাস্তবেব অমোঘতায।

২

"...'আমাব নিযতি এই যে, এই শেষ জীবনে আমাকে বৃদ্ধ জীর্ণপক্ষ পাখীব মতো সকালে আকাশে ডানা মেলে, দূবান্তব হতে খাদ্য আহরণ কবে এনে, ওই কটি অসহায নাতি-নাতনীকে খাওযাতে হবে। আমি তাই খাওযাব।"

"আমি আমায শ্রমশক্তিকে নিযোজিত কবব।" (আমাব কথা, পৃঃ ২২৫)

১৯৬৩-র এপ্রিল মাসে তাবাশঙ্কব 'যুগান্তব' পত্রিকাব সঙ্গে যুক্ত হন। এবং ঐ বছরেব ২৭ জুলাই থেকে ঐ পত্রিকায 'গ্রামের চিঠি' লিখতে থাকেন, প্রতি শনিবাব সম্পাদকীয পৃষ্ঠায (দু-একটি বাদে) তিনি স্বনামে ঐগুলি লিখে চলেন প্রায দু-বছবেব বেশি কিছু সময ধরে। নিযতিব পবিহাস-ই বটে, তারাশঙ্কব গ্রাম ছেড়ে কলকাতায এসেছিলেন ফিবে যাবেন না বলে, অবশ্য ১৯৪০ থেকে ১৯৬০ অব্দি দেশে গেছেন দু-একবাব কিন্তু তাকে ফেবা বলা যায় না, তবে যখনি গেছেন অপাবিমেয ভালোবাসা পেযেছেন গ্রামেব মানুষেব কাছে। তবে কি সেই টানে প্রতি হপ্তায় তিনি গ্রামেব চিঠি লিখতে বাজি হযেছিলেন, যদিও সমস্ত জীবন চাকবি না কবে শেষ জীবনে চাকবি নিযেছিলেন মনেব সব দ্বিধা সংকোচ কুণ্ঠা বিসর্জন দিয়ে বড় মেযের সংসাব —তার তিনটি মেযে ও একটি ছেলেকে মানুষ কবাব জন্য। কিন্তু ঐ লেখা-গুলি কেবল চাকরিব খাতিবে লেখা ছিল না, তাবাশঙ্কর চিঠিগুলো লিখে যেন তাঁব পূর্বঋণ শোধ করছিলেন, তাই ঐ চিঠি গ্রামেব চিঠি হলেও তাতে প্রাধান্য পেয়েছে বীরভূম—জন্মস্থান লাভপুব ও তাব সন্নিহিত অঞ্চল। এই ফেবা কি নিৎসের "চিবন্তন ফেরা" নাকি "আমরা যথা হইতে আসি তথায় ফিরিযা যাই" বা মানুষকে তার উৎসে ফিরতে হয়—ঐ সব তত্ত্ব প্রমাণ করে ?

'গ্রামের চিঠি'-তে অবশ্য এসব কথাব আভাস পর্যন্ত মেলে না।

বরং এই পর্বে তিনি খেটে খাওয়ার ব্যাপারটিকে মোটেই খাটো করে দেখেন নি, কিছুটা অহংকারেই বলেন, "জীবনের শেষ পর্বে এই খেটে খাওয়াটুকুই একমাত্র কথা এবং শেষ কথা।

"এব জন্য দেহে মধ্যে মধ্যে ক্লান্তি বোধ করি, হাঁপিযে উঠি, অবসরহীন বিবামহীন জীবনে নিশ্বাস ফেলতে কষ্ট অনুভব করি ; তবু মনেব মধ্যে এব জন্য আমাব কোন খেদ নেই। না, নেই।" (ঐ, পৃঃ ২২৭)

গ্রামেব হাল হকিকত জানানোব জন্য লেখা হতে থাকে 'গ্রামেব চিঠি'। কিন্তু গ্রামেব কথা জানানো মানে "বজ্রাঘাতে মৃত্যু, সর্পাঘাতে মৃত্যু, অনাহাবে মৃত্যু, অনাবৃষ্টিব সংবাদ, সভাসমিতি" ইত্যাদি বিবরণ দেওযা নয, কাবণ এ থেকে গ্রামেব সঠিক পবিচয পাওযা যায না। আমাদের দেশ গ্রাম-প্রধান, "এক কালে গ্রামই প্রধান ছিল। এখন গ্রামের প্রাধান্য গেলেও গ্রামেই দেশের প্রাণশক্তি নিহিত বহিযাছে।" (গ্রামেব চিঠি, তারাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায, সম্পাদনা ঃ তপোবিজয ঘোষ, কলকাতা, ১৯৮৬, চিঠি ১। পৃঃ ১)। ছকু চাটুজ্জেব জবানীতে লেখক জানাতে থাকেন গ্রামেব কথা—গ্রামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাব কথা ঃ

"গ্রামেব মাঠেই ধান, কলাই, আখ, পাট উৎপাদন হয, দেশ খাইযা বাঁচে এবং উদ্বৃত্ত হইলে তাহাতেই বৈদেশিক মুদ্রা আসে

"অন্য শক্তি জনশক্তি—সে শক্তিব দিকেও গ্রামেই এখনও বাংলা তথা ভাবতবর্ষেব গবিষ্ঠ অংশ বাস কবে।

"এই গ্রামেব মানুষই শহরে যায। মন্ত্রী, বাজকর্মচারী, অধ্যাপক, ইঞ্জিনিযব, সাহিত্যিক—যাঁহাবা শহরেব অলঙ্কাব—অহঙ্কার, তাঁহাদেব ৮০/৮৫ ভাগ গ্রামেব লোক।" (ঐ, পৃঃ ১)

কিন্তু গ্রাম এখন অন্ধকারেই পড়ে আছে। আগেও গ্রাম অন্ধকাবে ডুবে ছিল, তবু তা হতাশাব হা-হুতাশ হযে ওঠে নি, "সেকালে একটা সমাজ ছিল, তাব একটা বাঁধন ছিল, দাযদাযিত্ব ছিল। সেই বাঁধনে দবিদ্র সংসাব গুলি নানান কর্মের সূত্রে বর্ধিষ্ণু পরিবাবের সঙ্গে বাঁধা ছিল। দাযিত্ব এদেব ছিল কর্মের, এদেব ছিল পালনেব।" (ঐ, পৃঃ ২)। সিদ্ধিখোর ছকু চাটুজ্জে স্বীকার কবেন, "সেকালে দরিদ্র ছিল, দাবিদ্র্য বেশী ছিল, কিন্তু সম্পন্ন এবং দবিদ্রেব মধ্যে শোষণ পীড়ন সত্য হইলেও একটা আত্মীযতাব প্রেম

ছিল—★★ কিন্তু এখন দারিদ্র্যের কাঁটা অত্যন্ত তীক্ষ মুখ হইয়া উঠিয়াছে।" (ঐ, পৃঃ ৩)

তবু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের চেহারা পালটে যাচ্ছে, ছকু চাটুজ্জ্যে হিসেব দিচ্ছেন—"বাহিরের লোক আসিয়াছে। বসত এখন বংশ বাড়িয়া অন্ততঃ পাঁচছয় শত ঘর। ইহা ছাড়া সরকারী আপিস কি কম হইয়াছে? ★★ পাকা বাড়ির সংখ্যা এখন শতাধিক। ★★ দুই কুঠুরী মাটির ঘরের ভাড়া এখন পনের টাকা, পাকা হইলে পঁচিশ—তিরিশ।" (গ্রামের চিঠি/২, পৃঃ ৭)। গ্রামে পিচের রাস্তা হয়েছে, পাকা বাড়ির সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে, সরকারী আমলাদের আনাগোনা শুরু হয়েছে, শহরের অনেক হৈ-হুল্লোড ঢুকে পড়ছে যেমন, ফুটবল ম্যাচের হিড়িক, চ্যারিটি শো—এ ছাড়া আরও আরও ঘটনা আর তারই তলে তলে ঘটে যাচ্ছে সর্বনাশ, "বাউড়ীরা বায়েনরা একে একে সরিতেছে। কবে কে ঘর বেচিয়া চলিয়া যাইতেছে কেহ জানিতে পারিতেছে না। উপায় কি? চালের দর ৩৫ টাকা, মাছ মেলে না।★★" (ঐ, পৃঃ ৭)

এদিকে সরকারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের দূরত্ব বাড়ছে, তার কারণ তারা উপরওয়ালা, "দেশের শাসক। মধ্যে মধ্যে ভাবি—আঃ, ইংরেজ কি কলই পাতিয়া গিয়াছে। যে আসে সেই রাবণের মাসতুতো ভাই হইয়া দাঁড়ায়।" (গ্রামের চিঠি / ৪, পৃঃ ১৪) তাই নিম্নবর্গ মানুষদের কথা কেউ ভাবে না, গ্রামের নিম্নবর্গের মানুষের বেশীর ভাগ চাষী, "পল্লীর মধ্যে দুটি বা তিনটি বড়চাষী ছাড়া সব গৃহস্থই অর্থাৎ যারা অল্প জমির উপর কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করে—তাদের সংখ্যাই বেশী। ★★ বাংলার কৃষিজীবীর জমি যে আজ চাকুরে, বণিক এবং বড় চাষীদের গ্রাসে শতকরা ৭৫ ভাগ চলে গেছে, তার সব কারণের মধ্যে এই কারণটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর সুদ শতকরা পঞ্চাশ এবং শর্ত—চক্রবৃদ্ধি। (গ্রামের চিঠি / ৯৫, পৃঃ ২১৯—২২০)। আষাঢ়-শ্রাবন-ভাদ্র—এই মাস তিনটি চাষীর পক্ষে বড় কষ্টের সময়, তখন অন্ন চিন্তা একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়ায়, "মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় যদি দেশের চাষীকে বাঁচাতে চান, যদি দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চান, তবে চাষীকে চাষের সময় অন্তত অন্নের জন্য নিশ্চিন্ত করুন। মহাশয়, আমরা দান চাহি না, ভিক্ষা মাগি না, আমরা যাতে চাষের সময় ধান ঋণ পাই তারজন্য গ্রামে গ্রামে ব্লকের ব্যবস্থাধীনে

সমবায প্রথাব ধর্মগোলা স্থাপন কবুন—ধান্য ব্যাঙ্ক। ব্লাড-ব্যাঙ্কেব মতই-এব প্রযোজন।" (গ্রামের চিঠি/৯৮, পৃঃ ২২৫)

দেশ স্বাধীন হযেছে এবং গণতন্ত্রও সুপ্রতিষ্ঠিত। আগে ছিরু পাল ('গণদেবতা'-ব চবিত্র)-বা মাতব্বব হযে বাযেনদেব ঘব পোড়াত, দাবোগাব সঙ্গে দহবম মহবম কবে যা ইচ্ছে তাই কবত, এখন তাবাই টাকাব জোবে ক্ষমতা দখল কবছে ভোটেব মাধ্যমে, ফলে যা হওযাব তাই ঘটে চলেছে—দুর্নীতি ছেযে ফেলেছে সাবা সমাজ—

১. "ছেলেটা মাস্টাবীব জন্য চেষ্টা কবিতেছে কিন্তু মাস্টাবী পাইতে হইলে নাকি তিনশো টাকা চাই। কি জন্য? জিজ্ঞাসা কবিলে বলে—সকলেই তাই বলিতেছে—তাই শুনিতেছি।" (গ্রামেব চিঠি) / ৭, পৃঃ ২৩)

২. "যে ধবনেব বেনামীব জাল ইহাবা বুনিযাছে—আইনেব গিঁট দিযা যে তাহাতে লক্ষ লক্ষ একব জমি আটকাইয়া থাকিবে। একজন বেণীব পাঁচশো বিঘা জমি—সে নিজেব নামে পঁচাত্তবই বিঘা বাখিযাছে—স্ত্রীব নামে, ছেলেব নামে, পুত্রবধুব নামে, নাতিব নামে—এমনকি অনুগত গোমস্তা কর্মচাবীব নামে ষাট-সত্তব বিঘা কবিযা দলিল কবিযা বাখিযা গোঁফে তা দিতেছে। ." (গ্রা চি / ৮, পৃঃ ২৫)

৩. "শিক্ষকেবা নিযুক্ত হযেছেন—তাঁদেব বেতনেব খাতায লেখা হয এক বেতন—অর্থাৎ গ্রাণ্ট-ইন-এইড—ব লস্-অনুযাযী বেতন—তাঁবা পান অন্য বেতন। নিযম অনুষাযী প্রাপ্য তাঁদেব ১৬০ টাকা হিসাবে—কিন্তু তাঁবা পান ৭০ টাকা হিসাবে। এবং এই ৭০ টাকাও তাঁবা আজ ন'মাস ধবে পান নি।" (গ্রা. চি / ৫৮, পৃঃ ১৩৮)

এ বকম বহু ধবনেব দুর্নীতিব কথা স্পষ্ট ভাষায প্রকাশিত হয 'গ্রামেব চিঠি'-তে। প্রথম প্রথম লেখক সিদ্ধিখোব ছকু চাটুজ্জে-ব বকলমে শুরু কবেন, কিন্তু লেখা যত এগিযে যেতে থাকে এবং যতই তিনি বাস্তবেব মধ্যে ঢুকে পডতে থাকেন ততই দূব থেকে দেখা বাস্তবেব আডাল-আবডাল খুলে পডতে থাকে, তখন তিনি কোন চবিত্রেব মাধ্যম না নিযে সবাসরি লেখা শুরু করেন—

১ "পঞ্চায়েত বাজ হচ্ছে। কিন্তু পঞ্চাযেত কে? ভোটে পঞ্চায়েত

নির্বাচিত হয়। তাতে কি সত্যবাদী নিভীক ন্যায়পরায়ণরা আসে? তাঁরা দাঁড়ায়? দাঁড়ায় না। কুটিল বিত্তশালী, জটিল হিংসাতুর মধ্যবিত্ত, তারা দক্ষিণ-বাম রাজনীতির আদর্শ এবং মহত্ত্বকে ব্যঙ্গ করে, পদদলিত করে, মিথ্যার পথে ভোট সংগ্রহ করে, কর্মী সেজে ধ্বজা নাচিয়ে তাণ্ডব নৃত্য করছে। কে এর উপায় করবে।· ” (গ্রা· চি / ১০, পৃঃ ৩১)

২· “মাঠের ধান মাঠেই রয়েছে—বড় বড় মহাজনেরা এর মধ্যেই তারা বেচাকেনা করে রাখছে। যাকে বলে ফরওয়ার্ড কণ্ট্রাক্ট বা সেল। যার সোজা নাম ফাটকা। ★★ কিন্তু এই ফাটকাবাজির কাছে হার মেনে—পরের দেশের দানে এবং অন্য দেশ থেকে কিনে এমনভাবে চালের বদলে গম বিতরণ করে দেশকে কতদিন ভিক্ষুক করে রাখবেন? সাধারণ মানুষ যদি ভিক্ষুকই হয়ে যায় ★★ তবে এ স্বাধীন জাতটার সংজ্ঞা কি হবে? ব্যবসাতন্ত্রের কাছে সমাজতান্ত্রিক সরকারের এ পরাজয়, না জয়?” (গ্রা· চি / ১১, পৃঃ ৩৩)

৩· “গতবার জোতদার প্রসঙ্গে লিখেছিলাম বটে, এরাই এখন মহাজন এবং মজুতদার হয়েছে এবং এই মহাজনী হয়ে উঠেছে কুমীর বাঘের আক্রমণের মত নিষ্ঠুর ও ভয়ংকর।” (গ্রা· চি / ১৫, পৃঃ ৪৩)

৪· “· এই বীজাণুটিই মারাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। শরৎচন্দ্রের পল্লী-সমাজের বেণী ঘোষাল বীজাণু। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে—জটিল ও কুটিল প্রকৃতিবলে সমাজকে জ্বালাইয়া দেয়, জাল করে, জুয়া-চুরী করে, মামলা করে, ষড়যন্ত্র করে। রমেশ নামক শুভশক্তি যখন সমাজদেহে শক্তির সঞ্চার করে তখন তাহাকে ষড়যন্ত্র করিয়া জেলে পাঠায়। আবার যখন দেশ স্বাধীন হইল, রমেশ যখন মুক্তি পাইল, বেণী ঘোষালই সেদিন জেল গেটে মুক্তপ্রাপ্ত রমেশকে ‘ভাইরে’ বলিয়া জড়াইয়া ধরিয়া আপন সাজিয়া রমারূপিনী দেশকল্যাণের দিকে রমেশকে বিমুখ করিতে চাহিয়াছিল। ·

“স্বাধীনতার পর আজ দেশে ও সমাজে বেণী ঘোষালরা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীদের বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আপনার সাজিয়াছে (·· সকলেই প্রথমে কংগ্রেসী হইতে চায়।

না পারিলে বামপন্থী হয়।...” (গ্রা. চি / ৬, পৃঃ ১৯)

৫. “১৯৫৬ সাল থেকে যে নতুন প্রথার শুরু—১৯৬৫ সাল পর্যন্ত সে প্রথা পরিপূর্ণভাবে চালু হয়ে গেছে। আজ দলীয় স্বার্থকে সু-প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সৎ আদর্শবাদী লোকগুলিকে সুকৌশলে অপসারিত করে সুকৌশলী, চতুর, ধনী-মানুষদের দলভুক্ত করে শক্তি মদমত্ততায় অন্ধ হয়ে উঠেছেন। এই নব-প্রবর্তিত পঞ্চায়েত রাজ্যের যবনিকা অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই সত্যটি নিদারুণভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি—এরা সেই ইংরেজ আমলের পুরাতন অভিনেতার দল। পোষাক পাল্টে মেকআপ বদল করে আবির্ভূত হয়েছেন!

“এ শুধু একটি দল সম্পর্কেই বক্তব্য নয়। এ বক্তব্য আজ ভারতবর্ষের সকল রাজনৈতিক দল সম্পর্কেই।...” (গ্রা' চি / ৯৯, পৃঃ ২২৭)

এখন কোন গ্রামই নির্জন দ্বীপের মত নিঃসঙ্গ, বিচ্ছিন্ন নয়। পৃথিবীর কোণে কোণে যে সব ঘটনা ঘটে চলেছে তা পৌঁছে যাচ্ছে প্রত্যন্ত গ্রামেও। তাই ‘গ্রামের চিঠি’ নিছক গ্রামের কথাই হয়ে ওঠে না, তাতে এসে যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রসঙ্গ, চীন-ভারত বিরোধের কথা, উদ্বাস্তু পুনর্বাসন, হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতের প্রতিরোধ, যুদ্ধ-শান্তি সম্পর্কে সোভিয়েটের ইতিবাচক ভূমিকা, পঞ্চভাষা সূত্র ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ। যেহেতু চিঠির আদলে লেখা হয়, তাই লেখাতে লেখকের ব্যক্তিগত আবেগ অনুভূতি প্রতিক্রিয়া সন্তোষ-অসন্তোষ ঢুকে পড়ে অবলীলায়, আর তাতে লেখাগুলো অন্যমাত্রা পেয়ে যায়। অকপটে লেখেন—

১. “এরপর বিনোবাজীর ভূদান অ্যাইন পাশ হল। এবার বিনোবাজীর জয়জয়কার! দেখবেন—গ্রামদান হু হু শব্দে হতে থাকবে। কেননা গ্রাম দানে মালিকানি নিশ্চিন্ত, শুধু যৌথ পরিচালনা। তাতেই বা ক্ষতি কি। পরিচালক হবেন এই সব ধামাওয়ালারাই!

“আমি নিজে এককালে বিনোবাজীর ভূদানের কল্পনায় আকৃষ্ট হয়েছিলাম। আজ দেখে শুনে সেই মোহ কাটছে।” (গ্রা, চি /৫৯, পৃঃ ১৩১)

হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক ও সমস্যা নিয়ে তারাশঙ্কর যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন, "আজ ষোল বৎসর ধরে পূর্ববঙ্গের হিন্দু সমস্যার সমাধান হল না" জেনে মধ্যে মধ্যে উত্তেজিত ও উত্তপ্ত হয়ে উঠতেন, যার অনেক পরিচয় লেখাগুলিতে পাওয়া যায়। কোন কোন মন্তব্য আমাদের কাছে প্রায় মৌলবাদীর মত মনে হলেও তিনি অকপটে নিজের মতামত জানাতে দ্বিধা করেন নি। উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিষয়ে তিনি যে প্রস্তাব রাখেন তা সবকারের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলেও অভিনব ও প্রণিধানযোগ্য নিশ্চয়ই। তারাশঙ্কর লেখেন, "পূর্ব-পশ্চিমের সংখ্যালঘুদের সমস্যা সমাধান করতে পারত বা পারে—গ্রাম।

"পশ্চিমবঙ্গে গ্রামের সংখ্যা ৩৮,৪৭১ , এছাড়া ৯০টি মিউনিসিপ্যাল শহর এবং ৫৫টি মিউনিসিপ্যালিটি-বিহীন শহর আছে—অর্থাৎ এগুলি ইউনিয়ন-বোর্ড দ্বারা পরিচালিত। এর মধ্যে অন্ততঃ পঁচিশ হাজার গ্রাম বেছে নেওয়া যেতে পারত—যে সব গ্রামে গড়ে দশঘর লোকের পুনর্বাসন হতে পারত। অর্থাৎ আড়াই লক্ষ পরিবারকে বসিয়ে এক কোটি লোকের পুনর্বাসন সম্ভব-পর হত। শহরাঞ্চলে, বিশেষ করে কলকাতা অঞ্চলে, যে ভিড় জমেছে—তার লাঘব হতে পারত।

"কেন্দ্রীয় তথা বাংলাদেশের প্রাদেশিক পুনর্বাসন দপ্তরের দৃষ্টি যখন দণ্ডকারণ্যের দিকে প্রসারিত হল—তখন বাংলার পতিত জমি তাঁদের চোখে পড়েনি। চোখে পড়লে পূর্ববঙ্গের হিন্দুর সমাগম সমস্যা নিয়ে এত জটিলতার সৃষ্টি হত না। ফলে খাদ্য সমস্যাও অপেক্ষাকৃত সবল হয়ে উঠত।" (গ্রাঃ চি / ৩৫, পৃঃ ৮৮—৮৯)।

এ রকম ভাবেই তিনি মনে করতেন "বড় বড় শাহী ব্যবস্থায়" দৃষ্টি না দিয়ে মোট খরচের "কিয়দংশ ব্যয় করে যদি প্রাচীন পুষ্করিণী উদ্ধারের ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করতেন তবে বর্তমান অবস্থা থেকে কৃষিব্যবস্থা আরও অনেক গুণে উন্নত হত।" (গ্রাঃ চি / ৫২, পৃঃ ১২৭)

হিন্দু-মুসলমান, ভারত-পাকিস্তান, উদ্বাস্তু পুনর্বসন এবং অন্যান্য বিষয়ে নিয়ে লেখার সময় তারাশঙ্কর প্রকৃত দোষী বা সমস্যার সমাধানে দীর্ঘসূত্রতার জন্য কে বা কারা দায়ী তা চিহ্নিত করতে চান। এতে কর্মকর্তারা খুবই বিরক্ত হন, বিশেষ করে কংগ্রেসের প্রাদেশিক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। তাঁরা কংগ্রেস হাই-কমান্ডের উপরে চাপ দিতে থাকেন এই সব লেখা বন্ধ করার জন্য। এতে তারাশঙ্কর আদৌ ভয় পান নি, বরং স্পষ্ট ভাষায় বলে ওঠেন,

"আমাব দিক থেকেও সত্যকে প্রকাশ কবতে ভীত আমি কোনদিন হব না। কাবণ লেখক এক সত্যেব কমাণ্ড ছাড়া অন্য কোন কমাণ্ডেব অধীন নন। আমিও নই।" (গ্রাঃ চি / ৩৩, পৃঃ ৮৪)। এই দৃঢ় ঘোষণা লেখকেব অহংকারই বটে, তাবাশঙ্কব যেন নিজেব লেখকসত্তাকে আবিষ্কাব কবলেন গ্রামেব চিঠি লিখতে লিখতে কাউকে তোয়াক্কা বা বেযাদ না কবে—

"আজ সাবা সমাজেই সুবিধাবাদী চতুব অসৎ লোকেব অভ্যুদয হযেছে আগেব কালেব চেযে বেশি।" এতে বঞ্চিত হচ্ছে পল্লীগ্রামেব মানুষ, "সবাব মুখে এক কথা—একি দুর্ভোগ—একি দুর্ভাগ্য। অনেকে বলছে—স্বাধীনতাব একি ভযংকব স্বরূপ।" (গ্রাঃ চি / ১১, পৃঃ ৩২)। লেখকেব বিশ্বাস "এবা তো চিবকাল ভগবানকে ডেকে নিজেব অদৃষ্টকে ধিক্কাব দিযে নিজেব ঘবে বা পথের ধাবে বসে নিষ্ফল কান্না কাঁদবে না অথবা তিলে তিলে খাদ্যাভাবে জীর্ণ হযে শেষ নিশ্বাসেব সঙ্গে অব্যক্ত অভিশাপেব একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টানবে না। ·" (গ্রাঃ চি / ১০০, পৃঃ ২২৯)।

'গ্রামেব চিঠি' তাবাশঙ্কবেব স্বপ্নভঙ্গেব নির্মম কাহিনী যেন, তিনি কি দেখতে চেযেছিলেন আব কি দেখলেন? হতাশ হযেছেন, উত্তেজিত হযেছেন। এই হতাশা উত্তেজনা তাঁব পূর্ব উল্লেখিত আত্মিক সংকটকে তীব্র তীক্ষ্ন কবতে পাবত, কিন্তু আশ্চর্যেব বিষয গ্রামেব চিঠিতে সেই সংকটেব দীর্ঘ ছাযাপাতও ঘটে না। মাত্র দু-একটি জাযগায ঈশ্ববেব কথা এসেছে, কিন্তু তা যেন কথার কথা হিসেবে। তাই 'গ্রামেব চিঠি' পড়ে মনে হতে পাবে ঐ আত্মিক সংকট (অস্তি-নাস্তির দ্বন্দ্ব, পবমেব অনুসন্ধান) ইত্যাদি তাঁব জীবনেব মূল ধারা নয। তাবাশঙ্কর যেন প্রত্যক্ষবাদী ঔপন্যাসিক, 'ধাত্রী দেবতা', 'গণদেবতা', 'কবি', 'হাঁসুলি বাঁকেব উপকথা' ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ বচনায তাঁব ভাবাব জগতেব চাইতে দেখাব জগৎ-ই আধিপত্য কবেছে, সেই দেখার জগৎ-ই হচ্ছে তাবাশঙ্কবেব নিজস্ব ভূমি, সেখান থেকে যখন সবে গেছেন এবং অন্য ভিতেব উপব ইমাবত গড়াব চেষ্টা কবেছেন, তখন তাঁব সৃষ্টি আগের মহিমা থেকে বঞ্চিত হযেছে, 'গ্রামেব চিঠি' আবার তাঁকে স্বভূমিতে ফিরিযে নিয়ে আসে। কিন্তু এই প্রত্যাবর্তনেব পর কেন তিনি অমোঘ উপন্যাস লিখতে পারলেন না আব বুঝে ওঠা মুস্কিল হয আমাদের পক্ষে, তবে 'গ্রামের চিঠি' তারাশঙ্করকে অন্যভাবে দেখাব দিগন্ত খুলে দেয পাঠকেব সামনে।

তারাশঙ্করের শিল্পরীতি ঃ প্রতিমা-প্রতীকের আলোয়

সুতপা ভট্টাচার্য

তাবাশংকবেব হাতে লেখবাব বিষয ছিল অনেক, কিন্তু কীভাবে লিখতে হয জানা ছিল না তাঁব—এবকম অভিমত দিযেছেন বুদ্ধদেব বসুব মতো মান্য সমালোচক। প্রশ্ন করতে ইচ্ছা হয কাকে বলে লিখতে জানা। উত্তর অনেকে অনেকভাবে দিতে পাবেন। একজন ঔপন্যাসিকেব শিল্পবীতিব অনেকগুলি দিক থাকে। সমর্থ প্রতীক আর সার্থক প্রতিমাব ব্যবহার সেই অনেক দিকেব একটি। তারাশংকর লিখতে জানতেন কিনা, তার উত্তর তাঁব প্রতিমা-প্রতীকেব ব্যবহাব থেকে আমবা বুঝে নিতে পারি। তাঁর প্রথম পর্বেব অল্প কযেকটি উপন্যাস নির্বাচন কবে নিযে এ আলোচনা তাবই এক প্রাথমিক প্রযাস।

'গণদেবতা' তাঁব অন্যতম প্রধান উপন্যাস। সেখানে বিশেষত গ্রামীণ সমাজেব বিশ্লেষক তাবাশংকব, সে সমাজেব ক্ষমতাচাপেব বিবিধ স্তর তিনি খুলে ধরেছেন এ উপন্যাসে। ক্ষমতালোভ মানুষকে মানুষ রাখে না—পশু কবে তোলে, এ উপন্যাসের প্রতি-নায়ক চূড়ান্ত ক্ষমতালোভী ছিরু বা শ্রীহরি তাই বারবার বর্ণিত হয জন্তু-প্রতিমায। দৃষ্টিবিন্দু কোথাও কোথাও কথকেব নিজেব, কোথাও বা অন্য চরিত্রেব, কোথাও আবাব ছিবু নিজেই নিজেকে দেখছে জন্তুবুপে। কথকেব দৃষ্টিবিন্দু লেখকেব সমস্যাপট ধবিযে দেয, ধবিযে দেয় ক্ষমতাব জান্তব দিক ঃ অন্যেব জিনিষ যখন চুরি কবে, তখন 'ছিবু ছুটিযা চলে অন্ধকাববারী হিংস্র চিতাবাঘেব মত', আর যখন ছিবুব আক্রোশ হয, তখন 'সে' 'নির্মম আক্রোশে গর্তের ভিতরকাব আহত অজগবেব মত মনে মনে পাক খাইযা' ঘুরতে থাকে। অন্য চবিত্রের দৃষ্টি-বিন্দুতে ধবা পড়ে ক্ষমতাব আগ্রাসনেব দিক, পেষিতর চোখে পেষক ভয়াল জন্তুব থেকে আবো ভযানক, অনিরুদ্ধব স্বগতোক্তিতে তাই থাকে ঃ 'সাপ কি কি অপব জানোযাবকে সে ভয করে না! ভয তাহার মানুষকে। ছিবুকে আগে গ্রাহ্য করিত না, কিন্তু শ্রীহবি এখন আসল কাল-কেউটে।' কাল-কেউটেব প্রতিমায় অনিরুদ্ধব বউ পদ্মও দেখে শ্রীহরিকে, বলে 'স্বপ্ন দেখলাম

—মস্ত বড একটা কাল-কেউটে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।' আর দুর্গা, উপন্যাসের আরেকটি প্রধান নারী চরিত্র, সে বগি-দা তৈরি করায় শ্রীহরির রাগ থেকে আত্মরক্ষা করতে চেয়ে, বলে—'ক্ষ্যাপা কুকুরে বিশ্বাস নাই'।

পদ্মর মনে শ্রীহরি বিষয়ে আতঙ্ক আছে, তাই সর্প-প্রতিমা। কিন্তু দুর্গা শ্রীহরিকে ভয় করে না, তার মনে আছে চূড়ান্ত ঘৃণা। শ্রীহরি তার এক-সময়ের অনুগ্রহভাজন, পদ্মর মতন সে গৃহবধূ নয়, সে স্বৈরিণী, তার ভয় নেই, আছে অবিশ্বাস, তাই ক্ষ্যাপা কুকুরের উপমান। প্রতিমা-নির্বাচন এখানে সম্পর্কের নিহিতার্থও ব্যক্ত করছে।

শ্রীহরি নিজে নিজেকে জন্তুরূপে দেখছে কখন? লালসা যখন উদ্দাম, সেই মুহূর্তে, সেই মুহূর্তে নিজেকে জন্তু ভাবতে শ্রীহরির অসুবিধে নেই, বরং আছে পৌরুষের আত্মপ্রসাদ: 'হ্যাঁ, আর এক উপায় আছে। অনিরুদ্ধর অনুপস্থিতিতে পাঁচিল ডিঙ্গাইয়া পদ্ম কামারণীকে বাঘের মত মুখে করিয়া ·'। পদ্মের প্রতি তার আসক্তি মুক্তপরোক্ষ রীতিতে কথক বর্ণনা করছেন: 'ওই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটির প্রতি তাহার আসক্তি প্রচন্ড—কামনা প্রগাঢ, যে আসক্তি ও যে কামনাতে মানুষ মানুষকে, পুরুষে নারীকে একান্তভাবে একক ও নিতান্ত-ভাবে নিজস্ব করিয়া পাইতে চায় এক জনশূন্যলোকে—সে তাহাকে চায় চোরের সম্পদের মত, অন্ধকার গুহায় নিস্তব্ধতম আবেষ্টনীর মধ্যে সর্পের সর্পিনীর মত—শতপাকের নাগপাশের বন্ধনের মধ্যে।'—কথকের এ বর্ণনায় শ্রীহরির যৌনকামনা আর পেষকের দম্ভ একাকার হয়ে মিশে রয়েছে। ক্ষমতা আর যৌনবিকার—মনুষ্যত্বের অবমাননার এই দুই দিক যে হাত-ধরাধরি করে চলে, প্রতিমা-প্রয়োগের মাধ্যমেই তা যেন বোঝাতে চেয়েছেন লেখক।

সমাজে ক্ষমতাচাপের একটি অর্থনৈতিক দিক আছে, আরেকটি আছে পিতৃতন্ত্রের দিক। ছিরুর অর্থনৈতিক ক্ষমতা-লোলুপতা তো 'গণদেবতা'র মূল সমস্যাপটেরই অঙ্গ, আবার সেইসঙ্গে পিতৃতন্ত্রের ক্ষমতা ফলাতেও ছিরু রীতিমত দুর্ধর্ষ, কিন্তু উপন্যাসে সেদিক তার স্ত্রীর পরিচয়ের মধ্যে বলা আছে মাত্র, সেরকম বিশদভাবে দেখানো নেই। অর্থনৈতিক ক্ষমতাশূন্যতার মধ্যে দিয়েই বোধহয় পিতৃতন্ত্রের প্রতাপ দেখাতে চেয়েছেন লেখক, তাই বেছে নিয়েছেন পাতুর মতো চরিত্র। পাতু—নিম্নবর্ণের নিঃস্ব এক মানুষ, ছিরুর ক্ষমতাদম্ভের এক বলি, ছিরু যাকে নিষ্ঠুরভাবে মারে, যার ঘর জ্বালিয়ে দেয়, যার কষ্ট করে সংগৃহীত তালপাতা কেড়ে নেয়। সেই দরিদ্র অত্যাচারিত

পাতুই তার স্ত্রীর কাছে এলে হয়ে ওঠে বাঘের মতো, আর তার স্ত্রী বন-বিড়ালীর মতো—একই গোত্রের দুই জন্তু—ক্ষমতায় শুধু আকাশ-পাতাল তফাৎ। পাতু তাই 'বাঘের মতো লাফ দিয়া বউকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বুকে বসিয়া' গলা টিপে ধরতে পারে। এমন কি নিজের মায়ের দিকেও পাতু 'ক্রুদ্ধ বাঘের মতো চাহিয়া' থাকতে পারে।

পাতুর স্ত্রীকে কথক যতবার দেখিয়েছেন, ততবারই এনেছেন বিড়ালীর প্রতিমা—এই প্রতিমা-প্রয়োগের মধ্যে দিয়েই মেয়েটির চরিত্রায়ণ সম্পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। তেমনি দুর্গার চরিত্রও প্রকাশ পেয়েছে সর্প-প্রতিমায়, নারীত্বেরও শক্তি কম নয়, সেই শক্তি প্রকাশ পেয়েছে দুর্গার মধ্যে, স্বৈরিণীর মধ্যে সাপের খলতাও তো আছে। তাই শ্রীহরির মতো দুর্দান্ত পুরুষও ভয় পায় দুর্গাকে, তার মনে হয়, 'শুইবার ঘরে সে সাপ লইয়া বাস করিতেছে। সাপ নয় সাপিনী। সে দুর্গা।' শুধু শ্রীহরি নয়, কথক নিজেও দুর্গাকে সর্প-প্রতিমায় বর্ণনা করেন : 'বউয়ের কথা শুনিয়া দুর্গা 'দংশনোদ্যত সাপিনীর মতই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছিল'। একই সর্প-প্রতিমার বিভিন্ন প্রয়োগ ঘটছে শ্রীহরির চরিত্র বোঝাতে, আর দুর্গার চরিত্র বোঝাতেও—একই প্রতিমার ভিন্ন ভিন্ন দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগে। পাকে পাকে জড়িয়ে ধরায় পরিচয় আছে সাপের শক্তির, দংশনে হিংস্রতার, আবার 'দংশনোদ্যত সাপিনীর মতই ঘুরিয়া' দাঁড়ানোর মধ্যে শুধুই সাপের ক্ষিপ্রতার দৃশ্যমান ছবিটুকু ফুটে উঠছে। দৃশ্যমান ছবিটুকুই, তবু যে প্রতিমা দ্যোতনা দেয় হিংস্রতার, খলতার, যৌনতার, কোনো চরিত্র কথকের দৃষ্টিবিন্দুতে সেই প্রতিমায় বর্ণিত হলে মূল্যবোধের প্রশ্নও ওঠে। শিল্পী তারাশঙ্কর দুর্গাকে একটি অসাধারণ নারী হিসেবেই উপস্থাপন করেছেন, অথচ সেই সঙ্গে সামাজিক তারাশঙ্করের কোনো মূল্যবোধ হয়তো প্রবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে দুর্গা-প্রসঙ্গে প্রতিমা নির্বাচনের ক্ষেত্রে।

তাঁর নিজস্ব মূল্যবোধ থেকে নিজস্ব মূল্যায়নের আরো একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যতীনের স্বগতোক্তি থেকে, যতীনের উক্তি হয়েও যা বস্তুত কথকেরই উক্তি। পুকুরের পাঁক থেকে পাওয়া সূর্যমূর্তি বিষয়ে যতীন মনে মনে বলে : 'সূর্যমূর্তির মুখের সঙ্গে ন্যায়রত্নের মুখের মিল আছে। পল্লীর উপরের পঙ্কাবরণ উন্মোচন করিলে তাহাকে পাইবে।' গ্রামসমাজের ভাঙনের ছবি

আঁকতে বসে তাবাশঙ্কব প্রতিমা-প্রযোগেব মাধ্যমেই ইঙ্গিত দিতে চেযেছেন—এমন কিছু আছে, থাকে, সব ভাঙনের মধ্যে যা ভাঙে না। তাই জন্তু-প্রতিমাব বিপরীতে 'গণদেবতা'য় থাকে পুবাণ প্রতিমা। 'সবুজ সতেজ ধানের চাবা' চাপ বেঁধে সবুজ গালচেব মতো জেগে আছে—এটুকু তো নিছক দৃশ্য-গত অলংকবণ, কিন্তু কথক যে সেখানে দেখেন, 'যেন অদৃশ্য লক্ষ্মী-দেবতা আকাশলোক হইতে নামিযা কোমল চবণপাতে পৃথিবীব বুকে আসন পাতিয়া বসিতেছেন'—তাব মধ্যে পুবো উপন্যাসে পৌষলক্ষ্মীব ব্রত, লক্ষ্মী পুজাব আযোজন, ন্যাযবত্নব মুখেব লক্ষ্মী-অলক্ষ্মীব আখ্যান সব কিছু মিলে মিশে এক চিবন্তনতা প্রতিষ্ঠা পেযে যায় ন্যাযবত্নব শালগ্রামেব আখ্যান থেকে। শালগ্রামও এ উপন্যাসেব এক পুরাণ-প্রতীক হযে ওঠে, দেবুব শূন্যতাবোধের হাহাকাব বেজে ওঠে মুক্তপবোক্ষে উচ্চাবিত প্রশ্নে—'কই, তাব সে শালগ্রাম কই?' বামাযণ মহাভাবতের গল্পকথায, পুজা-পার্বণে, ব্রত-পারণে গ্রামীণ জীবনচর্যা যা সব ভাঙনেব মধ্যে আজও অটুট, তাকেও রূপ দিতে চেযেছেন লেখক এ উপন্যাসে। আশ্চর্য নয শ্রীহবিব মতো প্রতিনাযক চবিত্রেব ভাবনাতে আসে মহাভাবতের পুবাণ-প্রতিমা, সাধেব বাগানেব গাছগুলি কাটা পড়লে শ্রীহবি ভাবে: 'পঞ্চপাণ্ডবেব প্রতি আক্রোশে অশ্বত্থামা যেমন নিষ্ঠুব আক্রোশে অন্ধকাবেব আবরণে পাণ্ডব শিশুগুলিকে হত্যা করিযাছিল—তেমনি আক্রোশে কাপুরুষ শত্রু গাছগুলিকে নষ্ট করিযাছে।'

পুবাণ-প্রতিমাব প্রয়োগে চরিত্র যেন আযতন পায়; আব চবিত্র তাব নিজস্ব ভূমি পায় তাব দৈনন্দিন যাপন থেকে যখন সংগৃহীত হয় প্রতিমা। অনিবুদ্ধব কাজ কামাবশালায আগুন আর লোহা নিযে, তাই উত্তপ্ত পদ্মর চোখ দেখে তার মনে হয, 'দুই টুকবো লোহা যেন কামারশালাব জ্বলন্ত অঙ্গাবেব মধ্যে আগুনের চেযেও দীপ্তিময এবং উত্তপ্ত হইযা গলিবাব উপক্রম কবিতেছে।'—এখানে বর্ণনীয বিষয় শুধু নয, যে দেখছে তাব চরিত্রটিও দৃঢ়তা পাচ্ছে একই সঙ্গে। কখনো বা দেখছেন কথক নিজেই, বোঝা যায তিনি চবিত্রগুলির থেকে দূবে দাঁড়িযে নেই, বয়েছেন তাদেব ঘবকন্নাব মধ্যেই, সেখান থেকেই তাঁব দৃষ্টিবিন্দু উপমা সংগ্রহ করছে: 'দুর্বল পাণ্ডুব মুখেব মধ্যে পদ্মেব ডাগব চোখ দুইটা অনিবুদ্ধেব শখের শাণিত বগি-দা-খানায আঁকা পিতলেব চোখ দুইটাব মতোই ঝকঝক কবে।'

এই অনিবুদ্ধ কিংবা পাতু, পদ্ম কিংবা দুর্গা—এইসব অত্যাচারিত

মানুষের দুঃখ-দুর্দশা একদিকে, আরেক দিকে অত্যাচারী শ্রীহরি—এদের মাঝখানে দেবু ঘোষের আদর্শ পালন—এই সব নিয়ে গড়ে-ওঠা যে আখ্যান, কোনো মহৎ উপন্যাস তারই মধ্যে সীমায়িত হতে পারে না। আখ্যানের ভিতর দিয়ে ঔপন্যাসিক চান কোনো সমস্যাপিট খুলে ধরতে, চান মানুষের বেঁচে-থাকা তার সমাজ বিষয়ে কোনো প্রকল্প পেশ করতে। আর সেখানেও তাঁকে খুঁজে নিতে হয় যথাযথ প্রতিমা অথবা প্রতীক। এই সূত্রে মনে পড়ে এক সমাজতাত্ত্বিক ভাবুকের উক্তি ঃ

'I think it was Aristotle who said that the greatest gift of the writer was the power to make metaphors and in my sense every metaphor is a significant hypothesis or making relations.★ আশ্চর্য নয় তাই, গণদেবতার ভাববস্তুতে লেখকের যে 'significant hypothesis' রয়েছে তাও ধরা পড়ছে প্রতিমা-প্রয়োগের মাধ্যমেই। পুরানো ব্যবস্থার ভেঙে পড়া আর নতুনের উত্থান—এই যদি হয় এ উপন্যাসে লেখকের hypothesis, তবে তার সারাৎসার ধরা আছে পুরোনো বাড়ি আর বীজ বা বৃক্ষের ছবিতে, যা শুধু প্রতিমা নয়, প্রতীক হয়ে উঠছে যেন। পুরোনো বাড়ির ছবি এসেছে এভাবে ঃ

১. 'শ্রীহরি যেন. তাহার এতকালের বন্ধ-অন্ধকার দুর্গন্ধময় জীবন-সৌধের প্রতিটি কক্ষে—দেহের প্রতিটি গ্রন্থিতে—প্রতিটি সন্ধিতে এক বিচিত্র স্পন্দন অনুভব করিতেছে।'

২. ন্যায়রত্নের স্বগতোক্তি—'প্রকাণ্ড সৌধ, বটবৃক্ষ জন্মে ফেটে চৌচির হয়ে গেছে।'

★ দ্রঃ Richard Hoggart, 'The Literary Imagination and the Sociological Imagination', **Speaking to Each Other,** Voll. II London 1970, p, 266

(উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে ঃ প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, সমাজের মাত্রা এবং তারাশঙ্করের উপন্যাস ঃ চৈতালীঘূর্ণি', এক্ষণ, শারদীয় ১৩৮২, পৃঃ ৭৬)।

৩· চৌধুরীর স্বগতোক্তি ঃ 'তাহারই পুরানো পাকা বাড়িটার মত সব যেন ভাঙিয়া পড়িবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছে। ঝুরঝুর করিয়া অহরহ যেমন বাড়িটার চুনবালি ঝরিয়া পড়িতেছে—তেমনিভাবেই সেকালের সব ঝরিয়া পড়িতেছে।' এই শেষ দৃষ্টান্তটি অবশ্য 'পঞ্চগ্রাম' থেকে, 'গণদেবতার'ই পরের পর্ব যে উপন্যাস। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে যে বটবৃক্ষের কথা আসছে, সৌধের ধ্বংসের কারণ যে, সেই বটবৃক্ষের বীজ শ্রীহরির মনেই উপ্ত হচ্ছে ঃ 'আজিকার এই ক্ষুদ্র ঘটনাটি যেন বটবৃক্ষের অতিক্ষুদ্র একটি বীজ কণার সঙ্গে তুলনীয়। কিন্তু সেই এককণার মধ্যেই লুকাইয়া আছে এক বিরাট মহীরুহ।' গ্রামের সকলের সম্পত্তি যে চণ্ডীমণ্ডপ, শ্রীহরি তা গ্রাস ক'রে নিজের ব্যক্তিগত সম্পত্তি করে তোলে—এই তো পুরানো ব্যবস্থার চূড়ান্ত বিপর্যয়। শুধু জমিদারী প্রথা নয়, জোতদার-মহাজনের লোভ স্ফীত হয়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কীভাবে স্বৈরাচার আনে—শ্রীহরি তো তারই দৃষ্টান্ত। কিন্তু বটবৃক্ষ যদি প্রাচীন সৌধ ধ্বংস করেই দেয়, সেখানে কি গড়ে উঠতে পারে না আরেক নবীন সমাজ, সুন্দর সমাজ, যার স্বপ্ন দেখে দেবু? তাই দেবুর ভাবনায় কথক আনেন শালগাছের প্রতিমা—যা মাত্র একবারই ব্যবহৃত, তবু যেন প্রতীকের মহিমা পেয়ে যায় ঃ 'অরণ্যানীর শিশু শাল যেমন বন্য লতার দুর্ভেদ্য জাল ভেদ করিয়া সকলের উপরে মাথা তুলিতে চায় তেমনি উদ্ধত বিক্রমে সে এতদিন গ্রামের সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে। তবে সে একা অখণ্ড আলোক ভোগের জন্যেই উর্ধ্বলোকে উঠিতে চায় না, নিচের লতাগুলি তাহাকেই অবলম্বন করিয়া তাহারই সঙ্গে আলোক-রাজ্যের অভিযানে চলুক এই তাহার আকাঙ্ক্ষা'। —এ ছবি তো নিছক কাব্যিকতা নয়, গণদেবতা পঞ্চগ্রাম জুড়ে দেবুর কার্যাবলির নিহিতার্থ তো এর মধ্যে দিয়েই প্রকাশিত। তাই দেখি, 'গণদেবতা' উপন্যাসে দেবুর ব্যক্তিগত জীবনের শূন্যতাবোধের হাহাকারের উচ্চারণেই শেষ হয়ে যায় না, বরং শেষ হয় সমাজ-জীবনের কোনো অগ্রগতির সম্ভাবনা-স্বপ্নে, যেখানে দেবুও শামিল। সেও তো এক প্রতীকী সমাপ্তি ঃ 'ঠাকুর বোধহয় রথে চড়িলেন। রথ হয়তো চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাঁধের পথ ধরিয়া সে [দেবু] দ্রুত পদে অগ্রসর হইল।'

॥ ২ ॥

এ হলো তাবাশঙ্করের নিজস্ব 'সমাপ্তি পদ্ধতি', কেননা তিনি 'বিদ্রোহের' ছিলেন না, কেননা 'শূন্যবাদেব মধ্যে জীবনকে শেষ কবার কল্পনা'য় তাঁব "মনের পরিতৃপ্তি কোনদিন হয নি' ('আমাব সাহিত্য জীবন')। কিন্তু শেষেব পব যখন আবার শুরু হয ? 'গণদেবতা'ব পরের খণ্ড 'পঞ্চগ্রাম' তো স্বপ্নেব নয, সংগ্রামেরই কাহিনী। 'গণদেবতা'য় চবিত্রায়ণ যতটা গুরুত্ব পায়, "পঞ্চগ্রাম'-এ ততটা নয, নতুন চবিত্র কমই এসেছে এ উপন্যাসে, আব পুবোনো চরিত্র বিষযে জন্তু-প্রতিমার প্রযোগ 'গণদেবতা'কেই অনুসবণ কবে। 'পঞ্চগ্রাম'-এ গুরুত্ব পেযেছে সময়, সেই সমযকে প্রকাশ করেছে পটভূমি। পটভূমি, পটভূমিব অন্ধকার এ উপন্যাসে প্রতীক হযে উঠছে। অন্ধকারের কত যে ছবি কত যে বর্ণনা আমবা পাই এখানে! কখনো দেখি; 'বর্ষার আকাশে ঘনঘোর মেঘেব ঘটা' কখনো বা পাই 'দুর্যোগময়ী বজনী'ব কথা, যে বজনী 'নিশাচব-দেব মতই উল্লাসমযী হইয়া উঠিযাছে'। কখনো আবাব পাই অন্ধকাবের ফলিযে তোলা বর্ণনা: 'গাঢ অন্ধকাব বাত্রিব আবরণে ঢাকা পৃথিবী, জ্যোতির্লোক বিলুপ্ত, একটা প্রগাঢ পুঞ্জীভূত অন্ধকার ভিন্ন অন্য সবকিছুব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইযা গিযাছে।' কখনো অন্ধকাব নিহিত থাকে তিথিব উল্লেখে: 'ভাদ্রমাসেব কৃষ্ণপক্ষেব বাত্রি। মাঝে মাঝে মেঘ আসে।' কৃষ্ণপক্ষ কিংবা অন্ধকাব পক্ষের কথাই এ উপন্যাসে ঘুরে ঘুবে উল্লেখ কবা হয, শুক্ল পক্ষ যদি বা আসে, তাহলেও জানা যায বর্ষা নেমেছে সেবাব শুক্লপক্ষেই, তাই শুক্ল দশমীতে 'আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। দুই-চাবি ফোঁটা বৃষ্টিও হইতেছে।'

এ উপন্যাসেব চবিত্রগুলিও প্রায়ই স্থাপিত হয অন্ধকাবেব বাতাববণে। কখনো দেখা যায 'অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইযা দেবু।' বাম বা তাবিণীব মতো অপ্রধান চবিত্রদের দেখা যায 'অন্ধকাবের মধ্যেই সমজদাবের মতো জোবে জোবে ঘাড' নাডতে। কখনো দেখি ন্যাযরত্নকে, "অন্ধকাব দিগন্তেব দিকে চাহিযা ওই কথাই ভাবিতেছিলেন আর বিদ্যুৎ-চমকেব আভাস দেখিতে-ছিলেন।" আবাব বর্ষা নিশীথিনীতে একাকিনী পদ্মব মনের কথা শুনি: "অন্ধকাবেব রাত্রে ঘবেব মধ্যে অন্ধকাব স্পর্শসহ, গাঢতর হইযা উঠে। পদ্ম অন্ধকাব মধ্যে চোখ মেলিযা জাগিযা থাকে। উঃ—কি অন্ধকাব'—এই শেষ উচ্চারণে কথকের কণ্ঠস্বর হযে ওঠে চরিত্রের কণ্ঠস্বর, মুক্তপবোক্ষ রীতিব

একটি অসাধারণ নিদর্শন পদ্মের এই অন্তরুক্তি। এ অন্ধকার যে প্রতীক, উপন্যাসের এক জায়গায় কথক তা স্পষ্ট করেই বলেছেন: 'দেবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে—ভাগ্যবানের চোখের সম্মুখে বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠে—বর্ষার দিগন্তের বিদ্যুৎ; আলোর আভাস আসে, গর্জনের শব্দ আসিয়া পৌঁছায় না—ভাগ্যবান অন্ধকারের মধ্যেও নিশ্চিন্তে পথ দেখিয়ে চলে! কিন্তু ভাগ্যহীনের হাতের আলো নিভিয়া যায়, তাহার ভাগ্যফলে দিগন্তের বিদ্যুতাভাব পরিবর্তে আসে ঝোড়ো হাওয়া, দেবু যে আনন্দের প্রদীপখানি মনে মনে জ্বালিয়া ছিল—সে আলো তিনকড়িদের দুশ্চিন্তার দীর্ঘ নিশ্বাস এবং আর্তনাদের ঝোড়ো হাওয়ায় নিমিষে নিভিয়া গেল।'

কিন্তু এই সর্বগ্রাসী অন্ধকার কখনো তারাশঙ্করের উপন্যাসের শেষ কথা হতে পারে না। তিমির-বিলাসী নন তিনি, তিমির-বিনাশীই হতে চেয়েছেন বরং। সামূহিক এই অন্ধকারের বৈপরীত্যে আশ্চর্য একটি শুভ্রতার প্রতীক স্থাপন করেছেন তিনি—সে শুভ্রতা শিউলিফুলের। 'গণদেবতা' প্রথম সংস্করণে শিউলিফুল-প্রসঙ্গ ছিল না। দ্বিতীয় সংস্করণে যুক্ত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে 'পঞ্চগ্রাম' প্রকাশের অল্প আগে। মনে হয় 'পঞ্চগ্রাম'-এ শিউলির প্রতীকার্থ বিষয়ে সচেতন থেকেই তার ভূমিকা সংযোজন করেছেন তিনি 'গণদেবতা'তে—বিলুর মৃত্যুর পর দেবু শিউলি গাছটার দিকে তাকিয়ে বিলুর কথা ভাবে, তার মনে পড়ে তাদের 'নতুন দাম্পত্য জীবনের কত লীলার স্মৃতি ওই গাছটার সঙ্গে জড়িত।' 'গণদেবতা'-তে শিউলিফুলের উল্লেখ ওই একবারই, কিন্তু 'পঞ্চগ্রাম'-এ এ উল্লেখ ঘুরে ঘুরে এসেছে। সংঘর্ষময় দেবুর বহির্জগত, তার বৈপরীত্যে রয়েছে আবেগমথিত বেদনাবিধুর দেবুর অন্তর্জগৎ। বিলুর অনুপস্থিতি দেবুকে বারবার মনে পড়িয়ে দেয় শিউলিগাছটি—গাছটির ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্না পড়লে দেবুর মনে হয় বিলুই যেন দাঁড়িয়ে আছে। কখনো দেবুর চোখে পড়ে শিউলিতলার রৌদ্র-ম্লান ঝরা ফুল, সে পায় তার অতি সকরুণ মৃদু গন্ধ, বিলুর চিতায় সে সাজিয়ে দেয় সেই ফুল। কখনো বা সদ্য-ফোটা শিউলি-সুবাস তার মনের অবসন্নতা কাটিয়ে দেয়, তবে মনে হয় 'ঐ গন্ধটির মধ্যে যেন কি একটা আছে। অন্তত তাহার কাছে আছে।' একদিন সেই গন্ধ অনুসরণ করেই এসে দাঁড়িয়েছিল

দেবু সেই শিউলি গাছতলায়, 'সদ্য-ফোটা শিউলি গন্ধের মধ্যে' বিভোর হয়ে সেই বিভোরতার মধ্যেই স্বর্ণকে দেখে সে—যে স্বর্ণ দেবুর যথার্থ সঙ্গিনী! শুধু স্বর্ণ নয়, বিলুর মৃত্যুর পর আরো দুজন নারীকে শিউলি গাছতলায় দেখে দেবু বিলু বলে ভুল করেছিল। দেবুর জীবনে নারী-অনুভব শিউলি-ফুলের অনুষঙ্গেই ধরতে চেয়েছেন লেখক। এমনকি, পদ্ম গ্রাম থেকে চলে যাবার অনেকদিন পরে দেবু স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে নতুনভাবে নতুনসাজে যখন পদ্মকে দেখে, তখনও পটভূমিতে শিউলিফুল রাখতে হয় লেখককে: 'প্ল্যাট-ফর্মের রেলিংয়ের ওপাশে স্টেশনের কর্মচারীদের কোয়াটার্স-শ্রেণীর পাশে একটি শিউলি গাছ। তলায় অজস্র ফুল পড়িয়া আছে, সকলের বাতাসের মধ্যেও তাহার সমস্ত শরীর যেন কেমন করিয়া উঠিল—চোখের দৃষ্টি হইয়া উঠিল স্বপ্নাতুর।'

শিউলির শুভ্রতা, কোমলতা, স্বপ্নময়তা 'পঞ্চগ্রাম'-এ বিশেষ ভাবে এসেছে সাতাশ আর আঠাশ—এই শেষ দুটি অধ্যায়ে। এই শেষ অধ্যায় দুটিতে পটভূমিতে পরিবর্তন এসেছে, তারই সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে নিরাশার পরিবর্তে আশার স্বর। ছাব্বিশ অধ্যায়ের শেষ থেকেই শোনা যায় সেই স্বর: 'যে পঞ্চগ্রামের মানুষের ধ্বংস নিশ্চিন্ত ভাবিয়া সে চলিয়া গিয়াছিল—তাহারা আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়া বসিয়াছে, কণ্ঠে স্বর জাগিয়াছে, চোখে দীপ্তি ফুটিয়াছে, বুকে একটা নূতন আশা জাগিয়াছে।' সাতাশ অধ্যায় শুরু হয় এর তিনবছর পর। খুব সচেতনভাবে লেখক পটভূমিতে রাখেন শরৎকাল, দেবু যখন জংশনে নামে, তখন থাকে 'শরতের শুভ্র দীপ্ত রৌদ্র', 'সাদা হালকা মেঘ', আর 'ময়ূরাক্ষীর কিনারা ধরিয়া বকের সারি দেবলোকের শুভ্র পুষ্প-মাল্যের মত' ভেসে চলে। আবার রাত্রিবেলা, দেবু যখন একা, তখন 'শরতের গাঢ় নীল আকাশে পূর্বদিক হইতে আলোর আভা পড়ে।' কৃষ্ণপক্ষের উল্লেখ থাকে, কিন্তু অন্ধকার নয়, থাকে সপ্তমীর চাঁদের কথা, জ্যোৎস্নার কথা, সেই জ্যোৎস্নার আলোতে, শিউলির গন্ধে তার দেখা হয় স্বর্ণর সঙ্গে, স্বর্ণর বর্ণনাতেও থাকে শরৎ; 'শরতের ভরা ময়ূরাক্ষীর মত স্বর্ণ'; দেবু তার মুখ-খানি তুলে ধরে 'আকাশের শুভ্র জ্যোৎস্নার দিকে।' লেখকের তিমির-বিনাশী মন, তাঁর 'সমাপ্তি-পদ্ধতি', সমাপ্ত মুহূর্তের পটভূমিতে শুভ্রতাকে প্রাধান্য দেয়: 'জ্যোৎস্নালোকিত শরতের আকাশে শুভ্র ছায়াপথ আকাশবাহিনী নদীর মত একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত; শুভ্র ফেনার রাশির মত

ও-গুলি নীহারিকা পুঞ্জ।' আশ্চর্য নয়, 'পঞ্চগ্রামের মানুষ সর্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছে'—এইটেই এ উপন্যাসের শেষ কথা নয়, শেষ সেইখানে, যেখানে দেবু বলে—'কত কাজ! কত কাজ! কত কাজ!!' অন্ধকার আর আলোর বুনট তো সেই কাজের মধ্যেই তাৎপর্য পায়।

॥ ৩ ॥

পঞ্চগ্রামে এই বিপরীতের স্থাপনা দ্বান্দ্বিক। কিন্তু তারাশঙ্করের শিল্পী-মানসে সবসময়ই যে দ্বান্দ্বিকতা প্রাধান্য পায় এমন নয়। দুই বিপরীত টান আছে, অথচ কোনো দ্বান্দ্বিকতা নেই এমন দৃষ্টান্ত একাধিক দেওয়া যায়। 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে আকাশ, আকাশভরা তারা, ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষি, বৃশ্চিক, শুকতারা, ছায়াপথ—এসবই কখনো প্রতীকী পটভূমি, কখনো বা সব কিছু মিলিয়ে এক ঊর্ধ্বলোকের বাতাবরণ। এরমধ্যে বিশেষ করে ছায়াপথের ছবিগুলি উল্লেখ করতে চাই: ১. 'পৃথিবীর ধূলায় অঙ্গ ভরিয়া গেলে আকাশগঙ্গার বর্ষণে সে ধূলো ধুইয়া যাওয়ার চেয়ে কাম্য বোধ হয় আর কিছু নাই। ধরিত্রীর বুকে প্রবাহিতা গঙ্গার জলেও মাটির স্পর্শ আছে, কিন্তু আকাশলোকের মন্দাকিনীর বারিধারায় স্পর্শাপাদটুকুও নাই।' ২. শেষ ভাদ্রের কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার রাত্রি। প্রায় পূর্ণচন্দ্রের পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় শরতের নির্মল নীল আকাশ নীল মর্মরের মত ঝলমলই করিতেছে। মধ্যে শুভ্র ছায়াপথ একখানি সুদীর্ঘ উত্তরীয়ের মতো এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।' ৩. 'তাহার ওই মায়ের জীবনধারার মধ্যে শারদাকাশের ছায়াপথের মত একটি সাধনার স্রোতের আভাস যেন সে অনুভব করিতেছে।' তৃতীয় এই উদ্ধৃতিতে প্রতীকটিকে যেন প্রতিমায় খুলে দেওয়া হলো: শিবনাথের জীবনে আদর্শবাদের প্রেরণা এসেছে তার মায়ের কাছ থেকে—বোঝা গেল সেই প্রেরণাই আকাশ-নক্ষত্র-ছায়াপথের পৌনঃপুনিকতায় ব্যঞ্জিত হচ্ছে। আকাশলোকের বিপরীতে এ উপন্যাসে রাখা আছে মর্তলোক—মাটির পৃথিবী—ধরিত্রী দেবতা: 'উঃ তৃষ্ণার্ত মাটি হাহাকার করিতেছে। মাটি কথা কহিতেছে! মাটি-মা-দেশ-জন্মভূমি কথা কহিতেছেন। সে যেন সত্যই প্রত্যক্ষ করিল মৃত্তিকার আবরণের তলে জাগ্রত ধরিত্রী দেবতাকে।' মাটিকে ভালোবাসে বলেই মাটি নিয়ে কাজ করতে চায় শিবনাথ: 'সেখানে থাকিবে

শুধু সে আর মাটি', মাটিকে ভালোবেসে 'শিবনাথ ঘাসের উপব শুইয়া ধরিত্রীব কোলে দেহ এলাইযা' দেয়। মাটিব ভিতর যে মাকে প্রত্যক্ষ দেখতে চেযেছে শিবনাথ, উপন্যাসেব শেষে জানা গেল সেই মা তাব পিসিমা, যাকে সে বলে—'সেই বাস্তুর মূর্তিমতী দেবতা তুমি। গৌরীর যখন পরিবর্তন হয, তখন তো সে মাটিকেই চিনতে শেখে—'সে মাটি ধুলা নয়, কাদা নয় · যে মাটিব বুকে ফসল ফলিয়া উঠে, যে মাটিব বুকে মানুষ ঘর গড়িযা তুলিয়াছে এ মাটি সেই মাটি।' মাটিকে চিনতে শেখে বলেই গৌরী পিসিমার সঙ্গে মিলতে পাবে।

এই মাটি আব আকাশ, পিসিমা আব মা—শিবনাথের মধ্যে এদের নিযে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, বরং সে দেখে এ দুয়েব এক সমন্বিত রূপ ঃ 'কঠিন মাটিব তলদেশ হইতে মাটি ফাটাইযা যেমন বীজ অংকুবিত হয, তেমনই ভাবে মনুষ্যত্ব যুগে যুগে উর্ধলোকে চলিযাছে· ।' কিংবা 'আবাব বারান্দায বাহিব হইযা আসিযা সে দাঁড়াইল। পৃথিবীর বুকজোড়া নিবন্ধ্র অন্ধকাবের মধ্যে বহু বহু উর্ধলোকে নক্ষত্রখচিত আকাশ। মাটির বুকে অসংখ্য কোটি কীট পতঙ্গের সম্মিলিত সঙ্গীতধ্বনি।'

'ধাত্রীদেবতায যেমন মা আব পিসিমাব দুই বিপরীতমুখী টান নিযে শিবনাথেব মনে কোনো দ্বন্দ্ব নেই, 'কবি' উপন্যাসেও তেমনি ঠাকুরঝি আব বসনকে নিযে নিতাই-এব মনে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। দুটি বঙের প্রতীকতায এই দুই নাবীব বৈপবীত্য ফোটানো হযেছে—ঠাকুবঝি মানেই কাশফুলেব সাদা আব বসন হলো শিমুল ফুলেব লাল। লক্ষ কবাব বিষয, এমন নয যে ঠাকুবঝি সাদা বঙেব শাড়ি পবে, সে কী রঙেব শাড়ি পবে, তা কোথাও উল্লেখ কবা হযনি। অর্থাৎ এখানে কাশফুলেব প্রতিমা সাদৃশ্য বোঝায না, সনাক্ত কবে। বসনেব মৃত্যুব পব নিতাই যখন কাশী যায, তখন গঙ্গাকে দেখে এভাবে—'বাঁকা চাঁদেব ফালির মত গঙ্গাব শাদা জল ঝকঝক করিতেছে।' গঙ্গাব জল কাশীতে শাদা বলে আব কাবো চোখ দেখে কিনা জানি না, তাই মনে হয নিতাই-এব মনে ঠাকুবঝিব চোবা স্মৃতিই যেন গঙ্গাব জলকে শাদা করে তুলেছে, ঠাকুবঝিব প্রেবণায চাঁদকে নিযে গান বেঁধে ছিল একদিন নিতাই—'ও চাঁদ তোমাব লাগি না হয আমি হব বৈরাগি পথ চলব বাত্রি জাগি সাধবে না কেউ আব তো বাদ'—তারই লুকানো টানেই কি নিতাই-এর মনে এলো বাঁকা চাঁদেব উপমা ?

—অন্যদিকে লাস্যময়ী বসনের চরিত্র শিমুলের লাল রঙেই তো ঠিকঠিক প্রকাশ পেতে পারে। 'কবি'তে অবশ্য এই শাদা আর লাল ছাড়া আরো একটি রঙের কথা আছে—হলুদ রঙ। হলুদ রঙ কি জীবনের, নাকি মৃত্যুর? মৃত্যুর হিম স্পর্শ যখন চৈতন্যলোকে প্রবেশ করে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে অবশ করে দেয়, তখন আকাশে জ্যোতির্লোক হয় পাণ্ডুর'—বসনের মৃত্যু যখন নিতাই-এর অভিজ্ঞতা, তখন তো সে এই পাণ্ডুর বর্ণ দেখেছিল, সেও তো হলুদই। আবার নিতাই হলুদ রংকে জীবনের রঙ বলেও চেনে, 'চোখের সম্মুখে হেমন্তের মাঠে প্রান্তরে ফসলে ঘাসে পীতাভ রঙ ধরিয়াছে, তাহার প্রতিচ্ছটায় রৌদ্রেও পীতবর্ণের আমেজ। আকাশ হইতে মাটি পর্যন্ত পীতাভ রৌদ্রে ঝলমল করিতেছে।' সূর্যের আলোই শুধু তার চোখে হলুদ নয়, চাঁদের আলোও হলুদ: 'পূর্বদিগন্তে তখন শুক্লপক্ষের চতুর্দশীর চাঁদ উঠিতেছিল। আকাশে পাতলা মেঘের আভাস রহিয়াছে, কুয়াশার মত পাতলা মেঘের আবরণ। তাহার আড়ালে চাঁদের রঙ ঠিক গুঁড়া হলুদের মত হইয়া উঠিয়াছে। নতুন বরের মত চাঁদ যেন গায়ে হলুদ মাখিয়া বিবাহ-বাসরে চলিয়াছে।' নিতাই-এর ভালোবাসার আর্তিই তো গায়ে-হলুদের রং হয়ে ঝরে পড়ে চাঁদের আলোয়, ঝরে পড়ে ঝলমলে রোদে। এই একটিমাত্র হলুদরঙে জীবন প্রেম আর মৃত্যু যেন জড়াজড়ি করে থাকে। 'জীবন এত ছোট কেনে?'—অমোঘ এই জিজ্ঞাসায় ট্র্যাজিক বোধের যে অপার বিস্তার তারও মধ্যে যেমন থেকে যায় ঐ তিনই। 'সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে / ধূসর মৃত্যুর মুখ'—জীবনানন্দের এ পংক্তিতে রাঙা-ধূসর এর প্রবল বৈপরীত্য যে ভাবে ব্যক্ত হয় তারাশঙ্করের তেমন কোনো দ্বান্দ্বিকতা নেই। কেননা তিনি যে জানেন, আরোগ্যনিকেতনে যেমন বলেছেন—'অহরহই সে সঙ্গে রয়েছে, কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো, শ্রমের সঙ্গে বিশ্রামের মতো, শব্দের সঙ্গে স্তব্ধতার মতো, সঙ্গীতের সঙ্গে সমাপ্তির মতো, গতির সঙ্গে পতনের মতো, চেতনার সঙ্গে নিদ্রার মতো।' জীবন-মৃত্যু এরকমই অঙ্গাঙ্গী তারাশঙ্করের চোখে।

॥ ৪ ॥

প্রতিমার বদলে পটভূমিকেই প্রতীকী করে তোলা তারাশঙ্করের যে এক বিশেষ শিল্প-কৌশল তা আগেই দেখেছি আমরা। এ কৌশল 'পঞ্চগ্রামে'

প্রকট, তার চেয়ে বেশি প্রকট 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'য়। এ উপন্যাসে ঘুরে ঘুরে আসে হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের তলায় পৃথিবীর আদিম কালের অন্ধকারের উচ্চারণ। এ অন্ধকার পটভূমিগত, আবার তা নয়ও, কেননা সে যে 'সুযোগ পেলেই দ্রুতগতিতে ধেয়ে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার বাঁশবন থেকে বসতির মধ্যে', কেননা তা ভিতরে বাইরে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে—বাঁশবনের গোড়ায় আদিমকাল থেকে ঝরে পড়া পচা বাঁশপাতার নীচে...কাহার পাড়ার আটপৌরে পাড়ার ঘরের কোণ কোণাচে থেকে মানুষগুলির মনের কোণে পর্যন্ত· ।' বোঝা যায় অন্ধকারের সে আদিমতা শুধু কালগত নয়, প্রকৃতিগত। উপন্যাসের কোন এক বিশেষ মুহূর্তে 'প্রদীপটা নিবে যেতেই যে অন্ধকার ছুটে' আসে, 'যেন কোপাইয়ের বুক থেকে হড়পা বানের মত', কখনও আবার সে অন্ধকার 'অপদেবতার ছোঁয়াচ লাগা থমথমে ভরসনজের মুখ-আঁধারি।' একই সঙ্গে এ অন্ধকার আবার যুগ যুগ ধরে বঞ্চিত শোষিত কাহারদের জীবন পরিস্থিতিগত অন্ধকারও: 'আলোর প্রাচুর্য কাহারদের চিরকালই কম। অন্ধকারে জন্মায়, অন্ধকারে থাকে, অন্ধকারেই মরণ হয়। কাহাররা কি এ অন্ধকার থেকে মুক্তি চায় না? চায়, কাহারেরা সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকে 'আম-কাঁঠালের গাছ কবে বড় হয়ে ছাড়িয়ে উঠবে বাঁশবনের অন্ধকার।' করালীর মতো চরিত্র কি নয়, সেরকম এক আম-কাঁঠাল গাছ? কিন্তু অন্ধকারের পিছুটান এত প্রবল যে তেমন চরিত্রকে মানতে পারে না কাহার-পাড়া। বাঁশবনের অন্ধকার থেকে মুক্তি অবশ্য হয় তাদের একদিন হয় যুদ্ধের হিড়িকে—ঠক ঠক ঠক শব্দে সব বাঁশ কাটা হয়ে যায়, বাঁশবনের বাধা না থাকায় কোপাই-এর প্রবল বানের উচ্ছ্বাসে ধুয়ে-মুছে যায় কাহারপাড়া।

কোপাই-এর বান এ উপন্যাসে আবার প্রতিমা হিসেবেও আসে। আঞ্চলিকতার শিল্পীর প্রতিমা নির্বাচনও আঞ্চলিকতা-ধর্মকে পুষ্টি দেয়। 'পঞ্চগ্রাম-এ আছে ময়ুরাক্ষীর চারপাশের অঞ্চল, তাই যুবতী স্বর্ণকে মনে হয় যেন 'শরতের ভরা-ময়ুরাক্ষী'।' আবার হাঁসুলী বাঁক যেহেতু কোপাই-এর তীরে, তাই কালো বউ-এর চোখ যেন 'কোপাই নদীর দহ', কিংবা কাহারদের মাথার মধ্যে নেশার স্রোত ছোটে যেন 'কোপাইয়ের হড়পা বান'।

॥ ৫ ॥

আবার প্রতিমা-প্রতীকের মধ্য দিয়েই কীভাবে ঔপন্যাসিক ছোটো স্থান-

পরিসবকে অতিক্রম করে যেতে পাবেন, তার দৃষ্টান্তও তো তারাশঙ্কবেব বচনায না-থাকা নয। 'পাষাণপুবী' তাঁব একেবারে প্রথম যুগেব উপন্যাস, আঞ্চলিক সাহিত্য না হলেও এটি কারা-সাহিত্য, কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলেব থেকে অনেক ছোটো এব মানচিত্র, তাবাশঙ্করের সাহিত্য-আলোচনায এ উপন্যাসটিব তেমন কোনো নাম শোনা যায় না। না শোনারই কথা, ছোটো একটি কাবাগাবেব মধ্যে কযেকজন মানুষের কযেকদিনের কাহিনী নিযে এই উপন্যাস, জীবনেব বিচিত্র বৈভব এখানে অনেকাংশে অনুপস্থিত। কিন্তু যদি এই কাবাগাব একটি প্রতীক হযে ওঠে, যদি লেখক এই অনুভব সঞ্চার কবে দিতে পাবেন—আমবা প্রতিটি মানুষই আছি এক কারাগাবেব মধ্যে শিকলেব চাপ বযেছে আমাদেব অস্তিত্বের গহনে? তবে কি উপন্যাসটিব ক্ষুদ্র পবিসবই অনন্তে ব্যাপ্ত হযে যায না? তারাশঙ্কব স্পষ্ট ভাষায এই ভাববস্তু প্রকাশ কব্বছেনঃ 'প্রতি মানবমনে যে বিদ্রোহী বাস কবে, সে বুঝি জাগিবাব অবকাশ পায না। একখানা শিকলে যেন সব গাঁথা আর সে শিকলখানা অতি দ্রুত আবর্তনে আবর্তিত হইতেছে…সাবিবন্দী উঠা, সাবিবন্দী বসা, সাবিবন্দী চলা, সাবিবন্দী খাওয়া।' এই সাবিবন্দী চলা-ফেবা থেকেই চলে এসেছে 'সাবিবন্দী পিপীলিকা'ব প্রতিমা। পিঁপড়ের প্রতিমাব এই ব্যবহাব থেকে আমাব কেন জানিনা মনে পড়ে কাফকাব 'মেটামবফোসিস' নামে গল্পটিব কথা, সে গল্পে যদিও পিঁপড়ে নেই, আছে এক কিম্ভূত পোকা। গতানুগতিক দিন যাপনেব শিকলে বন্দী আমাদেব অস্তিত্ব তো ওইবকম এক পোকা কিংবা পিঁপড়েব মতোই! উপন্যাসে আবো দুবাব এসেছে পিঁপড়েব প্রসঙ্গ, এসেছে বর্ণিত একটি ঘটনা হিসেবেই, যে ঘটনাব প্রতীকতা স্পষ্ট। একবাব নবু দেখতে পেযেছে 'পিপীলিকাব একটা সাবি, তাহাবই অভুক্ত আহার্যেব কযটা কণা মেঝেব উপব পড়িযাছিল, তাই লইযা ত্যহাবা মহাব্যস্ত। আবাব ওই আহার্যেব কণা লইযাই তাহাদেব মধ্যে খণ্ড-যুদ্ধ বাধিযা যাইতেছে। সাবিটা চলিয়া গিয়াছে ওই দেওয়ালেব মাথা পর্যন্ত। সেখানে আবাব আবেক কৌতুক। একটা টিকটিকি ছাদ মধ্যে মধ্যে লাফ দিযা আসিযা উহাদেব ধবিযা ধবিযা খাইতেছে।' মাছি, মশা, ব্যাঙেব ছবিতে জীবনানন্দ ব্যক্ত কবেছেন চৈতন্যহীন টিকে-থাকা, তাবাশঙ্কবেব এই সাবিবন্দী পিঁপড়েব ছবিতে রযেছে তাব আবো মাত্রা—অর্থহীন নিযমনিগড, তুচ্ছ নিযে অর্থহীন কাড়াকাড়ি তাবপব ক্ষমতাশালীব নিষ্পেষণে মৃত্যু—দুঃসহ এই অর্থহীন অস্তিত্বেব ভার!

তৃতীয়বার পিঁপড়ের উল্লেখ আসে চাটুজ্জেব দৃষ্টিবিন্দুতে ঃ 'সহসা পাযেব তলায দৃষ্টি পড়িতে দেখিল, একটি পিপীলিকার সারি ; বর্ষার আগমনে উচ্চ বাসস্থান অভিমুখে ডিম মুখে সারি সাবি বাঁধিয়া চলিয়াছে। তাহার সহসা কোন খেয়াল হইল কে জানে—পা দিযা বেশ ধীরভাবে একটির পব একটিব পর একটিকে দলিয়া দলিযা মাবিতে লাগিল।' মাঝে মধ্যে অস্তিত্বের ভাব কোনো সত্তার কতদুব দুর্বহ মনে হতে পারে—এমন প্রতীকী ঘটনা ছাড়া তা কি আব কোনো ভাষা-কৌশলে এভাবে ব্যক্ত হতে পারতো ?

'পাষাণপুবী'তে পিঁপড়েব প্রতীক টুকবো এপিসোডেব মধ্যে একটা ঐক্য-বিধানও কবছে। উপন্যাসে প্রতীক ব্যবহাবেব এই শিল্পগত প্রয়োজনও থাকে অনেক সময। 'আগুন' উপন্যাসে সেই প্রযোজন-সাধনে প্রতীকের ব্যবহাব খুব বেশি প্রত্যক্ষ। পত্রিকায় প্রকাশেব সময উপন্যাসটির নাম ছিল 'কালপুবুষ'। 'কালপুবুষ'ও প্রতীক, কিন্তু সে প্রতীক উপন্যাসেব একটি-মাত্র চবিত্রেব চবিত্রায়ণ কবে, অন্য চরিত্রগুলিব প্রত্যেকেব নিজের নিজের পৃথক পৃথক গল্প পৃথক হয়েই থেকে যায। খুব সংগত ভাবেই এ উপন্যাসটির নাম বদলে 'আগুন' বেখেছেন লেখক। এ আগুন তুলনীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সেই পতঙ্গেব বহ্নিব সঙ্গে—এক-এক পতঙ্গেব এক-এক বহ্নিব কথা যে ভাবে ব্যক্ত কবেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো তারাশঙ্কর সরাসবি রূপ-বহ্নি ধন-বহ্নির মতো রূপক বাবহাব করেন নি, তিনি দেখিযেছেন আগুনের বস্তুগত রূপ। হিবু তার জমিদারীতে বহ্ন্যুৎসব কবে। সে বন্ধুকে দেখায ফুল-খেলা নামেব এক অনুষ্ঠান, যে অনুষ্ঠানে ফুল খেলার ফুল হলো—বহ্নি-পুষ্প, বহ্নি-পুষ্পেব অঞ্জলি দেওযা হয দেবতাকে, তীর ছুঁড়ে। বহ্ন্যুৎসবেব আগুন আকাশ থেকে নেমে এসে সাঁওতাল পল্লী পুডিযে দেয—হিরুব তাতেও আনন্দ ! চন্দ্রনাথেব ঐশ্বর্য ক্ষমতাব চূডান্ত যে চন্দ্রপুরা ফাযাব ওযার্কস, তাব 'আকাশেব বুকে অন্ধকাব চিবিয়া চিমনিব মুখে আগুনেব শিখা নাচিতেছে, যেন সাবিসাবি কম্পমান ধূমকেতু ! আর চন্দ্রনাথেব দাদা—তিনি পঞ্চতপা করেন—সমস্তদিন পাঁচদিকে পাঁচটা হোমকুণ্ড জেবলে তাব মধ্যে বসে জপতপ।'

আগুনের দহনগুণ ছাড়া আরো একটি মাত্রাব প্রতীকতা আছে এ উপন্যাসে, সে হলো আগুনেব সোনা রঙ। সেই সোনা রঙ থেকে এসেছে 'সোনাব-হরিণ'-এব মীথজ প্রতীক ঃ 'সোনার হবিণ ! সোনাব হবিণের পিছনে

পিছনে যে নিজে উন্মাদের মতো ছুটিয়াছে, সেও বলে সোনার হরিণের পিছনে ছুটিও না।' শুধু জীবই নয়, বর্ণিত ঘটনাতেও সেই সোনা রঙের প্রতীকী তাৎপর্য দিতে চেয়েছেন লেখক। উপন্যাসের কথক একদিন দেখছে—গঙ্গার জলে স্বর্ণসন্ধ্যার আভা দেখে সেই সোনাকে ধরতে চাইল একটি চার বছরের মেয়ে, কিন্তু আঁজলায় যতবার সে জল তোলে নদী থেকে, দেখে যে তাতে কোনো সোনা রং নেই। 'জলের সোনা কোথায় গেল বাবা?' চার বছরের মেয়েটির এই প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত থেকে যায় উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্রের পৃথক পৃথক ট্রাজেডির একটিই মর্মকথা।

যে কথাশিল্পী প্রতিমা-প্রতীকের ব্যবহার নিছক আলংকারিকভাবে করেন না, করেন বিবিধ শিল্প-কৌশলগত প্রয়োজনে—কখনো চরিত্রায়ণের স্বার্থে, কখনো ভাববস্তুকে ফুটিয়ে তুলতে, কখনো সমাজ বা চরিত্রের মূল্যায়ণ করতে চেয়ে, মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে, কখনো বা টুকরো টুকরো এপিসোডের মধ্যে সংহতি সাধনের তাগিদে, তাঁর বিষয়ে কি বলা যায়, কীভাবে লিখতে হয়, জানা নেই তার?

দর্পণে আত্ম-প্রতিবিম্ব ঃ তারাশঙ্করের চেতনাবিশ্ব

তপোধীর ভট্টাচার্য

লেখক ও পাঠকের গভীর দ্বিবাচনিক সম্পর্কের কথা আমরা জানি। পাঠকের দর্পণে প্রতিফলিত হয় লেখক-সত্তার অনেক জটিল টানা-পোড়েন, বহস্যময় গোপন অলিন্দ। পাঠক লক্ষ কবেন কিভাবে লেখকেব কথন বিশেব সোচ্চার ও নিরুচ্চার স্বর অন্তর্বয়ন তৈরি কবে। ফলে প্রতীয়মান বাচন থেকে বাববার আলাদা হযে যায প্রকৃত বাচনের নিবিড় আদল। চিহ্নায়ক ও চিহ্নায়িতের মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় অনতিক্রম্য ব্যবধান। এই জন্যে পাঠক জানেন, পাঠ-পবম্পরা অব্যাহত বাখাই তাঁর স্বাধীন অবস্থানেব প্রাক্‌শর্ত ও অভিজ্ঞান। কিন্তু লেখক স্বযং যখন পাঠক অর্থাৎ তাঁর লিখন-প্রণালীব ভাষ্যকাব—সে সময় প্রাগুক্ত প্রক্রিযাও নতুন দ্যোতনা বয়ে আনে। লেখক যখন নিজেব সম্পর্কে প্রতিবেদন তৈবি কবেন, পাঠককে নিযে যান তাঁর লেখার নেপথ্যে—তখন তাঁর কথনবিশ্ব কি খণ্ডিত হযে পড়ে ? অন্য ভাবে বলা যায, লেখকের ঐ আত্ম-উন্মোচন কি যথার্থ ? অর্থাৎ উন্মোচনেব ছলে তিনি কি আসলে নিজেকে আবো খানিকটা অনন্য কবে তুলছেন নাকি সুকৌশলে তাঁব পাঠককে ভুল গন্তব্যে সঞ্চালিত কবে দিচ্ছেন ?

আরো প্রশ্ন আছে। এই সঞ্চালন তো জ্ঞাতসারে না হলেও অজ্ঞাতসারে হযে যেতে পারে ! লেখক নিজেকে যেভাবে জানেন, তাকে বিশ্বস্তভাবে অনুসবণ কবতে গেলে পাঠকের স্বাধীনতা কি খর্ব হবে না ? কেননা নিজেকে জানা তো সংবেদনশীল লেখকের পক্ষেও সহজ নয় খুব। আমাদের আত্মতাকে ঘিরে থাকে দৃশ্য ও অদৃশ্য যত অপরতার বলয়, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎকালে প্রলম্বিত সেইসব বলযেব তাৎপর্য সম্পর্কে অবহিত যদি না হই, আত্মতার নামে পৌঁছে যাব নিষ্কর্ষশূন্য ভ্রান্ত আত্মতার উপলব্ধিতে। এছাড়া রয়েছে ভুল সামাজিকতার প্রশ্ন, বয়েছে খণ্ডিত ও গণ্ডীবদ্ধ সামাজিক চেতনার প্রসঙ্গও। আমবা জেনেছি, সত্তা মূলত দ্বিবাচনিক। সমান্তরাল অপরতার নিরন্তর উপস্থিতির বোধ চেতনাকে যে-পরিমানে শাণিত করে, আমরা সেই পরিমাণে তাৎপর্য অর্জন করি। এইজন্যে আত্মস্মৃতি নিছক নিজের অতীত-রোমন্থন মাত্র নয়, হওয়া আর হয়ে ওঠার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার

প্রতিবেদন। লেখক জানেন, তাঁর নিজস্ব সময বা নিজস্ব পরিসর বলে কিছু নেই, যতটুকু যা আছে তা আসলে সামাজিক সময় ও সামাজিক পবিসর মাত্র। আত্মস্মৃতিতে এই জানা যদি উপযুক্ত গুরুত্বেব সঙ্গে প্রতিফলিত হয়, তাহলে তা সার্থক। নইলে, বলা বাহুল্য, নয। অতীত ও বর্তমানের দ্বিবাচনিকতায, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সত্যের দ্বিরালাপে প্রতিষ্ঠিত হলো কিনা লেখকেব চেতনাবিশ্ব—এটাই লক্ষণীয।

তাবাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়েব জন্মশতবর্ষে যখন নৈর্ব্যক্তিক নিবিড পাঠের আযোজন চলেছে দেশজুড়ে, সে সময তাঁবই স্বনির্মিত দর্পণে প্রতিফলিত আত্মপ্রতিবিম্বেব বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে জবুরি। আত্মস্মৃতিমূলক চাবটে বই তিনি লিখেছেন। এদের সবগুলি তাঁব জীবৎকালে প্রকাশিত হযে বেশ জনপ্রিযতা পেযেছিল। এগুলি হলো ঃ আমাব কালেব কথা, কৈশোব-স্মৃতি, আমার সাহিত্যজীবন (দু'খন্ড) এবং আমার কথা। এছাড়া আবো কিছু আত্মস্মৃতিমূলক বচনাও তিনি লিখেছিলেন। নিজের প্রথম জীবনেব সানুপুঙ্খ বিবরণ যেমন দিযেছেন, তেমনি লেখকজীবনের উপলব্ধিব গতিব কথাও বিস্তাবিত জানিয়েছেন। অসামান্য গল্প বলিযে ছিলেন তাবাশংকব, আত্মকথাতেও তাই উপন্যাসেব স্বাদুতা পাই। কিন্তু এই স্বাদুতাকে যদি বেশি গুবুত্ব দিই, তাহলে আমাদের পাঠ লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। লেখকেব অন্দবমহল দেখতে দেখতে ভুলে যাব আসলে কি পাওযাব জন্যে আমবা তাঁর আত্মস্মৃতিব মুখোমুখি হযেছি! সাধাবণভাবে ভাবতীয উপমহাদেশে এবং বিশেষভাবে বাঙালিব ভাববিশ্বে যখন সন্ধিক্ষণের ধূসব ছাযা ঘনাযমান, কালেব নির্মম নিরাসক্ত প্রযাণপথ ঠিক কিভাবে উদ্ভাসিত হয়েছিল তাবাশংকরের কাছে—এই আমাদেব প্রধান জিজ্ঞাসা। উপন্যাসেব অণুবিশ্বে, দ্রষ্টাব কৃৎকৌশলে যেভাবে সময প্রতিভাত হচ্ছিল—লেখকেব আত্মস্মৃতিতে তাব কোনো সমর্থন পাই কি? যদি পাই তাহলে তা কতখানি স্পষ্ট। আমবা তো জানি সার্থক উপন্যাসে সময যুগপৎ অন্তর্বৃত ও বহির্বৃত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্পন্দন নিয়ে আঙ্গিকে অন্তর্বস্তুতে উপস্থিত থাকে সমযেরই নির্যাস। তারাশংকব তাঁর প্রতিটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসে মূলত সমযেবই বিচিত্র আযতন আর ক্রিয়াব বযান তৈবি কবেছেন। লক্ষ কবেছেন, কিভাবে পৌব সমাজে স্থিতি ও গতিব দ্বন্দ্ব ক্রমশ যাবতীয পূর্বাগত আকবণকে ধ্বস্ত কবে দিচ্ছে, কিভাবেই বা আধি-পত্যবাদী বর্গ নতুন নতুন কৌশল প্রযোগ কবে প্রতাপেব চক্রব্যূহ অটুট

রাখতে চাইছে। প্রশ্ন এই, এহেন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ পরিসরে তাঁর নিজের অবস্থান সম্পর্কে আত্মকথাগুলি কী জানাচ্ছে আমাদের !

'কালের পদধ্বনি শোনবার, সেই ধ্বনিতরঙ্গ অনুভব করবার শক্তি বোধহয় জীবজগতের জন্মগত।'—'রাধা' উপন্যাসে মাধবানন্দের এই বাচনে প্রকৃতপক্ষে লেখকের পরাপাঠ সক্রিয়। এই সহজাত শক্তি লেখককে নিয়ে যায় আপাত-কাল থেকে প্রকৃতকালে। তিনি বর্তমান বা অতীতের ছবি যেভাবে দেখতে পান তাতে স্পষ্ট বোঝা যায়, তথ্যের খোলস থেকে তাঁর যাত্রা অন্তর্লীন সত্যের দিকে। আত্মস্মৃতিমূলক রচনায় তারাশঙ্কর যেভাবে কালের পদধ্বনি শুনেছেন, তাতে বহিরঙ্গে যদি সমস্ত মনোযোগ রুদ্ধ হতে দেখি, তাহলে বুঝব, দ্রষ্টাচক্ষু তাঁর অধিগত নয়। তার মানে, লেখক নিছক বস্তু-সমাবেশ লক্ষ করেন মাত্র, বস্তুর নির্যাস তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আগেই লিখেছি, তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক সত্তা আত্মস্মৃতির বয়নেও প্রবলভাবে সক্রিয়। তাই রচনাশৈলীতে পরিশীলিত মননের ছাপ অত্যন্ত স্পষ্ট। 'আমার কালের কথা' নামক রচনার শুরুতে সচেতন দার্শনিক প্রতিবেদন তৈরির প্রয়াস আমাদের চোখে পড়ে। আত্মস্মৃতির নান্দনিক তত্ত্বও এতে প্রকাশিত। পরি-কল্পিত বয়ানের বাচনিক বৈশিষ্ট্য সূচনার প্রথম অনুচ্ছেদেই প্রকট :

'অসীম অনন্ত কালের পথ অতিবাহন করে চলেছে মানুষের মিছিল। বছরের পর বছরের মাইল-পোস্ট পিছনে পড়ে থাকছে। বিরাম বিশ্রামহীন চলা পঞ্চাশটা মাইল পিছনে ফেলে এসে বারেকের জন্য পিছনে চাইতে ইচ্ছে হলো।' (পৃঃ ৩) শুরুতেই তৈরি হলো সচেতন দার্শনিকতার এবং ঈষৎ নাটকীয়তার আদল। আত্মকথাকে সুখপাঠ্য করে তোলার তাগিদ স্বাভাবিক। এইজন্যে নাট্য-সংলাপের আবহ বয়ানের প্রয়োজনে নির্মিত। আসলে নিজেরই সঙ্গে নিজের কথোপকথন তুলে ধরতে চেয়েছেন তারাশঙ্কর। নিজের গড়া দর্পণে আপন অবয়ব দেখতে দেখতে কখনো বা ইচ্ছে করেই যেতে চেয়েছেন দর্পণের বিপ্রতীপে। তবু প্রশ্ন দেখা দেয়, স্মৃতি মানে যেহেতু বিস্মৃতিও—গ্রহণ-বর্জন-সংযোজন-পরিমার্জনের প্রক্রিয়া তো অক্ষুণ্ণ থাকবেই গ্রন্থনায় ? এর আনুপাতিক উপস্থিতির পরিমাপ কিভাবে করব, শুধুমাত্র আত্মস্মৃতি-কথার চৌহদ্দিতে থেকে ! ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর আর আত্মজীবনী-প্রণেতা তারাশঙ্করের মাত্রাগত পার্থক্য কতটা ? অন্যভাবে বলা যায়, পার্থক্য ও সমান্তরালতার দ্বিবাচনিকতা দিয়ে তাঁর সৃষ্টিজীবনের প্রতিবেদনকে যদি

বুঝতে চাই—নান্দনিক ও সামাজিক ভাবাদর্শের অভিব্যক্তিতে কোনো তারতম্য খুঁজে পাব কি ? খুব জরুরি এই জিজ্ঞাসা। তারাশংকর সচেতন ভাবেই লিখেছেন, জীবন ও সৃষ্টির পরিক্রমায় অন্তরঙ্গজনেরা লক্ষ করবে 'পথ চলার মধ্যে আমার ভাবান্তর' (তদেব)। তার মানে, পর্বে-পর্বে ভাবান্তর ঘটেছে তাঁর, এবিষয়ে তিনি নিজেই অবহিত। আমরা লক্ষ্য করব, এই 'ভাবান্তর' কতটা পৌর সমাজের অনিবার্য রূপান্তরের ফসল আর কতটা কোনো বিচ্ছিন্ন-একক ব্যক্তিসত্তার স্বয়ংপ্রভ প্রজ্ঞার নিদর্শন। আত্মকথার নান্দনিক ও সামাজিক তাৎপর্য এই সূত্রেই নির্ণীত হতে পারে কিনা, তাও আমাদের বিচার্য।

নিবিষ্ট পাঠে বুঝতে পারি, 'আমার কালের কথা'র প্রথম দুটি পৃষ্ঠায় তারাশংকর প্রকৃতপক্ষে আত্মস্মৃতিকথার নন্দনতত্ত্বই পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেছেন। সাধারণভাবে তাঁর উপন্যাস-গ্রন্থনা থেকে ভাববাদী-বীক্ষার যে-নিদর্শন পাই, নিজের জীবনবৃত্তান্তের উপক্রমণিকায় তার-ই ইসারা দিয়েছেন তিনি , 'আঁকাবাঁকা, চড়াই-উৎরাই, রুক্ষ প্রান্তর, ছায়াশীতল সমতল পার হয়ে চলেছে জীবনের রথ, আলোক-অন্ধকারে, সুখে-দুঃখে বিচিত্র এর রূপ' (তদেব)। তাহলে নিজের কথা লিখতে গিয়ে নৈর্ব্যক্তিক হওয়া কি সম্ভব নয় আদৌ ? কিংবা, এতে কোথাও অতিকথন আর কোথাও ন্যূন-কথনের দোষ কি দেখা দেবে ? সবচেয়ে বড়ো কথা, কাল ও পরিসরে বিধৃত নিজের জীবনকে বৃহত্তর জীবনস্রোতের দ্বিবাচনিকতায় এবং বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে কতখানি বুঝতে পারি ! তারাশংকর দ্বিবালাপের ধরনে জানিয়েছেন, 'আমার মা বলেছেন—নিজের পুণ্যের কথা বললে সে পুণ্য ক্ষয় হয়, কীর্তির কথা বললে সে কীর্তির বনিয়াদে ফাট ধরে ; নিজের বেদনার কথা বললে নিজের অপমান করা হয় ; নিজের সুখের কথা বললে অহংকারের পাপ স্পর্শ করে। নিজের কথা বলা যায় শুধু একজনের কাছে।' (তদেব) বাংলার চিরাগত কথকতার ঐতিহ্য যেমন তারাশংকরের উপন্যাস-গ্রন্থনায় পুরোপুরি নতুন মাত্রা যোগ করেছে, তেমনি আত্মস্মৃতিকথাকেও ঐকান্তিক বয়নের সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তীর্ণ করেছে বহুস্বরিক আত্মনাট্যের ব্যঞ্জনায়। বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ বিশ শতকে কোনো বিমূর্তায়িত পরাসত্তার কথা বলা যায় না, তারাশংকর তা ভালোই জানেন। তাই খানিকটা, রহস্যচ্ছলে, গোপন আত্মমুখী কৌতুকে তিনি জানান 'শুধু একজনের কথা'। আসলে সেই একজন

তাবাশংকব নিজেই। স্বয়ং তিনি দাতা এবং তিনিই গ্রহীতা। আপন সময় ও পরিসরেব ধারণাকে তিনি নিজে গড়ে তুলেছেন। সৃষ্টিশীল সেই আত্মসত্তার অস্তিত্ব তাঁর কাছে সংশযাচ্ছন্ন নয়, স্বকৃত আলোয তা জ্যোতির্ময।

দুই

কল্পিত সহযাত্রীদের সঙ্গে দ্বিরালাপেব আবহ তৈবি করা এইজন্যে জবুবি যে এছাড়া নিজেব সৃষ্টিকর্ম সম্পর্কিত উচ্চারণ খানিকটা উচ্চকিত ঘোষণাব মতো শোনাত। তাবাশংকব তা চান না, তাঁর অভিবষ্ট নিমগ্ন উচ্চাবণ যাব আন্তবিকতা সম্পর্কে কাবো দ্বিধা থাকবে না কোনো। এইজন্যে কথকেব সম্পর্কে কাবো দ্বিধা থাকবে না কোনো। সেইজন্যে কথকেব সঙ্গিতে সবাসরি বলতে চেযেছেন পাঠকেব কাছে, 'আমিও যে তোদেব সঙ্গী, একসঙ্গে পথ চলেছি। তোদেব সামনেও সে সন্ধিক্ষণ বা উদযলগ্নেব নব আভাস দেখা দিযেছে, আমিও যে চোখেব সামনে ঠিক তাই দেখছি। আমি বলছি যে জনেব কথা, সে হলাম আমি নিজে। নিজেব কাছে ছাড়া নিজেব সুখেব কথা, পুণ্যেব কথা, কীর্তিব কথা—এসব কথা বলতে নেই। যাঁরা অনন্য-সাধাবণ তাঁবা পাবেন বলতে। যেহেতু না, তাঁদের অনুসরণ কবেই আমাদের চলা। তাঁবা ঋষি, আদিম কাল থেকে তাঁবা বলে আসছেন তাঁদেব উপলব্ধিব কথা, অভযেব বাণী—শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ। আব বলে যারা একান্তই নগণ্য সাধারণ, তাবা। কাবণ তাদেব স্বার্থবোধ আছে—অনুভব শক্তি নাই, বেদনায চিৎকাব কবে কাঁদা, সুখে কলবব করে উল্লাস করা হল তাদেব স্বভাবধর্ম।' (পৃ ৩-৪) খুব গুরুত্বপূর্ণ এই বাচন। শুধুমাত্র তাবাশংকব-সত্তাব উন্মোচনেব জন্যেই নয, উনিশ শতকীয বঙ্গীয নবজাগবণের সীমাবদ্ধতা উপলব্ধির জন্যেও। আব, ভাবতীয আধুনিকতাব প্রকৃত স্ববূপ সম্পর্কে অবহিত হওযাব জন্যে। এইজন্যে তাবাশংকব 'উদয়লগ্নেব নব আভাস দেখা'র কথা লেখেন এবং লেখেন 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা', এই পবাপাঠেব ইশাবাতেও ঐতিহ্যাশ্রযী নয কেবল, ঐতিহ্যমূল তাঁব বীক্ষা। যে-দেশে সামন্তবাদী চেতনা-সংস্কাব-আকরণকে অক্ষুন্ন বেখে ঔপনিবেশিক শাসকেব প্রযোজনে আধুনিকতাব উদ্ভব ঘটে—সে-দেশে বীক্ষণের এই চবিত্রই অনিবার্য। বিনা-প্রশ্নে কোনো যথাপ্রাপ্ত অবস্থান বা আপ্তবাক্যকে গ্রহণ

.কবতে নাবাজ যে-আধুনিকতা, তাকে তারাশঙ্করের অণুবিশ্বে কতখানি পাওয়া সম্ভব-এই প্রশ্ন জাগে। আত্মস্মৃতিকথায় তাঁব বিশ্বাস সমভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে, উপন্যাসের বিশ্ববীক্ষায় তাকে যদি পেরিয়ে গিয়ে থাকেন তিনি—তাহলে স্রষ্টা হিসেবে তাঁব অনন্যতা স্বীকাব কবতেই হবে।

লক্ষণীয়, তাবাশঙ্কর প্রাগুক্ত অংশে লিখেছেন, অনন্যসাধাবণ পূর্বসূবী দার্শনিকদের অনুসৃতি সম্পর্কে কোনো দ্বিধা তাঁব নেই। জীবনেব চলাব পথে এই ঐতিহ্য-নির্ভর অবস্থান তাঁর কাছে সম্পূর্ণ মান্যতা পেয়েছে। তাহলে তাঁর সৃষ্টিশীল চেতনায় অর্থাৎ উপন্যাস বচনার ক্ষেত্রে তা কি কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈবি করেনি? ঔপন্যাসিক হিসেবে নতুন ও পুরোনোব দ্বন্দ্বে কাল ও পরিসরকে বার বার ধ্বস্ত হয়ে যেতে দেখেছেন তিনি। তাবা-শঙ্কবের বিশ্বাসে গভীরভাবে প্রোথিত সঞ্চালক ভাবাদর্শ কি শেষ পর্যন্ত ঐ দ্বন্দ্বের চিত্রকে একান্তিক কবে দেয়নি? কালিন্দী, আরোগ্য নিকেতন, হাঁসুলি বাঁকের উপকথা বা গণদেবতার মতো উপন্যাসেই নয় শুধু, প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি সার্থক পাঠকৃতিতে, নিজের অজ্ঞাতসাবেই তাবাশঙ্কর কি পক্ষ-পাতিত্ব দেখান নি? অসামান্য গল্প-বলিয়ে ছিলেন তিনি, অজস্র মানুষেব মিছিল তাঁব ঔপন্যাসিক অণুবিশ্ব জুড়ে বয়ে গেছে। কিন্তু আপাতকাল ও প্রকৃতকালেব দ্বিবাচনিকতায় এরা ঋদ্ধ, একথা নিঃসংশযে বলা চলে কি? তাবাশঙ্কবেব নিজস্ব ভাবাদর্শ কি তাদেব স্বাধীনবিস্তারে সূক্ষ্মভাবে বাধা দেয়নি, প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ তিনি দেখিযেছেন নিশ্চয, কিন্তু এদেব ঈপ্সিত পূর্ণতা দিতে চাননি—একথা আমাদেব মনে হতে পাবে। এইজন্যে দাযী, প্রকৃত আধুনিকতাব বদলে সামন্তবাদী সংস্কারে প্রোথিত প্রাক-আধুনিক চিন্তা-কাঠামোব প্রতি অব্যাহত আনুগত্য। এই মানসিকতায প্রশ্ন-প্রতিবাদ-বিদ্রোহ অপ্রতিষ্ঠ হতে বাধ্য। তাই তারাশঙ্কর কালেব সন্ধিক্ষণ সম্পর্কে অবহিত হযেও তাঁব নিজস্ব শ্রেণী-অবস্থান জনিত সীমা বদ্ধতাব জন্যে আপাত-কালেব হদিশ দিয়েছেন, প্রকৃতকালের মাত্রা ঝাপসা হযে গেছে ঐতিহ্যবোধেব বিচ্ছুবণে।

তাবাশঙ্করেব আত্মস্মৃতি তাঁব আত্মসচেতনতাবও নিদর্শন। তিনি যখন আপনকাল বা পবিসবেব বযান তৈবি করতে চান, নিজেকেই ফিবিযে আনেন : প্রস্তাবনায : 'অনন্যসাধারণ আমি নই, অতি বিনযকবে ,নিজেকে নগন্য সাধারণও মনে কবিনা। তাই চিৎকার করে কেঁদে বা কলবব করে

উল্লাস করে দুঃখসুখের কথা বলতে পারব না। আমি সাধারণ মানুষ, আমার অধিকার সম্বন্ধে আমি সচেতন, আমার মর্যাদা সম্বন্ধে সজ্ঞান। তাই আমার নিজের কথা বলব শুধু নিজেকে, নিজেই দাঁড়াব নিজের কাছে বিচারপ্রার্থীর মতো এবং বিচারকের মতো, সান্ত্বনাপ্রার্থীর মতো, সান্ত্বনা দাতার মতো।' (পৃ ৪) তারাশঙ্কর যদিও নিজেকে যুগপৎ বিচারপ্রার্থী এবং বিচারক বলতে চেয়েছেন, তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক রচনা সম্পূর্ণ পড়ার পরে মনে হয়, অন্যদুটি বিশেষণই বেশি প্রাসঙ্গিক। অর্থাৎ তিনি নিজের মুখোমুখি হয়েছেন সান্ত্বনাপ্রার্থী এবং সান্ত্বনাদাতা হিসেবে। আসলে জীবন সম্পর্কে তাঁর যে দৃষ্টিকোণ তাতে বিচারপ্রার্থী ও বিচারকের ভূমিকা স্মৃতিকথায় কিংবা উপন্যাসে তেমন বড়ো হয়ে ওঠেনি। শেক্সপীয়ার কথিত 'Milk of human kindness'-এর প্রভাবে উপন্যাসের ভেতরে ও বাইরে তিনি কখনো সান্ত্বনাপ্রার্থী কখনো বা সান্ত্বনাদাতা। দ্বিরালাপের ভঙ্গিতে তিনি জানিয়েছেন ঃ

'বলতে পারি পথের কথা অর্থাৎ কালের কথা' (তদেব) এবং জানিয়েছেন, "কালের কথায় নিজের কথা' উত্থাপন করলেও তা পুরোপুরি তাঁর নিজেরই উপস্থিতির স্মারক হবে না। অর্থাৎ তারাশঙ্কর ব্যক্তিসত্তাকেও নৈর্ব্যক্তিক ভাবে উপস্থাপিত করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কিন্তু আমরা লক্ষ করব কাজটা মোটেই সহজ নয়।

আত্মস্মৃতিকথা বা আত্মচিত্র প্রকাশমাধ্যম হিসেবে খুব বেশি বয়স্ক নয় এবং তারও রয়েছে নিজস্ব প্রত্নতত্ত্ব। ইউরোপে রেনেসাঁসের ইতিহাসে এর বাচনিক উৎস খুঁজে পাওয়া গেছে। পরম্পরাক্রমে গ্রীক-রোমান ধ্রুপদী চেতনা ও প্রত্নকথার জগৎ পর্যন্ত ঐ বাচনের প্রেরণা বিস্তৃত। বিদ্বজ্জনেরা একে বলেছেন 'rhetorical memory' আর বিশেষভাবে তাঁরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আত্ম-আবিষ্কারের প্রকরণের দিকে। আত্মস্মৃতিকথা তো আসলে আত্মবিনির্মাণ, নিজের পরিচিত তথ্যের সাহায্যে নিজেরই অজ্ঞাতপূর্ব পরিসরের পুনর্নির্মাণ। এও আখ্যান-উপস্থাপনার বিশিষ্ট ধরন। পূর্ব-নির্ধারিত কোনো শৈলী তা অনুসরণ করে না, ব্যক্তিগত স্মৃতির সঙ্গে মিশিয়ে দেয় সামূহিক স্মৃতির গ্রন্থনা। বর্তমান অক্লেশে মিলে যায় অতীতে। ধারাবাহিকতার বদলে ঘনঘন ছেদ ও বিরতি হয়ে ওঠে প্রত্যাশিত। আত্মস্মৃতিকথার বাচন যেন বা ছেদের পুনরাবৃত্তিকেই নিয়ামক বিধি হিসেবে

ব্যবহার করে—এভাবেই ব্যক্তিজীবন ও সামূহিকজীবন ও মনন ও সৃষ্টির আপাতবিচ্ছিন্ন প্রবাহের মধ্যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। মরিস ব্লাসোঁ Interruptions শীর্ষক নিবন্ধে (১৯৮৫ঃ ৪৩—৫৫) লিখেছিলেনঃ 'Discontinuity assures continuity of understanding·· to stop in order to understand, to understand in order to speak'। এই মন্তব্য আত্মজীবনী ও আত্মস্মৃতিকথায় ব্যবহৃত শৈলীর তাৎপর্য অনুধাবনের ক্ষেত্রে দিগ্‌দর্শক।

আত্মস্মৃতির প্রত্নতত্ত্ব আমাদের ভাবায় কেননা এব আবিষ্কৃত পরিসরে ক্রমশ দেখতে পাই ব্যক্তি-স্মৃতির গ্রন্থনায় অর্জিত পবিধিব উদ্‌ভাসন। কিন্তু ব্যক্তিমন তো নিরালম্ব বায়ুভুক উপস্থিতি নয় কোনো ; সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐতিহ্যেব সঙ্গে সচেতন ও অবচেতন ভাবে মানিয়ে নিতে-নিতে তা নিজেকে গড়ে তোলে। আত্মস্মৃতিকথায় এই প্রক্রিযার হদিশ পেতে পাবেন যে-কোনো সতর্ক পাঠক। লেখক এ ধবনের প্রতিবেদনে যত সচেতন গ্রন্থনাই করুন না কেন, তাঁর অজ্ঞাতসারেই সন্দর্ভে বয়ে যাবে অজস্র অন্ধবিন্দু। তত্ত্ব অনুযায়ী এঁদের ইতিবাচক উপস্থিতি পরবর্তী উন্মোচনেব উৎস, কিন্তু নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য যদি বড়ো হয়ে ওঠে, অন্তর্দৃষ্টিব প্রকাশ দেখব না। তাবাশঙ্করেব আত্মকথা যেহেতু 'আমার কালেব কথা' স্পষ্টত তাঁব বাচনে নান্দনিক ও সামাজিক ভাবে নৈর্ব্যক্তিক কণ্ঠস্বরই প্রত্যাশিত। তবু এও তিনি জানিয়ে দিতে ভোলেন নি—'ক্ষীরসাগবেব বসপবিপূর্ণতাব হানি না ঘটিয়ে যেটুকু জল তাব সঙ্গে থাকে, সেটুকু ন্যায্য অধিকাবেই থাকে' (পৃ ৫)। অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক উচ্চারণ-প্রাধান্য সত্ত্বেও আত্মকথায় তাঁব ব্যক্তিস্বব উপস্থিত থাকবে ন্যায্য অধিকাবে। তিনি হতে চান, কালবাহিত পবিসরেব প্রতীক। মহাভারতের যক্ষ-যুধিষ্ঠিব সংবাদেব সেই বিখ্যাত বাণী যেন তাবাশঙ্করেব প্রতিবেদনেও ধ্বনিত অনুরণিত ; 'কালঃ পচতীতি বার্তা'। তাঁর যাবতীয় দর্শন ও নন্দনেব কেন্দ্রবিন্দুতে এই বার্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন তিনি, সচেতনভাবে। মনে পড়ে 'The Silent Language'-এ E. T. Hall এব চমৎকাব কাব্যিক বয়ানঃ 'Time talks. It speaks more plainly than words. The message it conveys comes through loud and elear. Because it is manipulated less consciously, it is subject to less distortion than the spoken language.

It can shout the truth where words lie'.

॥ তিন ॥

সময়ের ভাষা শব্দময় উচ্চারণের চেয়ে সবলতর-এই বার্তা তারাশংকর দিয়েছেন স্মৃতিকথার সূচনাপর্বেই। কাল ও পরিসরের যুগলবন্দিত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন, উটপাখির মতো বালির মধ্যে মুখ গুঁজে থাকেননি। বলেছেন তাঁর জন্মভূমি লাভপুর গ্রামের কথা, পরম মমতায় অথচ বিশ্লেষণী মননে। '১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে—বাংলা ১৩০৫ সালের ৮ই শ্রাবণ সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বলগ্নে আমার জীবন যাত্রা শুরু' (পৃঃ ৪)—একথা জানিয়ে তারাশংকর ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতের কথাও লিখেছেন। এতে বুঝতে পারি ঔপন্যাসিকের বিশিষ্ট চোখ দিয়ে আত্মজীবনীর পরিসরকেও দেখেছেন তিনি : 'ভারতেশ্বরী তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া। লোকে বলত—মহারাণীর রাজত্ব। বাংলাদেশ তখন জেলায়-মহকুমায়-থানায় ভাগ হয়েছে। শিকলে ছাঁদে ছাঁদে বাধা এমন বাঁধন যে এক জায়গায় টান পড়লে শিকলের সবখানে সব কটা ঠনঠন শব্দে বেজে ওঠে। প্রাচীন রাঢ় বারেন্দ্র প্রভৃতি বিভাগের নাম মানুষ ভুলে গিয়েছে। বিস্মৃতনামা প্রাচীন রাঢ়ের একপ্রান্তে বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রাম।' (পৃ ৫) এভাবে তারাশংকরের নিজের কথা নিছক তাঁর ব্যক্তিগত সাতকাহন হয়নি, সঠিক ভাবেই হয়ে উঠেছে কালবাহিত পরিসরের কথা। রাজনৈতিক সমাজের পুরোপুরি ভিন্ন আদলের সমান্তরাল ভাবে ঔপনিবেশিক পৌরসমাজ কতটা কিভাবে পালটে যাচ্ছে, সেদিকে দৃষ্টি-পাত করতে ভোলেন নি তিনি। তিনি লিখেছেন : 'লাভপুর গ্রামখানি অদ্ভুত গ্রাম। আমার জন্মস্থান—আমার মাতৃভূমি, আমার পিতৃপুরুষের লীলাভূমি বলে অতিরঞ্জন করছি না, সত্য কথা বলছি। কালের লীলা, কালান্তরের রূপ মহিমা এখানে এত সুস্পষ্ট যে বিস্ময় না মেনে পারি না। এ গ্রামে জন্মেছি বলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। ১৮৯৮ সালে লাভপুরের সমাজে তখন দুই বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছে। (পৃঃ ৫) আত্মস্মৃতিকথা লিখতে গিয়ে তারাশংকর কখনো এগিয়ে আর কখনো পিছিয়ে কাল ও পরি-সরের বিচিত্র গ্রন্থনা তৈরি করেছেন। মূলত ভাববাদী এবং প্রচ্ছন্নভাবে স্থিতাবস্থার প্রতি পক্ষপাতসম্পন্ন হয়েও তিনি যে দ্বন্দ্বমথিত বাস্তবকে লক্ষ্য করেছেন—তা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ঔপনিবেশিক পৌরসমাজের সামগ্রিক স্থবিরতা সত্ত্বেও ভেতরে ভেতরে ক্ষয় ও অবসাদ অর্থনৈতিক রূপান্তরের সঙ্গে

যুক্ত হয়ে যতখানি গতির অবভাস তৈরি করছিল, তারাশঙ্কর সেবিষয়ে অবহিত না হয়ে পারেন নি।

জমিদার-প্রধান গ্রামীণ সমাজে একদিকে সামন্ততন্ত্রের ভাঙন এবং অন্যদিকে নতুন শিল্পপুঁজির আবির্ভাব কিভাবে সামাজিক সম্পর্কের ব্যক্তি ও অন্তর্বিন্যাসকে পাল্টে দিচ্ছে, আত্মজীবনীতে এ-বিষয়ে মন্তব্য করেছেন তিনি। আগে যেমন লিখেছি, সামাজিক দ্বন্দ্বের এই জটিল বিষয়ও তিনি তুলে ধরেছেন কাহিনীর আদলে। একদিকে ভঙ্গুর সামন্ততন্ত্র এবং তার যাবতীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো আর অন্যদিকে নব্য পুঁজিবাদী ব্যবসায়ী শ্রেণীর নিজস্ব ভাববিশ্ব—এই দুই-এর সংঘর্ষ পৌরসমাজের সামাজিক মননে কতটা তরঙ্গ তৈরি করেছিল এ সম্পর্কেও তিনি আভাস দিয়েছেন। কোনো সন্দেহ নেই যে তারাশঙ্করের সামাজিক বীক্ষণে দ্বন্দ্বের আবহটি চমৎকার প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লক্ষ করেছিলেন: 'বীরভূমে জমিদারের একটা বৈশিষ্ট্য হল জমিদারীর আয়তন ও আয়ের ক্ষুদ্রতা এবং তাদের সংখ্যার বাহুল্য।' (পৃঃ ৬) তবু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তর সহ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এদের সঙ্গে লক্ষপতি ব্যবসায়ীর অসম বিরোধ গ্রামীণ সমাজে তীব্র সংঘর্ষের বাতাবরণ গড়ে তুলেছিল। তারাশঙ্কর লিখেছেন, 'লাভপুর-সমাজের নেতৃত্বের আসন নিয়ে এই বিচিত্র বিরোধ সমাজ-জীবনের নানাস্তরে বিস্তৃত হয়েছে। কীর্তির প্রতিযোগিতা চলছে মহাসমারোহের প্রকাশের মধ্যে, দ্বন্দ্ব চলছে সৌজন্য প্রকাশ নিয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে রাজভক্তি নিয়ে, প্রতিযোগিতা চলছে জ্ঞানমার্গের অধিকার নিয়ে, আবার পরস্পরের মধ্যে কলঙ্ক কালি ছিটানো নিয়েও চলেছে জমিদার ও ব্যবসায়ীর মধ্যে বিচিত্র বিরোধ।' (তদেব) এই অনুচ্ছেদকে আমরা নিঃসন্দেহে তারাশঙ্করের উপন্যাস-সৌধের মেরুদণ্ড বলে চিহ্নিত করতে পারি। তাঁর সব কটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসে এই দ্বন্দ্বের বৃত্তান্তই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই হলো তাঁর কালের কথা অর্থাৎ সেই কাল যা তারাশঙ্করের বিশ্ববীক্ষায় পূর্ব-নির্ধারিত ভাবাদর্শের মধ্যে জারিত হয়ে কথাবস্তু হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কোনো সন্দেহ নেই যে প্রত্যেক সংবেদনশীল মানুষই মূলত সময়-তন্ত্রের ভাষ্যকার এবং প্রয়োগবিদ। দ্রষ্টাচক্ষুসম্পন্ন ঔপন্যাসিকের ক্ষেত্রে এতে যুক্ত হয় আরো গতি, ব্যাপ্তি ও কৌণিকতা। সময় একই সঙ্গে বিমূর্ত এবং মূর্ত হয়ে আমাদের অস্তিত্বকে সারবান করে তোলে। জৈব বিধির ছন্দে

আমরা যদিও বাঁধা, সমাজের কাল সংশিলষ্ট পরিসরেই ঐ ছন্দের তাৎপর্য নিরূপিত হতে পারে। আমরা যে-সমাজে জন্মাই, তার রূপান্তর-প্রবণ আকরণগুলির উৎস নিরবধিকাল। নানা বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সময়ের সামাজিক অভিব্যক্তিকে চিনে নিই বলে আমরা আসলে বাস করি সামাজিক সময়ের অনুজ্ঞায়।

তারাশঙ্করের আত্মস্মৃতিকথা অনুসরণ করে এই সত্য যেন স্পষ্ট হয়ে ওঠে আরো। প্রাক্-আধুনিক বাংলার পৌর সমাজে শ্রেণীদ্বন্দ্ব ও পারস্পরিক রেষারেষি প্রকাশ পেত জমিদারদের মাইনর স্কুল প্রতিষ্ঠায় আর ব্যবসায়ীদের হাই ইংলিশ স্কুল স্থাপনের মধ্য দিয়ে কিংবা ব্যবসায়ী ধনী যদি গ্রাম-দেবতার পুরোনো মন্দির ভেঙে নতুন মন্দির গড়েন, জমিদার সঙ্গে সঙ্গে দেবী মন্দিরের সামনে দীঘির উপর প্রশস্ত ঘাট বাঁধিয়ে দেন। জমিদারবাড়িতে যদি জগদ্ধাত্রী পুজোর সমারোহ হয়, তাহলে ব্যবসায়ী বাড়িতে রাধাগোবিন্দের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে রাসযাত্রার সমারোহ করা হয়। এমনকি নিমন্ত্রণের ভোজ আয়োজন করার ক্ষেত্রেও একে অপরকে কেবল টেক্কা দিতে চান। জগদ্ধাত্রী পুজোয় দুদিন যাত্রা হলে ব্যবসায়ী বাড়িতে রাস-পূর্ণিমায় একমাস ধরে ভাগবতের কথকতা ও যাত্রা হয়ে থাকে। এছাড়া দু-তরফেই খেমটা নাচের আয়োজন ছিল বাধ্যতামূলক। এই রেষারেষি আপাতদৃষ্টিতে কৌতুকের বলে মনে হলেও এর একটা সামাজিক তাৎপর্য ছিল ইতিবাচক। একটু আগে আমরা যে সামাজিক সময়ের কথা লিখেছি, তারাশঙ্করের চোখে ধরা পড়েছে তারই বিশিষ্ট একটা ধরন। জমজমাট গ্রাম হিসেবে লাভপুর ঔপন্যাসিকের আত্মস্মৃতিতে যেভাবে প্রতিভাত হয়েছে, তাতে আমরা উনিশশতকীয় গ্রামীণ পৌরসমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় বিশ্বস্ত ছবি দেখতে পাই। এই বিশেষ দৃষ্টি তারাশঙ্করের ঔপন্যাসিক অনুবিশ্বের ভিত্তি এবং সেই সঙ্গে সীমাবদ্ধতারও কারণ।

পুঁজিবাদী সংস্কৃতির প্রতি তারাশঙ্কর প্রসন্ন ছিলেন না, এই ইঙ্গিতও পাই তাঁর আত্মকথায়। তবে এই অপ্রসন্নতা কোনো গভীর রাজনৈতিক দার্শনিক সংবিদের জন্যে নয়, মূলক সামন্তবাদী চেতনায় দৃঢ়প্রোথিত নৈতিক সংস্কারের জন্যে। তবু এর অন্তবৃর্ত বাস্তবতা যে সন্ধি-কালীন লেখকমনকে প্রবলভাবে আলোড়িত করছিল, তার অজস্র নিদর্শন রয়ে গেছে তাঁর ঔপন্যাসিক অনুবিশ্বে। তিনি লিখেছেন : 'ব্যবসায়ীটির

কল্যাণে কলকাতার সঙ্গে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ। কলকাতার নবজীবনের সংস্কৃতির অমৃত কেউ ভৃঙ্গারে করে আনতে না পারলেও, ফ্যাসানের হুইস্কির বোতল কেস-বন্দী হয়ে গ্রামে অনায়াসে পৌঁছেছে (পৃ ৮)'। এরই নাম সময় যার প্রবাহে একটিমাত্র স্রোতের সত্য থাকে না, থাকে জটিল প্রতিস্রোত এবং কুটিল আবর্তের সংকেতও। তাই একদিকে যেমন অনুভব করি উদ্দাম গতির প্রাবল্য, অন্যদিকে তেমনি অনুরণিত হতে থাকে রিক্ততা ও যন্ত্রণার উপলব্ধি। এই বিচিত্র দ্বন্দ্বের আবহে তারাশঙ্করের জীবনকথা গ্রথিত। পূর্ববর্তী প্রজন্মের কথা যখন লেখেন তিনি, সমাজের প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অবস্থানই তাতে প্রতিফলিত হয়। সময়গ্রথিত পরিসর বিষয়ে সচেতনতা সত্ত্বেও পিতৃপিতামহের বৃত্তান্ত, যেন কথকতার ঐতিহ্য অনুযায়ী, জায়মান লোকপুরাণের অংশ হয়ে ওঠে। ছৌকারুকির মুখোশের আড়ালে যেভাবে প্রচ্ছন্ন থাকে নৃত্যশিল্পীর অবয়ব, তেমনি খণ্ডকালের বাস্তব ছবিকে আড়াল করে রাখে সময়ের অন্তর্বর্তী পরাসময়ের দ্যুতি। অথচ এই দ্যুতি সামাজিক বাস্তবতা ও সামাজিক সময়ের সন্দর্ভ হিসেবে তারাশঙ্করের দ্বারা চিহ্নিত হয় বলে তার কথনবিশ্বের বিশিষ্ট চরিত্রও নির্ধারিত হয়ে পড়ে। ঠিকই লিখেছিলেন হেলগা নোহেবার্টনি (১৯৯৪ ঃ ৭) 'It is we human beings who make time, the more complex the society the more stratified the courses of time also become, which overlap from temporal connections with and alongside one another.'

॥ চার ॥

'আমার কালের কথা'য় তারাশঙ্কর সচেতন ভাবেই নবীন ও পুরাতনের ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের কথা লিখেছেন। কিন্তু, লক্ষ করলে বুঝব, তাঁর অবচেতনে ব্যক্তি-নবীন ও যৌথ-পুরাতন তুল্যমূল্য নয়। বিশেষত পুরোনো জগৎ তাঁর কাছে মায়াময় লোকাতীত ও প্রত্নকথায় আশ্রিত। এইজন্যে, দ্বন্দ্বের বাস্তবতায় প্রাচীন পরাজিত হলেও তাঁর জন্যে তারাশঙ্করের করুণা ও হাহাকার গোপন থাকে না। ক্রমবিকাশমান ঔপনিবেশিক প্রতিবেদনে নিজেকে, হয়তো অজ্ঞাতসারেই অবিচ্ছেদ্য অংশ করে তোলেন তারাশঙ্কর। স্মৃতিকথায় তারই দূরাগত সংকেত পাই যেন ; 'এমনি দ্বন্দ্বের সমারোহে সমৃদ্ধ লাভপুরের

মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। সে দ্বন্দ্বের ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল। (তদেব) নিঃসন্দেহে এই জন্যে কালিন্দী-আরোগ্য নিকেতন—পঞ্চগ্রাম প্রভৃতি উপন্যাসের বয়ানে প্রচ্ছন্ন থেকে গেছে আত্মজৈবনিক মাত্রা। ঔপন্যাসিক পাঠকৃতি যেন বিশেষ অর্থে হয়ে উঠেছে আত্মস্মৃতিকথার স্বাভাবিক বিস্তার কিংবা কল্পনা সমৃদ্ধ পুনরুত্থাপন। এখানে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগেঃ সামন্ততন্ত্র ও বণিক তন্ত্রের দ্বন্দ্ব দু চোখ ভরে দেখার সময় তারাশঙ্করের অবস্থান কি নিরপেক্ষ ছিল? পুরোনো জগৎ বিলীয়মান আবার নতুন জগৎও অপ্রতিষ্ঠ—এমন পরিস্থিতি তাঁর উপন্যাসে মাঝে মাঝেই দেখা গেছে। আবার, ভারতীয় উপমহাদেশের বিশেষ বাস্তবতায় সামন্তবাদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোর সঙ্গে জায়মান বণিকতন্ত্র স্বচ্ছন্দে সহাবস্থান করার ফলে কি কি জটিলতা দেখা দিচ্ছে—এ বিষয়ে তাঁর ধারণা স্বচ্ছ ছিল বলে মনে হয় না। আত্মস্মৃতিকথায় তিনি যে-সমস্ত রূপক ব্যবহার করেছেন তা বিশ্লেষণ করলে মনে হয় পুরোনো ও নতুন জীবনভাবনার সহাবস্থানে তিনি কোনো ধরনের অস্বাভাবিকতা দেখতে পাননি। তাই তিনি লিখেছেন 'ইট-কাঠ-পাথরের মন্দির জড়বস্তু, কিন্তু মানুষের প্রতিষ্ঠার মন্দির সজীব, তাই কোনো নতুন প্রতিষ্ঠাবান যখন অপর সকল প্রতিষ্ঠাবানের প্রতিষ্ঠার মন্দিরকে ছাড়িয়ে নিজের ইমারত গড়ে, তখন পুরোনো প্রতিষ্ঠার মন্দিরগুলি স্বাভাবিক ভাবে সজীব বিন্ধ্যগিরির মতো থাকে।' (পৃ ৯) বিলীয়মান কালের অভিজ্ঞান যখন আসন্নকালের চিহ্নায়ক-পরম্পরায় মিশে যেতে থাকে, তারাশঙ্কর স্পষ্টতই তাকে স্বাভাবিক বলে গ্রহণ করেন। পৌর সমাজের কোষে কোষে সঞ্চারিত সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও প্রতাপের কৃৎকৌশল গুলি কিভাবে অন্যোন্য সম্পৃক্ত—এত সব জটিল প্রশ্ন তাঁর কাছে বড়ো হয়ে ওঠেনা।

এই প্রেক্ষিতে তারাশঙ্করের জীবন কথা পাঠকের কাছে তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। তিনি দেখিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের স্বাভাবিক সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্য কালের অমোঘ প্রভাব অস্বীকার করতে পারেনি। প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব তাঁর কাছে যে স্বাভাবিক জীবনধর্ম বলে বিবেচিত হয়েছে, এটা বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। তাঁর পিতামহ ও পিতার প্রসঙ্গ তারাশঙ্কর উত্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিকের মুন্সীয়ানায়। বিবর্তনশীল

কালেব অভিজ্ঞান তিনি লক্ষ কবেছেন তাঁর বাবাব ডাযেবী লেখাব প্রবণতায। উপন্যাসেব মতো সুখপাঠ্য বলেই নয, তাঁব জীবনেব পটভূমিব একাংশ স্পষ্ট কবাব প্রযোজনেই 'আত্মস্মৃতিকথার সানুপুঙ্খ বযান গডে উঠেছে। তাবাশংকব তাঁব বাবাকে হাবিযেছিলেন মাত্র আট বৎসব বযসে। তাবও চাব দশক পবে তিনি যখন পিতৃস্মৃতিকে পুনঃপাঠ কবেছেন, পবিণত মননসম্পন্ন ঔপন্যাসিকেব দৃষ্টি তাকে উদ্ভাসিত কবে তুলেছে। তাই বাবাব মধ্যে তিনি দেখতে পেযেছেন 'জীবন তত্ত্বেব রহস্য অনুসন্ধানেব প্রবৃত্তি এবং দৃষ্টি আযত্ত কবাব চেষ্টা।' (পৃঃ ১৩)। তাবাশংকবেব বাবা তাঁব ডাযেবীব প্রতিটি পৃষ্ঠায ছেলেকে সম্বোধন কবে কিছু-না কিছু লিখে গেছেন। তাবাশংকবেব কৃতিত্ব এই যে, একে তিনি ব্যক্তিগত অনুভূতিব মধ্যে সীমিত বাখেননি। ববং বিগতকালেব অভিজ্ঞান হিসেবে বাবাব ডাযেরীকে গ্রহণ কবেছেন। তাবাশংকবেব এই বিশ্লেষণ প্রমাণ করে, পাবিবাবিক অনুপুঙ্খের মধ্যেও তিনি যথাসম্ভব নৈর্ব্যক্তিক ভাবে বহতা কালেব চিহ্নাযক গুলি শনাক্ত কবতে চেযেছেন। এইজন্যে তাবাশংকবের নিম্নোক্ত বক্তব্য খুব প্রণিধানযোগ্য, 'আজকেব দৃষ্টি দিযে সেকালকে বুঝবাব পক্ষে সবচেযে বেশি সাহায্য কবেছে আমাব বাবাব ঐ ডাযেবি। এই ডাযেবি আবো একটা পবিচয বহন কবে বযেছে। সেটা হল সেকালেব ভাবতবর্ষের মানুষের ওপব ইউবোপেব সভ্যতাব প্রভাব পড়ার পবিচয। বাবাব ডায়েবিতেও স্পষ্ট এবং সেকালেব শ্রুতি ও স্মৃতিতেও প্রমান বযেছে যে, তখনকাব কালেব মানুষ ইংরাজেব বাজত্বে ইংরিজি সভ্যতার ও শিক্ষার রাজকীয় সমাদবে গভীব বেদনাব সঙ্গে ভালোমন্দ যা কিছু অতীত কালেব সম্বল ছিল সমস্ত কিছুকে পুবানো পুঁথিব দপ্তবে বেঁধে ভাঙা পেঁটবায় পুরে নতুনকে গ্রহণ কববাব জন্য ব্যগ্র হযে উঠেছিল (তদেব)'।

॥ পাঁচ ॥

এছাড়া তাবাশংকবের নজব পড়েছিল পিতৃতন্ত্রেব উদ্ধত প্রতাপে প্রান্তিকাযিত নারীসমাজেব প্রতি। আজকেব দৃষ্টিতে যাকে নাবীচেতনাবাদ বলি, তার অভিব্যক্তি লেখকেব ভাবাদর্শেব সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয। তবু কালেব সন্ধিক্ষণে মানবিকতাবাদী বিচ্ছুবণ নাবীব প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিকে নিঃসন্দেহে

প্রভাবিত করেছিল। তাই আত্মস্মৃতিতে বিবাহপ্রথা, নারীপুরুষের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে তারাশঙ্কর আলোকপাত করেছেন। এই সূত্রে তাঁর ঔপন্যাসিক অণুবিশ্বে উত্থাপিত নারীবর্গের প্রতিমায়িত অস্তিত্ব আমরা বিশ্লেষণ করতে পারি। প্রসঙ্গত মা ও পিসীমার কথা খানিকটা বিস্তারিত ভাবেই জানিয়েছেন তারাশঙ্কর। তাঁর ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুভূতির উপস্থিতি অস্বীকার না-করেও বলা যায়, এই দু'জন প্রিয় মানবীর মধ্যে নারীশক্তির অপার সম্ভাবনা ও লাবণ্য দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনের এই নিবিড় উপলব্ধি যে সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে, অন্তরঙ্গ পাঠে তা বুঝতে পারি। গার্হস্থ্য জীবনের পটভূমি যে দেশকালের আবহে সম্পৃক্ত, এই জরুরি বোধ তারাশঙ্কর অর্জন করেছিলেন। তাই তাঁর আত্মস্মৃতিকথা ও উপন্যাসের বয়ান দ্বিবাচনিক চেতনায় অন্যোন্য-সংশ্লিষ্ট—গুরুত্বপূর্ণ এই সিদ্ধান্ত আমরা নিতে পারি। তারাশঙ্কর লিখেছেনঃ

'এমনি যখন দেশের পটভূমি পরিবর্তনমুখী, তখন আমাদের ঘরের পটভূমিতে পরিবর্তন ঘটে গেল খানিকটা দ্রুততর গতিতে। আমাদের ঘরে এলেন আমার মা ··তিনি অসাধারণ একটি মেয়ে। প্রতিভাময়ী। তিনি এসেই আমাদের সংসারকে ঠেলে এগিয়ে নিয়ে গেলেন, তখনকার দিনে আমাদের গ্রামে প্রবহমান যে কাল তাকে পিছনে রেখে অনেক দূরে।' (পৃঃ ১৫) স্পষ্টত তারাশঙ্কর তাঁর জন্মের পূর্ববর্তী সময়কে অর্থাৎ উনিশ শতকের নব্বই দশককে পরবর্তী কালে অন্যদের কাছে জেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু স্মৃতিকথায় তাঁর পরিণত মননে পরিশীলিত হয়ে দেশকালের পটভূমি মিশে গেছে পারিবারিক বৃত্তে।

পাশাপাশি বলেছেন তাঁর পিসীমার কথাও যিনি পরবর্তীকালে লেখকের ধাত্রীদেবতা হিশেবে বন্দিত হয়েছেন। কিন্তু তার মধ্যেও সামাজিক সময়ে প্রতিবিম্বিত নারীসত্তার একটি বিড়ম্বিত দিক ভিন্নভাবে ব্যক্ত হয়েছে। আত্মস্মৃতিকথার বিভিন্ন অনুপুঙ্খে আমরা দেখেছি তাঁর কোমল-কঠোর ব্যক্তিত্ব। পিসীমার অসহিষ্ণু প্রকৃতি তারাশঙ্করের দাম্পত্য জীবনের প্রথম পর্বকে তিক্ত করে তুলেছিল। লেখক অবশ্য এ-জন্যে কোনো ক্ষোভ প্রকাশ করেননি বা কাউকে দোষারোপ করতেও দেখা যায় না। আশ্চর্য নিরাসক্তি নিয়ে, খানিকটা অম্ল-কষায় কৌতুকে, আত্মজৈবনিক উপন্যাসের ধরণে ঐসব ঘটনা

বিবৃত কবেছেন তিনি। কিন্তু ভালোভাবে লক্ষ কবলেই বুঝব মানবিক সম্পর্কেব এই টানাপোড়েনেও বড়ো হয়ে উঠেছে অনিবার্য ও অনতিক্রম্য সামাজিক সময়েব চলচ্ছবি। পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের একবাচনিক স্থিতিব মধ্যেও মহিমময়ী নাবী কিভাবে গৃহদীপ হয়ে উঠতেন, তাবাশঙ্কব আপন পবিবাব-বৃত্তেব মধ্য দিয়ে যেন সেই সামাজিক সত্যকে প্রত্যক্ষ কবেছেন। তাঁর বাবাব উৎকেন্দ্রিক জীবনকেও তাঁব মা যে আমূল বূপান্তবিত কবেছিলেন এবং তাঁব সাহচর্যে স্বামী-পুত্র হাবানোর শোকে ক্লিষ্ট পিসীমা ক্রমশ স্থিতধী হলেন —এ যেন গৃহদীপ্তি হিসেবে কথিত নাবী প্রতিমাব নতুন প্রতিষ্ঠা।

তাবাশঙ্কব প্রত্যক্ষভাবে এই ঐতিহ্যেব সাক্ষী ছিলেন বলে তাঁব উপন্যাসে মায়েব এই আদিকল্প ফিবে ফিবে এসেছে। তাঁদেব গ্রামের বাড়িতে যেমন মা নতুন ছাঁদ ও উজ্জ্বলতা নিয়ে এসেছিলেন, তেমনি সমকালীন বাঙালি সমাজে তখন দূবাগতভাবে হলেও নাবীচেতনাব প্রথম আলোক-বেখা ফুটে উঠছিল। তাবাশঙ্কবেব দ্রষ্টাচক্ষুতে মাতৃঅস্তিত্বেব এই মহিমময় প্রতিষ্ঠা আসলে সময়েব বাঁক ফেবাবই বিশিষ্ট অভিব্যক্তি। আত্মস্মৃতিকথায় তিনি স্পষ্ট লিখেছেন ঃ 'কাল-পবিবর্তনেব ক্ষণে আমাব মা আমাদেব বাড়িতে পদার্পণ কবে প্রসন্নাশক্তিব মতো কাজ কবেছেন। শুধু বুচিব দিক থেকেই নয়, ভাবেব দিক থেকেও তাঁব মধ্যে তিনি এনেছিলেন নতুন কালকে। আমাব জীবনে মা-ই আমাব সত্যসত্যই ধাবিত্রী, তাঁব মনোভূমিতেই আমাব জীবনেব মূল নিহিত আছে। শুধু সেখান থেকে বসই গ্রহণ কবেনি, তাকে আঁকড়েই দাঁড়িয়ে আছে' (পৃঃ ১৪)। এভাবে আত্মস্মৃতিকথায় তাবাশঙ্কবেব সৃজন-প্রক্রিয়াব নন্দন ও দর্শন ব্যক্ত হয়েছে। ফলে তাঁব মায়েব ছবিও ব্যক্তিগত স্মৃতিচাবণ হয়ে ওঠেনি। আজকেব অর্থে নাবীচেতনাব প্রকাশ তাতে দেখিনা। নাবীপ্রতিমাব ঐতিহ্য আধিপত্য প্রবণ পিতৃতান্ত্রিক পবিসবকে খানিকটা আড়াল কবে দিয়েছে। প্রাক্‌-আধুনিক সমাজে নাবী সাধাবণত বক্ষণশীলতাব চক্রব্যূহ হয়ে থাকেন, একথা ঠিক, কিন্তু বহতাকালেব অনিবার্য দাবিতে সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও নাবী কিভাবে আত্মশক্তি ও লাবণ্যেব অধিকারিণী হয়ে ওঠেন, তাবাশঙ্কব তা লক্ষ করেছিলেন। নতুন সংবেদনাব অভিব্যক্তিতে তাঁব আত্মস্মৃতি কথাব নারী প্রতিমাব মতো বিভিন্ন উপন্যাসেব নাবী-অস্তিত্বও নিছক প্রান্তিকায়িত হয়ে থাকেনি।

তারাশংকরের নজরে পড়েছিল মায়ের জীবনজোড়া প্রসন্ন বিপন্নতা, গার্হস্থ্য জীবনের ব্যস্ততা সত্ত্বেও সাহিত্য-পাঠের আশ্চর্য উদ্যম, অসাধারণ সাহস ও স্থৈর্য্য। এছাড়া তারাশংকর তাঁর মায়ের কাছেই কথকতার প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। অসামান্য গল্প-বলিয়ে তারাশংকরের মায়ের গল্পের ভাঁড়ার ছিল অফুরন্ত, ছিল গভীর স্বদেশানুরাগ। তারাশঙ্করের কথন বিশ্বে এই তিনটে উপকরণ আরো সংহত হয়েছে। তিনি নিজেই জানিয়েছেন ধাত্রী-দেবতার মায়ের সঙ্গে তাঁর মায়ের খানিকটা সাদৃশ্য আছে। তেমনি তারাশংকর তাঁর পিসীমাকেও ধাত্রীদেবতা বলে বর্ণনা করেছেন। আপন পারিবারিক বৃত্তে তারাশংকর যেন বিন্দুতে সিন্ধু দর্শন করেছেন। আগেই লিখেছি, লাভপুর গ্রাম তাঁর কাছে কার্যত ঐ বৃত্তেরই স্বাভাবিক বিস্তার হয়ে উঠেছিল।

॥ ছয় ॥

ফেলে আসা দিনগুলির সানুপুঙ্খ বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি স্পষ্টতই ধর্মাশ্রয়ী সেকালকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। এই প্রবণতা তাঁর ঔপন্যাসিক বিশ্ববীক্ষাকে সুনির্দিষ্ট পরিসীমায় বেঁধে দিয়েছে। সামাজিক রূপান্তরের সন্ধিক্ষণে যত বিচিত্র ধরণের ও জীবিকার মানুষজন তারাশংকরের নজরে পড়েছিল, ধর্মীয় বাস্তবতা সংশ্লিষ্ট নৈতিকতা কোনো না-কোনো ভাবে তাদের সঙ্গে যুক্ত। আপন চিত্তবৃত্তি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি সরাসরি জানিয়েছেন, রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে দ্রোহাত্মক মনোভাবেও ধর্মীয় সংবেদনা তাঁর মধ্যে সক্রিয় ছিলঃ 'প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছি, এরই মধ্যে হবে আমার জীবনের সার্থকতম বিকাশ। অপর প্রভাব এই দেবভক্তিই বলি, আধ্যাত্মি-কতাই বলি, নীতিবাদই বলি তার প্রভাব। একটি গভীর অজ্ঞাত অনুশাসন আমি অনুভব করি, মানব-হৃদয়ের এই অনুশাসনের একটি বেদনাময় আকুতি আমার আছে। এ দুর্বলতা হলে আমি দুর্বল! পরাজয় হলে আমি পরাজিত' (পৃঃ ৩১)। এভাবে তারাশংকরের মনন মূলত প্রাক্-আধুনিক চেতনায় দৃঢ়-প্রোথিত হয়ে থাকে। দ্বন্দ্ববিধুর জীবন সম্পর্কে প্রশ্নময় মানসিকতা তাঁকে প্রকৃত আধুনিকতার উপকূলে নিয়ে যায় না। উপন্যাসের নিয়ামক বৈশিষ্ট্য হিসেবে আজ আমরা দ্বিবাচনিকতার কথা বলি, কিন্তু তাঁর কথনবিশ্বে কাল ও পরিসর শেষ পর্যন্ত এক বাচনিক চরিত্র অর্জন

করে। আত্মস্মৃতিকথা প্রমাণ করে, এর উৎস ছিল তাঁর নির্দ্বন্দ্ব বিশ্বাসের জগতে, যেখানে প্রশ্ন নেই কোনো—আছে শুধু আনুগত্য। তাই ঔপন্যাসিকের অন্দরমহল জুড়ে থাকে কল্পলোকের কথকতা। যেমন স্বর্ণ-ডাইনীর বৃত্তান্তে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধার একাকিত্ব প্রসঙ্গক্রমে এলেও প্রাক্ আধুনিক বিশ্বাসের মূল ভিত্তি অশিথিল রয়ে যায়। শিউলিতলার ব্রহ্মদৈত্যকে তারাশংকর প্রশ্নহীনভাবে তুলে ধরেছেন ঃ 'ইনি ক্বচিৎ কদাচিৎ দেখা দেন। দেখা দেন কালপুরুষের মতো। তিনি দেখা দিলেই বুঝতে হবে, আমাদের কয়েক বাড়ির মধ্যে কারুর ডাক পড়েছে' (পৃঃ ৫১)। কোনো গোপন শ্লেষও যেহেতু বয়ানে অনুরণিত হয় না, তারাশংকরে লোকায়ত ভুবন জুড়ে দেখি শুধু যথাপ্রাপ্ত বিশ্বাসের নির্বাধ বিস্তার। 'ডাইন-ডাকিনী ভূত-প্রেত-সমাকুল আমার সে-কাল। বেদে সাপুড়ে পটুয়া দরবেশ তখন দেশে প্রচুর। প্রতিদিনই এদের কারুর-না-কারুর বা কোনো-দলের-না কোনো-দলের সঙ্গে দেখা হতই। আমার সাহিত্যিক জীবনে এরা দল বেঁধে ভিড় করে এসেছে ঠিক এই কারনেই'। (পৃঃ ৫১—৫২)।

প্রসঙ্গত 'ডাইনীর বাঁশি' গল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের কথা বলেছেন তারাশংকর। স্বর্ণ ডাইনীকে তিনি নিজের চোখে দেখেছিলেন, তাই গল্পে তাঁর দৃষ্টির প্রত্যক্ষতা ব্যক্ত হয়েছে। লেখক আরো জানিয়েছেন ঃ 'মায়ের শিক্ষা এবং বাবার গম্ভীর ও গভীর তত্ত্বসন্ধানের আকুতি থেকে আমি পেয়েছিলাম আমার পথ।' (পৃঃ ৫২) কল্লোলীয় আধুনিকদের মতো ইংরেজী বই পড়ার সূত্রে তিনি প্রেরণা সঞ্চয় করেন নি, চারপাশের জীবন থেকে অজস্র ধারায় উৎসারিত অনুপুঙ্খই মূলত তাঁর লিখনবিশ্বের প্রতিষ্ঠাভূমি! পরে 'আমার সাহিত্য জীবন' বইতে তারাশংকর বারবার জানিয়েছেন, তাঁর বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাসের পাত্রপাত্রীরা গ্রামীণ পৌর সমাজে প্রত্যক্ষত বর্তমান ছিল। দৃষ্টির এই প্রত্যক্ষতা তাঁর উপন্যাসবীক্ষার বস্তুগত ভিত্তিকে স্পষ্ট করে তুললেও এ আবার তাঁর সংকটেরও কারণ। অসামান্য গল্প-বলিয়ে ছিলেন বলে আমাদের নজরে পড়ে না, বহুক্ষেত্রে তাঁর বাস্তবানুসারী কল্পনা প্রয়োজনের সময়ও আকাশ বিহারী হয় না। তাঁর কাল ও পরিসর সংশ্লিষ্ট যাবতীয় ভাবনা ব্যক্ত হয় কেবল আপন সামাজিক বর্গের পরিচিত গণ্ডীতে যেখানে প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সঞ্চালন অবাধিত। কিন্তু সার্থক লেখক আপন বর্গের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও অপর আয়তন গুলিতে দৃষ্টিপাত করবেন, এটাই

প্রত্যাশিত। বিশ্ব সাহিত্যের আঙিনায় তাঁদেরই আমরা কালজয়ী হতে দেখি, যাঁদের উচ্চারণ নির্দিষ্ট বর্গায়তনে সীমিত নয়। দান্তে, শেক্সপীয়র, বালজাক, ডস্টয়েভস্কির মতো স্রষ্টা এর সার্থকতম দৃষ্টান্ত। বাস্তবনিষ্ঠা প্রতিবেদনের নির্মিতি-বিজ্ঞানে প্রাথমিকভাবে সহায়ক হলেও শেষপর্যন্ত সৃষ্টি-কল্পনাই কেবল সম্ভাবনার ক্ষেত্রকে কর্ষণ করতে পারে এবং যথাপ্রাপ্ত সীমারেখাগুলি চূর্ণ করে মুক্তির প্রসারতা এনে দিতে পারে। সাম্প্রতিক সমালোচক গিযর্গি মার্কাস 'A society of culture : the Constitution of modernity নিবন্ধে (১৯৯৪ : ১৭) লিখেছেন, আধুনিক চেতনা ঐতিহ্যানুগত্যের প্রতিস্পর্ধী—'which cannot keep up with the relentless force of historically progressing time. By announcing itself to be modern, the age located its essence in its ability to be always up-to-date, to be abreast of the times, where time is conceived of not as the inertial power of erosion, but as the creative force of change, which can be missed or harnessed for human ends !'

তারাশঙ্কর, তাঁর দৃষ্টির প্রত্যক্ষতা ও লোকজীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও, ঠিক এখানেই কল্পনাকে সঞ্চরণশীল সময়ের অনুভবে সম্পৃক্ত করতে ব্যর্থ হলেন। খণ্ডকাল থেকে এগিয়ে যেতে পারলেন না। যতক্ষণ গ্রামীণ পৌর সমাজের ঐতিহ্যমূল বয়ানে দৃষ্টির প্রত্যক্ষতাকে ব্যবহার করতে পেরেছেন, ততক্ষণ তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু যখনই তিনি নাগরিক আবহ ও আধুনিক জীবন-ভাবনায় মনোযোগী হতে চেয়েছেন, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে তাঁর অস্বাচ্ছন্দ্য পদে পদে ধরা পড়েছে। ঐতিহাসিকভাবে নিয়ন্ত্রিত গতিশীল সময়ের তীব্র জটিল আবর্তকে তারাশঙ্কর সনাক্ত করতে পারেননি। গল্প বলার শক্তি দিয়ে অন্তর্নিহিত দুর্বলতাকে ঢেকে রাখতে পারেননি তিনি। কাল ও পরিসরের বহুমাত্রিক দ্বিবাচনিকতা এই নতুন চারণভূমিতে তাঁর কাছে অধরাই থেকে গেছে।

তবু, মায়ের গল্প-বলা প্রসঙ্গে, তারাশঙ্কর যখন কথকের চেয়ে গ্রহীতা-শ্রোতার বেশি গুরুত্বের কথা লেখেন—তাঁর উপলব্ধি আজকের পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদের মর্মসত্যকে মনে করিয়ে দেয়। তারাশঙ্করের মা বলতেন 'আমি বলতাম বানিয়ে। কিন্তু তুমি সত্যি, আর গল্প সত্যি। কথনবিশ্ব স্বাধীন ও

সার্বভৌম অস্তিত্ব নিয়ে লেখক থেকে স্বতন্ত্র হয়ে যায় বলেই কাল ও পরিসরের সৃষ্টিশীল পুনর্নির্মাণে দৃষ্টির প্রত্যক্ষতা খুব বড়ো হয়ে ওঠে না। আসলে পূর্বগত ধারণার পিঞ্জর বর্গবিভাজিত বাস্তবতায় সমর্থন পেয়ে যায়, কল্পনা তাই হয়ে ওঠে মূলত পিঞ্জরমুক্তির মাধ্যম। কথা-গ্রন্থনার মধ্য দিয়ে জেগে ওঠা অনুবিশ্ব এবং পাঠকের দর্পণে প্রতিফলিত ঐ বিশ্বের পুনর্গৃহীত রূপই প্রকৃত সত্য। পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত ও যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের প্রতি অতিমান্যতা নিঃসন্দেহে সৃষ্টিচেতনার প্রতিকূল। মার্কসের আরো-একটি মন্তব্য স্মরণ করতে পারি এখানে, 'Artistic creativity is rooted in the emancipation of productive imagination precisely from the constraints of understanding and its pre-given concepts' (তদেব২১) তারাশঙ্করের আত্মকথা তাঁর ঘনিষ্ঠ বৃত্তটিকে দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে তুলেছে। প্রদীপ জ্বালানোর চেয়ে সলতে পাকানোর পর্বটি নিঃসন্দেহে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাই। আজ আমাদের কাছে অতি নাটকীয় মনে হয় জীবন-মৃত্যু-রহস্য অপার্থিবতার ঠাস বুনটে। কিন্তু তারাশঙ্করের স্মৃতিতে বিশ্বাস ও বাস্তব এমনভাবে অন্যোন্যসম্পৃক্ত যে এদের আলাদা করে দেখা অসম্ভব। আবার তিনি সচেতন ভাবে এর মধ্যে দার্শনিক দ্যুতিও খুঁজে নিয়েছেন বলে তাঁর মনের অবসংগঠনটি স্পষ্ট। প্রসঙ্গত রবীন্দ্রনাথের কথা উত্থাপন করে নিজের ভাবাদর্শগত অবস্থানকে সমর্থনও জানিয়েছেন যেন: 'এই আমার কালের প্রথম জীবনের সেকাল। সেকালের এই রূপ। দেশে নতুন কাল তখন এসেছে, এসেছে কলকাতায়, এসেছে তার আশেপাশের জেলায়, আমাদের জেলায় বোলপুরের প্রান্তে ভুবনডাঙায় শান্তিনিকেতন আশ্রম স্থাপিত হয়েছে—ওই স্বর্ণের প্রসঙ্গেই বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'আমাদের দেশে কত বিচিত্র ধারা কত বিচিত্র রীতিনীতি, কত বিচিত্র মানুষ, এঁরা তা দেখেন নি, দেখা দূরের কথা কল্পনাও করতে পারেন না। তুমি এদের দেখেছ। আমি কল্পনা করতে পারি, কিন্তু দেখিনি। দেখবার সুযোগ পাই নি, দেখতে দাওনি তোমরা, আমাদের তোমরা পতিত করে রেখেছিলে।' (পৃ ৬৯)।

যে ভাবে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর অবস্থান-গত ভিন্নতা তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর, তাতে বিষয়ীগত দৃষ্টিকোণ ব্যক্ত হয়েছে। 'দেখা' ক্রিয়াপদটির অনুষঙ্গের রয়েছে যে-দর্শন শব্দটি, তাতে চোখের আলোয় চোখের বাহির

দেখা নাকি আপাত আলোকহীনতাব মধ্যেও অন্তরে 'দ্রষ্টা' চক্ষু মেলা দেখা বড়ো হযে উঠছে—এই জিজ্ঞাসা রয়েই যায। রবীন্দ্রনাথ যদি 'তোমবা' বলতে হিন্দু আব 'আমাদেব' বলতে ব্রাহ্মদের কথা বলেও থাকেন—তাঁর বিপুল গভীব লিখনবিশ্ব কিন্তু এর উল্টো সাক্ষ্যই দেয। তবু আত্মস্মৃতি-কথায় তাবাশঙ্করেব এই বয়ান তাঁর মনস্তাত্ত্বিক অবসংগঠনকে চিনিযে দেয। সময় ও পবিসব বিমূর্ত নয়, গ্রহীতার নিজস্ব দর্পণ অনুযাযী তা প্রতিফলিত হযে প্রমাণ কবে, আধেয়কে চিনি আধাব অনুযাযী। আমবা মানুষেবাই তো নিজেদের শক্তি ও দুর্বলতা, রুদ্ধতা ও সম্ভাবনা দিযে সামাজিক সমযকে গড়ে তুলি। আমরা লক্ষ করলাম, আত্মস্মৃতিতে পুবোনো ও নতুনের বহুমুখী দ্বন্দ্বের কথা যে ভাবে জানিযেছে তাবাশঙ্কর, তাঁর রচনাসম্ভাব পাঠের পক্ষে তা চাবিকাঠি। এবং এই জন্যেই, আত্মকথা তাঁর মনোজগতের প্রবেশক। তাবাশঙ্করেব নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য নিবিড় পাঠ দাবি করে 'একদিকে ছিল ক্ষোভ থেকে উদ্ভূত উপেক্ষা। অন্যদিকে ছিল পীড়িতচক্ষু মানুষের আলোক ভীতিব মতো বেদনাদায়ক বর্জনপ্রবৃত্তি। একটা নদীর মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড চড়া, চড়াব দুধারে বয়ে যাচ্ছে দুটি স্রোত। একটির সম্মুখে পথের সন্ধান নাই, অপরের সম্মুখে পথের সন্ধান এবং জীবনের গতি। কিন্তু দুটি একত্রিত না হলে জলস্রোতে সে বেগ সঞ্চারিত হবে না সে বেগে সম্মুখের সে ভূমিতলে পথেব দিশা আছে, সে ভূমিতলকে কেটে আপন গর্ভপথে পরিণত কবে তাবই বুক বেয়ে ঠেলে যেতে পারবে জীবনস্রোত সাগরাভিমুখে।' (তদেব)

॥ সাত ॥

তবু, স্থিতিব কথাতেই তারাশঙ্কর চারুবাক, গতিব কথায অস্পষ্ট। মনে হয যেন স্বভূমিব বাইবে অনিশ্চিত পদক্ষেপ কবছেন। ফলে স্থিতি ও গতি একত্রিত হযে যে বেগ সঞ্চারিত হওয়ার কথা ছিল—তাঁব কথনবিশ্বে সেই দৃষ্টান্ত অপেক্ষিতই বযে গেছে। 'সম্মুখেব ভূমিতলে পথেব দিশা' কিংবা সাগবাভিমুখী জীবনস্রোতেব হদিশ আমবা পাই না। সামাজিক সময যখন দ্রুত আবর্তের পব আবর্ত তৈবি কবে চলেছে, ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর তখনও চিন্তন-অভ্যাসের নিগড ভেঙে নতুনেব কুলপ্লাবী উচ্ছাসে বিশ্লেষণ কবার কৃৎকৌশল আবিষ্কার কবতে পাবেন নি। পরিচিত ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক জগতে

যাবা অন্তেবাসী, অস্পৃশ্য বলে লাঞ্ছিত এবং যাদেব ঘবের মেযেবা নির্বিচাবে ভোগ্য—তাবাশঙ্কব স্মৃতিকথায তাদের প্রসঙ্গত উত্থাপন কবেছেন। কিন্তু আপন শ্রেণীঅবস্থানেব দূবত্ব থেকে বর্ষিত মানবিক করুণা নির্যাতিত লাঞ্ছিত-জনদের কোনো কাজে লাগছে কিনা, এ বিষযে প্রখব সচেতনতা ব্যক্ত হতে দেখি না। তাবাশঙ্কবের ঔপন্যাসিক সত্তা কিভাবে আত্মকথায নীলাঞ্জন ছাযা ছডিযে দিযেছে এব বহু প্রমাণেব মধ্যে দুটি উল্লেখ কবছি। এদেব বিশ্লেষণ কবে আমবা তাঁব সাহিত্য জীবনেব বাদী সুবকে সনাক্ত করতে পাবি, 'দোষে গুণে সেকাল এক জীর্ণমূল বনস্পতিব মতো। বিস্তীর্ণ শাখায় শাখায ঘন পত্রপল্লবে পল্লবে ছাযা বিস্তাব কবে বিবাজিত ছিল। তার সর্ব অঙ্গে জীর্ণতা বহু বজ্রপাতে বহু কোটবেব সৃষ্টি হযেছে, বহু শাখা ভেঙে গেছে, ভগ্ন শাখাব চিহ্নগুলি মহাযোদ্ধাব অঙ্গেব ক্ষতচিহ্নেব মতো সম্ভ্রম জাগাত। আব জীর্ণমূল বনস্পতি ঝডেব অপেক্ষা কবেছে আকাশেব দিগন্তে দিকে চেযে। কখন আসবে ঝড ? ভেঙে পডবে সে, তাব আত্মা সেই ঝড়ে মহাকালেব মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। মাটিব তলায নূতন কালেব বীজ তখন ফেটেছে, অঙ্কুব-উঠেছে। ওই বনস্পতিরই ঝরে পডা বীজেব অঙ্কুব তারই গোডায সে জন্মাচ্ছে। ঝডে চাবিদিক বিপর্যস্ত হবে, মাটি নতুন হবে, অতীত কালের বনস্পতি ধবাশাযী হলে আকাশ পথ কববে উন্মুক্ত, সেই পথে নূতন কালের অঙ্কুবেব আলোক সাধনা হবে শুরু (পৃ ৮০)।

বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালি জাতীযতাবাদেব সাধনাকে তারাশঙ্কব নতুন কালেব অভিবাসন হিসেবে চিহ্নিত কবেছিলেন। কিন্তু পৌবজীবনেব রূপান্তবকে তিনি ভাববাদী দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা কবেছেন বলে ইতিহাসেব সামূহিক উচ্চাবণে ব্যক্তি-অস্তিত্বেব একক উচ্চারণ কতটা অন্বিত বা অনন্বিত হচ্ছে তা তিনি পুবোপুরি উপলব্ধি কবেননি। 'কালবৈশাখী ঝডেব মতো' এসে নতুন কালে কিভাবে 'সৃষ্টি সমাবোহে চঞ্চল' (পৃ ৯৩) কবে তুলছে পবিপার্শ্বকে তা লক্ষ করেও তাবাশঙ্কর তাই উপন্যাসে খণ্ডিত দৃষ্টিব নিদর্শনই তুলে ধবেছেন। তিনি ভুলে গিযেছিলেন, বিন্দুতে সিন্ধু দেখা গেলেও কোন একটি বিন্দুতে সীমিত থাকতে নেই, নইলে নিজস্ব বর্গের বীক্ষাই কেবল মহিমান্বিত হবে। 'আমাব কালের কথাব উপসংহারে যেন নিজেব সৃষ্টিলোক সম্পর্কে ভবতবাক্য উচ্চাবণ কবেছেন তারাশঙ্কব 'আমাব জীবনে আমাব কাল সাক্ষাৎ অর্ধনারীশ্বব মূর্তিতে প্রকটিত। তাই আমাঁর সেকাল আর একালের মধ্যে

কোনো দ্বন্দ্ব নাই। চিবকল্যাণেব একটি ধাবা তার মধ্যে আমি দেখতে পাই। কোনো কালে ও পাবে ফুটেছে ফুল—কোনোকালে এপাবে ফুটেছে ফুল। আমি সকল কালের সকল ফুলেব মালা গেঁথেই পবাতে চাই মহাকালেব গলায়।' (পৃ ১২৩) এই উচ্চাবণে নির্ধাবিত তাবাশংকবেব কথন বিশ্বের মেলে পবাপাঠ। কৈশোব স্মৃতি এবং সাহিত্য জীবনের বয়ানে তিনি অন্দব-মহল সম্পর্কে যত তথ্য দিন না কেন ঐ পরাপাঠ অটুট থেকেছে। নির্দ্বন্দ্ব প্রতিবেদন সাধকেব হতে পাবে, সাহিত্যিকের নয়। কাল ও পবিসবেব সম্পর্ক বহুবৈখিক এবং দ্বিবাচনিক একথা স্পষ্ট না হলে উপন্যাস নামক শিল্প মাধ্যম অনিকেত হয়ে পড়ে। আপাতসময়ের অন্তবর্তী প্রকৃত সময় আবিষ্কাব না কবলে শৈল্পিক পবিসব ও অপ্রতিষ্ঠ হতে বাধ্য। আত্মস্মৃতি কথাব নিবিড় পাঠ যেমন তাবাশংকবেব চাবণভূমিকে চিহ্নিত কবে, তেমনি তাঁর দর্শন ও নন্দনেব স্বভাবেব প্রতিও তর্জনি সংকেত করে। আমবা বুঝে নিই, কেন হেলাম ন্‌নোহেবাট্‌নি জোব দিয়ে লিখেছিলেন ঃ 'It is necessary to discover and to shape it (the socially perceptible time) as a repeatable moment which fluctuates to and fro between social chaos and social order, between the self of proper time and the time of society' (১৯৯১, ১৫৭)

বর্তমানকে চেনাব জন্যে না হোক যে সময় ও পবিসবকে পেরিয়ে এসেছি, তাব গোধূলিবৰ্ত্তিম প্রতিবেদনকে অনুভব কবাব জন্য স্মৃতিব বয়ান পুনঃপাঠ কবব আমবা। আব যাই হোক, দর্পণ অন্তত মিথ্যা মায়া প্রসাবিত কবে না। তাবাশংকবেব আত্মপ্রতিবিম্ব এই জন্যে আমাদেব সাংস্কৃতিক ইতিহাসেব অপবিহার্য অঙ্গ হিসেবে শ্লাঘ্য। সাগর থেকে কিবে আসা আব সাগরে পাড়ি দেওয়ার মুহূর্তে বন্দরেব নৌকো যেমন অর্ণবপোতকে দিশা দেখায়, তেমনি তাবাশংকবেব আত্মকথা তাঁব চেতনাবিশ্বে প্রবেশ কবায় ও ঔপন্যাসিক সত্তা থেকে নিষ্ক্রমণেব দিক নির্দেশ করছে আমাদেব।

—০—

তারাশঙ্করের সাহিত্য ঃ বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাস

পরমেশ আচার্য

"An art whose medium is language will always exhibit a high degree of critical creativeness, for language itself is a criticism of life, it names, it defines, it hits the mark, it passes judgement, and all by making things alive."

Thomas Mann

১

তাত্ত্বিক ও শিল্প সমালোচকদেব অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায সত্ত্বেও শিল্প, সাহিত্যে কখন কিভাবে সৌন্দর্য সংক্রান্তি ঘটে তা আমাদেব আজো অজানা। একথা হয়ত ঠিক যে নন্দন, নীতি ও নৈতিকতা বা ধর্ম বিষযে আলোচনার কোন ব্যক্তিনিবপেক্ষ বিষযগত (objective) এবং সর্বজনগ্রাহ্য নির্বিখ নেই। এ সব বিষযেব বিচাবে ব্যক্তিগত বোধ, বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতাই বুঝি শেষ কথা। ব্যক্তিবিশ্বাসের অতীত কোন যুক্তিগ্রাহ্য মানদণ্ড না থাকায শ্রেষ্ঠ শিল্প, শিল্পী, সাহিত্য ও সাহিত্যিকেব অন্বেষণ এক হিসেবে পণ্ডশ্রম মাত্র। এ ধরনের যুক্তিব অবতারণা অবশ্য আর এক ধবনেব নৈবাজ্যবাদী প্রবণতাকে প্রশ্রয দেয়। তবে শুদ্ধ নন্দনেব বিচাব আমাদেব অন্বেষাব পথকে খুব একটা আলোকিত কবে না। আবাব দার্শনিক ও তাত্ত্বিকদের অন্বেষার গুরুত্ব স্বীকার কবেও বলা যায ভাষায জীবনেব ছবি যখন জীবন্ত হযে উঠে তখন পাঠক আমবা আপ্লুত বোধ কবি। আব এই বোধেব আনন্দেই সেই সাহিত্যকে বসঋদ্ধ বলে মনে কবি।

জিজ্ঞাসু পাঠক বসসিক্ত হযেও জীবনেব সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা নিয়ে ভাবিত হতে পাবেন। আব এই জিজ্ঞাসা থেকেই কথাসাহিত্যেব বিভিন্ন ধাবাব তাৎপর্য ও গুরুত্ব আলোচনাব প্রযোজন দেখা দেয। জীবনকে সমাজেব অন্তর্গত এবং বিভিন্ন সামাজিক শক্তিব গতি-প্রক্রিয়া বা ঘাত-প্রতিঘাতেব সমগ্রতায়ও দেখা

যেতে পারে। আবার কেউ কেউ সমাজ বিচ্ছিন্ন একা-এভাবেও দেখতে পাবেন। যদিও সম্পূর্ণ সামাজিক প্রভাবমুক্ত কোন ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্ব কতটা বাস্তব সে বিষয়ে সন্দেহ থাকতে পারে। কেউ হয়ত সমাজের পটভূমিতে সামাজিক শক্তির হাতের পুতুল হিসেবেও জীবনকে দেখতে পাবেন। ব্যক্তির মানসলোকের গভীরে অন্বেষণ করতে পারেন কোন সাহিত্যিক, কোন অজানা রহস্য। হয়ত আরো অনেকরকম দৃষ্টিভঙ্গির কথাও বলা যায়। তবে কথাসাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায় তিনটি ধারা বিশেষ বেগবান। একদিকে ডিকেন্স, বালজাক, টলস্টয় ও টমাস মানের ধ্রুপদী সাহিত্যের ধারা, আর প্রায় বিপরীতে জয়েস, প্রুস্ত প্রভৃতির ব্যক্তিক চেতনা প্রবাহের রোমাণ্টিক ধারা। আর এই দুই ধারার মাঝামাঝি রাখা যায় বুঝি ডস্টয়ভস্কি, কাফকা হয়ত কামুরও সাহিত্য। প্রথম ধারার সাহিত্য অনেকটাই মহাকাব্যের সঙ্গে নিকট সম্পর্কিত। যা সাধারণভাবে এপিকধর্মী বলে পরিচিত। সমাজের গতি-প্রক্রিয়ার বা সামাজিক শক্তির টানা-পোড়েনের ব্যাপক সমগ্রতায় ব্যক্তি মানুষের অর্থবহ অবস্থান এবং অংশগ্রহণের আলোকে ব্যক্তির সামাজিক সত্তার বিচিত্র প্রকাশে এই মহাকাব্য ধারার সাহিত্য পাঠককে এক সমগ্রতার বোধে ঋদ্ধ ও স্নিগ্ধ করে। এ ধারার সাহিত্যে ব্যক্তির সামাজিক সত্তা ও ব্যক্তিসত্তার বিরোধাভাস কখনো লক্ষিত হলেও কোন আত্যন্তিক বিরোধ কল্পিত হয় না। এ কথা বিশেষ করে সত্য যে ভারতীয় গ্রামসমাজ এই সাহিত্যের উপজীব্য। কারণ এটাই বাস্তব। অন্যদিকে সমাজ বিচ্ছিন্ন একক ব্যক্তির মননের গভীর ভাবব্যঞ্জনায় দ্বিতীয় ধারার সাহিত্য অনুরণিত। এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক সত্তার এক আত্যন্তিক বিরোধ পরিকল্পিত হয়। তৃতীয় ধারায় সামাজিক অবক্ষয়ের প্রেক্ষিতে চরিত্রের জটিলতর উদ্ভাসনে আমাদের বোধে আর এক মাত্রা যোগ হয়। ব্যক্তির সামাজিক সত্তার চেয়ে ব্যক্তি সত্তাই প্রাধান্য পায় এক্ষেত্রে। অবশ্য এই বিভিন্ন ধারাকে সম্পূর্ণ রাজা-প্রজার ভিন্নতা বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয়। এক ধারার কিছু লক্ষণ অন্য ধারার সাহিত্যেও লক্ষ্য করা যেতে পারে। যাইহোক, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রথম ধারার লেখক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সে হিসেবে সামাজিক সত্তার সাহিত্যিক রূপায়ণের নিরিখেই তার মূল্যায়ন যুক্তিযুক্ত।

বিভিন্ন সিদ্ধলেখক নিজস্ব ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে জীবনের ছবি আঁকেন। পাঠকও তেমনি তার পছন্দের দৃষ্টিভঙ্গিতে এইসব সাহিত্যের ভিন্ন

মূল্যায়ন করবেন এটাই স্বাভাবিক। আবার এক ধরনের পাঠক আছেন যারা সিদ্ধাইকে অন্য নিরপেক্ষ মাপকাঠি ধরে নিয়ে সাহিত্যের মূল্যায়নে দৃষ্টি-ভঙ্গির ভিন্নতার গুরুত্ব অস্বীকার করতে চান বা এড়িয়ে যান। এরা সাধারণত ব্যক্তিসত্তার সংকটের সাহিত্যিক রূপায়ণের নিরিখেই সাহিত্য বিচার করেন। কিন্তু এরা যখন সিদ্ধাইয়ের দোহাই দিয়ে ভালো খারাপ বা শ্রেষ্ঠত্বের তকমা আঁটেন আসলে নিজের পছন্দের দৃষ্টিভঙ্গির সাহিত্য ও সাহিত্যিকের পিঠে, তখন বাঁধে গণ্ডগোল। আসলে কথাসাহিত্যের মূল্যায়নে সমাজের গতীয়তা (dynamics) ও সামাজিক সম্পর্কের প্রাসঙ্গিকতা এড়িয়ে যাওয়ার অর্থ এক ধরনের আত্মপ্রবঞ্চনা। এমনকি ব্যক্তিসত্তার সংকটের সাহিত্যিক রূপায়ণেও সামাজিক সম্পর্কের প্রেক্ষাপট উপেক্ষা করা যায় না। তাছাড়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনাভ্যাসের চারিত্রিক ভিন্নতাও সাহিত্য মূল্যায়নে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দাবী করতে পারে।১ পাশ্চাত্য জীবনাভ্যাসের প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা, প্রাচ্য জীবনাভ্যাসের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যূথবদ্ধতা, একথা মেনে নিলে সাহিত্য মূল্যায়নের নিরিখও ভিন্ন হতে বাধ্য। ভারতীয় গ্রামসভ্যতার সঙ্গে ইউরোপীয় নগর সভ্যতার প্রভেদ জীবনচর্চা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে পরিস্ফুট। সাহিত্যেও এই অন্যতা প্রতিফলিত হতে বাধ্য। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তার মতে, 'শেক্স্পিয়র-এর নাটকে (যেমন তাহার 'কিঙ্-লিয়ার', 'হ্যামলেট্', 'ম্যাক্বেথ', 'জুলিয়াস সীজার' প্রভৃতিতে) যে অসাধারণ মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে তাহার নাটকীয় পাত্র-পাত্রী চরিত্রের প্রকাশন হইতেছে দেখা যায়, সেই ধরনের সাময়িক দ্বন্দ্ব বা বিক্ষোভ তারাশঙ্করের সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে নাই—কারণ তারাশঙ্কর এবং শেক্স্পিয়র, এই দুই জনের সামাজিক পারিপার্শ্বিক এবং মানসিক উপকরণ ও বাতাবরণ সম্পূর্ণ পৃথক।'২ উপন্যাসের মূল্যায়নে সামাজিক সম্পর্কের প্রাসঙ্গিকতা মেনে নিলে বা সামাজিক সত্তার সাহিত্যিক রূপায়ণের নিরিখে বিচার করলে বলতেই হয় বাংলা কথাসাহিত্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সবচাইতে তাৎপর্যপূর্ণ ও রসঋদ্ধ লেখক। অসীম রায় যথার্থই বলেছেন, তারাশঙ্কর 'তার সময়ের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক'।৩ এ গোত্রে, তিনি আজো অদ্বিতীয়।

অথচ বিষণ্ণচিত্তে একথা মানতেই হয়, তথাকথিত 'সমাজসচেতন' বুদ্ধি-

জীবী ও সাহিত্যরসিক ব্যক্তিরা কালান্তরের ঋজুদর্শী কথক তারাশঙ্করের মূল্যায়নে শুধু অপারঙ্গম নয় অনুচিত অনিষ্ঠা প্রদর্শনেও কুণ্ঠিত হননি একদিন। একথা হয়ত সঙ্গতভাবেই বলা যায়, মুখে যাই বলুন, বাংলার প্রগতিবাদী সাহিত্যরসিকদের অনেকের মানসিক গড়নে সামাজিক টানা-পোড়েনের বিতথাপ্রসূত যে রসসৃষ্টি তার চাইতে আত্মকেন্দ্রিক মননবিলাসের রূপকর্মের প্রতি অনুরাগ প্রবল। সমাজবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিকেন্দ্রিক চরিত্রের একাকিত্বের আত্মরতির মননবিলাস, যাকে অনেক সময় 'আত্মিক সংকট' বলে গৌরবান্বিত করা হয়, অথবা যৌন আবেগে বিপর্যস্ত ব্যক্তিসত্তার রোমান্টিক চেতনাপ্রবাহে সিক্ত সাহিত্য, এদের অনেকের কাছে 'স্নবারীর' গরিমায় মহান। এদের সাহিত্যবোধের প্রতি কটাক্ষ না করেও বলা যায় 'বাংলার মুখ দেখিতে হইলে' তারাশঙ্করের সাহিত্য পাঠ অপরিহার্য। সমাজের গতি-প্রক্রিয়ায় শ্রেণী, গোষ্ঠী ও ব্যক্তির অনেকান্ত সম্পর্ক, কর্ম, অনুভূতি ও চিন্তা-চেতনার নানা জটীল ও সবল বিন্যাসের ভাষা প্রকাশেই তারাশঙ্করের সৌন্দর্য সংক্রান্তি। সমাজের সজীব সত্তার নিরাবেগ অথচ সহানুভূতিস্নিগ্ধ ভাষাচিত্র অঙ্কনে তারাশঙ্কর সিদ্ধহস্ত এ বিষয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। এমনকি অপেক্ষাকৃত দুর্বল রচনাতেও তার এই মুন্সীয়ানার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

২

প্রায় ছাব্বিশ বছর আগে অসীম রায় 'তারাশঙ্কর প্রসঙ্গে' এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'বোধহয় বিশবছর আগে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের এক সভায় জনৈক লেখক বলেছিলেন, তারাশঙ্কর মোটা তুলির কাজ করেন, এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ সরু তুলির। তারাশঙ্করের সভাকক্ষ ত্যাগ চোখে পড়েছিল অনেকের।' তারপর অসীম রায় প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'সেই রোদে পোড়া তামাটে 'সাঁওতালি' যুবক যিনি আজীবন বাস্তবিক মোটা তুলিতে কাজ করে এসেছেন তিনি কেন তাঁর সময়ের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক তা আজ ভাববার সময়।' কারণ হিসাবে তিনি ভেবেছিলেন, 'গ্রামজীবনের এই মহৎ চারণ প্রথমেই গোড়ায় গলদ থেকে মুক্ত। তার গ্রাম শহর ফেরতা সৌখীন যুবকের বিচরণের আশ্রয়ভূমি নয়, শ্যামল কোমল জলে ভরা কাঁদো কাঁদো সিচুয়েশনের সমষ্টি নয়। তার গ্রাম প্রকৃতই গ্রাম যেখানে গ্রামের বেশীর ভাগ

মানুষ বাস কবে। এই কামাব-কুমোব-চাষী-বেদে-বেদেনীব গ্রাম আমবা আগে বাংলা সাহিত্যে দেখিনি। এবং এই দেখা তিনি বেঁধেছেন এক অখণ্ড জীবন বোধে। আমাদেব শতাব্দীব সবচেয়ে বড ঘটনাব অর্থাৎ গ্রামজীবনেব ভাঙ্গনেব এক প্রবল গভীরতায ও নৈপুণ্যে বছবেব পব বছর ধবে যত্নে অধ্যবসাযে বূপ দিযেছেন তাব 'ধাত্রীদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম' 'গণদেবতা' 'কালিন্দী'তে। 'হাঁসুলী-বাঁকেব উপকথায' তো বটেই, এমনকি তার ছোট বই 'কবি'তেও। অন্তত বিশটা ছোট গল্পে তার এই অসামান্য বোধ ও পাবদর্শিতা জলেব মতো স্পষ্ট।'[৪] যাবা বাংলাব গ্রামসমাজের সঙ্গে আন্তবিকভাবে পরিচিত এবং এই সমাজেব গতিপ্রকৃতি বিষযে ওযাকিবহাল তাবা অবশ্যই অসীম রাযেব সঙ্গে এই বিষযে একমত হবেন। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই তাবাশঙ্কবেব পূর্বসূবী শবৎচন্দ্রেব কথা এসে যায। সন্দেহ নেই তাবাশঙ্কব শবৎচন্দ্রের সার্থক উত্তবসূবী। অসীম বাযেব মতে, 'এমনকি যে অর্থে গ্রাম এবং গ্রামজীবনেব ওপব নতুন সংঘাতেব প্রাণবন্তবূপে তাঁব পল্লীচিত্র জীবন্ত সেই জীবনযাত্রাব সচল ভঙ্গিমা শরৎচন্দ্রেও অনুপস্থিত। শরৎচন্দ্রেব পল্লীসমাজেব পল্লী খুবই সীমাবদ্ধ, প্রায় নেই বললেই চলে।'[৫] শবৎচন্দ্রেব এই মূল্যায়নেব সঙ্গে হযত অনেকেই একমত হবেন না। তবে সন্দেহ নেই উত্তবসূবী তারাশঙ্কব পূর্বসূবী শবৎচন্দ্রের সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে অনেক এগিযে গিযেছেন।

তাবাশঙ্কবেব আগে কোন কথাসাহিত্যিক বাংলাব গ্রামজীবনকে এমন সম্পূর্ণভাবে দেখেননি একথা খাঁটি সত্য। শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায লক্ষ্য কবেছিলেন, 'তারাশঙ্কবেব সর্বপ্রধান কৃতিত্ব সমগ্র সমাজ-প্রতিবেশেব চিত্রনে। সমাজচিত্রেব ব্যাপক সমগ্রতা, সমাজনীতিব সূক্ষ্ম, গভীব আলোচনা, চলমান ঘটনা-প্রবাহের সার্থক, ভাবব্যঞ্জনামূলক বর্ণনা, এই সমস্ত লক্ষণ তাহাব বচনাকে উপন্যাস অপেক্ষা মহাকাব্যেব সহিত নিকটতব সম্পর্কান্বিত কবিয়াছে।'[৬] আসলে তাবাশঙ্কব ছিলেন ধ্রুপদী ধাবাব উপন্যাসিক, যে ধাবাব উপন্যাসের মধ্যে মহাকাব্যের লক্ষণ দেখা যায়। এ বিষযে সন্দেহেব কোন অবকাশ নেই যে, তাবাশঙ্কবের উপন্যাসে, বিশেষ কবে ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলীবাঁকেব উপকথা, আবোগ্য নিকেতন এবং কীর্তিহাটের কড়চায়, বাংলাব গ্রামজীবন, তাব প্রকৃতি, সমাজ, মানুষ, মাটি, মাযা, মমতা, ক্ষুদ্রতা, উদাবতা, শোষণ, শাসন, দুঃখ, দুর্দশা, আশা, ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, শিক্ষা, সংস্কাব, সংস্কৃতি, ভাঙ্গন, অবক্ষয় সব মিলিযে এমন

জীবন্ত হয়ে উঠেছে যে তা সার্থক সাহিত্যের দাবী মিটিয়ে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের এক অনন্য দলিল হয়ে উঠেছে। তারাপদ মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলেছিলেন, 'সে বিচারে 'গণদেবতা' এবং 'পঞ্চগ্রাম' একালের বাঙালীর সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ইতিহাসের ভাষ্য।'৭ কিন্তু এ ভাষ্যে সাহিত্যরসের কোন ঘাটতি নেই। আজকে যখন বাংলার গ্রামজীবন প্রায় অস্তমিত তখন ভবিষ্যত প্রজন্ম তারাশঙ্করের উপন্যাসে খুঁজে পাবে অতীত দিনের প্রাণের ছোঁয়া। বাংলার গ্রামজীবনের এমন যথার্থ (**authentic**) জীবন্ত ছবি খুব কম লেখকের লেখায় পাওয়া যায়। তাই সামাজিক গতি-প্রক্রিয়া বা সামাজিক ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে তারাশঙ্কর বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয় এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এখানে উল্লিখিত উপন্যাসের বিস্তারিত আলোচনাকালে আমরা আবার এই প্রসঙ্গে ফিরে আসব। তার আগে তারাশঙ্করের রচনাভঙ্গি সম্পর্কে দু'এক কথা বলে নেওয়া দরকার।

তারাশঙ্করের উপন্যাসের বিষয়বস্তু (**content**) শুধু নয়, তার রচনা-ভঙ্গির (**form**) সঙ্গেও বাংলার গ্রামজীবনের সাংস্কৃতিক আবহের আত্মীয়তা লক্ষ্য করেছিলেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অসীম রায় এবং বিশেষ করে প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'অনেক সময় মনে হয় তারাশঙ্কর ঠিক ঔপন্যাসিক নহেন, তিনি গ্রাম্যজীবনের চারণ কবি।'৮ আসলে সেই প্রগতি লেখকের উক্তি যে 'তারাশঙ্কর মোটা তুলির কাজ করেন,' তার কারণও বোধহয় তার এই দেশজ আঙ্গিকের সঙ্গে আত্মীয়তা। কলকাতার অনেক শেকড় ছেড়া লেখক ও বুদ্ধিজীবীর পক্ষে তার এই রচনাভঙ্গিকে উপভোগ করায় অসুবিধা ছিল। এ প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় একদা লিখে-ছিলেন, 'তারাশঙ্করকে দুই একজন মিত্র একটু গ্রাম্য ভাবাপন্ন, একটু 'সেকেলে' বলিয়াছেন। বোধহয় ইংরেজির পাকাপোক্ত শিক্ষায় তাহার মন পুরোপুরি গড়িয়া উঠে নাই, অন্য বহু কথাকারের তুলনায় বিদেশী ভাবধারা নিশ্চয়ই তাহার মজ্জায়-মজ্জায় প্রবেশ করে নাই। আমার মনে হয়, তাহা তাহার রস-সর্জনার পক্ষে, কৃতিত্বের পক্ষে উপকারক হইয়াছিল।'৯ তারাশঙ্কর যে তার সময়ের কথাসাহিত্যিকদের তুলনায় খাঁটি বাঙ্গালী জীবনের পূর্ণছবি আমাদের দিয়েছেন তাতে সন্দেহ নেই। আর এই খাঁটি বাঙ্গালী জীবনের জীবন্ত ছবি তিনি আমাদের দিতে পেরেছিলেন কারণ বাংলার কথকতার,

পটুয়াদের কাহিনী-চিত্র এবং মঙ্গলকাব্যের দেশজ ঐতিহ্য ছিল তার অন্তর্গত রক্তের ভিতর। গ্রামবাংলার সাংস্কৃতিক আঙ্গিকের ঐতিহ্যকে তিনি পুরোপুরি অন্তরঙ্গ করতে পেরেছিলেন তাই তার লেখায়, ভাষায় এত সহজ গতি, এত স্বাভাবিক তার প্রকাশভঙ্গি, তার লেখনী। যে 'সামাজিক পারিপার্শ্বিক এবং মানসিক উপকরণ ও বাতাবরণে' তিনি মানুষ হয়েছেন তাকে উপেক্ষা না করে তাকেই তিনি উপজীব্য করেছিলেন। আর তাই তাকে দিয়েছিল সাফল্য ও সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'মাটিকে এবং মানুষকে ও জানে, এর সঙ্গে ওর যোগ আছে।' এ অতিবড় প্রশংসার কথা। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য এমনকি তারাশঙ্করের প্রথম দিকের একটি দুর্বল রচনা 'চৈতালী ঘূর্ণি'তেও লক্ষ্য করেছিলেন, 'প্রতিমা-রচনার রীতিতে দেখি এক ধরনের সহজ স্বাভাবিক সারল্য, যা এপিক-রীতির লক্ষণ। প্রতিমার ব্যাপারে তাঁর যোগ ঃ দেশজ উপকথা-মহাকাব্য-পুরাণ-মঙ্গলকাব্যের দীর্ঘ ঐতিহ্যের সঙ্গে, যে ঐতিহ্যের অনেকটাই লোকায়ত, গ্রামীণ। এই সূত্রে প্রথমেই মনে পড়ে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরামের সঙ্গে তার সামীপ্য।'[১০] আর একজন সমালোচকের মনে হয়েছিল, 'মাটি ও মানুষকে বাঙালী পাঠক কবিতায় হারিয়ে ফেলেছিল তা পূর্ণ আবেগে উজ্জীবিত হয়ে উঠল তারাশঙ্করের রচনায়।'[১১] বড় খাঁটি কথা। রবীন্দ্র পরবর্তী প্রধান কবিরা প্রায় সকলেই ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এবং অধ্যাপক। তাদের মনোজগত পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃত সাহিত্য বা সংস্কৃতির সঙ্গে এদের কারো কারো অল্পবিস্তর পরিচয় থাকলেও, বাংলার দেশজ সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি এদের কোন অনুরাগ ছিল এমন প্রমান অন্তত তাদের লেখায় পাওয়া যায় না। স্বাভাবিক কারনেই আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠক অতি সীমিত। যাই হোক, নিশ্চিতভাবেই বলা যায় বিষয়বস্তু আর আঙ্গিকের এই স্বাভাবিক মেলবন্ধন তারাশঙ্করের সাহিত্যকে কালজয়ী করেছে।

৩

পুরাতনের প্রতি নিশ্চয়ই মানুষের একটা মমত্ববোধ থাকে। এবং এই বোধ সম্ভবত শিল্পী ও সাহিত্যেকের পক্ষে সৃষ্টিসহায়ক। তারাশঙ্করের মধ্যেও এই বোধ কাজ করেছে। কিন্তু 'ওল্ড ইজ গোল্ড' এই মানসিকতা থেকে

তারাশঙ্কর গ্রামজীবনের ছবি আঁকেন নি। গ্রামজীবনই ছিল তার পরিচিত অন্তরঙ্গ জগৎ। কাজেই স্বাভাবিকভাবেই গ্রামজীবন তার সাহিত্যেরও অন্তরঙ্গ জগৎ হয়ে উঠেছিল। অশ্রুকুমার সিকদার ঠিকই লিখেছেন, 'পুরাতন কালের প্রতি গভীর টান সত্ত্বেও নূতন কালের অংকুরোদ্গমের সমস্ত ইতিহাস তারাশঙ্কর অপক্ষপাত ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।' তার মতে, 'ঔপন্যাসিক হিসাবে তারাশঙ্করের মহিমা এইখানে যে সরলতাময় জীবনের প্রতি নস্টালজিয়া শেষ পর্যন্ত তার বাস্তবতাবোধকে আচ্ছন্ন করতে পারে না।'১২ তারাশঙ্করের সারাজীবনের সাহিত্য সাধনার মধ্যে আছে বাংলার গ্রামজীবনের টিকে থাকা ও ভাঙ্গনের রহস্য সন্ধান।

তারাশঙ্কর মূলত ও মুখ্যত গ্রামের মানুষ এবং গ্রামের কথাই তার গল্প-উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। কিন্তু সে কোন্ গ্রাম? আজ যদি কেউ বোলপুর, সাঁইথিয়া, লাভপুর যান তিনি কি সে গ্রামের কোন পরিচয় পাবেন? বোধহয় না। রাঢ় বাংলার যে গ্রাম এমনকি পঞ্চাশ-ষাটের দশকেও নিজস্ব ঐতিহ্যের ধারা বহন করে কষ্টেসৃষ্টে বেঁচে ছিল, সে গ্রামের কোন চিহ্নই প্রায় আজ তার খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলার গ্রামসমাজ হয়ত সত্যিই এককালে 'স্বয়ম্ভর' ছিল। একথাও হয়ত ঠিক যে ঐতিহ্যানুযায়ী প্রথাবদ্ধ আচার আর ধর্মীয় নিয়মের দ্বারাই সেকালের গ্রামীণ উৎপাদন সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হত। এই স্বয়ম্ভর গ্রামসমাজের প্রাণশক্তি নিহিত ছিল সমাজ পঞ্চায়েত নিয়ন্ত্রিত চণ্ডীমণ্ডপকেন্দ্রিক যৌথ জীবনাভ্যাস ও গোষ্ঠীচেতনায়। বিভিন্ন রকম স্বার্থসংঘাতের মধ্যেও অন্তঃসলিলে প্রবাহিত হত গ্রামসম্পর্কের একাত্মবোধ (village solidarity)। গ্রামবাংলার কৃষ্টি, ব্রতকথা, কথকতা, পাট-পুরাণ-মঙ্গলকাব্য এই যৌথ জীবনাভ্যাসেরই সৃষ্টি। আবার এই গ্রামীণ কৃষ্টির মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত থাকে গোষ্ঠীচেতনার ফল্গুধারা। সন্দেহ নেই, ব্রতকথা ইত্যাদি যৌথ বাঞ্ছার সরব অভিব্যক্তি যা যূথ-বন্ধনের চেতনা সহায়ক।

এই স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীচেতন গ্রামসমাজের পতনের ইতিহাস অবশ্যই এক স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়। তবে একথা হয়ত ঠিক যে বাংলার গ্রামসমাজের ভাঙ্গন যত না বাইরের আঘাতে, তার চেয়ে বেশী ভেতরের ক্ষয়ে। গ্রামসমাজ ভেতর থেকেই ক্ষয়ে যাচ্ছিল। এই ভাঙ্গন ত্বরান্বিত হয়েছিল বাইরের অভিঘাতে। প্রাক-উপনিবেশিক আমলেই স্বয়ম্ভর গ্রামসমাজে চিড় ধরেছিল। উপনিবেশিক শাসনে এই চিড় ফাটলে পরিণত হয়। আর স্বাধীনতার দুই

দশকেব মধ্যেই বাংলাব গ্রামসমাজ ধ্বসে পড়ে। প্রথাব নিগড়ে বাঁধা বর্ণভেদ ভিত্তিক সমাজ ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতিব বিধানসমূহ আব পুবোপুবি অন্ত্যজ বর্ণেব আচাব ও মনকে প্রভাবিত কবতে পাবছিল না। যাব পবিণতি লক্ষ্য কবা যায় ধর্মান্তব গ্রহণে। যদিও ধর্মান্তব গ্রহণেব পবও বহুকাল পুবানো সংস্কাবেব বাঁধন তাবা ছাড়তে পাবেননি। অন্যদিকে মুঘল আমলে প্রচলিত অর্থ-বিনিময় (cash nexus) ব্যবস্থা স্বয়ম্ভব গ্রামসমাজেব পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না। আব গ্রামসমাজেব বাইবে থেকে মনসবদাব-জমিদাববা যেভাবে কৃষি উৎপাদনেব ভাগ আদায় করছিল তা গ্রামীণ উৎপাদন ব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি কবছিল। ভোগ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় অর্থ-বিনিময় প্রথা ঠিক খাপ খায় না। তাছাড়া 'খুদখাস্ত' ও 'পাইখাস্ত' রায়তেব স্বার্থেব সংঘাত উৎপাদন সম্পর্কে সংকট সৃষ্টি কবছিল। খুদখাস্ত ও পাইখাস্ত রায়তেব সম্পর্ক প্রথাব নিগড়ে সম্পূর্ণ বাঁধা পড়েনি। তবে একথা ঠিক যে বাংলাব গ্রামসমাজ এইসব সমস্যাব ভাব তখনো বইতে সক্ষম ছিল।

উপনিবেশিক কেন্দ্রীয় আইনি শাসন, চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত ও সর্বোপবি উপনিবেশিক শিল্প ও বাণিজ্যনীতি বাংলাব ঐতিহ্যানুযায়ী গ্রামসমাজেব পবতে পবতে ফাটল ধরিয়েছিল। উপনিবেশিক আইনী শাসন ও চিবস্থায়ী বন্দোবস্তেব জমিদার গ্রামসমাজের দণ্ডমুণ্ডেব কর্তা হয়ে যৌথ জীবনাভ্যাসেব ভিত্তিকেই নাড়িয়ে দিয়েছিল। একদিকে সমাজ পঞ্চায়েতেব ক্ষমতা হয়েছিল খর্বিত অন্যদিকে ঐতিহ্যানুসাবী প্রথা ও নিয়মেব ভূমিকা হয়েছিল শিথিল। তার শিল্প ও বাণিজ্য নীতি গ্রামীণ শিল্পেব অবনতিব পথ প্রশস্ত কবে স্বয়ম্ভবতাব মূলে আঘাত কবেছিল। তবুও পণ্য অর্থনীতিব বিলম্বিত ও অপূর্ণ বিকাশ এবং ঐতিহ্যের টানে পুরানো গ্রামসমাজ এক মিশ্র অর্থনীতি আব প্রথা-কানুনেব মিশ্র বাঁধুনিতে, যদিও কিছুটা নতুনরূপে, আবো বেশ কিছুকাল টিকে ছিল, মূলত গ্রাম সম্পর্কেব সেই পুরানো একাত্মতা বোধ বা গ্রামীণ সৌভ্রাতৃত্বেব জোবে। তবে ভাঙ্গনেব চিহ্ন ছিল তাব সর্বাঙ্গে। সম্ভবত স্বদেশী আন্দোলন বাংলাব গ্রামসমাজে যে এক নতুন জোয়াব এনেছিল, যাব পবিচয় আমবা ধাত্রীদেবতায়, গণদেবতায় পাই, তা বাংলাব ভঙ্গুব গ্রামসমাজে আবাব প্রাণশক্তির সঞ্চাব কবেছিল। হয়ত এই স্বদেশীর প্রাণশক্তিতেই আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার সংস্কৃতির আঘাতেও বাংলাব গ্রামসমাজ তখন একেবারে ভেঙ্গে পড়েনি। গ্রামেব এই সংকট সবচেয়ে বেশী উপলব্ধি কবতে

পেরেছিলেন বুঝি গান্ধী। গান্ধীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচী মূলত এই গ্রামসমাজকে স্বাবলম্বী করে বাঁচানোর কর্মসূচী। আর এই গ্রামসমাজের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা থেকেই তারাশঙ্করও গান্ধীর আদর্শের প্রতি অনুরাগ বোধ করেছিলেন। বাংলার গ্রামসমাজের সত্যিকারের অন্তর্জলি যাত্রা সুরু হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে। তখন গান্ধী নিহত। গান্ধীর কর্মসূচী পরিত্যক্ত। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্যে আমরা উপনিবেশিক আমলের বাংলার ভঙ্গুর গ্রামসমাজের জীবন্ত ইতিহাসের দেখা পাই। কার্তিক লাহিড়ী সঙ্গতভাবেই বলেন, 'তারাশঙ্করের কৃতিত্ব এইখানে যে বাংলাসাহিত্য যখন ইংরেজী শিক্ষিত ভদ্রলোকের বিলাসী রচনায় মেতে উঠেছিল, তখন তিনি গ্রাম্য অশিক্ষিত প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত হবার ভয়ে ভীত না হয়ে পাঠকদের সেখানে নিয়ে যেতে চাইলেন—যেখানে তখন পুরনো জীবনধারায় নবীনের অভিঘাত শুরু হয়েছে, যা আমরা কোনদিন চোখ মেলে দেখিনি। ঐতিহ্যমুখী পল্লীসমাজ ক্রমে বাইরের আঘাতে পরিবর্তনের মুখে বা পরিবর্তিত হতে চলেছে, যদিও সেই পরিবর্তনের চিহ্ন অনেকদিন ধরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।'[১৩] নিদারুণ দুঃখ-দারিদ্র্য ও কলহ-কলঙ্কের মধ্যেও মায়া-মমতার প্রাণের প্রদীপ জেলে রেখেছিল রাঢ় বাংলার যে গ্রাম সে গ্রামে যথার্থই বারোমাসে তের পার্বণ বাঁধা ছিল এবং ভাঙ্গনের মুখে তা অস্থির হয়ে উঠেছিল, সেই হারিয়ে যাওয়া গ্রামের হদিশ পেতে হলে বাংলা কথাসাহিত্যের দুয়ারে ধর্ণা দেওয়া ছাড়া এখন আর উপায় নেই।

অনেক সময় এমন অভিযোগ করা হয় যে তারাশঙ্কর তার লেখায় জমিদারদের প্রতি বিশেষ সহানুভূতি দেখিয়েছেন। সাধারণত 'জলসাঘর' প্রভৃতি কিছু রচনাকে সাক্ষীও মানা হয়। অথচ জমিদারের অত্যাচার ও কুকীর্তির কথা তার লেখায় যেমন নিষ্করুণ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তা বুঝি বাংলা সাহিত্যে বিরল। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে উপনিবেশিক আমলের বাংলার গ্রাম সমাজ যা তারাশঙ্করের সাহিত্যের উপজীব্য, সেই সমাজের পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারদের বাদ দেওয়া যায় না। একথা ঠিক যে জমিদারী ব্যবস্থা প্রজাপীড়নের উপরই নির্ভরশীল। এবং তারাশঙ্কর তা ভালোভাবে জানতেন। 'ধাত্রীদেবতা' থেকে 'কীর্তিহাটের কড়চা' পর্যন্ত তারাশঙ্করের প্রধান রচনাগুলিতে যেখানেই জমিদারের কথা এসেছে সেখানেই এই সত্য স্বীকৃতি পেয়েছে। 'কীর্তিহাটের কড়চা' যা এক

হিসাবে বাংলার জমিদাবী প্রথাবও সাহিত্য ইতিহাস, তাতে বায বংশের শেষ প্রধান জমিদাব সুবেশ্বব বাযেব জবানীতে লেখক জানাচ্ছেন, 'বাংলাদেশে তাই বা কেন, পৃথিবীতে জমিদাব এমন একজনও নেই যে প্রজাদমনেব নামে মানুষকে পীড়ন কবেননি। ও হযনা।' 'ধাত্রীদেবতা' ও 'কীর্তিহাটেব কড়চা' এই দুটি প্রধান বচনাব মূল নাযকবা জমিদাব। এই উপন্যাস দুটিতে প্রধানত নাযক জমিদাবদেব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিতে-প্রতিফলিত বাংলাব গ্রাম সমাজেব ছবি পাঠকেব গোচবে আনা হযেছে। আবাব 'গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে' মূলত চাষীপ্রজা ও অন্ত্যজবর্ণেব অভিজ্ঞতায প্রতিফলিত বাংলার গ্রাম সমাজকে আমবা দেখি। আবাব 'হাঁসুলী বাঁকেব উপকথায' প্রান্তীয জনগোষ্ঠীব চোখে সমাজকে দেখি। এক হিসেবে পাঠক আমবা এতে লাভবানই হয়েছি। গ্রাম সমাজেব চিত্র এক পেশে না হযে সমগ্রতাব মাত্রা পেযেছে। উভয ক্ষেত্রেই কিন্তু তাবাশঙ্কব অতিস্বচ্ছ ও অপক্ষপাত সাহিত্য দৃষ্টিব পবিচয দিযেছেন। আবাব মানবিক সহানভূতিকেও ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। এখানেই তার সাহিত্যেব সার্থকতা।

তাবাশঙ্কবেব একাধিক উপন্যাসে জমিদাবী প্রথাব তীব্র অথচ গভীব সমালোচনা সহজেই লক্ষ্য কবা যায়। এমনকি সেখানে তিনি ব্যক্তি জমিদাবেব উদাব মনোভাবেব প্রতি সহানুভূতি দেখিযেছেন যেমন, 'ধাত্রীদেবতা', সেখানেও জমিদাবী প্রথাকে অনৈতিক ও অমানবিক বলেই চিত্রিত করেছেন। মা ও বতন মাস্টাবেব শিক্ষায় শিবনাথেব ন্যায-অন্যায বোধ গড়ে উঠেছিল যে ধাবায তাতে প্রজাব মঙ্গল ও স্বদেশীব প্রতি টান অনুভব কবা খুবই স্বাভাবিক ছিল তাব পক্ষে। জমিদাবী পবিচালনাব নানা ঘাত-প্রতিঘাত, কলেরা মহামাবী ও অজন্মা জনিত কাবণে প্রজাসাধাবণেব দুঃখ-দুর্দশা সর্বোপবি স্বদেশী আন্দোলনেব সংস্পর্শে এসে তাব মধ্যে এক মানসিক পবিবর্তন দেখা দিচ্ছিল যা সাধাবণ সাংসাবিক স্বার্থেব উপবে উঠে মহত্তব জীবনবোধেব অনুপ্রেবণায় মানুষকে টেনে নিযে যায় সকলেব মাঝে। উঠতি বড়লোক বাড়ীব মেযে শিবনাথেব স্ত্রী গৌবীব পক্ষে এই মানসিকতাকে মেনে নেওযা সহজ ছিল না। গৌবীব গঞ্জনা শিবনাথেব সাংসাবিক জীবনে এক অশান্তিব বাতাববন সৃষ্টি কবেছিল। জমিদাবীর সংকট ও ঘরের সংকটে বিব্রত শিবনাথ আবিষ্কাব কবে, 'Property is theft because it enables him, who has not produced, the fruits of other people's toil. জমিদাবী-

ব্যবস্থা অক্ষবে অক্ষবে তাই।' শিবনাথেব জমিদাবী পাঁচশ টাকাব বাকী খাজনার দাযে নিলামে উঠেছিল। এ সত্য আবিষ্কারেব পব জমিদাবী বাঁচাব কোন তাগিদ শিবনাথেব না থাকাবই কথা। কিন্তু, 'আজ কযেকজন প্রজা আসিযা কাঁদিযা পডিযাছে। কোনবূপে যেন সম্পত্তি বক্ষা কবা হয়, জমিদাব তাহাবা চায কিন্তু নতুন জমিদাব তাহাবা চায না নতুন জমিদারেব অধীনে তাহাদেব ভবিষ্যতেব শংকাব কথা বিবেচনা কবিযা সে বিচলিত হইযা উঠিয়াছে, বাঁচাতেই হইবে, যেমন কবিযা হউক, সম্পত্তি বাখিতেই হইবে।' অথচ এত টাকা জোগাড কবা ছিল প্রায অসম্ভব। প্রজাদেব কাছে খাজনা বাবদ পাওনা অনেক, কিন্তু আদায নেই। প্রজাদেব দেওয়াব মত অবস্থাও নেই। শিবনাথ তখনো আইনেব চোখে সাবালক না হওযায এত টাকা ধাব পাওযাও সম্ভব ছিল না। এই অবস্থায বতন মাস্টাব নিজেব সম্পত্তি বাঁধা বেখে টাকাব জোগাড কবেন। শিবনাথ ধনীঘবেব মেযে স্ত্রী গৌবীব কাছে টাকা চাইতে পাবেনি কিন্তু মাষ্টার মশাযেব দেওযা সাহায্য গ্রহনে কুণ্ঠা বোধ করেনি। এটাই স্বাভাবিক।

লেখক জমিদাব সন্তানেব চেযেও একাধিক মহত্তর চরিত্র সাধাবণ মানুষেব মধ্যেই খুঁজে পেযেছেন। যে কঙ্কালসাব মেথব বউটি বুগ্ন স্বামীকে বাঁচাবাব জন্য নিজে না খেযে স্বামীব মুখে খাবাব তুলে দেয়, ডাক্তাবেব ব্যবস্থাপত্র অনুযাযী পাখির মাংস জোগাড কবাব জন্য পায়বা চুবি কবতে গিযে ধবা পডে তাকেও লেখক জমিদাব গিন্নিব চেযে মহৎ কবেই আঁকেন। এবং সে চিত্র আবেগ চচ্চডি মাত্র নয, দৃঢ় বাস্তব। আবাব শিবনাথের আবিষ্কৃত সত্য অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত হয যখন, 'মেয়েটির গাযেব দুর্গন্ধে শিবনাথেব কণ্ঠ হইতে ছিল, সে মুখ ফিবাইয়া লইযা বলিল, বাডিব মধ্যে যাও বাপু দেখ, যদি কিছু থাকে তো পাবে। বলিতে বলিতেই তাহাব মনে পডিয়া গেল, এই মেযেটাই কাল অপরাহ্নে মেথবেব কাজ কবিযা চাবিটা পযসা লইযা গিযাছে, সন্ধ্যায খাইযা কিছু উচ্ছিষ্টও লইযা গিযাছে। ইহাবই মধ্যে সে আবাব অন্ন অন্ন কবিযা ফিবিতেছে! তবে এ উহাব স্বভাব, না সত্যই অভাব? মেযেটি চলিযা গেল, তাহাব পদক্ষেপের মধ্যেও সমতা নাই, পাযে পায়ে টোক্কব খাইতে খাইতে সে চলিযাছে। শিবনাথ সহসা ক্ষণপূর্বেব মনোভাবেব জন্য লজ্জিত হইযা পড়িল, নিজেব কাছেই নিজে অপবাধ বোধ কবিল। তাহাব মনে হইল লক্ষ লক্ষ যুগের ক্ষুধা ওই মেয়েটির উদবে

জ্বলিতেছে। সে ক্ষুধার অন্ন তাহারাই পুরুষানুক্রমে কাড়িয়া খাইয়া আসিয়াছে, সে নিজেও খাইতেছে।'

ধাত্রীদেবতার শিবনাথ বাংলার প্রজাপীড়ক জমিদারদের প্রতিনিধি-স্থানীয় নয় কিন্তু তাই বলে কোন অবাস্তব বা নিতান্তই ব্যতিক্রমী চরিত্র নয়। বাংলার স্বদেশী আন্দোলন বা সমাজবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যায় অনেক নেতাই ছোট জমিদার বা তালুকদার শ্রেণী থেকে এসেছিলেন। এদের সংখ্যাও নেহাতই কম নয়। এদের অনেকেই গ্রামসমাজেরও স্বাভাবিক নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। আর এদের প্রভাবও সমাজ জীবনে নিতান্ত কম পড়েনি। রাষ্ট্রীয় আইন যেদিন সমাজের নিয়মকে ডিঙ্গিয়ে গ্রাম সমাজের উপর কর্তৃত্ব জারী করল সেদিন বুঝি তার শেষ বিদায়ের ঘণ্টা বেজেছিল। স্বদেশীর জোয়ার বোধহয় আরো কিছুদিনের জন্য বাংলার গ্রামসমাজের প্রাণশক্তিকে জীইয়ে রেখেছিল। সমাজের এই নতুন নেতারা সমাজে তাদের শ্রেণী অবস্থান এবং চাষীপ্রজা বা কামার, কুমোর, বাগ্দী, বায়েন, বাউরী ইত্যাদি অন্ত্যজ বর্ণের সঙ্গে নিজেদের সম্পর্কের বিষয় নতুন দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছিলেন। ধাত্রীদেবতায় এমনি এক বাস্তবতার সাহিত্যিক রূপায়নই আমরা পাই। এই জমিদার-তালুকদার সন্তান যারা স্বদেশীর মধ্যে দিয়ে নিজেদের নতুন করে আবিস্কার করেছিলেন তাদের অনেকেই শেষে মার্কসবাদী আন্দোলনে যোগ দেন এবং নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হন।[১৪] এতে এই আন্দোলনের ভালো কি খারাপ হয়েছিল সে অন্য কথা।

'কীর্তিহাটের কড়চা' যা একদিকে কীর্তিহাটের জমিদার রায় বংশের উত্থান ও পতনের ইতিহাস এবং অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে জমিদারী প্রথা বিলোপের মধ্যবর্তী বাংলার গ্রাম সমাজের উপাখ্যান তাতে রায় বংশের দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার রত্নেশ্বর রায়ের অদ্ভূত স্বীকারোক্তিতে তারাশঙ্কর যে বাস্তবতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন তাতে সতিই এক 'ঋজুদর্শী' সাহিত্যিকেরই পরিচয় মেলে। বাংলার জমিদারদের অনেক দানধ্যানের গল্পই প্রচলিত আছে। কিন্তু এই দানধ্যান যে প্রজার অর্থেই করা হয়ে থাকে এবং এর পেছনে যে কোন বিশেষ মহতী আদর্শের টানের চেয়ে ব্যক্তিগত যশ ও খ্যাতির লোভই বেশী কাজ করে এ তারই স্বীকারোক্তি। রত্নেশ্বর রায় তার ডায়েরীতে লিখেছিলেন, 'জীবনে যত দান করিয়াছি, স্মরণ করিয়া দেখিতেছি পুণ্যের জন্য কোন দান করি নাই, খ্যাতির জন্য, সরকারী খেতাবের জন্য করিয়াছি।...

.. যে অর্থ ব্যয় করিয়াছি দান খাতে, কীর্তি খাতে তাহা নিজের তহবিল হইতে দিই নাই। প্রজাদের পীড়ন করিয়া আদায় করিয়া দিয়াছি। নিজে কিছুই দিই নাই। আজ আমি শঙ্কিত। কেমন একটা শংকা আমাকে যেন মাঝে মাঝে বিহ্বল করিয়া তোলে।' কোম্পানীর শাসন থেকে ভিক্টোরীয়ার শাসনে উত্তরণের সঙ্গে বাংলার জমিদারদেরও অনেকটাই আইনের শাসনে অভ্যস্ত হতে হয়। যদিও লাঠির শাসনও চলতে থাকে। 'বিষয় বাপের নয় দাপের' এ প্রবাদবাক্যের সত্যতাও বহাল থাকে। আইনের শাসনও যে প্রজার পক্ষে কোন অংশে কম নিষ্ঠুর নয় তারাশংকর তা অতি দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন কীর্তিহাটের কড়চায়। জমিদারের অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা, তাদের দম্ভ ও মানসিক যন্ত্রণা এসবই তারাশংকর নিস্পৃহ ভাবে দেখেছেন এবং লিখেছেন। লেখকের গভীর সামাজিক দৃষ্টির পরিচয় যেমন মেলে কীর্তিহাটের কড়চায় তেমনি ব্যক্তির মানসিক সংকট ও মানসিক যন্ত্রণার প্রতি মননশীল সংবেদনার পরিচয়ও পাওয়া যায়। সামাজিক ও ব্যক্তিক সম্পর্কের জটিলতার এমন মননশীল অথচ রসঋদ্ধ রচনা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী নেই।

'কীর্তিহাটের কড়চা' সম্পর্কে অনেক বিরূপ মন্তব্য শোনা যায়। অশ্রুকুমার সিকদার মন্তব্য করেন, 'কীর্তিহাটের কড়চায় পার্মানেণ্ট সেটেলমেণ্টের আগে থেকে জমিদারী-প্রথার অবসান পর্যন্ত কালের বর্ণনায় ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির ছাপ স্পষ্ট। বড় হয়ে উঠেছে জমিদার-বাড়ির গৌরব-অগৌরবের কাহিনী, প্রজা সাধারণের কথা, উৎপাদন সম্পর্কের চেহারা সেখানে অনুপস্থিত। যেন পাপের ফলেই জমিদারী প্রথার অবসান হলো, সেই প্রথা উচ্ছেদের পিছনে উৎপাদন-সংকটের, কৃষক আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংকটের ভূমিকা নেই।'[১৫] কীর্তিহাটের কড়চা নিশ্চয়ই কোন রাজনৈতিক ইস্তেহার নয়। তবে উৎপাদন সম্পর্কের চেহারা কিন্তু এখানে অনুপস্থিত নয়। সরকারের রাজস্ব থেকে জমিদারের আয় কিভাবে বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং জমিদাররা কিভাবে পতিত জমিকে আবাদী করে, প্রজার খাজনা বাড়িয়ে, জমিকে লাখেরাজ করে, জমিদারীর আয় বাড়াত তার বিশদ বিবরণ আছে এই কড়চায়। আর হ্যাঁ। প্রজা বিদ্রোহ এবং জমিদারি শাসনের সংকটের কথাও আছে। এই সংকটের ইঙ্গিত রায় বংশের প্রতাপশালী জমিদার রত্নেশ্বর রায় বিলক্ষণ পেয়েছিলেন। তার জবানীতে, 'যেদিন রাত্রে কাছারীতে

আগুন লাগল, তার আগের দিন হতে প্রজারা কাছারী আসা বন্ধ করেছিল। ব্যাপারটা পুলবন্দীর চাঁদা। নদীর ধারে ধারে বন্যা নিবারণের বাঁধ হবে—সরকার সিকি দেবেন, প্রজা সিকি দেবে, জমিদার দেবেন অর্ধেক এই নিয়ম। প্রজারা বলছে—এই সেদিন হুজুরের পৌত্রের বিয়েতে আমরা টাকায় সিকি চাঁদা দিয়েছি আর আমরা দিতে পারব না। কয়েকদিন পর বলল দেব না।' জমিদার প্রজাদের কাছে জবাবদিহি চাইলেন। প্রজারা গ্রাম ছাড়া হল। 'পরদিন সকাল থেকে গ্রামের সমস্ত পুরুষেরা অনুপস্থিত। কেউ বাড়ী নেই। সকালবেলা জল খেয়ে তাদের (কাছারিতে) আসবার কথা ছিল, কেউ এলনা। ডিসেম্বর মাস, ভরাভর্তি ধান কাটার সময়, লাট ভবানন্দ বাটীর চারখানা মৌজা নদীর ধারে, তার কোন গ্রামের মাঠে একটি লোক নেই। সোনার বর্ণ পাকা ধানে ভরা মাঠে ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়াপাখী উড়ছে, শীতের উত্তুরে বাতাসে রোদ্রের সঙ্গে রাত্রের শিশির ভেজা নরম ধান, শুকিয়ে উঠছে সঙ্গে সঙ্গে, গোটা মাঠ জুড়ে একটা মুড মুড় মুড শব্দ উঠছে।'

'সেই দিনই রায় বাহাদুরের হুকুমে সমস্ত গ্রামের গরু-বাছুর, ছাগল-ভেড়া ঘরে বন্ধ রইল। ঘর থেকে বের হতে পেলো না। রাখালেরা ফিরে গেল। গ্রামের রাস্তা সরকারী খাস পতিত, জমিদারের জমি, সেখানে বের হতে দেবেনা রায়বাহাদুর। সন্ধ্যেবেলা ঢেড়া পড়ল—'কাল সকালবেলা এক প্রহরের মধ্যে প্রত্যেক প্রজাকে কাছারীতে হাজির হবার জন্য হুকুমজারী করা হচ্ছে। যে প্রজা হাজির না হবে, তার সরকারী জমি, পুস্করিনী এবং গাছপালা যা সরকারী পতিতের উপর থাকা সত্ত্বেও ব্যবহারের সুবিধা ইত্যাদি বাতিল করা হবে।' পুরো আইনের বলে জবরদস্তি। সমাজের নিয়ম, সমাজ পঞ্চায়েতের ক্ষমতা রাষ্ট্রীয় আইনের দৌলতে সব বাতিল। চণ্ডীমণ্ডপ কেন্দ্রিক গ্রাম জীবনের রেশ আছে কিন্তু জোর নেই। আইনই সব। আর সে আইনের বলে দণ্ডমুণ্ডের কর্তা জমিদার, চণ্ডীমণ্ডপের সমাজ পঞ্চায়েত নয়। কিন্তু এবার প্রজাদেরও সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেছে। এ জবরদস্তি প্রজারা আর মানতে রাজী নয়। রত্নেশ্বর রায় 'জানতেন না যে, কাল তাঁর অজ্ঞাতসারে আরও অনেক এগিয়ে গেছে। প্রজাদের, সেই কালই, সেই রাত্রেই বোধহয় খুঁচিয়ে এগিয়ে দিয়েছিল—যা, তার চেয়ে আজ রাত্রি পোয়াবার আগেই কাছারীতে আগুন দিয়ে জালিয়ে দে। জমিদার বুঝুক তোরাও লড়তে পারিস।' প্রজাদের মনে আগুন জ্বলে উঠেছিল।

আর 'রাত্রে কাছারীতে আগুন লাগিল'। রত্নেশ্বর রায় অবশ্য কোন ক্রমে রক্ষা পেয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি কপাট খুলে বাইরে এসে রত্নেশ্বর রায় 'স্তম্ভিত' হয়ে গেলেন। এ সম্পর্কে তিনি ডায়েরীতে লিখলেন, 'এবার প্রজারা জমিদারের ঘরে আগুন লাগাইয়া পুড়াইয়া মারিতে চাহিতেছে। আমার মত জমিদারকেও গ্রাহ্য করিল না। কাল কি এতই বদল হইয়া গেল? ইহার পর? ভবিষ্যতে কি হইবে? জমিদারবর্গের সাবধান হইবার সময় আসিয়াছে।' কিন্তু কালের গতি রোধ করার ক্ষমতা বাংলার জমিদারদের ছিল না। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে ফজলুল হকের ডেট সেটেলমেণ্ট বোর্ড আইনের ফলে মহাজনী কারবারে যারা যারা লিপ্ত তাদের শঙ্কা পর্যন্ত বিস্তারিত বর্ণনা করা আছে কীর্তিহাটের কড়চায়। সেই সঙ্গে নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত পাপবোধ এবং মানসিক যন্ত্রণার কথা আছে। এই মানসিক সংকট বা যন্ত্রণার পরিচয় তারাশঙ্করের সাহিত্যে নেই, তার চরিত্রগুলি যান্ত্রিক, নাটকীয়তার দাবীই শুধু পূরণ করে এমন অভিযোগ কিন্তু আবার অনেক সমালোচকই করেছেন। অবশ্য ইউরোপীয় মডেলে ব্যক্তিক সংকটের যে রূপ আমরা দেখি তার সঙ্গে সঙ্গত কারনেই তারাশঙ্করের চরিত্রের মানসিকতা ও মানসিক সংকটের চেহারা আলাদা। এধরণের অভিযোগ যারা করেন তারা আসলে ইউরোপীয় নভেলের বাংলা সংস্করণ চান কারণ বাংলা উপন্যাসের রস গ্রহনে তারা অপারগ।

গ্রাম বাংলার ভূমি অর্থনীতি ও সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে যাদের অভিজ্ঞতা নিতান্তই সীমিত, গ্রামীন জীবনের নানা টানাপোড়েনের মধ্যেও যে মানবিকতার রস রয়েছে তার আস্বাদ যারা পায়নি এবং যাদের মেজাজ ক'লকাতার আধা শহুরে বৃত্তে পাশ্চাত্য সাহিত্যের আচ্ছন্নতার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে, তাদের পক্ষে তারাশঙ্করের সাহিত্যের রসাস্বাদন কিছু কঠিন বটে। এই মহাকাব্যানুসারী উপাখ্যানটি শুধু বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অসামান্য আলেখ্য নয, বাংলা ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির একটি। দেড়শ বছরের বিরাট পটভূমিতে অসংখ্য চরিত্র ও ঘটনার বিচিত্র নাটকীয় বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে একটা গোটা দেশের জীবন্ত উপাখ্যান কীর্তিহাটের কড়চা। এক হিসেবে ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম, হাঁসুলীবাকের উপকথার এক চূড়ান্ত পরিণতি যেন দেখতে পাই কীর্তিহাটের কড়চায়। এ এক আধুনিক মহাভারত

যার পটভূমি বাংলাদেশ। কীর্তিহাটের কড়চার বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই।

এ প্রসঙ্গে বরঞ্চ এবার আমরা গণদেবতা-পঞ্চগ্রামের দিকে চোখ ফেরাই। এখানেও নতুন জমিদার শ্রীহরি পাল বা পুরানো জমিদার কঙ্কণার বাবুদের কুকীর্তি-কাহিনী এবং মানসিকতা বর্ণনায় তারাশঙ্কর যে সম্পূর্ণ অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন সে বিষয়ে নিশ্চয়ই বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। তার চাইতেও বড়কথা গণদেবতা-পঞ্চগ্রামেই আমরা পাই বাংলার গ্রাম সমাজের ভাঙ্গনের এক অনবদ্য ভাষাছবি। এক জীবন্ত ইতিহাস। গণদেবতার সুরুতেই উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন, চণ্ডীমণ্ডপ বেদখল হওয়া আর সমাজ পঞ্চায়েতের অস্তগমনের নিশ্চিত আভাস যেভাবে পাঠকের গোচরে আনা হয়েছে তাতে লেখকের দৃষ্টির স্বচ্ছতা ও গভীরতা এবং অসামান্য সাহিত্যিক মনীষানার পরিচয় মেলে। আসলে এই উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রগুলি এবং এবং যে সামাজিক সমস্যা এর মূল বিষয়বস্তু তা লেখক এক অনায়াস দক্ষতায় শুরুতেই পাঠকের সামনে নিয়ে এসেছেন। পাঠক প্রস্তুত।

গণদেবতার শুরুতেই আমরা দেখি স্বয়ম্ভর গ্রাম সমাজের উৎপাদন সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। আবহমান কাল ধরে কামার অনিরুদ্ধ কর্মকার, ছুতোর গিরীশ সূত্রধর, প্রথা অনুযায়ী ধানের বিনিময়ে চাষের প্রয়োজনীয় লাঙলের ফাল পাঁজানো, কাস্তে গড়িয়ে দেওয়া, গাড়ীর চাকায় হাল লাগিয়ে দেওয়া, বাবলা কাঠের লাঙল বানানো এইসব কাজ করে আসছিল। এখন আর তাদের পক্ষে এভাবে কাজ চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। একে বিনিময়ে প্রাপ্য ধানের পরিমান সামান্য, তাও সকলে সময়ে দেয় না। বাকী থাকে। তাই তারা পেটের দায়ে 'নদীর ওপারে বাজারে—শহরটায় গিয়া একটা করিয়া দোকান করিয়াছে।' সকালে উঠে চলে যায় আর সেই সাঁঝের বেলা ফেরে। গায়ের লোকের কাজ জমে থাকে। তাছাড়া গ্রামের লোকের কাজও তারা নগদ অর্থের বিনিময়ে ছাড়া করতে রাজী নয়। তাদের আরো যুক্তি গ্রামে তাদের সারা বছরের কাজ নেই। হাড়ি, কড়াই, কোদাল ইত্যাদি গাঁয়ের লোকেরা এখন সস্তায় শহর থেকেই কেনে। আবার অনেক চাষীর জমি জমিদারের ঘরে ঢুকে যাওয়ায় হালের সংখ্যাও কমে গেছে। এই অবস্থায় পুরানো প্রথায় বেচে থাকা সম্ভব নয়। অনিরুদ্ধ সবলদেহ, সাহসী, কিছুটা গোঁয়ার, সে এদের মুখপাত্র। অনেকটা একার লড়াই।

গ্রামের প্রজাচাষী সম্প্রদায় বিপাকে পড়ে পঞ্চায়েতের মজলিস ডেকেছে এর বিচার করার জন্য। অবশ্য অভিযোগকারীরাই বিচারক। অনিরুদ্ধরা অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছুটা বাধ্য হয়ে হাজির হয়েছে। 'মজলিসের প্রায় মাঝখানে জাঁকিয়া বসিয়াছিল ছিরুপাল, সে নিজেই আসিয়া জাঁকিয়া আসন লইয়াছিল'। 'ছিরু বা শ্রীহরি পাল দুখানি গ্রামের নূতন সম্পদশালী ব্যক্তি। লোকটার চেহারা প্রকাণ্ড, প্রকৃতিতে ইতর এবং দুর্ধর্ষ ব্যক্তি।... অভদ্র ক্রোধী, গোঁয়ার, চরিত্রহীন, ধনী ছিরু পালকে লোকে বাহিরে সহ্য করিলেও মনে মনে ঘৃণা করে, ভয় করিলেও যথোচিত সম্মান কেহ দেয় না। এজন্য ছিরুর ক্ষোভ আছে...প্রাপ্য প্রতিষ্ঠা জোর করিয়া আদায় করিতে সে বদ্ধ পরিকর।' এই প্রতিষ্ঠা আদায়ের প্রথম ধাপ হিসাবে চণ্ডী মণ্ডপের মজলিসে জাঁকিয়ে বসে ছিল ছিরু পাল। পরে জমিদারের গোমস্তা এবং শেষে জমিদারী কিনে এবং চণ্ডীমণ্ডপের দখল নিয়ে সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হবার চেষ্টা করে।

চণ্ডীমণ্ডপের এই পঞ্চায়েত মজলিসে দুই গ্রামের মাতব্বররা প্রায় সকলেই হাজির। 'স্থানীয় হরিজন চাষীরাও দাঁড়াইয়া দর্শক হিসাবে। ইহারাই গ্রামের শ্রমিক চাষী। অসুবিধার প্রায় বারো আনা ভোগ করিতে হয় ইহাদিগকেই।' বায়তচাষী বা মালিকের সঙ্গে এদের সম্পর্কও অনেকটাই প্রথার নিগড়ে বাঁধা। তবে এদের নিজেদেরও আলাদা সমাজ পঞ্চায়েত আছে যার জমায়েত হয় ধর্মরাজ তলায়। এককালে শিবকালীপুর আর মহাগ্রাম এই গ্রামের জমিদার বর্তমানে 'সম্পন্নচাষী' প্রবীণ এবং অঞ্চলের মাননীয় ব্যক্তি দ্বারিক চৌধুরীও উপস্থিত আছেন। কিন্তু এই মজলিসেই সমাজের প্রাধান্য থেকে তার প্রস্থানের সূচনা। আর ছিরু পালের মঞ্চে প্রবেশ। আসেনি গ্রাম্য ডাক্তার জগন্নাথ ঘোষ। ডাক্তার কটুভাষী, পঞ্চায়েত বা গ্রামের মাতব্বরদের প্রতি তার বিশেষ আস্থা নেই। ডাক্তারের পৈত্রিক জমি দেনার দায়ে আগেই কঙ্কনার জমিদারদের ঘরে ঢুকেছে। জমিদার বা গ্রাম্য মাতব্বর শ্রেণীর লোকের উপর তাই তার স্বাভাবিক রাগ। পরোপকারী এবং অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বদাই সোচ্চার। কিন্তু বড় আত্মাভিমানী ফলে সমবেত কাজ বা নেতৃত্বের পক্ষে ঠিক উপযুক্ত নয়।

স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের ফ্রি প্রাইমারী স্কুলের পণ্ডিত দেবু ঘোষ অনিচ্ছার সঙ্গে মজলিসে এসে 'নিতান্ত নিস্পৃহের মত এক পাশের থামে ঠেস

দিয়া দাঁড়াইয়া ছিল'। তাব নিস্পৃহতাব কাবণ পঞ্চায়েতেব নিবপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ। অনিবুদ্ধ দেবুব ছেলেবেলাব স্কুলেব বন্ধু। অনিরুদ্ধদেব অভিযোগেব যৌক্তিকতা সে স্বীকাব কবে। দেবু জানে, 'অনিবুদ্ধব অন্যায়েব চেয়ে গাঁয়েব লোক তাব প্রতি অন্যায় কবিয়াছে বেশী'। কিন্তু সামাজিক নিয়ম ও প্রথাব বিবুদ্ধে অনিবুদ্ধব উদ্ধত জেহাদ সে মেনে নিতে পাবে না। সমাজেব শৃংখলা ভেঙ্গে যায় দেবু তা চায় না। আবাব অনিবুদ্ধবা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয় তাও তাব অনভিপ্রেত। ঐতিহ্য ও সামাজিক প্রথাব প্রতি শ্রদ্ধা এবং একটা ভাবসাম্য বজায় বেখে অথচ দুর্বল ও অন্ত্যজদেব স্বার্থকেও সুবক্ষা কবে চলাব পক্ষপাতী সে। পাবিবাবিক অভিজ্ঞতা থেকে স্বাভাবিক ভাবেই জমিদাব ও জমিদাবী ব্যবস্থাব প্রতি তাব একটা বিবূপতা আছে। 'জমিদাব, ধনী মহাজনকে সে ঘৃণা কবে। তাহাদেব প্রতিটি কর্মেব মধ্যে অন্যায়েব সন্ধান কবা যেন তাব স্বভাবেব মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। তাহাদেব অতি-উদাব দান-ধ্যান-ধর্ম-কর্মকেও সে মনে কবে কোন গুপ্ত গো-বধেব স্বেচ্ছাবৃত চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া।' জমিদাব-মহাজনেব প্রতি তাব বিবূপতা, অত্যাচাবিতেব প্রতি সহানুভূতি এবং সর্বোপবি নীতিবোধকে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধিব উর্দ্ধে স্থান দেওয়াব মানসিক প্রবণতাই তাকে গ্রামেব স্বাভাবিক নেতায় পবিণত কবে। এক ভঙ্গুব গ্রামসমাজে এই নীতিবোধেব প্রতি বিশ্বস্ত থাকা যে কি কঠিন পবীক্ষা তা লেখক গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে অতি দক্ষতাব সঙ্গে প্রতীয়মান কবেছেন। সমাজেব সংকট এবং দেবুব মানসিক সংকটের মধ্যে যে যোগসূত্র তা লেখক চমৎকাব ভাবে তুলে ধবেন।

'চাষীব ঘরে দেবনাথ যেন ব্যতিক্রম। তীক্ষ্নধী বুদ্ধিমান যুবক দেবনাথ। তাহাব ছাত্রজীবনে সে কৃতী ছাত্র ছিল। কিন্তু আর্থিক অসাচ্ছল্য এবং সাংসাবিক বিপর্যয় হেতু ম্যাট্রিক ক্লাস হইতে তাহাকে পড়া ছাড়িতে হইয়াছে। সে এখন এই গ্রামেবই পাঠশালাব পণ্ডিত।' দেবু ঘোষেব নেতা-নির্মিতিব ইতিহাস লেখক প্রাচীন গ্রামসমাজেব ভাঙ্গনেব প্রক্রিয়াব মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তোলেন অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে। এই ভাঙ্গনেব প্রক্রিয়াব মধ্যেই মাঝে মাঝে সেই পুবানো গ্রামীণ সৌহার্দ ও একাত্মতাব স্ফুবণ ঘটে যা পাঠককে চমৎকৃত কবে। দেবু ঘোষেব নেতৃত্বেব দীক্ষাও ঘটে এমনি একটি ঘটনা-প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে।

স্কুলেব পণ্ডিতি নেওয়াব পর থেকে দেবু আব চাষেব কাজে নিজ হাতে

অংশ নেয না। গ্রামের আর যে কয়টি পরিবার নিজেরা নিজ হাতে চাষ করে না তাদের অন্যতম দ্বারিক চৌধুরী, হরেন ঘোষাল, জগন ডাক্তার এবং শ্রীহরি পাল। এরা গ্রামসমাজেরও মাতব্বর ব্যক্তি। অনিরুদ্ধ ও গিরীশের সঙ্গে গ্রামসমাজের বিরোধ শেষ পর্যন্ত উঠতি কর্তা শ্রীহরি পাল এবং কর্মকারের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ ও সংঘাতে পরিণত হয। এই সংঘাতে কিন্তু দেবু ঘোষ পুরোপুরি অনিরুদ্ধের পক্ষ নিতে পারে না। বরঞ্চ একটা ঘটনায সারা গ্রাম শ্রীহরিরই পক্ষে দাঁডায। 'অনিরুদ্ধের দুই বিঘা বাকুডির আধ-পাকা ধান কে বা কাহারা নিঃশব্দে কাটিযা তুলিযা লইযাছে।' সকলেই সন্দেহ করে এ ছিরুপালের কাজ। অনিরুদ্ধকে শাযেস্তা করতে সেই একাজ করেছে। অনিরুদ্ধেরও তাই দৃঢ় বিশ্বাস। গ্রামেরও লোকের সহানুভূতিও তার দিকেই। অনিরুদ্ধ এ অত্যাচারে কিছুটা দিশাহারা হলেও তার রাগ চরমে উঠে। সে প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে। স্ত্রী পদ্মও ছিরুকে শাপমন্দ করে। কিন্তু অনিরুদ্ধ থানায ডাযেরী করতে চাইলে বাধা দেয। তার সহজ বুদ্ধিতে সে বোঝে থানা-পুলিস করে সুবিধা হবে না বরঞ্চ ঝামেলা বাডবে। কিন্তু জগন ডাক্তারের বুদ্ধিতে অনিরুদ্ধ পুলিসে ডাযেরী করে। গ্রামে পুলিস আসে চণ্ডীমণ্ডপে বসে তদন্ত করে। ছিরুর বাড়ীতেও খানা-তল্লাসী হয কিন্তু কিছুই পাওযা যায না। উল্টে অনিরুদ্ধকেই বোকা বনতে হয। এই ঘটনায় গ্রামের সকল লোকই অনিরুদ্ধের উপর ক্ষুব্ধ হয। অনিরুদ্ধ সমাজকে পঞ্চাযেতকে অবজ্ঞা করে গ্রামে পুলিস ঢুকিযেছে। 'পুলিস চলিযা যাইতেই চণ্ডীমণ্ডপে প্রচণ্ড কলরব উঠিল। সদ্‌গোপ সম্প্রদাযের কেহই অবশ্য শ্রীহরি ঘোষকে সুনজরে দেখে না, কিন্তু অনিরুদ্ধ কর্মকার যখন পুলিসে খবর দিয়া বাডীখানা তল্লাস করাইল, বাড়ীতে পুলিস ঢুকাইযা দিল, তখন অপমানটা তাহারা সম্প্রদাযগত করিযা লইযা বেশ উত্তেজিত হইযা উঠিযাছে। বিশেষ করিযা সেদিন অনিরুদ্ধের সমাজকে উপেক্ষা করার ঔদ্ধত্যজনিত অপরাধের ভিত্তির উপর আজিকার ঘটনাটা ঘটিবার ফলে বিষয়টা গুরুত্বে রীতিমত বড হইয়া উঠিযাছে।' এমনকি দেবু ঘোষও অনিরুদ্ধের প্রতি সহানুভূতি সত্ত্বেও এই ঘটনায বিরক্ত বোধ করে। 'সে বলিতেছিল,—কামার, ছুতোর, নাপিত কাজ করব না বললেই চলবে না। কাজ করতে তারা বাধ্য।' গ্রাম্য বিরোধের নিষ্পত্তি গ্রামের মধ্যেই করার প্রথাকে সে শ্রদ্ধা করে। 'গ্রাম্যজীবনের ব্যবস্থা শৃঙ্খলার বহু তথ্য সে ব্যগ্র কৌতূহলে অনুসন্ধান

করিয়া জানিয়াছে।' এই শৃঙ্খলাভঙ্গ হয় এমন কোন কাজকে সে সমর্থন করতে পারেনা। তার মতে অনিরুদ্ধ গ্রামের শৃঙ্খলা ভেঙ্গেছে। এই শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও সে করে। নিজে উদ্যোগ নিয়ে গ্রাম জীবনে সমাজ পঞ্চায়েতের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য নতুন করে পঞ্চায়েতের মজলিসের আয়োজন করে। শ্রীহরি আর জগন ডাক্তার কেবল আসে না সে মজলিসে। কিন্তু মজলিস চলাকালে হরিজন পল্লীতে আগুন লাগে মজলিস ভেঙ্গে যায়। শ্রীহরি রাতের অন্ধকারে পাতু বায়েনের খড়ের চালে জ্বলন্ত বিড়ি গুঁজে আগুন ধরিয়ে দেয়। একথা ঠিক যে ভাঙ্গা আসর আর ভাঙ্গা কাঁসর যেমন জোড়া লাগে না, গ্রামসমাজের ভাঙ্গা পঞ্চায়েতকেও আর জোড়া দেওয়া সম্ভব হয় না। দেবু ঘোষের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। সমাজের এই সংকট দেবুর নিজেরও সংকট হয়ে দাঁড়ায়। যাইহোক, পরবর্তী ঘটনাক্রমে দেখা যায় দেবু ঘোষ অনিরুদ্ধর বিশ্বাস আর শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। আর শ্রীহরি দেবুকেই তার প্রধান শত্রু হিসাবে দেখে।

দেবু ঘোষের নেতৃত্বে দীক্ষিত হওয়ার ঘটনাটি কিন্তু বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সেটা উনিশশো ছাব্বিশ সালের সেটেলমেণ্ট জরিপের সময়। গ্রামের মানুষের কাছে গ্রামে সরকারী আমলার আগমন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই আশঙ্কার কারণ হয়। সেটেলমেণ্ট তো সে হিসেবে বিভীষিকা বিশেষ। দুঃসংবাদটা প্রথম আনে তারা নাপিত। কঙ্কণায় সেটেলমেণ্টের ক্যাম্প বসেছে। মাঠে তখন পাকা ধান। এই সময় জরিপ মানেই পাকা ধানের উপর দিয়ে শেকল চালানো। কৃষকের সমূহ ক্ষতি। মাঠের ধান সব কেটে গোলায় তোলা সময়সাপেক্ষ। গ্রামে নানা জটলা হয়। সদরে দরখাস্ত করে সেটেলমেণ্ট পেছিয়ে দেওয়ার কথাও চলে। ইতিমধ্যে জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় সেটেলমেণ্টের বিরোধিতা করায় গ্রেপ্তার হয়েছেন এখবর কাগজে পড়ে গাঁয়েরা লোকেরা ভীত হয়ে কিছুটা দিশাহারা বোধ করে। শ্রীহরি আর গোমস্তা দাশজী অবশ্য সদরে গিয়ে 'ভেট দিয়ে' কিছু সময় নেবার চেষ্টা করার প্রস্তাব দেয়। লোকেরা খুর ভরসা পায় না। এদিকে ঘটনাক্রমে এক সার্ভে আমীনের সঙ্গে দেবু ঘোষের কিছু তকরার হয়। আমীন দেবুকে তুই-তোকারী করে কথা বললে দেবুর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। ফলে সেও একই তুই-তোকারী করে উত্তর দেয়। আমীন সাহেব রেগেমেগে তখনকার মত প্রস্থান করেন।

এখানে দুটো ব্যাপার লক্ষণীয়। প্রথমত সদ্গোপ চাষী পরিবারের যারা

কিছু আধুনিক শিক্ষা লাভ করেছে তাদের মধ্যে এক আলাদা আত্মমর্যাদা বোধ জেগেছে, বিশেষ করে গ্রাম সম্পর্কের বাইরের সামাজিক স্তরে তারা সমমর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার আশা করে।১৬ আবার এই শিক্ষা তাদের চাষে বা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দৈহিক অংশগ্রহণকে অমর্যাদাকর ভাবতে শেখায়। আধুনিক বা উপনিবেশিক শিক্ষার সঙ্গে এবিষয়ে ব্রাহ্মণ্য শিক্ষার একটা মিল আছে। ব্রাহ্মণের পেশা অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, যজন, যাজন। ব্রাহ্মণের লাঙল ধরতে নেই। ব্রাহ্মণই সমাজপতি, সমাজশ্রেষ্ঠ। অতএব সমাজের শ্রেষ্ঠদের উৎপাদন প্রক্রিয়ায় দৈহিক শ্রমের দ্বারা অংশগ্রহণ অমর্যাদার। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিও লাঙল ধরে চাষের কাজে অংশ নিতে লজ্জা বোধ করে। দেবু পণ্ডিত সদ্‌গোপ চাষী সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও চাষের কাজে অংশ নেয় না।' যেমন হরেন ঘোষাল নেয় না। সে একে ব্রাহ্মণ তায় ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়েছে। জগন্নাথ ঘোষ কায়স্থ এবং ডাক্তার কাজেই সেও চাষ করে না। আর চাষ করে না শ্রীহরি কারণ সে সম্পদশালী এবং সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন তার লক্ষ্য। আধুনিক শিক্ষাও সমাজে উচ্চনীচ ভেদ এবং শাসকের বিশেষ মর্যাদার স্থানকে সুরক্ষিত করার অনুকূল মানসিকতাই তৈরী করে।

যাইহোক, গ্রামে সার্ভে শুরু হলে দেখা গেল 'সার্ভে টেবিলের ধারে দাঁড়াইয়া আছে সেই কানুনগো লোকটি!' দেবু ঠিক করেছিল 'যা হয় হউক, সে কিছুতেই এই কানুনগোর সম্মুখে হাজির হইয়া হাতজোড় করিয়া দাঁড়াইবে না।' কিন্তু শেষে 'দেবুরই একটা জমি পরিমাপের সময় কানুনগোর সঙ্গে তাহার বচসা আরম্ভ হইল। কথার উত্তর দিতে দিতেই দেবুর নজর পড়িল—তাহার জমির ঠিক মাঝখানে পাকা ধানের উপর জরীপের শিকল টানা হইতেছে। রাগের মাথায় দেবু চরম কাণ্ড করিয়া বসিল। জরিপের চেন টানিয়া তুলিয়া ফেলিয়া দিল।' ফল যা হওয়ার তাই হল। কানুনগো সার্ভে বন্ধ করে ডেপুটিকে রিপোর্ট করল এবং সার্ভের কাজে বাধা দেওয়ার জন্য 'ওয়ারেণ্ট অব য্যারেস্ট' জারী হল। দারোগা-পুলিস গাঁয়ে এল। দেবু গ্রেপ্তার হল। শ্রীহরি ক্ষমা চেয়ে মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিল। দেবু অস্বীকার করে গ্রেপ্তার বরণ করল। গাঁয়ের লোক ভীত এবং নির্বাক। দারোগা দেবুকে নিয়ে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে অগ্রসর হতেই,—'ওয়েট্! চণ্ডীমণ্ডপে নাটকীয়ভাবে প্রবেশ করিল হরেন ঘোষাল। তাহার হাতে একটি

অতি সুন্দর গাঁদা ফুলের মালা। মালাখানি সে দেবুর গলায় পরাইয়া দিয়া উত্তেজিত আবেগে চিৎকার করিয়া উঠিল—জয় দেবু ঘোষের জয়।'

'মুহূর্তে ব্যাপারটা ঘটিয়া গেল।'

দেবু এবং সমবেত জনতার মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল। 'দারোগা যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ফুলের মালা আর জয়ধ্বনিতে দেবুর পা হইতে মাথা পর্যন্ত একটু অদ্ভুত শিহরণ বহিয়া গেল। বুকের মধ্যে যে ক্ষীণতম দুর্বলতার আবেগটুকু স্পন্দিত হইতেছিল—সেটুকুও রহিল না, তাহার পরিবর্তে ভাঁটার নদীর বুকে জোয়ারের মত একটা বিপরীতমুখী উচ্ছ্বসিত আবেগ আসিয়া তাহাকে স্ফীত প্রশস্ত করিয়া তুলিল। সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনতা দারোগা কনেস্টবলের উপস্থিতি সম্পর্কে সচেতন থাকিয়াও প্রতিধ্বনি তুলিল—জয় দেবু ঘোষের জয়। দৃঢ় দীর্ঘ পদক্ষেপে দেবু সম্মুখে অগ্রসর হইল।' নিজের স্বার্থবুদ্ধির উপরে নীতিবোধকে স্থান দিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করার যে সাহস দেবু দেখালো তা সমগ্র গ্রামবাসীর মনকে নাড়া দেয়।

এই ঘটনা সমগ্র গ্রামের মানুষকে যেন এক আত্মীয়তায় আবদ্ধ করল। সেটা পৌষলক্ষ্মী পূজার সময়। দেবুর স্ত্রী বিলুর 'লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করিতে হাত উঠিতে ছিল না।' কিন্তু সমস্ত গ্রাম সহানুভূতিতে এগিয়ে এল। 'প্রায় প্রতি ঘরের মেয়েরা আসিয়া বিলুর তত্ত্ব লইয়া গিয়াছে। জগন ডাক্তারের স্ত্রী পাঁচবার আসিয়াছে। হরিজনেরা জনে-জনে আসিয়াছে। খেজুর গুড়ের মহলাদারটি খেজুর গুড় দিয়া গিয়াছে। সতীশ হইতে প্রত্যেকেই ছোট ছোট ঘটিতে কাঁচা-দুধ আনিয়া দিয়া গিয়াছে। আর প্রয়োজন নাই বলিলে শুনে নাই, বুঝে নাই'। 'রাঙাদিদি কত বাহার করিয়া নিপুণ হাতে সাজাইয়া লক্ষ্মী পাতিয়া দিয়াছে। পদ্ম দুই-তিনবার আসিয়াছিল। দুর্গা তো সকাল হইতে বসিয়াই আছে, নড়ে নাই, শ্রীহরির মা-বউও আসিয়াছিল।' শিবকালীপুরে বুঝি এই শেষ বারের মত সমগ্র গ্রামবাসী গ্রাম সম্পর্কের নিবিড় আত্মীয়তার উপলব্ধিতে আপ্লুত হয়। পুরানো গ্রামসমাজের একাত্ম-বোধে বুঝি জেগে উঠেছিল সারা গ্রাম। অবশ্য এই ভাব স্থায়ী হয় না যদিও কিছু বেশ থাকে।

দেবুর একবছর তিনমাস জেল হয়। এই কারাবরণ কিন্তু দেবুকে নেতৃত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। দেবু জেল থেকে ফিরলে গণদেবতা উপন্যাসের পটভূমি আরো প্রসারিত হয়। যেমন দেবুর মনের দরজাও আরো খুলে যায়। লক্ষ্য

করলে দেখা যাবে গণদেবতা-পঞ্চগ্রাম উপন্যাসের গ্রামজীবন প্রত্যক্ষভাবে বাইরের অভিঘাতে বিশেষভাবে আলোড়িত হয় দুবার। দুটো সেটেলমেণ্ট গ্রামসমাজকে প্রত্যক্ষভাবে বিপর্যস্ত করে তোলে। এই সেটেলমেণ্ট গ্রামের কৃষি সম্পর্কের উপর চাপ সৃষ্টি করে। উপনিবেশিক সরকার এবং তার সৃষ্ট চিরস্থায়ী জমিদারকুল এই জরিপের দ্বারা সবচাইতে বেশী লাভবান হয়। অন্যদিকে গ্রামের সর্বহারা ক্ষেত মজুরেরা অন্তত বসতভিটার উপর দখলীসত্ত্ব লাভ করে। রায়তচাষীরা কোনদিনই সেটেলমেণ্টকে খুব সুনজরে দেখেনি। বাংলার গ্রামসমাজে সেটেলমেণ্টের প্রভাব তারাশঙ্করের মত আর কেউ এমন নিপুণভাবে তুলে ধরতে পারেননি। যাইহোক, প্রথম সেটলমেণ্ট শিবকালী পুরের মানুষকে একাত্মতায় নিবিড় করেছিল আর দেবুকে নেতৃত্বের অধিকার দিয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় সেটেলমেণ্টকে কেন্দ্র করে জমিদারের খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা, প্রজাদের বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন, জমিদারের প্রজাঐক্যে ভাঙ্গন ধরাবার জন্য হিন্দু ও মুসলমান প্রজাচাষীর মধ্যে বিদ্বেষ ও সন্দেহের বীজ বপন করা এবং দেবুকে নেতৃত্ব থেকে সরাবার চক্রান্ত সব মিলিয়ে একটা পুরো সময় যেন ধরা পড়ে তারাশঙ্করের লেখায়। ইতিমধ্যে দেখা যাবে,চণ্ডীমণ্ডপ বেদখল, গ্রামসমাজ বিভক্ত এই অবস্থায় গ্রামজীবনে স্বদেশী আন্দোলনের প্রবেশ। এই যে ভাঙ্গাগড়া, ঘাত-প্রতিঘাত এরই মধ্যে সাধারণ মানুষের মনের গহনে দৃষ্টিপাত করেন লেখক তাদের মানসিকতাকে বুঝতে।

স্বয়ম্ভর সমাজের রীতিনীতি অনেকদিন আগেই বিগত। এমনকি পুরানো জমিদারদের অনেকেই গতায়ু। দ্বারিক চৌধুরী এই জমিদারদেরই এক প্রতিনিধি। জমিদার থেকে সাধারণ-বিত্ত মালিক চাষীর স্তরে নেমে এলেও ব্রাহ্মণ্য নীতি বোধকে পুরোপুরি বিসর্জন দিতে পারেননি অনেক কাল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত এই নীতিবোধ আঁকড়ে থাকাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অভাবের ঘরে স্বয়ম্ভরের রীতিনীতি বেশী দিন টেকে না। বন্যায় শেষ সম্বল ভেসে গেলে অভাবের তাড়নায় গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দন ঠাকুরকে উঠতি ধনী শ্রীহরি ঘোষের কাছে পাঁচশ টাকায় বিক্রি করে বিবেক দংশনের যন্ত্রণায় মৃত্যুর দিন গুণতে হয়। এই ঘটনায় দেবুর ঐতিহ্যানুসারী সামাজিক সত্তায় আঘাত লাগে। আবার যে অভাবের তাড়নায় এই ঘটনা ঘটে এবং তার ফলে চৌধুরীর করুণ অবস্থা তার মানবিক সত্তায় সহানুভূতির উদ্রেক হয়। গ্রামসমাজের ভাঙ্গনের ইতিহাসে এই ঘটনা যেন আর এক মাত্রা যোগ করে।

এক কালের সমাজের বিধান দাতা ন্যায়রত্নও বোঝেন তার দিন ফুরিয়েছে। তিনি নামেই সমাজপতি। শ্রীহরি আর কঙ্কণার বাবুরাই আসল সমাজকর্তা —দণ্ডমুণ্ড-বিধাতা। এদের অনাচার-অত্যাচারে সমাজজীবন দূষিত, কলুষিত তবু কিছু করার ক্ষমতা তার নেই। তিনি এখন 'বাতিল বিধাতা'। যদিও সাধারণ নিম্নবর্ণ বা অন্ত্যজ বর্ণের মানুষ এখনো তাকে ন্যায় ও ধর্মের প্রতীক বলেই মনে করে এবং মান্যও করে। গ্রামবাংলার বর্ণভিত্তিক সমাজ বহুদিন ধরেই পরিবর্তিত হচ্ছিল। কিন্তু শ্রেণীভিত্তিক সমাজের মাপজোখে ঠিক খাপ খাচ্ছিল না। যাইহোক, নতুন মালিক শ্রীহরি ঘোষ বা কঙ্কণার মুখুজ্জেদের আইনি শাসনের নিষ্ঠুরতার মুখে সাধারণ মানুষ এই প্রাচীন সমাজপতির উপর ভরসা রাখতে চেয়েছিল। কিন্তু ন্যায়রত্ন নিজে বোঝেন ভরসা দেওয়ার ক্ষমতা তার নেই।

এরকম এক সংকটের অবস্থায় দেবু ঘোষের মধ্যে যেন ন্যায়রত্ন খুঁজে পান একটা ন্যায়ের আশ্রয়, যার উপর দুঃখী মানুষ ভরসা রাখতে পারে। ন্যায়রত্ন লক্ষ্য করেছিলেন দেশ যখন নতুন ধনীনন্দন আর জমিদারদের ভ্রষ্টাচারে বিপর্যস্ত তখন 'এই স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ সেইটাকে অনেকটা ধুইয়া মুছিয়া দিয়া গিয়াছে। মানুষের একটা নীতিবোধ জাগিয়াছে।' দেবুর মধ্যেও তিনি একটা নীতিবোধ দেখতে পেয়েছিলেন। সেটেলমেণ্টের সুযোগে 'ছোট বড় সমস্ত জমিদারই এক সঙ্গে বৃদ্ধি করিয়া' খাজনা বাড়াবার জন্য 'কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছে। প্রজারাও বসিয়া নাই, বৃদ্ধি দিব না এই রব তুলিয়া তাহারাও মাতিয়া উঠিয়াছে।' গ্রামে গ্রামে প্রজা সমিতি গড়ে উঠেছে। 'মহাগ্রামের লোক শরণাপন্ন হইয়াছিল ন্যায়রত্ন মহাশয়ের। ন্যায়রত্ন পত্র লিখিয়া তাহাদিগকে দেবুর কাছে পাঠাইয়া দিয়াছেন।' এ পত্রে ন্যায়রত্ন লেখেন, 'তোমার হাতে ভার দিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। কারণ মানুষের সেবায় তুমি সর্বস্ব হারাইয়াছ, তোমার হাতে ঘটনাচক্রে যদি লাভের পরিবর্তে ক্ষতিও হয়—তবু সে ক্ষতিতে অমঙ্গল হইবে না বলিয়া আমার প্রত্যয় আছে।' এখানে একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। ভারতীয় নীতিবোধে ত্যাগের একটা মহিমা স্বীকৃত। দেবু কলেরা মহামারীতে সেবা করতে গিয়ে স্ত্রী-পুত্র হারিয়েছিল। বিভিন্ন সময় নিজ স্বার্থের ক্ষতি করেও ন্যায়ের এবং অত্যাচারিতের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। এ ব্যাপারটা গাঁয়ের লোকের কাছে তাকে একজন 'মানুষের মত মানুষ' হিসাবে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাত্র

কবে তুলেছিল। মানুষ তাকে বিশ্বাস কবতে পাবত। ন্যায়রত্নেব দেবুব উপব আস্থাব একাধিক কাবণ আছে—ঐতিহ্যেব প্রতি দেবুব শ্রদ্ধা, গ্রামেব প্রতি টান, স্বদেশী মনোভাব আব সর্বোপবি তাব নীতিবোধ। পৌত্র বিশ্বনাথ, যে কলকাতায সাম্যবাদী আন্দোলনেব সঙ্গে যুক্ত, তাব উপব কিন্তু ন্যাযবত্নেব সেবকম কোন আস্থা নেই। এবং তা স্বাভাবিক। ন্যাযবত্নেব মতে, 'বিশ্বনাথেব সংসাব-জ্ঞান নেই।' কাজেই তার যুক্তিতে কান না দেওযাব পবামর্শ দেন তিনি প্রজাদেব।

তাবাশঙ্কবেব গভীব সামাজিক দৃষ্টিব পবিচয পাওযা যায এখানে। গাঁযেব মানুষ ন্যাযবত্নেব বংশধব হিসেবে বিশ্বনাথকে শ্রদ্ধা কবতে পাবে, ভক্তি কবতে পাবে এমনকি খানিকটা সমীহও কবতে পাবে কিন্তু ঠিক ভবসা কবতে পাবে না। যা তাবা সহজেই কবতে পাবে দেবু ঘোষকে। দেবু পণ্ডিত তাদেবই মত সংসার ধর্মে বিশ্বাসী একজন 'গৃহস্থ' এবং গাযেব লোকেব বিচাবে 'মানুষেব মত মানুষ'। আসলে দেবুব ন্যায়-অন্যায বোধেব সঙ্গে তাবা আত্মীযতা উপলব্ধি কবতে পাবে। দেবু পণ্ডিত শুধু তাদেব একজনই নয, তাবা তাকে বুঝতে পাবে, যদিও বেশীক্ষণ তাব পাশে বসে থাকতে কেমন অস্বস্তি বোধ কবে। গাযেব মানুষ মনে করে দেবু 'দশেব দুঃখে দুঃখী, দশেব সুখে সুখী।' শুধু তাই নয, 'দেবু তো আমাদেব সন্নেসী।' সন্নেসী হলেও সে আমাদেব। আবাব ঠিক এই জন্যই তাব পাশে বসে থাকতে পাবেনা বেশীক্ষণ। নিজেদেব দুর্বলতা অক্ষমতায তখন তাবা ক্লিস্ট বোধ কবে। দেবু ঘোষ ছিল স্বাভাবিক নেতা। অনিবুদ্ধ, ডেটেনিউ যতীন বা বিশ্বনাথ কাবো পক্ষেই কিন্তু গ্রামেব স্বাভাবিক নেতা হওযা সম্ভব ছিল না। কার্তিক লাহিড়ীব যতই আপত্তি থাক 'দেবু চবিত্রেব নির্মাণ পদ্ধতিতে',[১৭] তাবাশঙ্কব দেবুকে নেতা নির্মাণ কবে বাস্তবতাব পবাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই। অনিবুদ্ধ বা বিশ্বনাথ নেতা হলে নিশ্চিত সাহিত্যবোধে ঘাটতি ঘটত যদিও হযত প্রগতিবাদী সমালোচকরা খুসী হতেন।

গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে এবং হাঁসুলীবাঁকের উপকথায তাবাশঙ্কব গ্রাম সমাজেব বিভিন্ন স্তবেব মানুষেব মনেব গভীবে অবগাহন কবে তাদেব যে ভাবে বোঝাব চেষ্টা কবেন তা বুঝি বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। গণদেবতা-পঞ্চগ্রামে যদিও প্রধানত প্রজাচাষীব দৃষ্টিতে সমাজকে দেখবাব এবং দেখাবাব চেষ্টা হযেছে, ব্রাত্যজনেব অভিজ্ঞতাব কথাও কিন্তু অতি নিপুণ ভাবে বর্ণিত

হয়েছে। সতীশ, পাতুরায়েন বা পাতুর বোন দুর্গা চরিত্র চিত্রনে লেখক যে গভীর দৃষ্টি ও মনুস্বীয়ানার সাক্ষ্য রেখেছেন তা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ সন্দেহ নেই। দুর্গার চোখ দিয়ে গাঁয়ের এবং বাজারে-শহরের ধনী-মানীদের রাতের চেহারা যেরকম বিশ্বাসযোগ্য ভাবে দর্শিয়েছেন তা আসলে পতনশীল-সমাজ-কর্তাদের প্রতি তীব্র বিদ্রূপের ঝলক। সন্দেহ নেই দুর্গা চরিত্র তারাশঙ্করের এক অসামান্য সৃষ্টি। দেবুর সঙ্গে দুর্গার সম্পর্ক, বিভিন্ন ঘটনায় দুর্গার অলক্ষ্য ভূমিকা এবং তার জীবনের গতি পরিবর্তন উপন্যাসের পরিণতিতে এক শান্তরসের সঞ্চার করে। দেবুও পাল্টেছে। জাতিভেদ এবং অন্ত্যজবর্ণের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে তার পুরানো ধারণার পরিবর্তন ঘটেছে। দুর্গার হাতে জলগ্রহণে তার আর আপত্তি নেই। দুর্গা কিন্তু তাতে রাজী নয়। এখানে দুর্গা বুঝি আরো মহৎ হয়ে উঠে। প্রগতিবাদী সমালোচক হয়ত বলবেন লেখক এখানে যথেষ্ট প্রগতিশীলতার পরিচয় দেননি বা বলবেন এটা 'ন্যাচেরালিজম' হতে পারে কিন্তু 'রিয়েলিজম' নয়। রসিক পাঠক হয়ত বলবেন ভাগ্যিস লেখক তত্ত্ব নিয়ে অত ভাবেননি তাইতো এটা সাহিত্য হয়েছে। যেমন দেবুর বিধবা স্বর্ণকে বিয়ে করার ঘটনা যতই প্রগতিশীল হোক, মনে হয় যেন আরোপিত। ঠিক যেন বিশ্বাস-যোগ্য ভাবে উপস্থাপিত হয়নি। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও গণদেবতা—পঞ্চগ্রাম যে বিশশতকের প্রথমার্ধের গ্রাম বাংলার ভঙ্গুর সমাজের জীবন্ত ইতিহাস সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। সরোজ বন্দোপাধ্যায় যথার্থই লিখেছেন, 'গণদেবতা শুধু তারাশঙ্করেরই নয়, বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যেরই একটি যুগ-পরিচায়ক উপন্যাস। একটা দেশ একটা জাতির মোড় ফেরার আশ্চর্য আলেখ্য এই উপন্যাস। আশ্চর্য এই ঔপন্যাসিকের সমাজবোধ, ইতিহাসের ছন্দজ্ঞান।'

একথা ঠিক তারাশঙ্কর প্রাচীন গ্রামসমাজের প্রস্থানের জীবন্ত ইতিহাস রচনা করেছেন তার বিভিন্ন উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু নবীন সম্পর্কের প্রবেশ যেন তেমন জোরালো নয় তার সাহিত্যে। যদিও স্বদেশীর প্রবেশ অনেক ক্ষেত্রেই তাৎপর্যময় হয়ে উঠেছে। আসলে তারাশঙ্করের সাহিত্য দৃষ্টি দৃঢ় বাস্তব ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকায় যা স্বাভাবিক এবং যথার্থ তাই তিনি পাঠকের গোচরে এনেছেন। বাস্তব হচ্ছে গ্রাম সমাজ ভেঙেছে কিন্তু পরিবর্ত বা পরিপূরক শিল্পায়নের অভাবে নতুন উৎপাদন সম্পর্কের যথাযথ

প্রবেশ ঘটেনি বাংলাব গ্রাম সমাজে। বাঢবঙ্গে কিছু চাল কল, একটা দুটো চিনি কল, আব বাণীগঞ্জে অঞ্চলেব কয়লাখনি ছাড়া তেমন কোন শিল্প তখনো গড়ে উঠেনি। অবশ্য 'রেলওয়ে' এবং আইনেব শাসনেব ফলে কিছুটা নাগবিক সংস্কৃতিব অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। আব ছিল আধুনিক শিক্ষাব প্রভাব। আধুনিক শিক্ষা একদিকে যেমন ন্যায-অন্যায বোধে নতুন মাত্রা যোগ কবেছিল তেমনি শিক্ষিত-অশিক্ষিতেব এক নতুন জাতিভেদেবও জন্ম দিযেছিল। যে ভেদেব চবিত্র নির্ধাবিত হত শ্রমিক আর অবসবভোগী জীবন যাপনে। যাইহোক, আইনেব শাসন গ্রামসমাজেব পুবানো প্রথা-বন্ধনকে শিথিল কবে দিযেছিল। সমাজ পঞ্চায়েত বিগত, ক্ষমতাহীন। চণ্ডীমণ্ডপ সম্পদশালীব বেদখল। আব কেন্দ্রীয আইন উচ্চবিত্তেব হাতে হযে উঠেছিল নিষ্ঠুব শোষনেব সহজ হাতিযাব। অনাহাব, মহামাবী আর অন্যায়-অত্যাচাবের কবলে গ্রাম বাংলাব খেটে খাওয়া মানুষ। এই অবস্থায় স্বদেশী ও প্রজা আন্দোলন শোষিতেব পক্ষে দাঁড়িযে গ্রাম সমাজেব জীবন প্রবাহ আবো কিছুকাল অক্ষুণ্ণ বেখেছিল। উপনিবেশিক আমলেব গ্রাম সমাজেব এই বাস্তবতা তাবাশঙ্কবেব উপন্যাসে প্রাণবন্ত হযে উঠে। অন্তগামী বাংলার গ্রামসমাজের জীবন্ত ইতিহাস তাবাশঙ্কবেব সাহিত্য।

টীকা ও তথ্যসূচী

এ প্রবন্ধে তাবাশঙ্কব বন্দোপাধ্যাযেব বিভিন্ন উপন্যাস থেকে যে সব উদ্ধৃতি দেওযা হযেছে সেগুলি মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডেব 'তাবাশঙ্কর বচনাবলী'ব প্রথম, তৃতীয, চতুর্থ, ত্রযোদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ খণ্ড থেকে নেওয়া হয়েছে।

১। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, মার্কস-এব দিকে, 'বারোমাস', শারদীয ৮৭, কলকাতা। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য অতি দক্ষতার সঙ্গে বিষয়টির অবতাবনা করেছেন। এই প্রবন্ধে।

২। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, 'তারাশঙ্কব রচনাবলী' প্রথম খণ্ড, প্রধান ভূমিকা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৩৯৭, পৃ ঝ।

৩। অসীম বায, তাবাশঙ্কব প্রসঙ্গে, 'সাহিত্য পত্র' গ্রীষ্ম সংখ্যা, ১৩৭৯ কলকাতা।

৪। ঐ ঐ।

৫। ঐ ঐ।

৬। শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায়, "বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসেব ধাবা" মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৩৬৯, পৃ ৫৫১, ৫৫০।

৭। তারাপদ মুখোপাধ্যায, 'তারাশংকর রচনাবলী' পূ, উ, তৃতীয খণ্ড, পৃ, IX

৮। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায, 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' পূ, উ, পৃ ৫৪৯।

৯। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায, 'তারাশংকর রচনাবলী' পূ, উ, প্রধান ভূমিকা।

১০। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য, সমাজের মাত্রা এবং তারাশঙ্করের উপন্যাস চৈতালী-ঘূর্ণি', 'এক্ষণ' শারদীয সংখ্যা, ১৩৮২, পৃঃ ৮৫।

১১। তারাপদ মুখোপাধ্যায, 'তারাশংকর রচনাবলী' পূ, উ, পৃ III

১২। অশ্রুকুমার সিকদার, 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস' অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃ, ১২৬।

১৩। কার্তিক লাহিড়ী, 'বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস, 'এক্ষণ' পৌষ-চৈত্র, ১৩৭৮।

১৪। এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেওযা যায। যেমন, বর্দ্ধমানের বিনয চৌধুরী, ময়মনসিংহের মনি সিংহ, ভূপেশ গুপ্ত, স্নেহাংশু আচার্য। পূর্ববঙ্গের কমিউনিস্ট আন্দোলনের নেতাদের একটা বড অংশ এসেছিল ছোট বড তালুকদার পরিবার থেকে। ধাত্রী দেবতার শেষে জেলে শিবনাথের সঙ্গে গৌরী, শিশু পুত্র ও পিসীমার দেখা করার যে বর্ণনা আছে প্রায একই রকম এক দৃশ্যের সাক্ষী বর্তমান লেখকও।

১৫। অশ্রুকুমার সিকদার, 'আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস' পূ, উ, পৃঃ ১৪৪।

১৬। সরোজ বন্দোপাধ্যায, 'বাং উপন্যাসের কালান্তর' দেজ পাবলিশিং কলকাতা ১৩৯৫, পৃঃ ৩০৩, ৩০৪
সরোজ বন্দোপাধ্যায এ বিষযে চিন্তাযোগ্য কিছু আলোচনা করেছেন উপরোক্ত বইযে।

১৭। কার্তিক লাহিড়ী, 'বাস্তবতা ও বাংলা উপন্যাস' পূ, উ।

১৮। সরোজ বন্দোপাধ্যায, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', পূ, উ, পৃঃ ৩০০।

[প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের তারাশংকর সম্পর্কিত অসামান্য প্রবন্ধ দুটি অধ্যাপক অভ্র ঘোষ আমাকে যোগাড় করে দিয়েছেন। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ।]

অস্তিবাদীর দৃষ্টিতে তারাশঙ্করের কথাসাহিত্য

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

নিরন্তর ক্ষয় এবং ক্ষতির দ্বারা গড়ে ওঠা মানুষের জীবন চিরঅতৃপ্ত এবং অপূর্ণ। হতাশা, নিরাপত্তাহীনতা এবং বেদনাক্লিষ্ট জীবনযাপন মানুষের ললাটলিপি। জাগতিক আনন্দ ও মঙ্গলের সন্ধানে নিরত মানুষ নিমজ্জিত হয় ট্রাজেডির গভীরে। তা সত্ত্বেও হাসি ও কান্নার লুকোচুরি চলছেই। জীবনের সত্যসন্ধানে মানুষের বেপরোয়া অভিযান কেন শুরু হয়েছিল এবং কবে থেকে কোথায় বা তার পরিসমাপ্তি তা না জানাই মানুষের জন্মলব্ধ অধিকার। যদি মানুষের সুখাভিলাষ চরিতার্থ হত, তাহলে —এবং তা সম্ভব নয় কদাপি—মানুষ পরিণত হত চেতনাহীন পশুতে। কাফ্‌কা-র মেটামরফসিস-এর গ্রিগরি যেহেতু মানুষ থেকে কীটে রূপান্তরিত তাই তার পার্থিব বস্তুতে রুচিবিকার ঘটলেও ভিতরে চলেছিল চেতনার অন্য এক প্রবাহ। সাধারণ পশুর ইন্দ্রিয়বৃত্তির ঊর্ধ্বে সূক্ষ্মতর কোনো কিছুর অস্তিত্ব থাকে না। তাই নিছক সুখে পশুরই চিন্তামুক্ত অধিকার। ইংরেজদের সম্পর্কে নীট্‌শে বক্রোক্তি করেছিলেন—মানুষ সুখ চায় না, চায় ইংরেজরা। হয়ত এই ধরনের পূর্বানুমান থেকেই স্টুয়ার্ট মিল বলেছিলেন তৃপ্ত 'বরাহনন্দনের চেয়ে অতৃপ্ত শেক্সপীয়র অনেক গুণে সেরা'। কিন্তু মিলের এই মন্তব্যে সেই গূঢ়ার্থ নেই যে, অতৃপ্তি ছাড়া অন্য কোনো কিছু নির্বাচনের সুযোগ নেই মানুষের। রাজনীতি নয়, অর্থনীতি নয়, নয় অন্য কোনো প্রযুক্তি বিদ্যার অভাব যা মানুষকে সুখবঞ্চিত করে রাখে। আসলে মানুষ 'মানুষ' বলেই 'চির অসুখী'। 'অসুখ' শব্দটা অবিচ্ছিন্ন সম্পর্কে যুক্ত 'অভাব' শব্দের সঙ্গে। অভাবের সঙ্গে যুক্ত থাকে 'চাহিদা' এবং 'চাহিদা'ই মানুষকে সচেষ্ট রাখে অপ্রাপ্যকে লাভ করার জন্যে। 'চাহিদা', 'অভাব', 'অসুখ' প্রতিটি শব্দই কিন্তু ঐকান্তিক। দস্তয়েভস্কি তাঁর 'Notes from the underground'-এ ঈষৎ শ্লেষজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন ঃ

> What man wants is simply INDEPENDENT CHOICE, whatever that independence may cost and wherever it may lead. Any choice, of course,

the devil only knows, what choice.'[১]

দস্তয়েভস্কি বলেছিলেন 'suffering tells us that we exist'. এই 'suffering' এককের এবং Existence-ও এককের। কি বহুজনের সুখ, দুঃখ, যৌনতা এসবও প্রাসঙ্গিক হয়ে এসেছিল সার্ত্র-র আলোচনায়। একটি মানুষ তার যৌন সহচর অথবা সহচরীর এবং তাদের সম্পর্কের পরম তৃপ্তির মধ্যে 'I' এবং 'thou'-এর মধ্যেকার যে আত্মলুপ্তির মুহূর্ত, অস্তিবাদী দর্শন সেই সত্যটিকেও 'suffering' এবং 'Existence দিয়ে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু অস্তিতা ও ক্লেশভোগ দুইই নির্ভর করে 'বোধ'-এর ওপর। আলবেয়ার ক্যামু-র 'ক্যালিগুলো'র নায়ক বলেছিল—ধন্যবাদ যে, আমি নিঃসঙ্গ মানুষের স্বর্গীয় স্বচ্ছন্দদৃষ্টিকে জয় করতে পেরেছি।— ক্যালিগুলা-র নায়ক নিজের ক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন। এই সচেতনতার জন্য সে কৃতার্থ বোধ করতে পারে, কিন্তু তার চেতনাই কি তার দুঃখের কারণ নয়? কামনা, সাফল্য, ব্যর্থতা অথবা সাফল্য ও ব্যর্থতার বোধ—এই চক্রকের মধ্যেই ঘুরছে মানুষ অথচ 'Transcendence' বা উত্তরণ ছাড়া তার অস্তিত্বের প্রথম শর্তই অস্বীকৃত। নিজের থেকে একটু দূরে সরে এসে না দাঁড়ালে এবং সেখান থেকে নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে না পারলে নিজের অস্তিত্বকে কি টের পাওয়া যায়?

দার্শনিক তত্ত্বের ধারের কাছের মানুষ ছিল না তারাশঙ্করের শ্রীনাথ ডাক্তার। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ যখন মরুদ্যানের সন্ধানে ক্লান্ত তখন সাধারণ, অতি সাধারণ, একটা মানুষ অনায়াসে পেয়ে যায় পান্থপাদপের তৃষ্ণাহর আশ্রয়। কত অনায়াসে উচ্চারণ করে শ্রীনাথ ডাক্তার :

> জুতো না থাকাটাই হল স্বাভাবিক অবস্থা পায়ের। অথচ জুতো না হলে তার চলবে না। ফোস্কা হবে, টন টন করবে। তবু চাই। মানুষের দেখুন—একা আসে—একা যায়—একাকিত্বই তার সত্য ও অকৃত্রিম অবস্থা, তবু সে একা—তার কেউ নেই, মনে হলেই বুকে যেন পাথর চেপে বসে।

জীবন সম্পর্কে এই বোধই শ্রীনাথ ডাক্তারকে সত্তার সন্ধানে ব্যাকুল করে দিয়ে

---

১. Tr Constance Garnett. quoted from Dostoyevsky's 'White Nights and other stories, 1925. The Macmillan Company, London.

শেষ পর্যন্ত তাকে আত্মবিলুপ্তির অসীম গহ্বরে ঠেলে দেয়। শ্রীনাথ নিজে থেকে সরে না দাঁড়ালে যে Ideological structure থেকে discourse structure গড়ে ওঠে তার জন্ম হত না। ভেষজ নিয়ে যে শ্রীনাথ পরীক্ষা নিরীক্ষা করত এবং গবেষণায় প্রায় উন্মত্ত হয়ে উঠত সেই শ্রীনাথ নিজের স্ত্রীর মৃত্যুর কারণে পরিণত হল নিজেই। এবার শ্রীনাথের Authentic Existence থেকে জন্ম নিল অন্য এক শ্রীনাথ। এই দ্বিতীয় সত্তা যে-সিদ্ধান্ত নিল তার 'দায়িত্ববোধ' তাকে দিল সেই 'স্বাধীনতা' যা এক অর্থে নিতান্তই 'বিযুক্তি (alienation) সেই বিযুক্তিবোধ থেকে জন্ম নিল প্রচণ্ড হতাশা। গল্পের চমৎকারিত্ব সেখানটায় যখন দেখা গেল মদে বিভোর শ্রীনাথ ডাক্তার একটা স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ নিজের Identity হারিয়ে thatness (তথতা) প্রাপ্ত হল গিরিশচন্দ্র ঘোষের যোগেশের সঙ্গে। শ্রীনাথ নিজেকে হারিয়ে পরিণত হয়েছে যোগেশে কিন্তু গল্পের শেষে যখন সে বলে "পার্টটা কেমন হচ্ছে বলুন ত ?' তখন সংগত কারণেই ছোটগল্পের সমাপ্তি এবং দার্শনিকের প্রশ্নও ঠিক সেখানে। সত্তা-বিভাজনের ঘটনা সমাজ অবয়বের বিনির্মাণ ঘটায় বা বিরোধিতা করে বলেই গল্পটা 'গল্প'।

লুডউইগ বিটসেনস্টেইন বলেছিলেন, যদি বিজ্ঞানবিষয়ক সম্ভাব্য সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়ও তবু সব চেয়ে রহস্যময় যে-জীবন তাকে হয়ত স্পর্শ-ও করা যাবে না। একটু বুঝি কৌতুক করেই বললেন, জীবনের সমস্যার সমাধান বোঝা যায় সমস্যা অদৃশ্য হয়ে গেলে। যেখানে প্রশ্ন, বুঝতে হবে, সন্দেহ'টা সেখানে এবং 'প্রশ্ন' থাকলেই তার উত্তরও থাকবে একটা। কিন্তু 'প্রশ্ন' দিয়ে ভরা যে-জীবন তার কি কোনো নির্দিষ্ট আয়তন ও ছকে বাঁধা উত্তর আছে ? অবশ্যই নেই। তাই প্রশ্নাতুর পাঠকের মনে গল্পের শেষে সম্ভাব্য উত্তরের বয়ন চলতেই থাকে। শ্রীনাথ ডাক্তার যে-প্রশ্নের মুখোমুখি করে দেয় দেবতার ব্যাধি গল্পের ড. গরগরি কিন্তু তা থেকে ভিন্ন কিছুর দিকে আকর্ষণ করেন। গরগরি কেন স্থানত্যাগ করলেন ? কেনই বা নিজেকে দূরে নির্বাসিত করে স্বস্তির সন্ধানে গেলেন ? দূরে গেলেই কি নিজের থেকে দূরে সরে যাওয়া যায় ? আসলে ড. গরগরিকে তাড়া করেছিল 'সময়' 'স্মৃতি', 'কল্পনা,' 'সত্য', মিথ্যা' ইত্যাদি কতকগুলো নানা মাত্রার শব্দ। ক্যামু-র the Outsider-এর মিউরসো (Meursault)-র কথা মনে পড়ে, যার জীবন ভাবনা, লেখকের ভাষায়,

> He refuses to lie. Lying is not only saying what is not true. It is also and especially saying more than is true and as far as the human heart is concerned, saying more than one feels.

কিন্তু গোটা বিশ্বজুড়ে যেখানে 'a pregnant emptiness' এবং 'object-los, world-los is the precondition of all creation' সেখানে ড. গবগাবি অথবা মিউর সো কষ্ট পায 'সত্য' কথা বলতে না পারাব জন্য। অথচ এটাও কি সত্য নয যে 'সত্য' নামক শব্দটা স্থানে-কালে-সময়ে বন্ধ ? সেই যে বিধবা মেযেটি যে সশ্রদ্ধ হৃদয খানি কৃতজ্ঞতায় স্নিগ্ধ পদ্মপাতায় নিযে এসে শেষকালে বিমূঢ চিত্তে উপকাবী চিকিৎসকের কাছে আত্মসমর্পন কবেছিল 'খাতকেব মতই দীনভাবে' তার সেই মাধুর্যহীন আত্মদান জাগিযে দিযেছিল ড. গবগাবিব ক্রূব প্রবৃত্তি :

> সেই যে জাগল ক্রূব প্রবৃত্তি—তার নিবৃত্তি আব হল না। শুধু তাব আহুতি নিযেই তৃপ্ত থাকতে পাবলাম না। মানুষেব সকৃতজ্ঞ চিত্তের আনুগত্যেব সুযোগে—বহু ভোগেব আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠল।

ড. গবগাবি চিকিৎসক হিসেবে বোগীর কাছে ছিলেন দেবতুল্য। কিন্তু কে জানত যে দেবতুল্য মানুষটিব মনের গোপনে আব একটা সত্তাব দানবীয অস্তিত্ব ছিল ? 'বহু ভোগেব আকাঙ্ক্ষায উদ্দাম মানুষটির উপবকাব ড. জেকিলকে হাব মানতে হল মি. হাইডের কাছে। ড. গবগাবিব 'alienation from one's own being তাকে তাডিযে বেডিযেছিল for authentic existence. এই পর্যন্ত ড. গবগরিব দ্বন্দ্বময অস্তিত্বের একটি সত্যতা। কিন্তু ভোগেব মধ্যেও তিনি অনুভব করেছিলেন 'a pregnant emptiness.' আসলে 'শূন্যতা' কোনটা, কোন্‌টাই বা 'পূর্ণতা' তা বুঝতে না পারাটাই মানব অস্তিত্বেব গোডাকাব রহস্য। সেই রহস্যেব সমাধান করার ব্যর্থ চেষ্টাতেই তথাকথিত সভ্য সমাজ থেকে পালিযে আপন সত্য অস্তিত্ব যাচাই কবাব জন্য ড. গবগাবি দাঁডিয়েছেন দর্পণে প্রতিবিম্বিত অদ্বিতীয ব্যক্তিটিব মুখোমুখি। সত্য বলাব আবেগে অস্তিত্বেব মৌলিক প্রশ্নেব মুখোমুখি হযেছেন তিনি। অব্যয প্রতিবিম্ব উত্তব দেয না। তাই কতকগুলি অক্ষবেব কাছে নিজের সত্তাটাকেই উজাড কবে দিলেন ড. গবগাবি :

> আজ হযতো আপনি মাস্টাবি কবেন না, যদি কবেন—তবে

> অনুবোধ রইল, ছেলেদেব দেবতা হবাব উপদেশ দেবেন না। তাব দেবতাকে পুজো কবতেও উপদেশ দেবেন না। তাব সঙ্গে লড়াই করাব মত সাহস দেবেন তাদের।

কিন্তু মানুষ হওয়াব 'চেষ্টা' বা 'উপদেশ' এতেই কি কর্তব্যেব সমাপ্তি? 'উপদেশ' ফললাভে কতটুকু সহাযক? মানুষ 'মানুষ' হয becoming-এব দ্বাবা। এমন কোনো ধ্রুব অপাবিবর্তনীয কিছু নিযে মানুষ জন্মায না যেখান থেকে একটিমাত্র সংজ্ঞাব সীমায তাকে ধবা যায। আসলে Chaotic- multi plicity ই মানব-অস্তিত্বেব নির্ণাযক। শ্রীনাথ ডাক্তাব যাকে বুঝতে পাবেন নি, ড. গবগবিও তাকে ধবতে পাবেন নি। যেহেতু তাকে ধবা বা বোঝা যায না। 'কান্না' উপন্যাসেব জনও এইভাবে নিজেকে ধবতে চেযেছিল ঃ

> জীবনে অনেক দিযে পাঠিযেছিলেন আমাকে ঈশ্বব। সবারই কিছু কিছু থাকে—আমাব অনেক ছিল। দেহ—বূপলাবণ্য—সুন্দব কণ্ঠস্বব—অনেক। বস্তিতে পডেছিলাম—ফাদাব আর লনা এলেন জীবনে। ঈশ্ববেব তপস্যা একজন—একজন মূর্তিমতী পবিত্রতা। আমাকে কত দিলেন। কিন্তু পাপ—বস্তির পাপ—হযতো জন্মগত পাপ—মানুষের ধাতুগত পাপ আমাকে টেনে নামিযে দিল। কি হল আমাব?

জনেব পাপবোধ atheistic নয, theistic ধর্মীয ধাবণাব ঐতিহ্য নিযে সে নিজেকে বিযুক্ত কবে ফেলছিল সকলেব কাছ থেকে এবং হয়ত কিছুটা নিজেব কাছ থেকেও।

মানুষেব জীবন তো বহুমাত্রিক। Chaos থেকে cosmos-এ যাত্রা আসলে অস্তিত্বেব দিকে ধাওযা করা মাত্র। Chaotic multiplicity হেতু মানুষেব যে বাস্তবজীবন থেকে নিজেকে ছিন্ন কবাব (withdrawal from reality) অভিলাষ তাই তাকে একদিন হযত মনোবিজ্ঞানীব আলোচ্য বিষযে পবিণত কবে। মানুষ যতই ভাবুক যে, তার স্বস্তিব জন্য দবকাব 'A brand-new world' সে কি এম্নি মিলবে? অন্ততঃ অস্তিবাদীব মেলে না, কাবণ খাঁটি একটা নতুন বিশ্বেব জন্য তো দবকাব সংঘবদ্ধ জীবন, অথচ 'we are always in error / Lost in the wood' তাবাশঙ্কব তাঁব পূর্বোক্ত দুটি গল্পে (শ্রীনাথ ডাক্তার, দেবতার ব্যাধি) দুটি চিকিৎসকেব সত্তা সন্ধানের চেষ্টা ও নিরন্তর আত্মক্ষযী রণের ছবি এঁকেছেন। পূর্ণতা সত্য

বলে অপূর্ণ তাই মানবজীবনের সাবমর্ম। শেক্সপীযরেব ম্যাকবেথ ঠিকই বুঝেছিল Tomorrow and to-morrow and to-morrow। Creeps in this petty pace from day to day। To the last syllable of recorded time। And all our yesterdays have lighted foots। The way to dusty death ঃ এই প্রতীক্ষাব সত্যই সার্ত-র The Age of Reason'-এর ম্যাথুব উপলব্ধিতে ভাষান্তরে ধরা পড়েছিল nothing remains but periods of waiting, each waiting for the next, nothing but a life devitalized, blurred and sinking back upon itself.' এই প্রতীক্ষা কি 'জলসাঘব'-এব বিশ্বম্ভব বাযেব ছিল না ?

কিসেব জন্য বিশ্বম্ভব বায একটা ধ্বংস হযে যাওযা প্রাসাদের বন্ধ হযে যাওযা বিলাসকক্ষেব দিকে তাকিযে থাকতেন ? ধস নেমেছে ঐতিহ্যের বংশ মর্যাদার, গরিমাহীন ফিউডাল লর্ডেব সব চাওয়া-পাওয়াব। কিন্তু এদিকে যখন আলোব রোশনাই শেষ হযে যায, ইতিহাসেব স্বাভাবিক নিযমে আব এক প্রকোষ্ঠে জ্বলে ওঠে আলো। বাতিঘব থেকে নতুন বন্দবে জাহাজ নোঙ্গব কবার ইশাবা আসছে। অন্য এক অস্তিত্ব বা Existence যা প্রাচীন অস্তিত্বকে পবিণতি দেবে Nothingness-এ। হাঁসুলীবাঁকেব ডাকাবুকো কবালী যখন পুবোনোকে ভাঙাব নেশায মেতে উঠেছিল তখন যুক্তিশাস্ত্রেব অমোঘ নির্দেশ ছিল না তাব কাছে। সে সাপকে 'সাপ' বলেই জানে, তাব মধ্যে ঐশ্ববিক কোনো ইঙ্গিত খুঁজে পায না। তাব চর্মচোখ যেমনি সত্য জীবন ও যৌন তৃষ্ণাও তেমনি বলিষ্ঠ এবং সবল রৈখিক। বনওযাবীব চোখে ধবা পড়েছিল কবালীব মধ্যেকাব সুপ্ত সম্ভাবনা। তাই তাব মনে ঃ

> কবালীকে নিযে সাধ। সে জেনেছে, বেশ বুঝেছে, এই ছোঁড়া থেকে হয সর্বনাশ হবে কাহারপাড়াব, নয চবম মঙ্গল হবে। সর্বনাশেব পথে যদি ঝোঁকে তবে কাহাব পাড়ার অন্য সবাই থাকবে পেছনে—লাগতে লাগবে তাব পিছনে। সে পথে কবালী গেলে বনওযাবী তাকে ক্ষমা করবে না। তাই তাব ইচ্ছা তাকে কোলগত কবে নেয, তাব 'পুত্ত' সন্তান নাই।'

করালীব মধ্যে বনওযারী 'মুক্তি' খুঁজেছিল, এই মুক্তি 'emancipation' অর্থে নয, trancendence। উভযেব মধ্যেকাব 'বিযুক্তির' ব্যবধান ঘুচিযে পুরাতন বনওযারী নবীন করালীর সঙ্গে একস্রোতে মিশে আপন অস্তিত্বকে

টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল। বনওয়ারীর বাঞ্ছিত পথে তার অস্তিত্বের সার্থকতা আসে নি। শেষ পর্যন্ত 'এক্সিস্ট' করল করালী এবং অবশ্যই গড়ে ওঠা একটা স্ট্রাকচারকে নতুনের বিবর্ধিত রূপের সঙ্গে অন্বিত করে।—

> হাঁসুলী বাঁকে করালী ফিরছে। সবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে, বালি কাটছে আর মাটি খুঁজছে। উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে। নতুন হাঁসুলী বাঁক।

ইতিহাসের স্বাভাবিক নিয়মেই অতীত ও বর্তমানের সংঘর্ষ ঘটে থাকে এবং অতীত ও বর্তমানের প্রসারণ ঘটে ভবিষ্যতের দিকে ঃ

> Time present and time past
> Are both perhaps present in time future
> And time future contained in time past. (T.S. Eliot)

এই সাধারণ সত্য উপন্যাসের ব্যাপক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা যতটা সম্ভব, ছোটগল্পে ততটা নয়। আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না পরমানন্দ মাধবের চরণাশ্রয় নেওয়ার আগে জীবনমশাই কেমন ভাবে মেনে নেন প্রদ্যোতকে অথবা প্রদ্যোত জীবন মশাইকে। এই মেনে নেওয়াটাকেই আমরা ঐতিহাসিকের বাঞ্ছিত সমাধান মনে করি। কিন্তু কালেক্‌টিভের স্বাধীন অস্তিত্বকে তো অস্তিবাদী স্বীকার করেন না। অস্তিবাদী যেখানে ব্যক্তির death awareness-এর ওপর গুরুত্ব দেন বেশি সেখানে ইতিহাস মনে করে ব্যক্তির ক্ষয়ে জাতির ক্ষয় হয় না। সমগ্র 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটাকেই অস্তিবাদী দর্শনের আলোকে বিচারের সুযোগ আছে। তারাশংকরের যদিও পুরাতনের পক্ষপাতী এবং নবীনের প্রতি বিমুখ বলে চিহ্নিত করার মত মূঢ়তার পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে, তবু অন্বেষীর চোখে ধরা পড়বেই যে, ইতিহাসচেতনাই তারাশংকরের নিয়ন্ত্রক। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ কোনো তত্ত্বের নিরিখে তারাশংকরকে ব্যাখ্যা না করলেও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের সাহায্যে অস্তিবাদীদের ভাবনার খোরাক দিয়েছেন ঃ

> মঞ্জরী তাঁহার কল্পনায় মৃত্যুদূতীরূপে প্রতিভাত হইয়াছে, আতর বউ মৃত্যুরূপিনী-শক্তিরূপে তাঁহার সমস্ত জীবনকে বিষজর্জর ও বেদনা-নীল করিয়াছে। মৃত্যু-স্বরূপের সহিত ধ্যানাধিগম্য গভীর একাত্মতা এই সাদৃশ্য কল্পনার ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছে।

তাঁহার নিজের মরণ তাঁহার জীবনব্যাপী মৃত্যু-রহস্যভেদ-প্রয়াসের অন্তিম পর্ব ; মৃত্যুকে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের বিষয়রূপে অনুভব-সাধনার যজ্ঞে পূর্ণাহুতি ।'

'Death awareness' জীবন মশাইকে অভিনব এক অস্তিত্বের বোধে উপস্থিত করে দিয়েছিল। ক্রোধ নেই, ঘৃণা নেই, আতর বউ-এর বিসদৃশ আচরণে ব্যথাবোধ নেই। একমাত্র পুত্রের অমিতাচার হেতু মৃত্যুর জন্য দুঃখ নেই, নতুনকে স্থানত্যাগ করে দেওয়ার মুহূর্তে বিষণ্ণ গ্লানিবোধ নেই। সর্বপাপতাপ-হর কোন্ সে অনুভূতি যা জীবন মশাইকে পরম শান্তির জগতে পৌঁছে দিয়েছিল তা ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। জীবনটাকে মেনে নেওয়াই জীবনের একমাত্র প্রাপ্য। এই মৃত্যু দুটো ভিন্ন তাৎপর্যে সত্য হয়ে ধরা পড়ল 'রায়বাড়ি' এবং 'জলসাঘর' গল্প দুটিতে।

'রায়বাড়ি'তে শারীরিক মৃত্যু ঘটেছে ব্রজরাণী ও বিশ্বেশ্বরের ময়ূরাক্ষী ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে নৌকাডুবি হয়ে। কিন্তু এই শারীরিক মৃত্যু গল্পের একটি বাইরেকার ব্যাপার। এই বাইরের ঘটনাই আঘাত হেনেছে অত্যাচারী ও বিলাসী রাবণেশ্বরের মর্মে। এবার শুরু হল রাবণেশ্বরের প্রকৃত মৃত্যু। জন্ম নেয় অন্য এক রাবনেশ্বর। এই নবজাতকই রাবণেশ্বরের ভিতরকার মানুষ তথা authentic existence, আকস্মিক পরিবর্তনের প্রবল অভিঘাতে রাবণেশ্বর হয়ে দাঁড়ালেন প্রজাদের পিতা। অকালে জ্বলে উঠল জলসাঘরের নির্বাপিত দীপমালা, প্রজারা জয়ধ্বনি দিতে লাগল ঃ 'অক্ষয় হোক রায়-হুজুরের রাজত্বি, অক্ষয় হোক, আমরা সুখে বেঁচে থাকি'। প্রজাদের সুখ স্থূল বাস্তবিক সুখমাত্র, কিন্তু রাবনেশ্বর যে-সুখের সন্ধান পেলেন তা তাঁর একেরই এবং তা এল মৃত্যুর দীর্ঘরেখাঙ্কিত সরণি বেয়ে। এই মৃত্যু আর এক ভিন্ন চেহারা নিয়ে এল জলসাঘর-এর বিশ্বম্ভর রায়ের কাছে। এখানে আকস্মিক অভিঘাত নেই, আছে তিল তিল মরণের অনুল্লেখিত ইতিবৃত্ত। বিশ্বম্ভরের অনেক ছিল, এখন রয়েছে পুরাতনের স্মৃতির সম্বলটুকু মাত্র ; সেই শেষ সম্বলের মূল্যবান হীরক-খণ্ডটি হল তার ego। তার প্রবল আভিজাত্যবোধ। সেই আভিজাত্য এবং অহং-কে 'সওয়ার' করে নিয়ে মুখে রক্ত তুলে ছুটে চলেছে কশাতাড়িত 'তুফান'। কিন্তু প্রমত্ত আভিজাত্যবোধ বিশ্বম্ভর রায়-কে তার পরিত্যক্ত জলসাঘরের সামনে যখন উপস্থিত করে দিল তখন তাঁর অতীত ও তাঁর বর্তমান যেন

তার বিপরীত মেরুর দিকে সরে দাঁড়াল আর উভয়ের মধ্যেকার অবকাশ ভরে দিল প্রগলভ নবীন বিত্তবান মহিম গাঙ্গুলির উদ্দেশে অনুচ্চারিত 'অট্ট-বিদ্রূপ'। অবশ্য ইতিহাসের নিয়মে মহিম গাঙ্গুলিই বিশ্বম্ভরের কাছে অশনিসংকেত এবং বিশ্বম্ভর ইতিহাসের পাতা-ঝরা অরণ্যের রহস্যময় মর্মর-ধ্বনি। বিশ্বম্ভরের তৃষ্ণা আছে, দাহ আছে, কিন্তু বহ্নিবঙ্গের দীপ্তি নেই!

তৃষ্ণার্ত আস্তিক্যবোধ 'মরুর মায়া' গল্পের নন্কুকে অকস্মাৎ এক অবাঞ্ছিত anagnorisis-এর প্রতিক্রিয়ায় তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল মিথ্যা পরিচয়ের জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার জন্যে। ডগরু যখন বলেছিল—'তুম্হারা বাপকে নাম জগদীশ, হাঁ ঠিক মালুম হ্যায় উন্‌কে নাম জগদীশ রায়, জিলা-বর্ধমান, গাঁও-কালীপুর, তখন বন্ধনহীন নন্কু আপনার উৎস সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল, পিছনে রইল কাজরীর মত প্রেমিকা। একদিকে কাজরী, সানিয়া, ডগরু, ঘোড়াটা ডাকে নন্কুকে, অন্যদিকে তাকে ডাকে তার অপরিচিতা বাঙালী মাতা। নন্কু দেখে একটা নিশাচর পক্ষীর বাচ্চা কাঁদে, সে নীড়ে প্রবেশ করিতে চায়, কিন্তু তাহার মা আর প্রবেশ করিতে দিবে না।' এই দৃশ্যের পর নন্কু-র যাত্রা শুরু হ'ল ফেলে আসা পিছন পানে। কিন্তু পিছনে ফেলে আসা যাযাবরের দল কি আর তাকে ফিরে নেবে? শেষে কাজরী যখন নন্কু-র হাত ছাড়িয়ে নিয়ে দলের দিকে নেচে নেচে ছুটতে ছুটতে বলে, 'পাকড়ো তো হামে—দে"-খে' তখন মরুর মায়ায় বিভ্রান্ত নন্কু নিজেকেই খুঁজে পায় না কোথাও।

নন্কু-র সত্তা সন্ধানের যাতনা 'আলো-আঁধারি'র সুখময়ের ছিল না। কিন্তু সেও তো অস্তিত্বেরই ভাবনা যার দ্বারা তাড়িত হয়ে সুখময় ধনীর কন্যা এবং তার স্ত্রী সারদা-কে তার আপনজনের উদ্দেশে নিবেদন করে ঘুরতে লাগল জীবনের বিভিন্ন বন্দরে। কোথাও তো নিজেকে খুঁজে পেল না সে, যেখানে নিজেকে সার্থক ভাবতে পারে। অনেক ক্লেশের পর সুখময় এই বোধে উপস্থিত হল: 'আপন স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে খাপ খাইল না, বাহিরের দুনিয়ার সঙ্গে খাপ খাইবে কি রূপে?' কিন্তু মানুষ যেহেতু মানুষ তাই তার জীবনে সন্ধানটা যেমন সত্য তেমনি সত্য পরিবর্তনও। সুখময়ের স্বস্তিসন্ধানের যেখানে শেষ সেখানে সারদা-রও বিত্তলালসার যবনিকাপাত। সুখময় তার দুঃখের জীবনে পথকে ক'রে নিল সঙ্গী আর সারদা সুখময়ের আবির্ভাবের আসায় পথের দিকে তাকিয়ে রইল প্রত্যাশা বুকে নিয়ে। এক অর্থে প্রতীক্ষাই হয়ে রইল

উভযেব জীবনেব ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অস্তিত্বগত সার্থকতা। সুখেব সন্ধান যেহেতু মানুষেব জীবনে 'সত্য' বা একমাত্র সত্য তাই প্রতীক্ষাতেই অস্তিত্বেব সাবাৎসাব।

মানুষেব অস্তিতা যাব সঙ্গে মানুষেব সিদ্ধান্ত গ্রহণেব স্বাধীনতা যুক্ত হযে আছে সেখানে দেখা যায প্রযোজনের জগৎ এবং প্রেমেব জগৎ এক বিন্দুতে স্থিত। প্রযোজনেব জগতে, সাধাবণভাবে অস্তিবাদীরা মনে কবেন, ব্যক্তিব স্বাধীনতা থাকা উচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণেব। এই স্বাধীনতাব মধ্যেও থাকে এক বেদনাদাযক চাপ কাবণ মানুষেব কাজেব স্বীকৃতিতে 'সমাজ' নামক প্রতিষ্ঠানেব কাছ থেকে বৈধতাব ছাডপত্র প্রযোজনীয হযে পডে। অর্থাৎ সেই কাজে মানুষেব স্বাধীনতা নেই যে-কাজে অপরেব নিযন্ত্রণ নেই। প্রযোজনেব জগতে যা সত্য প্রেমেও সত্য সেটা। বিচিত্র সম্পর্কেব আবর্তে পরিধিস্থ দুটি বিন্দু হল 'নাবী' ও 'পুরুষ'। এদের সম্পর্কেব স্বাধীনতাব ক্ষেত্রে প্রাতি-ষ্ঠানিক বৈধতাব ব্যাপাব আছে। যেখানে ব্যতিক্রম, সেখানেই অস্তিতা সম্পর্কে প্রশ্ন। 'তাবিণী মাঝি' গল্পে তাবিণী ও সুখীর দাম্পত্য জীবন সাংসাবিক অর্থে সুখেবই ছিল। কিন্তু যেদিন উভয়েব অস্তিত্ব Nothing-ness-এব মুখোমুখি হল সেদিন সবচেযে বেশি আহত হল আপাতদৃষ্টিতে প্রযোজনেব বিপরীত প্রান্তস্থ 'প্রেম' নামক অনুভূতিটি। মযূবাক্ষীব বানেব জলের ঘূর্ণিতে যখন তাবিণী ও সুখী প্রাণ-বাঁচানোর আদিম বাসনায একে-বাবে উন্মাদ তখন যেন পূর্ণ বৃত্তেব দুটি পবস্পর-সম্পর্কিত বিন্দু বিচ্ছিন্ন হযে যেতে লাগল।—

> বুকেব মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন ফাটিযা গেল। তাবিণী সুখীর দৃঢ বন্ধন শিথিল কবিবাব চেষ্টা কবিল। কিন্তু সে আবও জোরে জডাইযা ধবিল। বাতাস-বাতাস! যন্ত্রণায তাবিণী জল খামচাইযা ধবিতে লাগিল। পব-মুহূর্তে হাত পডিল সুখীব গলায! দুই হাতে প্রবল আক্রোশে সে সুখীব গলা পেষণ কবিযা ধবিল। সে তাহাব উন্মত্ত ভীষণ আক্রোশ। হাতেব মুঠিতেই তাহাব সমস্ত শক্তি পুঞ্জিত হইযা উঠিয়াছে। যে বিপুল ভাবটা পাথবেব মত টানে তাহাকে অতলে টানিযা লইযাছিল, সেটা খসিযা গেল, সঙ্গে সঙ্গে সে জলেব উপবে ভাসিযা উঠিল। আঃ আঃ—বুক ভবিযা বাতাস টানিযা

লইয়া আকুলভাবে সে কামনা কবিল, আলো ও মাটি।'

স্বখীব চৈতন্যই স্বখীব অস্তিতাকে প্রমাণ করে এবং একই ব্যাপাব তাবিণীব ক্ষেত্রেও। তাবা জড়বস্তু নয বলেই তাদের অস্তিত্বেব প্রশ্ন অত্যন্ত জব্বরি। কিন্তু যে-ম্বহ্বর্তে একেব অস্তিত্ব অপবের অস্তিত্বকে দ্বন্দ্বে আহ্বান কবে তখনই সামাজিক ম্ল্যায়ন শ্বব্ব হযে যায। তাই ঘটনাপ্রবাহেব নিরিখে আলোচ্য গল্পে তাবিণী একজন ঘাতক। কিন্তু তাবিণী যে হত্যা কবেছে তাব পিছনে বযেছে অবশ্যই তার নিজেব বেঁচে থাকার অনিবার্য তাগিদ। দেস্দিমোনা-হত্যাব কারণও কি তাই নয ? ওথেলো-ব অস্তিত্ব তাব অধিকাব-বোধ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণেব স্বাধীনতাব ওপব নির্ভবশীল ছিল। সংশযেব চোবাবালিতে ওথেলোব অধিকাববোধ ক্রমে নিমজ্জিত হতে থাকে এবং তাবই পবিণামে ওথেলো পবিণত হয ন্শংস ঘাতকে। সৌভাগ্য যে, ওথেলো নিজেব বিচার নিজেই শেষ কবেছিল এবং তাবাশংকবের তাবিণী মাঝি জলেব গভীরে যে-হত্যাকাণ্ড চালাতে বাধ্য হয, সমাজেব কেউ তাব সাক্ষী ছিল না, একমাত্র সর্বজ্ঞ ও সর্বগ লেখক ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী।

স্বাধীনতাহীন অস্তিতা যে কত বীভৎস তাব নিদর্শন বযেছে তাবাশংকবেব দ্বটি গল্পে ঃ 'তিন শ্বন্য' এবং 'সন্তান'। 'তিনশ্বন্য' গল্পেব ল্যালা তাব বিকৃতদেহ নিযে জন্মেছিল প্বব্বষেব অন্ববাগহীন কামক্ষ্বধাব কাছে দ্বভিক্ষ-পীড়িতা নাবীব দেহদানেব পবিণামে। মন্ব্য্য পদবিবিশিষ্ট পশ্ব, নাম যাব ল্যালা 'তাব যত কৌতুক পশ্বব সঙ্গে, ছাগল ভেড়াব বাচ্চা ধ'বে তাদেব অসহ্য যন্ত্রণা দেয, তাবা চীৎকাব করে, ও হাসে।' ল্যালা যেন নিজেই নিজেব জন্মেব প্রতিবাদ। যে অপবাধেব ফসল সে নিজে, সেই অপবাধবাসনাই ক্রমে তাকে গ্রাস কবে। ব্বদ্ধদ্বাবে ল্যালা আঘাত হেনেছিল পেটেব ক্ষ্বধা মেটাবাব জন্যে। তাব স্বপ্ত যৌন লালসা সম্পর্কে সে নিজেও সচেতন ছিল না। কিন্তু নগ্ন নাবীব্বপেব লাবণ্য ল্যালাকে প্রাগৈতিহাসিক গ্বহাচাবী বাসনাব শিকারে পবিণত করে। প্ৃথিবীব অবাঞ্ছিত সন্তান অপবেব বাঞ্ছাব পবোযা কবে নি। তাব উদবেব ক্ষ্বধা তাকে যৌনক্ষ্বধায আতুব ক'বে শেষ পর্যন্ত বিকৃতকাম কবে তোলে। অস্বন্দবেব তৃষ্ণা ব্বক্ষ জৈবিকতাব সীমা ভাঙতে না পাবায স্বন্দরকে নিষ্ঠ্বব পেষণে শেষ কবে দেয়। ব্বপজ কামনা এমন নিদার্বণ সত্য যাকে আচ্ছন্ন কবতে পাবে না সভ্যতার স্বন্দব সকালেব কোনো নান্দনিকবোধ। এই কামনা যখন অপরের উপেক্ষা লাভ করে তখন

'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' গল্পের গোবিন্দ'র মতই তা নিষ্ঠুর প্রতিশোধ পরায়ণ হয়ে পড়ে। ল্যালা হত্যা করেছিল, গোবিন্দ আত্মঘাতী হয়েছিল। অস্তিত্বের প্রশ্নে কি নৈতিকতার স্থান নেই ? আছে অবশ্যই। তবে অস্তিবাদীরা 'rule-element' এর ওপরে 'Situation-element'কে স্থান দিয়ে থাকেন। সেদিক থেকে বিচার করলেও ঘাতক হলেও ওথেলো, তারিণী মাঝি বা ল্যালাকে সামাজিক অপরাধী বলা যাবে না। অপরাধী বলা যাবে না 'সন্তান' গল্পের গোবিন্দকেও। গোবিন্দ জন্ম-সূত্রেই ল্যালার আর এক সংস্করণ। তবে ল্যালার সঙ্গে গোবিন্দ-র পার্থক্যটাও অনস্বীকার্য ; ল্যালা ঔদরিক ক্ষুধাকেই সর্বস্ব জানত। গোবিন্দ বিয়ে করতে চায়। তার টাকা জমানোর ইচ্ছেটাও সেই কারণে। ধনীর ছেলে মানিককে লালন-পালনের পালা চুকিয়ে দেওয়ার মুহূর্তে গোবিন্দ ভৃত্যের জায়গা ছেড়ে অন্য এক আহ্বানের জন্যে লালায়িত হয়ে ওঠে। মানিককে কোলে নিয়ে গোবিন্দ বলে—

আমার ছেলে হবা মাণিক ? হবা ? বল কেনে, একবার 'বাবা' বল কেনে ? বলবে না ?

কেনে ? ভিখারীকেও তো 'বাবা' বলে লোকে। বল কেনে ?

লক্ষ্মীবাবু গোবিন্দকে পরের দিনই বিদায় দিলেন। নিছক যৌন-সম্ভোগে অস্তি-র বোধ যতটা প্রবল না হয়, তার চেয়ে বেশি হয় সন্তান কামনায়। জন ম্যাকারি (John Macquarie) লিখছেন 'Sex is thus an attempt at total sharing of being · Like most discoveries contraception is ethically ambiguous—it can enrich interpersonal relations within a responsible context, but it can also arrest community at the stage of being with the-other before one comes to being with others The link between sexuality and creativity cannot be severed. If sexuality is the bodily foundation of the simplest kind of community (sexual union or marriage) it is also the act that has the potentiality to found the next order of community, the family.[2]

2, John Macquarrie : Existentialism. Penguin Books (1973) pp 116—117)

জীবজগৎকে বিস্তার দেয় সন্তান। গোবিন্দ সেই সন্তান কামনায় 'নারী' কে চায়, নারীকে নারীর জন্যে নয়।

ঃ তাহার অন্তর একটি সুন্দর শিশুর জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। এই সূক্ষ্মতা ল্যালার ছিল না। ল্যালাকে তারাশঙ্কর গোবিন্দের মধ্যে নবজন্ম দিলেন যেন। গোবিন্দ একটা তৃষাতুর মন নিয়ে জন্মেছিল। এই মনই তার অসুখের কারণ। একদিন মঞ্জরী নামের এক বাল-বিধবাকে পত্নী-রূপে পেল গোবিন্দ। ক্রমে মঞ্জরী সন্তান-সম্ভবা। গোবিন্দ'র স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। সন্তান জন্ম নিল। কৌতুহলী গোবিন্দ মানিকের স্বপ্ন মাথায় নিয়ে সন্তানের মুখ দেখতে গিয়ে দেখে 'এক পাশে কাঁথার উপর শুইয়া আছে কদাকার কুৎসিৎ বিকৃতাঙ্গ একশিশু, অবিকল তাহার প্রতিমূর্তির এক ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব।' কিন্তু গোবিন্দ তো তা চায় নি। স্বপ্নময় আরশি-খানা খান খান হয়ে গেল ; প্রতিটি খণ্ডে গোবিন্দর বিকৃত দেহের প্রতিবিম্ব যেন তাকেই বিদ্রূপ করতে থাকে। হিংস্র আক্রোশে মঞ্জরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বর্বর গোবিন্দ হত্যা করে সন্তানকে। এর পরের ঘটনা—পাগলা গারদে। চিকিৎসক তাকে শান্ত রেখেছেন অন্যভাবে। ঘরের চারপাশে অপরূপ লাবণ্যময় কিছু শিশুর প্রতিকৃতি। তাদের সকলের নামই 'মাণিক'। 'গোবিন্দ তাহাদের সহিত কথা কয়, হাসে, নাচে।' সুন্দরের পিয়াসী গোবিন্দ তার জান্তব আচরণ সত্ত্বেও স্বপ্নকেই ধ'রে রইল অস্তিত্ব রক্ষার উপায় রূপে। যে মানুষটি উদরের উর্ধ্বে উঠতে পারে নি 'অগ্রদানী' গল্পের সেই পূর্ণ চক্রবর্তীর শেষ পরাজয়ের অসমাপ্ত চিত্ররূপ সন্তানকে কেন্দ্র করেই। যন্ত্রণাকাতর জৈবিক অস্তিত্বের নাম ল্যালা, জৈবিকতাকে অতিক্রম করে সুন্দরের অভ্যর্থনায় প্রথম ধাপে উঠে এসেছিল গোবিন্দ, ঔদরিকতার ঊর্ধ্বস্থ অস্তিতার প্রথম প্রশ্নের অভিঘাতে আক্ষিপ্ত সত্তার নাম পূর্ণ চক্রবর্তী আর যাবতীয় পার্থিবতাকে সঙ্গীতের পায়ে নিবেদন করে দুটো চোখের অভাব মন আর সুর দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিল 'তমসা' গল্পের পঙ্খী। কিন্তু এই পঙ্খীর authentic existence-ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল যখন তার গানের কথা রূপান্তরিত হল ভিক্ষা প্রার্থনায় এবং জাগতিক চাতুর্য শিখে আধুলিটা মেকি কিনা সে পরীক্ষা করতে চেষ্টা করে।

সুখ নয়, শান্তি নয়, অন্য এক সুন্দর অভ্যাসে আপন অস্তিত্বকে সার্থক-করার অভিলাষী মানুষ। চেতনাবিশিষ্ট প্রাণী বলেই মানুষের 'মেটামর-

ফসিস ঘটা নিত্যই সম্ভব। পরিপার্শ্বের টান-যোগানে ভেসে যাওয়া মানুষ, পরিপার্শ্বকে দূর থেকে দেখেছে যে-মানুষ, তারা নিজেদের কেবলই বদলায়। সেই বদলের ফলেই রাবণেশ্বর রায় অন্য মানুষ হয়ে যায়, ক্ষুধাতুর ল্যালা তার যৌনবাসনাকে এবং সুন্দরের পিয়াসী গোবিন্দ তার সন্তানকামনাকে বিকৃত করে ফেলে। শ্রীনাথ ডাক্তার পাগল হয়ে যায়, ড. গরগরি নিজের কাছ থেকে পালায়, জীবন মশাই পরমানন্দ মাধবের চরণধ্বনি শুনতে চায়, করালী উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দিতে চায় আর পৃথিবীর অন্য কেউ না জানলেও প্রকৃত সত্যকে জানত যে পূর্ণ চক্রবর্তী সে তার আপন সন্তানের (যদিও বাইরের পরিচয় শ্যামাদাস বাবুর সন্তান হিসেবে) উদ্দেশ্যে নিবেদিত শ্রাদ্ধের পিণ্ড গ্রহণে অনিচ্ছুক হলেও তার মিথ্যা অস্তিত্ব সামাজিক সত্যের চেহারা নিয়ে নির্মমকণ্ঠে আদেশ করল "খাও হে চক্রবর্তী" ?

———

রঙ্গমঞ্চের আত্মীয় তারাশঙ্কর

রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

তাবাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যাযেব সাধাবণ বাঙালীর কাছে পবিচিতি মূলত ঔপন্যাসিক হিসেবে, কিন্তু গত প্রায চাব দশক পশ্চিমবঙ্গের নাট্যরসপিপাসু দর্শকদেব কাছে তাঁব পবিচিতি উপেক্ষাব নয। এদিক থেকে তিনি অবশ্যই ববীন্দ্রনাথেব সমকক্ষ নন, কিন্তু শরৎচন্দ্র থেকে তিনি এক্ষেত্রে একধাপ এগিযে। শবৎচন্দ্র নাট্যকার নন, তাঁব তিনটি উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বমা' 'ষোডশী' এবং 'বিজযা' পেশাদাবী বঙ্গমঞ্চে এবং অপেশাদার সংস্থাব অভিনয়ে ব্যাপক জনপ্রিযতা যদিও দীর্ঘকাল পেযে এসেছে, এবং বিভিন্ন প্রযোজনাব সময যদিও তিনি রঙ্গমঞ্চে হাজিব হয়েছিলেন, কিন্তু নাটকের প্রযোগ সম্পর্কে তাঁব চিন্তা ভাবনা কখনই দানা বাঁধেনি। তাবাশঙ্কর কিন্তু অল্পবযস থেকেই নাটকাভিনয কবেছেন, নাট্যরূপরীতি সম্পর্কে মতামত দিযেছেন, পেশাদাবী মঞ্চে নিজ নাটক অভিনযেব সময হাজির থেকেছেন অনেকবার, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে মতামত বিনিময কবেছেন। এক্ষেত্রে ববীন্দ্রনাথেব সঙ্গে তাঁব কিছুটা মিল থাকলেও কলকাতা ও শান্তিনিকেতনে নিজ উদ্যোগে ববীন্দ্রনাথ যেভাবে নাটক প্রযোজনা করেছেন, তাবাশঙ্কব সেই পর্যায়ে পৌঁছুতে পাবেননি।

তাবাশঙ্কবেব অভিনয-তৃষ্ণা ॥

বীবভূম জেলাব লাভপুব গ্রাম প্রায একশ বছব আগেই সাংস্কৃতিক দিক থেকে অগ্রসর ছিল। তাবাশঙ্কব যখন নিতান্ত বালক সে সমযই (১৯০৪) লাভপুব গ্রামে একটি বঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয যাব নাম 'বন্দে মাতবম্' থিযেটাব। মাত্র সাত বছবেব বালক তাবাশঙ্কব লাভপুবেই পবিচিত হন কলকাতা থেকে আগত তখনকাব রথী মহাবথীদের সঙ্গে। গিবিশ চন্দ্রেব বিশিষ্ট বন্ধু, জনপ্রিয প্রহসন বচয়িতা অমৃতলাল বসু, বাংলা বঙ্গমঞ্চেব একজন বিশিষ্ট কৌতুকাভিনেতা রূপেও পবিচিত ছিলেন। লাভপুরে তাব উপস্থিতি ঘটেছিল। 'বঙ্গালযে ত্রিশ বৎসব' গ্রন্থের প্রণেতা, বাংলা মঞ্চ জগতেব সঙ্গে যুক্ত অভিনেতা অপবেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং বাংলা নাট্যসাহিত্যের স্বনামধন্য গবেষক-অভিনেতা মন্মথনাথ বসুবও লাভপুরেব মাটিতে উপস্থিতিব খবব আছে। এঁবা তাবাশঙ্কবের বালক-চিত্তে নাড়া দিযেছিলেন, সন্দেহ নেই। নটশেখব নবেশ

মিত্র, অভিনেতা বাধাচবণ ভট্টাচার্য এবং তিনকড়ি চক্রবর্তী লাভপুবে গিযেছেন, নাট্যাভিনয কবেছেন। তাবাশঙ্কব তাঁব আত্মজীবনীতে এঁদেব সঙ্গে ঘনিষ্ঠতাব ফলে প্রথম নাটক বচনাব তাগিদ অনুভব কবেন বলে জানিযেছেন। গ্রামেব সখেব থিযেটাবেব আবহাওযা না থাকলে তাবাশঙ্কব হযত ঔপন্যাসিকই হযে থাকতেন। নাট্যকাব হতেন না। এ সম্পর্কে স্বীকারোক্তি আছে 'চকমকি' প্রহসন বচনাসূত্রে। তাঁব কথায—'নাটকটি আমাব প্রথম বযসেব বচনা। নাটকটিব আখ্যানভাব অনেকাংশে সত্য। প্রথম বযসে ঘটনাটি নিযে নাটিকা বচনায প্রেবণা যুগিযেছিল আমাদেব গ্রামেব সখেব থিযেটাবেব আবহাওযা।'

সখেব থিযেটাবেব আবহাওযা ।।

লাভপুবেব গ্রামীণ আবহাওযায যে নাট্যচর্চাব উল্লেখ তাবাশঙ্কব কবেছেন তা থেকে তিনটে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব। এক. তাবাশঙ্কবেব দিক থেকে নাটক রচনাব তাগিদ। তিনি যে পঁচিশ-ছাব্বিশ বছবে 'মাবাঠা-তর্পণ নাটকটি লিখলেন তাব পিছনে লাভপুবেব মাটিতে নাট্যকাব ক্ষীবোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদেব আসা-যাওযা ও থাকাব ঘটনাটি কাজ করেছিল। ইতিমধ্যে ক্ষীবোদপ্রসাদেব বেশ কটি ঐতিহাসিক নাটক বাংলাব পেশাদাব বঙ্গমঞ্চে হৈ-চৈ ফেলে দিযেছিল। তাব 'প্রতাপাদিত্য' 'বাঙ্গালাব মসনদ' 'দাদা ও দিদি' 'পলাশীব প্রাযশ্চিত্ত' ইত্যাদি ঐতিহাসিক নাটক ব্রিটিশ সবকাবেব বক্তচক্ষুব সামনে পড়েছিল। সেই ক্ষীরোদপ্রসাদকে কাছ থেকে দেখাব ফলেই সম্ভবত তাবাশঙ্কব তাঁব প্রথম নাট্যবচনা 'মারাঠা তর্পণ' সৃষ্টি কবলেন। কিন্তু সেই নাটক যখন কলকাতায সে সমযকাব বিখ্যাত 'আর্ট থিযেটারে' অভিনযের জন্য প্রস্তাবিত হল তখন তারাশঙ্কবের প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা অত্যন্ত কবুণ। তদানীন্তন আর্ট থিযেটাবেব কর্ণধাব অপবেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দ্বারা নাটকটি প্রত্যাখানেব কারণ ব্যক্তিগত, নাটকটিব গুণাগুণনির্ভব নয়। তিনি চাইলেন না, কোনো তবুণ নাট্যকাব কলকাতাব বঙ্গমঞ্চে নতুন করে প্রতিষ্ঠা পান। যে তাবাশঙ্কব তাঁব বাল্য-কৈশোবে লাভপুবে অপবেশচন্দ্রকে দেখে মুগ্ধ হযে-ছিলেন তাঁব এ জাতীয ব্যবসাযিক আচরণ বাংলা বঙ্গমঞ্চের প্রতি তাঁকে বীতস্পৃহ করে তুলল। তিনি ঠিক সেই বেদনাবোধ থেকেই একযুগেব বেশি সময নাট্যজগৎ থেকে নিজেকে সবিযে বাখলেন। তাবপব প্রতিশোধও নিলেন সেই নাট্যনিকেতনেই তাঁর 'কালিন্দী' উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রযোজনার (১০৪৮ বঙ্গাব্দ) মধ্য দিয়ে।

দুই.

মধুসূদন-দীনবন্ধু-দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যকাব ছিলেন। নাট্যাভিনেতা ছিলেন না। আবার গিরিশচন্দ্র অমৃতলাল-জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-ববীন্দ্রনাথ যেমন নাটক লিখেছেন এবং অভিনয করেছেন; প্রযোগকর্তারও ভূমিকা নিয়েছেন। পাশ্চাত্ত্যে শেকসপীযব তার আব এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারাশঙ্করেব ক্ষেত্রে তেমন বিস্তাবিত না হলেও, একথা সত্য। এক্ষেত্রে আর একটি বিষযও কাজ করেছে, তা হল, লাভপুরনিবাসী এক ব্যবসাযী অথচ নাট্যপ্রেমী নির্মল বন্দ্যোপাধ্যাযের প্রভাব। ভদ্রলোক লাভপুরে যেমন কলকাতাব প্রতিষ্ঠিত নাট্যকাব-অভিনেতাদেব নিযে যেতেন, তেমনি নিজেও কলকাতাব বঙ্গমঞ্চে নাটক লিখে মঞ্চস্থ কবাতেন। পারিবারিক দিক থেকে নির্মলশিববাবুর সঙ্গে তাবাশঙ্কবেব সম্পর্ক পরে স্থাপিত। আমাদেব বিশ্বাস, এই সংযোগেব আব এক ফল, তাবাশঙ্করের অভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ। আব তা শুরু হয ছেলেবেলা থেকেই। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তাঁব 'মানুষ তারাশঙ্কর' নামক বইটিতে জানিযেছেন, তাবাশঙ্কবের বাল্যকালেব অনেক অভিনয়েব কথা তাঁব মুখেই শুনেছিলেন। পববর্তীকালে বীবেন্দ্রকৃষ্ণ বেতাবে রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠেব খাতা' নাটকেব অভিনয কবান সাহিত্যিকদেব নিযে। তাতে সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায প্রমুখেব সঙ্গে তাবাশঙ্কবও অংশগ্রহণ কবেছিলেন। তারাশঙ্কর কেদাব-এব ভূমিকায ভালই অভিনয কবেছিলেন। এই একই চবিত্রে তিনি পুনরায অভিনয কবেন 'বঙ্গীয সাহিত্য পবিষদে', এই তথ্য সংগ্রহ করেন ডঃ মানস মজুমদার, মনোমোহন ঘোষেব নিকট থেকে। ভূমিকা একই, কেদাবেব। তিনি আবও একটি তথ্য পেযেছিলেন পবিচালক দেবনারাযন গুপ্তেব কাছে, তা হল, ১৯৪২-এ 'রঙমহল' মঞ্চে সাহিত্যিকদের অভিনীত 'বশীকরণ' নাটকে উচ্চাঙ্গেব অভিনয় কবেছিলেন তাবাশঙ্কর।

অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক ॥

প্রখ্যাত নাট্যাভিনেতা অজিত বন্দ্যোপাধ্যাযের কাছে নানা সমযে বাংলাব নাট্যজগতের সঙ্গে তারাশঙ্করের সম্পর্কেব কথা আমি শুনেছি। একনিষ্ঠ নাট্যদর্শক বলতে যা বোঝায তিনি তাই ছিলেন। নাটক অভিনয়ের সময তিনি নিজেব সৃষ্টিকর্মের মধ্যে লীন হয়ে যেতেন। নাটক অভিনযের শেযে পবিচালক ও অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গে মতামত বিনিময করতেন। তিনি

ছিলেন পুবোদস্তুব নাট্যকে লোক। অজিতবাবু তাবাশঙ্কবেব নাটকে ব্যবহৃত অনেক সংলাপ ও গানেব ব্যবহাবেব ক্ষেত্রে নাট্য-দর্শকদের চাহিদাব সঙ্গে তাঁর নৈকট্য খুঁজে পেতেন বলে আমাকে জানিয়েছেন।

সেটা ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের কথা। তারাশঙ্কবের বহু অভিনীত নাটক 'দুই পুবুষে'র প্রথম পথচলা শুরু হয়। এই নাটকেব দ্বন্দ্বমুখী নায়ক চবিত্র নুটবিহাবীব ভূমিকায় নাট্যভাবতী মঞ্চে প্রথম থেকেই যুক্ত হন সেকালেব খ্যাত অভিনেতা ছবি বিশ্বাস। তারাশঙ্কর তাঁব প্রিয় চবিত্রের রূপকারের অভিনয় দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। ছবি বিশ্বাসেব প্রয়াণ-সংবাদে তিনি ছুটে এসেছিলেন স্টাব থিয়েটারে! এ সম্পর্কে 'কালি ও কলম' পত্রিকায় দেবনাবায়ণ গুপ্ত লিখেছেন—'ছবিদাব মৃত্যুব দিন সন্ধ্যায় স্টার থিয়েটারে মালা নিয়ে এলেন। বললেন (তাবাশঙ্কর) 'আমার নুটবিহারীকে মালা পরাবো বলে তোর এখানে চলে এলাম।' তারপর অভিনয় শিল্পে ছবিদার কীর্তি ও কৃতিত্ব নিয়ে কত কথাই না বলেছিলেন।'

এ থেকেই বোঝা যায়, কেবল নিজেব লেখা নাটকই নয়, ছবি বিশ্বাসেব অভিনীত অন্যান্য নাট্যকাবেব নাটক এবং চলচ্চিত্রের অভিনয়দক্ষতা ও বৈশিষ্ট্য নিয়েও তাঁব নিজস্ব মূল্যায়ণ ছিল। তাবাশঙ্কবের যেমন অভিনেতা-অভিনেত্রীদেব উপব শ্রদ্ধা ছিল তেমনি তাঁবাও তাঁকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাতেন। এ বিষয়ে দেবনাবায়ণ গুপ্তেব স্মৃতিচাবণাব একটি অংশ এখানে উদ্ধাব কবতে পাবি—'নাটক আব নাট্যশালাকে তিনি যেমন ভালবাসতেন, তেমনি নটনটীবাও তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা কবতো। স্টাব থিয়েটাবে আমি আসাব পব প্রায় প্রতিটি নাটকেবই তিনি অভিনয় দেখতে আসতেন। এসেছেন, অভিনয় দেখেছেন। সাজঘবে গিয়ে শিল্পীদেব সঙ্গে দেখা কবে সকলেব খোঁজ খবব নিয়েছেন।' প্রসঙ্গত মহেন্দ্র গুপ্ত, তুলসী লাহিড়ী, মিহির ভট্টাচার্য, তুলসী চক্রবর্তী, কালী সবকাব, প্রভা, জহর গাঙ্গুলী, রানীবালা, বাজলক্ষ্মী (ছোট), নীতিশ মুখোপাধ্যায়, রবীন মজুমদাব, হবিধন মুখোপাধ্যায়, জহর বায়, প্রণতি ঘোষ প্রমুখদেব কথা মনে আসে যাঁবা কালিন্দী, দুই পুবুষ, পথের ডাক, বিংশ শতাব্দী, কবি, আরোগ্য নিকেতন ইত্যাদি নাটকে কোন না কোন সময়ে অভিনয় কবতে গিয়ে নাট্যকার তাবাশঙ্কবেব মুখোমুখী হয়েছেন।

সরাসবি না হলেও, তাবাশঙ্কর একদিক দিয়ে নাট্যপ্রয়োগেবও নিপুণ

কলাকার। নাট্যদর্শকদের রুচি অনুযায়ী তিনি নাটকের অঙ্ক-দৃশ্য যোজনা, পরিবেশ সৃজন, নাচ গানের ব্যবহার, সংলাপের বৈচিত্র্য ইত্যাদিতেও মনোনিবেশ করেছিলেন। উপন্যাস যে নাটক নয় এ বিষয়ে তাঁ ধারণা স্বচ্ছ ছিল বলেই তাঁর বিস্তৃত কাহিনীসমৃদ্ধ 'কবি' উপন্যাসকে নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিসরে সংহত করেছিলেন। 'আরোগ্য নিকেতন' ও কবির নাট্যরূপ তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। উপন্যাসের সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বকে সুকৌশলে নাট্যরূপের সময় বর্জন করেছিলেন তারাশঙ্কর, তার অর্থ কেবল উপন্যাস-শৈলী নয়, নাট্যশৈলীও তাঁর করায়ত্ত ছিল। এ বিষয়ে তিনি নানা ভাবনা-চিন্তাও করতেন।

পঞ্চাশের দশকের শুরু থেকেই নাটক অভিনয়ের আগে ছোট একটি উদ্বোধন অনুষ্ঠানের রেওয়াজ শুরু হয়। এমন নানা অনুষ্ঠানেই তারাশঙ্কর নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন, বক্তৃতা দিতেন। সেই সব বক্তৃতা আজকালকার মত টেপ করে রাখার ব্যবস্থা ছিল না। তারফলে নাট্যতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাজাত নানা মন্তব্য আমাদের কাছে অজানা রয়ে গেল।

তারাশঙ্কর এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে, প্রকৃত প্রযোগকর্তা বা পরিচালকের অভাবে ভাল পাঠ্য নাটকও বঙ্গমঞ্চে ব্যর্থ হতে বাধ্য। কাজেই তাঁর নাটকের সার্থক উপস্থাপকদের তিনি যথাযোগ্য সম্মান দিতেন। তাঁর নাট্যকার জীবনের পথপ্রদর্শক নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'কালিন্দী' নাটকটি উৎসর্গ করেই তিনি বাংলার বঙ্গভূমিতে পা রাখেন। তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক নাটক উৎসর্গ করেন সেকালের পেশাদার বঙ্গালয়ের বিশিষ্ট পরিচালক, তাঁর প্রীতিভাজন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রকে। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক পেশাদার মঞ্চ নাটকটি সম্পর্কে আগ্রহ দেখায় নি। কিন্তু বীরেন্দ্রকৃষ্ণ তার প্রতি সেই উপেক্ষার জবাব দিলেন রঙমহলে 'কবি' নাটক মঞ্চস্থ করে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণর পরিচালনায় 'কবির' অভিনয় দেখে 'যুগান্তর' পত্রিকায় কবি ও চিত্র-পরিচালক প্রেমেন্দ্র মিত্র মন্তব্য করেছিলেন—'তারাশঙ্করের কবি নাটকটি' আমার কাছে একটি মধুর কবিতার মতো উপাদেয়। বারবার উপভোগ করেও আশা মেটে না।' বলাবাহুল্য তারাশঙ্করও তাঁর প্রযোজিত নাটকগুলির মধ্যে কবির অভিনয়ই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করতেন এবং সেক্ষেত্রে তাঁর প্রীতিভাজন বীরেন্দ্রকৃষ্ণের অবদানের কথাও বলতেন।

নাট্যদৃশ্য বর্ণনার চমৎকারিত্ব ॥

গণনাট্যের প্রতিনিধিস্থানীয় স্রষ্টা বিজন ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী,

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরাই প্রথম নাটকের দৃশ্য, সময় ও স্থান বর্ণনায় প্রথা ভাঙার দায়িত্ব নেন। এর সাথে নাট্যপ্রযোগকর্তার যেমন সুবিধে হয়, তেমনি অল্পশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত দর্শকদেরও। তারাশঙ্কর গণনাট্যের গোষ্ঠীভুক্ত না হয়েও গণজীবনের কথা তাঁর নাটকে যথেষ্ট বলেছেন। বিজন ভট্টাচার্যের মতন তাঁর নানা নাটকেও মঞ্চোপযোগী লোকসঙ্গীত লোকনৃত্যের সংযোজনও করেছেন। তবে 'কবি' নাটকেই তার চরম স্ফূর্তি, কাজেই এই নাট্যাভিনয়টি প্রবল জনপ্রিযতা অর্জন করে। বিশ্বরূপা থিযেটারে 'সেতু' এবং মিনার্ভা থিযেটারে 'অঙ্গার' নাটক যে নতুন নাট্যাঙ্গিকের জন্য যুগপৎ প্রশংসিত ও সমালোচিত হয়েছিল, তার আগেই, ১৯৫০ সালের জুন মাসে প্রথম মঞ্চস্থ 'কবি' নাটকে তারাশঙ্কর নিপুণ মঞ্চ কারিগরির সূচনা ঘটালেন। প্রসঙ্গত কযেকটি দৃশ্যমুহূর্ত তুলে ধরছি।

এক।

(নেপথ্যে ঘণ্টা বাজিল)

নেপথ্যে স্টেশনমাষ্টার। বাজা, এই বাজা। আরে ট্রেন যে ইন্ করছে। আবে।

বাজন। (উঠিযা পড়িল) yes sir, হাজির হ্যায। (যাইতে যাইতে) ইযে গাড়ীমে তো মেরে কবিযাল আতা হ্যায জী। (প্রস্থান)
(বিপ্রপদ একখানা ঘুঁটে কুড়াইযা লইল। খরিদ্দারেরা স্টেশনের ভিতরে গেল। ট্রেনের শব্দ হইল। বাঁশি বাজিল। ট্রেন আসিল। বেনে মামা হাঁকিল চা গ্রোম, চা গ্রোম। বিপ্রপদ আপন মনে কাঠি দিয়া ঘুঁটেটাকে ফুটা করিল। ইহারই মধ্যে ঠাকুরঝি ঘটি মাথায স্টেশনের ভিতর চলিযা গেল।'

[এই দৃশ্যাংশটি তীব্র নাটকীযতায গতিময়। নাট্যকার সংলাপের পরিবর্তে নাটকীয ক্রিয়া বা dramatic action এর চলচ্চিত্রধর্মী গতিমযতায় রঙ্গমঞ্চকে যেন মুঠোয পুরে নিযেছেন।' স্টেশন মাস্টারের কর্তব্যবোধ রাজনের নিতাইপ্রীতি, বিপ্রপদ-র শযতানি, ট্রেনের উপস্থিতি, হকারের প্রাত্যহিক ভূমিকা যখন অতি দ্রুত ঘটে যাচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে স্টেজের উইংসের এক-দিক থেকে অন্যদিকে ঠাকুরঝি-র দ্রুত চলে যাওয়ার বহতা নাট্যগতি দর্শকদের দৃষ্টিকে মঞ্চের প্রতি একাগ্র করে রাখে]।

দুই.

'কবি' নাটকের শেষ দৃশ্য। কাটোয়াতে কবিগান গেয়ে, সোনার মেডেল নিয়ে ঘরে ফিরছে নিতাই। ইতিমধ্যে তার জীবন থেকে বসন সরে গিয়েছে। সোনার মেডেলটা আজ সে তার প্রতিশ্রুতিমত পরকীয়া নায়িকা ঠাকুরঝিকে দিতে এসেছে। মঞ্চের একধারে খোলা জানলা দিয়ে চৈত্রশেষের পুষ্পিত কৃষ্ণচূড়ার ডালটি দুলছে। দূরে স্টেশনে বাজছে ট্রেনের ঘণ্টা। এতক্ষণে দৃশ্যপট আলোকিত হল। দীর্ঘক্ষণ দর্শক ঠাকুরঝি-র কোনো সংবাদ পায়নি। এবার নিতাই-এর সঙ্গেই জানল—

রাজন। সে নাই কবিয়াল!

নিতাই। সে নাই?

রাজন। না! কবিয়াল—তোমার জন্যে—পাগল হয়ে কেঁদে কেঁদে একদিন চলে গেল। এইখানেই কবিয়াল—সে এসে শুয়েছিল—
(নিতাই স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হাত হইতে মেডেলটি খসিয়া পড়িয়া গেল। রাজন আগাইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিল।)

রাজন। কবিয়াল।

নিতাই। রাজন, ভাই

রাজন। কাঁদছ

নিতাই। (সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল, বিষণ্ণ হাসি হাসিল) না ভাই ভাবছি।

রাজন। দোস্ত!

নিতাই। হায় রাজন!

(সুরে)—　এই খেদ মোর মনে
ভালবেসে মিটিল না সাধ কুলাল না এ জীবনে
হায় জীবন এত ছোট ক্যানে?
হায়!

ধীরে ধীরে যবনিকা নেমে আসে। বর্তমান প্রবন্ধকারের বড় ভাই রঙমহলের 'কবি' নাটকে নিয়মিত অভিনয় করতেন। তাঁর সঙ্গে একাধিকবার রঙ্গমঞ্চে গিয়েছি ও সেই কৈশোর জীবনেও এই দৃশ্যটির রসঘন আবেদনে

মুগ্ধ হয়েছি। একদিন তো সাজঘরে নাট্যকার তারাশঙ্করের সঙ্গে দেখাই হয়ে গিয়েছিল। তাঁর কথাবার্তার কিছু আবছা স্মৃতি এখনও মনে আছে। অভিনেতা রবীন মজুমদার, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, হরিধন মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায় এবং অভিনেত্রী কেতকী দত্ত, প্রণতি ঘোষ, গীতা সিং, রাজলক্ষ্মী (বড) প্রমুখ অনেকেই তাঁকে ঘিরে ধরেছেন। সঙ্গে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। আরও অনেকেই ছিলেন যাঁদের নাম এই মুহূর্তে মনে আসছে না। তারাশঙ্কর তাঁদের নানা কথার জবাব দিচ্ছিলেন, এমন কি কোনো দৃশ্যে অদল-বদলের প্রয়োজন আছে কিনা, তাও জানতে চাইছিলেন। পরবর্তীকালে মনে হয়েছে, এ হল গিরিশচন্দ্র-শিশির কুমারের ঘরানার শেষ ছবি। অনেকটাই গণনাট্যীয় কিন্তু পেশাদারী থিয়েটার বলেই, পুরোপুরি নয়। স্বভাবতই পুরোপুরি নাট্যকার-অভিনেতা উৎপল দত্তের সঙ্গে তারাশঙ্করের তুলনা করলাম না।

অভিনয়জগতের পরিবর্তন ও তারাশঙ্কর ॥

আমাদের বাল্যকালের কথা দিয়েই এই প্রসঙ্গটি শুরু করি। কলকাতা থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে, দক্ষিণ গোবিন্দপুর গ্রামে আমার বাল্য-কৈশোর কেটেছে। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় সেখানে 'রূপশ্রী' নামে একটি ক্লাব ছিল। একাধিক গ্রাম থেকে নাট্যানুরাগী ব্যক্তিরা সেখানে জড়ো হতেন। ক্লাবের জনৈক শিল্পী তাঁর বাড়িতেই বিরাট বিরাট উইংস এবং অন্যান্য পশ্চাদপট আঁকতেন। নিয়মিত রিহার্সাল হত। এই স্মৃতিমন্থনের কারণ হল, রূপশ্রী ক্লাবের 'দুই পুরুষ' এবং 'কালিন্দী' প্রযোজনা সেই অল্প বয়সেই আমাকে তারাশঙ্করের নাটকের ভক্ত করে তোলে। আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে বাংলার বিভিন্ন গ্রাম গ্রামান্তরেও তারাশঙ্করের নাটকের চাহিদা কতদূর প্রসারিত হয়েছিল, এ হল তার প্রমাণ।

ষাট-সত্তরের দশকেও বাংলা মঞ্চের দর্শকরা তারাশঙ্করের নাটক দেখতে চাইতেন। বিভিন্ন ব্যাংক, সওদাগরি অফিস, পাড়ার ক্লাবে তাঁর নাটক অভিনয় করার উৎসাহ ছিল। অবশ্য গ্রুপ থিয়েটারগুলি তাঁর নাটক প্রযোজনার ক্ষেত্রে সেভাবে এগিয়ে আসেননি কেন, তা ভেবে দেখা দরকার। তাঁর নাটকে সাম্প্রতিক কালের নাগরিক সমস্যাগুলি যেমন অনেকটাই ধরা পড়েছে তেমনি গ্রামীন সমাজের নীচতা-দীনতা—উদারতা-সহিষ্ণুতার ছবিও আছে। তাঁর

বিভিন্ন উপন্যাসকে নাট্যায়িত করারও প্রচুর উপাদান বর্তমান। এখন নতুন ভালো নাটকের অভাবের কারণ খুঁজতে সেমিনার পর্যন্ত হচ্ছে। অথচ হাতের কাছেই রয়েছে তারাশঙ্করের নাটকগুলি। আধুনিক দর্শকদের তৃপ্ত করার সুস্থ উপাদান এ যুগের যে কোনো নাটকের তুলনায় তারাশঙ্করের নাটকে বেশি-ই আছে। জানি, অনেকেরই এই সত্য কথাটা পছন্দ হবে না।

তথ্য সূত্র :

১। অহীন্দ্র চৌধুরী : নিজেরে হারায়ে খুঁজি।
২। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : আমার কালের কথা।
৩। কালি ও কলম, তারাশঙ্কর স্মৃতি সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮
৪। ড. মানস মজুমদার : নাট্যকার তারাশঙ্কর।

———

অন্ধকারের অন্তরে

(তারাশঙ্করের উপন্যাসে "নিম্নবর্গের" মানুষ)

অচিন্ত্য বিশ্বাস

রাঢ় বাংলার সমাজে কৃষি আর শিল্প বনভূমি আর সমভূমির মতো—মালভূমি আর পলিসঞ্জাত মৃত্তিকার মতো মিলে মিশে আছে। আমাদের ইতিহাস আর সমাজসংগঠনের যাত্রালগ্নের বহুসংবাদ সেখানে গভীর গোপনভাবে জড়িত রয়েছে। অন্যান্য স্তরগুলির কথাও এখানে বাস্তব। 'কালিন্দী'র বিমল মুখার্জিরাও এই বন্ধুর জীবন পরিধিতে আছেন—আছেন 'তামস তপস্যা'র পানুরাও—একটা জীবন যাদের কেটে যায় জাত (caste) কাঠামোময় জীবনচক্রে প্রবেশ করার মতো বিনয় ও আনুষঙ্গিক আয়ত্ত করতে। এই দুই প্রত্যন্তবর্তী সম্ভাবনার মাঝখানে ঝুলে রয়েছে বিচিত্র মানুষ—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের দিগন্তে যারা ভিড় করেছে। ইতিহাস এদের প্রতি সাধারণত অকরুণ। জীবনে-মরণে এদের সংবাদ নিতান্তই শিরোনাম বর্জিত—পাদপ্রদীপের উজ্জ্বলতা এদের জন্য নয়, এরা দিগন্তবিস্তৃত কৃষিলক্ষ্মীর বাহন মাত্র—তার অধিকারী হবার কথা স্বপ্নেও এরা ভাবে না। ইদানীং সারস্বত সভার কিছু আনকোরা মানবিক এদের নতুন নামকরণ করেছেন—নিম্নবর্গ। সমাজ-রাজনীতির ক্ষেত্রের এইসব মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়াস শুরু হয়েছে স্বাধীনতার পূর্ব থেকেই। তখন থেকেই—হাজার বছরের যবনিকা একটু একটু করে উঠেছে। তাদের অজান্তেই একটু একটু নামান্তর হয়েছে। কখনো তাদের ধর্মীয় প্রলেপের দ্বারা বলা হয়েছে তারা হরিজন। কখনো তাদের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে সাংবিধানিক মানদণ্ড—অনুসূচিত, তফসিলভুক্ত বা **Scheduled caste**, কখনো তারা **Scheduled tribe.** এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। রাঢ় কেন গোটা ভারতেই **Scheduled caste** আর **Scheduled tribe** (এবং সম্প্রতিকালে বহু ব্যবহৃত বিতর্কিত **Other Backward caste**) একটি অত্যন্ত অনির্দিষ্ট তরলিতপ্রায় সংজ্ঞা। এদিয়ে কিছুতেই কোন মৌল চরিত্রের সন্ধান মেলে না—যা দিয়ে কোন জনগোষ্ঠীকে নির্দিষ্ট ভাবে বর্গীকরণ করা সম্ভব। এক রাজ্যের

Scheduled caste অন্যরাজ্যে Seheduled tribe এমন দৃষ্টান্ত যেমন আছে, এক রাজ্যে O.B.C. অন্য রাজ্যে S.C. বা S.T. এমন উদাহরণও কম নয়। মাহিষ্যদের কথাই বলি। পশ্চিমবঙ্গে মণ্ডল কমিশনের বিবেচনায় তারা O.B.C. অসমে তারা S.C. আর ত্রিপুরা রাজ্যে তাদের নাম S.T. তালিকাভুক্ত। বিহার-পশ্চিমবঙ্গে সুপরিচিত S.T. সাঁওতাল-রা অসমে O.B.C. পর্যায়ভুক্ত। বলাবাহুল্য রাষ্ট্রিক প্রশাসনিক স্তরে বিভিন্ন রাজ্যের অবস্থা এক একটি গোষ্ঠীর সামাজিক অবস্থান সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে বিশেষ রকম কাজ করে গেছে। এর সঙ্গে সামাজিক অবস্থান ও গ্রহণযোগ্যতার কোন সম্পর্ক নেই।

তাহলে আমরা যাদের কথা বলতে চাইছি তাদের কি সনাক্ত করা যাবে না? কিভাবে তাদের বিবেচনায় আনা হবে? বস্তুত পক্ষে প্রশ্নগুলি সমাজতাত্ত্বিক। এর সঙ্গে উপন্যাস আলোচনার সম্পর্কও খুব নিবিড় কিনা কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন। আমরা সেরকম কূটপ্রসঙ্গের অবতারণা চাইছিনা। বর্তমান নিবন্ধে কাল-বিচারে আধুনিক ক্ষেত্রে সরে এসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নতুন একটি মাত্রা সংযোজন, কিছু কিছু লেখায় যা বর্তমান লেখক করেছেন,—তাও খুব বেশি উপস্থাপিত হবে না। না হোক, আমরা তারাশঙ্করের সৃজনের সীমানা অতিক্রম করলাম না—তাঁর রচনার ভূগোল মুর্শিদাবাদ থেকে বর্ধমান—সর্ব অর্থেই উত্তর রাঢ, এটুকুতেই না হয় সীমাবদ্ধ রাখা গেল, আর কালগত সীমানাও না হয় বদলালাম না—কিন্তু বিবেচনার ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি সামান্য বদলে যেতে বাধ্য আমাদের। গত দুই দশকের ভারতীয় রাজনীতিতে মানুষ হিসাবে নিম্নবর্গের জনসাধারণ স্বতন্ত্র মর্যাদা পেতে শুরু করেছেন। অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার ও বিচ্ছিন্নভাবে বেশ কিছু জায়গায় শ্রেণী হিসাবে বিকশিত হচ্ছেন তারা। এদের একটি স্বতন্ত্র রাজ-নৈতিক সাংগঠনিক পরিচয়ও পাওয়া যাচ্ছে। মহারাষ্ট্রে রিপাবলিকান পার্টি, উত্তরপ্রদেশ-পাঞ্জাবে বহুজন সমাজ পার্টির মতো রাজ্যের ও সর্বভারতীয় হিসাবে স্বীকৃত দলের মারফৎ আর একটি সংস্থা জেগে উঠছে। এই জন-গোষ্ঠীর নাম হয়ে উঠছে দলিত। বস্তুত তারা হরিজন সত্তাকে বর্জন করছেন, দলিত সত্তাকে অবলম্বন করছেন। আর এই ভাবেই এক ধরণের নবচেতনার প্রবাহে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের মানুষদের বিশ্লেষণ করার পূর্বশর্তও তৈরি হয়ে আসছে। মানুষগুলিকে তারাশঙ্কর আন্তরিকতার সঙ্গেই এঁকেছেন—কিন্তু তাদের যে ফ্রেমে বেঁধেছেন, এখনকার নবচেতনা

(দলিত আন্দোলনের ভাষায় Dalit Consciousness) দিয়ে দেখলে বহু ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে সেই ফ্রেমটাই যাচ্ছে আলগা হয়ে।

কঙ্কণা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, দেখুড়িয়া—এই পঞ্চগ্রামের মানুষদের ক্ষেত্রে ঘটেছিল অনেকটাই এইরকম বিপর্যয়। সকলেই যে যার বর্ণগত অবস্থান থেকে সরে আসছেন। নাপিত, বায়েন, দাই, চৌকিদার, নদীর ঘাটের মাঝি, মাঠ আগলদার—সবাই বাৎসরিক ধানের বন্দোবস্তে খুশি থাকতে পারেন নি—সকলেই বলেছেন নতুন এক বাজারি অর্থনীতির কথা। ঘটনার সূত্রপাত অনিরুদ্ধ কর্মকার আর গিরীশ সূত্রধরের কাজ থেকে—কাছেই যে বাজার, সেখানে একটি করে দোকান দিয়েছেন তারা। কারণ তারা লক্ষ করেছেন—পুরোনো ফ্রেমে আর চলছে না। আলগা হয়ে যাচ্ছে। অনিরুদ্ধের অজুহাত ঃ

১. কত ঘরে হাল উঠে গিয়েছে তাও দেখুন।...আমার চোখের ওপর এগারটি ঘরের হাল উঠে গিয়েছে। জমি গিয়ে ঢুকেছে কঙ্কণার ভদ্রলোকদের ঘরে। কঙ্কণায় কামার আলাদা। আমাদের এগারো-খানা হালের ধান কমে গিয়েছে।

২. তারপরে ধরুন—আমরা চাষের সময় কাজ করতাম লাঙ্গলের—গাড়ীর, অন্য সময়ে গাঁয়ের ঘর দোর হত। আমরা পেরেক গজাল হাতা খুন্তি গড়ে দিতাম—বঁটি কোদাল কুড়ুল গড়তাম,—গাঁয়ের লোকে কিনত। এখন গাঁয়ের লোকে সেসব কিনছেন—বাজার থেকে। সস্তা পাচ্ছেন—তাই কিনছেন। আমাদের গিরীশ গাড়ী গড়ত, দরজা তৈরী করত; ঘরের চাল কাঠামো করতে গিরীশকেই লোকে ডাকত। এখন অন্য জায়গা থেকে সস্তায় মিস্ত্রী এনে কাজ হচ্ছে।

বদলে যাওয়া অর্থনীতি আর দৃষ্টিভঙ্গি আঘাত করছে চিরাচরিত ব্যবস্থাকে। আগে হাল পিছু ধান পাবার বন্দোবস্ত ছিল। অনিরুদ্ধ পেত পাঁচ শলি আর গিরীশ পেত চার শলি। এগারটি হাল কঙ্কণায় চলে যাবার ফলে পঞ্চান্ন আর চুয়াল্লিশ একুনে নিরানব্বই শালি ধানের ক্ষতি হচ্ছে। এর নিয়ন্ত্রণ কে করবে? ষোল আনা বৈঠক? ময়ূরেশ্বর শিবমন্দিরের চণ্ডী মণ্ডপ? আবার অন্য ঘটনাও ঘটছে। গ্রামবাসীরাই দেখাচ্ছেন বাজার অর্থনীতির পথ। তারা অনিরুদ্ধ আর গিরীশের শিল্পকর্মের মূল্য দিচ্ছেন

না। নাপিত যে তাব বাড়িব সামনে অর্জুনতলায় খান কয়েক ইঁট পেতে বলেছেন ঃ 'পযসা আন, এনে কামিযে যাও।' সেও কি নয এই সামগ্রিক ব্যবস্থা বদদেব ইঙ্গিত? অর্থনীতিই গ্রামীন স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থাব ফ্রেমটি ভেঙে দিচ্ছে সন্দেহ নেই।

তবে এই সার্বিক পাবিবর্তনেব কিছু তাবতম্য আছে। তাবাশঙ্কব দেখাচ্ছেন তাদেব পরিণতি একটু অন্যরকম, অনিবুদ্ধ বা গিবীশেব মতো যাবা হাত তুলে নিতে পাবছেন না। অত্যাচাব আব শাসন—অর্থবান আব জাত কাঠামোয় উচ্চতর যাবা তাদেব ভ্রূকুটি কুটিল ষড়যন্ত্রে, নির্দয ব্যবহাবে এদেব অবস্থা নিতান্তই জটিল। কৃষিকর্মে অসুবিধা হয় কর্মকাব আব সূত্রধববা কাজ না করলে, কিন্তু ভূম্যধিকাবীদের তুলনায দলিত বর্গেব মানুষবাই এই অসুবিধা সহ্য কবেন বেশি। 'একেবাবে একপ্রান্তে গ্রামেব হবিজন চাষীবাও দাঁড়াইরা দর্শক হিসাবে। ইহাবাই গ্রামেব শ্রমিক চাষী। অসুবিধাব প্রায বাবো আনা ভোগ করিতে হয় ইহাদিগকেই।'—আমবা যোগ কবতে পাবতাম, এবং অনিবুদ্ধ-গিবীশ দূবে চলে যাওয়ার ফলে এদেরই ময়ূবাক্ষীব বালি ভেঙে, জল পেবিযে যেতে হযেছে শহবে। আর তাদেব এই পঞ্চগ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে কিছুমাত্র মতামত প্রদানেব অবস্থাই নেই।

এতক্ষণ যা লেখা গেল তা হল শোষণের কথা। **Exploitation**-এব ধাবণায় নতুন কবে যোজিত হচ্ছে **Sexploition** এর ধাবণাও। দলিত মানুষ তাদেব কথা বলবাব মতো অবস্থাতেই নেই। পাতুলাল মুচি ষোল আনাব সমাজে তাব কিছু কথা বলতে চেযেছিলেন, কিন্তু কেউ তার কথা শোনেন নি। অমবকুণ্ডাব মাঠে তাব সঙ্গে সাক্ষাৎ হল চৌধুবীব। মোড়ল চৌধুবীব সামনে দাঁড়ালেন একটি মুখ—দলিতেব ঃ

> 'কপালে একটা সদ্য আঘাত চিহ্ন হইতে রক্ত ঝবিযা মুখখানাকে বক্তাক্ত করিয়া দিযাছে। পিঠে লম্বা দড়ির মত নির্মম প্রহারচিহ্ন বক্তমুখী হইযা ফুটিযা উঠিয়াছে।'

কি, না অনিবুদ্ধ, গিবীশদেব মতই পাতু বাযেনও দাবি তুলেছিলেন, গোটা গ্রামেব লোকের 'আঙোট জুতি' যোগাতে পারবেন না। দ্বাবকা চৌধুবী বলেছিলেন গ্রামেব ভাগাড়ে মড়ি পডলে মুচিবা চামডা পান, হাড় বিক্রি কবেন, (মাংসও নিযে যান তাবা—যদিও চৌধুবী সেকথা 'ঘৃণাবশে উচ্চারণ কবিতে পারিল না') সুতবাং 'আঙোট জুতি' দিতে তো বাধ্য তাবা।

এর উত্তরে পাতুলাল জানিয়েছেন ঘটনা মোটেই তেমন নেই। বদলে গেছে। 'আলিপুরের রহমৎ স্যাথ' 'কঙ্কণার রমন্দ চাটুজ্জের সঙ্গে ভাগাড়' দখল করেছেন। ভাগাড়ে মড়ি পড়লে চামড়া ছাড়াবার মজুরি আর নুনের দাম ছাড়া দু'চার আনা তারা দেন। চামড়া বিক্রি করতে হয় তাদেরই কাছে। স্বভাবতঃই দ্বারকা চৌধুরীর উপলব্ধি—'শেষে চামড়া বেচিয়া রামেন্দ্র চাটুজ্জে বড়লোক হইবে! ছিঃ ছিঃ ব্রাহ্মণের ছেলে।'

পাতু বায়েনের দ্বিতীয় অভিযোগটি মারাত্মক।—'শুধু তো 'আঙোট জুতি' নয়, আপনারা ভদ্দরলোকরা যদি আমাদের ঘরের মেয়েদের পানে তাকান—তবে আমরা যাই কোথায় বলুন?' পাতু বায়েনের বোন দুর্গার সঙ্গে সদ্য ধনবান হয়ে ওঠা সদ্‌গোপ ছিরু পাল 'ফষ্টি নষ্টি' করছেন—এ অভিযোগ মারাত্মক শুধু নয়—রাঢ় বাংলার গ্রামজীবনের কদর্য একটি সত্যকেই তুলে ধরেছে।

আপাতত আলোচনায় বোঝা গেল তারাশঙ্করের সৃজনের দিগন্তে মানহারা মানুষের ভিড়ে তারাও আছেন, যারা পরিবর্তমান আর্থসামাজিক কাঠামোতে কিছুতেই নিজেদের অধিকারটি যথাযথ পাচ্ছেন না। অনিরুদ্ধ দেখেছিলেন, রাতের অন্ধকারে তার 'দুই বিঘা বাকুড়ির আধপাকা ধান' কে বা কারা কেটে নিয়ে গেছে। পাতু বায়েন প্রতিবাদ করার ফল পেয়েছেন হাতে হাতে।

বিষয়টি একটু বদলে যায় যদি আমরা অন্য দুয়েকটি উপন্যাসের ভুবন পরিক্রমা করি। 'গণদেবতা'-র বুনটটি ভিন্ন রকম। সেখানে আছে গ্রামজীবনে দু-ধরনের নেতৃত্ব জেগে ওঠার সংবাদ। প্রথম—অর্থনৈতিক, ছিরু পাল যার নায়ক; আর দ্বিতীয়—রাজনৈতিক, দেবু ঘোষ যার অবিসম্বাদী নায়ক। আর 'গণদেবতা'য় এই দুই নেতৃত্বের সামাজিক প্রতিপত্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক ধ্রুপদী দ্বন্দ্ব। তারাশঙ্কর বীরভূম জেলার পটভূমিতে মধ্যস্তরের সামাজিক কাঠামোতে অবস্থিত সদ্‌গোপ সমাজের উত্থানের চিত্র অংকনের চেষ্টা করেছেন। বস্তুত তাঁর প্রধান উপন্যাসের এক বড় অংশ জুড়েই রয়েছেন সদ্‌গোপ চাষী, যারা কর্মিষ্ঠ ও আত্মোন্নয়নশীল। ভূমি ব্যবস্থার একটি বিশেষ পর্যায়ে মধ্যবিত্ত (এবং মধ্যচিত্ত) ভূমিবান্ মানুষের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তারাশঙ্করের দৃষ্টি এড়ায় নি। আর এরকম কৃষক চরিত্র-গুলির আকর্ষণেই এসেছেন তারা—যাদের আমরা নিম্নবর্গের মানুষ বলি,

যারা নিশ্চিত ভাবেই দলিত। গোত্রহীন ব্রাত্য সমাজকাঠামোর দূরবর্তী মানুষ তারা। ভূমিব্যবস্থার বারো আনা কাজই তারা নিষ্পন্ন করেন—এবং অথচ তাদের কথা কেউ কখনো শোনেন না। পাদ-প্রদীপের আলো তাদের জন্য বরাদ্দ নয়।

'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'-র মানুষদের কথা তারাশঙ্কর তাঁর 'স্মৃতিকথা'য় বলেছেন—'জানার পুঁজির মূল্য বুঝে আমি এদের কথা বাংলা সাহিত্যে বলেছি। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র মানুষদের পর্যন্ত আমার···জানার সুযোগ হয়েছিল। ওই সুচাঁদ এবং আমি বসে গল্প করেছি আর বিড়ি টেনেছি। বাড়িতে যখন থাকতাম, এখনও যখন যাই লাভপুরে তখন সকালে বেলা উঠেই বাড়ি থেকে বের হই, আমার 'কবি' উপন্যাসের বনিক মাতুলের চায়ের দোকানে গিয়ে বসি, চা খাই। তাদের সঙ্গে গল্প করি। যোগেশ বৈরাগী ওখানকার দুর্ধর্ষ ব্যক্তি, তার সঙ্গে আমার খুব ভাব। নিতাই বাউড়ী, সতীশডোম এরা এসে মাটিতে উপু হয়ে বসে গল্প করে গল্প শোনে। রাজা পয়েণ্টসম্যান এসে সেলাম করে দাঁড়ায়, সেলাম হুজুর। জায়গাটা খাঁ খাঁ করে বিপ্রপদ অর্থাৎ দ্বিজপদর জন্যে। সে নেই। পথে নসুবালার সঙ্গে দেখা হয়, সে চুল বেঁধে নাকছাবি পরে থমকে দাঁড়ায়, বলে—হেই মা গো।··· বিদায়ের সময় বলে—এই দেখ, এমন করে মথুরার সুখে ব্রজধামকে ভুলে থেক না।'[২]

একইভাবে তাঁর সাক্ষাৎ হয় বসনের সঙ্গে, বসনের মেয়ে ময়নার সঙ্গে, স্বর্ণডাইনীর সঙ্গে। প্রায় সমস্ত উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলিই তারাশঙ্করের চোখে দেখা চরিত্র। পটুয়া, বাজীকর সহ বিচিত্র সব মানুষ তাঁর অভিজ্ঞতার সীমানায় ছিলেন। অভিজ্ঞতার এই সীমানায় ছিলেন আদিবাসীরাও। 'কালিন্দী' উপন্যাসে সাঁওতাল সমাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের চিত্রও স্পষ্ট হয়ে এসেছে। এই পরিচয়ের আড়ালে অবশ্য অপরিচিতির কিছু সূত্র বর্তমান। সে বিষয়ে উপযুক্ত অবসরে আমাদের মতামত দেওয়ার চেষ্টা করব।

১৩৪৮ সালের 'আনন্দবাজার' শারদীয় সংখ্যায় তারাশঙ্কর 'যাদুকরী' নামে একটি গল্প লেখেন। সে গল্পে আছে সিদ্ধলগ্রামের ভট্ট ভবদেবের কথা।

> 'রাঢ়ের সিদ্ধলরাজ ভবদেব ভট্ট—গুপ্তচরের এক অতি নিপুণ সম্প্রদায় সৃষ্টি করিয়া ছিলেন। নটী ও রূপোপজীবিনীদের সন্ততি লইয়া গঠিত হইয়াছিল এই সম্প্রদায়। নারী এবং পুরুষ—উভয় শ্রেণীই গুপ্তচরের

কাজ করিত। ইহাদিগকে ভোজবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র, অবধৌতিক চিকিৎসা শিক্ষা দেওয়া হইত, নারীরা নৃত্যগীতে নিপুণ ছিল। এই সম্প্রদায় যাযাবরের মত ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া দেশে দেশান্তরে সংবাদ গ্রহণ করিয়া আনিত।'[২]

গল্পের অংশটি প্রয়োগ করলাম তারাশংকরের মনোভাব বোঝাতে। তথ্যটুকু তারাশংকর পেয়েছিলেন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। একদা ভট্ট ভবদেব রাঢ় বাংলার সমাজ সংগঠনে সাহায্য করেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে আছে তার স্পষ্ট কিছু উদাহরণ। সমাজ শাসনের এই উদাহরণ আমাদের মনে আসে, হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের মারফৎ তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় তা জানতেন। জানতেন যে, তার প্রমাণ তো পেলাম 'বাজীকর' শীর্ষক গল্পটিতেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেখিয়েছেন ব্রাহ্মণ্য সংস্কার কিভাবে বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে বাংলায়। হরিবর্মার মন্ত্রী ছিলেন ভবদেব। তাঁর কাছেঃ 'ব্রাহ্মণেরা আসিতেন বৃত্তির জন্য, দক্ষিণার জন্য, ভাটেরা আসিত ত্যাগ পাইবার জন্য, আচার্যেরা আসিতেন পূর্ণ পাত্রের জন্য, বেণেরা আসিত ব্যবসার সুবিধা করিয়া লইবার জন্য, সৈন্যেরা আসিত জমি ও জায়গীরের জন্য, যুগী, জোলা, তাঁতিরা আসিত কাপড় বোনার সুবিধা করিয়া লইবার জন্য, তেলীরা আসিত ঘানির ব্যবস্থা করিবার জন্য, বৌদ্ধরা আসিত তাহাদের ওপর অত্যাচার না হয় সেটাই প্রার্থনা করিবার জন্য।'[৩]

তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়েকটি লেখা পড়লে মনে হয় তিনি পরিবর্তিত সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে মিলিয়ে এই বিপুল খেটে খাওয়া জনগোষ্ঠীকে তাঁর সৃষ্টির ভুবনে প্রায় অনুরূপ প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করেছেন। কিভাবে, তা বোঝাবার জন্য আমরা দুটি উপন্যাসের আলোচনা বিশেষভাবে করতে চাই—'কালিন্দী' ও 'তামসতপস্যা'।

'কালিন্দী'কে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কেন যে ব্যর্থ রচনা বলেছেন, জানি না। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনায় দুয়েকটি বিভ্রান্তিও চোখে পড়ল। যেমন তিনি লিখছেনঃ 'মহীন্দ্রের নরঘাতী পিস্তলে যে বারুদ সঞ্চিত হইয়াছে তাহা তাহার পিতৃঅপরাধের ভূগর্ভস্থ খনি হইতে সংগৃহীত।'[৪] উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক অংশঃ 'মহীন্দ্র কাছারি ঘরে ঢুকিয়া বন্দুকটা বাহির করিয়া আনিল।' অতএব মহীন্দ্র কিন্তু পিস্তল ব্যবহার করেনি, বন্দুক দিয়ে ননীপালকে মেরেছিল।

এরকম সামান্য বিভ্রান্তির কথা না হয় ছেড়ে দিলাম, শ্রীকুমারের অভিযোগ তারাশঙ্করের 'কালিন্দী' উপন্যাসটিতে লেখকের পরিকল্পনা সার্থক হয়নি। 'যে পরিমাণ কল্পনাসমৃদ্ধি থাকিলে জড় প্রকৃতি প্রতিবেশকে মানবীয় বিবোধের কেন্দ্রস্থলে সক্রিয় অংশভাক্ রূপে প্রতিষ্ঠা করা যায়, লেখক ততখানি বিদ্যুৎ-শক্তিপূর্ণ কল্পনার পরিচয় দিতে পারেন নাই।'[৫] তাঁর পরবর্তী অভিযোগ উপন্যাসটিতে কালিন্দীর চর নিয়ে দ্বন্দ্বে সাঁওতালদের 'সংশ্রব নিতান্ত শিথিল।' সারী চরিত্রটির বাস্তবতা সম্পর্কেও তিনি সন্দিহান, কিন্তু 'সারী উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের সহিত একটু ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত' হওয়ার অভিযোগটির ভিত্তি কম—ধনগর্বী কল মালিক বিমল মুখোপাধ্যায় তাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে সখ মিটিয়েছেন একথা সত্য হলেও, সবশেষে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত : 'উপন্যাসে যে অনেক অনাবশ্যক লোকের ভিড় ও কতক অসংলগ্ন ঘটনার যদৃচ্ছ সমাবেশ হইয়াছে তাহা ইহার নাটকীয় রূপে আরও উগ্রভাবে প্রকট। উপন্যাসের গঠন শিথিলতার মধ্যে যাহা চোখ এড়াইয়া যায়, নাটকের কঠোরতর সংহতির মধ্যে তাহা বিচার বুদ্ধিকে পীড়িত করে।'[৬] উপন্যাসে গঠন শিথিলতা প্রমাণের জন্য নাট্যরূপায়িত মাধ্যমের কথা স্মরণ করা কতটা প্রাসঙ্গিক তা আমাদের জানা নেই।

ভাষা এই উপন্যাসের সার্থকতার অন্যতম নিদর্শন। সামান্য কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া উচিত :

১. কার্নিশের মাথায় কড়িকাঠের উপরে বসিয়া সারি সারি পায়রার দল গুঞ্জন করিতেছে। সামনের খোলা মাঠটার উপর সারিবন্ধ নারিকেলের গাছ, তাহারই কোন একটার মাথায় আত্মগোপন করিয়া একটা পেঁচা আসন্ন সন্ধ্যার আনন্দে কুক কুক করিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঘরের ভিতর হইতে অন্ধকার নিঃশব্দে বাহির হইয়া আসিতেছে শোকাচ্ছন্ন বিধবার মত। এতবড় বাড়িটার কোথাও এক কণা আলোকের চিহ্ন নাই, কোথাও একটা মানুষের সাড়া নাই, শুধু সিঁড়ির পাশে দুই দিকে দুইটি সুদীর্ঘ শীর্ষ ঝাউগাছ অবিরাম সনসন শব্দ করিতেছে। সে শব্দ শুনিয়া মনে হয়, যেন এই অনাথা বাড়িটাই বুক ফাটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছে। (১২ পরিচ্ছেদ)

২. অহীন্দ্রের পরীক্ষার ফল জান'র পর সুনীতির চোখ জলে ভরে

যায়। 'চোখ যেন তাঁহাব সমুদ্র, আনন্দের পূর্ণিমায, বেদনার অমাবস্যায সমানই উথলিযা উঠে।' (১৭ পবিচ্ছেদ)

৩. 'কুয়াশা এত ঘন যে, বিমলবাবু সাবীকেও স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছেন না। সাদা কাপড় পবিহিত সাবীকে দেখিয়া মনে হয, কুযাশার একটা পুঞ্জ মেঘ ওখানে জমিযা আছে।' (২৩ পবিচ্ছেদ)

৪. 'চবটা যেন এক চঞ্চলা কিশোরীব মত কালিন্দীব জলদর্পণে চাহিয়া অহবহ প্রসাধনে মত্ত।

এপাবে বাযহাট নিস্তব্ধ; ওপারেব চবটার তুলনায মনে হয, যেন কোন লোলচর্মা পলিতকেশা জবতী ঘোলাটে স্তিমিত অর্থহীন দৃষ্টি মেলিয়া পবপারেব দিকে চাহিযা বসিয়া আছে নিস্পন্দ নির্বাক।' (২৪ পবিচ্ছেদ).

এবকম আবও উদাহরণ দেওয়া যায। 'কালিন্দী' হযে উঠেছে অভিজাত পরিবাবগুলিব আত্মশুদ্ধিব এক বিশিষ্ট/প্রক্রিয়া। দু তিন প্রজন্মেব দ্বন্দ্ব সংঘাতেব পবিণতি হিসাবে উপন্যাসটিতে saga জাতীয উপন্যাসেব বচনা শৈলীব ছাযা পড়েছে। হযে উঠেছে 'long detailed story', especially a piece of modern serialized fiction depicting successive generations of the same family.'

কৃতিত্বেব দিকটি পাশে সরিয়ে রাখলে ঐ উপন্যাসেব একটি বড ত্রুটি চোখে পডে। বস্তুত উপন্যাসটিব প্রধান ত্রুটি সাঁওতাল জনগোষ্ঠীব প্রতি লেখকেব দৃষ্টিভঙ্গিব মধ্যে নিহিত। সাঁওতাল সমাজ তাবাশঙ্কবেব অভিজ্ঞতাব সীমানায ছিল—কিন্তু যতটা নিবিড়ভাবে তিনি দেখেছেন বাগদী, বউবি, কাহাব, সদ্গোপদেব ততটা নিবিড়ভাবে তিনি আদিবাসী সমাজকে দেখেন নি। অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম কবলে যা হয়—'কালিন্দী'-ব আদিবাসী সমাজ হযেছে দূর থেকে দেখা সচল মিছিলের মতো। অনেকটাই যেন যাযাবর প্রায আদিম ঠাঁইনাডা চিব উদ্বাস্তু এক দল সবল মানুষ। অহীন্দ্র যাদেব দেখেছেন এক মধ্য রাত্রে—অন্ধকাবে তাদের চলা: 'পুরুষ-নাবী-শিশু, গরু-মহিষ-ছাগল। সাবি বাঁধিযা চলিয়াছে।' চলে যাচ্ছেন তারা। কালিন্দীব চর থেকে চলে যাচ্ছেন—'ময়ূরাক্ষীব ধাবে নতুন চবাতে।' (৬১ পবিচ্ছেদ) মৃত্তিকা যেখানে কুমারী থাকে, যেখানে জমিদাব নেই—সেখানে আদিম জনগোষ্ঠীর রম্যবচনা; আর সেই কৃষিক্ষেত্রের উপব যখন নেমে আসে লোভ—সভ্যতার অন্যান্তরের মানুষদের ভূমিক্ষুধা

যখন উত্তেজিত হয তখন এই মানুষরা চলে যায নতুন কোন কুমারী মৃত্তিকার ঘুম ভাঙাতে। 'কালিন্দী' উপন্যাসে এই সংবাদটি খুবই উচ্চস্তরের শিল্প সম্মত সত্য—স্বীকার করি। পাশাপাশি আমরা লক্ষ করি চরের জমি বন্দোবস্ত করার পর কমল মাঝি, চূড়া মাঝিরা যে গ্রামটি গড়ে তুললেন তার সম্বন্ধে তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতা—অহীন্দ্রের মতোই দূরবর্তী। এতটা যদিও বা স্বীকার্য, কিন্তু 'কালিন্দী' উপন্যাসে তারাশঙ্করের মৌল ত্রুটিটি হল সাঁওতাল বিদ্রোহের ঘটনার সঙ্গে এই চরিত্রগুলিকে মিলিয়ে ফেলায়। ত্রুটি অমার্জনীয এবং বিভ্রান্তি কর। আমরা একে একে এগুলি নির্দেশ করতে চাই ঃ

১. কমল মাঝি, একাধিকবার স্মরণ করেছেন সাঁওতাল বিদ্রোহের আগুন ঝরা ইতিহাস। তাঁর কাছে সে ইতিহাস প্রত্যক্ষ। স্মৃতি রোমন্থন। 'শাল জঙ্গলে মাদল বাজছিলো, হাঁড়িযা খাইছিলো সব বড় বড় মাঝিরা, আমরা তখন সব ছোট বেটে, দেখলাম সি, সেই আগুনের আলোতে রাঙা ঠাকুর এল।'　(৩ পরিচ্ছেদ)

'কৃষ্ণকায সচল প্রস্তর খণ্ডে'র মত যার চেহারা, তাকে, এইরকম বলতে শুরু করলে, অহীন্দ্র প্রশ্ন করেন তাহলে তাঁর বযস কত? সঙ্গত প্রশ্ন। ঐ উপন্যাসের কাহিনী যা, তাতে মনেই হয 'মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা'-র সঙ্গে অহীন্দ্র যুক্ত। উপন্যাসের শেষে তারাশঙ্কর লিখেছেন—'বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয দশকের মহাযুদ্ধের পর তখন ভারতবর্ষে গণ আন্দোলনের প্রথম অধ্যায শেষ হইযাছে। নূতন অধ্যাযের সূচনায রাশিযার আদর্শে অনুপ্রাণিত সমাজতন্ত্রবাদী যুব সম্প্রদাযের এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত হইযা পড়িল। অহীন্দ্র ছিল ইউ. পি.-র কোন একটা শহরে।' (৩৪ পরিচ্ছেদ)। বলা নিষ্প্রযোজন, এই শহরটি মীরাট—অন্তত তারাশঙ্করের রচনার নির্দেশ তাই। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার পটভূমি শুরু হয় ২০ মার্চ ১৯২৯ সাল থেকে। ঐদিন সারা ভারতের নানা প্রান্তে কমিউনিস্টদের ধরপাকড় শুরু করা হয। কমল মাঝির সঙ্গে অহীন্দ্রের সাক্ষাৎ হয ন্যূনাধিক ২।৩ বছর আগে। অর্থাৎ ১৯২৬ সালে। সাঁওতাল-বিদ্রোহের সমযও আমাদের জানা ১৮৫৫—৫৭। এ অবস্থায কমল মাঝির বয়স কত? ৮০ বছরের উপর না হলে সঙ্গতি রক্ষা হয কি? অহীন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে কমল বলেন—'দুকুড়ি'র মতো হবে; সঙ্গী রংলাল হা-হা করে হেসে বলেছিলেন, ওদের

হিসেব অমনই বটে। তা ওর বয়স প'চাত্তর-আশি হবে দাদাবাবু।'
'প'চাত্তর-আশি! অহীন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল, এখনও এই বজ্রের মত শক্তিশালী দেহ'। আমরাও কম আশ্চর্য হই না। কমল মাঝির নেতৃত্ব আর খাটবার ক্ষমতা আমাদের বিস্মিত করে। পরে যখন দেখি তারাশংকর 'সাঁওতাল বিদ্রোহে'র সঙ্গে 'মুণ্ডা বিদ্রোহ'কে গুলিয়ে ফেলছেন তখন আরও চমকাই। কমল মাঝি বলেনঃ 'রাঙা ঠাকুর ম'ল, সিধু সুভা ঠাকুর ম'ল, বাঁচিতে বিসরা মহারাজ ম'ল আর কে খেপাবে বল? আর কে হুকুম দিবে?'
(১০ পরিচ্ছেদ)।

২. সাঁওতাল বিদ্রোহ আর বিরসামুণ্ডার বিদ্রোহ—'উলগুলান' তারাশংকরের চোখে এক। 'কালিন্দী'র কমলমাঝি অহীন্দ্রকে বলেছেন, আবার তাদের খেপতে বললে তারা খেপবেন না। বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবার কেউ নেই। বিশেষত 'বিসরা মহারাজ' মারা যাবার পর। এই বিসরা মহারাজ নিশ্চয় বিরসামুণ্ডা। তারাশংকর এবিষয়ে লিখেছেনঃ 'বীরভূম ও সাঁওতাল পরগণায় যে সাঁওতাল বিদ্রোহ ঘটেছিল, সে বিদ্রোহ এবং ইংরেজদের কঠোর হস্তে নিষ্ঠুর বর্বর অত্যাচারে সে বিদ্রোহ দমন স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাঁর মাতামহী। আমার বাবা এবং পিসিমা সেই অত্যাচারের কাহিনী শৈশব থেকে শুনে এসেছিলেন। বাল্যকালে পিসিমার কাছে আমি এই সাঁওতাল বিদ্রোহের গল্প শুনতাম। বলতে বলতে তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকত। শঙ্কাতুর হয়ে উঠত। আমারও রোমাঞ্চ হত মুখে সিঁদুর মেখে, হাতে টাঙি আর তীর-ধনুক দিয়ে রক্তমুখ দানবের মতো সাঁওতালদের নাচের কথা শুনে। শাল জঙ্গলে মাদল বাজত, মশালের আলো জ্বলত চারিদিকে—তারই মধ্যে বিদ্রোহীরা নাচত।'[৮]

পিতা ও পিসিমার মাতামহীর কাছে শোনা বিদ্রোহের কাহিনী তারাশংকর 'কালিন্দী' উপন্যাসে প্রযোগ করেছেন। ফলে তাঁর লেখায় ঐতিহাসিক কালানুক্রম রক্ষিত হয়নি। ১৮৯৯-১৯০০ সালের বিদ্রোহ তথা 'উলগুলান', যা কোন মতেই সাঁওতাল বিদ্রোহ নয়—তাকে তিনি ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন। 'স্মৃতি কথা'য় এই বিভ্রান্তির আর একটু পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে:

'পিসিমা বলতেন, সাঁওতালেরা বিশুবাবুর জয় দিত। বলত বিশুবাবুই আমাদের রাজা। বিশুবাবু আমার মনের মধ্যে এমনই রেখাপাত করেছিল যে বিশুবাবুর সন্ধান আমি করেছি উত্তর জীবনে। কে ছিল বিশুবাবু? কেমন ছিল বিশুবাবু? কোন সন্ধান পাইনি। 'কালিন্দী' উপন্যাস

লেখাব সমযেও পাইনি। কিন্তু শৈশব মনোজগতে সযত্নে জল সিঞ্চন কবেছিল সেই বীজ থেকেই 'কালিন্দী'র সোমেশ্বর উদ্ভূত হযেছে হিংস্র কণ্টকাকীর্ণ বক্তপুষ্পময বৃক্ষেব মতো।'[৯]

বিশুবাজা সোমেশ্ববে পবিণত হওযাটাব পিছনে একটি ভুল কাজ কবেছে—পিসিমার কাছে প্রাপ্ত কযেকটি প্রজন্ম প্রবাহিত বিদ্রোহ সম্পর্কিত ভয মেশানো কাহিনী। এই ভুল আর একপ্রস্থ বৃদ্ধি পেযেছে তাবাশঙ্করেব অনুসন্ধানেব পব। একটি পাদটীকা লিখেছেন তিনি :

'পববর্তী কালে স্বগীয শবচ্চন্দ্র রায মহাশযেব ইতিহাস পডে সাঁওতাল বীব 'বিবসা মহারাজ'-এব নাম পেযেছি। বিদ্রোহী এই বীব সাঁওতাল যুবকই ছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহেব প্রেবণা। তাঁকে সাঁওতালবা বলত—'বিবসা ভগবান'। বিশুবাবু বোধহয বিবসা মহাবাজ। সাঁওতালেবা বিরসা মহাবাজেব জযধ্বনি দিত; এদেশের সাধাবণ মানুষ বিরসা মহাবাজকে জানত না বলেই বিশু বাজা বা বিশুবাবু বলে মনে কবত।'[১০]

১৮৯৯ সালেব ২৪ ডিসেম্বব যে 'উলগুলান' শুরু হয তা চলে বেশ কযেক মাস। এব সঙ্গে 'সাঁওতাল বিদ্রোহে'র কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু তাবাশঙ্কব কিভাবে এ দুটি ঘটনাকে মিশিযে ফেললেন? আমবা কিঞ্চিৎ বিস্ময বোধ না কবে পাবি না। 'কালিন্দী'ব এক জাযগায বিদ্রোহীদেব কথা লিখেছেন তাবাশঙ্কব, এইভাবে :

'সোমেশ্বব হাজাব সাঁওতাল লইয়া অগ্রসব হইলেন, একটা থানা লুট কবিযা, গ্রাম পোড়াইযা, মিশনাবিদেব একটা আশ্রম ধ্বংস কবিযা, কযেকজন ইংরেজ নবনাবীকে নির্মমভাবে হত্যা কবিয়া অগ্রসব হইলেন।' (২য পবিচ্ছেদ)।

এখানেও উলগুলান আব সাঁওতাল বিদ্রোহ একাকাব। মিশনাবী আশ্রম আক্রমণ, ইংবেজ নবনাবীব হত্যা—উলগুলানেব ঘটনা। ইতিহাসেব ঘটনা মিলিযে মিশিযে তাবাশঙ্কব বিষযটিব গুরুত্ব ও মর্যাদা বক্ষা কবতে পারেননি।

ইতিহাসকে ভুলভাবে প্রযোগ কবাব ফলে উপন্যাস ও তথ্য—উভযেবই ক্ষতি; ১৯৬৫ সালে 'মডার্ণ ফিলসফি' পত্রিকায় ব্রুস ডরু ওযার্ডোপাব

লিখেছেন : এরকম পরিস্থিতির কথা, যখন উপন্যাস মিথ্যা ইতিহাসের জন্ম দেয় :

'The novel, then, is a fake history in which the historian assumes even greater importance than the author in a romance.'[১০]

তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে ঘটেছে তাই। আভরম ফ্লিশমান দেখিয়েছেন ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ প্রয়োগের সময় ঔপন্যাসিক তাঁর স্বকালের সঙ্গে ভূতকালকে একাকার করে ফেলেন, সেসময় তাঁর আত্মসন্ধানের সংকট ইতিহাসের পৃষ্ঠায় প্রক্ষিপ্ত হতে থাকে। ব্যক্তিগত কিংবা সময়ের সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্য তখন ইতিহাস সন্ধানের সঙ্গে মিলে মিশে যায়। এ এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি। ফ্লিশমান লিখছেন :

'The historical novelist writes trans-temporally: he is rooted in the history of his own time and yet can conceive another. In ranging back into history he discovers not merely his own origin but his historicity, his existence as a historical beings.'[১১]

এইভাবে ঔপন্যাসিক যে যুগের কথা লিখছেন, তার চেয়েও যে যুগ-পটভূমিতে তাঁর ইতিহাসসন্ধান শুরু হচ্ছে—সেই পটভূমির ঐতিহাসিকতা হয়ে ওঠে অনেক গভীরভাবে বিবেচ্য। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রেও, আদিবাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ধারণা প্রকাশ করা সত্ত্বেও, তাঁর চেতনার স্তরে আদিবাসী সমাজ—সামগ্রিকভাবে বাংলার নিম্নবর্গ,—যে অভিঘাত এনেছে তার ফলাফলই অধিক বিবেচনার লক্ষ্য হতে পারে। বস্তুতপক্ষে তারাশঙ্করের সাহিত্যে বাংলা সাহিত্যে বহু যুগ ধরে বঞ্চিত অবহেলিত মানুষগুলি উত্তরোত্তর প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকাটিই ইতিহাসের এক বিশেষ কালপর্বের ঘটনা। তথ্যগত বিভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও তারাশঙ্কর এই কালচেতনায় ঋদ্ধ যে অবহেলিত-অবজ্ঞাত-দলিতদের জীবনরসধারা বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের আবেদন অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

এতদূর পর্যন্ত স্বীকার করে নিয়েও পরিকল্পনার স্তরে তারাশঙ্করকে বোঝার চেষ্টা করলে 'কালিন্দী'তে লক্ষ্য করি আর এক বিচিত্র বিভ্রান্তি, সেটি গুরুতর।

৩. 'কালিন্দী'ব চবে কুমাবী মৃত্তিকা পবিচ্ছন্ন কবে কমল মাঝির নেতৃত্বে সাঁওতালবা এসেছেন। আব তাদেব স্মৃতিতে জেগে আছে একটি সংবাদ—সোমেশ্বব চক্রবর্তী, অহীন্দ্রেব পিতামহ—তাদেব বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সাঁওতালদেব মধ্যে 'বাঙা ঠাকুব' বলে অভিহিত হতেন। জমিদাব পবিবাবেব সন্তান, জমিদাব সোমেশ্ববেব পক্ষে এই কাজ কতটা সম্ভব এ প্রশ্ন একটু দূবে বেখে দেখাই তাবাশঙ্কবেব বর্ণনায় কিভাবে বাঙাঠাকুর একটি বিচ্ছিন্ন মিথ (**Myth**) হয়ে আসছে। বাববাব রাঙাঠাকুব প্রসঙ্গে সাঁওতাল সমাজ কেমন আবেগাপ্লুত হচ্ছেন।

ক. 'কমল মাঝিব স্মৃতি বোমন্থন: জানিস বাবু, রাতেই লোক বড হয়, আবাব বাতেই লোক ছোট হয়। সুভা, সিধু, কানু হুকুম দিলে, আমবা খেপব। তুব দাদা—বাবাব বাবা—বাঙাঠাকুব বললে, খেপ তুবা, খেপ। এই টাঁলি লিযে বাঙা ঠাকুব খেপল, আমাদেব বাবাদেব সাথে।' (১০ পবিচ্ছেদ)

খ. অহীন্দ্রকে দেখে কমল তাকে সনাক্ত করলেন বাঙাঠাকুরেব সঙ্গে তাব সম্পর্ক আছে। 'হুঁ ঠিক সেই পাবা, তেমনি মুখ, তেমুনি আগুনেব পাবা বঙ, তেমুনি চোখ।' বংলাল বাঙাঠাকুরেব নাম কবাব সঙ্গে সঙ্গে 'বিশাল বিন্ধ্যপর্বত যেন অগস্ত্যেব চবণে সাষ্টাঙ্গে ভূমিতলে লুটাইযা পডিল।' (৩ পবিচ্ছেদ)। অচিবেই সিদ্ধান্ত হল তাদেব 'আমবা খাজনা দিব আমাদেব বাঙাঠাকুবেব লাতিকে—এই বাঙাবাবুকে।' শুধু কি তাই ? 'আমবা সোবাই বলব, আমাদের বাঙাবাবুব চব।' (৩ পবিচ্ছেদ)।

গ. বাঙাঠাকুব সম্পর্কিত **myth** নেমে এল বাস্তবেব পটভূমিতে। 'শুষ্ক বেনা ঘাসেব আঁটি' বেঁধে 'মহুযার তেল' দিযে মশাল জ্বালিযে অহীন্দ্রকে নিযে বাডি পৌঁছে দিলেন কমল মাঝিবা। 'বাঙাঠাকুবেব লাতি'কে 'বাঙা বাবুকে বাডিতে' দিতে গেলেন তাবা। (৩ পবিচ্ছেদ)।

ঘ. যোগেশ মজুমদাব-মহীন্দ্রেব সংলাপ। 'মজুমদাব হাসিযা বলিল, তবে তো ও আমাদেব হযেই গিয়েছে ; সাঁওতালবা যখন রাঙা-বাবুকে ছাডা দেবে না বলেছে, তখন তো দখল হয়েই গেল। চবটাব নাম দিতে হবে বাঙাবাবুব চব, সেবেস্তাতে আমবা ওই বলেই পত্তন করব।

মহীন্দ্র বলিল, না ঠাকুরদার নামেই হোক—'রাঙাঠাকুরের চব।' (৭ পরিচ্ছেদ)।

ঙ. অমল-অহীন্দ্রেব সংলাপ। 'আমাব পূজাবিণীব দল আসছে। আমি ওদেব বাঙাবাবু।

অমল মুগ্ধ হইযা গেল, বলিল, বিউটিফুল! চমৎকাব নাম দিয়েছে তো। কিন্তু এ যে একটা বোমান্স হে।

অহীন্দ্র হাসিযা বলিল, বোমান্সই বটে। আবাব চবটাব নাম দিযেছে বাঙাঠাকুবেব চব। আমাব ঠাকুবদাব সাঁওতাল-হাঙ্গামায যোগ দেওযাব কথা জান তো? তাঁব প্রতি ওদেব প্রগাঢ ভক্তি। তাঁকে বলত ওবা—বাঙাঠাকুর। আমি নাকি সেই বকম দেখতে। চোখগুলো খুব বড বড় কবে বলে, তেমনি আগুনেব পাবা বং।' (১৯ পবিচ্ছেদ)।

এমন উদাহবণ আবও অনেক দেওযা যায। 'কালিন্দী'ব মূল কাহিনীটিই যেন বাঙাঠাকুব সম্পর্কিত অতিকথা আব তার কার্যকাবণ সূত্রে 'বাঙাবাবু' অহীন্দ্রকে ঘিবে বিচিত্র জটিল জনমনস্তত্ত্বেব উপব গডে উঠেছে। বলতে চাই, এই অতিকথা নির্মাণও ইতিহাস বিরোধী। বীরভূমেব পটভূমিতে সাঁওতাল বিদ্রোহেব ইতিহাস কোথাও জমিদাব পক্ষেব কোন অনাদিবাসী নেতাব কথা জানায় নি।

আদিবাসী ছাড়া অন্য সমাজভুক্ত মানুষ অবশ্য সাঁওতাল বিদ্রোহে সাহায্য-কাবীব ভূমিকা নিযেছিলেন। কালীকিংকব দত্তেব বিববণে এর পবিচয পাচ্ছি:

'The Santals declared their determination to do away with the Bengalis and up-country mahajans, to "take possession of the country and set up a government of their own." Certain castes like kumars (Potters), telis (Oilman), blacksmiths, momins (Muhamadan weavers), chamars (Shocmakers), and domes, who were obedient to Santals and helped them in several ways, were exempted from their vengeance.'[১২]

১২৬২ বঙ্গাব্দেব ১৮ আষাঢ় 'হুল' তথা বিদ্রোহ শুরু হল ভাগনাডিহিতে। মারা গেলেন পাঁচ বর্ণহিন্দু বাঙালী মহাজন—মানিক চৌধুবী, গোবাচাঁদ সেন, সার্থক বক্ষিত, নিমাই দত্ত আব হীরু দত্ত। ভাগনাডিহিব দাবোগা মহেশলাল দত্ত কে বধ কবেন সিদু, সঙ্গে আবও কিছু মহাজন, ববকন্দাজ, চৌকিদাব (সর্বমোট ১৯ জন)। বাঙালীদের মাথা পিছু ৫টাকা করে মুক্তিপণও

আদায় করেন তারা। বীরভূমে প্রবেশ করেও বিদ্রোহীরা পাকুড়ের কাছে লিটিপাড়ায় ইশরী ভকত আর তিলক ভকত-কে হত্যা করেন, হত্যা করেন ঠুঠা ভকত কে। এরা বোধহয় বিহারের মহাজন ছিলেন। পাকুড়—হিরণপুর—সংগ্রামপুরে ব্যাপক লুঠতরাজ কায়েম করে, প্রচুর নরহত্যা করে বিদ্রোহীরা পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। এই পর্যায়ে সাঁওতালরা দেশী লোকজনের একাংশের সাহায্য পেয়েছেন ঠিকই (the Santals being informed of this through diku (non-santal spies) কিন্তু তাদের নেতৃত্বে অ-আদিবাসীদের আসা সম্ভব ছিল না। ১৮৫৫ সালের ১২ জুলাই সংগ্রামপুর থেকে পাকুড়ে সদলবলে আসেন সিধু-কানু-চাঁদ ও ভৈরব। জমিদার বাড়িতে হামলা হয়—রাধানাথ পাণ্ডে নামের শয্যাশায়ী পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্রাহ্মণ আর লক্ষ্মণ মণ্ডল নামক খোঁড়া মানুষটিও সাঁওতালদের রোষ থেকে রক্ষা পান নি। কেবলমাত্র রাণী ক্ষেমসুন্দরী-কে তারা ছেড়ে দেন। পাকুড়ের পর বল্লভপুরে ঘনশ্যাম মাঝিয়া নামক কামার আর কয়েকজন বৈরাগী ও ফকিরদেরও তারা হত্যা করেন। কালিকাপুর, বলিহারপুর, সাহাবাজপুর, নবীনগর ইত্যাদি গ্রামে বিদ্রোহীরা লুট-পাট হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যান। মোট কথা, বীরভূম জেলায় সাঁওতাল বিদ্রোহ কখনই কোন বর্ণহিন্দু জমিদারকে নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছে, এ-কথা ভিত্তিহীন—ইতিহাসের সংস্পর্শ বর্জিত, কিছুটা উদ্দেশ্যমূলকও। কি সেই উদ্দেশ্য? বলাবাহুল্য, আদিবাসী বিদ্রোহের স্বতোৎসারিত অগ্নিশিখাকে একটি বহিরাগত নেতৃত্বের সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারলে যে অতি-কথার জন্ম দেওয়া যায় তার ফলে বিদ্রোহীদের বশীভূত করার অবস্থা তৈরি হয়। কমল মাঝি-র নেতৃত্বে কালিন্দীর সদ্য জেগে ওঠা চরে রাঙাবাবুর উপস্থিতি আর রাঙাঠাকুর-সম্পর্কিত কাহিনীর সঙ্গে তাকে মিশিয়ে ফেলার ফলাফল অন্য কিছু হয় নি। সম্ভবত এরকম একটি ঘটনার ফলেই কমলরা চরে ভোগদখল করতে ব্যর্থ হলেন। যাদের তারা সহযোগী ভেবেছেন যাদের জমিদারিত্ব প্রশ্নহীন আনুগত্যের মারফৎ তারা মেনে নিয়েছেন—তারাই কালিন্দীর চরে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ দিয়েছেন বিমল মুখোপাধ্যায়ের মত অর্থনৈতিক জীবকে। অহীন্দ্র তাদের স্থায়ী প্রজা রংলাল, লাঠিয়াল ও প্রাক্তন নগদী নবীন বাগদীদের চাপে পড়ে পুরো চর সাঁওতালদের জন্য বন্দোবস্ত করেন নি। বড় একটি অংশ খাস রেখেছেন। আর সাঁওতালদের বন্দোবস্ত দেবার সময় অহীন্দ্র এটাও স্মরণে রেখেছেন যে—'সাঁওতালদের কথা স্বতন্ত্র।

আজ তাহারা বসিযাছে, দশবৎসব পনেবো বৎসব বা বিশ বৎসব পবে হযতো তাহাবা চলিযা যাইবে।' (১১ পবিচ্ছেদ)।

খুব সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে কমল মাঝি আব চূড়া মাঝিব মধ্যে পার্থক্য খুব কি আছে ? কমল বাঙাবাবুদেব বিশ্বাস কবেছেন, ঠকে চলে গেছেন দূবে দৃষ্টিসীমার বাইবে। চূড়া হযেছেন অর্থ সচেতন। তাব নেতৃত্ব দেবাব ক্ষমতা নিশ্চয কম, কিন্তু পবিবর্তিত পবিস্থিতিব সঙ্গে মানিযে থেকে গেলেন চূড়াই। চূড়াব নেতৃত্বেই অহীন্দ্রেব সঙ্গে উমাব বিবাহেব প্রাক-কালে সাঁওতালবা নেচেছেন। গান গেযেছেন 'বাজ্য যাবে সোরানে সোরানে' —এ গানও চূড়াব বচনা।

বিশাল বিন্ধ্যপর্বত আব অগস্ত্যের উপমা, তাবাশঙ্কব ভেবে চিন্তে দিযেছিলেন কিনা জানিনা—'কালিন্দী'ব সাঁওতাল সমাজ ব্রাহ্মণ জমিদাবেব নেতৃত্বে জাত কাঠামোব কাছাকাছি এসে নতমুখে প্রার্থনাব ভঙ্গিতে দাঁডিযেছেন, আব তাবা ভুলে গেছেন বিদ্রোহ, নেতৃত্বহীন পবাজযেব আশঙ্কাতুব, অত্যাচাবের কল্পনায় বিহ্বল তাবা—তাদেব আদিম সংহতিও লুপ্ত হযেছে। 'গণদেবতা'ব দুর্গাব কথা লিখেছি। আদিবাসীদেব 'সাবী'-ও তেমনি যৌন-শোষণেব প্রমাণ। সাবী অর্থ উত্তম। সাঁওতাল পল্লীব এই মেযেটিকে দেখে বিমল মুখোপাধ্যায বলেছিলেন ঃ 'মেযেটিব দেহখানি চমৎকাব, tall, graceful, —youth personified.' (২১ পবিচ্ছেদ)। অহীন্দ্রও তাকে দেখতেন অন্যদেব চেযে স্বতন্ত্রভাবে। অহীন্দ্রকে দেখে সাঁওতাল মেযেবা এনেছিলেন কুর্চি ফুল। অজস্র। সব মিলিযেই সাবীব ব্যক্তিগত আকর্ষণও কিছুটা ছিল বোধ হয। আব সেই আকর্ষণই তাকে সর্বনাশেব দিকে টেনে নিযে গেল। বিমল মুখার্জি শেষ কবে দিলেন তাকে—নিঃস্ব কবে বাংলোব বাইবেই বেব কবে দিলেন। কমল আব দুবন্ত শিকাবী যুবক, সাবীব স্বামী—চলে গেলেন তাবা। কোন প্রতিবাদ না কবে। বাঙাঠাকুবদেব অতিকথা বিশ্বাস কবে বাঙাবাবুদেব উপব নির্ভব কবে ফল যা হল তা কহতব্য নয়। চরেব চিনি কলে ঠিকাদাবেব মজুব হলেন তাবা—বাকিবা চলে গেলেন মযূবাক্ষীব চবে। এই ভাবেই এক চব থেকে অন্যচবে—এক কুমাবী ভূমি থেকে অন্য কুমাবী ভূমিব দিকে চলে যাবাব যে বাধ্যতা, তা তাবাশঙ্কবেব উপন্যাসটিতে ধবা পডেছে। ষেসব ত্রুটিব কথা লিখলাম, তা অতিক্রান্ত হযে যায—এক বিশিষ্ট জীবনবোধ সঞ্চারেব মারফৎ। সেকথা বলেই 'কালিন্দী' প্রসঙ্গ শেষ করব।

বামেশ্বব চক্রবর্তীব কাব্য-প্রাণতা নাকি তার হিংস্র ব্যবহাবেব সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয—শ্রীকুমাব বন্দ্যোপাধ্যায এবকম লিখেছেন। আসলে স্ত্রীব চবিত্রে অবিশ্বাসী, নিবঙ্কুশ আনুগত্য-আকাঙ্ক্ষী জমিদাব রামেশ্বরেব অপবাধ যেমন গুবুতব তাব প্রাযশ্চিত্তও তেমনি ব্যাপক। দুই যুগ ধরে অন্ধকাব কক্ষে মৃদু প্রদীপেব আলোয় বসবাস কবে রামেশ্বব অজ্ঞাতবাসের চেযে ভযঙ্কব কণ্ট সহ্য কবেছেন। তাব চেতনায ন্যায অন্যায, সু-কু' আলো-অন্ধকাব সমস্তই যেন সুদূব অতীতে স্থিব হযে আছে। অহীন্দ্র ভালভাবে পবীক্ষায উত্তীর্ণ হলে তাব মনে পড়ে বঘুবংশেব কথা—'বাজা দিলীপেব পুত্র বঘু—সমস্ত বংশেব মুখ উজ্জ্বল কবেছিলেন, তাঁবই নামে বংশেব নাম পর্যন্ত হযে গেল বঘুবংশ।' মুর্শিদাবাদেব কথায তাব মনে পড়ে সেখানকাব 'চাবিদিকে' 'অপবাধেব চিহ্ন'। অতীতেব অপবাধ তাব সম্ভবত ব্যক্তিগত নয —প্রতীকী। এই অপবাধ নাবীব প্রতি—সমগ্র নাবীজাতিব প্রতি। প্রজা, পবিবাবেব নাবী—সকলেব প্রতি অত্যাচাব যাদেব স্বভাব, সেই জমিদাবদেব প্রতিনিধি বামেশ্বব। দীর্ঘ দুই যুগ ধবে অন্ধকাব কক্ষে থেকে তাব একটাই ভয ছিল—হাতদুটিতে কুষ্ঠব্যাধিব লক্ষণ স্পষ্ট হযেছে। বাব বাব রক্ত পবীক্ষা কবা হযেছে—কোন জীবাণুব সন্ধান মেলে নি, তবু বামেশ্বব শিহবিত হযেছেন প্রাযই। এই অপবাধপ্রবণতাব দুটি দিক—প্রথম, পবিবাবেব নাবীদেব প্রতি অপমান অত্যাচাব আব দ্বিতীয, প্রজাদেব নির্লজ্জ শোষণ। মহীন্দ্র এই প্রথম অন্যাযের প্রাযশ্চিত্ত কবলেন—তাব সৎমা বাধাবানীব প্রতি কটাক্ষ সহ্য কবেন নি—ননীপালকে সজ্ঞানে হত্যা কবেছেন। দ্বিতীয অন্যাযেব প্রায়শ্চিত্ত কবলেন অহীন্দ্র। তাব মার্কসবাদ পাঠ, কার্লমার্কসকে মহামনীষী হিসাবে স্বীকাব কবাব চেয়ে বড় উপলব্ধি ঘটেছে অভিজ্ঞতা থেকেই। তা-ই তাকে Historical Materialism-এব শিক্ষা দান করেছে। অমলকে তাই তিনি বলতে পেবেছেন: 'চবটা আব তোমাব মধ্যেকাব টাইম অ্যান্ড স্পেসেব ডাইমেন্‌শন বাডিযে নাও না, দেখবে চবটা বেমালুম পৃথিবীব সঙ্গে মিশে গেছে, পার্থক্য নেই।' (৩১ পবিচ্ছেদ)। অহীন্দ্রেব এই উপলব্ধি তাকে কমিউনিস্ট বাজনীতিব দিকে ঠেলে দিযেছে।

তাবাশঙ্কব তাঁব স্মৃতিকথাব একত্র লিখেছেন মার্কসবাদেব প্রতি তাঁব আকর্ষণেব কথা। 'মার্কসেব ক্যাপিট্যাল বা তাঁব লেখা কোনো বই' তিনি পড়েন নি, 'বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মার্কসবাদেব উপব লেখা প্রবন্ধ কিছু

কিছু' পড়েছেন। কিন্তু তিনি স্পষ্টই লিখছেন 'আমাব সম্বল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা।' আব তা থেকেই সিদ্ধান্ত তাঁবঃ 'হাজার হাজাব বৎসব ধবে মানুষেব প্রতি মানুষেব অন্যাযেব প্রাযশ্চিত্তেব কাল একদিন আসবেই। এই আমি বুঝে ছিলাম। উনিশশো ষোলো-সতেরো সাল থেকে উনিশশো ত্রিশ-একত্রিশ সাল পর্যন্ত গ্রামে গ্রামে মানুষদেব মধ্যে ঘুরে এইটুকুই বুঝেছিলাম যে, সেদিন আসতে আব দেবি হবে না। রুশবিপ্লব সেই দিনেব উষাকাল তাতে সন্দেহ নাই। বাতাসটা উঠেছিল সেইখানেই প্রথম; সেখান থেকেই বাতাস উঠে এখানকাব গুমোটেব মধ্যে চাঞ্চল্য তুলেছে। এব জন্য মার্কসবাদ পড়তে হযনি আমাকে।'[১৩] অহীন্দ্র আব তাবাশঙ্কব এইভাবে যেন একাকাব হযে পড়েন।

বস্তুত 'কালিন্দী' উপনাসে তাবাশঙ্করেব আত্মপ্রক্ষেপেব প্রচুব উপকবণ ছড়ানো। তাঁব ছোটবেলাব পিসিমা শুধু ধাত্রীদেবতা'ব জননী চবিত্রেব নয—'কালিন্দী'ব সুনীতি চবিত্রেবও বীজ। সুনীতিবই মতোই সেই পিসিমাব সন্তান ছিল দুটি—দুজনই অকাল প্রযাত। আব জমিদাবি ব্যবস্থাব ক্ষযিষ্ণু পটভূমি তাবাশঙ্কবেব জীবন অভিজ্ঞতা। যাইহোক, অহীন্দ্রের বন্দী হবাব দৃশ্যে অনেকেই কেঁদেছেন। প্রতাবক কর্মচাবী যোগেশ মজুমদাব, বাচাল কল্পনাবিলাসী অচিন্ত্য থেকে আবম্ভ কবে গ্রামবাসী প্রায সকলেই। ব্যতিক্রম দুজন—প্রথম, শূলপাণি চক্রবর্তী, গঞ্জিকাসেবী জ্ঞাতি—ক্ষযপ্রাপ্ত জমিদাবিব প্রতিহিংসা পবায়ণতার শেষ চিহ্ন। আব দ্বিতীয, বামেশ্বব। তখন ভোব হযেছিল; 'বাত্রিশেষেব তবল অন্ধকারে অহীন্দ্র চলে গিযেছিলেন—ফিবে এসেছিলেন বেলস্টেশনে বন্দী হযে। কিন্তব খানাতল্লাশীর পব চলে গিযে-ছিলেন তিনি—'একালেব মেযে' উমাব চোখেব জলেব অধিকাংশই শোষণ কবে। পবদিনেব ভোব যখন পূর্ব দিগন্তে আলো ছড়িযেছে বামেশ্বব সুনীতিকে দেখিযে বলেন—'আঃ, কোন দাগ নেই, একেবাবে সাদা হযে গেছে।' জমিদাবিতন্ত্রেব বিভীষিকাব দুটি চিহ্ন—অন্যায অপরাধেব প্রাযশ্চিত্ত কবাব জন্য যে জমিদাবেব দুই পুত্র কাবাববণ কবেন—তাদেব পাপ আব থাকে না। রামেশ্ববেব তাই অন্ধগৃহবাসেব দিন শেষ হল।

'কালিন্দী'ব তুলনায 'তামস তপস্যা' যথেষ্ট অপবিচিত ও অপঠিত উপন্যাস। এব মধ্যে কাহিনীব বহুমুখ গতি নেই। তাবাশঙ্কবেব পবীক্ষা-মূলক উপন্যাসেব মধ্যে 'তামস তপস্যা' অন্যতম। 'কালিন্দী'র আদিবাসীরা

সভ্যতাব চব জাগলে যে আদিম কর্ষণেব উপকবণ ও সংস্কৃতি নিযে আসেন 'তামস তপস্যা' তাদেব নিযে লেখা উপন্যাস নয়—এ উপন্যাসে তাদেব কথা বিশেষ ভাবে ধবা পডেছে, যাদেব বলা যায যাযাবব—Nomadic, হাঘবে।

মহাবাষ্ট্রে কযেকটি বিশ্ববিদ্যালযে উপাচার্য হিসাবে কাজ কবেছেন লক্ষ্মণ মানি। তিনি লিখেছেন তাব শৈশবকাল নিযে আত্মজীবনীমূলক বচনা 'উপবা'। কেকযী নামক যাযাবব জনগোষ্ঠীব মানুষ লক্ষ্মণ মানি। তাবাশঙ্কব অবশ্য লক্ষ্মণ মানিব মতো বচনা লিখতে চাননি। 'তামস তপস্যা' পডলে বোঝা যায এই উপন্যাস তাবাশঙ্কবেব সমাজজিজ্ঞাসাব একটি তাৎপর্য-পূর্ণ সমাধান যোজনা কবতে চেযেছে। ছোট্ট এক দোকানী শ্যামাদাসেব পুত্র পানু। পাশেব দোকানী নাকু দত্তকে নৃশংসভাবে হত্যা কবে রেখে গেছে কেউ। সুতবাং জমাদার এসে সামনেব থানায নিযে যায শ্যামাদাসকে। নিছক সন্দেহেব বশে প্রবল অত্যাচাব হয় গোটা পবিবাবেব উপব। বিশেষ কবে শ্যামাদাসের সুন্দবী কন্যা চাবুর ওপব অত্যাচাব হয ভযঙ্কব। গন্ধবণিক পরিবাবেব মানুষ শ্যামাদাস। বাঢ় বাংলায তাদেব সামাজিক অবস্থান কখনই লক্ষ্মণ মানির মতো নয। কিন্তু উক্ত ঘটনাব আকস্মিকতায কিশোব পানু ছিটকে পড়ে সমাজেব বাইবে। স্কুলে সহপাঠীবা তাকে খুনীব পুত্র বলে সনাক্ত কবে। কোন সহাধ্যাযীকে প্রহাব কবে বিদ্যালয় শিক্ষকেব কাছে ততোধিক অত্যাচাব সহ্য কবে বাড়ি ফিবে সে দেখে গোটা পবিবাব থানায। পিতাকে অমানুষিক অত্যাচাব কবছেন জমাদাব। সংক্ষুব্ধ পানু প্রবল শক্তিতে জমাদারেব ঘাডে কামড় বসিযে পালায়। তারপব পালাতে পালাতে এক শহবেব আইন ব্যবসাযীব গৃহিনী ও আনুষঙ্গিক পবিস্থিতি পাব কবতে কবতে—অজ্ঞান অবস্থার পানু গিযে পডে 'হাঘবে' যাযাববদেব তাঁবুতে। জীবনেব সভ্য নাগবিক পাঠ নেবাব আগেই বুধন-সর্দাবের দলে ঢুকে পডল একটি কিশোব। তাদেব সংস্কাবে, আহাবে, জীবন নীতিতে ধীবে ধীবে মানিয়ে নিতে থাকল। সেখানে যে উদ্দাম অবণ্য-আদিম উতরোল জীবন, তাব সঙ্গে পবিচয় ঘটল তাব রুকনির মাধ্যমে। রুকনিকে বিযে কবে যুবক পানু ধীবে ধীবে যাযাবব জীবনটায নিজেকে মানিযেও নিচ্ছিলেন। তবে তাব প্রথম প্রণয়িনী আত্মহত্যা করেছেন। রুকনির আত্মহননেব পব উদাসীন পানু হঠাৎ ঘি বিক্রি করাব ফাঁকে আবিষ্কাব কবলেন চাবুকে—তার হাবিযে যাওয়া দিদিটিকে। এব পরই পানুর জীবনস্রোত অন্যপথে গেল বেঁকে।

বস্তুত পক্ষে যাযাবর জীবনের যেটুকু অনুপুঙ্খ তারাশঙ্কর উপস্থিত করেছেন, তা অসম্পূর্ণ। কখনোই সাহিত্য একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত লক্ষ্মণ মানির মতো অভিজ্ঞতার রূপায়ণ তা নয়। ঘটা সম্ভবও নয়। আর সেজন্যই তারাশঙ্কর পানুর মধ্যে যোজনা করেছেন এক অসম্ভব জীবনযন্ত্রণা। সমাজ-বিচ্যুত একটি মানুষের একক সংগ্রাম ও বহু স্তর পার করতে করতে সমাজে প্রবেশের কাহিনী 'তামস তপস্যা'। এজন্যই লিখেছিলাম ঐ উপন্যাস পরীক্ষামূলক, আর তারাশঙ্করের জীবনজিজ্ঞাসা সমাজ আদর্শ প্রতিষ্ঠার একটি দৃষ্টান্ত ধরা পড়েছে এখানে। আকস্মিক অত্যাচারে বিহ্বল একটি পরিবার ভেঙে গেল—চারুর স্মৃতিচারণের মারফৎ সেই কাহিনী এ উপন্যাসের অন্য আর এক দিক। লাঞ্ছিতা চারু ধীরে ধীরে যৌবনকেই টিঁকে থাকার উপায় করে নিলেন। খুঁজে পেলেন জীবনপথের সহযোগী দীনুকে। তাদের জীবন-কথা আর পরিক্রমণের চিত্রও কম বেদনাদীর্ণ নয়। কিন্তু পানুর জীবন-সংকট অসাধারণ—অভাবিতপূর্ব। একদিকে হারানো জীবনের সংস্কার, সারল্য, বলদর্পিত আচরণ—অন্যদিকে ভদ্রসমাজের সংসারের লোভ, জৈবিকতা এই দুইয়ের টানাপোড়েনে পানুর অকথ্য বেদনা এই উপন্যাসের মর্মবস্তু।

পানু তার দিদিকে চিনলেও দিদি তাকে চেনেন নি। এত বৎসরের দূরত্ব, সংস্কারগত পার্থক্য, ভাষার ভেদ তো ছিলই, ছিল চেহারারও পার্থক্য। পানু কিন্তু দেশত্যাগী। সুতরাং দিদির কাছে আসার উপায় হিসাবে এক ক্ষৌরকারের কাছে যাওয়াই বিবেচনা সম্মত বোধ হল। নাপিতের কাছে চুল দাঁড়ি ছেঁটে নিজেই আয়নায় দেখতে পেলেন পানু—'হা করে হারাইয়া গিয়াছে।' (আট-অধ্যায়)। দিদিও সনাক্ত করলেন। কিন্তু এক কঠিন আঘাত তার জন্য অপেক্ষা করছিল। সাবান দিয়ে 'মুক্তিস্নান' সেরে আহারে বসার সময় বুঝলেন পানু—দিদি তার বদলে গেছেন। দিদির উক্তিঃ 'আমার বাসনে ওকে খেতে দোব নাকি? ওর কি জাত আছে?' (এগার—অধ্যায়)। জাত নেই তার, একথা তীরের মত বেঁধে। কিন্তু জাত ফিরে পাওয়ার উপায় তো পানু জানেন না। এই সংগ্রামকে তারাশঙ্কর নিশ্চয় ব্যক্তিগতভাবে দেখতে চান না। আলোচনার এক স্তরে আমরা ভবদেব ভট্টের কথা লিখেছি। 'তামসতপস্যা' প্রসঙ্গে মিলিয়ে দেখলে আমাদের প্রতিপাদ্য স্পষ্ট হবে। ভদেব ভট্ট সমাজ সংগঠন করেছিলেন—তারাশঙ্কর সমাজব্যবস্থার নিপুণ পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করলেন। সুতরাং

লক্ষ্মণ মাণিব বচনাব তুলনায় তাবাশঙ্কবেব বচনা ভিন্নধর্মী। আমাদের মনে পড়ে ঐ প্রসঙ্গে 'দলিত' নামক সংকলনেব সম্পাদক দেবেশ বাযেব বিশ্লেষণ। লিখেছেন দেবেশ বায, মাবাঠী দলিত সাহিত্য ভাবতীয় সাহিত্যেব ক্ষেত্রে অভিনব একটি সংবূপ বা genre-এর পবিচয ঘটালো। —আত্মজীবনী। আব তিনি লক্ষ কবেছেন, উপন্যাস সাহিত্যেব খর্বুটে হযে আসাব প্রক্রিযা—Bonsization। উপন্যাস সেখানে স্থান নিচ্ছে ছোট হযে—আত্মজীবনীব ঘেবাটোপে।—' আত্মজীবনীর এই অদ্বিতীয প্রকবণ দলিত সাহিত্যে উপন্যাসেব সম্ভাবনা নষ্ট কবছে। হযত উপন্যাসেব প্রকবণ তেমন প্রাধান্য পেলে, আত্মকথা এত প্রধান হযে উঠত না। কিন্তু এই আনুমানিক আলোচনায কি নিশ্চিতভাবে বলা যায, দলিত-উপন্যাস তাঁদের আত্মকথাব বিকল্প হয়ে উঠতে পাবত?…অস্পৃশ্যতা ও আত্মনির্বাসনেব নন্দনতত্ত্ব আত্মপ্রতিনিধিত্বেব বাজনীতি তৈবি কবেছে। অ-দলিত সাহিত্যে সমাজের সংহত জীবনেব মধ্যে অনায়াসে লেখক নিজের কথা বলাব জায়গাটুকু বেছে নিতে পাবেন কিন্তু দলিত সমাজেব অসংহত বিচ্ছিন্নতা লেখকের আত্মতাব ওপব ভব কবে তাকে ছোট কবে আনে, খাটো করে আনে।'[১৪]

বস্তুত তাবাশঙ্কব দেখেন 'সংহত জীবনেব' দৃষ্টিতে আব লক্ষ্মণ মাণি, দযা পাওযার, অববিন্দ মালাগাট্টিবা দেখেন 'দলিত সমাজেব অসংহত বিচ্ছিন্নতা'ব দিক থেকে। ব্যক্তি, অভিজ্ঞতা ভিন্ন হওযায় বিষযবস্তু, উপাদান, প্রযোগ ও দৃষ্টিকোণও যায বদলে।

আমবা আবাব নিজেদেব কথায় ফিবে আসি। বাজাবে এক বৃদ্ধ দোকানী 'বামায়ণ' পড়ছিলেন। পানু শুনলেন কৃত্তিবাসেব ভাষা, বামনামেব অপাব মহিমাব সন্ধান পেলেন তিনি।

মহাপাপী হইয়া যদি বামনাম কয!
সংসাব সমুদ্র তার বৎস-পদ হয॥

ভগ্নীপতি দীবুব কাছে এসে পানু বললেন—বহুৎ বললাম 'বাম রাম বাম'। আব তাব অকপট উপলব্ধি 'হামাব জাত তো আমি পেলম। হামাব পাপ তো গেল' (বাবো—অধ্যায)। কিন্তু জাত পাওযা এত সহজ নয়। পানুব ক্ষেত্রে তা হলও না। দীনু ডাকলেন তাব গুরুদেব কে; পানুকে দীক্ষা দিলেন গুবু। বন্য স্বভাবেব উত্তবাধিকারী পানু একটি সজারু হত্যা

করে গুরুকে উপহার দিতে গেলেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর ভর্ৎসনায় তার দ্বিতীয় পর্বের ছেদ ঘটল।

ময়ূরাক্ষীর তীরে একটি মোষ কিনে জীবনের আর এক ছকে ঢুকলেন পানু। লছমী আর তার বাচ্ছা মংলী—তাদের নিয়ে গড়ে উঠল পানুর একক সংগ্রাম। কিছুদূর হাঁটতেই এল বিপত্তি। জমিদার, নায়েব, জমাদারের সমবেত বিশ্লেষণে ময়ূরাক্ষীর তীরের আবাস তুলতে হল। সংস্কারহীন মানুষ পানু, তার দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করলেন: 'হে দেওতা, দেখাইয়া দাও সেই দেশ। যেখানে এসব করিয়া দারোগা জমাদারে মারিয়া পিঠেয় চামড়ায় দাগ কাটিয়া দেয় না, যেখানে নায়েবের পেযাদা আসিয়া কাছারিতে ধরিয়া লইয়া নায়েবের হুকুমে সর্বস্ব কাড়িয়া লইতে চায় না, সেই দেশ দেখাইয়া দাও।' (তেরো—অধ্যায)।

লছমী আর মংলীকে নিয়ে আবার দূরযাত্রা। ময়ূরাক্ষীর চরে এবার দেখা বোবা-কালা যশোদার সঙ্গে। যশোদা আসলে ময়ূরাক্ষীর চরে গো-মহিষ চরানো এক ঘোষ-এর অবৈধ সন্তান। অচিরেই পানুর সঙ্গে যশোদার বিবাহ দিলেন ঘোষ বাবা। আর দিনের পর দিন ঘোষের গোহালে মূক-বধির যশোদা ও পানু খেটে চললেন। এসব সময় ওপারের সদ্‌গোপ কর্তার সঙ্গে দেখা হয। বললেন তিনি, কিভাবে ঘোষ-চাচা তাদের ঠকাচ্ছেন। ষাট তোলার কাঁচি মাপ আর আশি তোলার পাকি মাপ-এর সংবাদ পাওয়া গেল সদ্‌গোপ-কর্তার কাছেই। বস্তুত সমাজ সংসারের এরকম সংবাদ তার জানা ছিল না। পুরাণ-গ্রন্থ পড়ার আগ্রহে পুরোন অক্ষর পরিচয়ে ফিরে পাওয়া কিংবা দীনুর কাছে শেখা গণনা পদ্ধতি—সবই তার সমাজ-ব্যবস্থায় প্রবেশ করার এক একটি স্তর অতিক্রমণ।

প্রতিবাদ করার ফল পানু পেলেন। ঘোষ বাবা 'স্মরণাতীত কাল' ধরে বংশানুক্রমিক শক্তিচর্চার সবটুকু অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে পানুকে ফেলে এলেন ময়ূরাক্ষীর চরে'—অর্ধমৃত অবস্থায়। যশোদাও মংলি-লছমীদের নিয়ে সেই রাত্রেই এসে ছুটেছিলেন পানুর সঙ্গে। এক রাত্রে যতদূর যাওয়া যায়—ততদূর পার হয়ে আবার নতুন ছক, কোপাই নদীর তীরে।

কোপাই তীরে পানু—যশোদা গড়লেন একটি বাতাসা ইত্যাদির দোকান। আর একদিন, লছমীর প্রসব হচ্ছে—কোন একটা কাজে পানু গেছেন ভেতরে —পা পড়েছে এক কাল সাপের মাথায়। যাযাবর জীবনে অনেক সাপের সঙ্গে

লড়েছেন পানু, তবু—আজ তার কেমন ভয় হতে থাকল। বোবা কালা যশোদা তার জীবনের সব চাহিদা পূরণ করতে পারছেন না। সুতরাং রাজবালা নামের ভিক্ষুকের সঙ্গে মালা বদল করে আকস্মিকভাবেই তাকে নিয়ে এলেন ঘরে !

নারীরা এই উপন্যাসে আদিম—সক্রিয়। তারা প্রায়ই যাকে বলে দলিতেরও দলিত। অসংস্কৃত প্রতিহিংসাপরায়ণ তারা। অন্তত বুকনী আর যশোদা তাই। ঘোষ বাবার প্রাণঘাতী মারের জবাব দিয়েছিলেন পানু আর যশোদা—তার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে। রাজবালাকে বিয়ে করার রাত্রে যশোদা পানুর ঘরে আগুন দিয়ে পালান। বেশি দূরে যেতে পারেন না—'মানুষেরা দয়া করিল না, লালসার অত্যাচারে তাহাকে মারিয়া ফেলিল।' মৃত এক ভ্রূণ প্রসব করে অসহায় যশোদার মৃত্যু হল !

রাজবালা তথা রাজির ছিল সমাজ-ধর্ম-সংস্কার—জাতিগত কোঠা থেকে কোন কারণে অধঃপতন ঘটেছিল তার। তবু এই নারী ছিলেন স্বৈরিণী। একজন নাগর জুটল তার। যাত্রা দলের এক ড্যান্সিং মাস্টার। কিন্তু পানুকে ভালবেসেছিলেন রাজি। তাই ঐ রাজু-র এক বোনকে বিয়ে দিয়ে পানুর সংসারের ব্যবস্থা করে পালালেন তারা। ছুটকিকে নিয়ে সংসার চলল আরও কিছুদিন। ডাকাতির মামলায় শহরে সাক্ষ্য দেবার জন্য গিয়ে বিধবার বেশে আবিষ্কৃত রাজিকে নিয়ে ফিরে এলেন পানু। চলতে থাকল তার বীবত্ব ব্যঞ্জক জীবন পরিক্রমা।

অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে জাত কাঠামোতে ঢোকার এক একটি বূ্যহ পার করতে করতে পানুর ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষময় দ্রৌপদীর শাড়ীর মতো অনিঃশেষ হিন্দুত্বের প্রতি অভিযাত্রাটি তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন। বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ মেলাবার মতো পানু নামক একটি বিচ্ছিন্ন অনালিঙ্গিত চরিত্রের গতি দেখাবার সঙ্গে সঙ্গে রাঢ় বাংলার অন্ত্যজ জাতিগুলির পরিক্রমার পথরেখাটি সনাক্ত করলেন তিনি। এখানে বাস্তব ও কল্পনা—ব্যবস্থা ও ব্যবস্থাপত্রের বিচিত্র সমাহার।

রাজি দ্বিতীয়বার স্ত্রীর সম্মান পাবার পর পানুর পরিবারকে যথাসম্ভব উন্নতির দিকে নিয়ে গেছেন। আধ্যাত্মিকতার কিছু মাত্রাও যোজিত হয়েছে তারই মারফৎ। উপলক্ষ গ্রামীণ জমিদারের একটি বাছুর। পানুর যত্ন লালিত হাস্নুহানার গাছটি সে মুড়িয়ে খেয়েছিল। স্বভাবত নিষ্ঠুর-বন্য-

প্রকৃতিব পানু তাব পা খোঁড়া করে ফেলেন। তাবপবই আশ্চর্য পরিবর্তন হতে থাকে তাব। বাছুবটিব প্রতি—জীবনে এই প্রথম কোন প্রাণীব প্রতি দবদ ঘনিযে এলো। বাঁচাবাব চেষ্টাও চলল। পানু দুধ খাওয়া ছেড়ে দিতে চাইলেন—সমস্ত প্রাণীব জন্যই যেন জেগে উঠল ক্ষীণ সমবেদনাব ভাব। তবু জমিদাব বাবুব গোবৎসকে এভাবে প্রহাবেব ফল তাকে পেতে হল। মাবাই গেছে বাছুবটি ধবে নিযে জমিদাবের বযস্য বামুনটিকে শ্রাদ্ধ করতে হল, তারপব জানা গেল সেটি আছে পানুর এক্তিযাবে। যথারীতি পঞ্চাশটাকা জরিমানা। জবিমানা দিযে পানু ফিবে এলেন। আব তাবুও বৃহত্তব অত্যাচার এসে পড়ল। এব আগে বহুবার পানু জমিদাবেব অত্যাচাব সহ্য কবেছেন। এই প্রথম তাব ওপবে পড়া মারে ভাগ বসালেন বাজি।

উপন্যাস অবশ্য এখানে শেষ হতে পাবে না, হযও নি। নিকটবর্তী এক আখড়াব সন্ন্যাসী চবিত্রেব আগমন ঘটেছে। তাবাশঙ্কবেব বহু উপন্যাসেব মতোই, এই সন্ন্যাসীর নাম নমোনারাযণ ঠাকুব। বন্যা ঠেকাবাব জন্য স্থানীয মানুষদেব সংগঠিত কবছেন তিনি। সমবাযিক সেই উদ্যোগ ধর্ম সম্মত করসেবা। তারাশঙ্কব লিখছেন সে উদ্যোগ সার্বিক—সার্বজনীন, রাঢ়বাংলাব ভাষায 'ষোলআনা'—উদ্যোগ ঃ

> 'সক্ষম চাষী হইতে হাড়ী, বাউড়ী, ডোম সকলেই কোদাল ধবিবে, যেসব জাতিব মেযেবা মজুব খাটে তাহাবা ঝুড়ি বহিবে, এবং সৎ জাতিবা—ব্রাহ্মণ কাযস্থ প্রভৃতিবা চাল দিবেন, ক্ষেতেব তরকাবি দিবেন, সামর্থ্য যাঁহাদেব আছে তাঁহাবা নগদ টাকাও কিছু দিবেন—এই ব্যবস্থা হইযাছে।' (তেইশ অধ্যায)।

ডাক পেযেও এই কাজে পানু যোগ দেন নি। জমিদাব-উঁচুজাত-সমাজ সমস্তই তাব দেখা হযে গেছে। কাবুব প্রতিই বিশ্বাস আর অবশিষ্ট নেই। সুতবাং একাকী বিচ্ছিন্ন পানু যেদিন অত্যাচারিত হচ্ছেন—তাব স্ত্রী বাজবালা উপাযান্তব না দেখে সন্ন্যাসীকেই দিলেন ডাক। সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন মাঝখানে। সেদিনেব মতো অত্যাচারেব হাত থেকে মুক্ত হলেন পানু। সঙ্গীহীন—হাঘরেদেব কাছে মানুষ—সমাজ থেকে ফেরারি—একজন সহাযতা পেলেন। কিন্তু ক্ষোভ তাব সকলের উপর। গোবৎসটি বিক্রি কববেন কসাইকে, মাববেন জমিদার, সন্ন্যাসী আর বাধা দিলে বাজিকেও। কাবণ পানুব ভিতবকাব যাযাবব সত্তাকে বেঁধে রাখছে এরা—মাযা জাগছে—প্রতিহিংসাও জাগছে।

কাহিনীর উপান্তে দেখা গেল বহ্নিমান পানুর গৃহকোণ। যশোদা আগুন দিয়েছিলেন অভিমানে—রাজি দিলেন চরম ক্ষোভ, অভিমান আর ভালো বাসায়। নিজের গায়ে আগুন দিলেন তিনি। 'ঘরে আগুন লাগে নাই, শরের আঁটিতেও নয়! রাজু আগুন লাগাইয়াছে নিজের গায়ের কাপড়ে। কেরাসিন ঢালিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া পুড়িতেছে। চীৎকার করে নাই। নিঃশব্দে পুড়িতেছে।' (পঁচিশ অধ্যায়)।

আত্মহনন। রাজির ভালোবাসা পানুকে পুড়িয়ে নতুন মানুষের জন্ম দিল। দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল তার—'বোধহয় এই প্রথম দীর্ঘ নিশ্বাস'। তারাশঙ্কর পানুর 'তামস তপস্যা' এখানেই শেষ করলেন। 'পানুর কাছে রাত্রিটা সত্য সত্যই দীর্ঘ, সুদীর্ঘ রাত্রি। শুধুই কি তাই? সে কী রাত্রি—সে শুধু পানুই জানে। জন্ম জন্মান্তরের অন্তর্বর্তী কালের কত দীর্ঘ উদ্বেগময়; অমোঘ দণ্ডপাতের যাতনায় দুঃখে জর্জর, বিমূঢ়; কালান্তরের বিপ্লব রাত্রির মত জটিল, বিশৃঙ্খল।' (ছাব্বিশ অধ্যায়)।

আত্মঘাতিনী রুকনি, অসহায় যশোদা আর আত্মত্যাগী রাজবালার সান্নিধ্য না পেলে অবশ্য পানুর তামসতপস্যা শেষহত কিনা জানি না। ব্যথিত, অনুশোচনশীল পানু গিয়ে দাঁড়ালেন মনোনারায়ণ-এর আখড়ায়—'তাহার একান্ত সাধ,' 'রাজুর সমাধির উপর একটি ছোট মন্দির রচনা করিবে' —অনুমতি প্রার্থনা করতে তার আসা।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এইভাবেই এসেছেন দলিত বর্গের মানুষ। তারা কুমারী মৃত্তিকায় চাষ সেরে—তৈরি করেন জমি, মানুষ তার উপর টেনে নিয়ে যান চেন—মাপা হয়, বন্দোবস্ত হয়। তারা এক ক্ষেত্র থেকে ভেসে যান অন্য ক্ষেত্রে—কালিন্দীর চর থেকে ময়ুরাক্ষীর চরে। ভ্রাম্যমান এই শ্রমজীবীদের বাইরেও ঘোরেন মানুষ—মানুষই, তবে তারা অন্ধকারের মানুষ। কিভাবে তারা ঢুকবেন সমাজে—কোন সেই দিব্য জ্যোতির্ময় সবিতৃবর্ণের পথ? লিখেছেন তারাশঙ্কর—'তামস তপস্যা'র মারফৎ। কাল্পনিক এই পথরেখা—নিতান্তই সাহিত্যিক। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রকারেরও কি নয়? একটু শোনাই ঃ

> 'সংসার ঘটনার কঠিন আঘাত অতি সাধারণ একটি ময়রার ছেলেকে একটা অরণ্যবাসে পাঠাইয়াছিল। সহস্র বৎসরের অতীত সেখানকার অন্ধকারে মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া লুকাইয়াছিল।' পানু সেই অন্ধকারে অবলুপ্ত

হয়েছিলেন। 'আবার সংসার বিচিত্র আঘাতে তাহার বুকের অন্ধকার মোচন করিয়া আলোকের দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। আজ সে বর্তমানের মানুষ হইয়া বহু সহস্র বৎসরের আলোকপ্রাপ্ত মানুষের সমাজে বহুর মধ্যে অতি সাধারণ নগণ্য একজন হইয়া মিশাইয়া হারাইয়া গেল—রঙের বাটিতে একফোঁটা রঙের মত।' (ছাব্বিশ—অধ্যায়)।

কে বলবে, তামসতপস্যা যাদের আজও শেষ হয়নি তাদের কথা? কে শোনাবে, তাদের কথা যারা অন্ধকারের অন্তরে আজও মরণাতীত জীবন যন্ত্রণায় নিত্য বিদ্ধ হচ্ছেন? আর এই আলো অন্ধকার তাও তো মানুষের বানানো সমাজ আদর্শেরই কল্পনা-পরিকল্পনার অঙ্গ—মনু-যাজ্ঞবল্ক্য-ভট্টভবদেব বা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো ধীমানরা যা প্রয়োগ করেন। আলো আসুক—অন্ধকারের অন্তরে জ্বলে উঠুক পবিত্র আগুন॥

অনুষঙ্গ ঃ

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ **"আমার সাহিত্য জীবন"**; 'তারাশঙ্কর স্মৃতি কথা'-গ্রন্থভুক্ত, নিউ বেঙ্গল প্রেস, প্রাঃ লিঃ, কলকাতা; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৯৪ বঙ্গাব্দ, ৩১০ পৃঃ।

২. **"তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ"**, জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত; দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা; চতুর্থ মুদ্রণ; ১৯৯৩; ৩৭৪ পৃঃ।

৩. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ঃ **"বেণের মেয়ে"**, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ; ২য় অধ্যায়।

৪. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ **"বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা"**; মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা; পঞ্চম সংস্করণ; ১৩৭২ বঙ্গাব্দ; ৫৫৩ পৃঃ।

৫. ঐ; ৫৫২ পৃঃ।

৬. ঐ; ৫৫৫ পৃঃ।

৭. Ashok Kumar Mukhopadhyay (Ed) ঃ **"India and Communism (secret British Documents")**; National Book Agency Pvt. Ltd. Calcutta, 1st N. B. A. reprint, February, 1997. 115 P.

৮. তাবাশংকব বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ "কৈশোর স্মৃতি" ; 'তারাশংকর স্মৃতিকথা' গ্রন্হভুক্ত , উক্ত ; ১৭৭ পৃঃ।

৯. ঐ।

১০. Bruce W. Wardropper : 'Don Quixote : Story or History ?' 'Modern Philosopły', L XIII, 1965.

১১. Avrom Fleishman : **'The English Historical Novel (Walter Scott to Virginia woolf)'** ; The Johns Hopkins Press, Baltimore and London ; 1972 ; 15 P.

১২. Kali kinkar Datta : **"The Santal Insurrection of 1855-57,"** Calcutta University, 1988 ; 16 P.

১৩. তাবাশংকর বন্দ্যোপাধ্যাযঃ **"আমার সাহিত্য জীবন"** , উক্ত ; ৩৬৩ পৃঃ।

১৪. দেবেশ বায (সংকলিত ও সম্পাদিত)ঃ **"দলিত"** , ভূমিকা , সাহিত্য অকাদেমি , কলকাতা , ১৯৯৭ ; ১৯ পৃঃ।

———

উদক চান্দ জিম

—জ্যোতির্ময় ঘোষ

'উদক চান্দ জিম সাচ না মিচ্ছা'—জলেব বুকে চাঁদেব প্রতিবিম্বন যেমন সত্যও নয় আবাব মিথ্যাও নয়ঃ এই উক্তিটি ব্যবহার করেছেন প্রাচীন বাঙালি কবি একটি চর্যাপদে। চর্যাগানগুলির অন্তর্নিহিত তাত্ত্বিক দার্শনিক তাৎপর্য প্রায়শ নানা উপমা রূপক প্রভৃতি অলংকাবের মাধ্যমে আভাসিত করেছেন কবিরা, জ্ঞানীবা জানিয়েছেন আমাদেব। সহজিয়া বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের নিগূঢ় উপলব্ধি তথা সাধনতত্ত্বেব গভীর কথা নানা ইশাবায় ইঙ্গিতে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে যোগ্য শিষ্যদেব, যাঁবা স্বয়ং-সাধক, তাও জানি। সে সব গূঢ়ার্থ যে অদীক্ষিতদেব জন্য নয়, তাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু জানানো হয়েছে লোকভাষায়, লোকায়ত আঙ্গিকে। উপমা-রূপকের ভাষা ও ছবিও এসেছে চেনা-জানা জগত থেকে। আর সেজন্যই তার একটা আবেদনও আছে সাহিত্যপাঠকেব কাছে। ধ্রুপদী ভাষায় তারাই হলেন সহৃদয় সামাজিক। তাত্ত্বিক দার্শনিকের অথবা দীক্ষিতেব দৃষ্টিতে না দেখে শুধু সহৃদযের বোধবুদ্ধিব আলোয় দেখলে সুস্পষ্ট যে, শুরুতেই উদ্ধৃত পদ্যাংশটিতে বেশ উপভোগ্য কবিত্ব আছে। চর্যাপদগুলিতে কবিত্বেব আবেদনেব প্রশ্নে চিবকাল সর্বাগ্রে চলে এসেছে যে পদ্যাংশটি, তা হলোঃ উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই শবরী বালী! এই লেখকের সবচেয়ে বেশি মনঃপূত হলোঃ 'উদক চান্দ জিম' প্রভৃতি অংশটি।

কথাশিল্পী তাবাশঙ্করেব প্রকৃতিভাবনা- তাঁব রচনায কী ভাবে কতটা প্রতিফলিত, তা নিয়ে ভাবিত হতে গিযে কৌতুহল জাগে—বাংলা সাহিত্যের আদি পর্যায়ে, একেবাবে প্রাবম্ভে সাহিত্যস্রষ্টাবা প্রকৃতিকে কী ভাবে ব্যবহাবেব মধ্যে এনেছেন। দেখা যাচ্ছে, চর্যাপদেব কবিব কাছেও প্রকৃতি অনিমন্ত্রিত অতিথি মাত্র ছিল না। শুধু তাই নয। পবিমাণেব বিচাবে তেমন উল্লেখ্য না হলেও, প্রকৃতিকে ব্যবহাবেব নিপুণতা ও গভীবতায় চর্যাপদেব কবি যথেষ্ট আধুনিক মানসিকতাবই নিদর্শন নির্মাণ কবেছেন।

সাহিত্যে প্রকৃতির ব্যবহার কি তবে দেশকালনিবপেক্ষ, উঠেই আসে এমন প্রশ্ন। এই সূত্রেই অন্তত 'রোমাণ্টিক ইমাজিনেশন' সংক্রান্ত বিশ্রুত সব বিতর্ক

ও আলোচনার রেশ ইংরেজি সমালোচনাপড়া পাঠকের মনে অস্বস্তি জাগাতে থাকবে। সংশয়বিদ্ধ ইংরেজিনবিশেরা এবং তাঁদের নকলনবিশেরা একটু ভেবে দেখলেই বুঝবেন, লিরিকাল ব্যালাডস'-এর প্রকাশকাল থেকেই বিশ্বব্যাপী নবনারীর রোমান্টিক স্বপ্ন দেখার শুরু অথবা রোমান্টিক চেতনার সূত্রপাত, তা তো হতেই পারে না! লিরিকাল ব্যালাডস'-এর আত্মপ্রকাশ বস্তুত একটি বিশিষ্ট সাহিত্যতাত্ত্বিক বা বলা ভালো নন্দনতাত্ত্বিক ভাব আন্দোলনকে সংগঠিত করলো। দৃষ্টান্ত বিরল নয়। একটি উল্লেখই যথেষ্ট। 'একজিসটেন-সিয়ালিজম' তাত্ত্বিক-দার্শনিক অবয়ব পেয়েছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। অথচ বিশেষজ্ঞমাত্রই জানেন সেই তত্ত্বদর্শনের রাসোত্তীর্ণ সাহিত্যশিল্পরূপ কয়েক শতাব্দী পূর্ববর্তী সেকসপীয়রের নাটকেও দুর্লভ নয়।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-সহ সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলীতেও প্রকৃতির ব্যবহার লক্ষনীয়। কোনো কোনো বৈষ্ণব পদে নিসর্গের ব্যবহার শুধু অনুষঙ্গরূপেই নয়, কবির সমগ্র বিরহানুভূতি তথা জীবনবোধের সারাৎসাররূপেও চমৎকারজনক। 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর' পদটির উল্লেখই যথেষ্ট। এই পদটি বিদ্যাপতি বা কবিবল্লভ যিনিই লিখে থাকুন, এই ধরণের পদের অভাব নেই বৈষ্ণব পদসাহিত্যে, চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের নিসর্গখচিত ও নিসর্গময় পদের পরিমাণও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়।

রোমান্টিক কবিকল্পনার সঙ্গে নিসর্গের চেতনা ওতপ্রোত। কাজেই বৈষ্ণব-পদাবলীতে নিসর্গের রসোত্তীর্ণ ব্যবহার অপ্রত্যাশিত নয়। বিশেষত পূর্বরাগ, অনুরাগ অভিসার, মাথুর প্রভৃতি পর্যায়ের সঙ্গে ঋতুবৈচিত্র্যের স্বতঃস্ফূর্ত অঙ্গীকার ও রসস্ফূর্তি রসসাহিত্যের অধিকারের সীমারই অন্তর্গত।

বাংলা শাক্ত সাহিত্যে বিশেষত শাক্ত পদাবলীতে রোমান্টিক কবিকল্পনার অবকাশ স্বভাবতই সীমিত। আগমনী-বিজয়ার গানের পরিবেশ ঋতুবৈচিত্র্যকে আত্মস্থ করার সুযোগ পায় না, শরৎ-সর্বস্ব গানগুলি আবার বাৎসল্যসর্বস্বও বটে। বৈষ্ণবীয় রসবৈচিত্র্যের প্রসঙ্গও তেমন বড়ো কথা নয়, আসল কথা মধুর রসের অনুপস্থিতি। শাক্ত পদাবলীতে তাই নিসর্গ আবেদন মুখ্য প্রসঙ্গ হয়ে ওঠে না। রোমান্টিক স্বপ্নের, অবশ মোহের, যৌনবোধ মিলন ও বিরহের কল্পনার সুদূরতম হাতছানিও সেখানে নেই। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্য-রকম আবেদন টের পাওয়া যায়। এমন আবেদন, যেখানে ভয় আর আতঙ্ক

মানুষের মনের দিগন্ত স্পর্শ করে থাকে—শাক্ত কবি বলেন, 'এবার কালী তোমায় খাব'। —চণ্ডীর স্তোত্র পাঠক রূপ চায়, জয় চায়, যশ চায় এবং চায় শত্রুকে ধ্বংস করতে। পার্থিব সমস্ত আশঙ্কার মূর্ত প্রতীকরূপে সে মানুষ দেখে দেবীকল্প চণ্ডীকে, আবার শক্তিসাধকের কাছে এই উপলব্ধিরও অভ্রান্ত বাস্তবতা সুস্পষ্ট—

যা দেবী সর্বভূতেষু মৃত্যুরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ ॥

অবান্তর হবে না, যদি এখানেই মনে করিয়ে দিতে চাই বিবেকানন্দ-রচিত Kali, the Mother কবিতাটির কথা, যার রচনা শেষমাত্র কবি মূর্ছিত হয়ে পড়েন এবং সংজ্ঞা ফিরে পেয়েই ছুটে যান কাশ্মীরের হ্রদে ভাসমান নিবেদিতার বজরায় তাঁর সেই অনুভবের কথা জানাতে, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদে যে কবিতার শিরোনাম ঃ 'মৃত্যুরূপা কালী'। একই সঙ্গে চোখ বুলিয়ে নেওয়া যায় ইংরেজিতে নিবেদিতা রচিত দুই শক্তি-সাধকের সাধন-ধ্যানের বৃত্তান্ত ঃ রাম-প্রসাদ ও রামকৃষ্ণ বিষয়ক বিস্ময়কর মননকল্পনাজাত সেই রচনাটিতে। ভারত বর্ষীয় তন্ত্রভাবনায় কালী কোনো পুতুল নয়, কালী একটি ভাবপ্রতিমা। সমস্ত অন্ধকারকে সংহত করে কালী। কালীই প্রকৃতি। প্রতিমার পদতলে শায়িত শিবমূর্তি পুরুষ। যারা যোগসাধনার গভীরে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের রুদ্ধ চক্ষে ধ্যানের অবসরে ব্যাপ্ত অন্ধকারে ক্রমশ স্ফুটতর হয় একটি আলোকবিন্দু। অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো ?

॥ দুই ॥

অপরিহার্য ন্যূনতম এই ভূমিকা ভাষ্যের পরে তারাশঙ্করের সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্বের কয়েকটি প্রাসঙ্গিক তথ্য স্মরণ করা যেতে পারে। তার প্রথম পর্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনার মধ্যে 'রসকলি, রাইকমল, মালাচন্দন, হারানো সুর, প্রসাদমালা প্রভৃতি যেমন পড়ে তেমনই সমাধিক সমাদরযোগ্য রায়বাড়ি, জলসাঘর' ও পাঠকের স্মৃতির পটে জেগে ওঠে। বস্তুত তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যের সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয় থাকলেও স্পষ্ট হবে, 'রসকলি-রাইকমল' যেমন বৈষ্ণবীয় ভাবধারণাপ্রসূত তেমনি রায়বাড়ি জলসাঘর শাক্তস্বভাবজাত। এই সব রচনা নিয়ে বেশ কিছু প্রচলিত অ্যাকাডেমিক আলোচনা হয়েছে, তেমন

অনুভবময় অন্তর্ভেদী মনন যদিও চোখে পড়েনি বললেই হয়। উপযুক্ত পরিসরের প্রতীক্ষায় থেকে আপাতত এই মূল্যায়নে কোনো বাধা নেই যে, তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যে বৈষ্ণব ও শাক্ত দৃষ্টিভঙ্গির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার মৌলিক চরিত্র ধ্রুপদী নয়, সৌভাগ্যক্রমে লোকায়ত।

অবশ্য লোকায়ত হওয়াই স্বাভাবিক হয়েছে তারাশঙ্করের পক্ষে। দেশকাল এবং তারাশঙ্কররূপী পাত্রের পক্ষে ধ্রুপদী বৈষ্ণবীয়তায় বা শাক্তস্বভাবে স্থিত থাকার সম্ভাবনা ছিল না। ইতিহাসচেতনা সেকথাই বলে।

সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ষোড়শ শতকীয় বৈষ্ণব তত্ত্বদর্শনের ধারাটি ক্ষীয়মান হয়ে এসেছিল। অন্যপক্ষে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত ছাড়া তৃতীয় কোনো শাক্ত-পদকর্তাকেই ধ্রুপদী ধারার পরমাত্মীয় বলে গণ্য করা কঠিন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলাসাহিত্যের বৈষ্ণব ও শাক্ত দুটি ধারাই প্রায় সম্পূর্ণই ব্যাপক লোকায়ত চাহিদার নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। আমাদের প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিতেরা কেউ কেউ ভিন্নতর মত পোষণ করে থাকতে পারেন। তবু বিগত প্রায় চারদশকের ধারাবাহিক সন্ধান সত্ত্বেও এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে মান্য বলে আমাদের মনে হয়েছে ১৭৬০ থেকে ১৮৩০-এর সত্তর বছর ব্যাপী কাল পর্যায়ের কবিগান আখড়াই হাফ আখড়াই প্রভৃতির যে প্রতিপত্তি সে বিষয়ে অধ্যাপক সুশীলকুমার দে মহাশয়ের বিশ্লেষণ ও বিচার ইতিহাস চেতনা সমৃদ্ধ। বৈষ্ণব পদাবলীর সাহিত্যিক উচ্ছিষ্ট 'কলঙ্ক' 'ছলনা' যেমন কবিগান প্রভৃতির বিষয় হয়ে উঠল তেমনি শাক্তপদাবলীর 'আগমনী' ও 'বিজয়া' অংশটি সামগ্রিক শাক্ত দর্শন সাধনতত্ত্ব থেকে বেরিয়ে এলো বঙ্গীয় সমাজের সমকালীন 'গৌরীদান' প্রথার বাস্তব মর্মবেদনা-সূত্রে।

রাঢ়বঙ্গের পল্লীজীবনেও, পল্লীকবির রচনাতেও বৈষ্ণব ও শাক্তসাহিত্যের যে পৌনঃপুনিক অনুবৃত্তি লক্ষনীয় হলো বীরভুমের একটি পল্লীগ্রামের জনমানসের সাংস্কৃতিক মান তারও চেয়ে অর্থাৎ সেই গতানুগতিক অভ্যাসের চেয়ে গভীর কিছু আকাঙ্ক্ষার ও গ্রহণের যোগ্য ছিল।

বাংলা সাহিত্যের তথা তারাশঙ্কর-সাহিত্যের বিশ্রুত সব সমালোচকেরা যখন খুব ভারি ভারি আলঙ্কারিক তৎসম শব্দকণ্টকিত আলোচনায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কার, শাক্ত বা তন্ত্র দর্শন বা বৈষ্ণবীয় রসভাষ্য প্রভৃতি প্রসঙ্গে মুখর হন, তখন আমাদের মনে বড়ো বেশি ধন্ধ জাগে। বীরভুমের গ্রামাঞ্চলে এখন থেকে

অর্ধশতাব্দী আগে কার্বাইট জ্বালা গ্যাসের আলোয় কিছুক্ষণ পরপর দম দিয়ে জ্বালিয়ে বাখা পেট্রোম্যাক্সেব আলোয শিশিবভেজা ঘাসেব ওপরে পাতা চটে বসে শৈশব কৈশোবে শোনা লম্বোদর-গোমানির কবিগান এবং ঝুমুর ইত্যাদির আসরের কথা শৈশব-কৈশোবেব স্মৃতি খুঁড়ে যখন বের করে নিয়ে আসা সম্ভব হয এবং অগণিত দীন ভিখাবি, বাউলেব গলায় শোনা গানেব কথাও যখন মনে পড়ে, তখন স্পষ্ট হয়ে ওঠে যাবতীয় কেতাবি পাণ্ডিত্যভবা কৃত্রিম শব্দপুঞ্জেব অন্তঃসারশূন্যতা। কেঁদুলির মেলায় জয়দেবেব (তাও বিতর্কিত, কেননা প্রতিবেশী ওড়িশাব দাবি ভিন্নতব) উত্তরাধিকাব অথবা নানুর অঞ্চলে চণ্ডীদাসেব পদাবলীব সুরভি তাবাশঙ্কবেব কালেই কবি কল্পনার সামগ্রীতেই পর্যবসিত হয়েছিল।

বীবভুম প্রচলিত ধাবণামতো বীবেব ভূমি না, নিতান্তই জঙ্গলাকীর্ণ অঞ্চলমাত্র, দাবিদ্র্য ও নিবক্ষরতা বীরভূমের গ্রামাঞ্চলে ছিল যখন নিত্যসঙ্গী। গাছেব ডুমুব পেড়ে অথবা নষ্টপ্রায় জলাশয়েব তীরে গুগলি ও ঘিমে শাক সংগ্রহ করেই কার্যত যাদেব জীবনযাপন, নববর্ষাব ধারায ধানের খেত থেকে বহু কষ্টে সংগৃহীত অঙ্গুলি প্রমাণ সিঙি ও কই যাদের আহার্যের তালিকায় মহার্ঘ্য আমিষ—সেইসব মানুষের জীবনেও শীলিত কবিতার অভাব সত্ত্বেও লোকায়ত গান তো থাকেই, এমন কী প্রক্ষিপ্ত কবিতাও—তারাশঙ্কর তাঁব অসামান্য সৃষ্টিপ্রতিভাব বলে সেই জীবনকেই যখন শহুরে পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেন তখন তার চমৎকাবিত্বে সাহিত্যেব পাঠকরূপে সাড়া দিতেই হয়।

।। তিন ।।

তাবাশংকবের সাহিত্যে নিসর্গ কাজ কবে প্রাথমিকভাবে আঞ্চলিক পবিবেশ নির্মাণেব সূত্রে। শুধু তারাশঙ্কবেব বচনায় কেন, বিশেষত কথাসাহিত্যেব সর্বত্রই তো এটাই নিসর্গ ব্যবহাবেব প্রধান কাবণ। স্থানিক বৈশিষ্ট বা আঞ্চলিক চেহাবা ও চরিত্রটি তো ফুটিয়ে তুলতেই হয় কথাশিল্পীকে।

তাবাশঙ্করেব কথাসাহিত্যে নিসর্গ ব্যবহাবেব একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য যা লক্ষণীয় হয়ে ওঠে তা হলো তাঁর নিসর্গেব ব্যবহার কোথাও তেমন আরোপিত বা উদ্দেশ্যমূলক নয় মূলত তা স্বতঃস্ফূর্ত। নিসর্গেব ব্যবহাবে কোথাও তাই অতিরঞ্জন বা প্রদর্শনস্পৃহা চোখে পড়ে না।

সাহিত্যে নিসর্গের ব্যবহার প্রসঙ্গে আমাদের প্রচলিত ধারণা, হয় নিসর্গ মানুষের জীবনধারার সঙ্গে পরিপূরকরূপে অথবা পরস্পর বিরোধী চেহারা নিয়ে আসবে। কিন্তু মানুষ বা মানুষের জীবন সম্পর্কে প্রকৃতি যে আদ্যন্ত উদাসীন তার চেয়ে বেশি সত্য আর কী আছে! রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের চন্দরাকে আইনের রক্ষাকর্তারা যখন গ্রামের পথ দিয়ে ধরে নিয়ে যাচ্ছে তখন চারিপাশের নিসর্গের উদাসী নিরপেক্ষতা রীতিমতো নির্মম হয়ে ওঠে, যদিও সুভা বা অতিথির মতো গল্পে মানবচরিত্র ও নিসর্গকে একাত্ম করেই দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। আবার 'পোস্টমাস্টার' গল্পের শেষ অনুচ্ছেদটি যেন অকৃতজ্ঞ একটি মানুষের অপরাধ ও আত্মগ্লানিকেই প্রচ্ছন্ন রাখার কৌশল হিসেবেই নিসর্গের ব্যবহার, মনেই হতে পারে কোনো পাঠকের। আবার 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শ্মশানের যে ছবি এঁকেছেন শরৎচন্দ্র, উপন্যাসের শ্মশানদৃশ্যও কতকটা তার অনুরূপ হয়েও তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও প্রনিধানযোগ্য। মোহিত-লাল যাই বলুন না কেন শরৎচন্দ্রের বর্ণিত শ্মশানদৃশ্য মূলত শরৎচন্দ্রীয়। অর্থাৎ ব্যাপক রসব্যঞ্জনার ভাষায় তা বৈষ্ণবীয় চেতনায় আর্দ্র, কবিত্বের আরোপও সেখানে নিতান্ত দুর্লক্ষ্য নয়, পক্ষান্তরে 'কবি' উপন্যাসের শ্মশান-দৃশ্য যিনি রচনা করেন তাঁর দৃষ্টি এবং দর্শন দুটিই শাক্তজীবনদর্শন-সম্ভূত।

শ্রীকান্ত উপন্যাসে শ্মশানের বর্ণনা তাই উত্তমপুরুষে এই দৃষ্টি খুবই ব্যক্তিগত, সাবজেকটিভ'। কবির শ্মশানদৃশ্য সর্বজ্ঞ লেখকেরই বর্ণনা ও ভাষ্য। নিতাই কবিয়ালের সঙ্গে এখানে লেখক তারাশঙ্কর একাত্ম নন: এই সত্যটি প্রণিধানযোগ্য। তারাশংকর এক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব 'অবজেকটিভ'। এখানে তারাশঙ্কর প্রায়-বঙ্কিমচন্দ্রীয়। রাবীন্দ্রিকও নন, নন শরৎচন্দ্রীয়ও।

অথচ পরিণতমনস্ক তারাশঙ্কর 'আরোগ্য নিকেতন'- উপন্যাসে মৃত্যুকে জীবনমশায়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখতে গেলেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন না, থাকতে পারেন না নিরাসক্ত। মৃত্যুকে যেন বরণ করার, তাকে স্বাগত জানানোর দায়বোধ যেন লেখক তারাশংকরকে নিজের কাঁধেই তুলে নিতে হচ্ছে।

মৃত্যুচেতনা তাহলে কি নিসর্গচেতনারই অঙ্গীভূত?

॥ চার ॥

তারাশংকর প্রসঙ্গে আঞ্চলিকতার যে সর্বজনবিদিত বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচিত

হয়, তার যৌক্তিকতা সর্বতোভাবে স্বীকার্য হলেও এতদিনে এই সত্যটি আমাদের জানা হয়ে গেছে যে, গতানুগতিক অর্থে আঞ্চলিকতা তারাশংকরের সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে কোনো সংকীর্ণ ঘেরাটোপে বাঁধছে না।

বস্তুত, সব কথাসাহিত্যই আঞ্চলিক কিন্তু কোনো কথাশিল্পই আঞ্চলিকতার প্রচলিত সংকীর্ণতায় পর্যবসিত নয়। 'কথা' বা 'কাহিনী' যখন আখ্যান বা নভেল রূপে শিল্পিত হয়ে উঠল, তখন সেই আখ্যান কোন দেশের কোন্ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে আবর্তিত, তা তেমন কোনো প্রশ্নই নয়। তারাশংকরের সমকালীন আর এক মহান প্রতিভাধর স্রষ্টা কেমন অক্লেশে ঘোষণাপত্রের মতো উচ্চারণ করতে পারেন ঃ

'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি তাই পৃথিবীর রূপ দেখিতে যাই না আর'। তারাশংকরের কথাসাহিত্য মুখ্যত যে রাঢ় অঞ্চলের সুনির্দিষ্টভাবে বীরভূমের 'মুখ'টি ধরা দিয়েছে তাতে কোনো সংশয় নেই, কিন্তু তাতেই যে তাঁর সাহিত্যের আবেদন সংকীর্ণ হয়ে পড়তে পারত এমন কোনো আশংকা অমূলক। হাঁসুলী বাঁকের উপকথা বা কালিন্দী'র আঞ্চলিক পরিবেশ লেখক বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। আঞ্চলিক পরিবেশ নির্মাণে নিসর্গ বা প্রকৃতির ব্যবহার ফলপ্রসূ হতে পারে। কিন্তু ভূ-প্রকৃতির বর্ণনা থেকেই কথাশিল্পীর প্রকৃতি বা নিসর্গভাবনার পরিচয় নিঃশেষে জানা যায়, এমন আশাও অমূলক। প্রকৃতি বা নিসর্গভাবনার উৎসসন্ধানে যাত্রার অর্থ সমগ্র আখ্যানে প্রতিবিম্বিত কথাশিল্পীর মেজাজ মর্জি দৃষ্টিভঙ্গিরও স্বরূপ সন্ধান।

তারাশংকরের কথাসাহিত্যে দেশের যে অঞ্চলের নিসর্গমেজাজ সুস্পষ্ট, সেই অঞ্চলটি যেমন রাঢ়ের অন্তর্গত, তেমনি জেলা হিসাবে তার নাম বীরভূম। বীরভূম জেলার অন্তর্গত বোলপুর অঞ্চলের শান্তিনিকেতন প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, শান্তিনিকেতন তিনি প্রকৃতির সামগ্রিক রূপটিকে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। প্রকৃতিলোকে ছটি ঋতুকেই তিনি সুচিহ্নিত চরিত্রে দেখতে পান শান্তিনিকেতনে। রবীন্দ্রসাহিত্যে ঋতুর উৎসবে একটিও অনিমন্ত্রিত যাবে না শেষ পর্যন্ত। কিন্তু তারাশংকরের কথাসাহিত্যে ছটি ঋতু তো দূরের কথা, একটির বেশি দু'টি ঋতুরও দর্শন কার্যত গবেষণাসাপেক্ষ।

কী সেই ঋতুটি, যা তারাশঙ্করের কথাসাহিত্য অটল মহিমায় জাজ্বল্যমান? ঋতু হিসাবে গ্রীষ্ম, মাস হিসাবে বৈশাখের প্রতিপত্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু অভ্যস্ত সাহিত্যিক ভাবাবেগ থেকে এ-রকম বলাও খুব ভুল হবে যে,

গ্রীষ্ম তাঁব 'প্রিয় ঋতু' অথবা তাঁর 'প্রিয় মাস' বৈশাখ। কেননা, প্রকৃতিব ব্যবহার সাহিত্যে লক্ষণীয বলেই যেমন বলা চলে না, সাহিত্যিক মাত্রই প্রকৃতি-প্রেমিক। প্রকৃতি 'প্রিয়' বলেই, কোন ঋতু বা কোন মাস 'প্রিয' বলেই লেখক তাঁব বচনায প্রকৃতিব বা বিশেষ কোন ঋতু বা কোন বিশেষ মাসেব ব্যবহাব করেছেন, বাস্তবতা থেকে উদ্ভূত এ কোন সত্য নয়।

বীবভূমেব বা বাঢ় বঙ্গেব লেখক বা কবি হলেই তাঁবা গ্রীষ্মপ্রেমিক বা বৈশাখ-প্রেমিক হবেনই—এ বকম সিদ্ধান্তও তাৎক্ষণিক বিমূঢ় মন্তব্যমাত্র হতে পারে, আসলে লক্ষণীয়, কবি বা কথাশিল্পীবিশেষের অভিজ্ঞতা ও জীবনদর্শন-প্রসূত অপ্রতিবোধ্য মেজাজমর্জি'র এবং স্বতন্ত্র উদ্ভাসন।

এই প্রতিপাদ্যটি স্পষ্ট কবাব কাজে ব্যবহাব কবা যায় তাবাশংকবের কথা-সাহিত্যর অগণিত নির্বাচিত অংশ। কিন্তু সহমর্মী তথা সহৃদয় সামাজিকেব চেতনার স্তবটিকে স্পর্শ কবার জন্য কয়েকটি অতি-নির্বাচিত উদ্ধৃতিই যথেষ্ট। অতি-পবিচয়ের মধ্যেও নব-পবিচয়েব তৃপ্তিকব বিষযও হয়তো দুর্লভ হবে না। 'ধাত্রীদেবতা'র দশম পরিচ্ছেদে কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্যই নেই। কাজেই, প্রকৃতিবর্ণনাব অবকাশও নেই। তবু, এই পবিচ্ছেদেব প্রথম বাক্যটিতেই তাবাশঙ্কবের নিসর্গদৃষ্টির তথা নিসর্গভাবনাবও পবিচয় পাবেন ভাবুক পাঠক—

ঘটনাটা হয়তো সামান্য এবং নগণ্য, কিন্তু বৈশাখেব অপবাহ্নেব ছোটো সামান্য একটুকবা মেঘেব মতো দেখিতে দেখিতে বিপুল পবিধিতে পবিণতি লাভ কবিয়া যেন কালবৈশাখীব সৃষ্টি কবিযা তুলিল। একদিকে পিসিমা, অন্যদিকে নাতিব দিদিমা।

'সামান্য এবং নগণ্য' একটি পাবিবাবিক ঘটনা, এক্ষেত্রে বালিকাবধূকে কেন্দ্র কবে দু'জন মহিলাব অহং-ঘটিত কলহ ঃ তাবাশংকব 'বৈশাখেব অপবাহ্নেব ছোটো সামান্য একটুকবা মেঘ'-কে 'কালবৈশাখীব' 'বিপুল পবিধিতে পবিণতি লাভ' করতে দেখছেন। আসলে 'বৈশাখ' ও 'কালবৈশাখী'ব বাক-প্রতিমার ব্যবহাব কথাশিল্পী তাবাশংকবেব কাছে অপ্রতিবোধ্য হযেছে।

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটিব মতো বহু গল্প-উপন্যাসের স্রষ্টা তাবাশংকব যে-অর্থে যতখানি বীরভূমেব সৃষ্টি, প্রাকৃতিক ও দার্শনিক তাৎপর্যে তিনি সমপরিমাণেই তেমনি এক বীবভূমেবও স্রষ্টা। সেই বীরভূম জটাজুট ও রুদ্রাক্ষধাবী তপঃক্লিষ্ট শ্মশানবাসী শংকব, কখনো বা শ্মশানবাসিনী ভয়ংকবী

বালিকাব দ্বিতীয় রহিত প্রতীক যেন।

'ধাত্রীদেবতা'ব পঁচিশের পরিচ্ছেদটি থেকে দেখা যায়, একটি দাম্পত্য তথা পাবিবাবিক কাহিনী কীভাবে বীবভূমের আঞ্চলিকতা অতিক্রম করে দেশেব স্বাধীনতা, জাতীষ গৌবব, জাতি, দেশ, জন্মভূমির সূত্রে আন্তর্জাতিক চেতনাকে আত্মস্থ কবেও কত অনায়াসে নিসর্গভাবনার মধ্যস্থতায় লেখকেব জন্মভূমি বীবভূমেরই মৃত্তিকায় নিয়ে আসে। শুধু মৃত্তিকা নয়। তাবা-শঙ্কবেব কথাসাহিত্যের এই এক অসামান্য বৈশিষ্ট্য। মাটি বা নিসর্গ কখনো মাটিব মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হযে থাকে না। মাটির টান তথা প্রকৃতিব স্পর্শ মানুষেব আখ্যানকেই পুষ্টি দেয়, পবিণতি দান কবে।

পঁচিশেব পবিচ্ছেদে গৌবী-শিবনাথেব ক্রুদ্ধ কলহেব পবেই শিবনাথ কাছারিবাড়িতে এসে সংবাদপত্র পায। সংবাদপত্রে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তেব ছয শত মাইলব্যাপী যুদ্ধসংবাদেব বিস্তাবিত বিববণেব সঙ্গেই জানতে পারে— 'প্যাবিসেব অনতিদূরে জার্মান সৈন্য খুঁটি গাড়িয়া বসিয়াছে। ওদিকে পূর্ব-সীমান্তে প্রায শত শত মাইল যুদ্ধক্ষেত্র। লক্ষ-লক্ষ মানুষেব প্রাণ, প্রত্যেক জাতিব সমগ্র ধনভাণ্ডার জাতীয়গৌবব বক্ষার্থে নিয়োজিত হইয়াছে। ভাবতবর্ষ হইতে ভারতীয় সৈন্য প্রেবণেব পবিপূর্ণ আযোজন চলিতেছে।'

'ভাবতবর্ষ', 'ভাবতীয় সৈন্য' প্রভৃতিব অনুষঙ্গে শিবনাথ কাগজ থেকে মুখ তুলে আকাশেব দিকে চেযে স্বাগত উচ্ছ্বাসে মগ্ন হয—'জাতীষ গৌবব! জাতি—দেশ, জন্মভূমি! অকস্মাৎ জীবনে যেন একটা পট পবিবর্তন হইযা গেল। জীবনেব আকাশেব কামনার কালবৈশাখীব কালো মেঘে সমস্ত আবৃত হইযা গিয়াছিল, সে মেঘ কাটিয়া যাইতেই আবার দেখা দিল সেই আকাশ, তাহার সকল জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী। মনেব মধ্যে সুপ্ত বিস্মৃতপ্রায় কামনা আবার তাহার জাগিয়া উঠিল, দেশের স্বাধীনতা।'

দেশেব স্বাধীনতা কোন্ পথে আসবে, ভাবছে শিবনাথ। এই ভাবনাব ধবন গডন শিবনাথেব স্রষ্টা তারাশঙ্কবেব অনুসবণেই, সন্দেহ নেই। রক্তাক্ত পথেব কথা ভাবতেই সে তখন শিহবিত বোধ কবে। তাব মনে পডে যায় 'অতি সাধাবণ আকৃতিব এক মহাপুরুষেব কথা'—গান্ধীজীর অনুসঙ্গে তাব মনে আসে তাব মায়েব কথা। মাযেব কথার সূত্রে—

'গভীর চিন্তায় আচ্ছন্নেব মতো বসিয়া থাকিতে থাকিতে সে বাহিব হইয়া পড়িল। গ্রাম ছাড়াইয়া মাঠের মধ্য দিয়া সে সেই কালীমায়ের আশ্রমেব দিকে

চলিয়াছিল। সরু আল-পথের দুই দিকে ধানের জমি; প্রায় কোমর পর্যন্ত উঁচু ধানগাছে মাঠ ভরিয়া উঠিয়াছে। সহসা একটানা একটা সোঁ সোঁ শব্দে আকৃষ্ট হইয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। কোথায় এ শব্দ উঠিতেছে? কিসের শব্দ? তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে গভীর মনঃসংযোগ করিয়া সে আবিষ্কার করিল, শব্দ উঠিতেছে জমিতে, অনাবৃষ্টি রৌদ্রের প্রখর উত্তাপে জমির জল শুকাইয়া যাইতেছে, মাটি ফাটিতেছে! উঃ তৃষ্ণার্ত মাটি হাহাকার করিতেছে! মাটি-মা-দেশ-জন্মভূমি কথা কহিতেছেন! চোখ তাহার জলে ভরিয়া উঠিল। হ্যাঁ, কথাই তো কহিতেছেন। সে যেন সত্যই প্রত্যক্ষ করিল মৃত্তিকার আবরণের তলে জাগ্রত ধরিত্রী-দেবতাকে। চোখের সম্মুখে সুতোর মতো ফাটলের দাগগুলি ক্রমশ মোটা হইয়া সুদীর্ঘ রেখায় অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। শস্যগর্ভা ধানের গাছের দীর্ঘ পাতাগুলি ম্লান হইয়া মধ্যস্থলে যেন ভাঙিয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্মী দেহত্যাগ করিতেছেন।

এ ধ্যানও তাহার ভাঙিয়া গেল একটা আকস্মিক কোলাহলে। দৃষ্টি তুলিয়া সে দেখিল, সম্মুখেই কিছু দূরে দুইটা লোকের মধ্যে ক্রুদ্ধ বাক্য-বিনিময় হইতেছে।'

'মাটি ফাটিতেছে' 'তৃষ্ণার্ত মাটি হাহাকার করিতেছে'—গ্রীষ্মদগ্ধ ফুটিফাটা মাটির মরুতৃষ্ণা, রুদ্র বৈশাখের ক্ষমাহীন বহ্নিজ্বালা- (তাই জ্বালা তীব্রতর হয় পরাধীনতার জ্বালার সঙ্গে মিশে?) ভাবনার উৎসে আছে এই স্বতঃস্ফূর্ত প্রায় বাক্ প্রতিমাটি। পাশাপাশি লক্ষণীয়, তারাশংকরের নায়ক শিবনাথ ভাবাবেগ আন্দোলিত অস্থিরতায় ছুটে যায় 'কালীমায়ের আশ্রমের দিকে'!'

রুদ্র বৈশাখের অসহ্য অনলদীপ্তির অনুষঙ্গে মৃত্যুরূপা কালী, বিবেকানন্দ-প্রাণিত তারাশংকরের দৃষ্টিতে সেই মৃত্যুও জীবনের সারাৎসার অচ্ছেদ্য বন্ধনে বিধৃত। তারাশংকরের ভাষায় 'কালীমায়ের আশ্রম' অর্থাৎ সংসারসীমান্তের সুদূর বাইরে নয় তাঁর কালীর অবস্থান। কিন্তু তারাশংকরের প্রকৃতি ভাবনায় কালোরাত, কৃষ্ণপক্ষের রাত, বিশেষত অমাবস্যার রাত্রি এই একই সূত্রে বিধৃত। এই সূত্রেই তারাশংকরের মৃত্যুভাবনা আভাসিত। কিন্তু কালী তো শুধু 'মৃত্যুরূপা' নন, মাতৃরূপাও। তাই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের গানের সঙ্গে তারাশংকরের স্বদেশভাবনাপ্রসূত নিসর্গ সন্দর্শন সাধু গদ্যের অবয়বেও সাদৃশ্য খুঁজে পায়। যদিও তারাশংকরের সুগভীর রবীন্দ্রানুরাগ জাতীয়তাবাদী স্বাদেশিকতার সুবাদে বঙ্কিমচন্দ্র, আনন্দমঠ ও 'বন্দেমাতরম' গানটিকেও

আত্মস্থ করে নিতে দ্বিধায় দীর্ণ হয় না এবং এই সমগ্র প্রক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয় তারাশংকরের একান্ত নিজস্ব নিসর্গ গ্রন্থনায়।

তারাশংকরের একান্ত নিজস্ব নিসর্গ-গ্রন্থনা অর্থাৎ সমকালীন বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিসর্গ-গ্রন্থনার সঙ্গে যার কিছুমাত্র সাদৃশ্য খুঁজে পেতে কষ্টকল্পনা ছাড়া উপায় থাকে না। বস্তুত সমকালীন কোনো কথা-শিল্পীর সঙ্গে তারাশংকরের নিসর্গসন্দর্শন মিলছে না। রবীন্দ্রনাথের 'পৃথিবী' কবিতা ও চিত্রকলায় প্রকৃতির যে নির্মোহ ও এমনকী নির্মম রূপটি প্রতিভাত এবং জীবনানন্দ দাশের ইতিহাসবোধ ও লোকচেতনাপ্রসূত নিসর্গ-ভাবনার সঙ্গে তারাশংকরের মাটি -ও মানবরসাশ্রয়ী প্রকৃতিলোকের যদি কিছু অন্তর্লীন স্বভাবসাদৃশ্য অনুভবগম্য হয় ও তবু তা প্রভাব ও প্রেরণাসূত্রে নয়, সুক্ষতর মর্জির সূত্রেই সদৃশ বুঝতে হবে।

'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসটির উনত্রিশের পরিচ্ছেদের নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতে বিশ্লেষণী দৃষ্টিপাতই বলে দিতে পারে ঐতিহ্যচেতনা কোথাও কোথাও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও—তারাশংকরকে কী ভাবে শক্তিধর কথাশিল্পীতে উন্নীত করেছে—

'চোখের ঘুম যেন আজ ফুরাইয়া গিয়াছে। সহসা তাহার মনে হইল, দুঃখ, দারিদ্র্য, স্বার্থপরতা, লোভ, মোহের ভার হিমালয়ের ভারের মতো মনুষ্যত্বের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে। সেই ভার ঠেলিয়াই মনুষ্যত্বের আত্মবিকাশ অহরহ চলিযাছে। কঠিন মাটির তলদেশ হইতে মাটি ফাটাইযা যেমন বীজ অংকুরিত হয়, তেমনই ভাবেই সে যুগে যুগে উর্ধ্বলোকে চলিয়াছে, জানালা দিয়া আকাশের দিকে সে চাহিয়া দেখিল, গাঢ় নীল আকাশ, পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতির্লোকের সমারোহে রহস্যময়। সে সেই রহস্যলোকের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। পশ্চিম-দক্ষিণ কোনাটা কেবল গাঢ় অন্ধকার, সহসা দীপ্তির একটা চকিত আভাসও যেন সেখানে খেলিয়া গেল। মেঘ! মেঘ দেখা দিয়াছে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে! শিবনাথ পুলকিত হইয়া জানালায় আসিয়া দাঁড়াইল। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের মেঘ! মেঘ যেন পরিধিতে বাড়িতেছে, বিদ্যুতের প্রকাশ ঘন ঘন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আঃ দেশ বাঁচিবে, চৌচির মাটি আবার শান্ত স্নিগ্ধ অখণ্ড হইয়া উঠিবে। সেই কোমল স্নিগ্ধ মাটির বুকে মানুষ আবার বুক দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িবে স্তন্যপায়ী শিশুর মতো। আবার মা হইবেন সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা, শস্য-শ্যামলা কমলা কমলদলবিহারিণী।

এ রূপ মায়েব অক্ষয় রূপ, এ রূপেব ক্ষয় নাই ; শত শোষণে পরাধীনতাব অসহ বেদনাতেও এ রূপেব জীর্ণতা আসিল না।'

তাবাশংকবেব জীবনভাবনায় নিসর্গচেতনায় চৌচিব মাটি তৃষ্ণার্ত ধরিত্রী ও পরাধীন স্বদেশের জন্য এক আকাশ মুক্তিব মতো দিগন্তপ্লাবী বৃষ্টিব উন্মুখ প্রার্থনা সেই মাটিময় ধবিত্রীর বুক জুড়ে লক্ষ কোটি মানুষের জীবন আব জীবিকাব সংগ্রাম, মেঘ চাই বৃষ্টি চাই মৃত্তিকা আর মানুষের জন্য নিছক একটি মনোজ্ঞ নিসর্গদৃশ্য নির্মাণের কবিত্বপূর্ণ তাৎক্ষণিক তাগিদ থেকে নয়। তাবাশংকবের নিসর্গবোধ তাঁর জীবনবোধেরই নামান্তর। আব তাঁর জীবন-বোধ মহান স্রষ্টাদেবই মতো 'মৃত্যুবূপেণ সংস্থিতা'! মৃত্যুর সেই অন্ধকার উৎস থেকেই উৎসারিত আলো। আলোব অবিরাম নিঃসবণ। উৎসের অনিঃশেষ অন্ধকার প্রকৃতিরূপিণীব মতোই।

বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসে তিন স্মবণীয় ব্যক্তিত্ব অপেক্ষাকৃতে আধুনিককালে কল্লোল ও কল্লোল-উত্তর বাংলা উপন্যাসেব ক্ষেত্রে তাবাশঙ্কর বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তিনজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক। বন্দ্যো-পাধ্যায়-ত্রয়ী, কিছু আগে ও সমকালে আরও কয়েকজন কথাশিল্পী বিশিষ্টতায় তাৎপর্যপূর্ণ হলেও প্রাসঙ্গিকতার বিবেচনায় বন্দ্যোপাধ্যায়-ত্রয়ীর কথাসাহিত্যে নিসর্গসন্দর্শনেব প্রসঙ্গটি এসেই পড়ে। বিভূতিভূষণেব বসোত্তীর্ণ রচনাগুলি থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন কবে দেখার কোন অবকাশ থাকে না। তাঁব বিষয, চবিত্র ও অনুভব প্রধানত সমসূত্রে বিধৃত। প্রাক-পার্টি পর্বে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যাযেব লেখা উপন্যাসগুলিতে (দিবাবাত্রিব কাব্য, পদ্মানদীর মাঝি, পুতুলনাচের ইতিকথা প্রভৃতি উপন্যাসে) মাণিকেব প্রকৃতি দৃষ্টি রোমান্টিক-সাবজেকটিভ থেকে ক্রমশ সর্বজ্ঞ স্রষ্টাব বস্তুনিষ্ঠায় পবিবর্তিত।

পক্ষান্তরে তাবাশংকবেব নিসর্গদৃষ্টি বা নিসর্গভাবনাব কোন স্বতন্ত্র বিচাব-বিবেচনার তাৎপর্য আছে বলেই আমার মনে হয় না। অর্থাৎ ছাত্রজীবন থেকে আমরা যে অর্থে ওয়ার্ডসওয়ার্থের বা ববীন্দ্রনাথেব প্রকৃতিচেতনা নিয়ে ভাবিত হতে অভ্যস্ত সেই অর্থে তাবাশংকবেব নিসর্গভাবনা প্রসঙ্গে ভাবিত হওযাব কোন সার্থকতা আছে বলে মনে হয় না। বস্তুত বন্দ্যোপাধ্যায়-ত্রযীব সমকালীন কবি জীবনানন্দ যেমন লিখেছিলেন—বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীব রূপ খুঁজিতে যাই না আর।

অথবা

তোমবা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পাবে রয়ে যাব।

অথবা

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীবে এই বাংলায়…

ঠিক সেই বিশ্বস্ত আকুতিভরে আমাদের প্রথম শ্রেণীর অন্যতম কথাশিল্পী তাবাশঙ্কর ঘোষণাবাক্যেব মতো উচ্চাবণ কবতে পারেন—'আমাব বই বলুন আব যাই বলুন, সেটা হচ্ছে আমাব এই রাঢ় দেশ। এব ভেতব থেকেই আমাব যা কিছু সঞ্চয়। তার বেশি আমার আর কিছুই নেই।'

ঠিক চাববছব আগে (জুলাই ১৯৯৪) যুবমানস পত্রিকায় 'যে-জীবন ফড়িঙেব, দোয়েলের…' বচনাটিতে কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের 'নাস্তিক' গল্পটিব সঙ্গে কবি জীবনানন্দের 'আট বছব আগেব একদিন' রচনাটিব তুলনা-মূলক সমীক্ষায় প্রবৃত্ত হতে হয়েছিল। তখনই মনে হয়েছিল 'জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতি' এই শিবোনামে কোনো আনুষ্ঠানিক রচনাব মতোই 'তাবা-শঙ্করেব নিসর্গচেতনা' বিষয়ে কোনো বচনা উপস্থাপনা হবে বস্তুত প্রগলভ বাক্যবয়ন মাত্র।

বাংলাব যে-মুখ দেখেছেন জীবনানন্দ তা যেমন ববিশাল জেলাভিত্তিক পূর্ববঙ্গেব, তেমনি বাংলার যে-মুখ দেখেছেন তাবাশঙ্কর সে মুখ বীরভূম জেলাভিত্তিক বাঢ় বাংলাব।

অবশ্য, তাবাশঙ্কবের অন্ধকাবচেতনা আব মৃত্যুভাবনার স্বরূপও সমসূত্রে বিধৃত এবং তাব মৃত্যুভাবনাব সঠিক ঠিকানা জানা না থাকলে তাঁব জীবনবোধ তথা নিসর্গবোধের পরিচয় গ্রহণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়—

'দিগন্তের কোলে ঘনায়িত অন্ধকাব, কিন্তু নিকটে আশেপাশে চাবিদিকে অন্ধকাবেব মধ্যেও এখনও অস্পষ্ট আলোব রেশ একটা আবছায়াব মতো জাগিযা আছে। অস্পষ্টতার মধ্যে একটা রহস্য আছে, সন্ধ্যার ছায়ান্ধকাবে সব যেন বহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। এখানকার প্রতিটি চেনাজানা বস্তুও এই বহস্যের আববণেব মধ্যে অজানা অচেনা হইয়া উঠিতেছে। চিনিতে ভুল হয় না কেবল আকাশস্পর্শী শিমুলগাছটিকে, সকলেব উর্ধ্বে তাহার মাথা জাগিয়া থাকে, তাহার উন্নত মহিমা যেন বহস্যেরও উপবে প্রতিষ্ঠা পাইযাছে। এক-একটা মানুষ এমনই কবিয়া অতীতকালেব বিস্মৃতির অন্ধকারের মধ্যেও মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া থাকে; বিগতকাল যত দীর্ঘ হউক, বিস্মৃতি যত প্রগাঢ় হউক, সে মিলাইয়া যায় না। তাহার মনেব মধ্যেও এমনই কয়েকটি

মানুষ সকল বিস্মৃতিকে চাপাইয়া মহিমান্বিত মূর্তিতে দাঁড়াইয়া আছে।'

উপরের উদ্ধৃত অংশে লক্ষণীয়, নিসর্গবর্ণনায় তারাশংকরের পটুত্বের কিছুমাত্র অভাব না থাকলেও তিনি কখনও নিসর্গসৌন্দর্যে অভিভূত হন না। নিসর্গের সূত্রে মানুষ, মানুষের বাস্তবতা তারাশংকরের কথাসাহিত্যে অনিবার্য চরিত্রের মতো সমুপস্থিত।

জীবনানন্দ ও তারাশংকর—দু'জনের সৃষ্টিতেই সূর্যোদয়ের স্বপ্ন লেগে থাকলেও অন্ধকারের অভিজ্ঞান সুস্পষ্ট। 'অন্ধকার' কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন—'আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি, অন্ধকারের স্তনের ভিতর, যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছি।'

তারাশংকরের 'অরণ্য-বহ্নি' উপন্যাসের (পৃঃ ৩৫৫, তারাশংকর-রচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড) নিম্নোদ্ধৃত অংশটি তুলনীয়—'(ভৈরবী) কিছুক্ষণ কেঁদে ক্লান্ত হয়ে স্তব্ধ হলেন। তারপর উঠলেন। অন্ধকারের মধ্যেও তিনি দেখতে পাচ্ছেন। অন্ধকার যত ঘন হোক, মানুষ চোখ বন্ধ করে বা হতচেতন হয়ে যখন থাকে তখন সে নিবিড়তম অন্ধকারে দৃষ্টি হারায়, প্রকৃতির অন্ধকার তার থেকে অনেক কম ঘন।

'মৃত্যুর অন্ধকার আর সৃষ্টি-জগতের রাত্রির অন্ধকারে অনেক প্রভেদ। রাত্রির অন্ধকার—হোক অমাবস্যা—আকাশে নক্ষত্র থাকে, অন্ধকারের মধ্যে গাছপালা পাথর জমাট অন্ধকারের মতো নিজের অস্তিত্বকে দৃষ্টির সম্মুখে জানিয়ে দেয়; আকাশে মেঘ থাকলেও মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের আভাস চকিত দীপ্তিতে সব কিছুকে ভাসিয়ে দেয়। মৃত্যু বা হতচেতনার মধ্যে চোখের পাতা নেমে আসে—তার মধ্যে কিছু নেই। ঘুমের মধ্যে থাকে স্বপ্ন—হতচেতনার মধ্যে, মৃত্যুর মধ্যে অন্ধকার স্বপ্নহীন—কালো কষ্টিপাথরের দেওয়ালের মতো। সেই অন্ধকার থেকে রাত্রির অন্ধকারে চেতনা পেয়ে চোখ মেলে তিনি সব দেখতে পাচ্ছেন। সেই পশুটা নেই সে তিনি প্রথমেই দেখেছেন। তারপর মনে হলো সে কি মায়ের ঘরে গিয়ে ঢুকেছে।'

জীবনানন্দ যা'-কিছু করেছেন কবিতার ভাষায়, কবিতার নিজস্ব শিল্পের নিয়মে তারাশংকর ঠিক তাই করেছেন তাঁর মতো করে, কথাশিল্পের নিয়মে, আখ্যানের বিতানিত বয়নে। বিভূতিভূষণের 'নাস্তিক' গল্পটিতে মৃত্যুর পদসঞ্চার, জীবন ও মৃত্যুর দ্বান্দ্বিক লীলা জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিনে'র কথা আমাকে মনে পড়িয়ে দেয়, নতুবা বিভূতিভূষণের প্রকৃতিলোক

যে-অর্থে 'সব পেয়েছির দেশ', জীবনানন্দ তেমন নন। মাণিকের প্রথমার্ধে প্রকৃতি, মৃত্যু ও নিয়তিচেতনার সহাবস্থান। জীবনানন্দ আর তারাশঙ্কর যথাক্রমে পূর্ববঙ্গ আর রাঢ়বঙ্গের ভূ-প্রকৃতিকে মানবজীবননাট্যের সেই আখ্যানের বাইরে প্রকৃতির কোনো স্বতন্ত্র চেহারা বা চরিত্র নিয়ে তাদের কোনো শিরঃপীড়া নেই। তারাশঙ্করের প্রতিষ্ঠাপর্বের 'ধাত্রীদেবতা'র পাশাপাশি তাঁর পরিণতি-পর্বের 'অরণ্যবহ্নি' অবলম্বনে আমাদের বক্তব্য প্রতিপন্ন হয়। 'অরণ্যবহ্নি'র ভৈরবী প্রসঙ্গটি মৃত্যুরূপা কালীকেই স্মরণ করায়—

'উঠলেন তিনি। ধীরে ধীরে তাঁর শোকার্ত হতাশা অসহায় বেদনা কেটে গিয়ে জেগে উঠতে লাগল একটা ক্রোধ একটা হিংসা। নেমে এলেন তিনি ওই চালাটা থেকে। তারপর সন্তর্পণে গিয়ে কালী ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন। দেখতে পেলেন দরজাটা খোলা হা-হা করছে। ভিতরটা বাইরের অন্ধকার থেকে গাঢ়তর। ভৈরবী একখানা ভারী ওজনের পাথর তুলে নিয়ে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে ঘরের দরজায় স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ঘরের চারিপাশে খুঁজছেন তিনি। ওই কি! ওই সে! দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে—

'মুহূর্তে ক্রোধে আত্মহারা হয়ে পাথরটা তুলে মেরেছিলেন—পরক্ষণেই নিজে চিৎকার করে উঠেছিলেন—মা—

'খেয়াল হয়েছিল—কালীমূর্তি! কালো নিবিড়তম তমসার পুঞ্জীভূত আদ্যাশক্তির মূর্তি যে। কালীমূর্তিটিও সশব্দে ভেঙে পড়েছিল—তিনিও আবার পড়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন।'

বস্তুত, ঋতু হিসাবে বৈশাখ তারাশঙ্করের রচনাবলীতে ফিরে-ফিরে আসে। রবীন্দ্রনাথ বীরভূমবাসী হওয়ার পরে রবীন্দ্রসাহিত্যও বৈশাখ অনেক বেশী আবেদনময়। বৈশাখ তাঁর প্রিয়জনকে হরণ করেছিল অপঘাতের মাধ্যমে। রবীন্দ্রানুরাগী-তারাশঙ্কর, বীরভূম-অনুরাগী তারাশঙ্কর বৈশাখের প্রেক্ষিতেই সোচ্চার—

'বৈশাখ মাস—গতরাত্রে এত ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে—কারুর চালা উড়েছে, কারুর ঘরের খানিকটা উড়ে গেছে। রতন মাঝির বাড়িখানা একটেরে, জঙ্গলের গা ঘেঁষে; অবশ্য গাঁয়ের কাছাকাছি জঙ্গলের গাছপালাগুলি সবই ছোটো ছোট, তাও একটা ছোটো গাছ মাঝ বরাবর মুচড়ে ভেঙে রতনের ঘরের চালের মাথায় ঝুঁকে পড়েছে। একেবারে ভেঙে পড়লে চালাখানা মচকে যেত।

কিংবা হয়তো ভেঙেও যেতে পারত। সকালে এতক্ষণ পর্যন্ত পাটকাম কারুর হয়নি। কাল রাত্রেই বাজটা যখন পড়েছিল, তখনই সকলে বুঝতে পেরেছিল বাজটা পড়ল জহর সর্দার সেই সব থেকে উঁচু গাছটার মাথায়।'

পুনশ্চ, বৈশাখ—প্রকৃতি-মানুষ-জীবনধারার সমস্তই একটিমাত্র সূত্রে গ্রথিত—

বৈশেখ মাস—দুপুর হয়ে এসেছে। বাড়িতে ভোরে ফ্যানভাত বেশ পেটভরে খেয়ে এসেছে। কিন্তু তা কখন হজম হয়ে কোথায় গিয়েছে তার ঠিক নেই। খিদেতে পেট চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু সঙ্গীরা ফিরে না এলেও খেতে ইচ্ছে করছে না। তার সঙ্গে খানিকটা গুড় আছে, লঙ্কা আছে, ক্ষেতের বুটকলাই আছে। কাল রাতে ফুল চারটি বুটকলাই ভিজিয়ে সিদ্ধ করে দিয়েছে। বেশ রতর হবে। সকলকে দিয়ে খাবে এই ইচ্ছে। কিন্তু এরা এখনও আসছে না। কী হলো? রাগ করলে? না, রাগ করবে না। কী করছে? দেখে বেড়াচ্ছে! দেখে বেড়াচ্ছে! শুধু দেখে বেড়াচ্ছে! থু থু! কী হবে দেখে? কী হবে?

তারা খরগোশ পাখি মেরে খায়—কুকুরগুলো জিভ হ্যা হ্যা করে বসে থাকে। টপটপ করে লাল পড়ে। এ তাই। থু!

আসে কয়েকটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি—নিসর্গ আর মানুষ তারাশঙ্করের সাহিত্যে কেউ কাউকে ছাপিয়ে যায় না। আর দুইয়ে মিলেই তো পূর্ণতা। জীবনানন্দের অননুকরণীয় ভাষায়—'কবিতা (এখানে প্রকৃতি) ও জীবন একই জিনিসেরই দুইরকম উৎসারণ'—

১। সকলে আকাশের দিকে তাকালে। আকাশ যেন কালচে সীসের আস্তরণে ঢেকে গেছে। গাছপালা সব স্থির। পাতা নড়ে না। বড়ো শাল-গাছের মাথাটার দিকে তাকালে সিধু। সবুজ পাতাগুলোর গায়ে যেন ভুসো কালির আস্তরণ পড়েছে মেঘের ছায়ায়।

২। আবার একবার বিদ্যুৎ চমকাল। সিধু দেখলে কালো মেঘের গায়ে জ্বলন্ত রূপালী আঁকাবাঁকা হিজিবিজি দাগে কত কিছু যেন লেখা হয়ে গেল।

৩। —উঁ-হু। ফুল ভালো বেটে কিন্তুক মাতৃতে লারে হে!

—ই কি বুলছিস? ফুলের মতুন নাচতে কে পারে বুল? তু মাদল ধরলে তো আশিনের ধানগাছের মতুন হেলে পড়ে হে। বাওড়ে 'মুনগা' (সজনে গাছ) গাছের মতুন নাচে হে।

৪। বলেছি বাবু, ওই ঝড়ের রাতে কালীর থানের শ্মশানে তালবৃক্ষে বাজ পড়েছিল। ভট্চাজ বারণ করছিলেন, তিনি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। সর্বাঙ্গে তাপ লেগেছিল।

সে ছবি আমার মনশ্চক্ষের সামনে যেন অতীতের যবনিকা তুলে দিল। ১৮৫৪ / ৫৫ সালের এদেশের জ্যৈষ্ঠ শেষের রোদে পোড়া লাল মাটি ভেসে উঠল। মধ্যে মধ্যে শালগাছের ঝোপ-ভরা খানিকটা জায়গা—তারপর খানিকটা শালবন—তারপর শুধু প্রান্তর—মধ্যে মধ্যে গ্রাম, আবাদী জমি—তার মধ্য দিয়ে চলে গিয়েছে লাল কাঁকুরে মাটির উপর গরুর গাড়ির চাকায় গরু বাছুরের পায়ের ক্ষুরে মানুষের পায়ে পায়ে তৈরি লাল ধুলাচ্ছন্ন পথ। বৈশাখের সেই ভয়ংকর কালবৈশাখীর পর আরো একটা দুটো ঝড় হয়েছিল। তারপর দ্বাদশ সূর্যের উদয়ে পৃথিবী যেন ঝলসে গিয়েছে। লাল ধুলো উড়ছে ঘূর্ণির পাকে পাকে।

গভীর রাত আর কৃষ্ণপক্ষ, বজ্রপাত আর 'কারণ,' ভয়ংকর কালবৈশাখী, কাঁকুরে মাটি, শালবন : সমস্তটা জড়িয়ে তান্ত্রিক বীরভূমের কণ্ঠের রুদ্রাক্ষ-মালা। এখানেই তারাশংকরের নিসর্গসন্দর্শন তাঁর জীবনদর্শনেরই সঙ্গে ওতপ্রোত।

যেমন, নিম্নোক্ত অংশটিতেও প্রকৃতি অর্থাৎ কালিকাপ্রতিমা অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মৃত্যুবিধানের দিকে অগ্রসর :

গভীর রাত্রি। অন্ধকার পক্ষ। অরণ্যের অন্ধকার গাঢ়তর ; যেন চামড়ার মতো পুরু। বড়ো বড়ো সব গাছগুলোর উপরের ডালপালা পাতার তলায় ছোটো বড়ো গাছগুলোর গুঁড়িগুলোকে অন্ধকারে গড়া স্তম্ভের মতো মনে হচ্ছে। বনটা থমথম করছে। সে এক বিচিত্র থমথমে ভাব। কারণ অজস্র ঝিল্লীর শব্দতরঙ্গ অবিচ্ছিন্ন অবিরাম একটানা বয়ে যাচ্ছে শব্দের ঝরনার মতো তবু মনে হবে—মানুষের মনে হবে কি নিদারুণ স্তব্ধতা।

তিনি নাকি তাদের কালকেতু আর বিরূপাক্ষ বলে চিনেছিলেন। ওই ঝড়ের রাতে তিনি প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন চণ্ডীর কাছে। এবং বলেছিলেন—তুদের লেগে বসে আছি রে আমি। সেই ঝড়ের রাত থেকে। আজ আলি, আয়—আয়। ওরে যে তোদের মরংবোঙ্গা সেই আমার ন্যাংটা বেটী! কালী মা। হাঁ রে। তেমনি তোদের চেহারা বটে। বটে! লে—তোদের লেগে আমি কবচ নিয়ে বসে আছি—

প্রকৃতিরূপা কালীর আত্মপ্রকাশ লাঞ্ছিতা নারীর প্রতিশোধ স্পৃহায়—কালী এখন আর কল্যাণী নন—

'মানব প্রকৃতির আদিম রুদ্র প্রকাশ। এখানে ন্যায় অন্যায়ের বিচার অচল।

সমাজ এখানে শহরের মতো প্রাণহীন—নিদারুণ আক্রোশে তার বুকের উপর অত্যাচারিতের আশ্চর্য অভ্যুদয় তাণ্ডব নৃত্য করে। না, সমাজ এখানে সব নয—অত্যাচারিতের অভ্যুদিত শক্তি—সেও লজ্জাহতা কালী কল্যাণী নয।

আদিম ক্ষুব্ধ প্রকৃতির রুদ্ধ আক্রোশ কোনো বিধান মানে না।

ফুল নামের মেয়েটি, সাঁওতাল অভ্যুত্থানের নায়ক সিধু বলে গেছে তাকে ফাঁসির প্রাক্ মুহূর্তে, 'ফুল, কাঁদিস্ নাই, রুকনিকে এলে বলিস্ '। ভৈরবীর কথা মনে রেখে সিধুপ্রিয়া রুকনি যজ্ঞের আযোজন করেছিল। যদি সিধু ফিরে আসে। যজ্ঞের আযোজনে ফুল সাহায্য করেছিল রুকনিকে—

'ফুল দিযেছিল তাকে ঘি। শুধু ঘি নয, অন্য উপকরণও দিযেছিল। কিন্তু বাবু, অল্পবুদ্ধি সবল জাতের মেযে আর মাথাও ঠিক ভালো ছিল না। যজ্ঞি করতে গিযে এমন করে ঘি ঢাললে যে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠে লাগল চারিপাশের শুকনো ঘাসে। তার উপর বোশেখ মাস। নিজেও ছিল উপোস করে। দেখতে দেখতে বড়ো বড়ো শুকনো ঘাসে আগুন লাগল বেড়া আগুনের মতো। মেয়েটা নাচতে লেগেছিল আগুনের এমন শিখা দেখে। ...সেই আগুন লেগেছিল রুকনির কাপড়ে। তাতেই সে পুড়ে মরেছিল।

এতক্ষণ যা-কিছু বলা হলো, এ-কি নিসর্গেরই ফল? তারাশঙ্করের নিসর্গভাবনার বৃত্তান্ত? বলা কঠিন। জলের মধ্যে চাঁদের প্রতিবিম্ব তো আর চাঁদ নয। চাঁদ নয, ঠিকই, তবু চাঁদই যে, তা-ও তো আর সম্পূর্ণ মিথ্যা নয়। উদক চাঁদ জিম, সাচ ন মিছ্ছা!

———

তারাশঙ্করের সাহিত্যভাবনা ঃ তত্ত্বে ও প্রয়োগে

ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়

উপন্যাস বাতীত তাবাশঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায 'সাহিত্যেব সত্য' (১৯৬০), 'ভাবতবর্ষ ও চীন' (১৯৬৩), 'ববীন্দ্রনাথ ও বাংলাব পল্লী' (১৯৭১) নামে তিনটি প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা কবেছেন। ১৩৬৫-তে প্রকাশিত 'মস্কোতে কযেকদিন' তাবাশঙ্কবেব ভ্রমণকাহিনী মূলক গ্রন্থ। 'ইতিহাস ও সাহিত্য' একটি প্রবন্ধ মাত্র। তাছাড়া তাঁব আত্মজৈবনিক ও আত্মস্মৃতিমূলক বচনা হলো— 'আমাব কালেব কথা' (১৩৫৮), 'কৈশোব স্মৃতি' (১৩৬৩), 'আমাব সাহিত্য জীবন' (প্রথম পর্ব ১৩৬০, দ্বিতীয পর্ব ১৩৬৯)। 'সাহিত্যের সত্য' ব্যতীত অন্যত্র তাবাশঙ্করেব সাহিত্য ভাবনাব প্রতিফলন ঘটে নি। ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত 'ভারতবর্ষ ও চীন' তারাশঙ্করেব দিনলিপিভিত্তিক চীন ভ্রমণেব কাহিনী। অবশ্য আলোচ্য গ্রন্থে লেখকেব চীন ও কমিউনিজম সম্পর্কিত মনোভঙ্গির প্রতিফলনে ঘটেছে। 'ববীন্দ্রনাথ ও বাংলাব' পল্লী' বিশ্বভাবতী বিশ্ববিদ্যালয কর্তৃক আহূত তারাশঙ্কবেব নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান। ১৯৭১ সালের ১৪ থেকে ১৮ ফেব্রুযাবি তাবাশঙ্কব যে চাবটি বক্তৃতা দেন তাই এখানে সংকলিত। 'প্রাবম্ভিক নিবেদন ও ভূমিকা, 'ববীন্দ্রনাথ ও পল্লীব মানুষ' 'ববীন্দ্রনাথ ও পল্লী সমাজ', 'ববীন্দ্রনাথ ও পল্লী প্রকৃতি' এই চাবটি বক্তৃতা এখানে সংকলিত হযেছে। শেষ প্রবন্ধটি 'রবীন্দ্রনাথ ও ভাবতবর্ষ' ববীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে রচিত ও প্রকাশিত হলেও ভাবসাদৃশ্যহেতু উক্ত গ্রন্থেব অন্তর্ভুক্ত হয।

ববীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী গ্রন্থে যদিও তাবাশঙ্কব রবীন্দ্রনাথ এবং পল্লীব মানুষ, সমাজ ও প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা কবেছেন এবং 'লেখকেব নিবেদন' অংশে নিজেকে 'সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক এবং 'একজন কথা-কাব মাত্র' বলেছেন প্রথম বক্তৃতাব 'প্রাবম্ভিক নিবেদন' অংশে. তবুও প্রসঙ্গত এমন অনেক মন্তব্য কবেছেন যা তার সাহিত্য ভাবনাব অন্যতম প্রমাণ রূপে উপস্থিত হতে পারে। ববীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা কালে তাঁব মতামত সাহিত্য ভাবনাবও পবিচয় বহন কবে এবং উক্ত অংশগুলি ক্রমানুসাবে সজ্জিত করলে তাঁব সাহিত্যাদর্শের পবিচয অপ্রকাশিত থাকে না।

১০ শিল্পীব এই রুচি ও প্রবণতাই তাব সীমা ও গণ্ডি নির্দিষ্ট করে দেয। এই রুচি ও প্রবণতা যেমন শিল্পীকে তার নিজস্ব দৃষ্টি, তার থেকে সঞ্জাত দর্শন,যা জীবনবোধেব নির্যাস এবং সৃষ্টিব উত্তাপ যোগায তেমনি সে আপনার নিজস্ব বিশেষত্ব দিযে শিল্পীকে খণ্ডিতও কবে। এব ফলশ্রুতি সাহিত্যেব পাতায় পাতায। তবে তাব ফল সাহিত্যের পক্ষে অশুভ হয নি। তাতে অভিনব বৈচিত্র্যেব বিবিধ উপকবণে সাহিত্যেব ভাণ্ডাব উজ্বলই হয়েছে। বৈচিত্র্যই নূতন মহার্ঘতাব বোধ সংযুক্ত কবেছে।'

[রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী, প্রথম বক্তৃতা, ভূমিকা]

২০ "শিল্পের যে পরিধি পৃথিবীব ধূলিজাল থেকে উর্ধ্বলোকে জ্যোতিষ্ক-লোক পর্যন্ত প্রসাবিত সেখানে সেই বিশাল বাজ্যে কোন শিল্পী শুধু ধূলোব মুঠো নিযে খেলা কবেছেন, কেউ বা ধূলোব উপরে বসে ধূলোর মুঠোর সঙ্গে চোখের জল মিশিযে মূর্তি গড়েছেন। কেউ বা মাটিতে ধূলোয দাঁড়িযে আকাশেব উদাসীন মেঘকে উদাসীনেব মতোই দেখেছেন, কেউ বা আকাশ লোকেব অনন্ত জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীব দিকে তাকিয়ে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন কবেছেন। এঁরা সবাই শিল্পী, সার্থক শিল্পী। এক একজনের সৃষ্টিতে এক—এক আস্বাদ"। [পূর্বোক্ত]

ববীন্দ্র-কাব্যেব আলোচনা প্রসঙ্গে তাবাশঙ্কব ববীন্দ্র কাব্যেব মূল সুব নির্ণয কালে বলেছেন—"দৃষ্টিব সম্মুখে প্রসাবিত, প্রত্যক্ষ সৃষ্টির সৌন্দর্য চেতনা এবং সেই চেতনাব ফলশ্রুতি স্ববূপ এই সৃষ্টির ভঙ্গুব মৃৎপাত্রে তজ্জনিত আনন্দে অমৃত বস পান।" অর্থাৎ তাবাশঙ্কবের সাহিত্যাদর্শ অনেক পবিমাণে সৌন্দর্যচেতনা কেন্দ্রিক। আব এ সৌন্দর্যেব ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু অনেকখানি ববীন্দ্রনাথেব আনন্দবাদী ভাবধাবায নিষিক্ত সৌন্দর্য চেতনা। তাবাশঙ্কবেব সাহিত্যভাবনা কোনো বিচ্ছিন্ন ভাবনাকে কেন্দ্র কবে কবে গড়ে ওঠে না। কবি-শিল্পীব মননে উদ্ভাসিত সৃষ্টি ও নির্মাণের জগত সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনায যেমন লব্ধ, তেমনি আবাব মহত্তম ও বৃহত্তম ধ্রুববোধেব চেতনায তা স্পন্দিত। পূর্বোক্ত গ্রন্থেব দ্বিতীয বক্তৃতা অর্থাৎ 'ববীন্দ্রনাথ ও পল্লীব মানুষ' অংশে এ প্রসঙ্গে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাবে বলেন—"মহাকবিব যে কোনো বচনা বা অভিজ্ঞতা, তা যত ক্ষুদ্র পবিসবের মধ্যেই বিধৃত হোক বা যত সামান্যই হোক বা কোন বিশেষ বা বিশিষ্ট ঘটনাকেন্দ্রিক হলেও তা প্রায সব সময়েই মানব অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ কি পবোক্ষভাবে

এক স্থির ধ্রুববোধের স্পর্শ বহন করে, এবং তাকে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে গেলে তাকে তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী অচ্ছিন্ন তপস্যায় অর্জিত সেই বৃহৎ ও স্থির উপলব্ধির আলোকের সম্মুখে স্থাপন করে দেখতে হবে।" তারাশঙ্কর শিল্পসাধনাকেই একমাত্র সাধ্য বিষয় বলে মনে করেন না। তিনি মনে করেন, 'শিল্পসাধনার সঙ্গে জীবনসাধনা অঙ্গাঙ্গীভাবে ও অচ্ছেদ্য রূপে জড়িত। সাধারণ শিল্পীর ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর আনন্দকে শিল্পের ফলশ্রুতি হিসেবে মনে করেছেন। শিল্পী কে সাধারণ ও অসাধারণ এই পর্যায়ে বিভক্ত করা সম্পর্কে সংশয় আছে। সাধারণ শিল্পীর ক্ষেত্রে আনন্দ যদি একমাত্র ফলশ্রুতি হয়, তবে অসাধারণ শিল্পীর ক্ষেত্রে ফলশ্রুতি কী ? তারাশঙ্কর কথিত এ আনন্দের স্বরূপই বা কী! আসলে তারাশঙ্কর সাহিত্যভাবনার ক্ষেত্রে প্রচলিত পথের পথিক, তিনি ভারতীয় আলংকারিকদের মতো মনে করেন, 'আনন্দাস্বাদ ব্রহ্মস্বাদ সহোদর' ঃ সাহিত্য যেখানে মানবিক কল্যাণ অকল্যাণের সঙ্গে সম্প্রতি ও সর্বকালে জড়িত সেখানে মানবিক কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে সম্পর্ক নিরপেক্ষ আনন্দজনকতা একালের সাহিত্যসেবীকে বিচলিত করে এবং বিশেষত তারাশঙ্কর যখন বলেন—"সেখানে মানব জীবন রহস্যের তীব্র আস্বাদ থেকে যে আনন্দের জন্ম হয় তা বৃহৎ অর্থে মানবিক কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে সম্পর্ক নিরপেক্ষ।"

'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থেও তারাশঙ্করের সাহিত্য ভাবনা নানারূপে প্রকাশিত। অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত মনে করেছেন, তারাশঙ্করের বহির্মুখিতা তাঁকে কল্লোলীয়দের সঙ্গে মিশতে দেয় নি। তারাশঙ্কর কল্লোলীয় সাহিত্যকে 'বর্তমানকে ভেঙে চুরে তাকে অগ্রাহ্য করে শূন্যবাদের মধ্যে জীবনকে শেষ করার কল্পনা' বলে মনে করেছেন। কিন্তু কল্লোল যুগের সাহিত্য তো শুধু ভাঙার নয়, তা সৃজনমূলকও বটে। অর্থাৎ তারাশঙ্করের সাহিত্য ভাবনায় কল্লোলীয় আদর্শ অগ্রহনীয় ছিল। স্বীয় সাহিত্যাদর্শ সম্পর্কে মন্তব্যকালে তিনি 'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থের প্রথম পর্বে বলেছেন— "উত্তাল উর্মিলতার মধ্যে তটভূমিতে আছড়ে পড়ে ফিরে গিয়ে তটভূমি ভেঙে এবং আবর্ত সৃষ্টি করেই তৃপ্তি পাওয়ার মতো মনের গঠন আমার ছিল না। ওই উর্মিলতার নীচে যে স্রোতোধারা প্রবাহিত হয়, যে স্রোত অহরহ সমুদ্রের বুকের ভিতর প্রবাহিত হয় আপনার বেগে আপনার পথে, আমার মনের গতি অনেকটা সেই ধরণের"। 'অন্তরের আত্মা'কে অনুভব করাই তাঁর প্রকৃতিগত

সাহিত্যভাবনা। চোখে দেখা মানুষকে তিনি যেভাবে সাহিত্যে রূপায়িত করেছেন তাকে অভিজ্ঞতামূলক সাহিত্যাদর্শ রূপে চিহ্নিত করা যায়। এ প্রসঙ্গে তাঁর 'পাষাণপুরী' উপন্যাসের উল্লেখ করা যায়—'পাষাণ পুরীর অন্যতম নায়ক কালী কর্মকার আমার চোখে দেখা মানুষ'। জীবনের অভিজ্ঞতাজাত উপলব্ধি যে সাহিত্যে রূপায়িত হবে এবং সাহিত্যে সামাজিক সাম্য যে রূপায়িত হবে এমন কোনো তত্ত্বাদর্শ তারাশঙ্করের মনে স্থান পায় নি। অর্থনৈতিক সাম্য হলেই যে পরম কাম্যকে পাওয়া যাবে—এ তত্ত্বাদর্শে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। 'চৈতালী ঘূর্ণি'র আলোচনা প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর স্বয়ং বলেছেন—"চৈতালী ঘূর্ণি' বৈশাখের অগ্রদূত এবং আমাদের জীবনেই সেদিন চৈত্র দ্বিপ্রহরে ছোটো স্বল্পায়ু ঘূর্ণিগুলি অদূরবর্তী কালবৈশাখিরই ইঙ্গিত দিচ্ছে এটুকু আমার থিসিস ছিল না—ছিল জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি ★★★ এই দেশের মানুষ যাদের আমি জানতে চিনতে চেষ্টা করেছি—আমি নিজেই যাদের একজন, তাদের আত্মার তৃষ্ণা থেকে রুচি থেকে বুঝতে পেরেছি সামাজিক সাম্যই সব নয়—এর পরও আছে পরমকাম্য ; সেই পরম কাম্য অর্থনৈতিক কাম্য হলেই পাওয়া যাবে না। অন্তরের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, পরিশুদ্ধতার মধ্যেই আছে সেই পরম কাম্য সুখ ও শান্তি। ঈর্ষা বিদ্বেষ থেকে অহিংসায় উপনীত হওয়ার মধ্যেই আছে পূর্ণ মানবত্ব, সত্যকামের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেই অবস্থায় উত্তরায়ণে, পূর্ণ মানবত্ব অর্জনের ভিত্তির উপর। সমাজকে যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে ছাঁচে ফেলা মানুষ তৈরী করে সে অবস্থায় উপনীত হওয়া যায় না।" তারাশঙ্করের সাহিত্যাদর্শে কীর্তির চেয়ে কীর্তিমান বড়ো, কাব্যের চেয়ে কবি, শিল্পের চেয়ে শিল্পী। 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ লিখেছেন—"কীর্তির চেয়ে কীতিমান আমার কাছে বড়ো। সিদ্ধিকালের চেয়ে সাধক বড়ো। কাব্যের চেয়ে কবি বড়ো। শিল্পের চেয়ে শিল্পী বড়ো।" তারাশঙ্করের সাহিত্য ভাবনার বৈশিষ্ট্য সূত্রাকারে নিম্নরূপ—ক. কল্লোলকেন্দ্রিক চেতনার অস্বীকার। খ পাশ্চাত্যমুখীনতার পরিবর্তে দেশ-সংস্কৃতিও সভ্যতার পারিপার্শ্বিকতার স্বীকার। গ কাল-প্রবাহে পরিবর্তনের স্রোতে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক জীবনের প্রতি মোহ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত তারাশঙ্করের রচনাধারার বৈশিষ্ট্য হলো সামন্তব্যবস্থার পাশাপাশি নতুন বণিক সভ্যতা, মহাযুদ্ধ জনিত নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পরিবর্তন কেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থার পরিচয়কে

বিশ্বস্তার সঙ্গে অংকন কবা। তাঁব জীবনদৃষ্টি তাঁব সাহিত্যভাবনায প্রতিফলিত—তাঁব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যন্ত্রণাও তাঁর সৃষ্টির ইতিহাসেব সঙ্গে জড়িত। অবশ্য একথাও মনে বাখতে হবে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পববর্তীকালে তাঁব মনোজগতে আদর্শগত পরিবর্তন না ঘটলেও জীবনদৃষ্টিব পরিবর্তনেব সূচনা হযেছিল। ফলে তাঁব সাহিত্যভাবনা যখন উপন্যাসে প্রায়োগিক দিক পেল তখন নতুন যুগেব পবিবর্তনেব প্রবাহকে তিনি তাঁব বচনার বিষয়ীভূত কবেছেন, নতুনের জয়বার্তাও ঘোষিত হযেছে, প্রাচীনকে পবাভূত করে নতুনের প্রতিষ্ঠাও হযেছে। কিন্তু তাবাশংকবেব শিল্পীমন তাঁব সমাজচেতনাব সর্বাত্মক প্রকাশ ঘটিযেও প্রাচীনের প্রতি সহানুভূতিশীল চিত্তেব যে পরিচয় দিযেছে যেখানে শিল্পীমানসেব বিষন্ন কবুণ দ্বিধান্বিত রূপও প্রকাশিত।

তাবাশংকবেব সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থ হলো 'সাহিত্যের সত্য' (১৯৬০)। অবশ্য এ গ্রন্থের সবগুলিই সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত নয। আলোচ্য গ্রন্থে সমালোচনামূলক স্মৃতিচাবণামূলক নানা জাতীয বচনার সমাবেশ ঘটলেও বিশুদ্ধ সাহিত্যতত্ত্ব বিষযক প্রবন্ধের অনুপস্থিতি লক্ষ্যগোচব। অবশ্য প্রবন্ধগুলিতে পৃথকভাবে সাহিত্যতত্ত্বেব কথা বলা না হলেও সাহিত্য ভাবনা ইতস্তত ভাবে প্রকাশিত হযেছে। স্মৃতিচাবণামূলক বচনা 'লেখাব কথা'য সাহিত্যেব মধ্য দিযে নবজীবনেব কথা লেখাব যে প্রতিশ্রুতি উচ্চাবণ কবেছেন তা আসলে তাবাশংকবেব সাহিত্যভাবনাব ফলশ্রুতি। সাহিত্যে যে সত্যেব কথা মানুষেব কথা, বিশ্বাসেব কথা ইত্যাদি বলা হয তাদেব স্ববূপ সম্পর্কে তাবাশঙ্কব মন্তব্য কবতে গিযে বলেছেন—

১. মানুষ বলতে মানুষ নামক জীব নয—মনুষ্যত্বেব নীতিতে প্রতিষ্ঠিত ও বোধজাগ্রত মানুষ।"

[বাংলাব সংস্কৃতি ও সমস্যা।]

২. "অকপট স্বরূপে ব্যক্ত হওযাই তো সত্য"।

[ঐ]

৩. "বস্তুবাদেব মধ্যে এই আত্মা ব তপস্যাশক্তি স্থাপনেই মানব সভ্যতা মৃত্যুভয থেকে মৃত্যুঞ্জযীতায উত্তীর্ণ হবে বলেই আমাব বিশ্বাস।"

[বাংলা সাহিত্যেব মর্মবাণী]

৪. "সাহিত্য মানুষের, অন্যাযেব সঙ্গে মনুষ্যত্বে অধিষ্ঠিত সংগ্রামী মানুষেব।"

[আধুনিক কাল ও সাহিত্য।]

বাংলা সাহিত্য কেন এখনো পশ্চিমী সভ্যতার কাছে গ্রহণীয় হয় নি, তার কারণ নির্দেশ প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর 'বাংলা সাহিত্যের মর্মবাণী' প্রবন্ধে পশ্চিমী সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করেছেন। 'বাংলা তথা ভারতের তথা পূর্বের সাহিত্য বিশ্বমানবের আনন্দের ভোজে পরিবেশিত না হওয়ার কারণ, তারাশঙ্করের মতে, 'ভারতের বাণী তথা বাংলা সাহিত্যের মর্মবাণী অবৈরিতার, অহিংসার'। ১৯৬৫ সালে এশীয় লেখক সম্মেলনে প্রদত্ত 'বাংলা সাহিত্যের মর্মবাণী' ভাষণ প্রবন্ধে তিনি চিরন্তন সাহিত্যের চরিত্র নির্ণয় প্রসঙ্গে স্মরণীয় উক্তিতে বলেছেন—

"সে বাণী সত্যের, সততার, উদারতার, প্রেমের শুদ্ধতার, আলোকের।" স্বাধীনতা-উত্তরকালে যে ভোগবাদী জীবনাদর্শ, ঐতিহ্য অস্বীকার, স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার, যৌন-সর্বস্বতা বাংলা সাহিত্যকে ক্লেদাক্ত করে তুলছিল, তারাশঙ্করের দৃষ্টিতে তার রূপ ধরা পড়েছিল—১. "সাহিত্যে শিল্পে তারা সঞ্চারিত করতে চাইছে এই নাস্তিক্য বুদ্ধি, উগ্র হিংসাবাদের নিছক জৈব প্রবৃত্তি।"

২. "সত্য বলে ঘোষিত হচ্ছে জৈব ধর্মের ক্রোধ, হিংসা, লোভ। এই বিকারের নির্দেশে সুন্দর ও মঙ্গলের আশ্রয় সাহিত্যকে করে তুলতে চাইছে হিংসা চরিতার্থতার হাতিয়ার।" সাহিত্য বলতে তারাশঙ্কর কী বুঝেছেন তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তিনি 'আধুনিক কালও সাহিত্য' প্রবন্ধে ব্যক্ত করেছেন —"সাহিত্যই আমার কাছে শাস্ত্র যা মানুষকে সকল প্রকার বেদনা দুঃখ ও গ্লানির শাসন ও পীড়ন থেকে ত্রাণ করতে পারে।*** সাহিত্য আমার কাছে চায়ের পেয়ালার মত অবসর ও ক্লান্ত বিনোদনের পানীয় সামগ্রী নয়, সে আমার কাছে প্রাণরসদায়ী সঞ্জীবনী সুধা।" আলোচ্য বক্তব্যে তারাশঙ্কর সাহিত্যের কলাকৈবল্যতত্ত্বে আস্থা স্থাপন না করে জীবনের জন্য সাহিত্যের পক্ষে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে সমাজচেতনা, প্রগতিধর্মিতা, মার্কসবাদের প্রসার ইত্যাদি সম্ভবত তারাশঙ্করের পছন্দের ছিল না। সাহিত্যে এর প্রয়োগ ও প্রকাশ তার অনাকাঙ্ক্ষিত ছিল। 'আধুনিক কাল ও সাহিত্য' প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যে প্রগতিশীলতার বিরুদ্ধে তাঁর জেহাদ ঘোষিত হয়েছে—"তথাকথিত প্রগতিবাদের গালিগালাজ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আস্ফালন যত উচ্চ ততই প্রাণহীন। তাঁরা প্রাণধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি করতে গিয়ে আক্রোশ সর্বস্ব রচনায় রচনার প্রাণকে

বিসর্জন দিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁদের বহুল প্রচারিত সাহিত্যের সংজ্ঞা ও বিশ্লেষণ আজ আর কারুর অবিদিত নয়। গাঢ় দুর্যোগের মধ্যে যখন উচ্চারিত হতে শুনেছি—বরবাদ হোক সে সাহিত্য—রাজা নায়ক যে সাহিত্যের, সামন্ত জমিদার ধনী নায়ক যে সাহিত্যের, উচ্চবর্ণ নায়ক যে সাহিত্যের, আজকের নতুন সাহিত্যের অভ্যুদয় চিরজীবী হোক—দরিদ্রের সাহিত্য, পতিতের সাহিত্য। মিথ্যা অতীতের তপস্যার সাহিত্য, সত্য একমাত্র বিপ্লবের সাহিত্য। জনগণের যুগে সত্য একমাত্র গণসাহিত্য। প্রথম অবস্থায় সেই দুর্যোগের বিভ্রান্তির মধ্যে এর উত্তেজনা মানুষকে স্পর্শ করেছিল। কিন্তু দুর্যোগের কাল ধীরে ধীরে যতই অবসান হয়ে আসছে—ততই প্রশ্ন জাগছে। ওই ধ্বনিসর্বস্ব সাহিত্য ও সঙ্গীতের উত্তেজনা আজ আর জীবনে সুর তুলতে পারছে না, সাড়াও জাগাচ্ছে না।"

'সাহিত্যের সত্য' প্রবন্ধেও তিনি প্রায় একই অভিযোগ-এর উপস্থাপিত করেন যখন বলেন—"আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আত্মিক লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে কয়েকটি কথার বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে ; যথা বাস্তবতা, প্রগতি, গণচৈতন্য সমাজচেতনা ইত্যাদি। বহুবিধ রাজনৈতিক বাদবিসম্বাদের বাদ্যভাণ্ড সহযোগে যখন সাহিত্যের এইসব ধ্যানমন্ত্র সমালোচকের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে থাকে তখন সাহিত্যের স্বরূপ ঘুলিয়ে যায়"। সাহিত্য ও সাহিত্যিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে যে বক্তব্য তিনি উপস্থিত করেন তা কিন্তু তার পূর্ববর্তী ধারণার সঙ্গে মেলে না। তিনি সাহিত্যের উপযোগিতাবাদকে মানেন, অথচ সাহিত্যে গণচেতনার উপস্থিতি গ্রহণীয় নয়—এমন চিন্তা পরস্পর বিরোধিতার নামান্তর মাত্র। তাঁর মত—"সাহিত্যের মধ্যে আমরা শুভ উদ্দেশ্যের আশা করব" এবং সাহিত্যের স্বরূপ ও ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাচেতনা যেন তাঁকে বঙ্কিম-অনুসারী সাহিত্যতাত্ত্বিক রূপে চিহ্নিত করিয়ে দেয়। তিনি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় আনন্দবাদী, রসবাদী নন ; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মত তিনি উপযোগিতাবাদী ও প্রায়োগিক, তাঁর মতে, রাজনীতি, বুদ্ধিবাদ ইত্যাদি অপেক্ষা হৃদয়বত্তা ও প্রেমভাবনা অনেক বেশি। তারাশঙ্কর মনে করেছেন—"সাহিত্যে শিল্পে সঙ্গীতের মধ্যেই বাজবে জীবন-ভগীরথের শঙ্খ। মহাজীবনে জীবন্ময় হয়ে উঠবে মানুষ, প্রকৃতির গড়া পৃথিবীর নতুন গঠনে সজ্জায় হয়ে উঠবে পরম সুন্দর ; আবির্ভাব হবে কল্যাণের, জ্যোতির্ময়ের। জয় হবে মানবতার, জয় হবে জীবনের"।

তারাশঙ্কর রবীন্দ্রদর্শনে অভিস্নাত বলেই মানবতার জয় ঘোষণাই তাঁর সাহিত্যভাবনার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যরূপে দেখা দেয় তিনি বিশ্বাস করেন—

> "অমানুষের সঙ্গে মানুষের সংগ্রামের কাহিনীই সাহিত্যের মর্মকথা" কোনো 'ধ্বনিপ্রধান সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক সংজ্ঞা'য় তারাশঙ্কর অনুপ্রাণিত না হলেও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—সাহিত্যের "সংগ্রাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অন্যায় ধর্মী সকল তন্ত্র যা মানুষের মনুষ্যত্বকে খর্ব করে তার বিরুদ্ধে। রাজতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র, এমনকি দারিদ্র্যতন্ত্রের বিরুদ্ধেও"। 'শিল্পোৎকর্ষ, সৃজনের দ্বারা মানবাত্মার মুক্তিই সাহিত্যস্রষ্টার' ঐতিহাসিক দায়িত্ব—তারাশঙ্কর একেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মৌল লক্ষণ বলে মনে করেন, যা ধ্বনিত হয়েছিল তাঁর কণ্ঠে ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণে—"The spirit of the writer is the song of freedom. Although the writer cannot ignore the politlcal struggle he has a deeper obligation to himself and to humanity which is to liberate the spirit of man through excellence of creation"

॥ ২ ॥

তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যভাবনায় মূলত বাস্তবতার কথা বললেও তিনি মনে করেন, বাহ্যবাস্তবতা ও দৈনন্দিন জীবনবাস্তবতার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ রচনা করাই বাস্তববাদী সাহিত্য সৃষ্টির একমাত্র শর্ত নয়। প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতার বিবরণ রচনার সমান্তরালভাবে লেখককে সমসাময়িক সমাজ-প্রতিবেশ—রাজনীতি ও জীবনের সংকটকে তুলে ধরতে হবে। কথাসাহিত্যে গল্পে উপন্যাসে জীবনলীলা মুখ্য বিষয়বস্তু হলেও জীবনের পটভূমিকার যে স্থান-কাল আছে, যার সঙ্গে সমাজনীতি ও রাজনীতির বন্ধন অবিচ্ছেদ্য, তাকেও রূপায়িত করতে হবে। তাই তিনি জীবনের বাস্তবতার বিবরণ যেমন প্রদান করেছেন তেমনি সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিফলনও তাঁর উপন্যাসে ঘটিয়েছেন। শুধু বাস্তবতার উপস্থাপনামূলক সাহিত্য তাঁর কাছে মহৎ সাহিত্য নয়, সাহিত্যে বাস্তবতার উপস্থাপনা প্রসঙ্গে, তিনি সৃজনশীল কল্পনারও অন্যতম প্রয়োগ কর্তা। তাঁর উপন্যাস এ বক্তব্যের পক্ষে

সাক্ষ্য দেয়। যে সাহিত্যে অশিক্ষিত, অন্ত্যজেব জীবন রূপায়িত হয নি, সে সাহিত্যকে তিনি জনবিচ্ছিন্ন আত্মকেন্দ্রিক সাহিত্য বলে মনে কবেছেন। ফলে তার সাহিত্যে আমবা বেদে, কাহাব, সদ্‌গোপ, সাঁওতাল, পটুয়া, বাগ্দী, ভল্লা, বাউরি, বায়েন, ডোম, কোড়া ইত্যাদি জনজাতিব চিত্রকে উপন্যাসে বূপায়িত হতে দেখি। তারাশংকবেব উপন্যাসে পল্লীসমাজ ও ব্যক্তিজীবন-বাস্তবতার সঙ্গে সমাজবাস্তবতাব চিত্রও আছে। তারাশংকরের পল্লীজীবনে সমকালীন বাজনৈতিক অভিঘাতেব নির্দেশ লক্ষ্য কবা যায়। তাঁব উপন্যাসে একটি বিশেষ সময়ের, একটি বিশেষ অঞ্চলেব জীবনবাস্তবতাব সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ কালেব বিশেষ ঘটনাব দ্বাবা আলোড়িত সমাজকেও পাওযা যায়। অর্থাৎ তাঁব কথাসাহিত্যেব সমাজ কাল নিরপেক্ষ নয়।

তাবাশংকব বন্দ্যোপাধ্যায বাংলাব রাঢ় ভূখণ্ডেব পল্লী জীবনের ‘অবিকল উপস্থাপক’ ও বিশ্বস্ত দলিল বচয়িতা হলেও, তাঁর পল্লীপ্রকৃতি ও মানুষ চিবকালের প্রকৃতি বা মানুষ নয়, তাবা বিশেষ স্থানে ও কালে স্থাপিত। তিনি পল্লীজীবন সম্বন্ধে কোনো পূর্বাপর ধাবণা নিযে পল্লী-জীবন উপস্থাপনা করেন নি। তাঁর পল্লী সমযের রাজনীতি—সামাজিক ও অর্থনীতির আলোড়নেব দ্বারা আলোড়িত। তিনি বাস্তবতাব অবিকল উপ-স্থাপনা নীতির অন্যতম প্রবক্তা হলেও সর্বক্ষেত্রে তাঁর গৃহীত পদ্ধতিও এক নয।

তাঁর উপন্যাসে পল্লীব সমস্ত শ্রেণীর মানুষের স্থান আছে। তাঁব উপ-ন্যাসেব জমিদাববা ক্ষয়িষ্ণু, অর্থনীতিগতভাবে দুর্গত, প্রখর আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন। এদেব মধ্যে যাবা প্রাচীন তারা দুশ্চবিত্র, নাবীলিপ্সু, অত্যাচারী, নবীনবা আদর্শবাদী, সমাজসংস্কারক, উদাব মানবতাবাদী এবং শেষ পর্যন্ত তাবা কোনো না কোনো বাজনীতিক বিশ্বাসে দীক্ষিত হয। তারাশংকবেব উপন্যাসেব সাধারণ গৃহস্থবা স্বচ্ছল হলেও, নানা প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রক্রিযায় তাদের জীবন জর্জবিত। অন্ত্যজ মানুষেব ব্যাপক উপস্থিতি এবং তাদের ব্যাপকতব বূপ তারাশংকব ব্যতীত অন্য কোনো লেখকেব রচনায প্রায দুর্লভ। তাবাশংকবেব লেখায় পল্লীবাংলাব দাবিদ্র্য এবং দবিদ্র মানুষেব বেঁচে থাকাব সংগ্রামেব চিত্র অংকিত। তাঁর কথাসাহিত্যেব পল্লীজীবন জমিদাব ও মহাজনেব শোষণে পীড়িত, দুর্ভিক্ষ-খবা-বন্যা-ঝড়ে বিধ্বস্ত, কলেরা-বসন্ত জলাভাব ও অগ্নিকাণ্ডে অনপনেয দুর্গতি দুর্দশাব শিকাব, তবুও সেখানে

নানা ঋতুব উৎসব, বার ব্রত, গাজন-চড়ক, ঘেঁটু-মনসা ইত্যাদি প্জা ও নানা সামাজিক উৎসব। তুলনাম্লকভাবে বিভূতিভূষণেব পল্লীজীবনেব শান্ত-স্নিগ্ধ শ্যামশ্রী ব্প আমাদেব মোহগ্রস্ত কবে। তাবাশঙ্করেব পল্লীজীবন বেঁচে থাকাব অবিবাম সংগ্রামে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তাঁর পল্লীজীবন স্থিব ও অপাবিবর্তনীয নয়, সময়ের চাপে পবিবর্তনশীল। তাঁব 'নীলকণ্ঠ' উপন্যাস সাধরণ পল্লীজীবনের ধ্বংসেব কাহিনী সেখানে দারিদ্র্য, দ্র্যোগ, ব্যভিচাব, অনৈতিকতা; এখানে পাবিবাবিক জীবন বাস্তবতার সঙ্গেই বৃহত্তব সমাজবাস্তবতাব র্পও অন্পস্থিত নয়। 'প্রেম ও প্রযোজন' উপন্যাসে জমিদাব শাসিত গ্রামেব প্রেক্ষাপটে নাযকেব পল্লীসংস্কাব, নারী-প্রুষেব সমানাধিকার বিষযক তর্ক ইত্যাদি বাংলার বিশ শতকেব দ্বিতীয ও তৃতীয দশকেব প্রেক্ষাপটটি স্মবণ কবিযে দেয। তাঁর উপন্যাসে আদর্শবাদ ও বিয়ালিজম্ দ্ই-ই আছে, তবে জনপ্রিয হযেছে বিযালিজমেব প্রাধান্যযুক্ত উপন্যাস [যেমন কবি, হাঁস্লি বাঁকেব উপকথা ইত্যাদি]। 'ধাত্রী-দেবতা' আদর্শবাদী শিবনাথেব বিকশিত হয়ে ওঠাব কাহিনী—আব সে কাহিনী আদর্শবাদম্লক উপন্যাসেব বক্তব্য হলেও সেখানে সামাজিক বাস্তবতা অন্পস্থিত নয। সমাজজীবনেব ভগ্নদশা, জাতিব অধঃপতন, দেশমাতৃকার পবাধীনতা ইত্যাদি তাকে বাজনীতিপ্রবণ করে তোলে। 'ধাত্রীদেবতা'য যেখানে ক্ষযিষ্ণু জমিদার শ্রেণী থেকে উঠে আসে গান্ধীবাদী নাযক, 'কালিন্দী'তে সেখানে সেই শ্রেণী থেকে উঠে আসে সমাজতান্ত্রিক সাম্যবাদী নাযক অহীন্দ্র। এ উপন্যাসে পাবিবর্তনম্খী পল্লীজীবন ও সমাজেব ব্প অন্পস্থিত নয। 'গণদেবতা' উপন্যাসে প্রথম বিশ্বয্দ্ধোত্তব সমযেব পটভূমিতে বাঢ অঞ্চলেব পল্লীব সামাজিক, আর্থনীতিক, ব্যক্তিগত ও ধর্মীয জীবনেব ব্প পাওযা যায। তেবশো ঊনত্রিশ বঙ্গাব্দে প্রথম বিশ্বয্দ্ধেব দংশনে অস্থিব শিবকালীপ্রেব সনাতন বিধিবিধানপ্র্ণ সমাজ ভেঙে যায, নানা বিশৃঙ্খলা ও নৈবাজ্যেব স্বীকার হয সে। গ্রামেব সাধারণ সদ্গোপ চাষীবা অর্থপ্রাপ্তিব আশায জমি বিক্রী কবে ভূমিহীন শ্রমিকে পবিণত হয। এ উপন্যাসে একটি নতুন ধনিকশ্রেণীব উত্থান ও সামন্ত ভূস্বামীব পতনেব চিত্র অঙ্কিত। আব এই নব্যবণিক শ্রেণীর প্রতিনিধি শ্রীহবি—যে আমার্জিত, প্রতিহিংসাপবাযণ, কুটিল ও স্থূল। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসেও রাঢ় অঞ্চলেব ময়্রাক্ষী তীরবর্তী পাঁচটি গ্রামের সমাজজীবনবাস্তবতার চিত্র

বৃপায়িত। এখানে ব্যক্তিব জীবনচিত্র বৃপায়ণেব সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনেব নানা ঘাত প্রতিঘাতে ব্যক্তিব জীবনে নেমে আসা বিপর্যযের কাহিনীও অঙ্কিত। আলোচ্য উপন্যাসে জনপদবাসীদেব শোচনীয জীবনচিত্রাঙ্কণে তাবাশঙ্কব শুধু মাত্র বিযালিস্ট; কিন্তু তিনি যখন খাজনা বৃদ্ধি, সুদ, অনাহাব, কলেবা ম্যালেবিয়া, দাঙ্গা, গোমড়ক, অগ্নিকাণ্ড, অনাবৃষ্টি, খবা ইত্যাদিব পব জনপদবাসীদেব অদম্য বাঁচাব আগ্রহকে বৃপায়িত কবেন তখনই তা বিয়ালিজমেব সীমায আবদ্ধ না থেকে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায উত্তীর্ণ হয। সন্দীপন পাঠশালাতেও সমাজ পবিবর্তনেব ইঙ্গিত—নতুন সমযেব প্রেক্ষাপটে অন্ত্যজ শ্রেণীব জাগবণেব চিত্র অঙ্কিত। তাবাশঙ্কব সাহিত্য ভাবনায সম্পূর্ণত সামাজিক পবিবর্তনেব চিন্তা কবতে পাবেন নি ; এটা তাঁব সমযগত সীমাবদ্ধতা বৃপে চিহ্নিত হতে পাবে। তাঁব বেশ কিছু উপন্যাসে রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এবং চবিত্র থাকলেও (যেমন—ধাত্রীদেবতা, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, কালিন্দী সন্দীপন পাঠশালা) তাঁব সমস্ত উপন্যাসকেই বাজনৈতিক বাস্তবতাবাদী উপন্যাস বলা যাবে না। কেননা, এখানে বাজনীতির পবিবর্তে পল্লীজীবনেব বাস্তবতাই প্রধান। তাঁব বাজনৈতিক বাস্তবতা প্রধান উপন্যাসবৃপে চৈতালী ঘূর্ণি, মন্বন্তব, ঝড ও ঝবাপাতা ইত্যাদিব উল্লেখ কবা চলে। 'চৈতালী ঘূর্ণি' উপন্যাসে গান্ধীবাদেব সঙ্গে সাম্যবাদেব সমন্বয় প্রচেষ্টা। এ উপন্যাসে শ্রমজীবীশ্রেণীব শোষিত, বঞ্চিত জীবন ও তাদেব ব্যর্থ বিদ্রোহেব বৃপ উপস্থাপিত এবং ভবিষ্যত বিজযেব আশাও প্রকাশিত। অর্থাৎ এখানে তিনি যথাযথ উপস্থাপনাবাদী। 'মন্বন্তব' উপন্যাসেব পটভূমিকা ১৯৪২-৪৩ এব নানা সংকটে বিপর্যস্ত কলকাতাব বৃপ। এখানে তারাশঙ্কব আকালগ্রস্ত কলকাতাব নাবকীয বৃপ অঙ্কন কবলেও বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে মানুষেব মহা-মন্বন্তবে গান্ধীব অনশনব্রতেব পুণ্যফলকেই একমাত্র ভবসা বলে মনে কবেছেন। এ উপন্যাসে তাঁব স্ববিবোধিতা প্রকট—সাম্যবাদী চবিত্র সৃষ্টি কবতে চাইলেও স্বীয বৈশিষ্টবনাত সাম্যবাদীদেব গান্ধীবাদে দীক্ষিত করেছেন। এখানে বাহ্যবাস্তবতা থাকলেও উপন্যাসেব আগেই বিমিশ্র বিভ্রান্তকারী রাজনৈতিক মতবাদের উপস্থাপনা। তাঁব 'ঝড় ও ঝবাপাতা' কলকাতার 'বাজনৈতিক বাস্তবতার দলিল' হলেও বিক্ষুব্ধ জনতার আন্দোলন কোনো বিশেষ বাজনৈতিক বিশ্বাসে দীক্ষিত নয , ব্যক্তির অন্তর্গত ক্ষোভ তাদের বিদ্রোহে উদ্বুদ্ধ কবেছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিবুদ্ধে তাদের আন্দোলন, বিদ্রোহ সফল না হলেও উপন্যাসের বক্তব্যে আশাবাদেব প্রকাশ।

সাহিত্য ভাবনার দিক থেকে তারাশঙ্করকে বাস্তববাদী মনে হলেও কখনো কখনো সেখানে ভাববাদের অনিবার্য প্রবেশ ঘটেছে, আবার বাস্তববাদী ভাবনার বশবর্তী হয়ে উপন্যাসে যখন তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছেন তখন সেখানে বিমিশ্রতত্ত্বের উপস্থাপনা ঘটেছে। সেখানে বাস্তবতাবাদ, উপাস্থাপনাবাদ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার কাছাকাছি মতবাদ, গান্ধীবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদির বিমিশ্র মতবাদ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ তাঁর সাহিত্যভাবনা তত্ত্বে ও প্রয়োগে কখনো পরস্পর সংলগ্ন, কখনো আবার আমেরু পৃথক। এমন হওয়ার কারণ সম্ভবত প্রতিভাবান লেখকেরা তত্ত্বের নিগড়ে মননকে শৃঙ্খলিত করেন না, অথচ সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অত্যাচার, অবিচারের অবসান কামনা করেন। আর সেখানেই লেখকরা হয়ে ওঠেন উদার-নৈতিক মানবতাবাদী। তারাশঙ্করের সাহিত্যাদর্শের পটভূমিকায় এই মানবতাবাদের দর্শন ক্রিয়াশীল। ফলত, তাঁকে কোনো বিশেষ তত্ত্বের এক-নিষ্ঠ লেখক-প্রবক্তা বলা যাবে না। তারাশঙ্করের চিন্তার রাজ্যে যে উপলব্ধি ক্রিয়াশীল তাই তাঁর সাহিত্যভাবনার-তত্ত্ব ও প্রয়োগের উৎস। যার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই তিনি স্বয়ং বলেছেন—

"মানুষও তার সৃষ্টির আদিকাল থেকে এই বস্তুপ্রধান বহির্লোকের সঙ্গে দ্বন্দ্বে সংঘর্ষে দুঃখ পেয়েছে। সেই বেদনায় সে সৃষ্টি করেছে অন্তর-লোকে কামনার কল্পলোক। সেখানে শোকে-মিলনে, দুঃখে-সুখে আলোকে-অন্ধকারে একাত্ম হয়ে গেছে। সেই লোকের পথ দিয়েই সে আবিষ্কার করেছে সৃষ্টি রহস্য, রূপের বসতির মধ্যে অরূপ স্রষ্টাকে, এবং তারই সঙ্গে একাত্মতার উপলব্ধির আনন্দে তার মনে যে রস সৃষ্টি হয়েছে—তাই অমৃত, তারই অভিব্যক্তি চিরন্তন সাহিত্য। সুতরাং মানবজীবনে বস্তুই সর্বস্ব হলে মনোলোক খর্ব হবে, সে তার কল্পনায় দূরপ্রসারী শক্তি ও সৃষ্টি হারাবে। যা নশ্বর নিত্য পরিবর্তনশীল, তাকে সর্বস্ব করে অমৃতময় চিরন্তনত্ব থেকে বঞ্চিত হবে। তাই বাহ্য রাজনীতিতে বাধা—তাই বস্তুবাদপ্রধান জীবনবাদে বাধা! *** জীবনের জয়েই সাহিত্যের সার্থকতা। *** মতবাদ বা একটা জীবনদর্শন প্রত্যেক অভিব্যক্তির মধ্যেই আছে। কারণ, দৃষ্টির ফলে ভাবের উদ্রেক হয়। ভাবের প্রকাশের মধ্যে অবশ্যই দৃষ্টির দর্শন ভঙ্গির পরিচয় থাকবে। সেই তো মতবাদ। তবে মতবাদ অত্যুগ্র হয়ে জীবনলীলা অপেক্ষা প্রকট হলেই সে হয় প্রচারধর্মী। সে বস্তু সাহিত্যই নয়।"

———

তারাশঙ্কর : সামাজিক টেনশন থেকে শ্রেণীসংহতিতে উত্তরণ

বাসব সরকার

তারাশংকর গ্রামবাংলার সামাজিক 'টেনশনের'-আলোড়ন ও উত্তেজনার ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী, ঋজুদর্শী। তাঁর এই দেখা ছিল ভিতর থেকে, গ্রাম সমাজের একজন হয়ে, গভীর আন্তরিকতায়, মমত্ব বোধে। সেখানে কোন ফাঁক, কোন ফাঁকি ছিল না। তাঁর এই দেখা পর্যবেক্ষকের মতো ছিল না, ছিল একজন ইতিহাস-সচেতন মানুষের দেখা। তাই সামাজিক বাস্তবতার যে সম্ভাবনা ছিল বিকাশোন্মুখ, তার প্রথম 'মাতন' নিপুণভাবে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে সেই মাতনের ছবি আছে, আছে তার দুর্বলতা, ব্যর্থতার ছবি।

তারাশংকরের অন্তরঙ্গ পরিচয় রাঢ় বঙ্গের একটা ছোট অঞ্চলের সঙ্গে। ময়ূরাক্ষী তীরের সেই ছোট অঞ্চল, বীরভূম জেলায় তারাশংকরের বাসভূমি লাভপুরের আশেপাশের ক'খানি গ্রাম একান্ত পরিচয়ের আত্ম-উন্মোচনের মধ্য দিয়ে, তাঁকে পরিচিত করে তুলেছিল সারা বাংলার গ্রাম সমাজের সঙ্গে। গ্রাম সমাজের সেই বঙ্গদেশ ব্যাপী রূপ-কল্প পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে গানের ধুয়ার মতো বারবার ধ্বনিত হয়েছে। সেই গ্রাম-সমাজ বর্তমানকালে কল্পনার অতীত হলেও, এককালে ছিল। "গ্রাম হইতে পঞ্চগ্রাম, সপ্তগ্রাম, নবগ্রাম, বিংশতিগ্রাম, পঞ্চবিংশতি গ্রাম—এমনি ভাবেই গ্রাম সমাজের ক্রমবিস্তৃতি ছিল, বহু পূর্বে শতগ্রাম, সহস্রগ্রাম পর্যন্ত এই বন্ধনসূত্র অটুট ছিল।" তখন যাতায়াত কঠিন, যোগাযোগ কালচক্রের বিধানে তিথি নক্ষত্র অনুযায়ী কখনো সখনো হলেও সমাজপতির বিধান অলংঘনীয় ছিল। তখন মানুষের জীবন ছিল শান্ত, সমাহিত সুস্থিতিপূর্ণ। গোলাভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, মাথার উপরে নিশ্চিন্ত আচ্ছাদন, বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে বাঙালির জীবন কেটেছে।

বাঙালির এই সুখী জীবনের চিত্র তারাশংকরের উপন্যাসে নিঃস্বের বেদনার মধ্যে আত্মবিস্মৃতির মুহূর্তগুলিতে নানা চরিত্রের কথায় মাঝে মাঝেই প্রকাশ পেয়েছে। এই জীবনটা ছিল সমাজের একাংশের অধিগত। বর্ণ-

সমাজে তারা অবশ্যই সেই স্তরের মানুষ যাদের জীবনচর্যায় এই সুরসঙ্গীত ভেঙ্গে যাওয়ার কোন কারণ ঘটেনি তখনো। কিন্তু যখন থেকে ভাঙ্গতে সুরু করেছে, দৈব দুর্বিপাকে নয় ইতিহাসের কুটিল গতিতে, তারাশঙ্কর তারও উল্লেখ করেছেন। তার সঙ্গে আরো যেটা বলেছেন সেটা হলো এহেন শান্তি, সুখের পাশাপাশি গ্রাম সমাজের এক পাশে ছিল আরেক দল মানুষ যারা ব্রাত্যজন প্রকৃত অর্থে, একেবারে নীচু তলার মানুষ। তাদের জীবনে বঞ্চনার শোষণের বেদনা, বুভুক্ষা হয়তো সেই সুখী গ্রাম সমাজে একালের মতো এতোটা তীব্র ছিল না। কিন্তু সেখানে যে কোথাও একটা চেতনার সঞ্চার হয়েছিল, তা সে যতো ক্ষীণ হোক, তার ভাষা যতো অস্ফুট হোক, কিম্বা তাদের কথা ভেবে দেখা দরকার, অন্তত এই চেতনাটুকু সমাজের সচ্ছল অংশের কারো কারো মনে দানা বেঁধেছিল, তারাশঙ্কর ধাত্রীদেবতা উপন্যাসে তারই প্রথম ছবিটি তুলে ধরেছেন। সেখানে অবশ্য শেষের কথাটিই বেশি প্রাসঙ্গিক। এই ব্রাত্যজনের অগ্রগতি না ঘটলে সমাজে কোথাও এগিয়ে চলার তাগিদ চোরাবালিতে আটকে যাবে, সাহিত্যে সম্ভবত তারাশঙ্করই তার প্রথম উল্লেখ করেছেন।

।। এক ।।

'ধাত্রী দেবতা' উপন্যাসের কালগত পটভূমি এই শতকের দ্বিতীয় দশকে সুরু হয়ে অসহযোগ আন্দোলনে শেষ হয়েছে। বাংলার জীবনে তখনও সামাজিক আলোড়ন ও সংঘাতের জমি তৈরী হয় নি। রাজনৈতিক আন্দোলন স্বদেশী যুগের প্রবল উত্তেজনাকে পুঁজি করে তখন গণরাজনীতির পথ ছেড়ে বিপ্লবী সংগ্রামের পথ নিয়েছে। যে কোন মূল্যে দেশের মুক্তি এটাই তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। দেশের মুক্তির অর্থ যে দেশের মানুষের মুক্তি, তেত্রিশ কোটি মানুষের ছেষট্টি কোটি হাতের অবাধ কর্ম চাঞ্চল্য, স্বদেশব্রতী বিপ্লবীদের চেতনায় তার রূপটি ধরা পড়েনি। তাদের গভীর বিশ্বাস ছিল একদল মানুষের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই ঘটবে দেশজোড়া বিপ্লবী অভ্যুত্থান, যার পরিণতিতে দেশের মুক্তি। আগে দেশের মুক্তি ঘটুক তারপর দেশের আপামর মানুষের মুক্তি। তাই সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টিতে তাদের কোন আস্থা, ভূমিকা ছিল না।

বীরভূম জেলার দক্ষিণাংশে বক্রেশ্বর আর কোপাই নদী দুটি যখন মিলিত

হয়ে কুয়ে নাম নিয়ে ময়ূরাক্ষীর সঙ্গে মিশেছে, তারই পাশে লা-ঘাটা বন্দরের সাত আনির মালিক প্রয়াত কৃষ্ণদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র কিশোর জমিদার শিবনাথের চেতনায় এই সামাজিক মুক্তির কথাটি এসে পড়েছিল হঠাৎই চরম আকস্মিকতার মধ্যে। সাঁওতাল পরগণার এক গভীর আরণ্যক পরিবেশে একান্তভাবে অনার্য, শূদ্রদের মধ্যে দেশের মুক্তির পথ খুঁজতে আসা এক আদর্শবাদী মানুষের কয়েক ঘণ্টার সান্নিধ্যে শিবনাথ সামাজিক মুক্তির দীক্ষা পায়। এই মানুষটি বিপ্লবীর আদর্শভ্রষ্ট কিন্তু জাতির মুক্তির এক ভিন্ন পথের সন্ধানী। তিনিই প্রথম শিবনাথ ও তার সহযোগী পূর্ণকে জানান যে ব্যক্তিগত নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, আত্মত্যাগ সবই মহৎ গুণ, কিন্তু জাতির মুক্তি এই পথে আসবে না। তার জন্যে চাই গণজাগরণ। তাহলেই মানুষের মুক্তি আসতে পারে। মতের এই পরিবর্তনের জন্যে, চেতনার ভিন্নতার জন্যে হাসিমুখে তরুণ সহকর্মী পূর্ণর রিভালভারের গুলীতে প্রাণ দিয়ে তিনি শিবনাথ ও পূর্ণের সামনে এই দৃষ্টান্তটাই তুলে ধরেন যে পথ আলাদা হলেও আদর্শের জন্যে প্রাণ দেওয়াটাই একজন বিপ্লবকর্মীর প্রকৃত পরিচয়, সেটা রাজনৈতিক কিম্বা সামাজিক বিপ্লব যাই হোক না কেন। শিবনাথের জীবনের পথও যেন তখনই নির্ধারিত হয়ে যায়। শূদ্র ভারতের জাগরণ, আর বিপ্লবী গোষ্ঠীর সর্বস্বপণের লড়াই নয়, সামাজিক মুক্তির পথই আসল পথ।

শিবনাথের মনোজগতে এই বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা সযত্নে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিলেন তার মা জ্যোতির্ময়ী দেবী। পিতৃহীন শিবনাথের একান্ত আপনার জগৎ গড়ে উঠেছিল মা জ্যোতির্ময়ী বিধবা পিসিমা শৈলজা ঠাকুরানীর স্নেহচ্ছায়ায়। তবে তাঁরা কেবল স্নেহ দিয়ে নয়, তাঁদের ব্যক্তিত্বের সব কিছু উজাড় করে দিয়ে ছিলেন শিবুকে মানুষ করার কাজে। শিবু মায়ের কাছে পেয়েছিল সমাজের দীন হীন দুঃখী জনকে আন্তরিক ভালোবাসার শিক্ষা, তাদের সমব্যথী হওয়ার তাগিদ যা না হলে শূদ্র ভারতের আলোড়ন সৃষ্টি করা যাবে না। শিবু তার মায়ের এই শিক্ষা সর্বাংশেই গ্রহণ করেছিল, আর পিসিমা শৈলজাদেবীর চারিত্রিক আভিজাত্য বোধ আর তেজস্বিতা। জমিদার তনয়ার আজন্ম লালিত বিশ্বাস 'মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের' আর 'না খাব উচ্ছিষ্ট ভাত না দিব চরণে হাত', এই দুটি শিক্ষার মধ্যে শিবু প্রথমটি নিতে পারে নি মায়ের শিক্ষা গুণে, আর দ্বিতীয়টি নিয়েছিল সর্বাংশে নিজের জীবন বৃত্তে। মাস্টার মশাই রামরতন আর পলটন

ফেবং সন্যাসি বামজী গোঁসাইবাবা শিবুকে শিখিয়েছেন স্বপ্ন দেখতে, স্বপ্নে দেখা জগৎকে বাস্তবে পবিণত কবতে কঠিন পরিস্থিতিব মুখে সাহসেব সঙ্গে দাঁড়াতে।

ব্রাত্যজনেব জাগবণে শিবুও উপন্যাসেব শেষে সংসাব ত্যাগ করে ময়ূবাক্ষীব চবে সেই হঠাৎ দেখা বিপ্লবী দাদাব মতো একক সাধনা সুবু কবেছিল। সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টিব সেই কঠিন তপস্যা যেদিন মহাত্মা গান্ধীব ডাকে অসহযোগেব গণবাজনীতি হযে মানুষেব নিস্তবঙ্গ জীবনে আছড়ে পড়ে তখন শিবুও তাব সাধনাব পথ ছেড়ে তাতে সামিল হয গণরাজনীতিব সৈনিক হিসেবে। তাবাশংকব তাব পটভূমি বচনা কবেছেন নিপুণ দক্ষতায। যে বাতে নিঃসঙ্গ বিপ্লবী সুশীল শিবুব কাছে বিদায নিযে চলে যায় দেশে হোক না হলে বিদেশে গিযে অস্ত্র সংগ্রহ কবে সশস্ত্র বিপ্লবেব প্রস্তুতি কবাব জন্যে তাব পবেব দিনই ময়ূবাক্ষীব চর থেকে তাব একক সাধনাব পথ ছেড়ে আড়াই বছব পব শিবু ফিবে আসে গ্রামে গান্ধীজীব ডাকে ভাটিখানায পিকেটিং কবাব জন্যে। লক্ষ্য এক কিন্তু পথ ভিন্ন। সুশীলেব লক্ষ্য আগে দেশ তাবপব দেশেব মানুষ। শিবনাথেব লক্ষ্য দেশেব মানুষ আগে তাব সঙ্গে সঙ্গে দেশেব মুক্তি। শিবনাথেব কারাবাস, পিসিমাব শিবুব সংসারেব দাযিত্ব নিতে ফিবে আসা, গৌবী আব শিবুব শিশু পুত্রেব জেলের গেটে দুই পাশ থেকে মিলন দৃশ্য, সব ভুল বোঝাবুঝিব অবসান, উপন্যাসেব প্রযোজনে দবকাব ছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু যে সামাজিক আলোডনের দিকটি তাবাশংকব তুলে ধবতে চেযেছিলেন, সেই মানুষেব জডত্ব, অন্ধত্ব, কুসংস্কাব থেকে মুক্তিকে আলোডন সৃষ্টিব পথ বলে দেখাতে চেযেছিলেন, তাব ইঙ্গিত 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শিবনাথেব এই মানসিক পবিবর্তন ধাত্রীদেবতার নিবিড় পাঠে স্পষ্ট বোঝা যায তারাশঙ্কর উপন্যাসেব প্রযোজনে হঠাৎ আমদানি করেন নি। এটা ছিল তাঁব জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতাব অঙ্গ। তাই শিবনাথের শিক্ষাব আয়োজনে মাযেব উৎসাহে তার 'বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র, আর রবীন্দ্রনাথেব' বইপড়ার কথা এসেছে। বিবেকানন্দ তাকে দিযেছেন বিপুল সংখ্যাগবিষ্ঠ শূদ্র ভাবতের আগামী দিনেব মূল শক্তি হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওযার সম্ভাবনাব ধারণা, আনন্দমঠ তাকে দিযেছে 'মা যা হইয়াছেন' হৃত সর্বস্বা নগ্নিকা কালী মূর্তিব দৈন্যদূব কবাব ব্রত আব রবীন্দ্রনাথ দিযেছেন মানুষেব প্রতি অকৃত্রিম

ভালোবাসা। সামাজিক আলোড়নের তাগিদ যে শিবনাথ গভীরভাবে অনুভব করবে ধাত্রীদেবতায় রয়েছে তারই প্রস্তুতি পর্বের সলতে পাকানোর কথা।

॥ দুই ॥

সামাজিক আলোড়ন সৃষ্টির পরবর্তী পর্ব সুরু হয়েছে 'গণদেবতা' উপন্যাসে। শিবনাথ গণমুক্তির চেতনা সঞ্চারে একক ব্রত উদ্‌যাপন ছেড়ে অসহযোগের গণরাজনীতির বহুর সাধনার মধ্যে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল অকুণ্ঠভাবে। কিন্তু ১৯২১-২২ সালের সেই উত্তাল গণ-আন্দোলন যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, সেখান থেকেই সুরু গণদেবতা'র বোধনকাল। সকলেই জানেন গণদেবতা'র আদি নাম তারাশঙ্কর দিয়েছিলেন 'চণ্ডীমণ্ডপ'। পরে তার নাম বদলে রাখেন গণদেবতা। নামের এই রদবদল তিনি করেছিলেন সচেতনভাবেই উপন্যাসের মর্মবস্তুকে নামের মধ্য দিয়েই স্পষ্ট করে তুলতে কোন শৈল্পিক কারণে নয়। চণ্ডীমণ্ডপ নামের মধ্যে বাংলার গ্রাম সমাজের যে অন্তরঙ্গ পরিচয় আছে, সেখানে কর্ম ও বৃত্তির কারণে সকলের অবদান ও ভূমিকার একটা সহনশীল স্বীকৃতি ছিল, এটাও ঠিক। কিন্তু তারাশঙ্করের সমকালে সেই গ্রাম সমাজ কর্ম ও বৃত্তির ভেদকে বড়ো করে তুলে সমাজের অধিকাংশের স্থান নির্দেশ করেছিল সেই চণ্ডীমন্ডপের একপাশে দীনহীনের মতো অনুগৃহীতদের দলে। সেখানে তখন বর্ণাশ্রমের ধারক পণ্ডিত ব্রাহ্মণদের জায়গা ক্রমেই দখল করছিল বিত্তবানের দল, উঠ্‌তি বা প্রতিষ্ঠিত যে পর্যায়ের হোক না কেন। তারাশঙ্কর তাদের কথা বলতে চাননি, বরং তাদের স্বরূপটাই ব্রাত্যজনের সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তারাই গ্রাম বাংলার অনাগত কালের প্রধান মানুষ। এই নিম্ন বর্ণের ও নিম্নবর্গের কথা নিয়েই 'চণ্ডীমণ্ডপ' হয়ে উঠেছে 'গণদেবতা'।

গণদেবতা'র কথারম্ভ বাংলা তেরশ' ঊনত্রিশ, ইংরাজি উনিশ শ' বাইশ সালে। দেশে অসহযোগ আন্দোলন শেষ, তার ব্যর্থতার জ্বালা মানুষের মনে থাকলেও, রাঢ় বঙ্গের এই এলাকায় তার কোন প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ প্রভাব পড়েনি। বাংলায় অবশ্য দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্য দলের তৎপরতা সুরু হয়েছে। খবরের কাগজে স্বরাজ্য 'দলের নেতাদের সরকারের নীতি নিয়ে নানা সমালোচনা প্রকাশ হচ্ছে, শুধু দৈনিক নয়, অর্ধ সাপ্তাহিক কাগজেও তার বিস্তারিত প্রতিবেদন। সেই রকমই একটা অর্ধ সাপ্তাহিক

নিয়মিত আসে শিবকালীপুর গ্রামের একমাত্র কায়স্থ বাসিন্দা হরেন ঘোষের ডাক্তারখানায়। হরেন পৈত্রিক অধিকারে ডাক্তার, কারণ তার পিতা ও পিতামহ এই পেশায় গ্রাম সমাজে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। কোন পাশ করা ডাক্তার নয় জগন। তবে কিছুটা হাতযশ আছে, বাঁধাধরা কিছু মিকশ্চার দেয়, লোকে ডাকতে এলেই হাজির হয়, ফি নেয় না দেয়ও না বিশেষ কেউ। তবে ওষুধের দাম নেয়, যদিও বাকিও থাকে অনেক। এই পাণ্ডববর্জিত এলাকায় তাই জগন ডাক্তারের কিছুটা প্রভাব প্রতিপত্তি আপনা থেকেই হয়। বৃহত্তর দেশের সঙ্গে একমাত্র যোগসূত্র একখানি অর্ধ সাপ্তাহিক কাগজ আর জগনের ডাক্তারখানার মজলিশ। মজলিশে উপস্থিত যারা থাকে তারা প্রায় সবাই নিরক্ষর। কাগজের পাঠক জগন ছাড়া আরেকজন, গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত দেবনাথ ঘোষ, সকলের কাছে দেবু পণ্ডিত।

গণদেবতা উপন্যাস সুরু হয়েছে অবশ্য গ্রাম সমাজের বহু প্রাচীন রীতি ধানের বদলে বৃত্তিজীবী কামার, ছুতার, নাপিত ও বায়েন কয়েক জনের ব্যক্তি কেন্দ্রিক বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। বিদ্রোহের কারণ তাদের ব্যক্তি চরিত্রের অবাধ্যতা নয়, গ্রাম সমাজের চিরাচরিত প্রথা মেনে চলার অপারগতা। প্রথম পর্যায়ে তার নায়ক অনিরুদ্ধ কর্মকার আর গিরীশ সূত্রধর। পরে তাদের দেখে এবং প্রাথমিক সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে যোগ দিয়েছে তারাচরণ পরামানিক আর পাতু বায়েন। অনিরুদ্ধ আর গিরীশ কাছেই ময়ূরাক্ষীর ওপারে জংশন শহরে দোকান খুলে বসেছে বৃত্তিগত অভিজ্ঞতা সম্বল করে। ধান নিয়ে তারা গ্রামের লোকের কাজ আর করবেনা, গ্রামেও কাজ করবে না। কাজ করাতে গেলে শহরে যেতে হবে, নগদ পয়সা দিতে হবে। ঘটনা সামান্যই। কিন্তু শিবকালীপুরের গ্রাম সমাজে তার অসামান্য অভিঘাত ফুটিয়ে তুলতে তারাশঙ্কর রচনা করেছেন গণদেবতা উপন্যাস। শিবকালীপুর শুধু একখানা গ্রাম নয়। এই অঞ্চলে ময়ূরাক্ষীর কোল ঘেঁষে যে পাঁচখানা গ্রাম তারাশঙ্করের বহুকথিত 'পঞ্চগ্রাম' তারই অন্তর্গত, কিন্তু এক্ষেত্রে বিশিষ্ট হয়ে ওঠার মতো বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ একটা গ্রাম যে সামাজিক আলোড়ন তারাশঙ্করের এই উপন্যাসের উপজীব্য তারই সূতিকাগার।

প্রতিবাদের কারণ যে অর্থনৈতিক, মানুষের রুটি রুজির সওয়াল, অল্প কথায় উপন্যাসের গোড়ায় তারাশঙ্কর তা বলে নিয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার চার বছর পরেও যুদ্ধকালীন চড়া দাম আর কমে নি। অথচ

সম্বলহীন গ্রামের এই সব মানুষদের আযেব কোন পথও গ্রাম সমাজেব প্রথা সিদ্ধ কর্মধাবায দেখা দেয়নি। তার উপব ঘটেছে বাজারী অর্থনীতিব চোবা অনুপ্রবেশ। গ্রামের স্বযং সম্পূর্ণ জীবনচর্যায বৃত্তিজীবীবা যা তৈবী করতো, গ্রামেব মানুষদেব যা দরকাব হতো, সেগুলি লেনদেনেব সহজ সরল সূত্র ছিল। এখন সেই প্রযোজনেব উপকরণ লোক জংশনের বাজাব থেকে পযসা দিয়ে কিনতে পাবে। তাতে পছন্দসই জিনিস অনেক সময সস্তায পাওয়া যায সেগুলি শিল্প পণ্য বলে। গ্রামের কারিগর হাতে তৈরী কবে তাব সঙ্গে পাল্লা দিতে পাবে না।

তারাশঙ্কব এই সব কথা নানা প্রসঙ্গে উপন্যাসে প্রতিবাদী চরিত্রগুলিব মুখ দিযে বলিযেছেন এটা বোঝাতে গ্রাম সমাজের প্রথাসিদ্ধ জীবন ধাবা এই মানুষগুলি স্বেচ্ছায ভাঙ্গতে চাযনি। আব গ্রামেব অন্য সব মানুষ কৃষিজীবী যাবা তাবাও বহুদিন সাচ্ছল্যের মুখ দেখে নি বলেই বৃত্তিজীবীদেব বাঁচিযে বাখা যে তাদেব দায এবং দাযিত্ব, সেটাও মনে বাখে নি। তারা প্রথাসিদ্ধ জীবনের অধিকাবটুকু ভোগ করতে চায়, কিন্তু দাযটা পালন কবতে চায না। তাবাই চণ্ডীমণ্ডপের মজলিশে বসেছে বহুদিন পবে নিজেদেব এতোদিনকাব সুযোগ সুবিধাগুলি যাতে প্রতিবাদেব জন্যে চিবকালেব মতো হাবিযে না যায তারাই প্রতিবিধান করতে। মজলিশেব মূল উদ্দেশ্যেব সঙ্গে সহমত পোষণ করে যাবা, তাদেব দুটি কেন্দ্রিয চবিত্র দেবু পণ্ডিত আব শ্রীহবি ওরফে ছিবে পাল। কিন্তু আপাত সাদৃশ্য ছাড়া দেবু ও ছিবে পালেব উদ্দেশ্যেব মধ্যে কোনও মিল নেই। উঠ্তি বিত্তবান ছিবে পাল চায মজলিশেব সিদ্ধান্তটা কৌশলে কাজে লাগিয়ে গ্রাম সমাজে বিত্তবানেব প্রতি আনুগত্যেব গতানুগতিক ধারাটাকে নিজেব ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহাব কবতে। প্রতিবাদকে শিকড় সমেত উপড়ে ফেলতে। দেবু পণ্ডিত চেযেছিল পুবানো ঐতিহ্যশ্রযী গ্রাম সমাজেব সহমর্মিতা ও সহযোগিতার ধারাটিকে সযত্নে বাঁচিযে বাখতে। দেবুর এই চাওযাটা আন্তরিক, যদিও তার মধ্যে গ্রাম সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠ হযে ওঠার সুযোগটা কাজে লাগাতে তাব ব্যক্তিগত ইচ্ছা যে নেই তা নয। কিন্তু সেটা দেবুব সামাজিক আদর্শকে ব্যাহত কবে না। তাই চণ্ডীমণ্ডপেব মজলিশেব ক্ষযিষ্ণু কর্তৃত্ব পুনবুদ্ধাব ও প্রতিষ্ঠিত কবতে তাব আগ্রহ এতো বেশি।

কিন্তু দেবু পণ্ডিতেব চাওয়া আব গ্রাম সমাজেব গভীরে অর্থনৈতিক অভিঘাতে ক্রমে ঘনিয়ে ওঠা অনিবার্য দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা, এ দুটোর মধ্যে যে

আর কোন বনিবনা সম্ভব নয়, টুকরো টুকরো প্রতিবাদী ঘটনার মধ্য দিয়ে গণদেবতায় তারাশঙ্কর সেই বাস্তবতা তুলে ধরেছেন। অনিরুদ্ধ আর গিরীশ সেই দ্বন্দ্বের ব্যক্তি প্রতীক। গ্রাম সমাজের অনুশাসন যে এতো সহজে অমান্য করা যায় দেবু পণ্ডিত তার আর্থ-সামাজিক কারণের বদলে শহরে গিয়ে গ্রামের এই সব বৃত্তিজীবীদের ঔদ্ধত্যের লক্ষণ বলেই মনে করে ছিল! তারপর নবান্নের অনুষ্ঠানে অনিরুদ্ধের স্ত্রী পদ্মকে অংশ গ্রহণ করতে না দিয়ে দেবু পণ্ডিত সেই দ্বন্দ্বকে একটা পারস্পরিক চ্যালেঞ্জের পর্যায়ে নিয়ে যায়। অনিরুদ্ধর প্রতিবাদ এবার হয়ে ওঠে গ্রাম সমাজের জীর্ণ কাঠামোর বিরুদ্ধে একক প্রতিরোধের সংগ্রাম। দেবু সেই প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের বিরুদ্ধে গ্রাম সমাজকে সমবেত করে একটা সহনশীল সমাধানের পথ খুঁজছিল, সেখানে গ্রাম সমাজের ভাঙ্গনের অন্যতম প্রধান হোতা ছিরে পাল সুকৌশলে নিয়ন্ত্রণ নিপীড়নের ভার নিজের হাতে তুলে নেয়। সেটা ছিরে পালের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য কায়েম করার কৌশল। দেবু যখন বোঝে অনিরুদ্ধদেরও বক্তব্য অন্যায় নয়, তখন বড়ো দেরী হয়ে গেছে। তবে তারাশঙ্কর যেভাবে সামাজিক আলোড়নের ছবি আঁকতে চেয়ে ছিলেন, সেই দিক থেকে বিচার করলে দেবুর এই ভুলটুকু দরকার ছিল।

কাহিনীর বিন্যাসে তারাশঙ্কর দেখিয়েছেন অনিরুদ্ধর একক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ব্যর্থতায় কিন্তু এই ধরণের প্রতিবাদ থেমে যায় নি। অবশ্যই অনিরুদ্ধ তার ভূমিকা যতোদূর নিয়ে যেতে পেরেছিল, অন্যরা তা পারেনি ঠিকই, কিন্তু প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। সনাতন ব্যবস্থার অধীনে যে কোন সমাজে নীচুতলায় যে আলোড়ন জাগে তার সূচনা পর্ব এমনই হয়। ব্যক্তিগত প্রতিবাদ সেখানে সমূহের প্রতিবাদে পরিণত হতে সময় লাগে। এমন কি সংগঠিত প্রতিবাদ করার তোড়জোড় চলা কালেই ভেঙ্গে যেতে পারে আশংকায়, ভয়ে। ১৯২৬ সালে প্রজাস্বত্ব আইনকে কেন্দ্র করে যে চঞ্চলতা দেখা গিয়েছিল তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এসে পড়ে নতুন করে সেটেলমেণ্ট করার সরকারি হুকুমনামা। এই প্রদেশে এর আগে যখনই সেটেল-মেণ্ট হয়েছে তখনই জমিদারবর্গ তার সুযোগ নিয়েছে পুরো মাত্রায় খাজনা বৃদ্ধির জন্যে।

কিন্তু সেকথা বড়ো হয়ে ওঠার আগেই শিবকালীপুরে এক অসাধারণ ঘটনা ঘটে যায় দেবু পণ্ডিতকে গ্রেপ্তার করার মধ্য দিয়ে। জরীপের কাজ

সুরুর যে হুকুমনামা জারী হয়েছিল তখন ক্ষেতে পাকা ধানের সমারোহ। সেই ক্ষেতের উপর দিয়েই লোহার ভারী চেন টেনে টেনে জমির নতুন মাপজোপ চলবে। পাকা ধান নষ্ট হওয়ার আশংকায় চাষীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। সমস্বার্থ বোধে তারা স্থির করে শহরে উপরওয়ালাদের কাছে দলবেঁধে যাবে এই হুকুমনামা স্থগিত করতে। সেই গণডেপুটেশানের সিদ্ধান্ত যখন কার্যকর করার সময় আসে তখনই খবরে জানা যায় সেটেলমেণ্টের কাজে বিরোধিতা করার জন্যে বিধায়ক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হয়েছেন। খবরটা দেয় নতুন ভুস্বামী পর্যায়ে উন্নীত শ্রীহরি বা ছিরে পাল। গণডেপুটে-শনের সব সংকল্প সমস্ত সংহতি মুহূর্তে উবে যায় কর্পূরের মতো। রাজ শক্তির সঙ্গে বিরোধের আশংকায় প্রজাসংহতি যে গড়ে ওঠার আগেই সময় সময় স্তব্ধ হয়ে যেতে পারে, ইতিহাসে তার অনেক নজীর আছে। জনগণের এই ছত্রভঙ্গ অবস্থায় হঠাৎই তুচ্ছ কারণে ঘটে যায় দেবু পণ্ডিতের নিগ্রহ আর কারাবাস।

কানুনগোর দেবুকে তুই তুকারি করে তার ব্যক্তি মর্যাদায় যে আঘাত হানে দেবু আপাতদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর পাঠশালার পণ্ডিত হলেও একজন আত্ম-মর্যাদা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে প্রত্যাঘাত করে। আমলাতান্ত্রিক কৌশল আর আইনের বেড়াজাল দেবুর অনমনীয় দৃঢ়তার মুখোমুখি হয়ে তাকে কয়েদ করার ব্যবস্থা করে। ঘটনার মধ্য দিয়ে রাজশক্তির সঙ্গে সচেতন ব্যক্তি মানুষের আত্মশক্তির দ্বন্দ্ব তারাশঙ্কর নিপুণ ভাবে ফোটাতে চেয়েছেন। এই আত্মশক্তির চেতনা দেবুর মনে এসে ছিল শুধু তার শিক্ষা বা পাঠশালার পণ্ডিত গিরি করে নয়, গ্রামের নিম্নবর্গের মধ্যে একটা উঠে দাঁড়াবার আপাতঃ ব্যর্থ সংকল্পকে দেখে। অথচ সেই গ্রামের এর কিছু আগেই যখন পাতু মুচী তার স্বসমাজে স্বৈরিণি বোন দুর্গার কাছে ছিরে পালের যখন তখন আনা গোনায় কিছুটা প্রতিবাদের কথা শুনে পালকে সংযত হতে বলে, তার পরেই ছিরে পাল নির্মম প্রহার করে পাতুর আত্মমর্যাদা বোধকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। এটা ছিল বিত্তবানের সঙ্গে নির্বিত্তের দ্বন্দ্ব। প্রথমটা রাজশক্তির সঙ্গে অধীন মানুষের আত্মশক্তির আর দ্বিতীয়টার বিত্তবানের সঙ্গে নির্বিত্তের দ্বন্দ্ব, এ দুটোর মধ্যে প্রথমটায় আত্মশক্তির অপরাজেয়তা আর দ্বিতীয়টায় ব্যর্থ প্রতিবাদের মরীয়া মর্মযন্ত্রনা তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর। এই প্রেক্ষাপটেই শিবকালীপুরের গ্রাম সমাজে সামাজিক আলোড়নের জমি তৈরী হয়েছে, যদিও একটা গুরুত্বপূর্ণ

কাজ তখনও বাকি ছিল। সেটা ঘটে গেছে দেবুর প্রথম কারাবাসের পনেরো মাসের মধ্যে।

ছন্নছাড়া বৃত্তিহীন অনিরুদ্ধের বাড়ীর বাইরেকার ঘরটি মাসিক দশটাকায় ভাড়া নিয়ে গ্রামে এসেছে ডেটিনিউ যতীনবাবু। উনিশ কুড়ি বছরের তরতাজা যুবক কিন্তু একান্ত আদর্শবাদী, যতীনকে সরকার পাঠিয়ে দিয়েছে শহুরে রাজনীতির সংস্পর্শহীন শিবকালীপুরের জীর্ণ বন্ধ সমাজ জীবনে তাকে চরম হতাশায় জর্জরিত করতে। কিন্তু ফল হয়ে গেছে ঠিক বিপরীত। অল্প সময়ের মধ্যেই যতীন শিবকালীপুরের জনজীবনে সংস্কার আর শোষণ পেষণে চাপা পড়ে থাকা অন্তরাত্মার গুমড়ে ওঠা বিক্ষোভের নাড়ীতে হাত দিয়ে অনুভব করেছে বিপুল প্রাণশক্তির একটা স্ফুরণ সময় ও সুযোগের অপেক্ষায় স্বপ্রকাশ হতে পারছে না। যতীন এটাও লক্ষ্য করেছে মানুষের মর্যাদা আদায় করে নেওয়ার একক সংগ্রামে রাজশক্তির প্রচণ্ড আঘাত মাথা পেতে নিয়ে নিজেকে ঋজু রেখে দাঁড়াতে পেরেছিল বলেই দেবু এই অঞ্চলের সমস্ত মানুষের মূক প্রতিবাদহীন অস্তিত্বের সামনে একটা স্বতন্ত্র নজীর গড়ে তুলতে পেরেছে, সে হয়ে উঠেছে নিজের অজান্তে তাদের অগ্রগণ্য মানুষ, শিবকালীপুরের নিস্তরঙ্গ জীবনের প্রথম সামাজিক আলোড়নের লোকনায়ক।

যতীনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পুঁজি কতোটা তারাশঙ্কর সেটা পাঠককে জানানোর প্রয়োজন মনে করেন নি। কিন্তু ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করে, দেবুর অনুপস্থিতিতে সেই সিদ্ধান্ত ডেটিনিউয়ের সতর্ক প্রহরা-ধীন জীবনে যতোটা রূপায়িত করা যায় তার সার্থক উদ্যোগের কথা বলে তারাশঙ্কর জানিয়ে দিয়েছেন, শিবকালীপুরের মানুষদের আন্তর দুর্বলতা আর তার নিরাময়ের পথ যতীন ঠিকই নির্ধারণ করেছিল। অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে গেলেও জাতীয় মুক্তির রাজনীতি যে নীচের তলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হবে তার জন্যে দরকার গ্রাম পর্যায়ের রাজনৈতিক সংগঠন 'কংগ্রেস কমিটি'। কিন্তু দরিদ্র, নিরক্ষর ছোট ছোট রায়ত চাষী আর অধিকাংশ কৃষি মজুরদের জীবন যাপনের প্রাত্যহিক সমস্যায় রাজনীতির ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠতে যেহেতু সময় লাগবে অনেক, তাই এখনই জরুরী ভিত্তিতে দরকার "প্রজা সমিতি"।

বঙ্গদেশের বৃহত্তর রাজনীতির প্রেক্ষিতে বিশের দশকের শেষার্ধে এই প্রজা সমিতি গঠন ছিল কংগ্রেসের মুক্তি আন্দোলনের পাশাপাশি দেশের সংখ্যা

গবিষ্ঠ কৃষক সমাজে আর্থ-সামাজিক পবিবর্তনের প্রাথমিক উদ্যোগ। তার পিছনে স্ববাজ্যদল, পেজেণ্টস্ এ্যাণ্ড ওযার্কাস পার্টিব কর্মসূচিব পবোক্ষ প্রেবণা থাকা অসম্ভব নয়। তাবাশঙ্করেব কোথাও সেই রাজনৈতিক বিষযটি উপন্যাসের বিন্যাসে সামনে তুলে আনেননি। কিন্তু গ্রাম বাংলাব নিথব জীবনে আর্থ সামাজিক পরিবর্তনেব প্রসঙ্গটি বাববার তুলে ধবতে চেযেছেন সচেতন-ভাবে বোধ হয় এই বক্তব্যেব দিকে ইঙ্গিত কবতে যে, বাজনৈতিক স্বাধীনতা এই নিম্নবর্গের জীবনে অর্থহীন হয়ে যাবে যদি না তাদেব আর্থ-সামাজিক মুক্তি ঘটে। বহু বছব পবে ষাটের দশকেব মাঝা মাঝি দৈনিক যুগান্তব পত্রিকায যখন তাবাশঙ্কব সাপ্তহিক কলাম হিসেবে গ্রামেব চিঠি লেখা সুরু কবেন, তখনও সেকথা স্পষ্টভাবে বলেছেন, স্বাধীনতাব বিশ বছব পবেও গ্রাম বাংলাব মানুষ, আর্থ-সামাজিক মুক্তি হযনি বলেই সেই অনগ্রসবতাব নাগপাশ ছিন্ন কবতে পাবেনি। প্রজা সমিতিব গুবুত্ব তাঁব চোখে কতো বেশি হযে উঠেছিল যখন দেখা যায ডেটিনিউ যতীনেব মুখ দিয়ে তিনি বলে নিযেছেন, সদ্য-কাবামুক্ত দেবু পণ্ডিতকে প্রজাসমিতিব প্রেসিডেণ্ট কিম্বা সেক্রেটাবী হতে হবে, কংগ্রেস কমিটির দাযিত্ব যে কেউ নিলেই চলবে। বস্তুতঃ শিবকালীপুব এলাকায গণ মানুষেব অববুদ্ধ বিক্ষোভ ও দ্রোহী চেতনাকে সুসংগঠিত আন্দোলনেব রূপ দেওযাব জন্যে যে গণনাযকের প্রযোজন ছিল, দেবু পণ্ডিতেব গণনাযকত্বে পবোক্ষ অভিষেক তখন হযে গিযেছে। যতীন কথাটির প্রকাশ্য আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিব পর্ব শেয কবেছে মাত্র।

কৃষক কিংবা শ্রমিক শ্রেণী শোষণে বঞ্চনায জর্জবিত হযে থাকলেও একান্ত-ভাবে নিজেদেব উদ্যোগে তার প্রতিবাদী রূপটি সংগঠিত করতে পাবে না। দরকাব হয বাইবে থেকে চেতনাব অনুপ্রবেশ। তার যোগান দেয ব্যাডিকাল চিন্তাব প্রাগসর মানুষ, যাবা নিজেরা কৃষক ও শ্রমিক নয। কথাটা মার্কসেব বহু কথিত, বহু আলোচিত। তাবাশঙ্কব গণদেবতায দেখিযেছেন দেবু পণ্ডিতেব চেতনাব বৃত্তে এই ধরনেব কালোপযোগী সংগঠন গড়ে তোলাব কোন ধারণাও ছিল না! সে ভেবেছিল মুমূর্ষু চণ্ডীমণ্ডপেব মজলিশ বিশেব দশকের বিক্ষুব্ধ গ্রাম সমাজেব জীবনধাবায নতুন সংহতিব পথ দেখাবে, সেই চণ্ডীমণ্ডপের কর্তৃত্ব বাবহার কবতে ছিবে পালের মতো কাযেমী স্বার্থ-বাদীদের নতুন প্রজন্ম যে সব ব্যবস্থা কবে রেখেছে কিংবা করতে পাবে, যাব সামনে গ্রামের মানুষ অসহায, দেবু পণ্ডিতের সেই ধারণা আদপে ছিল না।

তাব জন্যে চাই বিকল্প সংগঠন, বিকল্প নেতৃত্ব। সেই বিকল্প সংগটন প্রজা-সমিতি, আব বিকল্প নেতৃত্ব দেবু পণ্ডিতেব। বাঢ বঙ্গেব এই অঞ্চলকে উপলক্ষ্য কবে তাবাশঙ্কর নবচেতনাব এই বোধনে অনুঘটকেব অসাধরণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা দিয়েছেন ডেটিনিউ যতীনকে।

প্রজাব প্রতিবাদী ভূমিকাব ছোটখাটো প্রকাশ দেখে ছিরে পাল যখন বাজশক্তির সাহায্য পেতে চেষ্টা করে, তখন তার জবানিতে প্রাযই প্রকাশ হয়ে পড়ে সব গোলমালের পিছনে আছে প্রজা সমিতি। উপন্যাসে তাবাশঙ্কর সামাজিক আলোড়নেব যে প্রেক্ষাপট তুলে ধবতে চেযেছেন সেখানে শূদ্র ভারত, নিম্নবর্গেব সংহতি যে অপবিহার্যতা দাবি কবে, প্রজা সমিতি গঠন ছাডা অন্য কোন ভাবে তা পূরণ কবা সম্ভব ছিল না। আর গণনাযকরূপী দেবুব ভূমিকা সামাজিক আলোডনে অবাধ কবে তোলাব জন্যে দরকাব ছিল দেবুব জীবনেব সেই ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির, যা বিলু ও খোকনকে তাব কাছ থেকে সরিযে দিযে বন্ধনহীন ভূমিকা সম্ভব করতে পাবে। মহামহোপাধ্যায ন্যায়রত্ন সর্বস্ব ত্যাগ কবে ধর্মকে আশ্রয কবে থাকার যে উপাখ্যান দেবুকে শুনিযেছেন দু'টি পর্বে, প্রথমবার খোকনেব বালা জোড়া বন্ধক দিযে অসহায মানুষদের আটক গরুগুলি ছাড়িযে আনাব টাকা বোগাড় কবার জন্যে, আব দ্বিতীযবাব বিলু ও খোকনেব মৃত্যুর পর, সেটা যেমন উপন্যাসের প্রযোজনে দবকার ছিল, তেমনি দবকাব ছিল প্রজা সমিতিব কাজে দেবুর পিছুটানহীন ভূমিকা সম্ভব করাব জন্যে। কংগ্রেসের কাজ করাব জন্যে তার দবকার ছিল না, কিন্তু প্রজা সমিতিব কাজে সেটা দবকাব ছিল।

॥ তিন ॥

ময়ূরাক্ষীর বন্যারোধী বাঁধ থেকে ডেটিনিউ যতীনকে বিদায দিযে শিবকালীপুবেব দেবু পণ্ডিত রওনা হচ্ছে মহাগ্রামেব ন্যাযরত্নের বাডীত বথযাত্রাব অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। দূব থেকে ঢাকের শব্দ ভেসে আসছে জগন্নাথেব বথেব বশি স্পর্শ কবার জন্যে হিন্দু সমাজেব সকলকে ডাক দিযে; এইটুকু ঘটনাব নিহিতার্থ তাবাশঙ্কর 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসেব প্রথম অনুচ্ছেদেই কোন বিবাট সম্ভবনাব ইঙ্গিত, তাব আভাসটুকু দিযে রেখেছেন। শিবকালীপুবেব দেবু পণ্ডিত এপর্যন্ত তার গ্রামকেন্দ্রিক কাজকর্মকে নিপীডিতদের সংহত

করার মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিল। এবাব শিবকালীপুব ছেড়ে মহাগ্রামের পথেতাব যাত্রা, যে মহাগ্রামেব মহামহোপাধ্যায পবিবাব দীর্ঘদিন এই অঞ্চলেব শ্রদ্ধেয সমাজপতি, তাঁরই বাড়ীর অনুষ্ঠানে জগন্নাথের রথেব বশি টানার আহ্বান, এটা বিবাট কর্মযজ্ঞেব প্রতীকী উপস্থাপনা মাত্র। তাবাশঙ্কব জানিযে দিয়েছেন, জগন্নাথ কাঙালেব ঠাকুব। তাই হিন্দুসমাজেব আপামব জন সবাই জগন্নাথের বথ টানে এই জীবন থেকে এক অন্য জীবনে উত্তবণের আশায।

এই হিন্দু কথাটিব উপব জোব পড়েছে অহেতুকভাবে নয। আগামী দিনে এই অঞ্চলে যে সামাজিক আলোড়ন বিস্ফোরণমুখী হযে উঠবে, যার জন্যে দেবু পণ্ডিতের নেতৃত্ব দরকাব, সেখানেও দেখা যাবে লক্ষ্য এক হযেও হিন্দু ও মুসলমান আন্দোলনের পথ নিয়েছে স্বতন্ত্রভাবে। একান্ত ভাবে মুসলমানদের গ্রাম কুসুমপুব গণবিক্ষোভের পথে এগিযে যেতে চেয়েছিল হিন্দুদের পাশাপাশি, তবে নিজেদের মতো করে। তারাশঙ্কর পঞ্চগ্রামেব জনবিন্যাসেব যে চিত্র তুলে ধরেছেন প্রসঙ্গতঃ তার কিছুটা আলোচনা দবকাব। মহাগ্রাম, শিবকালীপুর, বালিযাড়া-দেখুরিয়া, কুসুমপুব আব কঙ্কণা, এই গ্রামগুলি নিয়েই তাবাশঙ্কবেব পঞ্চগ্রাম। প্রাথমিক সংহতি কিংবা সংঘট্ট, দুযেবই কেন্দ্রে শিবকালীপুব। তারপব পর্যাযক্রমে এসেছে দেখুবিযা, কুসুমপুবেব কথা। মহাগ্রামেব বারবাব উল্লেখ কবা হয়েছে দুটি কারণে, যে দুটিবই সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িযে আছেন একটি মানুষ, অশেষ সম্মানীয চবিত্র, শিব শেখরেশ্বব ন্যাযরত্ন। ন্যায়বত্ন এই অঞ্চলেব এককালীন প্রভূত প্রভাবেব অধিকারী সমাজপতি ছিলেন। এখন সেই নামটুকু তাঁর কর্তৃত্বের জীর্ণ কাঠামো আঁকড়ে কোনমতে টিকে আছে। উচ্চবর্ণেব কাছে তিনি অপ্রযোজনীয। তবে নিম্নবর্গের অধিকাংশ মানুষ তাঁকে মনে করে "সাক্ষাৎ দেবতা"।

ন্যায়রত্ন মশায দেবু পণ্ডিতেব গ্রাম সমাজের আদি কল্পনাব শেষ সমাজপতি। প্রথম যৌবনে সমাজপতি হিসেবে তিনিও কঙ্কণাব উচ্ছৃঙ্খল, ব্যাভিচারী জমিদাব তনযদেব জঘন্য আচবণেব প্রতিবাদে সংঘবদ্ধ আন্দোলন করেছিলেন। সেটা ছিল তাঁব বিশ্বাসেব মাপকাঠিতে সমাজধর্ম সম্মত। কিন্তু সমকালেব প্রতিবাদী আলোড়নে তিনি বেদনা অনুভব করেন, কিন্তু অংশগ্রহণ কবতে পারেন না। তাই দুঃখী মানুষ তাঁর কাছে এলে পাঠিয়ে দেন

চিঠি দিযে দেবু পণ্ডিতের কাছে, "পণ্ডিত আমার শাস্ত্রে ইহাব বিধান নাই। তুমি ইহার্ব ব্যবস্থা করিও।" আর সংশযদীর্ণ দেবু মাঝে মাঝে ছুটে যায মহাগ্রামে ন্যায়রত্নের বাড়ীতে, পথের দিশা পেতে, শান্তিও সান্ত্বনা পেতে কখনো কখনো। এটাই হলো মহাগ্রামের এই সামাজিক সংঘট্টে জড়িযে থাকাব প্রথম কারণ। পুরনো গ্রাম সমাজের বিলীযমান 'কাঠামোর প্রতি দেবুর অনাধুনিক মনেব সহজাত টান উপন্যাসের ট্র্যাজিক বিন্যাসে একটা বিশেষ মাত্রা এনে দিযেছে।

দ্বিতীয কারণ ন্যাযরত্নেব পৌত্র বিশ্বনাথের জীবন-দর্শন আব রাজনৈতিক বিশ্বাসেব দ্বন্দ্ব আব অন্যদিকে দেবু পণ্ডিতেব বিকাশমান চেতনার সেই দিকে তীব্র আকর্ষণ অথচ সমস্ত অন্তব দিযে তাকে গ্রহণ কবতে না পাবার সংঘাত। বিশ্বনাথ কমিউনিস্ট। তার মত ও পথেব প্রতি দেবুব এক দুর্নিবার আকর্ষণ আছে। আবার ন্যায়রত্নেব জীবনদর্শনের প্রতি ভক্তি মেশানো শ্রদ্ধা আব আজন্ম লালিত সংস্কারেব জন্যে বিশ্বনাথের মতবাদ সম্পর্কে একটা বীত-রাগ আছে। তাবাশঙ্কব সচেতনভাবেই বিশ্বনাথের ভূমিকায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের তৎকালীন চেহাবাব দিকে পাঠকেব দৃষ্টি আকর্ষণ করে বোঝাতে চেযেছিলেন গ্রামবাংলায গণমানসে তখন সেই মতবাদেব ডাকে সাড়া দেওযাব মতো কোন প্রস্তুতি ছিল না।

উপন্যাসে তাবাশঙ্কব মহাগ্রামের জনবিন্যাসেব, সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসেব আব কোন কথা বলেন নি, যাতে এই দুটি কাবণ ছাড়া পঞ্চগ্রামেব গণআলো-ড়নে তাব অন্য কোন যোগসূত্র বোঝা যায়। জনবিন্যাসে শিবকালীপুব নবশাক সম্প্রদাযেব চাষী সদ্গোপ প্রধান গ্রাম, যাবা বেশিব ভাগই ছোট বাযত চাষী। দেবু পণ্ডিত, দ্বারকা চৌধুরী, ছিরে পাল এই শ্রেণীতে পড়ে। আব আছে হবিজন যারা সংখ্যাগবিষ্ঠ, বায়েন, বাউবী ইত্যাদি। এবা ছাড়া আছে কাযস্থ জগন ডাক্তাব, আব ব্রাহ্মণ হবেন ঘোষাল। দেখুবিষায় উচ্চবর্ণেব কেউ নেই। এখানে কিছু চাষী সদ্গোপ ছাড়া গ্রামেব বেশিব ভাগ মানুষ' ভল্লা বাগ্দী, অর্থাৎ হরিজন! গ্রামের মোড়ল তিনকড়ি সামাজিক সংঘট্টের এক বিশেষ চবিত্র। কুসুমপুব মুসলমানদের গ্রাম, অমুসলমান পরিবাব একঘরও নেই। তার মানুষদের সুখে দুঃখে নেতৃত্ব দেয দুর্ধর্ষ গোঁয়ার, সাদা মনেব নির্বোধ মানুষ রহম। পাশ থেকে রহমকে সাহায্য করে ইরসাদ মিঞা! গ্রামের সবচেয়ে ধনী দৌলত শেখ মানুষজনের কাছে অপাঙক্তেয। তবে

সংঘট্টের এক চরম মুহূর্তে মালিকপক্ষের একান্ত বিশ্বাসভাজন হয়ে নেতৃত্ব দেয় সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢেলে আন্দোলন ভেঙ্গে দিতে। আর রয়েছে কঙ্কণার ব্রাহ্মণ জমিদার, ব্যবসায়ী, ধনী আর শহরবাসী জমির উপস্বত্ব ভোগীর দল যারা গ্রাম সমাজের এই আন্দোলনের প্রতিপক্ষ।

পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে তারাশঙ্কর যে সংহতি ও সংঘাতের কথা বলেছেন সেটা ছিল আসলে শিবকালীপুর দেখুরিয়া আর কুসুমপুরের হিন্দু ও মুসলমান নিম্নবর্গের মানুষদের সঙ্গে কঙ্কণার জমিদারদের দ্বন্দ্ব। মহাগ্রাম এখানে এই গণ আলোড়নে ন্যায়রত্নের ভূমিকার মাধ্যমে যোগান দিয়েছে নৈতিক শক্তির, মনোবলের। মতাদর্শের যোগানও আসতে পারতো ন্যায়রত্নের পৌত্র বিশ্বনাথের মাধ্যমে, তবে সেটা এই গ্রাম সমাজের সীমিত অভিজ্ঞতার ফসল নয়, সেটা ছিল সর্বভারতীয়, আসলে আন্তর্জাতিক। ভাবী কালের সেই ডাক শোনা ও সাড়া দেওয়ার মতো মানসিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রস্তুতি পঞ্চগ্রামের মানুষদের ছিল না। তাই পথের দ্বন্দ্বে আপাততঃ তার ভূমিকা নেই, রহমের উক্তিতে সেই মীমাংসা হয়ে গেল বলে বিশ্বনাথ, দেবুর বিশু-ভাই, হাসিমুখে বিদায় নেওয়ার সময় বলেছিল, "এখন যাই, তবে ডাকলেই আসব, হয়তো বা নিজের থেকেই আসব কোন দিন।" সেই ডাক আর আসেনি। বিশ্বনাথের দলও তাদের কর্মক্ষেত্রের সীমাবদ্ধতা বোঝেনি। বোঝেনি দেবু পণ্ডিতও। কিন্তু আশ্চর্য ঘটনা হলো বুঝেছিল দুর্গা, পাতু মুচীর স্বৈরিণী বোন। তাই সাহায্যদান সমিতির দুয়ারে গ্রামের দুঃস্থ মানুষ ন্যায়রত্নের প্রতি পৌত্র বিশ্বনাথের আচরণে শিউরে উঠে তখনকার মতো মুখ ফিরিয়ে থাকলেও পেটের জ্বালায় তারা যে আসবেই, সেই বিশ্বাসের কথা দেবু পণ্ডিতকে বলতে পেরেছিল দুর্গা। "জামাই-পণ্ডিত তোমার বিশু-ভাইকে চলে যেতে দিলে কেন, কেন তাকে আটকাতে চেষ্টা করলে না।" কিন্তু তখন অঘটন যা, ঘটে গিয়েছে।

পঞ্চগ্রামের নিম্নবর্গের সামাজিক আলোড়ন যে আর রাজনৈতিক আন্দোলনের বৃত্তের বাইরে থাকতে পারবে না, দেবু পণ্ডিতের জীবনের উপন্যাসে বিধৃত বাকি ইতিহাসের মধ্য দিয়ে তারাশঙ্কর তা বোঝাতে চেয়েছেন। উনিশ শ' তিরিশের আইন অমান্য আন্দোলন পঞ্চগ্রামের মানুষদেরও টানবে অপ্রতিরোধ্য শক্তিতে এটা তারাশঙ্করও দেখিয়েছেন উপন্যাসে। সেই টানে যারা সাড়া দিয়েছে তারা অধিকাংশই চাষীপরিবারের লোক, হয়তো হরিজন

সমাজের কেউ কেউ। কারণ রাজনীতি, তার উপর আইন অমান্যের রাজনীতি তাদের চেনা জগতের বাইরেকার ঘটনা। সেখানে সাময়িক উত্তেজনার আগুন পোহানো যায়, তাকে জীবনের লক্ষ্যে পরিণত করা যায় না। সর্বস্ব পণও করা যায় না। নিঃসঙ্গ জীবনে হাঁপিয়ে ওঠা দেবু পণ্ডিত তীর্থ পরিক্রমায় গিয়েছিল বিশ্বনাথ চলে যাওয়ার কিছুকাল পরেই। তারপর অন্য প্রদেশে রাজনীতির কর্মচাঞ্চল্য লক্ষ্য করে আর কাশীতে ন্যায়রত্নের উপদেশ শুনে ফিরে আসে স্বক্ষেত্রে সেই রাজনীতির জোয়ারে ঝাঁপিয়ে পড়তে। তারপর এক টানা তিন বছর দু'দফায় কারাবাসের পর যেদিন ফিরে আসে তখন কংগ্রেস সংগঠন টিকে আছে মাত্র নামে অথচ তাদের বাঁচার লড়াই চলেছে আগের চেয়ে আরো কঠিন, কঠোর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে।

জমিদার প্রধান কঙ্কণার জনসমাজে এই আইন অমান্য আন্দোলনের তাপ-উত্তাপ কিছুই লাগেনি, অবস্থান্তর ঘটানোর মতো করে। তাদের সঙ্গে জোট বেঁধেছে ছিরে পাল আর দৌলত শেখ। ছিরে পাল শিবকালীপুরের জমিদার আর দৌলত শেখ কুসুমপুরের জমি-জমার কার্যতঃ একছত্র মালিক। কঙ্কণার জমিদারদের সঙ্গেই তাদের নাড়ীর টান, আর প্রগাঢ় ভক্তি রাজশক্তির শৃঙ্খলা বজায় রাখার উপরে। ধনী দৌলত শেখ এর সঙ্গে এটাও বুঝেছে খাজনাবৃদ্ধির প্রচেষ্টায় প্রজা ধর্মঘট কুসুমপুরের জমিদারদের কূট পরামর্শে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢেলে বিপর্যস্ত করে দেওয়া গেছে তখনকার মতো কিন্তু ভবিষ্যতের ভাবনা তার আছে। তাই নিজের স্বার্থে আর হিন্দু প্রধান কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কোন কর্মসূচিতে বিপদগ্রস্ত না হওয়ার প্রস্তুতিতে মুসলীম লীগে যোগ দিয়েছে।

১৯৩৪ সালে জেল ফেরৎ দেবু পণ্ডিত শিবকালীপুরে পৌঁছেই এই সব খবর পায়। তারপর শোনে তাদের মিলিত উদ্যোগে গড়ে তোলা প্রজা সমিতি ভেঙ্গে গেছে। হরিজন শ্রেণীর মানুষদের অনেকেই চাষের কাজ ছেড়ে রোজ যায় কলে খাটতে। ছোট, মাঝারি আর প্রান্তিক চাষী যারা আছে, যারা কৃষি শ্রমিক হিসেবে তখনও রয়ে গেছে গ্রামে, তাদের সামনে জীবন সংগ্রামই মুখ্য। ব্যর্থ রাজনৈতিক আন্দোলনে কংগ্রেস কমিটি এখন আর নেতৃত্ব দেওয়া দূরে থাক্ তাদের সুসংহত করতেও পারবে না। দেবু শোনে ইরসাদ ভাই গড়েছে কৃষক সমিতি। দেবু পণ্ডিত বোঝে তাদের নতুন করে বাঁচার পথ খুঁজে পেতে হবে কংগ্রেসের মতো, কিম্বা প্রজা সমিতির মতো গণ সংগঠনের মধ্য দিয়ে নয়, সেটা পেতে হবে শ্রেণী সংগঠনের মধ্যে। এই কৃষক সমিতি' গঠন হবে দেবু পণ্ডিতের নতুন কাজ, নতুনতর সক্রিয়তার ক্ষেত্র।

॥ চার ॥

পঞ্চগ্রাম উপন্যাসে তারাশঙ্কর দেবু পণ্ডিতের গ্রাম সমাজ কেন্দ্রিক সীমিত রোমান্টিক সমাজ চেতনা থেকে গণচেতনার স্তরে উত্তরণের প্রথম পর্বে প্রজা সমিতি গঠন, দ্বিতীয় পর্বে সেই চেতনায় রাজনীতির একটা মাত্রা যোগ করতে কংগ্রেস কমিটি স্থাপন, আর শেষ পর্বে গণচেতনাকে শ্রেণী চেতনায় পরিণত করতে কৃষক সমিতি স্থাপনের পর্ব পর্বান্তর এমনভাবে উপস্থিত করেছেন, যা তাঁর আগে বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নি। চণ্ডীমণ্ডপ কেন্দ্রিক চিরায়ত গ্রাম সমাজ যে বিকাশমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার চাপে ভিতর থেকে ঘুণ ধরা একটা কাঠামো সর্বস্ব অচলায়তন হয়ে পড়বে, বিত্তবান ও নির্বিত্তদের স্বার্থ দ্বন্দ্ব যে ক্রমশঃ প্রকট হয়ে উঠবে, তার অভিঘাতে গ্রামীন গরীবদের একাংশ যে শুধু বেঁচে থাকার জন্যে শহরে কলকারখানায় কুলি মজুর হয়ে পড়বে, আর তারপরে যারা থেকে যাবে গ্রামীণ নিম্নবিত্ত খেটে খাওয়া মানুষ তাদের যে শ্রেণীসংগঠন ও শ্রেণী আন্দোলনের দিকে যেতে হবে, তারাশঙ্কর সামাজিক আলোড়নের সেই দিকের একটা পূর্ণাঙ্গ ছবি ধাত্রী-দেবতা, গণদেবতা ও পঞ্চগ্রাম এই তিনটি উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। ১৯১১-১২ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল, এই দুই দশক তাঁর সামাজিক ইতিহাসের কাল-গত পটভূমি। সামাজিক টেনশনের অনিবার্য পরিণতি শ্রেণী সংহতি, শ্রেণী রাজনীতি, তারাশঙ্করের উপন্যাসে সেই ইতিহাসের সত্য এদেশের পটভূমিতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

এই শ্রেণী রাজনীতি শুরু হলেও তার সফল পরিণতি আসতে যে অনেক দেরী হতে পারে ঘটনার কুটিল গতিতে, কায়েমী স্বার্থবাদীদের নানা চক্রান্তে তিন দশক পরের ঘটনায় বীরভূম জেলার এই অঞ্চলের সমাজচিত্র বর্ণনায় তিনি অকুণ্ঠভাবে সে কথাই বলেছেন। সেদিনের সেই ছিরে পালরা ষাটের দশকেও যে অন্য নামে আগের মতোই সমস্ত ঠাটবাট বজায় রেখে বেঁচে বর্তে আছে। তারাশঙ্কর ছকু চাটুজ্যের জবানীতে লিখেছেনঃ "এই বীজাণু মারাত্মক বীজাণু, গ্রামে ইহার জন্ম এবং গ্রামের মাটিতে জলে কলেরার বীজাণুর মত বাড়ে। এ বীজাণুকে সাহিত্যিক ডাক্তার শরৎচন্দ্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন —তুমিও তাহাদের মধ্য হইতে আর এক জাত আবিষ্কার করিয়াছ। শরৎচন্দ্র এ বীজাণুর নাম দিয়াছেন গোবিন্দ গাঙ্গুলী (পল্লীসমাজ)। তুমি নাম দিয়াছ ছিরু পাল (পঞ্চগ্রাম, গণদেবতা)।" (গ্রামের চিঠি / ৫, ১৪ই ভাদ্র, ১৩৭০ / ৩১শে আগস্ট, ১৯৬৩, যুগান্তর পত্রিকা)। তারাশঙ্কর ইতিহাসের ধারা যে সঠিকভাবেই বুঝেছিলেন সামাজিক আলোড়নের উত্তরণ শ্রেণী সংহতিতে, শ্রেণী সংগ্রামে, এটাই তাঁর সমাজচেতনার সার্থক পরিচয়।

———

তারাশঙ্কর ঃ তথ্যপঞ্জী

অলক মণ্ডল

তাবাশংকর এক বহুমুখী বিবল প্রতিভা। অনেক লেখকেব মতো কবিতা দিয়ে মাত্র আট বৎসর বযসে তাঁর সাহিত্য বচনার সূত্রপাত। তাঁর ২৮ বৎসব বয়সে প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের (কবিতাব) নাম 'ত্রিপত্র' (প্রকাশ ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯২৬)। প্রকাশক চন্দ্রনাবাযণ মুখোপাধ্যায। লাল কালিতে ছাপা। শবৎচন্দ্রের অক্ষম অনুকবণে রচিত প্রথম উপন্যাস 'দীনাব দান' শিশিব পাবলিশিং হাউস থেকে শিশিব কুমাব বসু সম্পাদিত 'এক পযসার শিশির' পত্রিকায ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয। গ্রন্থাকাবে যা আজও প্রকাশিত হযনি। অসংখ্য উপন্যাস (৭০ টিব ওপব), ছোটগল্প (প্রায় ২০০টি) ছাড়া নাটক, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গান (৫৬ টিব ওপব)। আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, ছবি আঁকা ও কাঠের ভাস্কর্যে তাঁব প্রতিভাব স্বাক্ষর ছড়িযে আছে। সেই বহুমুখী প্রতিভাব পবিচয সম্বলিত তথ্যপঞ্জী বচনাব আমরা প্রয়াসী হয়েছি। তারাশংকব সম্পর্কিত আলোচনায় তাঁব উপন্যাস, গল্পেব তালিকা বহুবাব বিভিন্ন জাযগায় উল্লেখিত হওযায তা এখানে দেওযা হল না।

তাবাশংকবের বচিত মোট গ্রন্থেব সংখ্যা প্রায় ১৪৫টি। তমধ্যে আ আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা ও ভ্রমণকাহিনী জাতীয় গ্রন্থ যথা—

(১) আমাব কালেব কথা—প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮ (১৯৫১)। প্রকাশক ঃ (বেঙ্গল পাবলিশার্স, নিউ বেঙ্গল প্রেস (১৩৯৪) কলকাতা। তাঁব জন্মবৎসব ১৮৯৮ থেকে কৈশোরেব বিকাশ পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯১১ / ১২ সাল নাগাদ কাহিনীর বিস্তাব।

(২) কৈশোব স্মৃতি—প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬৩ (১৯৫৬)। প্রকাশ শ্রাবণ নিউ বেঙ্গল প্রেস, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা। বাজনৈতিক কাবণে পড়া ছেড়ে নিজেব গ্রমে তাবাশংকর অন্তবীন হন। কাহিনীব বিস্তার ১৯১২ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত বিস্তৃত।

(৩) আমাব সাহিত্য জীবন (১ম খণ্ড)—প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৬০ (১৯৫৩) প্রকাশক বেঙ্গল পাবলিশার্স, নিউ বেঙ্গল প্রেস। কল্লোল পাবলিশিং, কলকাতা ১৯১৬ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত কাহিনীর বিস্তার। এই দীর্ঘ সময়ে

কলকাতায় বাসা ভাড়া নিয়ে বাগবাজারের আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে সপরিবারে বাস করছিলেন।

(৪) আমার সাহিত্য জীবন (২য় খণ্ড)—প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৬৯ (১৯৬২), প্রকাশক সন্দেব প্রকাশন, নিউ বেঙ্গল প্রেস (১৩৭৬), রবীন্দ্র লাইব্রেরী, কলকাতা। কাহিনী বিস্তার ১৯৫০ সালের পরবর্তী সময় এবং প্রাক্ স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত। যদিও স্বাধীনতার কিছুকাল পর্যন্ত ঘটনাগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে তবুও স্বাধীনতার দিন পর্যন্ত এসে ছেদ টেনেছেন। সম্প্রতি আমার সাহিত্য জীবন (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে) পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী প্রকাশ করেছেন (১৯৯৭)।

(৫) বিচিত্র (মনের আয়নায়)—প্রকাশ চৈত্র ১৩৫৯ (১৯৫২)। প্রকাশক ডি. এম, লাইব্রেরী, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, সাহিত্যম্ কলকাতা।

(৬) মস্কোতে কয়েকদিন (ভ্রমণকাহিনী)—প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬৪ (১৯৫৮)। প্রকাশক ঃ অভিজিৎ প্রকাশনী, ৭২/১ কলেজ স্ট্রীট কলকাতা-১২ ১৯৫৮ সালে লেখকের মস্কো ভ্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত। সম্পাদনা (লেখক পুত্র শ্রী সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক ঃ অনামিকা।

(৭) আমার কথা ঃ প্রকাশ পৌষ ১৪০২ (১৯৯৬) পাবলিশার্স, ১০/২ বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা—৯।

লেখকের শেষ আত্মস্মৃতিমূলক রচনা, একসময়ে 'শনিবারের চিঠি' তে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত ব্যক্তিগত জীবন ভাবনা ও উপলব্ধির অসমাপ্ত কথা।

তারাশংকর জীবনের শেষ দিকে ডায়েরী লিখতেন যা আজও অপ্রকাশিত। এছাড়া আজও গ্রন্থিত হয়নি তারাশংকরের বিপুল পত্রসাহিত্য।

প্রবন্ধ-সাহিত্য ঃ

(১) সাহিত্যের সত্য (প্রবন্ধ সংকলন) ঃ প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ (১৯৬০) প্রকাশ ঃ আনন্দ পাবলিশার্স, লিপিকা, ৯, এণ্টনি বাগান লেন, কলকাতা-৯।

(২) ভারতবর্ষ ও চীন ঃ প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৭০ (১৯৬৩)। প্রকাশক ঃ এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্স, কলকাতা। ১৯৫৭ সালে চীন সরকারের আমন্ত্রণে লেখকের চীন ভ্রমণের অভিজ্ঞতা এবং ভারত চীনের নবজীবন ও অগ্রগতির তুলনামূলক আলোচনা।

(৩) রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার পল্লী ঃ প্রকাশ ভাদ্র ১৩৭৮ (১৯৭১)। প্রকাশক ঃ সাহিত্য সংসদ, অনামিকা পাবলিশার্স, কলকাতা। এটি ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী (১৪ থেকে ১৮) মাসে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃপেন্দ্র চন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা মালার সংকলন।

(৪) পাঁচজন নাট্যকারের সন্ধানে—প্রকাশ ১৩৭০ (১৯৭৭) প্রকাশক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রস্তাবনা ও সম্পাদনা—ড, সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৭১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক দ্বিজেন্দ্রলাল রায় স্মৃতি বক্তৃতা (মধুসূদন, দ্বিজেন্দ্রলাল, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে) দিতে আহ্বান পান। তারাশঙ্কর এই বক্তৃতা প্রদানের আগেই ইহলোক ত্যাগ করেন। এই লিখিত বক্তৃতা পরে ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভায় পাঠ করেন।

(৫) গ্রামের চিঠি (সংবাদমূলক)—প্রকাশ জুলাই, ১৯৮৬, প্রকাশক ঃ সারস্বত লাইব্রেরী। গ্রন্থটি তপোবিজয় ঘোষ সম্পাদিত। দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিগুলো ১৯৬৩ সালের জুলাই থেকে ১৯৬৫ সালের ২১ আগস্ট পর্যন্ত লিখিত হয়।

(৬) মনে রাখার মতো (প্রবন্ধ সংকলন)—সম্পাদনা সবিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশ মাঘ ১৪০৩। প্রকাশক ঃ মডার্ন কালাম, কলকাতা।

নাট্যকার ঃ নাট্যকার তারাশঙ্করের প্রথম রচিত (১৩৩৩ বঙ্গাব্দে) ঐতিহাসিক নাটক 'মারাঠা তর্পণ' (আর্ট থিয়েটার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত) স্থানীয় লাভপুর থিয়েটার ক্লাবে অভিনীত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ১৫টি নাটকের ৮ খানির মতো কলকাতার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের জন্য তারাশংকরের রচিত তিনটি একাংক নাটক যথা (১) উমানন্দের মন্দির, (২) ডাইনীর মায়া, (৩) অভিশপ্ত।

১৫টি নাটক যথা—১) চকমকি, কোথাও মঞ্চস্থ হয়নি।

(২) কালিন্দী দুবার অভিনীত। প্রথমবার ১২ই (১৯৪১) নাট্যনিকেতনে নরেশ মিত্রের পরিচালনায়, দ্বিতীয়বার স্টারে মহেন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায়।

(৩) দুই পুরুষ—শিশির মল্লিক প্রযোজিত নরেশ মিত্র ও সতু সেনের পরিচালনায় সবচেয়ে মঞ্চসফল নাটকটি ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, প্রভাদেবী

প্রমথ নাট্যভারতীতে (অধুনা গ্রেস সিনেমা) অভিনীত হয়।

(৪) পথের ডাক—নাট্যভারতীতে অভিনীত হয়।

(৫) বিংশ শতাব্দী—রঙমহলে অভিনীত হয়।

(৬) আহমদ শাহ আবদালী—পানিপথের ৩য় যুদ্ধ অবলম্বনে এই নাটক স্টারে অভিনীত হয়।

(৭) দ্বীপান্তর—পূর্ব নাম ছিল সোনার পদ্ম। কালিকা থিয়েটারে অভিনীত হয়।

(৮) কবি—উপন্যাসের নাট্যরূপ রঙমহল থিয়েটারে অভিনীত হয়।

(৯) কালরাত্রি—একাঙ্ক নাটক, কোন মঞ্চে অভিনীত না হলেও আকাশ-বাণীতে অভিনীত হয়।

(১০) যুগবিপ্লব—মারাঠা তর্পনের ছায়া থাকলেও সম্পূর্ণ নতুন রূপ, স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়।

(১১) রাধা—বিশ্বরূপা থিয়েটারে অভিনীত হয়।

(১২) সংঘাত—তিন অংকের নাটক। কোথাও অভিনীত হয়নি।

(১৩) আরোগ্য নিকেতন—নাট্য নিকেতনে (পরে বিশ্বরূপায়)।

(১৪) মহাত্মাশিশির কুমার—অমৃতবাজার পত্রিকা গোষ্ঠী অভিনয় করে।

(১৫) বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা—কোথাও অভিনীত হয়নি।

তারাশংকরের নাটকসমগ্র (১ম ও ২য় খণ্ড) ডঃ অজিতকুমার ঘোষের সম্পাদনায় লিপিকা থেকে প্রকাশিত।

অভিনেতা : বাল্যকাল থেকেই তারাশংকর স্বগ্রাম লাভপুরের 'বন্দে মাতরম' থিয়েটার-এ অভিনয় করতেন। পুরুষ ও স্ত্রী চরিত্রে তাঁর অভিনয়ের একটি তালিকা দেওয়া হল।

॥ পুরুষ চরিত্র ॥

চরিত্র	নাটক
১) শকুনি	কর্ণার্জুন
২) চন্দ্র এবং বিনোদ	শেষরক্ষা (বেতার নাটক)
৩) শ্রীশ	চিরকুমার সভা

॥ নারী চরিত্র ॥

চরিত্র	নাটক
১) বিনোদিনী	বঙ্গলক্ষ্মী
২) মরিয়ম	চাঁদবিবি
৩) জ্ঞানদা	প্রফুল্ল
৪) সীতা	সীতা

চরিত্র	নাটক	চবিত্র	নাটক
৪) যজ্ঞেশ্বব	বঙ্গনারী (দ্বিজেন্দ্র-লাল)		(যোগেশ চৌধুরীর)
		৫) কল্যাণী	প্রতাপাদিত্য
৫) নসীরাম	মারাঠা তর্পণ	৬) মেজবৌ	গৃহলক্ষ্মী
৬) কেদার	বৈকুণ্ঠের খাতা (বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র প্রযোজিত বেতার নাটক)		
৭) ভৃত্য	বশীকরণ		
৮) কৃষ্ণ	কৃষ্ণার্জুন		

গীতিকবি ঃ তারাশঙ্কব প্রায ৫৬টিব ওপব গান বচনা কবেছেন। গানগুলিব মধ্যে কিছু গান বেশ জনপ্রিয এবং জনসাধাবণেব মনোবঞ্জনেব ভেতব দিযে আজও প্রতিনিযত সঞ্জীবিত। যেমন (আমি) ভালবেসে এই বুঝেছি। সুখেব লাগি সার সে চোখেব জলে রে, - মধুর মধুর বংশী বাজে। কোথা কোন্ কদমতলীতে ·····তোমার শেষ বিচারের আশায বসে আছি ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাবাশঙ্করের গানের একটি ক্যাসেট (সুর ও শিল্পী জগন্নাথ মুখোপাধ্যায) প্রকাশিত হযেছে (১৯৯৭ এ)। প্রকাশ করেছেন করেছেন তাবাশঙ্কর পবিষদ, ২৫ সি তাবাশঙ্কব সবণী, কলকাতা-৩৭।

শিশু কিশোবদেব ঃ তাবাশঙ্কবেব শিশু কিশোবদেব গল্পের মধ্যে কালা পাহাড, প্রবিন সিংয়ের ঘোড়া, ডগি এ্যালসেশিযান নয, আঙ্গুলে খেলোয়াড ও বমজান শের আলি, চিনু মণ্ডলের কালাচাঁদ, হেডমাস্টাব কান্না, জটাযু, ভুলোব কাশীযাত্রা, স্বাধীনতা, উত্তব কিস্কিন্ধ্যা কাণ্ড (গল্প গ্রন্থও বটে) উল্লেখযোগ্য। বম্য বচনা জাতীয কাহিনীর মধ্যে স্বর্গলোকে ভূমিকম্প ও ভূতপুবাণ (চিত্রসম্বলিত) অন্যতম।

'কামন্দক ও হাবুশর্মা' নামেব আডালে ঃ 'কামন্দক' ছদ্মনামেব আডালে তারাশঙ্কব লাভপুবেব স্থানীয় 'পূর্ণিমা পত্রিকায কিছু কবিতা সমালোচনা ও বঙ্গগল্প লেখেন (১৯২৭ এ)। গল্পেব মধ্যে মুকুন্দের মজলিশ (অগ্রহাযণ ১৩৩৩), ভালচাব ক্লাব (পৌষ ১৩৩৩) কলাকসরৎ (মাঘ ১৩৩৩) উপন্যাসে উপদ্রব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। 'শনিবাবের চিঠি' তে 'হাবুশর্মা' ছদ্মনামেও (বাল্যকালে তাবাশংকরেব ডাক নাম ছিল হাবু) কিছু রচনা লেখেন।

অনূদিত গল্প ঃ কুড়োনো ঘডি

সম্পাদক ঃ লাভপুব থেকে প্রকাশিত 'পূর্ণিমা' মাসিক পত্রিকায সহসম্পাদক হন ১৯২৬ সালে। ১৯৩৪ সালে হন বিখ্যাত 'শনিবারেব চিঠি' সহ সম্পাদক। ১৯২৬ সালে চীন ভাবত সংঘর্ষেব পর 'যুগান্তব' সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় পদত্যাগ করলে তাবাশঙ্কব সম্পাদকমন্ডলীর সদস্যবূপে যোগ দেন।

রাজনীতিবিদ ও সমাজসেবী ঃ গান্ধীবাদী কংগ্রেস কর্মী হিসাবে, তারাশঙ্কর অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়ে সিউড়ী জেলে কারাবন্দ্ধ হন (১৯৩০ এ)। ১৯৫২ সালের ১লা এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তাঁকে বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত করেন। ২রা এপ্রিল বিধান পরিষদের সদস্যপদ থেকে অবসর গ্রহণ। ১৯৬০ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতি সাহিত্যিক হিসাবে তাঁকে রাজ্যসভার সভ্য মনোনীত করেন। যৌবনে লাভপুরে সোস্যাল সার্ভিস প্রতিষ্ঠার (১৯২১) মাধ্যমে দেশসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

শ্রীহীন তারাশঙ্কর ঃ তারাশঙ্করের সময়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে আর এক ঔপন্যাসিক (শ্রীময়ী ও অমানিতা মানবী ইত্যাদি উপন্যাসের স্রষ্টা) আত্মপ্রকাশ করেন। ডি. এম. লাইব্রেরী ছিলেন তাঁর প্রকাশক। পাঠকদের বিভ্রান্তি দূর করতে তিনি নামের আগে 'শ্রী' বর্জন করেন।

নামরহস্য ঃ শারদ শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে লাভপুরে তারাশঙ্করের পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তারামায়ের পুজো ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এ ঘটনার ঠিক দশমাস পরে তারামায়ের আশীর্বাদে নবজাতকের জন্ম হলে গোঁসাইবাবা রামজী সাধু নবজাতকের নাম রাখেন তারাশঙ্কর।

পিতাপুত্রের রচনা ঃ তারাশঙ্কর তাঁর দুটি উপন্যাস সম্পূর্ণ করে যেতে পারেননি। সেই অসম্পূর্ণ উপন্যাস দুটি শতাব্দীর মৃত্যু (২য়, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড) ও শিবাজীর স্বপ্ন সম্পূর্ণ করেন জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রয়াত সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। ধূসর তাম্রলিপ্ত ও 'অঙ্গজ' ইত্যাদি উপন্যাসের স্রষ্টা ছিলেন তারাশঙ্করের এই পুত্র।

সম্মান ঃ রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে তারাশঙ্করই সম্ভবত একমাত্র সাহিত্যিক যিনি তাঁর সমগ্র জীবনে ভারতের প্রায় সবকটি সাহিত্য পুরস্কার ও ৫ য় সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক স্বীকৃতি পেয়েছেন।

তারাশঙ্কর সরণি ঃ ১৯৮০ সালের ২৩শে জুলাই প্রয়াত তারাশঙ্করের ৮৩ তম জন্মদিনে তাঁর কলকাতাস্থ বাসভবন সংলগ্ন টালাপার্ক এভিনিউ এর নামকরণ হয় তারাশঙ্কর সরণি।

গণদেবতা এক্সপ্রেস ঃ জন্মশতবর্ষের প্রাক্কালে তারাশঙ্করের কালজয়ী সৃষ্টি 'গণদেবতার নামানুসারে ভারতীয় রেলওয়ে হাওড়া রামপুর হাট এক্সপ্রেসের নামকরণ করেন 'গণদেবতা এক্সপ্রেস।

তারাশঙ্করের জীবন ও সাহিত্যের ওপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। জন্মশতবর্ষেও বেশ কিছু গ্রন্থ ও বিশেষ জন্মশতবর্ষ স্মারকসংখ্যা প্রকাশিত হচ্ছে ও হবে। যেমন, তারাশঙ্কর জন্মশতবর্ষ স্মারকসমিতি উদ্যোগে তারাশঙ্কর স্মারক গ্রন্থের কাজ শুরু হয়েছে বারিদবরণ ঘোষের সম্পাদনায়। পরিবেশক মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স। তারাশঙ্করের স্বগ্রাম লাভপুর তারাশঙ্কর জন্ম

শতবার্ষিকী কমিটিব 'তাবাশঙ্কব স্মবনিকা প্রকাশ কবেছেন। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমী ও সাহিত্য আকাদেমীও তাবাশঙ্কবের ওপব পৃথক পৃথক গ্রন্হ বচনায উদ্যোগী হযেছেন।

সুধী পাঠক-পাঠিকা, তাবাশঙ্কব অনুবাগী ও গবেষকদেব সুবিধার্থে তাবাশঙ্কবেব জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কিত একটি গ্রন্হপঞ্জি দেওযা হল। উল্লেখ্য, পত্র পত্রিকায তাবাশঙ্কব চর্চাব তালিকা দেওযা গেল না ঃ

১। তাবাশঙ্কব—ডঃ হবপ্রসাদ মিত্র, শতাব্দী গ্রন্হভবন।

২। তাবাশঙ্কবেব শিল্পিমানস—ডঃ নিতাই বসু, দে'জ পাবলিশিং।

৩। ঔপন্যাসিক তাবাশঙ্কব—ডঃ মুক্তি চৌধুবী, মর্ডান বুক এজেন্সী।

৪। তাবাশঙ্কর দেশকাল সাহিত্য—ডঃ উজ্জ্বল কুমাব মজুমদার সম্পাদিত।

৫। নাট্যকাব তাবাশঙ্কব—ডঃ মানস মজুমদার সাহিত্যশ্রী।

৬। তাবাশঙ্কবেব জীবন ও সাহিত্য—ডঃ সমবেন্দ্রনাথ মল্লিক, প্রতিভাস।

৭। তাবাশঙ্কর স্মৃতিমাল্য—দিলদাব সম্পাদিত, কল্পনা সাহিত্য মন্দিব।

৮। তাবাশঙ্কব　　—সুজিত কুমার নাগ সম্পাদিত গ্রন্হবিতান

৯। তাবাশঙ্কব স্মৃতি—বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত, সাহিত্যম নির্মল বুক এজেন্সী।

১০। তাবাশংকব বিচিত্রা—　,,　সাহিত্যালোক।

১১। তাবাশংকব অন্বেষা—সবোজ বন্দ্যোপাধ্যায সম্পাদিত বমা প্রকাশনী।

১২। সোনাব মলাট তাবাশংকব—শ্যামল চক্রবর্তী সম্পাদিত, বামাযণী প্রকাশভবন।

১৩। উপন্যাসেব শৈলী ঃ তাবাশঙ্কব ও মানিক বন্দোপাধ্যায আশিস কুমার দে।

১৪। ছোটগল্পে ত্রযী তাবাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ডঃ বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য পপুলাব লাইব্রেবী।

১৫। গল্পকাব তাবাশঙ্কব ও মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায—ধ্রুব কুমাব মুখোপাধ্যায সম্পাদিত।

(১৬) তাবাশংকবের ছোটগল্প—অধ্যাপক দেবকুমার ঘোষ, শিলালিপি।

(১৭) তাবাশংকরেরধাত্রীদেবত —ক্ষেত্রগুপ্ত ও জ্যোৎস্না গুপ্ত, গ্রন্হনিলয।

(১৮) তারাশংকবেব গণদেবতা—বাণী দে, রমা প্রকাশনী।

(১৯) তাবাশংকবেব কবি—অরুণচাঁদ দত্ত, পরিবেশক, কারেণ্ট বুক এজেন্সী।

২০। তারাশংকব ও রাঢ বাংলা—রঞ্জিতকুমার মুখোপাধ্যায, নবার্ক।

২১। তাবাশংকর ও কালিন্দী—পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, রমা প্রকাশনী।

(২২) তাবাশংকরেব কালিন্দী—ডঃ সমবেশ মজুমদাব, রত্নাবলী।

(২৩) তাবাশংকবেব কবি—স্বস্তি মণ্ডল, বামা পুস্তকালয়।

(২৪) প্রসঙ্গ হাঁসুলী বাঁকেব উপকথা—সম্পাদনা ববীন পাল, নিমাই দাশ, অনিল রায, চ্যাটার্জী পাবলিশার্স।

(২৫) তাবাশংকবেব গল্পগুচ্ছ (১ম, ২য ও ৩য খণ্ড) জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত সাহিত্য সংসদ।

(২৬) তারাশংকব ঃ সময় ও সমাজ—ডঃ আদিতা মুখোপাধ্যায পাণ্ডুলিপি।

(২৭) তারাশংকর সাহিত্য সমীক্ষা—ডঃ গৌরমোহন রায়, সাহিত্যশ্রী।

(২৮) বিভূতিভূষণ / তারাশংকব ব্যক্তিরূপ—গৌরীশংকর ভট্টাচার্য, মডার্ন কলাম।

(২৯) আমাব পিতা তারাশংকর—সবিৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ।

(৩০) আমাব কালেব কয়েকজন কথাশিল্পী—জগদীশ ভট্টাচার্য, ভাববি।

(৩১) তাবাশংকব স্রষ্টা ও সৃষ্টি—ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য, পরিবেশক দেব সাহিত্য কুটীব।

(৩২) তাবাশংকব নববিচাব—দুলাল আচার্য, ভোলানাথ প্রকাশনী।

(৩৩) তাবাশংকবেব সাহিত্য ও গান—সন্তোষ কুমাব দত্ত, মহাদিগন্ত।

(৩৪) প্রসঙ্গ তারাশংকব—সন্তোষ ব্রহ্ম সম্পাদিত। পরিবেশক ডেল্টা ফার্মা।

(৩৫) নির্বাচিত বচনা ঃ তাবাশংকব বন্দ্যোপাধ্যায—ডঃ নিতাই বসু সম্পাদিত, পুনশ্চ।

(৩৬) তাবাশংকব বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ রচনা সমগ্র (২৪ খণ্ডে)—মিত্র ও ঘোষ।

(৩৭) Tarasankar Bandopadhyay-Mahasweta Devi—Sahitya Academy।

(৩৮) তারাশঙ্কর—রঞ্জিৎ সিংহ—অনামিক পাবলিশার্স।

(৩৯) পত্রলেখায় তারাশংকর—কাঞ্চনকুন্তলা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত—অমৃতধারা।

(৪০) তারাশংকরের উপন্যাস, অমরেশ দাস—বামা পুস্তকালয়।

(৪১) গল্পকার তারাশংকর—প্রতিভা ও মূল্যায়ণ, তরুণকান্তি রায় সম্পাদিত, পরিবেশক—ভট্টাচার্য ব্রাদার্স।

(৪২) উপন্যাসে আঙ্গিক, বিভূতিভূষণ ও তারাশংকর—চৈতালী বন্দ্যোপাধ্যায়—রত্নাবলী।

(৪৩) ঔপন্যাসিক তারাশংকর—ডঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়।

ভারতীয় ও ইংরাজি ভাষায় তারাশংকরের সাহিত্য ঃ

তারাশংকর একজন বাঙালি সাহিত্যিক হলেও নানা ভারতীয় ভাষায় তাঁর সাহিত্যের অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ায় তিনি একজন সর্বভারতীয় সাহিত্যিকের সম্মানে অধিষ্ঠিত। ইংরেজি ও অন্যান্য বিদেশী ভাষায়ও অনুবাদ সূত্রে (যেমন ইউনেস্কো কর্তৃক) তারাশংকর আন্তর্জাতিক সাহিত্যিকের পরিচিতি লাভ করেছেন। আরও বিভিন্ন ভাষায় (দেশী ও বিদেশী) তারাশংকর সাহিত্যের অনুবাদ হচ্ছে, ভবিষ্যতে হবে—এ আশা করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইংরেজি ও অন্যান্য দেশী-বিদেশী ভাষায় তারাশংকর সাহিত্যের সমগ্র অনুবাদসূচী এখানে দেওয়া সম্ভব হল না।

ভারতীয় প্রাদেশিক ও ইংরেজি ভাষায় অনুবাদের তালিকা ঃ

মূল বই	অনূদিত ভাষা	অনুবাদক
১। অভিযান	হিন্দি	ছেদীলাল গুপ্ত
২। আরোগ্য	,,	হংসকুমার তেওয়ারী
নিকেতন	,,	হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী
	ইংরেজি	এনাক্ষী
	(Sanatorium)	চট্টোপাধ্যায়
	গুজরাটি	রেমানিক মেঘানি

মূল বই	অনূদিত ভাষা	অনুবাদক
	মালয়ালাম	নলিনী আব্রাহম কুট্টাযাম
	তেলেগু	জোনালা গড্ডু সত্যনারায়ণমূর্ত্তি
	তামিল	টি. এন. কুমারস্বামী
	মারাঠী	
	পাঞ্জাবী	
৩। কবি	ওড়িয়া	হেমকান্ত মিশ্র
	অসমীয়া	কেশব মাহাতো
	গুজরাটি	রমনলাল সোনী
	হিন্দি	অজ্ঞাতনামা
	মারাঠী	অরুনানাগরকর
	তামিল	টি. এন. কুমারস্বামী
	পাঞ্জাবী	অমর ভারতী
৪। কালিন্দী	হিন্দি	হংসকুমার তেওয়ারী
	সিন্ধী	মোতি প্রকাশ
	ইংরেজি (The Caprice of the river and the Greed of man	লীলা এল জাভিচ
	তেলেগু	মাম্পিপামলাসুব
৫। কালরাত্রি	হিন্দি	প্রফুল্লচন্দ্র ওঝামুক্ত
৬। গণদেবতা	হিন্দি	হংসকুমার তেওয়ারী
	মারাঠী	ইন্দুমতি সেভেদে
	সিন্ধি	শ্রীচাঁদ
	ইংরেজি (The Temple Pavilion)	লীলা রায়
	,,	অজ্ঞাতনামা
	মালয়ালাম	ইন্দুমতি সেভদে
	ওড়িয়া	বনন্তকুমার দাস
৭। গন্নাবেগম	হিন্দি	হংসকুমার তেওয়ারী

মূল বই	অনূদিত ভাষা	অনুবাদক
৮। মন্বন্তর	ইংরেজি (Epoch's end)	হীবেন মুখার্জি
	হিন্দি	প্রফুল্লকুমাব ওঝামুক্ত
৯। না	হিন্দি	কমল যোশী
	তামিল	এন-সেনাপতি
	তেলেগু	মান্দিপাটলা সুরী বেঙ্কেটশ রাও
১০। উত্তরায়ণ	তামিল	সরস্বতী ফামনাথ
	হিন্দি	হংসকুমাব তেওযারী
	সিন্ধ্রি	বিহাবীলাল
১১। ধাত্রীদেবতা	সিন্ধ্রি	গোবিন্দ মাহী
	তামিল	সম্মুখসুন্দরম্
১২। দুইপুরুষ	হিন্দি	হংসকুমাব তেওযারী
১৩। পঞ্চগ্রাম	ইংবেজি (Five Villages)	মার্কাস এফ ক্রদা ও সুহৃদ কুমাব চ্যাটার্জী
১৪। ভুবনপুরের হাট	হিন্দি	হংসকুমাব তেওযারী
১৫। সপ্তপদী	তেলেগু	মান্দিপাটলা সুবী বেঙ্কটেশ বাও
		বাসুপাল সত্যপ্রিয
	মালযালম	নীলিমা আব্রাহাম
		প্রতাপ চন্দ্রান কোট্টায়াম
	পাঞ্জাবী	অমর ভারতী
	হিন্দি	নেমিচাঁদ জৈন
১৬। রাইকমল	হিন্দি	হংসকুমার তেওয়ারী
	তামিল	সম্মুখসুন্দবম,
	ইংবেজী (The Eternal Lotus)	ইলা সেন
১৭। ফবিয়াদ	হিন্দি	অজ্ঞাত নামা
	মালযালাম	ই. কে. কুইকুটাচান কোট্টাযাম
১৮। রাধা	হিন্দি	হংসকুমার তেওয়ারী
১৯। বিপাশা	তেলেগু	মান্দিপাটলীসুরী
২০। বসন্তরাগ	হিন্দি	কুসুম বান্হিয়া

মূল বই	অনূদিত ভাষা	অনুবাদক
২১। একটি কালো মেযেব কথা	,,	পুষ্প দেবন্দা
২২। মহাশ্বেতা	,,	হংসকুমার তেওযারী
২৩। গুলবদন	,,	রঙ্গনাথ রেক্স
২৪। তামসতপস্যা	,,	ধান্যকুমাব জৈন
২৫। কান্না	,,	হংসকুমাব তেওয়ারী
২৬। প্রান্তিক	,,	ঠাকুবদত্ত মিশ্র
২৭। চাঁপাডাঙ্গার বৌ	তেলেগু	বাজশেখব বাজমুণ্ড্রি
২৮। সংকেত	হিন্দি	হংসকুমাব তেওয়ারী
২৯ সন্দীপন পাঠশালা	হিন্দি	সন্ধ্যাপ্রকাশ
৩০। হাঁসুলী বাঁকেব উপকথা	,,	হংসকুমার তেওয়াবী

গল্প ঃ—

১। বিচারক	মালযালাম	ই. কে. কৃষ্ণাণ ই কুট্টাচান
	তেলেগু	আদর্শ গ্রাভিথা মণ্ডলী
	ইংরেজি (The Judge)	সুধাংশুমোহন ব্যানাজী
২। শিলাসন	ইংবেজি (In the Seat of Stone	হুমাযুন কবিব সম্পাদিত Green Gold, Stories Poems from Bengal এব অন্তর্ভূক্ত
৩। তাবিণীমাঝি	ইং	হীবেন মুখাজী
৪। নারী ও নাগিনী	ইং	,,
৫। জলসাঘর	ইং	দিলীপকুমার গুপ্ত সম্পাদিত নীলিমাদেবী অনূদিত Best Stories of Modern Bengal এর অন্তর্ভুক্ত

মূল বই	অনূদিত ভাষা	অনুবাদক
৬। রাধারাণী	ইং	সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্পাদিত Stories of Rural Bengal এর অন্তর্ভুক্ত
৭। ডাকহরকরা	হিন্দি	হংসকুমার তেওয়ারী
৮। সাপুড়ে গল্প	ইং (The Snake Charmer)	এস, দত্ত অনূদিত Stories of Rural Bengal এর অন্তর্ভুক্ত

★ তারাশঙ্করের কাহিনী অবলম্বনে রচিত যাত্রাপালার তালিকা ঃ

পালা	দল	পালাকার
১। কালিন্দী	লোকনাট্য	সত্যপ্রকাশ দত্ত
২। কবি (জ্যোৎস্না দত্ত গুরুদসে ধাড়া)	শিল্পীতীর্থ	নির্মল মুখোপাধ্যায়
৩। গন্নাবেগম	নট্টকোম্পানী	আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়
৪। গনদেবতা	লোকনাট্য (নির্দেশনা শ্যামল সেন)	ভৈরব গঙ্গোপাধ্যায়
৫। চাঁপাডাঙার বৌ (স্বপন কুমার, স্বপ্না কুমারী অভিনীত)	ভারতী অপেরা	সত্যপ্রকাশ দত্ত
৬। ডাকহরকরা	শিল্পীতীর্থ	কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
৭। নাগিনী কন্যা	আর্য অপেরা	পার্থপ্রতিম চৌধুরী
৮। না	নিউ আর্য অপেরা	আগন্তুক (দিলীপ দাস)
৯। দুই পুরুষ	,,	কমল কৃষ্ণ খাঁ
১০। দীপান্তর	শিল্পীতীর্থ	আনন্দময় বন্দ্যোপাধ্যায়
১১। প্রতিমা	,,	নির্মল মুখোপাধ্যায়
১২। ফরিয়াদ	জনতা অপেরা	কুনাল মুখোপাধ্যায়
১৩। মঞ্জরী অপেরা	কল্যাণী অপেরা	নন্দগোপাল রায়চৌধুরী
১৪। রাইকমল	অগ্রগামী	কানাইলাল নাথ

তাবা ভট্টাচার্য, তারাবাণী পাল অভিনীত)

১৫।	সপ্তপদী	স্বপন অপেবা	বীরু মুখোপাধ্যায়
১৬।	হাঁসুলী বাঁকের উপকথা	নিউগনেশ অপেবা	ভৈবব গঙ্গোপাধ্যায়
১৭।	পুত্রহাবাব কান্না, (অগ্রদানী)	আর্য অপেবা	,,
১৮।	অগ্রদানী	,,	,,

★ পাকিস্তান ও বাংলাদেশে প্রকাশিত তারাশঙ্করের কিছু গ্রন্থ ঃ

১।	বসন্ত বাগ	লাহোব ইউনিভার্সাল পাবলিকেসন।
২।	বিচিত্র	,,
৩।	বিচারক	মুচিগেইট, লাহোর, গোলাম আলী খান
৪।	বিপাশা	আনাবকলি রোড, লাহোব, খাঃ ইউসুফ বাযহান
৫।	ভুবন পুবেব হাট	আবিন্দা, ঢাকা, কল্পনা পাবলিশার্স
৬।	মহাশ্বেতা	ঢাকা বুক লিংক
৭।	বাইকমল	মিরপুব, ঢাকা
৮।	সংকেত	খিলগা ঢাকা এম বহমান
৯।	সপ্তপদী	ঢাকা খযরুল আলম চৌধুবী

★ তারাশংকব সংগ্রহশালা ঃ তাবাকশঙ্করের জন্মশতবর্ষে তাঁব জন্মস্থল লাভপুরেব বাড়িটি (প্রকৃত পক্ষে ছিল কাছাবি বাড়ি) যাব নাম ছিল 'ধাত্রী দেবতা' সেটি পশ্চিমবঙ্গ সরকাব অধিগ্রহণ কবেছেন এবং এটি সংগ্রহশালায রূপান্তরিত করায প্রবাসী হযেছেন।

★ তাবাশংকবেব কাহিনী অবলম্বনে বাংলা ছাড়া হিন্দি ও অন্যান্য কিছু ভাবতীয ভাষায চলচ্চিত্র হযেছে।

তাবাশংকবের সাহিত্য অবলম্বনে বাংলায রূপায়িত চলচ্চিত্রের তালিকা ঃ

	চলচ্চিত্রের নাম	পরিচালক
১।	অগ্রদানী	পলাশ বন্দ্যোপাধ্যয

	চলচ্চিত্রের নাম	পরিচালক
২।	অভিযান	সত্যজিত রায়
৩।	আগুন	অসিত সেন, গীত ঃ তারাশংকর
৪।	আরোগ্য নিকেতন	বিজয় বসু
৫।	উত্তরায়ণ	অগ্রদূত (বিভূতি লাহা)
৬।	কবি	দেবকী বসু ও সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায় গীত ঃ তারাশংকর
৭।	কালিন্দী	নরেশ মিত্র
৮।	কান্না	অগ্রগামী (সরোজ দে)
৯।	গণদেবতা	তরুণ মজুমদার
১০।	চাঁপাডাঙার বৌ	নির্মল দে, গীত ঃ তারাশংকর
১১।	জলসাঘর	সত্যজিৎ রায়
১২।	ডাক হরকরা	অগ্রগামী, গীত ঃ তারাশংকর
১৩।	দীপার প্রেম	অরুন্ধতী দেবী
১৪।	দুই পুরুষ	সুবোধ মিত্র
১৫।	ধাত্রীদেবতা	কালিপ্রসাদ রায়
১৬।	নবদিগন্ত	পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭।	না	শ্রী তারাশংকর
১৮।	নাগিনী কন্যার কাহিনী	সলিল সেন
১৯।	প্রতিমা	পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
২০।	ফরিয়াদ	বিজয় বসু
২১।	বন্দিনী কমলা	শংকর ভট্টাচার্য
২২।	বাতাসী	আগন্তুক (অজিত গাঙ্গুলী)
২৩।	বিপাশা	অগ্রদূত (বিভূতি লাহা)
২৪।	বিচারক	প্রভাত মুখোপাধ্যায়
২৫।	মঞ্জরী অপেরা	অগ্রদূত (বিভূতি লাহা)
২৬।	রাইকমল	সুবোধ মিত্র
২৭।	রাজা সাহেব	পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৮।	শুকসারী	সুশীল মজুমদার
২৯।	সন্দীপন পাঠশালা	অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়
৩০।	সপ্তপদী	অজয় কর
৩১।	হার মানা হার	হীরেন নাগ
৩২।	হাঁসুলী বাঁকের উপকথা	তপন সিংহ, গীত ঃ তারাশংকর

★ তথ্য সূত্র ও ঋণস্বীকার ঃ

১। তারাশংকর সাহিত্য সমীক্ষা—ডঃ গৌর মোহন রায়
২। আমার পিতা তারাশংকর—শ্রী সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
৩। সাহিত্য ও সংস্কৃতি পত্রিকা—সঞ্জীব কুমার বসু সম্পাদিত
৪। তারাশংকর স্রষ্টা ও সৃষ্টি—ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য্য
৫। শ্রী সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬। শ্রী চণ্ডীদাস চট্টোপাধ্যায়
৭। শ্রী পলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
৮। শ্রী প্রভাস ভট্টাচার্য
৯। ইস্টার্ন ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে শ্রী চণ্ডীদাস রায়
১০। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা (কার্তিক-পৌষ ১৪০৪)
১১। সত্তর দশক (তারাশংকর সংখ্যা, পৌষ ১৪০৪)।

অধুনা প্রাপ্তিযোগ্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল্যবান প্রকাশনা

★ Rasvihary Das Philosophical Essay : Ramaprasad Das 150.00

★ Economic Theory, Trade and Quantitative Economics : Asis Banerjee, Biswajit Chatterjee 200.00

★ পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা : ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ ৩০০.০০

★ বাংলার বাউল : পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ৩০.০০

★ ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশচিন্তা ও বঙ্কিমচন্দ্র : সুপ্রিয়া সেন ভট্টাচার্য ৯০.০০

★ কবিকঙ্কনচণ্ডী : শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী ১২৫.০০

★ বাংলা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা : শ্রী সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ৬০.০০

★ শাক্ত পদাবলী (চয়ন) : শ্রী অমরেন্দ্রনাথ রায় ৭০.০০

★ বৈষ্ণব পদাবলী (চয়ন) : অধ্যাপক শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রী বিশ্বপতি চৌধুরী, শ্রী শ্যামাপদ চক্রবর্তী সম্পাদিত ৬০ ০০

★ একালের ছোটগল্প সঞ্চয়ন ২৫.০০

★ একালের কবিতা সঞ্চয়ন ২৫ ০০

★ একালের প্রবন্ধ সঞ্চয়ন ৩৫.০০

★ আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান : ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ১০০.০০

★ বামাবোধিনী পত্রিকা : ডঃ ভারতী রায় ১৫০.০০

★ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা চিন্তা : ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ ৭৫.০০

★ পূর্ববঙ্গের কবিগান : ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ ৯০.০০

★ ময়মনসিংহ গীতিকা : রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন ৯০.০০

★ প্রাচীন কবিওয়ালার গান : ডঃ শ্রী প্রফুল্লচন্দ্র পাল ১২৫.০০

★ বাংলা কাব্যে নারীত্বের রূপায়ণ : কণক মুখোপাধ্যায় ২৫.০০

আরো বিশদ বিবরণের জন্য :

Pradip Kumar Ghosh, Superintendent
Calcutta University Press
48, Hazra Road, Calcutta-700019

বিক্রয় কেন্দ্র :

আশুতোষ ভবনের একতলা, কলেজস্ট্রীট চত্বর

PARICHAY May—July '98 Reg. No. 13273
WB EC—265
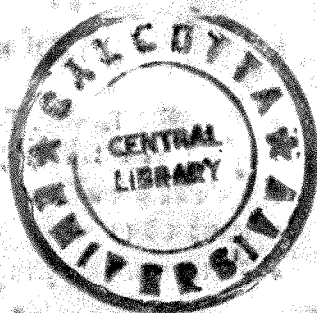
শারদীয়

পরিচয়

মহালয়ার আগেই বেরোবে

সম্পাদনা দপ্তর : ৮৯ মহাত্মা গান্ধি রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

ব্যবস্থাপনা দপ্তর : ৩০/৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

পরিচয় দাম : ত্রিশ টাকা

পরিচয়
শারদ ১৪০৫

শারদ শুভেচ্ছা

শুধু রাস্তাঘাট, নালা-নর্দমা, অঞ্জাল সাফাই স্বাস্থ্য, পানীয় জল সরবরাহ ইত্যাদিই নয়, নাগরিক জীবনের আরও নানাবিধ সমস্যার ক্ষেত্রে সেবার আদর্শ নিয়ে পৌর কর্মীবৃন্দ সর্বদা নিরত।

সকল মত ও পথের নাগরিকগণের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা নিয়ে নাগরিক পরিসেবায় উচ্চমানের কর্মসংস্কৃতির মাধ্যমে এই শহরাঞ্চলকে সুন্দর করে গড়ে তোলাই হোক আমাদের শপথ !

"যাহারা শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।"

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উজ্জ্বল চ্যাটার্জী
পৌরপতি
কুলটি পৌরসভা
নিয়ামতপুর
বর্ধমান

আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
আসানসোল

আবেদন

(১) বাড়ীর বা রাস্তার কল যেখানেই দেখবেন পরিশ্রুত জল পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তৎক্ষনাৎ সেটির কল (Bib-Cock) বন্ধ করে দিয়ে অপচয় রোধ করুন।

(২) রাস্তার ধারে যেখানে যেখানে সরবরাহের Stand-Post আছে, সেখানে কল (Bib-Cock) না থাকলে পৌর নিগমে খবর দিন।

(৩) কল অথবা Main Pipe থেকে Pump লাগিয়ে জল টেনে নেওয়া প্রতিরোধ করুন। পৌর নিগমে খবর দিন।

(৪) বে-আইনীভাবে কেউ বাড়ীতে জলের সংযোগ নিয়ে থাকলে এই অফিসে খবর দিন।

(৫) যে সব স্থানে ট্রাকের সাহায্যে জল পাঠানো হয় সেখানেও জল ভরার সময় যেন বেশী জল অপচয় না হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখুন।

বামাপদ মুখোপাধ্যায়

মেয়র

৫½ বছরে টাকা ডবল
কিষাণ বিকাশ পত্র
যে কোন বিভাগীয় ডাকঘরে পাওয়া যায়
২½ বছর পর টাকা তোলার সুবিধা
উৎসমূলে কোন আয়কর কাটা হয না

BURDWAN UNIVERSITY PUBLICATIONS

কুষ্ঠ কল্যাণে

আসানসোল মাইনস বোর্ড অব হেলথ্

আসানসোল

(১) শাপে নয়, পাপে নয়, জীবাণু দিয়ে কুষ্ঠ হয়।

(২) সময় মত ধরা পড়লে ও নিয়মিত চিকিৎসা করলে সেরে যায়।

(৩) শতকরা ৮০ ভাগ কুষ্ঠ রোগী রোগ ছড়ায় না।

(৪) দীর্ঘদিন ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না এলে সাধারণত কুষ্ঠ রোগ হয় না।

(৫) আসানসোল মাইনস বোর্ড অব হেলথের অধীনে আসানসোল, রাণীগঞ্জ ও বরাকর তিনটি হাসপাতাল নিয়মিত কুষ্ঠ রোগীর সেবায় নিয়োজিত। এছাড়া ১৫ ক্লিনিকে অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ নির্ধারিত দিনে রোগীদের চিকিৎসা করেন।

(৬) পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি।

(৭) উন্নতমানের চিকিৎসা রোগ নিরাময় ও পুনর্বাসনে সকলের সহযোগিতা চাই।

পঞ্চায়েত ঃ গণচেতনার অপর নাম

এখন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে উপজাতি, তপসিলীসম্প্রদায় ও মহিলাদের প্রতিনিধিত্বের হার বেড়েছে। পঞ্চায়েতের অর্থনৈতিক প্রশাসনের উন্নয়নশীল পরিবর্তন এসেছে।

স্বায়ত্তশাসনের পরিকাঠামো দৃঢ় করতে ও তৃণমূলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করতে গঠিত হয়েছে গ্রাম সংসদ। সভ্য বুনিয়াদ যে গ্রাম তাই আজ নিশ্চিত অগ্রতির পথে।

পঞ্চায়েত পাঁচজনের জন্য
পাঁচজনকে নিয়েই পঞ্চায়েত।

মানুষের কাছে, মানুষের সাথে
বিশ বছর ধরে মানুষের পাশে

১৯৭৭-১৯৯৭। এই বিশ বছরে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে ঘটেছে নানা মূলগত পরিবর্তন। সাধারণ মানুষকে পাশে নিয়ে এগিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে স্বায়ত্বশাসনের বাতাবরণ। শুধুমাত্র ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণই নয়, সরকার সাফল্য পেয়েছে ভূমি-সংস্কার, কৃষি, বিদ্যুৎ, শিক্ষাপ্রসার ও স্বাস্থ্যের মত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলিতে। পরিবহন ও আবাসন প্রকল্পে নেওয়া হয়েছে ব্যাপক উদ্যোগ। তা সত্ত্বেও আত্মতুষ্টির কোন স্থান নেই। চরৈবেতির মূল মন্ত্র ধরে পশ্চিমবঙ্গকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার বদ্ধপরিকর। দায়বদ্ধ সাধারণ মানুষের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে।

আই সি এ-২৬০৫ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে গড়ে তুলুন দূষণমুক্ত পৃথিবী

বিভিন্ন ধরনের পবিবেশ দূষণ বর্তমান যুগে আমাদেব সামনে কঠিন সমস্যার সৃষ্টি কবেছে। এই পরিস্থিতি কিন্তু একদিনে তৈবী হয়নি। প্রাকৃতিক নিযমগুলিকে অগ্রাহ্য করে মানুষ আধুনিক জীবনেব ক্রমবর্দ্ধমান ও জটিল চাহিদাব সামাল দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কাজে হস্তক্ষেপ করছে। উন্নতর জীবনযাত্রাব প্রযোজনে মাটি, জল, অবণ্য ও খনিজ সম্পদকে অবাধে মানুষ ব্যবহার কবেছে। অতিব্যবহাবের ফলে যে ক্ষতি তা পূবণেব ব্যবস্থা না কবেই। ফলশ্রুতি হিসাবে এই গৃহে আমাদের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

অবাধ বৃক্ষচ্ছেদন কলকাবখানাব বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীব নির্মল স্রোতকে রুদ্ধ কবা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোঁয়া ও কর্কশ উচ্চগ্রামের শব্দ আমাদের পরিবেশ দূষণেব শিকাব করে তুলেছে।

কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত?

যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিবেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত হয়ে যাবে, খরা এবং বন্যাব কবলে পডবে পৃথিবী, প্রাণী ও উদ্ভিদজগতেব অসংখ্য প্রজাতি চিরদিনের মত বিলুপ্ত হবে, আমাদের এই সুন্দর গ্রহেব বাতাস হযে পড়বে নিঃশ্বাস নেবাব অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটছে আমাদেব অপরিনামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদেব ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদার জন্য।

উন্নয়নমূলক কাজকর্ম আমাদেব চালিযে যেতে হবে। কিন্তু তা করতে হবে প্রাকৃতিক ভারসাম্যেব হানি না ঘটিয়ে নিষেধমূলক আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদেব মোকাবিলা করতে পারি।

পরিবেশ সংরক্ষণের কাজে ব্রতী হতে হবে আমাদের সকলকেই প্রস্তুত হতে হবে দূষণমুক্ত পৃথিবী গডাব উদ্দেশ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামেব জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আই. সি. এ ২৬০৫

সাক্ষরতাই দেশের মূল সম্পদ

বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে
রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ছে শিক্ষার আলো।

কমছে নিরক্ষরতা
বাড়ছে নবসাক্ষরের সংখ্যা।

কেবল উৎসাহদান নয়
আসুন, আমরাও নেমে পড়ি কাজে।

শিক্ষা আমাদের প্রত্যেকের জন্মগত অধিকার।

আগস্ট—অক্টোবর ১৯৯৮

শ্রাবণ—আশ্বিন ১৪০৫

১—৩ সংখ্যা ৬৮ বর্ষ

প্রবন্ধ

সাক্ষাৎকার

গল্প

উপন্যাস

সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

রঞ্জন ধর কর্তৃক বাণীরূপা প্রেস ৯-এ মনোমোহন বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ব্যবস্থাপনা দপ্তর ৩০/৬, ঝাউতলা রোড, কলকাতা-১৭ থেকে প্রকাশিত।

"যে মূল উপাদানগুলি আমাদের সমষ্টিগত জীবনের ভিত্তি গড়বে সেগুলি হল ন্যায় বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা, অনুশাসন এবং প্রেম। আমি ভারতবর্ষে সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র চাই।"

—সুভাষচন্দ্র বসু

কিছু টুক্‌রো খবর

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কি লিখব ভাবতে বসে মনে এলো অজস্র কথাব একটা ভিড। যেটাকে সাম্‌লে একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ বচনা খাড়া কবাব মতো সাধ্য আব নিজেব মধ্যে খুঁজে পেলাম না। তখন হঠাৎ স্মবণে এল একদা আমাদেরও গুরুস্থানীয ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়-এব "মনে এলো" (ভুল হচ্ছে না তো?) শীর্ষক একটি গ্রন্থ আব ভাবলাম অনেকটা সেই ধরনে এখনই ছুটে আসা কতগুলি বিষয হাল্‌কা ভাবে ছুঁযে একটা কিছু বানিযে ফেলি। আর বলে রাখি দেশে আব সর্বদেশে যখন দেখি এমন অন্ধকার যাকে কাটাবাব কাযদা আমার মতো অভাজনেব জানা সম্ভবই নয। তখন একটু যেন আশার আলো দেখি। দক্ষিণ আফ্রিকাব নেলসন মান্দেলা, কিউবাব কাস্ত্রো আব গদ্দাফি হাত মিলিযে যেন তুলে ধরেছেন নবজীবনের জযধ্বজা। এই ত্রযীব মৈত্রী অক্ষত থাকুক, আবাব পৃথিবীতে আকাশগঙ্গা নামাবার উদ্যোগ আবম্ভ হোক্।

১

আমাদের দেশে একদা বিখ্যাত ছিল এজন্য যে বহু প্রাচীনকাল থেকে বিপুল স্মৃতিশক্তিব অধিকাবী ছিলেন অনেক 'শ্রুতিধর', তাঁদেব কল্যাণে নাকি সংস্কৃতেব পুঁথিপত্র হাবিযে গেলে প্রায় সবই উদ্ধাব কবা যেত তাঁদের স্মৃতিব ভাণ্ডার থেকে। নিজে কাছে থেকে দেখেছি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী কিম্বা ধুরন্ধর আই-সি-এস এইচ-এম প্যাটেলেব (কিছুকাল সংসদসদস্য ও দেশের বিত্তমন্ত্রী) মতো অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন সজ্জনকে। যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ভট্টপল্লীব শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয পড়াতেন কালিদাসের 'রঘুবংশ', তখন অবাক হযে দেখতাম যে শুধু কালিদাসেব মধুব রচনা নয মল্লিনাথ-কৃত খটোমটো টীকাও তাঁর কণ্ঠস্থ। এদেব কথা মনে এলে আমাব স্মবণশক্তিব বাহবা শুনলে (যা মাঝে মাঝে শুনি) লজ্জা হয।

সংস্কৃত নিযে আমাব 'মাযা' কেন, তা একটু বলে বাখি। পবাধীন দেশে জন্মে স্বভাবতই ভাবতবর্ষের ঐতিহ্য নিযে গর্ব আমাদের কাছে ছিল ভযংকব দামী আব জরুরী। 'Revivalist' বলে গালি যদি শুনতে হয তো নাচাব। তবু বলি যে ছেলেবেলায "কপালকুণ্ডলা" পড়াব সময় মুখস্থ হযে গিযেছিল আর আজও রয়েছে: "দূরাদযশ্চক্র নিভস্য তন্বী / তমালতালী বনরাজি

নীলা / আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেধারানিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।" এটা বঙ্কিমের গুণে, আমার নয়। আবার কিশোর মন মেতে উঠেছিল যখন বঙ্কিমের কণ্ঠ থেকে শুনি যে "জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষায়" প্রভাতে তিনি সূর্য বন্দনা করেন ঃ "জবাকুসুমসংকাশম্ কাশ্যাপেয়ম্ মহাদ্যুতিম্ / ধ্বান্তারিম্ সর্বপাপঘ্নম্ প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্"। স্কুলে হেডপণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ কাব্য-তীর্থ মহাশয়ের পড়ানো এমন মনোহর ছিল যে ভাষাটিকে না ভালোবেসে চলল না। আর কলেজে যখন পড়লাম ঃ "অস্ত্যুত্তরস্যাম্ দিশি দেবতাত্মা/হিমালয়ো নাম নগাধিরাজ / পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যাইব মানদণ্ডম্।" পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রে স্নান করে নগাধিরাজ দেবতাত্মা হিমালয় যেন পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে বিরাজ করছেন। আমার "ভারতীয়ত্ব" সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে দৃঢ়ীভূত হয়ে গেল—এটা অধুনা বিকৃত বিষাক্ত বিদেশবৈরিতাদুষ্ট 'ভারতীয়ত্ব নয়, এ হল রবীন্দ্রনাথের ভারতবোধের সূত্র। বলেননি তিনি 'মহাভারতবর্ষ'-এর কথা। যা পরিণতি পেয়েছিল (তাঁরই ভাষায়) পশ্চিম এশিয়া থেকে মুসলমান ধারা যখন এসে এদেশে মিশে গেল, 'ভারতীয় তুর্ক' বলে যিনি গর্ব করতেন সেই মহামনীষী আমীর খসরুর জীবন ও কর্মে যার প্রকাশ।

অনেক পরে জানলাম যে বারাণসীর কোবিদ কুলগৌরব বাঙালি মনস্বী গোপীনাথ কবিরাজ বুঝি বলতেন সংস্কৃতের গরিমা বিষয় এই যে এ ভাষার একটি মাত্র বিদ্ ধাতুর ব্যবহার তিন অর্থে—বিদ্যতে, বেত্তি, বিন্দতি অর্থাৎ সৎ (Being), চিৎ (Consciousness) আর আনন্দ (joy, Perfection) এই ত্রয়ী মানুষের সত্তা ও মহিমাকে বিধৃত করে। এই তথ্যটি মেনে রোমাঞ্চ অনুভব করেছি। সংস্কৃতের জয় হোক্। সংস্কৃতের দুহিতা বাংলা ভাষার জয় হোক্। কত ভালো লাগে যে বাংলাদেশে সংস্কৃতের সমাদর অক্ষুণ্ণ।

* * *

২

আজ দুনিয়ার দৌলত শুধু নয়, নানাদিক থেকে দুনিয়ার দখলদারি যার হাতে সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তার বহু অপকীর্তির জন্য মানবসভ্যতার প্রতি কৃতঘ্নতার অভিযোগ আমাদের মতো দেশে সঙ্গত ভাবে উঠলেও বলা দরকার যে সেখানে আছেন অসংখ্য গুণধর মানুষ, আছেন বহু সহৃদয় মান-বিকতামণ্ডিত সজ্জন যারা বর্তমানে সভ্যতার সংকট সমাধানে সহায় হবেন মনে করা অসঙ্গত নয়। সেখানকার শাসকশ্রেণীর যদৃচ্ছাচার যতই বিরক্তি

যন্ত্রণার উদ্রেক করুক, সকল দেশের জনশক্তির মধ্যেই নিহিত আছে সেই সব গুণ যার জোরে মানুষের অগ্রগতি নিশ্চিত। তবু প্রলুব্ধ হচ্ছি উদ্ধৃত করতে আমেরিকার প্রতিনিধিসভার (House of Representatives) প্রবলপ্রতাপ অধ্যক্ষ (Speaker) Newt Gingrich-এর একটি মন্তব্য ('Time' weekly 2 / 11 / 94): "এমন একটা দেশে সভ্যতা বজায় রাখা সম্ভব নয় যেখানে বারো বছরের মেয়েরা গর্ভবতী হয়। পনেরো বছর বয়সীরা পরস্পরকে খুন করে, সতেরো বছর বয়সীরা 'এড্‌স্' রোগে মরে, আর আঠারো বছর বয়সীরা 'ডিপ্লোমা' পায় বটে কিন্তু তা পড়তে পারে না।" এটা বেদবাক্য নয়, এর পিছনে রাজনৈতিক কু-মতলব থাকতে পারে। কিন্তু সর্বজনপরিচিত এক উচ্চপদাধিকারীর এমন প্রকাশ্য ঘোষণার তাৎপর্য অবশ্য আছে। সাথে কি সে দেশের এখন এমন এক ব্যক্তি রাষ্ট্রপতি যার মোটামুটি সভ্য, সুস্থ সমাজে স্থান থাকা উচিত নয় ?

★　　　★　　　★

৩

সম্প্রতি পশ্চিমবাংলা সরকারের তথ্যবিভাগের পক্ষ থেকে নদীয়া জেলা বিষয়ে একটি বই বেরিয়েছে যাতে অনেক দামী লেখা ভালো লাগ্‌ল। একটা খবর জেনে আশ্চর্য ও আনন্দিত হলাম। এতদিন জেনে এসেছি যে গোটা ভারতবর্ষে ব্রহ্মার মন্দির বুঝি একটি মাত্র আছে আজ্‌মের-এর কাছে অবস্থিত 'মহাতীর্থ' বলে পরিচিত পুষ্কর হ্রদের ধারে। এই সরকারী প্রকাশন থেকে জানা গেল যে নদীয়া জেলাতেই একাধিক ব্রহ্মা মন্দির (হয়তো ধ্বংসের মুখে) রয়েছে। এটা জেনে আমার নাস্তিক মনে একটু চমক লেগেছিল। ঘটনাটাকে অর্থাৎ এই আবিষ্কারকে অলীক বলে ওড়াতে পারি না। অথচ এটা সত্য হলে (আর মন্দির শিল্পবিচারে অকিঞ্চিৎকর কিম্বা প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত না হলে) এখনই অবিলম্বে যথোচিত সংস্কার এবং কাছাকাছি এলাকায় পুণ্যার্থী ও ভ্রমণপিপাসুদের যাতায়াত ও আবাসন ব্যবস্থা প্রয়োজন। কর্তৃপক্ষদের মধ্যে কয়েকজনকে জানাবার চেষ্টা করেছি। পশ্চিমবাংলায় একাধিক 'ব্রহ্মা' মন্দিরের অবস্থান সারা ভারতে সুবিদিত হলে এই রাজ্যেরই কিছু মঙ্গল হয়তো ঘটতে পারে।

★　　　★　　　★

৪

নভেম্বর বিপ্লবের পঞ্চাশবর্ষপূর্তি উপলক্ষে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি অতি মূল্যবান ভাষণ দেন Isaac Deutscher, যিনি ট্রট্‌স্কির একজন প্রধান গুণগ্রাহী হয়েও স্টালিনেরও সম্ভবত সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনীকার বলে বিখ্যাত ছিলেন। সেই বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে উনিশশতকের প্রমুখ রুশ মনস্বী Herzen-এর একটি মন্তব্য উল্লিখিত ঃ "পশ্চিম ইয়োরোপ সোসালিজ্‌ম্‌-এর দিকে চলেছে 'স্বাধীনতা'-র ("freedom") মধ্য দিয়ে আর রাশিয়া শুধুমাত্র 'সোসালিজ্‌ম্‌'-এর মধ্য দিয়ে 'স্বাধীনতা' প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।" নানাবিধ 'গণতান্ত্রিক' প্রকরণের সহায়তায় তুলনায় সমুন্নত পাশ্চাত্য দেশে মানুষের অকল্যাণ সুনিশ্চিত করার জন্য একান্ত কাম্য সমসুযোগের সমাজ প্রতিষ্ঠা তাই বেশ কিছু কাল ধরে প্রতীক্ষিত ছিল। স্বয়ং মার্কস্‌-এঙ্গেল্‌স্‌ও ভেবেছিলেন ইংলণ্ড বা হল্যাণ্ডের মতো দেশে সোসালিজ্‌ম্‌ সবার আগে আসতে পারে। ঘটনাচক্রে দেখা গেল যে "সে গুড়ে বালি", আর মার্ক্‌স্‌-এঙ্গেলস-এরই মনে সোসালিজ্‌ম-এর প্রথম 'আঁতুড় ঘর' হিসাবে পশ্চাৎপদ অথচ নানা কারণে অগ্নিগর্ভ রাশিয়ারই ছবি ফুটে উঠেছিল।

যাই হোক, নভেম্বর বিপ্লবের গৌরব আর প্রায় সাত দশক ধরে তার দুনিয়াজোড়া কীর্তিকলাপকে মুছে ফেলার যে চেষ্টা ১৯৮৭-৮৯ থেকে পুরো দমে চলেছে তার পরিণামের জন্য ইতিহাসকে কতকাল অপেক্ষা করতে হবে কে জানে? ইতিমধ্যে "Western Marxism" বলে একটি শব্দও উদ্ভাসিত হয়েছে, 'সোশ্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল' নামে আজও বিদ্যমান সংস্থা দেশে দেশে কম্যুনিস্ট বিরোধিতাকে চাঙ্গা করে তুলতে চেয়েছে আর 'ইউরো কম্যুনিজ্‌ম্‌' ধরনের আওয়াজ তুলে প্রচার করে এসেছে যে সোভিয়েট ও তার সহযোগী দেশগুলিতে লেনিনবাদ ঢুকিয়েছে মার্কস্‌তত্ত্বের কলুষিত বিকৃতি যা তারা ক্ষমতায় এসে নিঃশেষ করে দেবে এবং প্রকৃত 'সমাজবাদ' তারাই আনবে। Deutscher-এর মতো চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ মনস্বীও সোভিয়েট ব্যবস্থার কৃতিত্ব শুধু নয় তার মহিমারও (যার দেদীপ্যমান দৃষ্টান্ত অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাহিনীতে) প্রশস্তি জানবার পর বলেছিলেন যে সোভিয়েটের তুলনায় প্রকৃত সমাজবাদের আসল রূপ ফোটাতে হবে 'সোসাল ডেমোক্রাসির' সাফল্য দেখিয়ে। কম্যুনিস্ট বিরোধী 'সোসালিস্টরা' বহুকাল বহুদেশে রাষ্ট্রশক্তি দখল করেও সমসুযোগের সমাজস্থাপনে একেবারে যে ব্যর্থ হয়েছিল তা নিঃসন্দেহ। ত্রিশের দশকে একবার প্রচণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়ে স্টালিন বলেছিলেন যে সোসাল ডেমোক্রেসি ফ্যাসিজম-এর শত্রু নয় বরঞ্চ "যমজ ভাইয়ের মতো।" তখন সেই কথায় অত্যুক্তি কিছু থাকলেও

সত্যতাও ছিল। এখন থেকে আজ পর্যন্ত এর অসংখ্য প্রমাণ মিলেছে, যার সমুচিত বর্ণনা ও বিশ্লেষণেব প্রয়োজন আজও যথেষ্ট। ছোট্ট একটা মন্তব্য কবতে চাই। এদেশে 'সোশালিস্ট ইণ্টাবন্যাশানাল'-এর 'এক ও অদ্বিতীয' প্রতিনিধি হলেন জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ। খ্যাতনামা এই মানুষটি কযেক বছর আগেও সোশালিস্ট ইণ্টাবন্যাশানালেব এক সভা ভাবতে করেছিলেন। মার্ক'স-এব মৃত্যুব (১৮৮৩) পব থেকে একশো বছব কেটে যাবাব সময বহু অনুষ্ঠান ও গ্রন্থ প্রকাশন হযেছিল আব তখনই ফার্ণাণ্ডেজ নিজস্ব পত্রিকা "The other way"-তে ছাপিযেছিলেন বছব বিশেক আগে লেখা বামমনোহব লোহিযাব এক প্রবন্ধ যাব মূল বক্তব্য ছিল যে "কম্যুনিজম্ এশিযাব বিরুদ্ধে ইযোবোপেব এক চক্রান্ত মাত্র!" বলতে ইচ্ছা যায 'বুঝ সাধু যে জানো সন্ধান!' জর্জ-ফার্ণাণ্ডেজ-এব বহুরূপী চেহাবা এদেশে অজানা নয। একটুও আশ্চর্য হবাব কথা নয যখন মস্ত 'সোসালিস্ট' বলে খ্যাত এই ধুবন্ধব অম্লানবদনে বি-জে-পিব মতো দলেব সঙ্গে দোস্তি কবেন, মন্ত্রিত্বেব গদিতে বসেন, হরেক বকম ছদ্মবেশে মূল মতলব হাসিলেব কাজে লেগে থাকেন।

*　　*　　*

৫

সোভিযেটেব বিলোপ আব কম্যুনিজম্-এব বাহুগ্রাস এমন একটা অবস্থাব সৃষ্টি কবেছে যাতে নভেম্বব বিপ্লব আব তাব পববর্তী অন্তত সত্তব বছবের ইতিহাসকেই জগদ্বাসীব মন থেকে মুছে দেবার আযোজন বিনা প্রতিবাদেই চলেছে। "সোশালিজম্ আবও সোশালিজম্, চিরতবে সোশালিজম্' আওযাজ নিযে শুবু করে গর্বাচভী প্রতিবিপ্লব শুধু চাতুর্যেব জোবেই যে কম্যুনিজম্কে পর্যুদস্ত কবতে পেবেছে তা হতে পাবে না। সোসালিস্ট দেশ-গুলিতে আর নানাদেশেব কম্যুনিস্ট আন্দোলনে অনেক গ্লানি, দুর্বলতা, অনৈতিকতা স্বৈবাচাব ইত্যাদি 'পাপ' জমা হযে না উঠলে ইতিহাসকে এমন দুর্দান্ত ধাক্কায পিছিযে দেওযা সম্ভব হবে না। তবু একটা কথা না বলে পাবছি না। 'বুদ্ধিজীবী' (শব্দটি যেমন যেন কটু লাগে) মহলে এখনও দেখি George Orwell নামে বিখ্যাত মানুষটি সমাদৃত। বিশেষ কবে 'Eighty four' 'Animal Farm' ইত্যাদি কম্যুনিজম্ বিবোধী বিষোদ্গারী গ্রন্থেব বচযিতা হিসাবে। কিছুকাল আগে এবই বিষযে যেসব খবর বেবিযেছিল সেদিকে আমাদের বামপন্থীদেব নজর কেন যে পড়েনি তা আমাব কাছে অবোধ্য। 'স্টেট্স্মান', 'টেলিগ্রাফ'-এব মতো কাগজেও সংক্ষেপে ছাপা হয়েছে (বিদেশী কিছু কাগজে আবও বিস্তাবিত ভাবে) যে নিষ্ঠাবান সংবেদনশীল কম্যুনিস্ট হিসাবে পবিচিত হবাব পব সম্ভবত স্পেনের গৃহযুদ্ধকালে মত বদ্‌লে

প্রথমে সমালোচক আর অনতিবিলম্বে কম্যুনিজ্‌ম্‌-এর ঘোর শত্রু হয়ে পড়েছিলেন বলে অরওয়েল কুণ্ঠিত হন নি এতটা নীচে নামতে যে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ নিয়ে বহু বৎসর গোয়েন্দাগিরি করেন। তাঁর কাছ থেকে নিয়মিত ভাবে পাওয়া যেত কম্যুনিস্টদের প্রতি অল্পাধিক 'বন্ধুতাসম্পন্ন' লেখকদের তালিকা, যার দৈর্ঘ্য দেখে অবাক হতে হয়। বিলাতের মহাফেজ-খানা (Public records office) থেকে পাওয়া খবর হিসাবেই এসব কথা জাহির হয়ে পড়ে। মার্কিন সি-আই-এর কুখ্যাত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এই ব্যাপারে অরওয়েল নীরবে সকলের অজান্তে বহু বৎসর লিপ্ত ছিলেন আর সংকোচ বোধ করেন নি J B. Priestly-র (The Good companion প্রভৃতি জনপ্রিয় উপন্যাসের লেখক) মতো ব্যক্তিকে কম্যুনিস্ট পার্টির সক্রিয় 'সহযাত্রী' ছাপ লাগাতে। এখন যেন বুঝছি Orwell কেন ঘৃণাক্ষরে সম-কালীন কম্যুনিস্ট বিরোধী শিবিরের অপরিসীম দৌরাত্ম্যের লেশমাত্র সমা-লোচনা না করে সর্বশক্তি সহকারে, কম্যুনিস্ট দলনে সহায় হবার জন্য 'কোমর' বেঁধে ছিলেন। জগৎ এবং জীবন এমনই জটিল যে প্রতিভাধরদের মধ্যেও এরূপ দুর্বৃত্তি দেখা যায়। '1984' 'Animal Farm' প্রভৃতির স্রষ্টাকে নিয়ে 'ধন্য ধন্য' রব এখনও অবশ্য শোনা যেতে থাকবে। ইংরিজিতে প্রবাদ আছে নাকি যে Nothing fails like failure—সমাজবাদ সাম্যবাদ যদি খাদে পড়ে হাতির মতো তো ব্যাঙেরাও এসে লাথি মারতে থাকবে। এভাবে লিখছি কারণ Orwell-বিষয়ক এই খবর গুলো ফাঁস হবার পর এ নিয়ে বামপন্থী মহলে কোন সাড়া দেখিনি।

★ ★ ★

৬

সম্প্রতি প্রয়াত ননী ভৌমিকের জীবন ও মৃত্যু নিয়ে যদি একটি ছোট অথচ গভীরতা স্পর্শী নিবন্ধ 'পরিচয়' বার করে তো খুশি হব খুব। আশ্চর্য হতে হয় দেখে যে হাজার অসুবিধা সত্ত্বেও সারা দুনিয়ার সব দেশের আর বিশেষ করে আমাদের মতো অবহেলিত দেশের সাহিত্য সোশালিস্ট দেশে (প্রধানত সোভিয়েট) প্রচারের যে "ঐতিহাসিক মহালগ্ন" আজ প্রতিবিপ্লবের দাপটে পরিত্যক্ত, সে বিষয়ে কারও যেন তেমন নজর নেই। গর্বাচভ-নেতৃত্বের কাল থেকে এটা ঘটেছে আর তাই কিছু দিন আগে পর্যন্ত খুবই সস্তায় সোভিয়েট দেশে ছাপা চমৎকার শিশুপাঠ্য (সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান বিষয়ে ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থ) বই আনা যে বন্ধ হয়েছে তা নয়, মস্কোয় Foreign Literature প্রকাশসংস্থার দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমাদের সমর সেন, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ননী ভৌমিক ও আরও অনেকে যে কাজে লেগে ছিলেন আর

ঝাঁপ বন্ধ কবে দেওয়া হযেছে। এটা শুধু নতুন সবকাবের একটা 'বিভাগ' উঠিযে দেবার মত তুচ্ছ ব্যাপার নয়।

জানি না আব কোথাও কখনও সোভিযেটেব এই আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধিব উদ্দেশ্যে নানাদেশেব সাহিত্য পবিচয সংঘটনেব এমন প্রযত্ন দেখা দিযেছে। ইযোবোপ আমেবিকাব বেশ কযেকটি দেশে নিশ্চয়ই শুধু বাংলা কেন ঢেব বেশি অজানা দেশেব ভাষা সাহিত্য নিযে ওযাকিফ্‌হাল ব্যক্তিকে খুঁজে পাওযা যাবে। কিন্তু বুশ ও অন্যান্য বহু সমাজবাদী দেশের ভাষায অনূদিত হযে ববীন্দ্রনাথেব বচনাব কযেক কোটি যে পাঠকেব হাতে পৌঁছেছে, এব অনুবূপ ঘটনা অন্যত্র কোথাও নেই। মনে পডছে ১৯৮০/৮১ সালে সোভিযেট কোন পত্রিকায দেখি যে আমাদেব সুভাষ মুখোপাধ্যাযেব নতুন একটি কবিতা সংগ্রহ এক লক্ষ কপিব সংস্করণে প্রকাশ হতে চলেছে! তাদের বাছাই,তাদেব বুচি, হয়তো বা তাদেব গভীব 'বাজনৈতিক' অভিপ্রায নিযে প্রশ্ন তোলা হয হোক্ কিন্তু সর্ব মানবেব লক্ষ্মীলাভ শুধু নয়, তাদেব সাংস্কৃতিক পবস্পব পবিচয সুদৃঢ কবে বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বশান্তি সুদৃঢকবণেব এই অধুনা পবিত্যক্ত কর্মযজ্ঞেব মহিমাকে নস্যাৎ করব? ননী ভৌমিককে হারিযে বাংলা সাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হযেছে কিন্তু তার সঙ্গে হৃদ্যতাব ভিত্তিতেই বলি তিনি কাযমনোবাক্যে এই যজ্ঞেই জডিত ছিলেন, কান্নাহাসিব দোলদোলানো জীবনেব আস্বাদ পেযেই সোভিযেট ভূমি ছেড়ে আসতে পারেন নি। ভাবত-সোভিযেট সম্পর্কেব প্রতীক হয়েই পঞ্চভূতে ফিরে গেলেন।

হযতো বিদগ্ধ কণ্ঠ থেকে রুষ্ট মন্তব্য শুনব যে সোভিযেটকে কিছুতেই সুসংস্কৃত 'সভ্য' দুনিযাতে স্থান দেওযা যায না। কাবণ সেখানে পাস্তের-নাক-এব মতো প্রতিভা নির্যাতিত হয 'Dr Zhivago' লেখার জন্য 'শাস্তি' পেতে হয। নোবেল পুবস্কাবেব মতো ঈর্ষণীয় গৌরব প্রত্যাখ্যানে বাধ্য হতে হয, ইত্যাদি ইত্যাদি! এই উপলক্ষে Deutscher-এব বচনা (১৯৬৭) থেকে কযেকটা কথা মনে আসছে। ত্রিশেব দশকে পাস্তেবনাক অন্যান্য সোভিযেট কবিদেব মতো স্টালিনেব প্রশস্তি কবতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। শোনা যায প্যাবিসে আন্তর্জাতিক লেখক সভায Bebel এবং Pasternak স্টালিনের বিশেষ আগ্রহেই বুঝি গিযেছিলেন। কিন্তু 'Dr, Zhivago' লিখতে গিয়ে (Deutscher-এর মতে) তিনি সোভিযেট বিপ্লব ও বিপ্লবের ভিত্তিভূমি মার্কসতত্ত্বকে এমন কদর্য ছাপ দেবার চেষ্টা করেন যা হল "the epitome of callousness and egotism" পাস্তেবনাকই লিখছেন ঝিভাগো আর লবাব প্রেমবন্ধন এমনই যে "even more than what they had in common, they were united by what separated them from the rest of the world." (অনুবাদের দরকাব নেই)। Deutscher-এর

মতে পাস্তেরনাক যুগান্তকারী বিপ্লবকে "artistically and politically vacuums" বানিয়ে ছাড়লেন যা সোভিয়েট সমাজ সহ্য করতে পারে নি। মনে পড়ছে ইলিয়া এরেনবুর্গ-এর অভিযোগ ঃ "পাস্তেরনাক একটি ঘাসের শ্বাসপ্রশ্বাস শুনতে পারতেন আর উপেক্ষা করলেন সমাজের শিকড় থেকে তাকে টেনে তোলার বিপ্লবকে।"

কবি অমিয় চক্রবর্তী পাস্তেরনাক প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে লেখেন ঃ দুঃসাধ্য জাতীয় অথবা মহাজাতীয় বিপর্যয়পারগামী উজ্জীবনকে পাস্তেরনাক গূঢ় অভিজ্ঞতায় স্বীকার করতে পারলেন না, আর যোগ দিলেন ঃ "বিষয়তদ্গত শুদ্ধির স্বভাব মূলত আত্মসর্বস্বভাবেরই ছদ্মবেশ।" অপর কবি বিষ্ণু দে-এর মন্তব্য ঃ "এ ছদ্মবেশ রবীন্দ্রনাথকে কখনও পরতে হয় নি [কারণ] ঐতিহাসিক বৃহৎ বাস্তবকে কবিসত্তার সমস্যায় মেলাতে পারার প্রতিভা তাঁর ছিল।" কত গূঢ় গভীর অথচ অপরিহার্য প্রশ্ন নিয়ে যে "শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন" চাই, 'প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া" সিদ্ধান্তে উত্তরণের কাজ যে পড়ে রয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। "স্রোত চলে সূর্য জ্বলে" চলুক মানব অভ্যুদয়ের পরিক্রমা।

বাঙালী কি আত্মঘাতী?

রবীন্দ্র কুমার দাশগুপ্ত

"যেখানে চিন্তাব ধাবা বীতিহীন—শব্দেব প্রযোগ অসংগত

জীবনানন্দ দাশ

বাঙালী কি আত্মঘাতী এই প্রশ্নটি আমাব বড অদ্ভুত বলিযা মনে হইতেছে। এ পর্যন্ত কোন বঙ্গীয মণীষী বাঙালীকে আত্মঘাতী বলিযাছেন বলিযা জানি না। হবপ্রসাদ শাস্ত্রী বাঙালীকে এক আত্মবিস্মৃত জাতি বলিযাছেন। আত্মঘাতী বলেন নাই। বঙ্কিম, ববীন্দ্রনাথ বাঙালীর চবিত্রেব অনেক দোষেব কথা বলিযাছেন। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বায বঙ্গীয যুবকদেব কর্মবিমুখতাব জন্য কত তিবষ্কাব কবিযাছেন। সে তিবস্কাব আমরা তখন আশির্বাদ বলিযা গ্রহণ কবিয়াছি। কিন্তু আমাদেব আত্মঘাতী বলিয়া কেহ চিহ্নিত কবেন নাই। তবে আজ এই শতাব্দীর শেষে এই প্রশ্ন কেন উঠিল তাহা বলি।

১৯৮৮ সালেব ২০শে নভেম্বব "আত্মঘাতী বাঙালী" নামে দুইশত পৃষ্ঠাব একখানি গ্রন্থ বাহিব হইল। প্রকাশক, তাঁহাব নিবেদনে বলিলেন 'এই গ্রন্থ তিন খণ্ডে সমাপ্ত হবে। গ্রন্থকাব নীরদ চন্দ্র চৌধুবী কিন্তু ঠিক এই নামে আব দুই খণ্ড পুস্তক লিখিযাছেন। বাকী দুই খণ্ড অন্য নামে বাহিব হইল। ১৯৯২ সালে 'আত্মঘাতী ববীন্দ্রনাথ' নাম দিযে একখানি বই প্রকাশিত হইল। নাম পত্রে জানান হইল যে এই গ্রন্থ "আত্মঘাতী বাঙালীব" দ্বিতীয খণ্ড। ১৫৪ পৃষ্ঠায এই গ্রন্থেব শেষে বলা হইল 'দ্বিতীয খণ্ড সমাপ্ত' এবং আত্মঘাতী ববীন্দ্রনাথ প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।' ইহাতে যে bibliographical confusion-এব সৃষ্টি হইল তাহা গ্রন্থকাব বা প্রকাশক কেহই বুঝিলেন না। ইহাব পব ১৯৯৬ সালে ১২০ পৃষ্ঠাব 'আত্মঘাতী ববীন্দ্রনাথ' দ্বিতীয খণ্ড বাহিব হইল। এবাব আব নামপত্রে শেষ পৃষ্ঠায এই পুস্তকখানিকে আত্মঘাতী বাঙালীব তৃতীয খণ্ড বলা হইল না। অর্থাৎ প্রথম খণ্ডে বাঙালী আত্মঘাতী হইযা মরিল। দ্বিতীয খণ্ডে বাঙালী এবং বাঙালী কবি মবিলেন। তৃতীয খণ্ডে একা রবীন্দ্রনাথ মবিলেন। সঙ্গে আর কেহ মবিলেন না।

এমন কেন হইল। এই বিষযে একটি অনুমান করতে পাবি। যে কোন গ্রন্থ এখানে এক বাণিজ্যিক পণ্য। পণ্য হিসাবে আত্মঘাতী ববীন্দ্রনাথ-এব ক্রেতা আত্মঘাতী বাঙালী ক্রেতা হইলে সংখ্যায বেশি হইবে।

এই গ্রন্থত্রযের আলোচনার বড সমস্যা এই যে এই আলোচনা কে করিবে। পাঠক, তুমি জাননা তুমি মরিযা গিযাছ! এতদিনে মবিয়া ভূত হইযাছ। তোমাব দুর্দশাব ইহাই শেষ কথা নয। ভূত হিসাবেও তোমার কোন কৌলীন্য নাই। আত্মঘাতীব মৃত্যু অপমৃত্যু। তুমি জাতিচ্যুত ভূত।

এখন আমাব কথা বলিতে হয। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে কিছু লিখিতে আমাব হাত কাঁপিবে। নীবদ বাবুকে ছাত্রজীবন হইতেই চিনি। পিতৃবন্ধু হিসাবে তিনি আমাকে কিছু স্নেহও কবিতেন। তাঁহাব বিদ্যার বিস্তাব এবং তাঁহাব স্মবণশক্তি আমাকে বিস্মবাবিস্ট কবে। আমি দিল্লীতে তাঁহার নিকলসনেব বোডেব বাডিতে যাইতাম- কখনও দিলীপ কুমাব সান্ন্যালেব সঙ্গে কখনও একা। তাঁহাব কথা নীবব হইযা শুনিতাম তাঁহাব সঙ্গে কথোপকথন বড হইতে পাবে না। আলোচনায উত্তবপক্ষেব কোন স্থান নাই। একটানা পূর্বপক্ষ। এক-জনে গাবে ছাডিযা গলা, আব জন গাবে মনে। তাঁহাব সকল কথা বুঝিতাম এমন কথাও বলিতে পাবি না। দিলীপ বাবু মাঝে মাঝে তাল ঠুকিতেন। আমি তাহাও পাবিতাম না। কথাব মধ্যে ইংবাজি কোটেশানেব কিসমিস, ফরাসী কোটেশানেব বাদাম, ল্যাটিন কোটেশানেব পেস্তা, আব সংস্কৃত-বাংলা কোটেশানেব জাফ্রান আষ্টে পৃষ্টে লাগিযা আছে। এক পেটবোগা মানুষেব সামনে যেন এক থালা লক্ষ্ণৌব বিবিযানি। আমি তখন দিল্লীব একটি কলেজেব এক অখ্যাত ইংরাজিব অধ্যাপক। নীবদবাবুব সামনে নিজেকে মনে হইত আমি যেন এক অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষ।

একদিন নীবদবাবুব পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথাগুলি শুনিবাব পব একটু আড্ডা দিযা মনকে হাল্কা করিবার ইচ্ছা হইল। মেটকাফ হাউসে পরম সুহৃদ পবিমল বাযেব বাসায় চলিযা গেলাম। পবিমল বাবু বসিক মানুষ। নীবদবাবুব অসীম বৈদগ্ধেব কথা শুনিয়া তিনি আমাকে একটি গল্প বলিলেন। গল্পটি এই। একদিন পবিমল বাবুব সঙ্গে নীবদবাবুব দিল্লীব এক বাজপথে দেখা। কিছুক্ষণ কথা হইবাব পব নীবদবাবু বলিলেন—আমাদেব বাডি একদিন আসিবেন। পবিমলবাবু বলিলেন—আমবা মুর্খ মানুষ। আপনাব কাছে কোন সাহসে যাইব। এই কথা শুনিযা নীবদবাবু বলিলেন—তাহাতে কিছু যায আসে না, আপনি আসিবেন। পবিমলবাবু একদিন নীবদবাবুর বাডি গেলেন, গৃহের দরজা খোলা ছিল। বাহিব হইতেই দেখিলেন যে নীবদবাবুর গৃহ-পালিত কুকুবটি Romain Rolland-ব Jean Cristophe মূল ফবাসীতে পডিতেছে। পবিমল বাবু আব সেই কক্ষে প্রবেশ না কবিযা গৃহে ফিবিলেন। এই গল্পটি পবিমলবাবুব বম্য-বচনা-সংগ্রহ "ইদানীং" গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট। কাহিনীব সত্যাসত্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে পাবি না। বচনাটিতে কিছু অতিবঞ্জন অবশ্যই থাকিতে পাবে। তবে নীবদবাবুব কথা বলাব বীতিটি

এই কাহিনীতে বড় সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

নীবদ বাবু সম্বন্ধে আমার মন্তব্য সর্বজন গ্রাহ্য হইবে বলিযা মনে কবিনা। ইহার কারণ এই যে তিনি আমাব প্রতি বাম ছিলেন। ইহার কাবণ বলিব। ১৯৬৭ সালে 'দুই ববীন্দ্রনাথ' নামে নীবদবাবুর একটি প্রবন্ধ দেশ পত্রিকায প্রকাশ হয। প্রবন্ধটিব বক্তব্য ছিল এই যে ১৯১৩ সালে নোবেল পুবস্কার লাভ করিবাব পব এক দ্বিতীয ববীন্দ্রনাথেব আবির্ভাব হইল। তিনি আব তখন বাঙালী কবি নন, বিদেশীব মনোবঞ্জনই তাঁহাব তখন একমাত্র উদ্দেশ্য। গত বৎসব সেপ্টেম্বব মাসে ধ্রুব নাবাযণ চৌধুবী সম্পাদিত নীবদ বাবুব যে নির্বাচিত প্রবন্ধ গ্রন্থ আনন্দ পাবলিসার্শ বাহিব কবেন তাহাতে এই প্রবন্ধটি নাই। মনে হয লেখক, সম্পাদক এবং প্রকাশক ভাবিযাছিলেন যে এই প্রবন্ধটি ঘোর ববীন্দ্রবিদ্বেষীরাও পড়িবে না। দেশ পত্রিকায 'দুই ববীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটি কবিকন্যা মীরা দেবী পড়িয়া বিশেষ ক্ষুন্ন হইযা ছিলেন। তিনি তখন terminal cancerএ শয্যা লইয়াছেন। তিনি প্রমথনাথ বিশী মহাশযকে একখানা চিঠি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি এই প্রবন্ধ পড়িয়া নীবব থাকিবেন না কি ইহাব সমুচিত জবাব দিবেন। ইহাব কিছুদিন পবে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালযেব বাংলার এম. এ পবীক্ষার কাজে প্রমথ দিল্লী আসিলেন। দিল্লী আসিযা আমাদেব বাড়িতে উঠিলেন। রাত্রে আহাবেব পব পকেট হইতে মীবা দেবীব চিঠিখানি আমাকে দেখাইলেন। চিঠিখানি পড়িযা আমি যেন অসুস্থ মৃত্যুপথযাত্রী কবিকন্যাব কাতর কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম। প্রমথ আমাকে এই প্রবন্ধের এক কড়া সমালোচনা লিখিতে বলিলেন। আমি বলিলাম মীরা দেবী আপনাকে লিখিতে বলিযাছেন আপনাব স্থান আমি লইতে পারি না। আপনি কবিব স্নেহধন্য এক বিশিষ্ট নিকট লেখক। আপনাকে এই প্রবন্ধ লিখিতে হইবে'। আমাব কথা শুনিলেন না আমাকে লিখিবাব জন্য পীড়াপীড়ি কবিতে লাগিলেন। আমি একবূপ বাধ্য হইযা ২৬ পৃষ্ঠাব একটি প্রবন্ধ লিখিযা গজেন বাবুকে পাঠিযে দিলাম। কলিকাতায এই প্রবন্ধ কে পড়িযা কি বলিলেন তাহা দিল্লী বসিযা জানিতে পাবি নাই। তবে কবি নবেন্দ্র দেব এই প্রবন্ধটি পড়িযা আমাকে একখানা চিঠি দিয়েছিলেন। ববীন্দ্র চর্চাব ইতিহাসে এই চিঠিখানিব মূল্য বুঝিযা ইহা পাঠকেব কাছে উপস্থিত কবিলাম।

ঔ

৭২ হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা—২৯
৫. ১২. ৬৭

পবম প্রীতিভাজনেসু

ববি ভাষা অনেককেই পড়তে হযেছে বিস্তর কিন্তু কজন তা কাজে লাগাতে

পেবেছে ? কথাসাহিত্যে তোমাব অমূল্য রচনাটি পড়ে আমরা দুজনে খুবই সুখী হয়েছি। তুমি যে দুই রবীন্দ্রনাথের লেখককে শুধু দ্বিজ ববীন্দ্রনাথ নয় ববীন্দ্রনাথেব দ্বিজবূপে দেখিয়ে এক ভাগ্যহত স্বজাতিবিদ্বেষীকে কিছু জ্ঞান দেবাব চেষ্টায় তোমাব অমূল্য সময় অনেকখানি ব্যয় কবেছ এ জন্য ববীন্দ্র ভক্ত আমবা তোমাব কাছে আমাদেব সানন্দ কৃতজ্ঞতা নিবেদন কবছি এবং আশীর্বাদ কবছি তুমি দীর্ঘায়ু হও। আশাকবি বৌমা ও মিঠুমা উভযেবই কুশল।

ইতি তোমার গুণমুগ্ধ নবেন দা।

কিন্তু নীবদ বাবু এই প্রবন্ধ পড়িযা কি ভাবিলেন তাহা বলিতে পাবি নাই। ইহাব ঠিক বিশ বছব পবে, ১৯৮৬ সালে দুইমাস অক্সফোর্ডে কাটাইতে হইযাছিল। ঐ সময তপন বাযচৌধুবী উক্ত বিশ্ববিদ্যালযে ইতিহাসেব অধ্যাপক। আমি তাঁহকে একদিন বলিলাম ২০ নম্বর ল্যাথবেবী বোডে নীবদ বাবুব বাড়িতে আমাকে লইযা চল। তপন বলিলেন তাঁহাব সঙ্গে দেখা কবা আমাব উচিত হইবে না। তিনি আপনাব প্রতি বুষ্ট। আপনাব সঙ্গে নীবদ বাবুব বিশেষ পবিচয আছে জানিযা আপনাব নাম একদিন উল্লেখ কবিযাছিলাম। তিনি বলিলেন ববি বাবু একজনকেই জানি, তিনি গীতাঞ্জলী লিখিযাছেন। অন্য কোন ববিবাবুকে আমি চিনি না। তপন নীবদবাবুকে জিজ্ঞাসা কবিযাছিলেন যে তিনি যে ববিবাবুব কথা বলিতেছেন তাহাব সম্বন্ধে তিনি কি বলিতে চাহেন। নীবদবাবু বলিলেন এই রবি দাশগুপ্ত একটি প্রবন্ধে তাঁহাকে গালি গালাজ কবিযাছে। আমাব প্রবন্ধে আমি নীবদবাবুকে গালি দেই নাই, একটু রঙ্গব্যঙ্গ কবিযা কথা বলিযাছি।

"আত্মঘাতী" ত্রিপিটকেব একটি পিটকে অবশ্য নীবদ বাবু আমাব নাম উচ্চাবণ না কবিযা এই বচনা প্রকাশ কবিবাব জন্য কথাসাহিত্যেব সম্পাদককে তিবস্কাব কবিযাছিলেন। এই তিবস্কাবেব একটি ফল হইযাছে এই যে কথা-সাহিত্য পত্রিকাব দুযাব আমার জন্য বন্ধ হইযা গিযাছে। আমি কোন অর্থেই লেখক নহি। কিন্তু দুই জন সম্পাদকেব স্নেহপূর্ণ প্রশ্রযে আমাব বচনা দুইটি পত্রিকায বাহিব হইযাছে। পবম সুহৃদ্ সাগরময ঘোষ সদয হইযা দেশ পত্রিকায আমাব লেখা ছাপাইযাছেন। আব এক পবম সুহৃদ গজেন্দ্র কুমাব মিত্র আমি ছাই-ভষ্ম যাহাই লিখিতাম তাহাই কথা সাহিত্যে ছাপিতেন। গজেনবাবুব মৃত্যুর পবেও কথাসাহিত্যেব সম্পাদক শাবদীয সংখ্যাব জন্য প্রবন্ধ চাহিয়া প্রতি বৎসব চিঠি দিতেন। বেশ কযেক বৎসব হইল আব চিঠি পাইতেছিনা। আত্মঘাতী ত্রিপিটকেব একটি পিটকে আমাব প্রবন্ধের প্রচ্ছন্ন এবং বুষ্ট উল্লেখ দেখিযা এই নীববতাব কারণ বুঝিলাম।

এখন বাংলা লিখিবার সুযোগ আর বড় নাই।

আত্মঘাতী ত্রিপিটকের পূর্বে প্রকাশিত নীরদ বাবুর ইংরাজী বাংলা গ্রন্থ সব গুলিই পড়িয়াছি। ইহার পরে প্রকাশিত তাঁহার 'আমার দেশ আমার শতক' এবং "Three Horsemen of the new Apocalypse (১৯৯৭) এবং 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' (১৯৯৭) গ্রন্থত্রয়ও পড়া হইয়াছে। নীরদ বাবুর ইংরাজী বাংলা রচনা পড়িয়া আমার মনে হইয়াছে যে তিনি অনেক কথা, বিচিত্র কথা, সাবলীল, আকর্ষণীয় ভাষায় লিখিতে পারিলেও তাঁহাকে একজন শ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় মণীষী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিনা। তাঁহাকে আচার্যের আসনেও বসাইতে পারিনা। তিনি চিন্তা করিতে পারেন বলিয়া তিনি আমাদের তাক লাগাইয়া দিতে পারেন কিন্তু হৃদয় স্পর্শ করিতে পারেন না। কখনও কখনও তাঁহার কথা প্রলাপের মত শোনায়। সে প্রলাপের ভাষা সুষ্ঠু হইলেও তাহা প্রলাপ। নীরদ বাবুর সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে ওই প্রবন্ধে কিছু বলিতে চাহিনা। এই প্রবন্ধের বিষয় "বাঙ্গালী আত্মঘাতী" কিনা। নীরদবাবু বাঙ্গালী আত্মঘাতী বলিয়াছেন এবং রবীন্দ্রনাথকেও আত্মঘাতী বলিয়াছেন। কোন জাতিকে কোন পণ্ডিত আত্মঘাতী বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন বলিয়া জানিনা। কোন কবিকেও কেহ আত্মঘাতী বলেন নাই। এই আত্মঘাতী ত্রিপিটক আমি যত্ন করিয়া পড়িয়াছি, এবং পড়িয়া আমার মনে হইয়াছে যে তিনি তাঁহার বিষয়ের সম্যক বিশ্লেষণ করিতে পারেন নাই। এই গ্রন্থত্রয়কে যদি একটি term essay হিসাবে পরীক্ষা করা হয় তাহা হইলে ইহাকে দশ নম্বরের মধ্যে দুই নম্বরের বেশী কোন পরীক্ষকই দিতে পারিবেন না। একটি জাতিকে আত্মঘাতী বলিয়া প্রমাণ করিতে হইলে যে ভাবে বিষয়ের উপস্থাপনা করিতে হয় এবং স্তরে স্তরে ইহার যে বিশ্লেষণ করিতে হয় সে সম্বন্ধে নীরদ বাবুর কোন জ্ঞান আছে বলিয়া মনে হইলনা। এই গ্রন্থের সিদ্ধান্ত কেবল গ্রন্থের নামেই পাইতেছি ; কোন যুক্তির পথে, বিশ্লেষণের পথে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছান হয় নাই।

ত্রিপিটকের প্রথম পিটকে নীরদবাবু বলিলেন 'বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের দুর্নিবার অধোগতি দেখিয়া এক ধরনের অদৃষ্টবাদে আস্থাবান হইয়াছি'। কিন্তু এই অধোগতির ইতিহাস কোথায় ? এই অধোগতির আরম্ভই বা কোথায় ? এই পিটকের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন এই অধোগতির আরম্ভ ১৯১৭-১৮ সাল। কিন্তু ১৯১৭-১৮ সালের পরবর্তী কালে বাঙ্গালীর কৃতিত্বের অভাব নাই। এই শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে বাঙ্গালী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জীবন ও কর্মে এক বিশেষ মহত্বের পরিচয় পাইলেন। ১৯২৪ সালে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক সত্যেন্দ্রনাথ বসু আইনষ্টাইনের সান্নিধ্যে আসিয়া Bose Einstein Statis-

tics উপস্থিত করিয়া বিশ্ববরেণ্য হইলেন। এই কালসীমার মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়াইল। এই সময়েই রবীন্দ্রোত্তর শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি জীবনানন্দ দাশের আবির্ভাব। রাজনীতিতে দেখি ১৯২২-এর গয়া কংগ্রেসের সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ এবং তাহার পরেই মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় আসিয়া চিত্তরঞ্জনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে মানিয়া লইলেন। এই পিটকেই তিনি আরও লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালী 'অজ্ঞাতে প্রবৃত্তির বশেই আত্মহত্যা করিয়াছে'। এই আত্মহত্যার সন তারিখ নাই। এই পিটকের পর বাকি দুইটি পিটকে নীরদ বাবু বাঙ্গালীকে ছাড়িয়া রবীন্দ্রনাথকে ধরিলেন। মনে হইবে নীরদ বাবুর বক্তব্য এই যে বাঙ্গালী এবং রবীন্দ্রনাথ এক সঙ্গে আত্মঘাতী হইলেন। এখন প্রশ্ন হইল এই যে রবীন্দ্রনাথ কবে আত্মঘাতী হইলেন। এই তারিখটিও ঐতিহাসিক নীরদবাবু উল্লেখ করিতে পারেন নাই। তবে এই সম্বন্ধে একটি মন্তব্য তিনি তৃতীয় পিটকে করিয়াছেন। সেখানে তিনি ১৯৬৭ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির কথা বলিয়াছেন অবশ্য প্রবন্ধটির নাম উল্লেখ করেন নাই। তাহার পর তিনি লিখিলেন এই প্রবন্ধটার উপর সর্বাপেক্ষা তীব্র আক্রমণ মিত্র এ ঘোষের কথাসাহিত্য পত্রিকাতেই ছাপা হইয়াছিল। এই 'সর্বাপেক্ষা তীব্র আক্রমণ' বলিতে তিনি মল্লিখিত 'পড়তে হয়েছে বিস্তর' প্রবন্ধটির কথাই বলিতে চাহিতেছেন। এই পিটকের পঞ্চম অধ্যায়ে তিনি অবশ্য তাঁহার "দুই রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটির উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন 'আমি ১৯৬৭ সনে 'দেশ' পত্রিকায় 'দুই রবীন্দ্রনাথ' নাম দিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম তাহার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি হইয়াছিল। পরে জানিয়াছিলাম মীরা দেবীই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি একজন সুপরিচিত রবীন্দ্রভক্ত অধ্যাপককে আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিতে বলেন। তিনি অগ্রসর না হওয়াতে আর এক অধ্যাপককে বলেন, রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই দ্বিতীয় অধ্যাপকের আগ্রহ বা জ্ঞানের পরিচয় আগে পাওয়া যায় নাই। তবে, তিনি বিলাত ফেরৎ ছিলেন। তিনি আমাকে আক্রমণ করেন।' এখানে একটি কথা স্পষ্ট করিতে পারি। সুপরিচিত রবীন্দ্রভক্ত অধ্যাপক অবশ্য প্রমথনাথ বিশী। মীরাদেবী তাঁহাকেই দুই রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধের জবাব দিতে বলিয়াছেন। মীরা দেবী আমাকে লিখিতে বলেন নাই। আমার সঙ্গে তাঁহার কোন পরিচয়ই ছিল না। তিনি আমার নামও জানিতেন না। আমি প্রমথ বাবুর অনুরোধে এই প্রবন্ধ লিখি।

ইহার পর নীরদবাবু যাহা লিখিলেন তাহা একেবারেই অবিশ্বাস্য। তিনি মিত্র-ঘোষকে জানাইলেন যে এই প্রবন্ধ ছাপাইবার অপরাধে তিনি 'বাঙ্গালী জীবনে রমণী' গ্রন্থটি, যাহা মিত্র ঘোষ তখন ছাপাইতে ছিলেন, 'প্রত্যাহার' করিবেন। মিত্র-ঘোষ তখন তাঁহাদের একজন কর্মাধ্যক্ষকে দিল্লিতে পাঠাইলেন

এবং তিনি বলিলেন এই আক্রমণটি তাঁহারা ব্যবসায়িক কারণে ছাপাইয়া ছিলেন। ঐ ব্যবসায়িক কারণেই কথাসাহিত্যে আজ আমার কোন স্থান নাই, অবশ্য স্থান থাকিলে আমি যে একজন লেখক হইয়া উঠিতাম সেকথাও বলিতে পারি না। নীরদবাবু লিখিলেন মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষের সহিত আমার মিত্রতা অক্ষুণ্ণ রহিল'। 'আমিও বলি মিত্র অ্যাণ্ড ঘোষের সহিত আমার মিত্রতাও অক্ষুণ্ণ।

এখন আত্মঘাতী ত্রিপিটকের কথায় ফিরিয়া আসি। এই গ্রন্থত্রয়ের লেখক কোন অর্থেই ঐতিহাসিক নন। বঙ্গদেশ সম্বন্ধে কোন ঐতিহাসিক স্তবের কোন চিহ্ন ইহাতে নাই। বাঙালীর পতন অথবা অপমৃত্যু সম্বন্ধে লিখিতে হইলে যে সামাজিক-ঐতিহাসিক দৃষ্টির প্রয়োজন তাহা নীরদবাবুর নাই। তিনি এক কথক ঠাকুর। মজার কথা বলিতে পারেন, কাজের কথা বলিতে অক্ষম। ক্ষণকালের জন্য এক শ্রেণীর পাঠককে চমকিত করিবার কৌশল তিনি অবশ্যই জানেন। সেই কৌশল প্রয়োগ করিয়াই তিনি লেখক হিসাবে কিছু খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। এই খ্যাতি টিকিবে না। সামাজিক ইতিহাস লিখিবার দায়িত্ব বোধ যদি লেখকের বিন্দুমাত্রও থাকিত তাহা হইলে এই ত্রিপিটক গ্রন্থের বিষয় বিন্যাস অন্য রকম করিতেন। আসলে নীরদবাবু বিষয়ের উপস্থাপন করিতে পারেন নাই। প্রাচীন বাংলা, মধ্যযুগের বাংলা, এবং আধুনিক বাংলা, এই তিন বাংলার মধ্যে রক্তের সম্পর্ককে প্রথমে বুঝিতে হইবে। বাঙালীকে চিনিয়া লইতে হইবে। এই তিনকালের বাঙালীকে এক করিয়া দেখিবার কোন চেষ্টা এই গ্রন্থত্রয়ে নাই। বাঙালী যে আত্মঘাতী হইল সেই ঘটনা কবে ঘটিল। তাঁহারা কি হঠাৎ একদিন সকলে মিলিয়া বিষ পান করিলেন বা গলায় দড়ি দিলেন। এত বিষ এত দড়ি কোথা হইতে আসিল। আমি কোন অর্থেই ইতিহাসবেত্তা নহি। সাধারণ পাঠক হিসাবে কতগুলি ইতিহাস গ্রন্থ পড়িয়াছি। সেই সব গ্রন্থের নাম গন্ধ নীরদবাবুর এই mass suicide report এ নাই। বাঙালীর সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়া দিবার পূর্বেই উনি বাঙালীর আত্মহত্যার মর্মান্তিক সংবাদ দিলেন। বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে বাঙালীর অতীতকে বুঝিয়া লইতে হইবে। যদিও নীরদবাবু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলিতেছেন না। আত্মঘাতী বাঙালীর ভবিষ্যৎ নাই। তাহার অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। তাহা হইলে কে আত্মঘাতী হইল, তাহার ইতিহাস কি বুঝাইয়া বলিতে হইলে এই গ্রন্থত্রয়ে সেই বিচার বিশ্লেষণ আদৌ নাই। আমি যত্নকরিয়াই তিনখানা গ্রন্থ পড়িয়াছি। আমার মনে হইয়াছে এই তিনখানি পুস্তক যেন চটুল চুটকির তিনখানি তোড়া। পড়িবার পর ভাবিয়াছি কেন পড়িলাম।

১৮৮০ সালে বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন বাঙ্গালীর ইতিহাস

নাই, ইহার ছয় বৎসর পূর্বে বঙ্কিম লিখিয়াছিলেন ইতিহাসবিহীন জাতির দুঃখ অসীম। সেই হতভাগ্য জাতিদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য বাঙালী, কিন্তু অচিরেই বাঙালীর ইতিহাস চেতনা হইল। বাঙালীর অতীত কথা কহিয়া উঠিল। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালীর ইতিহাস (১৮৭৪), বোধহয় আমাদের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কতগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিলেন। তাঁহার 'বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, বাঙলার ইতিহাস, বাঙালার কলঙ্ক, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি শিক্ষা, বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, বাঙ্গালীর উৎপত্তি প্রভৃতি বাঙ্গালার ইতিহাস চিন্তার সূত্রপাত করিল। আজ বাঙালীর ইতিহাসের অভাব দেখিনা। সেই ইতিহাসের ইতিহাস আজ সুপরিচিত, কিন্তু নীরদবাবু সেই ইতিহাসের ধার ধারেননাই। মৌর্য বঙ্গ, গুপ্ত বঙ্গ, পাল বঙ্গ, সেন বঙ্গ, পাঠান বঙ্গ, মোগল বঙ্গ, ব্রিটিশ বঙ্গ সম্বন্ধে একটি শিক্ষাও তিনি বলিলেন না। অথচ আমাদের কালের বাঙালীর এই ইতিহাস না জানিলে বাঙালীকে চিনিতে পারিব না। নীরদবাবু বঙ্গকথায় আত্মঘাতী বাঙ্গালীর সংবাদ পাই। কবে কি অবস্থায় কি কারণে বাঙ্গালী আত্মঘাতী হইল সে বিষয়ে এই বই তিনখানিতে কোন সার্থক আলোচনা নাই।

নীরদবাবু বঙ্গদেশেই বাস করিতেন। বিধি বৈগুণ্যে এই দেশেই তাঁহার জন্ম। কিন্তু এই দেশেতেই জন্ম আমার যেন এই দেশেতেই মরি, এসব কথা তিনি ভাবিলেন না। সে ভাব সাধারণ বাঙালীর ভাব। নীরদবাবুকে একজন সাধারণ বাঙালী বলিতে পারি না। যাহাহউক তিনি উত্তর কলিকাতায় বসবাস করিতেছিলেন। একদিন আবিষ্কার করিলেন যে বঙ্গদেশ ডুবিতেছে। তিনি উত্তরাপথে দিল্লী শহরে আশ্রয় লইলেন। ১৯৭০ পর্যন্ত দিল্লীতে বাস করবার পর একদিন আবিষ্কার করিলেন ভারতবর্ষ ডুবিতেছে। তখন তিনি যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে তাঁহার প্রথম গ্রন্থ The Autobiography of an Unknown Indian উৎসর্গ করিয়াছিলেন সেই সাম্রাজ্যের রাজধানী লন্ডন শহরে আশ্রয় লইলেন। ইহার পর আবিষ্কার করিলেন যে সমস্ত প্রতীচ্য ডুবিতেছে। পলাইবার স্থান নাই মা, বল কি উপায় করি। আশ্রয় লওয়ার স্থান ত আর রহিল না। সারা বিশ্ব ডুবিতেছে। কল্পনা করিত পারি এখন তিনি তাঁহার মৌলিক চিন্তার নোয়াজ্‌ আর্কে নিরাপদে ভাসিতেছেন।

যাহারা আত্মঘাতী বাঙ্গালী এবং আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ পড়িয়া পীড়িত বোধ করিতেছেন তাহাদের উদ্দেশ্যে দুএকটি কথা বলিতে চাহিতেছি। তবে এমন লোকের সংখ্যা কম। আত্মঘাতী বাঙালী গ্রন্থখানি পাঁচ বৎসরে সাতবার মুদ্রিত হইয়াছে। হইবেই বা নাই কেন। তিনিঅক্সফোর্ডে বসিয়া ধুতি

পড়িয়া হয়তো খাগের কলমে কাঁদিতে কাঁদিতে আত্মঘাতী বাঙ্গালীর কাহিনী লিখিয়াছেন। ইংলণ্ডবাসীর প্রতি বাঙ্গালীর একটা শ্রদ্ধা বরাবরই ছিল। সেই শ্রদ্ধার জন্যই ইংরাজ প্রায় দুই শত বৎসর আমাদের শাসন করিয়াছেন। স্বাধীনতা লাভের পর শেষ ইংরাজ শাসনকর্তাকে আমরা ডাকিয়া বলিয়াছিলাম যেতে নাহি দিব। সেই ইংরাজের দেশে বসিয়া এক বাঙালী সুধী তাঁহার স্বজনের অপমৃত্যুর কথা লিখিয়াছেন। সেকথা ত অমৃত কথা।

নীরদ বাবুর ইংরাজি বাংলা সব বইই পড়িয়াছি। ইহার মধ্যে আত্মজীবনী দুই খানা, জীবনী দুইখানা। বাকী বইগুলিকে বলিতে পারি প্রবন্ধ সাহিত্য। তবে এক অর্থে নীরদবাবুর সকল কথাই আত্মকথা, নিজের কথা না বলিয়া তিনি কোন কথাই বলিতে পারেন না। যখন তখন তিনি ধান ভানতে শিবের গীত গাহিয়া থাকেন, তবে সেই শিব তিনি নিজে। এই গ্রন্থ নিচয় পাঠ করিয়া আমার মনে হইয়াছে যে বাঙালীর নিন্দা এবং রবীন্দ্রনাথের নিন্দা নীরদবাবুর এক সাধের কর্ম।

সর্বাগ্রে নীরদ বাবুর প্রথম গ্রন্থ The Autobitapy of an Unknown Indian (১৯৫১) এর কথা বলি। পূর্বেই বলিয়াছি এই গ্রন্থখানি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে উৎসর্গ করা হইয়াছে। ইংরাজ আমাদের দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার মাত্র চার বছরের মধ্যে ইংরাজ শাসনের এই প্রশস্তি লিখিতে হইল এবং তাহা ইংরাজের হাতে দিয়া বলা হইল: All that was good and living within us was made, shaped and quickened by the British rule। এই বইখানি নীরদবাবুর প্রথম গ্রন্থ। ইহা দিয়াই তাঁহাকে দাঁড়াইতে হইবে, প্রথমে ইংলণ্ডে এবং পরে সারা বিশ্বে। ইহাই হইবে নীরদ বাবুর গীতাঞ্জলি। অতএব গ্রন্থকার নীরদবাবু কেবল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে উৎসর্গ করিলেন না। তিনি ইংরেজর পাতে মধু ঢালিতে ব্যস্ত হইলেন। ইংরাজ যাহা শুনিতে চাহে, তাহাই ইংরাজকে শুনাইলেন।

উনি জানিতেন স্বজাতিপ্রীতির জন্য রবীন্দ্রনাথ ১৯২০ সালে তাঁহার ইংরাজ বন্ধুদের দ্বারা একেবারে বর্জিত হইয়াছিলেন। নীরদবাবু সেই সর্বনাশা স্বজাতি প্রীতি নির্মম ভাবে ত্যাগ করিলেন। এবং তাঁহার আত্মজীবনীতে বাঙ্গালীর মাথায় লগুড়াঘাত করিলেন। লিখিলেন 'The life and culture of Bengal have been overtaken by a blight as complete and sordid as that which put an end to his career. This degradation of Bengal is of course, part of the larger process of the rebarbarization of the whole of India in the last twenty years (পৃঃ ২১৭) অর্থাৎ নীরদবাবু ইংরাজকে ডাকিয়া বলিলেন যে 'হে ইংরাজ, তুমি যে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছ সে দেশ

বর্বরের দেশ। তুমি ভারত ছাড়িবার পনের বৎসর পূর্ব হইতেই ভারত-বর্ষ এক বর্বর দেশে পরিণত হইয়াছে। ইংরাজ শাসককুল ভারতের নব-জাগরণকে হিন্দু জাগরণ বলিতেন। নীরদবাবু তাঁহার আত্মজীবনীতে এই মতের পোষকতা করিলেন। অর্থাৎ ১৯১০ সালে Sir Valentine Chirol তাঁহার Indian Unrest গ্রন্থে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন নীরদবাবু চল্লিশ বছর পর তাহাই বলিলেন। তিনি ভারতের অভ্যুদয়ে দেখিলেন Hindu revivalism preached by Bankim Chandra Chatterjee and Vivekananda (পৃঃ ২৪১) ইহার পর হিন্দুর চরিত্র সম্বন্ধে লিখিলেন ঃ Like most Hindu virtues, these Hindu vices too were the products of feebleness and passivity (পৃঃ ২৫০) তারপর নীরদবাবু তাঁহার বাঙালী বিদ্বেষের সুর আরও চড়াইলেন ঃ The same class of Hindu Bengalis who opposed Lord Curzon's partition of Bengal have now themselves brought a second partition of their country—a good illustration perhaps of the inconsistencies which is inseperable from the method of arriving at political decisions by the assertion of collective whim (পৃঃ ২৫৯) অর্থাৎ ইংরাজকে বলিলেন বাঙালী লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগের বিরোধিতার নির্বুদ্ধিতার জন্য বিধাতার কোপ এড়াইতে পারিল না। ১৯৪৭ সালে তাহাকে ভারত-বিভাগ গ্রহণ করিতে হইল। ভারত-বিভাগ যে বাঙ্গালীর পরিকল্পনা নহে, শরৎ বসু যে ইহার বিরোধিতা করিয়াছিলেন, এমনকি স্বাধীনতা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই সে কথা নীরদবাবু বলিলেন না। ইংরাজকে তুষ্ট করিবার জন্য তিনি ইতিহাস উল্লেখ করিলেন। স্বদেশবাসীর রাজনীতিকে collective whim বলিলেন। ইংরাজের আনন্দ হইল। নীরদবাবু এইখানেই থামিলেন না। তিনি বাঙ্গালীর ইংরাজ-বিদ্বেষ কি বস্তু তাহা ইংরাজকে বুঝাইলেন। 'Our messianic faith in the future of our country was filled not with a definitely Hindu content, to our lyrical love for our country was added a fierce hatred of the English , the spirit of self-sacrifice and dedication found its natural, but always fatal, complement of fanaticism. When in later life I read Sir Valentine Chirol's Indian Unrest we had been taught to hate him and his book equally well—and compared what he had written with my own recollections, I found that he had been wholly correct in his estimates.

of the swadeshi movement in representing it as essentially a movement of Hindu revival (পৃঃ ২৬৪) অর্থাৎ নীবদবাবু দুঃখ কবিলেন যে বাঙ্গালী স্বদেশপ্রীতিব সঙ্গে বিদেশী শাসকেব প্রতি বিদ্বেষ মিশাইযা ফেলিযাছিল। এবং সেই দুঃখ তিনি ইংরাজকে জানাইলেন।

এই আত্মজীবনী দিযা নীবদবাবু তাঁহাব জীবনকে নূতন কবিয়া সাজাইতে চাহিলেন। ইংবাজেব দুযাবে কবাঘাত কবিযা বলিলেন—হে ইংবাজ তুমি যে আমাদেব শাসক হিসাবে বলিতে যে আমাদেব স্বাদেশিকতা হিন্দু স্বাদেশিকতা তাহা সর্বৈব সত্য। তুমি যে ভারত ছাডিবাব সময ভাবতেব একটি অংশ মুসলমানকে দিযা আসিযাছ তাহা সুবিচাবই হইযাছে। স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল হিন্দু আন্দোলনঃ Bankim Chandra Chatterji and Ramesh Chandra Dutt glorified Hindu rebellion against Muslim rule and showed the Muslims in a correspondingly poor light. Chatterji was positively and fiercely anti-muslim (পৃঃ ২৬৯)

পাঠান যুগ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবাব সুযোগ এই গ্রন্থে নাই। যদি থাকিত তাহা হইলে বোধহয নীবদবাবু পৃথ্বীবাজেব মুসলমান-বিদ্রোহ সম্বন্ধে এই রূপ মন্তব্যই করিতেন। নীবদবাবুর চিন্তায বঙ্কিম যেমন হিন্দু ঔপন্যাসিক, রবীন্দ্রনাথ তেমনি হিন্দু কবি। বামমোহনও এক হিন্দু সংস্কাবক। তাঁহাবা চিন্তায হিন্দুভাব ইউবোপীয ভাবের সহিত মিশিযাছে। মুসলমানেব ভাব বাদ পডিযাছে। অর্থাৎ নূতন ভাবতে মুসলমানেব কোন অস্তিত্ব নাই। ‘The very first result of this renaissance was a progressive de-Islamization of the Hindus of India and a corresponding revival of Hindu traditions (পৃঃ ২৬৯) নীরদবাবু ইতিহাসেব ছাত্র ছিলেন। তাঁহাব নানা গ্রন্থে ইতিহাসেব নানা প্রসঙ্গ। কিন্তু তাঁহাব ইতিহাস বোধ ছিল বলিয়া মনে হয না। থাকিলেও সেই বোধ তিনি ইংবাজ-তোষণেব জন্য চাপিযা গিযাছেন। তবে স্বদেশী আন্দোলনেব কথা তাঁহাব জীবনকথাব অংশ কোন কালেই হইতে পারে না। এই আন্দোলন যখন আবম্ভ হয তখন তাঁহাব বযস মাত্র সাত। ইংরাজেব পাতে কিছু মধু ঢালিবাব জন্যই তিনি এই গ্রন্থে স্বদেশী আন্দোলনেব প্রসঙ্গ কবিযাছেন।

নীরদবাবু যে ইংবাজ-শাসককুলেব এক বাঙ্গালী আত্মীয তাহাও তিনি এই আত্মজীবনী গ্রন্থে স্পষ্ট কবিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধেব সময ভাবত সবকাব যে Defence of India Act চালু কবিলেন সে সম্বন্ধে তিনি লিখিলেনঃ ‘The Defence of India Act, almost the last important

public measure of Hardinge, at last succecded in seizing the revolutionaries by the throat. (পৃঃ ৩৭১)। পাঠক যদি জিজ্ঞাসা করেন Hardinge-এর পর নীরদবাবু কাহাকে Viceroy হিসাবে চাহিয়াছিলেন তাহা হইলে সেই প্রশ্নের উত্তরও এই আত্মজীবনী হইতেই দিতে পারিব। এই বিষয়ে তিনি লিখিলেন যে এই সময়ে তিনি তাঁহার একবন্ধুকে বলিয়াছিলেনঃ I wish they would sent out Winston Churchill (পৃঃ ৩৭২)।

বাঙালীর নিন্দা এই গ্রন্থের যত্রতত্র। আমি মাত্র আর একটি দৃষ্টান্ত দিব। এক জায়গায় নীরদবাবু লিখিলেন 'On account of this absence of idealism the Bengalis of Calcutta, taken as a collective mass, could be moved to action only through the gross worldliness or what was its counterpart in them, a frothy sentimentality (পৃঃ ৪৩৮)। এই রকম উদ্ধৃতি আর কত দিব। বাঙালী জীবনের এই মিস্ মেয়ো (পুং) বাঙালীর নিন্দায় মুখর।

স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে নীরদবাবুর মনোভাবের কথা বলিয়াছি। তাঁহার মতে ইহা ছিল এক হিন্দু আন্দোলন। ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলন সম্বন্ধে তিনি লিখিলেনঃ I found myself not only out of sympathy with the ideas, aims and methods of the movement, but also violently opposed to them (পৃঃ ৪৭৪)।

নীরদবাবু ইহাও জানিতেন যে কেবল বাঙালীর নিন্দায় ইংরাজের পেট ভরিবে না। মহাত্মা গান্ধী ইংরাজের প্রধান শত্রু। তাঁহাকেও নীচে নামাইতে হইবে। এই কথা মনে রাখিয়া তিনি গান্ধীর rejection of civilzation and reason সম্বন্ধে উক্তি করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে লিখিলেনঃ The Good that he was punished at the hands of the Evil he had helped to triumph (পৃঃ ৫১৭, ৫১৯) শেষে ইংরেজকে স্পষ্ট করিয়া বলিলেন ' I felt an instinctive dislike for the non-co-operation movement (পৃঃ ৫১৯)

কিন্তু এই কথার পর জিজ্ঞাসা করিতে হয় ইংরাজের কাছে নীরদবাবুর শেষ কথা কি। সেই শেষ কথা এই। ভারত বিদেশী প্রভাব ছাড়া বাঁচিতে পারে না। সেই প্রভাব বিদেশী শাসন ছাড়া সম্ভব নহে। তাই বলিতেছি হে ইংরাজ, তুমি আসিয়া ছিলে, চলিয়া গিয়াছ, আবার আসিবে। আবার আসিবে ফিরে, এই গঙ্গার তীরে। 'Working within the emerging polity of the larger Europe the Anglo-Saxons can be expected to lay claim to a special associatien with India on historical gorunds. In

plain words I expect either the United States singly or a combination of the United States and the British Commonweath to re-establish and rejuvenate the foreign domination of India (পৃঃ ৬০০) আমরা পরে দেখিব যে নীরদ বাবুর মনে সাম্রাজ্য ছাড়া সভ্যতা নাই। ইংরাজ তাঁহার ভারত সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া আমাদের আবার সভ্য করিয়া তুলিবে।

The Autobiography of an Unknown Indian যখন প্রকাশিত হয় তখন আমি দিল্লীর একটি কলেজের এক অখ্যাত ইংরাজির অধ্যাপক। মনে আছে দিল্লীর বাঙালীরা এই বইখানি পড়িয়া বা না পড়িয়া নীরদবাবু সম্বন্ধে বিশেষ উচ্ছ্বসিত। একজন বিশিষ্ট ইংরাজিনবিশ বাঙালী, ইংরাজির Ph. D. আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বইখানি আমি পড়িয়াছি কিনা। আমি যখন বলিলাম হ্যাঁ পড়িয়াছি, তিনি বলিলেন যে নিশ্চয়ই আমি ইহার সব অংশ বুঝিতে পারি নাই। এই সম্বন্ধের কারণ বুঝাইতে যাইয়া বলিলেন যে এই গ্রন্থে ব্যবহৃত যাটটি ইংরাজি শব্দ ছোট বড় কোন Oxford Dictionary-তে নাই। ইংলণ্ডে বইখানির খুব প্রশংসা হইয়াছিল। বড় বড় বিদগ্ধ পত্রিকায় ইহার review বাহির হইয়াছিল। একজন ইংরাজ সমালোচক নীরদ বাবুর সম্বন্ধে একটি মূল্যবান কথা বলিয়াছিলেন। Glasgow Herald এর সমালোচক নীরদ বাবুকে 'product of a tortured and assertive spirit বলেন। এই tortured কথাটির ব্যবহার আমাকে আকৃষ্ট করিয়াছে, নীরদ বাবুর সমগ্র রচনাই এক পীড়িত মনের সৃষ্টি।

নীরদ বাবুর দ্বিতীয় গ্রন্থ Passage to England ১৯৫৯ সালে ছাপা হয়। গ্রন্থখানি পড়িয়া বুঝিলাম The Autobiogophy of an Unknown Indian ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিবার কয়েক বৎসরের মধ্যেই, মনে হয় চার বৎসরের মধ্যেই B B C এবং British Council একত্র হইয়া নীরদ বাবুকে পাঁচ সপ্তাহের জন্য ইংলণ্ডে ঘুরাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করেন। তাঁহার ইংলণ্ড এবং ইংরাজের স্তুতি এবং বাঙালী এবং গান্ধীর নিন্দার সুফল ফলিল। লক্ষ্য করিলাম ইংলণ্ডের কোন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডাকিয়া তাঁহার কথা শুনিতে চাহিল না। British Academy তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিল না। School of Oriental and African Studies তাঁহাকে দেখিতে চাহিল না, তাঁহার কথা শুনিতে চাহিল না। ১৯৫৫ সালে নীরদবাবু পাঁচ সপ্তাহ বিলাতে ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন, ফিরিয়া যে গ্রন্থখানি লিখিলেন তাহার নাম দিলেন A Passage to England। দেশে ফিরিবার পূর্বে অবশ্য দুই সপ্তাহ

প্যারিসে এবং এক সপ্তাহ বোম্বে কাটাইয়াছেন, তবে ইংলণ্ডের ব্যবস্থায় বিদেশ ভ্রমণ করিলেন বলিয়া এই গ্রন্থে কেবল ইংলণ্ডের কথাই লিখিলেন। এই গ্রন্থে আত্মঘাতী বাঙালী প্রসঙ্গ অবশ্য নাই। তবে নীরদবাবুর পশ্চিম-মুখীনতার এই গ্রন্থ এক বিশেষ নিদর্শন। যিনি এমন বিদেশমুখী তিনি স্বদেশমুখী হইতে পারেন না। জীবনানন্দ দাশের মত 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি পৃথিবীর মুখ দেখিতে চাহিনা আর' এমন কথা নীরদবাবু অবশ্যই বলিবেন না। জীবনানন্দের এই চরণটি নীরদবাবুকে শুনাইলে তিনি বলিতেন ইহা এক গ্রাম্য বাঙালীর কথা। এই গ্রন্থে স্বদেশের নিন্দার দুইটি দৃষ্টান্ত দিয়া অন্য গ্রন্থের কথা বলিব। (১) The permanent face of India and the permanent face of England are different, the wear different looks. Time has made the face of my country stark and sad and it remains so in spite of the lipstick that is being put on it by hands of the spiritual half-castes The face of England remains smiling (পৃঃ ১৫) আমি ইংলণ্ডের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম। ইংরাজের মুখে হাসি আমি বড দেখি নাই। কলিকাতায় ভিখারীর মুখেও হাসি দেখিয়াছি, দেখিয়া কাঁদিয়াছি। (২) we deny ourselves every comfort contemptuously rejecting the western notion of inproving the standard of living in order to lay by and leave a fortune at death, so that we may poor in future births. (পৃঃ ২০)।

আমি বাঙালীকে দাদার কন্যার বিবাহের জন্য নিঃস্ব হইতে দেখিয়াছি। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে নীরদবাবু এমন অদ্ভূত কথা লিখিলেন কেন। ইহার উত্তর আমি নীরদ বাবুর ভাষাতেই দিতে পারি। এই গ্রন্থের প্রস্তাবনায় তিনি লিখিয়াছেন 'I apologize for its dogmatic and doctrinaire tone' (পৃঃ ১৫)।

নীরদবাবুর তৃতীয় গ্রন্থ 'The Continent of Circe (১৯৬৫) সম্বন্ধে কিছু বলবার পূর্বে একটি কথা বলিতে চাহিতেছি। নীরদবাবু একটি প্রবন্ধে দুই রবীন্দ্রনাথের কথা লিখিয়াছেন। আমরা এক রবীন্দ্রনাথের কথাই জানি এবং তাঁহার অখণ্ড ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে বহু মনীষী আলোচনা করিয়াছেন। আমি বলিতে চাহিতেছি দুই নীরদচন্দ্রের কথা। The Autobiography of an Unknown Indian লিখিবার পূর্বে এক নীরদচন্দ্র আর ঐ গ্রন্থ বাহির হইবার পরে আর এক নীরদচন্দ্র। The Autobiography of an Unkdown Indian গ্রন্থখানি Macmillan ছাপাইয়াছিলেন। বিদেশের পত্র পত্রিকা এই গ্রন্থের প্রশংসায় মুখর হইলেন। দেশেও unknown

Indian এক বহুশ্রুত লেখক হইযা উঠিলেন। ইংবাজী গীতাঞ্জলিও Macmillan ছাপাইযাছিলেন এবং সেই গ্রন্হেবও review গুলি ববীন্দ্রনাথকে এক শ্রেষ্ঠ কবি বলিযা উপস্থিত কবিযাছিল। তাঁহাব A Passage to England গ্রন্থখানিও বিদেশে ছাপা হয। গীতাঞ্জলীব পবে ববীন্দ্রনাথেব অনেক ইংরাজী বইMacmillan-ই প্রকাশ কবেন। আমাব মনে হয নীবদচন্দ্র ভাবিলেন যে তিনিও ববীন্দ্রনাথেব মতই এক প্রতিভাবান লেখক। পাঠক বলিবেন ইহা আমাব অনুমান মাত্র। কিন্তু আমি আমাব মন্তব্যের পক্ষে একটি প্রমাণ উপস্থিত কবিতে পাবি। The Coninent of Circe গ্রন্হেব জন্য নীবদচন্দ্র Duff Cooper পুবস্কার পাইযাছিলেন। বিদেশে প্রকাশিত এই তৃতীয গ্রন্হেব জন্য নীবদবাবু ইংলণ্ডে যে পুবস্কাব লাভ কবিলেন তাহাকে তিনি Nobel Prize বলিয়াই ধবিযাছিলেন। ইহাব প্রমাণ দিতেছি নীবদচন্দ্র আনন্দ পুবস্কার লাভ কবিযাছিলেন। গ্র্যাণ্ড হোটেলে যে সভায তাঁহাকে এই পুবস্কাব প্রদান করা হইযাছিল সেই সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। নীরদবাবু এই পুবস্কাব গ্রহণ কবিবাব জন্য কলিকাতায় আসিতে পাবেন নাই। তাঁহাব বক্তৃতাব টেপ এই সভায বাজাইযা শোনান হইযাছিল। এই বক্তৃতাব একটি উক্তি আমাব কানে এখনও বাজিতেছে। উক্তিটি এই "ববীন্দ্রনাথ প্রাচ্যে বসিযা প্রতীচ্যেব পুবস্কাব লাভ করিযাছিলেন আমি প্রতীচ্যের পুবস্কাব প্রাচ্যে বসিযা পাইলাম।' একথাটি বলিযা তিনি অবশ্য বলিলেন না যে তাঁহার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথেব তুলনা হয় না। এই অদ্ভুত উক্তিটিকে ছেলে মানুষী বলিযা উপেক্ষা কবিতে পারি না। ইহাব কারণ এই যে ক্রমে নীবদ বাবু একজন মহর্ষি হইযা উঠিলেন এবং বিচিত্র ঋষিবাক্য উচ্চাবণ করিতে আবম্ভ কবিলেন। The Autobiography of an Unknown Indian গ্রন্হ প্রকাশেব পূর্বে তাঁহাব এই ঋষিভাব ছিল না।

এখন The Continant of Circe গ্রন্হখানি সম্বন্ধে কিছু বলিতে পাবি। এই গ্রন্হেব subtitle An Essay on the Peoples of India। লক্ষ্য কবিতে পাবি নীবদ বাবু people of India না বলিয়া Peoples of India বলিলেন। আমাদেব ইংরেজ শাসকবাও people of India না বলিযা Peoples of India বলিতেন। বইখানিব নামটিও কিন্তু বড অস্বস্তিকব। ভাবতবর্ষকে নীরদবাবু Continent of Circe বলিয়া অভিহিত করিলেন। Circe গ্রীক পুবাণেব এক মাযাবী। তিনি একটি দ্বীপে বাস কবিতেন। ইউলিসিস যখন তাঁহাব সাঙ্গপাঙ্গ লইযা এই দ্বীপে উপস্থিত হইলেন তখন Circe সকলকে তাঁহাব যাদুবিদ্যার দ্বাবা শূকরে রূপান্তরিত কবিলেন। ইউলিসিস অবশ্য Maly নামক একটি ভেষজেব দ্বাবা সকলকে রক্ষা করিলেন। তাই বলিতেছিলাম ভাবতবর্ষকে Continent of Circe নাম দিয়া গ্রন্হকার

ভারতবাসীর প্রতি ঘোব অবিচার করিযাছেন। এমন কথা আমাদের ইংবেজ প্রভুবাও কখনও বলেননি। ইংল্যাণ্ডে এই গ্রন্থখানির জন্য নীরদবাবু পুরস্কৃত হইযাছেন। ইহাব কাবণ এই যে এই গ্রন্থের বক্তব্য ইংল্যাণ্ডকে খুশী কবিযাছে। যে সাম্রাজ্য ইংবাজ ছাডিযা আসিয়াছে সে সাম্রাজ্য এক অভিশপ্ত দেশ। গ্রন্থেব প্রথম পবিচ্ছেদেই নীবদবাবু লিখিলেন ঃ 'As to the word Indian it is only a geographical definition, and a very loose one at that (পৃঃ ২৭)। ইহার পর লিখিলেন ঃ We Hindus are not Hindus because we have a religion called or understood as Hinduism ; our religion has been given the very imprecise label of Hinduism because it is the jumble of the creeds and rituals of a people known as Hindus after their country' (পৃঃ ২৯) এ বকম উক্তি অনেক ইংবাজ পাদ্রী অবশ্যই কবিযাছেন, এবং আমাদের ইংবাজ শাসকদেব মধ্যে অনেকেই এরূপ ভাবিতেন। ইহার পর নীরদবাবু লিখিলেন ঃ I do not consider that all the citizens of this state belong to one nation (পৃঃ ৩০) অর্থাৎ আমাদেব সংবিধানে আমবা ভারতবর্ষকে যে একটি অখণ্ড রাষ্ট্র বলিযা চিহ্নিত কবিযাছি তাহা নীরদবাবু মানিলেন না। নানা জাতি, নানা ভাষা লইয়া যে এক অখণ্ড ভারতবর্ষের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নীরদবাবু স্বীকাব করিলেন না। যে কথা বলিযা ইংবাজ আমাদেব শাসন কবিতেন, সেই কথাই আমাদেব স্বাধীনতাব পব নীরদবাবু ইংবাজকে শুনাইলেন।

নীবদবাবু এই গ্রন্থে ভাবতবর্ষকে একটি Hindu military dictatorship হিসাবে উপস্থিত কবিযাছেন। তিনি লিখিয়াছেন ঃ Hindu militarism is a genuine and powerful force influencing Indian foreign policy. (পৃঃ ১১৬)। ইহার পরের পৃষ্টায নীরদবাবু Hindu's insatiable militarisn-ব কথা লিখিযাছেন। শিক্ষিত ভারতীয হিন্দুদেব তিনি dominant minority হিসাবে উপস্থিত করিলেন। এই minority সম্বন্ধে তিনি বলিলেন ঃ 'It is constituted by the Hindus of the Anglicized upper middle class and is thus an offshoot or rather variety of the Hindu specis (পৃঃ ৩৩৮)। এই সকল কথা যে ইংবাজেব কানে মধুবর্ষন কবিবে তাহা স্বাভাবিক। আসলে The Continent of Circe গ্রন্থখানি The Autobiography of an Unknown Indian 'গ্রন্থেব উপসংহাব। এই দুইখানি গ্রন্থ লিখিযাই নীরদবাবু ইংরাজ আলালের ঘরেব দুলাল হইযা উঠিলেন।

নীরদ বাবুর চতুর্থ গ্রন্থ ' The Intellectual in India ১৯৬৭ সালে

প্রকাশিত হয়। আশী পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানি ইংলণ্ডে ছাপা হইল না। অবশ্য ইংলণ্ডের কোন প্রকাশককে নীরদ বাবু এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পাঠাইয়াছিলেন কিনা জানি না। দিল্লির Associated Publishing House এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিলেন। The Autobiography of an Unknown Indian গ্রন্থে নীরদবাবু হিন্দু মুসলমান বিদ্বেষের কথা লিখিয়াছেন। এই গ্রন্থে তিনি সেই কথা আবার বলিলেন ঃ

'The westernized Hindus of India did not take any notice of the intellectual movement among the Indian Muslims until the political implication of the latter became clear to them. Then they became extremely hostile to the Muslim ideology without however trying very seriously to understand or appraise it. (পৃঃ ৭)। বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের এই বিরোধের কথা আমি জানি না। এই বইখানিতে আমি কোন নূতন তথ্য, নূতন বিচার এবং নতুন সিদ্ধান্তের আভাস মাত্র পাই নাই। তবে গান্ধী বিরোধিতা এই গ্রন্থেও উপস্থিত। নীরদবাবু লিখিয়াছেন 'The Gandhian phase of the nationalist movement lowered the intellectual life of the country ঃ (পৃঃ ৫২)। নীরদবাবু আরও লিখিলেন যে গান্ধীবাদে historical conciousness এর এর কোন স্থান ছিল না। জওহরলাল নেহেরু গান্ধীর অনুগামী ছিলেন। তাঁহার Autobiography, Glimpses of World History এবং Discovery of India গ্রন্থে নীরদবাবু historical conciousness এর অভাব দেখিয়াছেন কিনা বুঝিলাম না। এই বইখানিতে তিনি ভারতীয় পত্রিকা সম্পাদকদের সম্বন্ধে যে মন্তব্য করিয়াছেন তা অবশ্যই আপত্তিকর। তিনি লিখিয়াছেন ঃ Most Indian editors are as monumental as temple idols, and their monumentality is accentuated by the high salaries they are getting in these days. Thus their writings tend to be solemn to the point of being vulgar, (পৃঃ ৬৫)। ইংরাজী ও বাংলা সংবাদপত্রের কয়েকজন সম্পাদকের সঙ্গে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। সেই অভিজ্ঞতা উপর নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে নীরদবাবুর এই মন্তব্য অর্থহীন। বাঙ্গালীর 'নিশ্বাস ঈর্ষা' সম্বন্ধে নীরদবাবুর মন্তব্যেরও কোন অর্থ খুঁজিয়া পাই না। গ্রন্থখানি মূলত ঃ হিতোপদেশ এবং এই উপদেশ দিতে যাইয়া নীরদ বাবু নিজের কথা বলিবার অবকাশ পাইয়াছেন। নীরদ বাবুর শেষ কথা ঃ To be acceptable to western publishers an

Indians must write English not only with competence but with distinction. The competition with the natural writers of English is so severe that British and American publishers will not submit to the impact of any English from an Indian writer which is not quite out of the ordinary (পৃঃ ৮০)। ইহা প্রকারান্তরে নীরদবাবুর স্বলিখিত গ্রন্থের প্রশংসা।

ইহার পর To Live or not to Live ১৯৭ পৃঃ গ্রন্থখানি ১৯৭০ সালে দিল্লীতে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থখানির আলোচনা করিয়া পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইতে চাহি না। ইহা ভারতীয় জীবনের নানা অসঙ্গতি, অসম্পূর্ণতার এক নীরদবাবু সুলভ বর্ণনা। কিন্তু এই বছরটি নীরদবাবুর জীবনের এক স্মরণীয় বছর। এই বৎসরই তাঁহার জীবনের মধ্যলীলা শেষ। আদ্যলীলা কলিকাতায়। মধ্যলীলা দিল্লীতে। ১৯৭০ সালে লীলাস্থানের পরিবর্তন ঘটিল। নীরদবাবু ইংলন্ডবাসী হইলেন। ম্যাক্সমুলারের জীবনী লিখিবার জন্য তিনি ইংলন্ডে গমন করিলেন। ১৯০০ সালের ২৮ অক্টোবর Max Muller এর মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী Georgiana লিখিত The Life and Letters of the Rt. Hon. Friedrich Max Muller গ্রন্থখানি দুই খণ্ডে ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়। Max Muller সম্বন্ধে অনেক কাগজ-পত্র অক্সফোর্ডে Bodleian Library-তে ২৭ খণ্ডে রক্ষিত জানিয়া Oxford University Press Max Muller-এর একখানি নূতন জীবনী প্রকাশ করার কথা ভাবিলেন। এই কাগজপত্রের, বহুলাংশই Georgiana ব্যবহার করিতে পারেন নাই। Oxford University Press এই নূতন জীবনী রচনার ভার নীরদবাবুকে দিলেন। এই সময় হইতেই নীরদবাবু অক্সফোর্ডে বাস করিতেছেন। এখন প্রশ্ন হইল যে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং হিন্দু দর্শনের এক বিশিষ্ট প্রবক্তা Max Muller-এর জীবনী লিখিবার জন্য Oxford University Press—যোগ্যতম লোক বাছিয়া লইয়াছেন কিনা। নীরদবাবু ইংরাজি ভাষার বৃহস্পতি। কিন্তু ভারতাত্মা সম্বন্ধে তাঁহার কোন সম্পর্ক আছে কিনা তাহাই এখানে বড় প্রশ্ন। আসলে ভারতাত্মা বলিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্বই তিনি স্বীকার করিতেন না। ১৯৭০ সালে এই কাজ আরম্ভ করিবার মাত্র পাঁচ বৎসর পূর্বে নীরদবাবু তাঁহার The Continent of Circe গ্রন্থের শেষে লিখিলেন 'I have rescued my European soul from circe (১৭৬পৃঃ)। যে ভারতবর্ষকে নীরদবাবু Continent of Circe বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছেন সেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে Max Muller তাঁহার India : What can it Teach us (১৮৮২) গ্রন্থে বলিয়াছেন যে সমগ্র প্রতীচ্যকে এখন নূতন আদর্শের জন্য ভারতের

দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে Max Muller-এর এই স্মরণীয় উক্তিটি অবশ্য নীরদবাবু উধৃত্ত করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে Max Muller-এর যে উৎসাহ ও আগ্রহ তাহার ভগ্নাংশও নীরদবাবুর নাই, তিনি বরং লিখিতেছেন যে যদি Max Muller স্বচক্ষে ভারতবর্ষ দেখিতেন তাহা হইলে তিনি অন্য কথা বলিতেন। অন্ততঃ পক্ষে অনেক ইংরেজ যে Max Muller-এর ভারতপ্রীতি সম্বন্ধে এই কথাটি বলিতেন তাহা তিনি বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। The fact that he had no first hand experience of India was often thrown in his teeth by the Englishmen there who did not like his advocay of Indians and his enthusiastic evocations of ancient Hindu civilization. The charitable among them regarded him as too idealistic and the malicious gloated over his disenchantment if he were ever to visit the country (পৃঃ ২৮৭)। পাঠক তুমি যদি The Continent of Circe গ্রন্থখানি পড়িবার পর নীরদবাবুর Scholar Extraordinary The Life of Professor the Rt. Hon Friedrich Max Muller P.C. (১৯৭৪) বইখানি পড় তাহা হইলে তুমি অবশ্যই ভাবিবে যে নীরদবাবু এই ভারতবিদ্বেষী ইংরাজদের মত Max Muller কে ভারতের অন্ধভক্ত বলিয়া মনে করিতেন। নীরদ বাবুর এই বইখানি সম্বন্ধে তাঁহার শেষ কথা এই যে Max Muller ছিলেন একজন pioneer and explorer, তিনি যে আধুনিক জগতে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের এক শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাকার সে কথা নীরদবাবু আমাদের বুঝাইয়া বলিলেন না। বিবেকানন্দ যে Max Muller কে 'a vedantist of vedantists বলিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিলেন না। রামকৃষ্ণের নাম এই গ্রন্থে মাত্র একবার করা হইয়াছে। Max Muller যে ইংলণ্ডের পত্রিকা The Nineteenth Century-তে ১৮৯৬ সালে রামকৃষ্ণ সম্বন্ধে A Real Mahatma নাম দিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিয়া ছিলেন তাহার উল্লেখ পর্যন্ত এই গ্রন্থে নাই। Max Muller-এর Ramkrishna : His Life and sayings গ্রন্থখানি সম্বন্ধে শুধু বলিয়াছেন he wrote book on him (পৃঃ ৬২৮) এই গ্রন্থের প্রায় শত পৃষ্ঠার ভূমিকাটি যে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও ধর্ম সম্বন্ধে একটি মূল্যবান আলোচনা তাহা, নীরদবাবু বলিলেন না। এই গ্রন্থে যে রামকৃষ্ণের ৩৯৪টি উক্তি সন্নিবিষ্ট সে সম্বন্ধে নীরদবাবু নীরব। ইহার কারণ অবশ্য অনুমান করিতে পারি, এই গ্রন্থেই তিনি 'personality cult of both Vivekananda and Ramkrishna সম্বন্ধে লিখিয়াছেন (পৃঃ ৬২৬)। এই গ্রন্থের

২৬৩ পৃষ্ঠায নীরদবাবু বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লিখিযাছেন যে তিনি হইলেন leader of the new Hindu revivalist movement of Bengal (পৃঃ ২৬৩)। ভারতেব আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে এক ঘোব অশ্রদ্ধা লইযা এই Max Muller এব জীবনী লিখিত হইযাছে, একজন ইংবাজ পাদ্রীও কি এই ভাবে Max Nuller জীবনী লিখিবে ? আমি এই বই খানি পডিয়া পীডিত বোধ করিয়াছি। ববং আমি জার্মান পণ্ডিত J. H. Voigt-এর Max Muller ঃ The Man and His Ideas (১৯৬৭) বইখানি পরিয়া Max Muller-এর হৃদযের সংবাদ পাইযাছি। এই প্রসঙ্গে একটি ব্যক্তিগত কথা বলিযা রাখি।

এই বইখানি বাহিব হইলে Oxford University Press আমাকে ইহা আনুষ্ঠানিক ভাবে বিলিজ কবিতে বলেন। আমি বলিলাম এই কাজেব আমি অযোগ্য কাবণ, আমি নীবদবাবুব ভক্ত নহি। তখন ঠিক হইল সভায আমি Max Muller সম্বন্ধে বলিব এবং খুশবন্ত সিং নীরদবাবু এবং এই বই সম্বন্ধে বলিবেন। আমি বইখানি বিলিজ কবিযাছি শুনিলে নীবদ বাবু অবশ্যই খুব বিরক্ত হইবেন।

এখন নীবদবাবুর ইংবাজি গ্রন্থেব কথা কিছু বলিতে পাবি। এই বইখানিব নাম Clive of India লণ্ডনেব Barrie and Jenkins প্রকাশিত ৪৪৬ পৃষ্ঠাব এই জীবনীগ্রন্থ নীবদবাবু কেন লিখিলেন বুঝিলাম না। ইহাতে কোন নূতন তথ্য নাই, কোন নূতন বিশ্লেষণ নাই। নীবদবাবু নিজেই এই গ্রন্থেব ভূমিকায বলিযাছেন—'This book is not a work of fresh reseach'। তবে এই গ্রন্থেব মূল্য কোথায। নীবদবাবু বলিলেন—'it offers a reinterpretation of the personality and achievement of Clive বই খানি পডিযা আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম ইহা নীবদ বাবু কেন লিখিলেন। এই গ্রন্থেব বাবো পাতার ভূমিকায নীবদবাবু অবশ্য এই প্রশ্নেব উত্তর দিযাছেন। কিন্তু সেই উত্তব বড স্পষ্ট হয় নাই। এই ভূমিকার প্রধান বক্তব্য এই যে ভাবতে ইংরাজ শাসনেব ইতিহাস এবং উক্ত সাম্রাজ্যেব দুই প্রতিষ্ঠাতার জীবনকথা আজিও সহজ ভাবে উপস্থিত কবা হয নাই। ইহাব প্রধান কাবণ হইল এই যে ভাবত সাম্রাজ্য যে ইংবাজের এক মহাসৃষ্টি তাহা ইংবাজ বুঝিলনা। ইংরাজ ঐতিহাসিকদের ক্লাইভ নিন্দাও নীবদ বাবুকে দুঃখ দিযাছে।

কিন্তু ক্লাইভেব জীবনী লিখিবার আসল কারণটি বুঝিতে হইলে নীবদবাবুর ইংরাজি বাংলা সব গ্রন্থ পডিতে হইবে। যাঁহাবা নীবদবাবুব সকলকে কথা শুনিয়াছেন, অর্থাৎ যাহারা তাঁব সমগ্র বচনা পড়িযাছেন তাঁহাব দেখিযাছেন যে নীরদবাবুর চিন্তায সাম্রাজ্য ছাড়া প্রকৃত সভ্যতা অসম্ভব।

তিনি তাঁহার প্রথম গ্রন্থখানি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়াছেন। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্য কোথায়। ভারতে ইংরাজ নাই ইহা ভারতের দুর্ভাগ্য। এই গ্রন্থ যখন বাহির হইল তখন ভারতে নীরদবাবুও নাই। এখন নীরদ বাবু ইংলণ্ডবাসী হইয়া বুঝিলেন, The Coutinent of Cricc লিখিয়া তিনি তাঁহার Europcan soul এর কথা বুঝাইয়াছেন Ulysis এর মত তিনি সেই European soul কে রক্ষা করিয়াছেন। ক্লাইভের জীবনী লিখিয়া নীরদ বাবু তাঁহার British soul এর প্রমাণ দিলেন। তিনি বলিতে চাহিলেন যে যাহারা Sir John Malcolm এর Life of Robert Lord Clive (১৮৩৬) তিন খণ্ড, মেকলের Essay on Clive (১৮৪০), G. R Gleig এর Lifc of Robert First Lord Clive (১৮৪৮) G. B Malleson এর Lord Clive (১৯০৭) Sir George Forest-এর Life Lord Clive, দুই খণ্ড (১৯১৮) R. J Minney Clive (১৯৩১) A Davies এর Clive of Plassey পড়িয়াছেন তাঁহারা Clive-এর চরিত্রের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারে নাই, ক্লাইভকে জানিতে হইলে নীরদবাবুর Clive of India পড়িতে হইবে। গ্রন্থখানির নাম হইতেই বুঝা যাইবে ক্লাইভ ভারতের, ইংলণ্ডের নায। ক্লাইভের জীবন কথা ভারতীয় সামগ্রী। ক্লাইভের জীবন কথা যে সব ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিযাছেন তাঁহাদের মনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে একটি অস্বস্তি ছিল। এই সাম্রাজ্যের অবলুপ্তির জন্য দুঃখিত নীরদ বাবু সজল নয়নে ক্লাইভের জীবন কথা লিখিযাছেন। ক্লাইভ সম্বন্ধে নীরদ বাবুর মোদ্দা কথা এই যে 'no accusasion of king any of high highhandidness or Indian princ or horable can be brought cruelty to any against him. He teacted all of than with respect even when he privately knaw then to be villains or idiots (পৃঃ ৪২৫) House of Commons-এর বিচারে ক্লাইভ নির্দোষ প্রমাণিত হইযাছিলেন নীরদবাবু বিচারে ক্লাইভ এক মহৎ ঐতিহাসিক পুরুষ। নীরদবাবু যদি কবি হইতেন তাহা হইলে তিনি বোধহয় এক নূতন পলাশীযুদ্ধ কাব্য লিখিতেন। সেই মহাকাব্যে নীরদবাবুর মোহনলাল ক্লাইভের জয়গান করিতেন।

১৯৭৫ সালে ক্লাইভের জীবনী প্রকাশিত হইবার পর ১৯৭৬ সালে নীরদ বাবুর একখানি গ্রন্থ মুম্বাইতে বাহির হয। এই গ্রন্থের নাম Culture in the Vanity Bag। এই গ্রন্থের নামে যে লঘুতা ইহার বিষয়েও তেমন লঘুতা। ইহার আলোচনা না করিয়া ১৯৭৯ সালে বিলাতে প্রকাশিত তাঁর Hindusim নামে গ্রন্থখানির আলোচনা করিব। এই বইখানি আমি যত্ন করিয়া পড়িয়াছি। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে লিখিত একখানি গ্রন্থ হিসাবে আমি

ইহাকে মারাত্মক বলিয়া মনে করি। হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে এই গ্রন্থে একটি কথাও নাই। নীরদবাবু ইহা জানিতেন। এই গ্রন্থের শেষের দিকে তিনি লিখিয়াছেন: I am bound to the account of leaving out the most important part of the religion (পৃঃ ৩১১) এবং তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন তিনি হিন্দুর আধ্যাতিকতার কথা বলেন নাই, কারণ পাশ্চাত্যের লেখকগণ এই আধ্যাত্মিকতাকেই হিন্দু ধর্মের সার বলিয়া জানিয়াছেন। নীরদবাবু মৌলিক হবার ইচ্ছায় হিন্দু ধর্মের এক ভ্রমাত্মক বিবরণ উপস্থিত করিয়াছেন। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দু ধর্ম যে এক বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যদিয়া এক অখণ্ড ধর্ম চেতনায় পরিণতি লাভ করিয়াছে সে কথা এই গ্রন্থে নাই। বেদ, উপনিষদ গীতা, ভাগবত পুরাণ, মধ্য যুগের সন্তকবিদের গান, এবং শেষে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ধর্মদর্শন, হিন্দুধর্মের এই ইতিহাস নীরদবাবু লেখেন নাই। বিংশ শতাব্দীতে হিন্দু ধর্মের কথা বলিতে যাইয়া নীরদ বাবু শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দের নাম পর্যন্ত উল্লেখ করিলেন না। হিন্দুধর্মের ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য দেখাইবার জন্য তিনি সাধারণ বুদ্ধি বর্জন করিয়াছেন। Chaitanya সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন: At first his love for Krishna resembles the fervidness of a young girl who had fallen in love with a man, but though erotically excited, had not been united with him. Then it sought even greater intensity in a vicarious experience of fornication, that is, in the pleasure found by an unmarried girl in premarital sexual intercourse with her lover (পৃঃ ২৮৬), চৈতন্য এবং বৈষ্ণব ধর্মের এখন বিকৃত ব্যাখ্যা এক মাত্র কিছু বিদেশী পাদ্রীর লেখাতেই পড়িয়াছি। বইখানি পড়িয়া মনে হইয়াছে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নীরদ বাবুর কোন উপলব্ধি নাই, বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানও বড় আছে বলিয়া মনে হয় না। নীরদ বাবুর আত্মঘাতী বাঙালী সম্বন্ধে আলোচনায় এই প্রসঙ্গ পড়িলাম ইহা বুঝাইবার জন্য যে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে যেমন তাঁহার কোন উপলব্ধি নাই, বাঙালীর ইতিহাস এবং জীবন সম্বন্ধেও তাঁহার কোন উপলব্ধি নাই। ইহার একটি কারণ হইতে পারে এই যে নীরদ বাবু হিন্দুও নহেন বাঙালীও নহেন।

বিলাতে প্রকাশিত নীরদবাবুর ৯৭৯ পৃষ্ঠার শেষ গ্রন্থ Thy Hand Great Anarch (১৯৮৭), the Autobiography of an Unknown Indian গ্রন্থে পত্র সংখ্যা ৬১০। সাকুল্যে এই ১৫৬৯ পৃষ্ঠার আত্মজীবনীতে এই দীর্ঘ মহাজীবন কথা ১৯৫২ পর্যন্ত আসিয়াছে। এই হিসাবে বাকী ৪৮ বছরের কাহিনী ২০০০ পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ করা যাইবেনা। এই আকারের

আত্মজীবনী বা জীবনী গ্রন্থ কোন ভাষায় লিখিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। Bertrand Russell এর আত্মজীবনীর পত্র সংখ্যা ৭৫০। এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয়। ইহার পর রাসেল আরও দুই বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন। রাসেলের এই আত্মজীবনী পড়িয়া রাসেলকে চিনিয়াছি। নীরদবাবুর আত্মজীবনীর ১৫৬৯ পৃষ্ঠা পড়িয়া নীরদ বাবুকে চিনিতে পারি নাই। Thy Hand Great Anarch গ্রন্থ আলোচনা করিয়া পাঠকের বিরক্তিভাজন হইতে চাহিনা। কেবল আত্মঘাতী বাঙালী এবং আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই গ্রন্থে নীরদ বাবু কি বলিলেন তাহাই পাঠককে শুনাইব। কাজি নজরুল সম্বন্ধে নীরদবাবু লিখিলেন 'he seemd very superficial, indisciplined and frothy, নজরুল সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধু বুদ্ধদেব বসু একদিন মৃদু হাসিয়া আমাকে বলিয়া ছিলেন যে কাজী ত সুরে বাঁধা গোলমাল। কথাটির মধ্যে বোধহয় একটু সত্য আছে। কিন্তু নীরদবাবু নজরুলকে একেবারেই তুচ্ছ করিলেন।

তৃতীয় দশকের বঙ্গদেশে তিনি দেখিলেন 'total decadence of modern Bengali life and culture (পৃঃ ১৫৭)। আমি এক ক্ষুদ্র অখ্যাত বঙ্গ সন্তান। আমার মনে হইয়াছে এই তৃতীয় দশকে বাঙালী এক নূতন সাহিত্যের সৃষ্টি করিল। তিনি আর বলিলেন যে এই সময়ে যে বাঙালী ২৫ বছর পার হইয়াছেন তিনি 'became increasingly dead to idea and emotions, and wholly incapable of any innovation. (পৃঃ ১৫৭) এই সময়ে জীবনানন্দ পঁচিশ পার হইয়াছেন) এবং তৃতীয় দশকের কোন একটি বৎসরে সুভাষ ২৫ বছরের উর্দ্ধে। ইহার পর নীরদ বাবু বলিলেন ঃ I felt in the twenties that the young were beginning to transform their own function from creation to destruction (পৃঃ ১৪৮)। এই destruction এর সূত্র ধরিয়াই নীরদবাবু তাঁহার আত্মঘাতী বাঙালী ও আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে আসিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে নীরদবাবুর আলোচনা এই গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডের পঞ্চম অধ্যায় করা হইয়াছে। এই অধ্যায়ের শিরোনাম Tagore : The Lost Great Man of India রবীন্দ্রনাথের এখন আর প্রতীচ্যে কোন উপস্থিতি নাই। নীরদবাবুর পশ্চিমে যে উপস্থিতি তাহা রবীন্দ্রনাথের যে নাই সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। এই দেশেও রবীন্দ্রনাথ আর কতকাল টিকিবেন সে প্রসঙ্গ নীরদবাবু তুলিয়াছেন thinking over of his literary achievemet one might say that great as it is, it too will not assure him the immortality he deserves.

(পৃঃ ৫২৫)। নীরদবাবু রবীন্দ্রনাথকে লইয়া এক বিষম পাকে পড়িলেন, বিদেশে রবীন্দ্রনাথ প্রায় বিস্মৃত কিন্তু স্বদেশেই বা তাঁহার ভবিষ্যৎ কি ?

লেখক হিসাবে সাহিত্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ কত নম্বর পাইতে পারেন ইহাই নীরদবাবুর চিন্তা। তবে এখন যে বঙ্গদেশে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠা তাহার মূল্য বড় নাই। কারণ রবীন্দ্রনাথকে বুঝিবে কে ? 'to reestablish him even in Bengal one would need a level of historical and lingustic scholarship which is not likely to be found in the Bengalis, of course he is still worshipped by them, but only as a fetish. He has become nothing more than the holy mascot of provincial vanities (পৃঃ ৫৯৬) কথাটি বড় যুৎসই হইল। একটি ঢিলে বাঙালী এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই মরিল। আর রবীন্দ্রনাথ কাহাদের কবি, বাঙালী হিন্দুদেরই কবি। এই বাঙালী হিন্দুকারা তাহাদের নীরদবাবু সনাক্ত করিয়াছেন ঃ the popular Hindu conservatives of the majority of educated Bengalis were a mixture of crude and often superstitious religious beliefs and cultural obscurantism (পৃঃ ৬০৯)। সর্বশেষে নীরদবাবু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বলিলেন ঃ 'his work will be like a buried city of the past (পৃঃ ৬০৬) তবে এখানে আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথকে উপস্থিত করা হয় নাই। নীরদবাবু কখন কী বলিবেন তাহা অনুমান করা শক্ত। আপন কথা বলিতে তাহাকে বিশ্বের কথা বলিতে হয়। বিশ্বের কথায় মধ্যে আপন কথা আসিয়া যায়। মনে হয় তিনি কথার বৃহস্পতি, তাঁহার পক্ষে চিন্তার সঙ্গতি রক্ষা করা অসম্ভব। নীরদবাবুর বাগ্‌বৈদগ্ধ স্বীকার করি। তিনি বাকসিদ্ধ এমন কথা বলিতে পারি না। বরং তাঁহার বাকপটুতার মধ্যে বাক সংযমের অভাব লক্ষ্য করিয়াছি।

এখন আমাদের মূল বিষয় আত্মঘাতী বাঙালী এবং আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ করিতে পারি ? কিন্তু মুস্কিল এই নীরদবাবু এই দুই বিষয়ে ঠিক কি বলিতে চাহেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। নীরদবাবুর রচনায় একটি কথার হাত ধরিয়া বহু কথা নাচিতে থাকে। ইহার মধ্যে কোনটি যে আসল কথা তাহা ধরিতে পারি না। তার যে কোন কথাই বিদ্যার রসে এমন আপ্লুত থাকে যে তাহাকে ঠিক স্পর্শ করা যায় না। পিছলাইয়া যায়। শব্দগুলি অবশ্যই কর্ণগোচর হয়। কিন্তু তাহার পর যেন বিদ্যার বাতাসে উড়িয়া যায়। রামেন্দ্রসুন্দর বিদ্বান, চিন্তাশীল। তাঁহার কথা বুঝি। অন্যকেও বুঝাইতে পারি। কিন্তু নীরদবাবুর কথা বুঝি না, অন্যকেও

বুঝাইতে পারি। ইংরাজি ব্যাণ্ডের বাদ্য আকৃষ্ট করে। কিন্তু সেই বাদ্যের অর্থ নিজেও বুঝি না, অপরকেও বুঝাইতে পারি না। বাঙালীকে যে কেন, কি অবস্থায় আত্মঘাতী হইল তাহা বুঝিলাম না, তবে কখন আত্মঘাতী হইল ১৯১৭—১৮ সাল। এই আত্মঘাতী ত্রিপিটকের প্রথম পিটকে নীরদবাবু লিখিলেন 'বাঙ্গালীর জাতীয় আত্মহত্যা অকাল মৃত্যু (পৃঃ ১৩)। বাঙালীর সংস্কৃতি সম্বন্ধে নীরদবাবুর বক্তব্য এই যে, সে সংস্কৃতির জন্ম ইংরাজ আমলে। বাঙালী যদি ১৯১৮ সালে আত্মহত্যা করিয়া থাকে তাহা হইলে বলিতে হইবে বাঙালী কমপক্ষে শতায়ু হইয়াছে। তবে রবীন্দ্রনাথের আত্মঘাতী হবার তারিখটি নীরদবাবু মাঝে উল্লেখ করিয়াছেন। এটি দ্বিতীয় ত্রিপিটকের যে শেষ তিনটি বাক্যে তিনি বলিয়াছেনঃ রবীন্দ্রনাথ কলিকাতা পৌঁছাইলেন ১৯১৩ সনের ২৯শে সেপ্টেম্বর। সকাল আটটায় বোম্বে মেল হাওড়ায় পৌঁছিল। তখন হইতেই রবীন্দ্রনাথের আত্মঘাতী রূপ দেখা দিল ও উহার সহিত তাঁহার আত্ম-সমাহিত মনের বিরোধ চলিল।। তবে ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯১৩ তারিখটি রবীন্দ্রনাথের আত্মহত্যার তারিখ নহে। ঐদিন কবি আত্মঘাতী হইতে আরম্ভ করিলেন। আত্মঘাতী হইতে কবির বহুবৎসর লাগিল।

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে দুটি কথা বোধহয় বুঝিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার, সব হুজুগ। আর বলিয়াছেন 'রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বর প্রেম যে আসলে খ্রীষ্টধর্ম-সম্ভূত ও পাশ্চাত্ত তাহা আমি দেখিয়াছি। প্রথম কথাটি নীরদবাবুর নিজের কথা, দ্বিতীয় কথাটি ইংরাজ পাদ্রীদের কথা, ইংরাজ পাদ্রী পাশ্চাত্যের মানুষ বলিয়া নীরদবাবু তাহার কথা শুনিয়াছেন। গীতাঞ্জলির ধর্ম চেতনা সম্বন্ধে আমার অধ্যাপক ডাঃ আরকার্ট এই পাদ্রীসুলভ কথাই বলিয়াছেন ? ১৯১৮ সালে ম্যাক-মিলান দ্বারা প্রকাশিত রাধাকৃষ্ণাণের The Philosophy of Rabindranath Tagore গ্রন্থের এই উক্তির খণ্ডন সর্বজন গ্রাহ্য হইয়াছে। নীরদবাবু এই গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেন নাই।

রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রেম কেবল বিদেশী সামগ্রী নহে, বাঙালীর প্রেম বিদেশাগত। 'বাঙালী জীবনে রমণী' গ্রন্থে নীরদবাবু লিখিয়াছেন যে প্রেম কি বস্তু বাঙ্গালী তাহা ইংরাজের কাছে শিখিয়াছে। পাঠক চাহিয়া দেখ ঐ ক্লাইভের অশ্বের পিছনে প্রেমলক্ষ্মী বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতেছেন এবং বাঙালীর হৃদয়ে সার্থক প্রেমের সঞ্চার করিয়া দিতেছেন। কিন্তু সেই প্রেমও বাঙালীকে রক্ষা করিতে পারিল না। বাঙালী আত্মঘাতী হইল।

এখন জিজ্ঞাসা করিতে হয় নীরদবাবু এমন সব অদ্ভুত কথা বলিলেন কেন ? আমার মনে হয় ইহার কারণ এই যে নীরদবাবুর সকল কথার উৎস

ভৃঙ্গারে গেলাসে কভু কভু পেয়ালায়

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

যৌক্তিক ব্যক্তিত্ব, কিন্তু নিষ্প্রাণ এবং নিরাবেগ, তার কোনো নান্দনিক মূল্য নেই। স্ববিরোধ প্রচুর কিন্তু বরুফে নিশ্চলতা নয়, বরং আছে ভুলপদক্ষেপী অথচ ছুটন্ত গতিস্পন্দন—তা অনেক বেশি বরণীয়। নজরুল জীবনে এবং শিল্পে সর্বত্র অত্যন্ত illogical—আর এটাই আশ্চর্যের বিষয় তাঁর শক্তির এবং দুর্বলতারও 'লজিক'। সেদিক থেকে নজরুল শুধু অনন্য নন—অসাধারণও বটে। নজরুল আবেগ সর্বস্ব—একথা বললে অবশ্যই ভুল হবে। যদি তাই হ'ত তাহলে নজরুল হতেন দ্বিতীয় গোবিন্দচন্দ্র দাস। তা তিনি হননি। একটা মোটা হিসাব আগেই দিয়ে রাখা ভাল। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া বাঙালি আমজনতার প্রাণের কবি নজরুল। সে ব্যাপারটি এমনি এমনি হয়নি। সবুজের অভিযাত্রীর উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে ভুলগুলি সব আনরে বাছা বাছা', বলেছিলেন 'ঘুচিয়ে দে ভাই পুঁথিপোড়ার কাছে পথে চলার বিধি বিধান যাচা'—আসলে ইতিহাসের দ্বন্দ্বনির্যাস পান করে ভদ্রলোকের তকমা তাবিজ ছিঁড়ে রবীন্দ্রনাথ এক বিদ্রোহীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আহূত সেই বিদ্রোহী নজরুলের 'আমি'। রবীন্দ্রনাথের 'মানসী' (১২৯৭ বঙ্গাব্দ) এবং 'সোনার-তরী'-র (১৩০০) দুটি উচ্চারণ এখানে স্মরণ করি। 'মানসী'-র (দুরন্ত আশা) (১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮ বঙ্গাব্দ) কবিতায় ইংরাজের কলোনিতে কেরানিরক্তের গঞ্জনাতাড়িত চরিত্রের উক্তি বিস্ফোরক মূর্তি পরিগ্রহ করেছে কবিতাটির শেষ দুটি স্তবকে। এ যে সাময়িক উত্তেজনাপ্রসূত উক্তি মাত্র নয়, সে উপলব্ধি আমাদের জন্মায় 'সোনার তরী-র 'বসুন্ধরা' (২৬ কার্তিক ১৩০০) বঙ্গাব্দ কবিতার এই অংশে :

> পরিতাপ জর্জর পরাণে
> বৃথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে
> ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা দুরাশায়—
> বর্তমান-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায়
> নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি উল্লাসি—
> উচ্ছৃঙ্খল সে জীবন সেও ভালবাসি ;

"'নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি কোনো প্রথা'—এমন জীবনের জন্য ব্যগ্রতা উনবিংশ শতাব্দের শেষ দশকে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। পোষমানা ভব্যতা

ভারাক্রান্ত জীবন বেঙ্গল ভিক্টোরিয়ানদের যে জীবনচর্যার দান, তার তলায় তলায় বারুদ যে জমতে শুরু করেছিল, তার প্রমাণ তা হলে দেখা যাচ্ছে দুর্লক্ষ্য ছিল না। ইংরাজি স্কুলের ছাঁচে ফেলা গুড কনডাক্টের প্রাইজ পাওয়া ম্লান অনুগত ছেলেদের চেয়ে গৃহছাড়া লক্ষীছাড়া ছেলেদের জীবনে আছে ভাবীকালের বীজ—এ কথাও রবীন্দ্রনাথের গলাতেই আমরা প্রথম শুনেছি।

নজরুলের যে কবিতাটি তাঁকে এনে দিল তাঁর কালান্তরগামী কবি ব্যক্তিত্বের প্রধান অভিধা সেই 'বিদ্রোহী' কবিতাটি আমাদের পূর্বোক্ত অনুচ্ছেদের প্রেক্ষাপটে একটু আলাদা করে বিশ্লেষণ করা যাক। সকলেই জানেন কবিতাটির একটি লক্ষ্যভেদপ্রয়াসী প্যারডি শনিবারের চিঠি-তে (অক্টোবর ১৯২৪) প্রকাশিত হয়েছিল। প্যারডিটির নাম 'ব্যাং'। কবিতার জগতের সাধারণ সূত্রটি এই যে, মূল কবিতা অতীব জনপ্রিয় হলে, সেটি মূলত রস-সার্থক কবিতা হলে, তবেই প্যারডি জমানো যায়। জেলখানায় নজরুলের করা জেলর সায়েবের উদ্দেশে গাওয়া রবীন্দ্রনাথের গানের প্যারডি এখানে স্মরণীয়। স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের লেখা অতি বিখ্যাত কবিতা 'শরৎ' কবিতার যতীন্দ্রনাথ-কৃত প্যারডি। সুতরাং শনিবারের চিঠির 'ব্যাং' নজরুলের 'বিদ্রোহী'-র প্রতি পরোক্ষ অভিবাদন। এতো গেল একটি তুচ্ছ কথা। আসল কথা হল 'বিদ্রোহী কবিতার 'আমি'। এই 'আমি' নজরুলের সত্তার অবৈকল্যের প্রতিনিধি। ওয়াল্ট্ হুইট্‌ম্যানের সঙ্স অফ মাইসেলফ-এর 'আই' (I) যেমন Sours like a Greek God through time and space—সেভাবে না হলেও নজরুলের এই 'আমি'ও বিশ্বাত্মার প্রতিভু। 'শান্তিনিকেতন'-এ 'নববর্ষ' (১৩১৮ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'মানুষ যখনই মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে, তখনই বিধাতা তাকে বলেছেন 'তুমি বীর'। তখনই তিনি তার ললাটে জয়তিলক এঁকে দিয়েছেন। পশুর মতো আর তো সেই ললাটকে সে মাটির কাছে অবনত করে সঞ্চরণ করতে পারবেনা। তাকে বক্ষ প্রসারিত করে আকাশে মাথা তুলে চলতে হবে।' রবীন্দ্রনাথের বলবার কথাটি রবীন্দ্রনাথেরই, নজরুলের বলবার কথা নজরুলের। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতির পিছনে রয়েছে ইতিহাসের অভিঘাত—সে ইতিহাস স্বদেশী যুগে সর্বৈব প্রতিকূলতার প্রতিস্পর্ধী বাঙালির মাথা তুলে দেওয়ার ইতিহাস। নজরুলের 'আমি' প্রথম মহাযুদ্ধ পার হয়ে আসা বিশ্বনাগরিকের জটিল 'অহং'। এ 'আমি'-কে বুঝে নেবার আগে স্বদেশী যুগে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের 'আমরা'-কে আমরা স্মরণ করতে পারি। বিস্তারিত এই ঐতিহাসিক 'আমরা' পৃথক ঐতিহাসিক পটে বিস্ফোরিত স্প্লিণ্টার তীক্ষ্ণ 'আমি'-তে রূপ নিয়েছে 'বিদ্রোহী' কবিতার 'আমি'-তে।

নিবিষ্ট বিশ্লেষণে ফুটে ওঠে এক panoramic image—তাৎপর্যময় এর বহু বিপরীতের সমাবেশ ঃ

সৃষ্টি	ধ্বংস
সাইক্লোন	মলয়-অনিল
সন্ন্যাসী	সৈনিক
মৃন্ময়	চিন্ময়
আগ্নেয়াদ্রি	বাড়ববহ্নি
বিধবার বুকে ক্রন্দনশ্বাস	প্রথম পরশকুমারীর
বাঁশের বাঁশরী	রণতূর্য
লোকালয়	শ্মশান
আকুল নিদাঘ তিয়াষা	মরুনির্ঝর
আমি দেবশিশু	জাহান্নমের আগুন

আরো কথা আছে। শব্দমাত্রেই অভিজ্ঞতার প্রতীক। সে হিসাবে এ কবিতায় এমন সব শব্দকে স্বয়মাগত হতে দেখি যারা এর পূর্বে বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত হয়নি, হবার কথাও নয় ঃ সাইক্লোন, টর্পেডো, মাইন, কুর্নিশ হাবিয়া দোজখ, হিম্মৎ-হ্রেষা, হুতাশী, হর্দম, ঠমকি ছমকি, পঞ্জা ইত্যাদি।

লক্ষণীয় দুটি স্তবকের ভাববৈপরীত্যের বিষম অবস্থান—ষষ্ঠ স্তবক (আমি সন্ন্যাসী সুর সৈনিক ·) এবং সপ্তম স্তবক (আমি বন্ধন হারা কুমারীর বেণী)। কিন্তু দুটি স্তবকের সুর বৈপরীত্যে সৃষ্ট হয়েছে, সমৃদ্ধ হয়েছে পয়েণ্ট কাউণ্টার পয়েণ্টে এক মেলডি। সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য, কিশোরীর প্রথম চুম্বন—দুইই ছক ভেঙে বেরিয়ে পড়া। সেই অর্থে দুটোই বলে দিতে চাইছে—'আমি সহসা আমারে চিনেছি, আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ'। রবীন্দ্রনাথ প্যারাডক্সের সম্রাট—নজরুল রাজা ঃ

(ক) আমি যুবরাজ মম রাজবেশ ম্লান গৈরিক
(খ) আমি জাহান্নমের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি
(গ) করি শত্রুর সাথে গলাগলি ধরি মৃত্যুর সাথে পঞ্জা
(ঘ) আমি কভু প্রশান্ত—কভূ অশান্ত দারুণ স্বেচ্ছাচারী
(ঙ) আমি বন্ধন হারা কুমারীর বেণী তন্বী নয়নে বহ্নি
(চ) আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন চিতে চেতন।

বস্তুত পক্ষে বলতে কি সমগ্র কবিতাটিই এক মহাপ্রসারিত প্যারাডক্স। আনুগত্যক্লান্ত, প্রথাদাস জীবনের সঙ্গে অভিপ্রায়ী বিদ্রোহীর যে সংঘাত এই বিস্তারিত প্যারাডক্সের অভিব্যক্ত ও নিহিত স্তর তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

কবিতাটির মাত্রাবৃত্তের মুক্তক চাল—নিয়মিত শ্লোকবন্ধন থেকে মুক্তিও

কবিতাটির নিজস্ব ভাবাত্মার অভিজ্ঞান। ছয় মাত্রার কলাবৃত্ত নজরুলের ছন্দোরীতি। মিশ্রবৃত্তে তাঁর লেখা কবিতা অবশ্যই আছে—কিন্তু ষন্মাত্রিক কলাবৃত্তেই তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য ছিল বেশি। 'বিদ্রোহী' কবিতায় ব্যবহৃত অতি-পর্ব সেই ছন্দে গূঢ়ার্থ ব্যঞ্জক। পাঠক দেখেন কবিতাটিতে ভবিষ্যৎবাচী ক্রিয়াপদ মাত্র দুবার প্রযুক্ত। নিত্য বর্তমান এবং ঘটমান বর্তমান ক্রিয়ারই প্রাধান্য। আরো দেখি বাক্যগুলি মাঝে ক্রিয়ামুক্ত থাকলেই অধিকতর গতি-শীল থাকে। অতিপর্ব দুএক স্থলে পংক্তিমধ্যেও নিজের স্বাধিকার ঘোষণা করছে। ক্রিয়াপদগুলির একটি নাতি উচ্চারিত কিন্তু নিঃসংশয় বৈশিষ্ট্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করি। 'ভেদিয়া' 'ছেদিয়া', 'দীর্ণকরা', 'ফাড়ি' 'ভিন্ন করা' প্রভৃতি ক্রিয়া এক দুর্বার রতিরঙ্গের পুরুষ সম্ভব সক্রিয়তার স্মারক। তখন অতি পর্ব সেই গূঢ়ার্থকে একটু স্পষ্টতা দেয়। শ্বাস প্রশ্বাসের দ্রুততায় দম নেবার জন্য যেন ওই অতিপর্বের মৌহূর্তিক বিরাম। কবিতাটির প্রথম স্তবক যার আরম্ভ, শেষ স্তবকে তার শান্তি। এই পুরুষার্থ সম্ভব সাবেগ সক্রিয়তায় হাম্বীর ছায়ানট হিন্দোলের সঙ্গে একাত্মতা—কোনো রাগিণীর নাম আসে নি। মন্তাজের মতো পর পর 'শট' গুলির উপস্থাপনা কোনো যোগফল রচনার জন্য নয়—একটি অন্যতর ব্যঞ্জনাসৃষ্টির জন্য। তা অবশ্যই বিদ্রোহাত্মক।

যে গতিস্পন্দ এবং থর্‌ রিদম নজরুলকে দুঃসাহসিক শব্দসমন্বয় ঘটাতে তৎপর করে তুলছে তারও মূলে আছে নজরুলের জীবন। যে স্বরস্বাতন্ত্র্যের জন্য নজরুল প্রধান রবীন্দ্রোত্তর কবি সে স্বরস্বাতন্ত্র্য নজরুলের স্বতন্ত্র জীবনচর্যার দান। লেটোর দলে ঢুকে পড়া সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করা, সৃজনী সাহিত্য বাবদে ইংরাজের কারাগারে জেলখাটা, জেলে অনশন—এই সমস্ত কর্মকাণ্ডে তিনি কোনো পূর্বসূরী দ্বারা প্রভাবিত হন নি। টেকনিকের উপর তাঁর নিজস্ব দখল তাঁর জীবন যাত্রার নিজস্ব চালের প্রতিচ্ছায়া। বাংলা বাক্যে আরবি ফার্সির মিশ্রণ—কখনো কখনো পুরোপংক্তিটাই হিন্দী উর্দু মিশ্রিত—নজরুলের 'পার্সন' এবং 'পার্সোনা'র এজরা পাউণ্ড কথিত কবির রূপ-স্বরূপের প্রকৃত রহস্যের হদিস দেয়। তিনি কতখানি শক্তিমান কবি তা আলাদা ভাবে উপলব্ধিতে আসে যখন আমরা তিনজন প্রধান আধুনিক কবি —যাঁরা নজরুলের অব্যবহিত অনুজ—তাঁদের প্রাথমিক পদচারণায় নজরুলের প্রভাবকে প্রত্যক্ষ করি। এই তিন জন কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং বুদ্ধদেব বসু। নজরুলের মতোই এঁদের প্রত্যেকের প্রথম কাব্য গ্রন্থের 'আমি' প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর অস্থির হাওয়া এবং ধুলো ধোঁয়ার সঙ্গে সরেজমিনে লড়াকু 'আমি'। অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে পৌরোহিত্যে অভিপ্রায়ী 'আমি'। নজরুলের 'আমি' দেবশিশু বুদ্ধদেবে হয়েছে শাপভ্রষ্ট

দেবশিশু। কিন্তু নজরুল যে প্রবলভাবে স্বকণ্ঠনির্ভর হয়ে উঠলেন, হয়ে উঠলেন স্বতন্ত্রবাচী তার মূলে রয়েছে নজরুলের জীবনের স্পীড—তার জীবনের গতিবেগ। এ প্রসঙ্গে সব কথাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তার বৈপ্লবিক বিবাহ, মুক্তি আন্দোলনের অংশগ্রহণ সাম্যবাদী আন্দোলনের আবেগ সৃজন, 'ধূমকেতু' 'লাঙ্গল' পত্রিকা, শ্রমজীবী শ্রেণীর অভ্যুত্থান সম্বন্ধে নিশ্চয় প্রত্যয়, সবকিছুই আজও আমাদের অভিবাদনীয়। মধ্যবিত্ত আতু পুতু জীবন চর্চা ভেঙ্গে তিনি জীবন এবং কবিতাকে রক্তে মাংসে ঘামে জড়ানো মানুষের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন। সেজন্যই নজরুলের কবিতায় গতি-চ্ছন্দ একটা বড়ো ব্যাপার। আমরা তিনটে কবিতা বেছে নিচ্ছি নিবিষ্ট পাঠের জন্য। 'বিদ্রোহী' কবিতায় বিপরীত বৈষম্যের নাট্যরস এর আগে উল্লেখিত হয়েছে। এর সঙ্গে আমরা স্মরণ করতে পারি কামালপাশাকে। এক সম্পূর্ণ অভিনব আঙ্গিকে কবিতাটি গঠিত। কামাল শব্দের যমক প্রয়োগ থেকে সে নাটকীয়তার শুরু। তারপর ঘটনাগতির সঙ্গে সঙ্গে নাট্যরস ঘন হতে হয়েছে। অনুভূতিকে দৃশ্যময়, দৃশ্যকে প্রগাঢ়, এবং সে তন্ময় গাঢ়তাকে প্রমূর্ত করে তোলায় নজরুলের যে সার্থকতা সেখানে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই নাট্যগতি বাংলা কবিতায় নজরুল এনেছেন নিজের আশৈশব গতিশীলতার অভিজ্ঞতা থেকে। আমি 'লিচুচোর' কবিতাটি স্মরণ করছি। এমন কোনো যুবক বাঙালি নেই যিনি বিদ্রোহী কবিতাটি জানেন-না। এমন কোনো বাঙালি বালক নেই যে 'লিচুচোর' কবিতাটি জানে না। চার মাত্রার চৌচাপট দাপট কতখানি উপভোগ্য হতে পারে, তিনের চাল কত দ্রুতগ হতে পারে কবিতাটি তার প্রমাণ। পুরো কবিতাটি একটি সদ্য ঘটে যাওয়া বালকোচিত অ্যাডভেঞ্চারের বর্ণনা। বন্ধুর কাছে বন্ধু কাহিনীটি বলছে। সবে সে কোনো ক্রমে পালিয়ে বেঁচেছে। সুতরাং সে হাঁফিয়ে গেছে। 'বলি থাম একটু দাঁড়া'—থামতে বলার কারণ হল সে একটু দম নিতে চায়। আমি এক বালক আবৃত্তিশিল্পীকে জানতাম সে কবিতাটি শুরু করতো যেন অনেকখানি ছুটে এসেছে এমন ভাবে। 'বলি থাম' বলার পর সে নিজেও দুসেকেন্ড থেমে যেত। সমস্ত ঘটনায় আছে একটা দ্রুতগতি। পুকুরের কাছে লিচুগাছটাকে দেখা, কাস্তে নিয়ে গাছে চড়া, ছোট ডালটি ধরা, গাছ থেকে হঠাৎ পতন, মালি গাছের আড়ালে অপেক্ষমান, তার বর্ষিত কিল ঘুসি, হাইজাম্প দিয়ে দেওয়াল ডিঙিয়ে পলায়ন প্রয়াস—এইবার চূড়ান্ত ঘটনা—ড়ালকুত্তা আর আমাদের নায়কের দৌড় প্রতিযোগিতা। এক চুলের জন্য বেঁচে গেল ছেলেটি। আমরা বেশ বুঝতে পারি এই দুরন্ত দামালের শেষ শপথ—কি বলিস ফের হপ্তা / তোবা নাক খপ্‌তা; শুধু তাৎক্ষণিক উক্তিমাত্র। সে আবার যাবে। আশ্চর্য কবিতাটির গঠন। প্রথম পংক্তি থেকে শেষ পংক্তি

পর্যন্ত কবিতাটি ছুটছে—কোনো পংক্তিতে এক মুহূর্তের জন্য দাঁড়াযনি। আমি সকল মাননীযকে গণনীয রেখেই বলছি, কীট্‌স-এব There was a naughty boy (A song about myself) কবিতাটি ছাড়া কোথাও এ কবিতাব জুড়ি নেই।

চাবমাত্রাব মাত্রাবৃত্তে নজবুল কী ম্যাজিক সৃষ্টি কবতে পারতেন তাব জন্য আমাদেব সামনে আছে 'ফাল্গুনী'। এ কবিতাতে চাবমাত্রা আর কথ্য ভাষাব—বিশেষ এক সময়েব বাঙালি মেযের মেয়েলি বাক্‌বীতির চাল আলোব ফুলকি ছড়িয়েছে। আগেই বলেছি নজবুল ববীন্দ্রনাথেব সাবালক উত্তরাধিকাবী। 'বিদ্রোহী' কবিতাব কতকগুলি বিরোধাভাসেব কথা আগে উল্লেখ করেছি। এখন 'ফাল্গুনী' কবিতাব কতকগুলি বিবোধাভাসেব কথা বলি ঃ

(ক) এল খুন মাখা তূণ নিযে খুনেবা ফাগুন

(খ) তাহাদেব মধু ক্ষবে—মোবে বেঁধে হুল

(গ) সখি মিষ্টি ও ঝাল মেশা এল একি বায়
এযে বুক যত জ্বালা করে মুখ তত চায

(ঘ) ফুলে এত বেঁধে হুল
ভাল ছিল হায
ছিঁড়িও দুকূল যদি কুলের কাঁটায়।

এই কবিতাটিব আবেকটি বৈশিষ্ট্য এর প্রত্যেকটি স্তবকেব নিহিতার্থ। যা প্রতীযমান সেটা বলার কথাব ছদ্মবেশ। ভিতবেব কথাটি ব্যাখ্যেয নয, অনুমেয় ঃ

এ যে শবাবেব মত নেশা
এ পোড়া মলয নেশা
ডাকে তাহে কুল নাশা
কালামুখো পিক
যেন কাবাব কবিতে বেঁধে কলিজাতে শিক।

উৎপ্রেক্ষাটি অভিনব। অথচ কী সজীব। 'আলো বাধা' 'জোছনা আবির', 'নিমখুন' 'নাজেহাল' 'আব-বাঙা' 'ফুল ঝামেলা' 'ডগমগ' প্রভৃতি সাবলীল শব্দ কবিতাটিতে এনে দিযেছে অভিপ্রেত তবঙ্গিলতা। কবিতাটিতে ছেকানুপ্রাস ও যমক এই তবঙ্গকল্পকে তৃতীয মাত্রা দিযেছে। পরিণামী স্তবকটি উদ্ধৃত না করল অন্যায হবে ঃ

আজ সঙ্কেত শঙ্কিতা বনবীথিকায
কত কুলবধূ ছেঁড়ে শাড়ি কুলের কাঁটায!
সখি ভবা মোর এ দুকূল

কাঁটাহীন শুধু ফুল ?—
ভাল ছিল হায়,
সখি ছিঁড়িত দুকুল যদি কুলের কাঁটায়।

আমি যে প্যারাডক্সের কথা বার বার বলছি সেই সূত্রে এ কথা কি বলা যায় না যে নজরুল নিজেই একটি বিরাট প্যারাডক্স। আসক্ত এবং অনাসক্ত, অনুরাগী এবং বৈরাগী, বিদ্রোহী এবং প্রেমিক এই প্রেক্ষক এবং সংবেদী কবি কী করে একই সঙ্গে হয়ে ওঠেন একই কালের ক্রোধের কবি এবং প্রধান ভক্তি গীতিকার তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আমি ভুলে যাচ্ছি না নজরুলের সীমাবদ্ধতা। তিনি প্রেমের কবিতায় আনমনে গিয়ে পড়তেন রাবীন্দ্রিক বেড়াজালে। কিন্তু সকল ক্ষেত্রে নয়। তাঁর প্রেমের কবিতাতেও এমন পংক্তি আছে ঃ

অনন্ত অগস্ত্য তৃষাকুল বিশ্ব মাগা যৌবন আমার
এক সিন্ধু শুষি বিন্দু সম, মাগে সিন্ধু আর !

এমন উচ্চকিত করে দেওয়া চিত্রকল্প আছে ঃ

মাটির প্রদীপ জ্বালবে তুমি মাটির কুটিরে,
খুশীর রঙে করবে সোনা ধূলি মুঠিরে।
আধখানা চাঁদ আকাশ পরে
উঠবে যবে গরব ভরে
তুমি বাকী আধখানা চাঁদ হাসবে ধরাতে,
তড়িৎ ছিঁড়ে পড়বে তোমার খোঁপায় জড়াতে।

এবং আমাদের অবশ্য আলাদা করে মনে পড়বে দীর্ঘ কবিতা 'সিন্ধু'— কি রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' এবং 'পূরবী'র সমুদ্র (২১ অক্টোবর ১৯২৪) কবিতার পরেও মনে পড়বে। 'সিন্ধু' কবিতাটির তিন ভাগ—প্রথম তরঙ্গ, দ্বিতীয় তরঙ্গ, তৃতীয় তরঙ্গ। 'সিন্ধু' নজরুলের বিকল্প অহং। প্রথম তরঙ্গে বিরহী সমুদ্র, দ্বিতীয় তরঙ্গে বিদ্রোহী সমুদ্র, তৃতীয় তরঙ্গে তৃষিত ক্ষুধিত সমুদ্র—

মন্থন-মন্দার দিয়া দস্যু সুরাসুর
মথিয়া লুণ্ঠিয়া গেছে তব রত্নপুর,
হরিয়াছে উচ্চৈঃশ্রবা, তব লক্ষ্মী, তব শশীপ্রিয়া
তারা সব আছে আজ সুখে স্বর্গে গিয়া !
করেছে লুণ্ঠন
তোমার অমৃত সুধা—তোমার জীবন !
সব গেছে আছে শুধু ক্রন্দন কল্লোল,
আছে ব্যথা, আছে স্মৃতি ব্যথা উতরোল !

উর্ধ্বে শূন্য—নিম্নে শূন্য—শূন্য চারিধার,
মধ্যে কাঁদে বারিধির সীমাহীন রিক্ত হাহাকার।

হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্র' কবিতার সঙ্গে নজরুলের সিন্ধু চেতনার আত্মীয়তা খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু দুজনের অনুভূতির ব্যবধানও তো ভুল করা যাবে না।

যুগসন্ধ্যা কবে এল তার,
ডুবে গেল অলক্ষ্যে অতলে। রূপনিঃস্ব হাহাকার
অদৃশ্য বুভুক্ষু ভিক্ষু ফিরিছে বিশ্বের তীরে তীরে,
ধূলায় ধূলায় তার আঘাত লাগিছে ফিরে ফিরে।
ছিল যা প্রদীপ্ত রূপে নানা ছন্দে বিচিত্র চঞ্চল
আজ অন্ধ তরঙ্গের কম্পনে হানিছে শূন্যতল। (সমুদ্র / পূরবী)

'হাহাকার' এই শব্দসাদৃশ্য সত্ত্বেও দুই কবির টোন টিউন দুয়েরই পার্থক্য অস্বীকার করা যাবে না। পৃথক জীবনার্থ সেই টোন টিউনকে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

এ সব সত্ত্বেও নজরুলের অনন্য এবং একক কৃতিত্ব অন্যত্র। সেখানে তাঁর কোনো যথার্থ পূর্বগামী নেই, সঠিক উত্তরপুরুষও অংশত একজন কি দুজন। নজরুল প্রথম বাঙালি কবি যিনি বিশুদ্ধ ক্রোধকে কবিতায় রূপান্তরিত করেছেন। 'ফরিয়াদ' 'আমার কৈফিয়ৎ' 'সব্যসাচী' 'হিন্দুমুসলিম যুদ্ধ' প্রভৃতি কবিতা নজরুলের পরিচিতিকে উন্নীত করেছে প্রগাঢ় জনপ্রিয়তায়। এ সব কবিতায় এমন এমন পংক্তি আছে যা আজও অগ্নিমন্ত্রের মতো উদ্দীপক। একথা ঠিক যে নজরুলের সময়টাও ছিল এই বিশিষ্ট ভাবের আলম্বন উদ্দীপন বিভাবের সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক উত্তাপে চঞ্চল। এই সব উক্তি এখনো কত সজীব ঃ

(ক) নিতি নব ছোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান বিজ্ঞান

(খ) মনের শিকল ছিঁড়েছি পড়েছে হাতের শিকলে টান

(গ) আমরা তো জানি স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস !

(ঘ) প্রার্থনা করো যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস,
যেন লেখা হয় আমার রক্ত লেখায় তাদের সর্বনাশ।

(ঙ) বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে একবার মরে বাঁচি।

(চ) পরের মুলুক লুট করে খায় ডাকাত তারা ডাকাত
তাদের তরে বরাদ্দ ভাই আঘাত শুধু আঘাত।

(ছ) লঙ্কা-সায়রে কাঁদে বন্দিনী ভারতলক্ষ্মী সীতা,
জ্বলিবে তাঁহারি আঁখির সুমুখে কাল রাবণের চিতা

(জ) যে লাঠিতে আজ টুটে গম্বুজ, পড়ে মন্দির চূড়া
সেই লাঠি কালি প্রভাতে করিবে শত্রু দুর্গ গুঁড়া।

এবং এই রৌদ্ররসের আতপে ফুটে উঠেছে সম্পূর্ণ স্বনির্ভর নজরুলি প্যাবাডক্স ঃ

(ক) ভায়োলেন্সের ভায়োলিন আমি

(খ) ল্যাজে যদি তোর লেগেছে আগুন স্বর্ণ লঙ্কা পুড়া

(গ) সজীব হইয়া উঠিয়াছে আমি শ্মশান গোরস্থান

(ঘ) ভারত ভাগ্য করেছে আহত ত্রিশূল ও তরবার

(ঙ) ভোগের পেয়ালা উপচায়ে পড়ে তব হাতে

তৃষ্ণাতুরের হিস্‌সা আছে ও পেয়ালাতে।

(চ) তোরা ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মার মুখে দিস ধূপের ধোয়া

(ছ) তোরা সব ভক্তিশালী
বুকে নয়, মুখে খালি
বেড়ালকে বাছতে দিলি মাছের কাঁটা যে রে।

(জ) এ দুনিয়া পাপ শালা,
ধর্মগাধার পৃষ্ঠে এখানে শূন্য পুণ্য-ছালা।

তথাপি একথা বলা আমার আদপেই উদ্দেশ্য নয়, যে নজরুল কেবল ক্রোধসিদ্ধ কবি। দুর্বাসা নয়, বরং শিবের সঙ্গেই তাঁর মিল। শেয়ানা

পাগল নন, তিনি সত্যই পাগল ভোলানাথ। তা নইলে তিনি এ কথা বললেন কেমন করে ঃ

> রাখাল বলিয়া কারে করো হেলা, ও হেলা কাহারে বাজে !
> হয়তো গোপনে ব্রজের রাখাল এসেছে রাখাল সাজে।
> চাষা বলে করো ঘৃণা !
> দেখো চাষা রূপে লুকায়ে জনক বলরাম এলো কিনা !
> যত নবী ছিল মেষের রাখাল, তারাও ধরিল হাল
> তারাই আনিল অমর বাণী-যা আছে রবে চিরকাল।
> দ্বারে গালি খেয়ে ফিরে যায় নিতি ভিখারী ও ভিখারিণী,
> তারি মাঝে কবে এল ভোলানাথ গিরিজায়া তা কি চিনি।

মননে নয়, হৃদয়ধর্মে তিনি ধার্মিক—তত্ত্বে নয় আবেগে তাঁর আশ্রয়—আশ্রয়-দাতাকে তিনি প্রশ্রয় দিয়েছেন হাতে কিছু না রেখে। অসাধারণ ছিল তাঁর চোখ কানের ক্ষমতা। বাঙালির জীবনের আনাচ কানাচ অন্ধিসন্ধি তাঁর নখদর্পণে। তাঁর কবিত্বের দরদালানে কোন রস আপাংক্তেয় নয়। অকৃত্রিম সাংসারিক আনন্দ নিয়ে তাঁর কবিতা 'অঘ্রাণের সওগাত'। একটি মুসলমান গ্রামীন কৃষক পরিবার অঘ্রানের আনন্দ এবং ছোটখাট সাংসারিক সংবাদ আঁকাড়া বাঙালি শব্দে কবিতাটিতে একটা টাটকা বাতাবরণ রচনা করে। 'গিন্নিপাগল চাল' (আজকালকার ছেলে মেয়েরা নামই শোনে নি) 'তেলে-সমাত' 'লবেজান' 'দলিজ' 'শাশবিবি' 'নেকাব'—বাংলা কবিতায় ব্যবহৃত সেই সব শব্দ মুসলিম পরিবারের অন্তঃপুর থেকে উঠে এসেছে—তিনটি ছবি ফুলের পাপড়িতে ধৃত সৌরভের সারাৎসার ঃ

(ক) মাঠের সাগরে জোয়ারের পর লেগেছে ভাটির টান

(খ) বধূর পায়ের পরশে পেয়েছে কাঠের ঢেঁকিও প্রাণ

(গ) হেমন্ত গায় হেলান দিয়ে গো রৌদ্র পোহায় শীত

এতো গেল সাংসারিক চিত্রলতায় ভরা কবিতা—সে অতিজাগতিক চেতনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পাশে নজরুল নিজের একটি ছোট্ট অথচ নিজস্ব আসন রচে নিয়েছিলেন, সেই মহাজগতে নজরুল আমাদের চেনা জীবনের নানা মিষ্টি অভিজ্ঞতার ছায়া ধরে দিয়েছেন 'চাঁদনীরাতে' কবিতায়। কবিতাটির স্বাতন্ত্র্য কল্পনা এবং ফ্যাণ্টাসির সূক্ষ্ম ভেদরেখাটি মুছে দেওয়ায়। যে নজরুলী ডিকসন একমাত্র নজরুল সম্ভব তা এখানে পূর্ণফল হয়েছে। নজরুল সম্বন্ধে প্রায়ই তাঁর কবিতালভ্য সত্যেন্দ্রীয় আমেজের কথা বলা হয়। যেভাবে

দেখলে তাঁব সাম্যবাদী পর্যাযের কবিতায বাগ্‌ভঙ্গিতে যতীন্দ্রীয আঁচও পাওযা যাবে। কিন্তু এই দুই কবি থেকে নজরুলের আসল পার্থক্যকে চিনতেও আমাদেব ভুল হয না। সত্যেন্দ্রীয আমেজকে নজরুল অতিক্রম করেছেন নজরুলী ইমেজে—যতীন্দ্রীয দুঃখবাদকে তিনি পাশ কাটিযেছেন নিজের অকৃত্রিম প্রাণোল্লাসে। সত্যেন্দ্রনাথ আপন ছন্দেব প্রেমে অভ্যাসিক সিদ্ধিকে প্রাযশ যান্ত্রিক কবে তুলেছেন। যতীন্দ্রনাথ আপন অভিজ্ঞতায আপনি বন্দী। নজবুল সম্বন্ধে এসব কথা একেবাবে খাটবে না। তাঁব দুর্বলতার কথা আমবা জানি। তিনি বিরহকে মনে করতেন মিলনেব অভাব। মিলনকে মনে 'কবতেন আসঙ্গ ভোগ। কিন্তু অনন্যসাধারণ তাঁব অন্যকে সঞ্জীবিত করে তোলাব ক্ষমতা। এ ব্যাপাবে প্রধান সহায তাঁব নির্বিকার শব্দচযন। 'চাঁদনী বাতে' কবিতায 'কোদালে মেঘ' শব্দটি খনাব বচন থেকে আলগোছে তুলে নেওযা। 'মউজ' 'ছুঁড়ি' 'সসাব', 'শাম্পান' 'নেটের মশাবী' সব কিছুই তাঁব কবিতায ছবির উপাদানে কাজে লাগে ঃ

> সপ্তর্ষির তাবাপালঙ্কে ঘুমায আকাশ বাণী,
> 'সেহেলি' 'লাযলি' দিযে গেছে চুপে কুহেলী মশারি টানি।
> দিক চক্রেব ছাযাঘন ঐ সবুজ তবুর সাবি
> নীহাব নেটের কুযাশা মশাবি—ওকি বর্ডাব তারি ?

মঙ্গল গ্রহ মঙ্গল দীপ জ্বালিয়েছে, কালপুরুষ উল্কাজ্বালার সন্ধানী আলো নিযে বিনিদ্র প্রহরায রত। এবই মাঝে ঃ

> কাব কথা ভেবে তারা-মজলিসে দূরে একাকিনী সাকী
> চাঁদেব 'সসারে' কলঙ্ক ফুল আনমনে যায় আঁকি ·

গানেও নজরুল প্রথাবিমুক্ত শব্দ চযনে পবাঙ্মুখ ছিলেন না। বাংলাগানেব যে ঐতিহ্য মধ্যযুগ থেকে চলে আসছে—কথা ও সুরেব হবগৌরী মিলনের রূপ বস সৃজন, নজরুল সেই ধাবাবাহী। ববীন্দ্রনাথ ছাডা নজরুলই এ যুগেব দ্বিতীয বাঙালি গীতিকাব যাঁর জনপ্রিযতা এখনো ক্রমবর্ধমান। তাঁব গানে গাযকেব বা শিল্পীর স্বাধীনতা আছে বলেই এমনটি ঘটেছে একথা বললে ব্যাখ্যাটি আংশিকতা দুষ্ট হবে। বহু অযত্নকৃত বাণী সন্নিবেশ সত্ত্বেও গানেব বাণীতে বেশ কখনো ববীন্দ্রবীথিতে পবিক্রমা সত্ত্বেও নজরুলেব যে কোনো গান ধবতাইয়ের মুখ থেকে নজরুলের গান বলে চিনতে আমাদের ভুল হয না। তাঁব গানের লিরিক কবি নজরুলেবই সৃষ্টি। গানের মিত পবিসরে আবেগ সেখানে সংহত হযেছে বলে তা অবিস্মরণীয। তাঁর গানে—বিশেষ তাঁব গজল গানে তিনি প্রথা বিমুক্ত শব্দ চযনেব অবকাশ পেয়েছেন বেশি। কিন্তু বিস্ময়েব বিষয তিনি যে সব নবাগত শব্দের প্রাথমিক প্রতিবোধকে গলিযে গলিযে তাদের পুবোদস্তর গীতিসম্মত কবে তুলেছেন। 'লোপাট' এবং 'খুন'

শব্দ যে গানে ব্যবহৃত হতে পারে নজরুলের আগে তা আমরা জানতাম না।

সংগীত আলোচনার ক্ষেত্রে সে জনই সব থেকে যোগ্য, সংগীতের ইতিহাস জ্ঞান, সুরজ্ঞান এবং সহজাত রসবোধ যাঁর সংগীত চেতনাকে একযোগে সমৃদ্ধ করে তোলে। 'পরিচয়'-এর লেখক শ্রী অনন্ত কুমার চক্রবর্তী এমন একজন। 'গীতিকার নজরুল ইসলাম' (১৯৭৭) শীর্ষক—একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধে এই শতবার্ষিকীর আলোড়নের অনেক আগে অনন্ত কুমার লিখেছিলেন ঃ

> প্রথমত পল্লী-বাংলাব জীবনের সঙ্গে, বিশেষ করে তাব সাঙ্গীতিক সংস্কারের সঙ্গে শৈশবের ও পববর্তী জীবনেব ঘনিষ্ঠ পরিচয়। দ্বিতীয়ত কৈশোরে ও যৌবনে উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতেব সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়। তৃতীয়ত রবীন্দ্রনাথেব কাছ থেকে পাওয়া সঙ্গীতের বিরাট উত্তরাধিকার। চতুর্থত বাজনৈতিক আন্দোলন ও কৃষক মজুরের জীবন ও সংগ্রামের সঙ্গে মিলতে পাবার দুর্বাব আকাঙ্ক্ষা। তাঁর গান এই আকাঙ্ক্ষারই এক বিশিষ্ট শিল্পরাগ। এর সঙ্গে মিলিত হযেছে তাঁব স্বভাবসিদ্ধ সঙ্গীতবিভোরতা। সব কিছুর যৌগিক পরিণতি, হযতো কিছুটা অপরিণতি সমেত, যাকে বলা হয় নজরুলগীতি।"

এই যৌগিক পরিণাম শেষ পর্যন্ত হযে উঠেছে নজরুলের শৈল্পিক অস্তিত্বের প্রধান অভিজ্ঞান। আমি আগেই বলেছি নজরুল ছিলেন পথিক মানুষ, তাঁর পথচলাব সঙ্গে সঙ্গে চলেছিল তাঁব দেখা এবং শোনা। জীবন বিমুগ্ধ নজরুল জীবন রস পান করেছেন নানা আধারে, 'ভৃঙ্গারে গেলাসে কভু, কভু পেয়ালায়।' আশ্চর্য রসগ্রাহিতায় অনন্তকুমাব বলেন ঃ

> স্বদেশের মাঠে ঘাটেই ছড়িযে আছে অজস্র সুর, অজস্র স্বর-বিন্যাস ও স্বরভঙ্গি, তাবা জনজীবনেব বেগবান ধারাব অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একটু কান পাতলেই তাদেব শোনা যায়, চেনা যায়, সহজেই আব শিল্পীর প্রকাবণগত অভ্যাসেব অঙ্গীভূত হয়ে পড়ে, তাবপব প্রয়োজনের বিভিন্নতায় ও ব্যক্তিস্বরূপেব স্বাতন্ত্র্যে তারা কিছু কিছু রূপান্তরিতও হয়। এই গ্রহণ বর্জনরূপান্তরের মধ্য দিযেই শিল্পীর ক্রমাগ্রসর সামর্থ অর্জন ও স্বকীযতা। আসলে সমস্ত সৎ শিল্পীকেই চলমান জীবনেব নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতি ধারায় অবগাহন করে শক্তি সঞ্চার করতে হয়। উপরন্তু সাধারণের জীবনেই আছে তাঁব মানসসরোবরেব উৎস, যদিচ তার নীল জলে আকাশের ছবি প্রতিফলিত (বিষ্ণু দে ঃ 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ')। একদিকে দেশ ও কালগত ইতিহাস, অন্যদিকে শিল্পরীতিগত ঐতিহ্য—এই হলো শিল্পীর অপরিহার্য পাদপীঠ। এই পাদপীঠে, মোটের ওপর

বলতেই হবে, নজরুলের প্রতিষ্ঠা ছিল বেশ সুদৃঢ়। তাঁর মধ্যে আমরা দেখেছি দেশজ এক প্রাকৃত শক্তির বিস্ময়কর বিস্ফোরণ।"

এই সঙ্গে একটা কথা বলি। উদ্দীপক গানে নজরুলের স্থান রবীন্দ্রনাথের পরেই। আমাদের গীতিকারদের অধিকাংশের স্বদেশীগান দেশবন্দনা, মাতৃ-বন্দনা, বা দেশগৌরব গীতি। যথার্থ উদ্দীপক গান রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর একজনই জমিয়ে দিয়েছিলেন এবং এখনো আগুন ধরিয়ে দেন তিনি নজরুল। কবিতা হিসাবেও সেগুলি প্রথম শ্রেণীর। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার' গানটি কলকাতার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গমার কালে নেতাজি সুভাষ চন্দ্রের নির্দেশে লেখা। সুতরাং সে ক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রই গানটির গডফাদার। লক্ষনীয় সুভাষচন্দ্র গানটি কোনোদিন ভোলেননি। উনিশশো তেতাল্লিশ সাল নাগাদ আমার বয়সী বা আমার থেকেও বয়সে বড়ো প্রতিসন্ধ্যায় গোপনে বেতার গ্রাহক যন্ত্রে শুনতেন সায়গন থেকে প্রচারিত আজাদ হিন্দ ফৌজবার্তা অনুষ্ঠান শুরু হবার ঠিক আগে জলদ গম্ভীর সুরে আবৃত্তি করা হত এই কবিতার প্রথম দুই পংক্তি। আমি কি এখন অনুমান করতে পারি, চল্লিশ দিন সাবমেরিন যাত্রার কালে সেই চরম দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধা এই লিরিকটির কথা ভেবেছেন। গানটির গড ফাদারের জীবনে গানটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়ে উঠল। ছয়মাত্রার ছন্দোতরঙ্গে যেন প্রতিধ্বনিত হয়েছে সমুদ্র তরঙ্গের চড়াই উৎরাই। মাস্টারি স্বভাব হচ্ছে মার্কা দিয়ে ফার্স্ট সেকেণ্ড থার্ড প্লেস নির্ণয় করে দেওয়া। আমি তার মধ্যে যাবোনা। শুধু আমার ব্যক্তি-গত পরিসংখ্যান বলে উদ্দীপক গানে রবীন্দ্রনাথের পাশে একজনই আছেন— তিনি নজরুল। রামনিধি টপ্পার বাঙালীকরণ করেছিলেন। নজরুল গজলের। রবীন্দ্রনাথ বিলিত সুরকে বাংলা বেশ পরিয়ে ছিলেন। নজরুল মধ্য প্রাচ্যের নানা সুরকে।

এই নজরুলই আমাদের একালের ভক্তিগীতির প্রাণ কাড়া রচয়িতা। এখানে আমি শুধু একটা গল্প শোনাবো। এ গল্পের আসল কথক তারাশঙ্কর। সাল ১৯৩৯—তারাশঙ্করের এক শিশু সন্তান সেদিন দুপুরের আগেই মারা গেছে। পিতা এবং পরিবারের অন্যদের অবস্থা অনুমেয। বেলার দিকে তারাশঙ্কর একটা টেলিগ্রাম পেলেন নজরুল আসছেন। তিনি এদিককার খবর জানতেন না। স্বভাবতই তারাশঙ্কর একটু বিব্রত বোধ করলেন। নজরুল ও তাঁর সঙ্গী নলিনী গুপ্ত মহাশয লাভপুর ষ্টেশনে এসে সব শুনলেন তাঁরা ডাকবাংলো অথবা স্টেশনে ওয়েটিং রুমে রাত কাটাতে চাইলেন। তারা-শঙ্কর তা অনুমোদন করলেন না। তারাশঙ্কর নিজ বাড়িতেই ওঁদের নিয়ে গেলেন। পরদিন বিকালে তারাশঙ্করকে নজরুল বললেন 'রাত্রে আসর পাতো। গান গাইব।' ফুল্লরা দেবীর মন্দির মহাপীঠ। সেখানে পদ্মাসন

হযে বসে নজবৃুল গান রচে গাইলেন। তারপর মধ্যবাত্রি পর্যন্ত চলল গান। বহু মুসলমান নজরুল এসেছেন শুনে গান শুনতে বসে গেছেন। বহু হিন্দু তো ছিলেনই। নজরুল ইসলামী ভক্তিগীতি গাইলেন। গাইলেন শ্যামা-সংগীত। এই হল নজরুল যিনি ভক্তির গান গেয়ে হিন্দু-মুসলমান উভযকেই নিষ্পন্দ করে দিতে পাবতেন। হাত জোড় করিযে দিতে পারতেন। এখন দীপাবলী আসছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের সংকলিত শাক্ত পদাবলীতে হবিশ মিত্রের পদ অনেকেব মনে পডবে—'হেমাঙ্গী হইযাছে কালীব ববণ'। নজবুল কি এ পংক্তিব সঙ্গে পবিচিত ছিলেন ? জানি না। কিন্তু নজবুল যখন লেখেন 'মহাকালেব কোলে এসে গৌবী হল মহাকালী / শ্মশান চিতাব ভস্ম মেখে ম্লান হল মা-র রূপের ডালি' তখন তিনি যে কোনো শাক্তপদকর্তাব ঈর্ষাভাজন। তিনি পরম্পরাব সঙ্গে লগ্ন থেকেই নিজ কল্পনাব দীপ জ্বালিযে আরতি করেছেন। তাব পরে গানটিব সঞ্চাবি অংশে তিনি যখন বলেন ঃ

অন্ন দিযে ত্রিজগতে
অন্নদা মোব বেডায পথে
ভিক্ষু শিবের অনুরাগে
ভিক্ষা মাগে রাজদুলালী—

তখন তিনি সবাইকে ছাডিযে যান। আমাদেব দেশটই অদ্ভূত। খ্রিস্টান মধুসূদন বিজয়া দশমীর টানে অসামান্য কবিতা লেখেন। মুসলমান নজরুল পরমাশ্চর্য আগমনী গান বচেন। আবাব নজবুল যখন ইসলামী ভক্তিসংগীত বচনা করেন এই ভাষায ঃ

'যাবি কে মদিনায় আয ত্বরা কবি'
তোব খেয়াঘাটে এল পুণ্য তরী...

তখন রূপকে প্রতীকে ফুটে ওঠে বাঙালি অন্তরাশ্রযী বহুকালাগত নৌকাব সংস্কাব। গানে গানে তিনি যে জগৎ সৃষ্টি করেন তার আলাদা একটা আমেজ আছে 'শূন্য এ বুকে পাখি মোব ফিরে আয' আজকের এবং সেদিনের শ্রোতাকে সমান ভাবে বিভোর কবে বাখে। তাঁর কোনো কোনো ভক্তিগীতিতে যে মহাজাগতিক চেতনা তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের সমগোত্রীয় গানের সঙ্গে তুলনায। একটি গানের কথার উল্লেখ কবে আমাব বলা শেষ করি।

খেলিছ এ বিশ্বলয়ে বিরাট শিশু আনমনে।
প্রলয সৃষ্টি তব পুতুল খেলা নিবজনে প্রভু নিবজনে॥

একটি ছোট ছেলের খেলাঘবের রূপকে স্রষ্টা ও সৃষ্টির আনন্দকে তিনি ধরে দিতে চেযেছেন। দুবাব 'নিবজনে' শব্দটি গানের সুবে সেই মহাস্রষ্টাব একাকিত্বেব বানীমূর্তি। এসব ক্ষেত্রে তিনি সত্যই রবীন্দ্রনাথের সাবালক উত্তবাধিকারী।

———

এই সময়ে তোমাকে চাই, পল রোবসন

শ্যামল চক্রবর্তী

মানুষের, যেন প্রকৃতিরই জয়জয়,
প্রাণের সূর্যে জয় করেছে সে বর্বর অপচয়,
দেশের দশের সমাজের যত বাধা যত ক্ষতিক্ষয়।

মানুষেরই সে যে প্রকৃতির জয়গান,
শরীরে রৌদ্রে রঙিন কষ্টি-পাহাড়ের সম্মান,
কণ্ঠে যে তার মহাসমুদ্র মেঘে মেঘে একতান।

প্রকৃতির জয়ে শুভ্র হৃদয়ে সে ধরেছে ইতিহাস,
রক্তের লালে সারা বিশ্বের পেয়েছে সে আশ্বাস,
অভয়ঙ্কর গুণীকে বাঁধবে কোন্ ভীরু ক্রীতদাস?

প্রাণের আলোয় বহুকর্মা সে দেশে দেশে তার ঘর,
তার নাট্যের রূপকে শিল্পী ভবেছে চিদম্বর,
তার মুক্তিতে মুক্ত আকাশে মানব-কণ্ঠস্বর॥

বাংলা ভাষার এই অসামান্য কবিতাটি আমাদের কাব্যজগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিষ্ণু দে'র রচনা। কবিতাটি রচিত হয় ১৯৫৮ সালের পয়লা এপ্রিল। মুদ্রিত হয়েছিল তাঁর জ্ঞানপীঠ প্রাপ্ত 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত' কাব্যগ্রন্থে। যে কোন পাঠক উপলব্ধি করবেন, কবিতাটি একজন মানুষকে নিয়ে। মানুষটি এমন যে কণ্ঠে তার 'মহাসমুদ্র'। দেশে দেশে রয়েছে তার ঘর। কে সেই মানুষ? পল রোবসন। কবিতাটির নামও ছিল পল রোবসন। '৫৮ সালের এপ্রিলে এমন একটি কবিতা লেখা হয়েছিল কেন? রোবসনের বয়েস তখন ষাট। পৃথিবীর নানাদেশে শ্রমজীবী ও সংস্কৃতিবাণ মানুষ তার ষাটতম জন্মদিন পালন করছেন। বাংলাদেশের অগ্রণী এক কবি নিজস্ব জগতের ভাষায় সম্মানিত করেছেন তাকে।

রোবসনের জীবন এক বিস্ময়কর ইতিহাস। বাবা ক্রীতদাস ছিলেন। ১৮৬৩ সালে মার্কিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিংকন ক্রীতদাস প্রথা আইন করে উচ্ছেদ করেন। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত কালো মানুষদের মূল্যের বিনিময়ে কেনা যেত। প্রাণহীন যন্ত্রের মতো ফরমায়েশ খাটতে হত মালিকের। টুঁ শব্দটি করলে অত্যাচারের সীমা ছিল না। ঘৃণ্য এই প্রথার উচ্ছেদ চাই। কালো মানুষদের অনেকে আন্দোলনে নেমেছেন। জীবন দিয়েছেন। সেই বলিদান কাহিনীতে আমরা আজ যাব না।

দাদু ক্রীতদাস। বাবাও ক্রীতদাস। জন্ম তার ১৮৯৮ বলে জন্মসূত্রে রোবসন ক্রীতদাস নন। কিন্তু ক্রীতদাসের সন্তান ছিলেন। বাবা পালিয়ে চলে এসেছিলেন বহু কষ্ট করে। সৈনিক শিবির কাজ নিয়েছিলেন। কাজ করার ফাঁকে লেখাপড়া করেছেন। স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। পরে গির্জায় কাজ করেছেন।

আট ভাইবোনের সংসারে পল সবার ছোট। ১৮৯৮ সালের ৯ই এপ্রিল পল পৃথিবীতে প্রথম আলোর মুখ দেখেন। ছ'বছর বয়েসে মাকে হারিয়েছেন তিনি। এক 'মা' চার্লি চ্যাপলিনকে তৈরি করেছিলেন। রোবসনকে বড়ো করবার জন্য তার 'মা' পৃথিবীতে রইলেন না।

বাবা উইলিয়াম ড্রু রোবসন মা হারা সন্তানদের ভালোবাসতেন খুব। আবার কঠোর হতেও দ্বিধা করতেন না। ছোটবেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার প্রতি নজর ছিল তার। ১০০তে ৯৫ পেলেও খুশি হতেন না তিনি। পাঁচ নম্বর কম কেন? আসলে বাবা নম্বর সর্বস্ব মানসিকতার মানুষ ছিলেন না। অভিজাতদের অবজ্ঞা ঠেকাতে কালো মানুষদের 'লেখাপড়া' ছাড়া আর কি-ই বা আছে!

প্রিন্সটন শহর কালো মানুষদের শহর নয়। কালোদের ঠাঁই নেই সেখানে। ন'বছরের রোবসন বাবার সাথে ওয়েস্টফিল্ডে চলে এসেছিলেন। নতুন এই শহরে কালোরা অতো ছোট নন। কায়িক পরিশ্রম রোবসন ছোটবেলা থেকেই করতেন। বাবাকে রান্নাঘরে সাহায্য করতেন! নিজে পল ইটের ভাটিতে শ্রমিকের কাজ করেছেন। জাহাজে কুলি, হোটেলে বাসন মেজেছেন। ফলে জীবনটাকে তিনি চিনতে পেরেছিলেন দুদিক থেকেই। পড়াশুনোর দিক থেকে। গায়ে গতরের দিক থেকে।

ছ'ফুট তিন ইঞ্চি লম্বা এক যুবক। পাগল করা ফুটবল খেলেন।

লেখাপড়ার কথা আগেই বলেছি। তবু রটগার্সে সাদা চামড়ার মানুষদের মাঝে স্বস্তি পেতেন না। 'ফাই বিটা কাপ্পা'র সদস্য হয়েছিলেন রোবসন। মেধার অভাবনীয় পরিচয় না দেখালে-এর সদস্য হওয়া যায় না। ১৮৬৯ সাল থেকে একটানা জিতে আসা প্রিন্সটনকে ১৯১৯ সালের খেলায় পরাজিত করেছিলেন। ১৯১১ সালে ইংরেজদের হারিয়ে আমাদের যা উন্মাদনা হয়েছিল, রটগার্স আর রোবসন এর চেয়ে কিছু কম উত্তেজনা অনুভব করেনি।

১৯২৩ সালে রোবসন আইনে স্নাতক হলেন। চাকুরি নিলেন। সাদা চামড়ার অধস্তন কর্মী কালো পলের মুখ থেকে 'ব্রিফ' লিখতে রাজি নয়। ক্ষোভ ও অভিমানে ছেড়ে দিলেন সেই কাজ।

রোবসন কি ভেবে রেখেছিলেন জীবনে তিনি কি হবেন? না। কালো মানুষেরা জীবনের গতিপথ ওভাবে ঠিক করতে পারেন না। পলের পদচারণা পাঠক একবার ভেবে দেখুন কেমন বিচিত্র।

দুর্দান্ত খেলোয়াড়। খেলাকে পেশা হিসেবে নেননি। আইন পড়লেন। কাজে লাগাতে পারলেন না। নাটক করেছেন। সিনেমায় অভিনয় করেছেন। গান করেছেন।

সব কথা তার সব মানুষ জানেন না। একটা কথা দুনিয়া সুদ্ধ মানুষ জেনেছেন। পল একজন গায়ক। মন মাতানো গান করেন পল রোবসন।

হতভাগ্য মানুষদের জন্য গান করেন পল। অথচ তিনি কখনও একটি গানও নিজে বাঁধেননি। সুর করেননি। গেয়েছেন শুধু। মন উজাড় করে গেয়েছেন।

লাঞ্ছনায় ক্ষতবিক্ষত তার শিল্পী জীবন। আবার অভিনন্দনে পরিপূর্ণ জীবনও তার-ই। পলের লেখালেখি, সাক্ষাৎকার ও বক্তৃতার সংখ্যা প্রচুর। শুধু কথায় সুর লাগিয়ে মানুষের কাছে যেতেন না রোবসন। নিজের ভাবনাকে খোলাখুলি ও নির্ভয়ে মানুষের কাছে রেখেছেন তিনি। পৃথিবীর নানা দেশে হাজার হাজার মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেছেন রোবসন।

অভিনয়ের কথা দিয়েই শুরু করি আমরা। স্কুলে 'ওথেলো' করেছিলেন। পরেও 'ওথেলো' করেছেন। অগ্রজ সমালোচক 'ওথেলো'র অভিনয় দেখে লিখেছিলেন, 'পলের কথা ভেবেই বোধহয় সেক্সপিয়ারের এই চরিত্র রচনা।'

পেশাদার অভিনয়ের জগতে 'ট্যাবু' তার প্রথম নাটক। ১৯২২ সালে

ল'ডনে গিয়ে নাটক করেছেন পল। তখনও তার লেখা পড়াই শেষ হয়নি।

নাট্যকার হিসেবে ইউজিন ও নীল খুবই শ্রদ্ধার চরিত্র। তাঁর লেখা নাটক 'অল গড'স চিলড্রন গট উইংস'। অভিনয় করলেন পল। করলেন শুধু ইউজিনের নাটক বলেই। এই নাটকে একজন কালোমানুষ এক সাদা চামড়াব তরুণীকে ভালোবেসেছিল। ফলে তুমুল হৈ চৈ। দাঙ্গাবাজ কু-ক্ল্যাক্স-ক্লান ইউজিনকেই চিঠি দিল, 'তুলে নাও তোমাব এই নাটক, নইলে মৃত সন্তানের মুখ দেখবার জন্যে তৈরি হও'।

নাটক কিন্তু হয়েছিল। পল অভিনয় থেকে পিছিয়ে আসেননি। পরের নাটক ছিল 'এম্পারার জোনস'। এই সময়ে তিনি একজন মানুষের দেখা পেয়েছিলেন। নাম তার লরেন্স ব্রাউন। গায়ক পলেব জীবনে ব্রাউনের প্রভাব বলে শেষ করা যায় না। পল আর ব্রাউন-দুই অবিচ্ছেদ্য চরিত্র।

১৯৩০ সাল। বত্রিশ বছরের পল 'ওথেলো' অভিনয় করছেন। কবে স্কুলে কি করেছিলেন, আজ আব মনে নেই। তবু চবিত্রটি তাব মনেব ভেতর গেঁথে আছে। বিলেত জুড়ে হৈ চৈ। প্রশংসায় পঞ্চ মুখ সবাই। 'হার্পার অ্যান্ড ব্রাদার্স" এব মতো প্রকাশকও পলের জীবনী ছাপিয়ে ফেলল সে সময়।

১৯৫৮ সালে আমেরিকাব এক বেতার সংস্থা পলের একটি সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছিল। সাক্ষাৎকারটি আজও ডেলওয়্যার বিশ্ববিদ্যালয়েব 'ব্ল্যাক স্টাডিজ' ডিপার্টমেণ্টে বয়েছে। সেই সাক্ষাৎকারের একটা জায়গায় বলছেন তিনি স্পষ্ট কবে, '১৯২৮ থেকে ১৯৩৯-এই দীর্ঘ সময় আমি ল'ডনে কাটিযেছি। ১৯৩৩ সালের একটা ঘটনা আমার জীবনে গভীব দাগ কাটে'।

জহ্লাদ হিটলাবেব রাজত্বে ইহুদী মানুষদেব ঠাঁই নেই। সবাই ল'ডনে চলে আসছেন। এদের জন্য সে সময় একটা কমিটি তৈবি হয়। সভাপতি হয়েছিলেন এইচ. জি. ওয়েলস। আর ছিলেন মাবি সিটন। মারি সিটনের নাম আমবা জানি। সত্যজিৎ রায়ের ছবির তিনি অন্যতম গুণগ্রাহী ও সমালোচক। মারি পলকে 'অল গডস'…নাটক অভিনয় কবে কিছু টাকা তুলে দিতে বলেছিলেন। ঐ কমিটিতে অনেক রাজনীতিব লোক। পল চাইলেন, ওসব রাজনীতিতে জড়াবেন না। পার পাননি। ধমকে ওঠেছিলেন মাবি সেদিন, 'যাই করুন, যতো প্রতিভাই থাকুক আপনার, বর্ণবিদ্বেষীরা কি ভুলে যাবে যে আপনি একজন নিগ্রো নন' ?

চমকে ওঠেছিলেন পল সেদিন। অভিনয় কবেছিলেন। রাজনীতির অঙ্গনকে ভুলেও কোনদিন আর অচ্ছুৎ মনে করেননি।

একাধিক চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন পল। আইজেনস্টাইনের ছবিতে কাজ কবাব তীব্র আগ্রহে তিনি সোভিয়েত গিয়েছিলেন। যদিও সেই ছবি শেষ পর্যন্ত হযনি। 'স্যাণ্ডাবস দি বিভাব' কিম্বা 'দি সঙ অফ ফ্রিডম' এ পলেব অভিনয় অবিস্মবণীয়। 'স্যাণ্ডারস…' ছবিতে পবিচালক পবে কিছু মনগডা অংশ জুড়ে দিযেছিলেন। কালো মানুষদেব আত্মসম্মান এতে ক্ষুণ্ণ হযেছিল। পল খোলাখুলি এ জিনিসেব প্রতিবাদ জানিযেছিলেন।

একটু আগেই বলেছি আমবা, পলেব সবচেয়ে বড়ো পবিচয় তিনি গাযক। ভেবেচিন্তে গানেব জগতে আসেননি। যখন যা স্পর্শ কবেছেন, সোনা হযেছে। পল বোবসনেব 'নদীব গান' আমবা কে না শুনেছি। মিসিসিপি, ভোলগা, গঙ্গা, নীল, ইয়াংসি আর আমাজান-ছয় নদীব গান। একটা চলচ্চিত্রে এই গান ছিল। লিখেছিলেন বের্টোল্ড ব্রেখট। ছবিটির পোস্টাব করেছিলেন পাবলো পিকাসো। পৃথিবীর অন্যতম ঐতিহ্যবাহী সঙ্গীত 'নিগ্রো স্পিবিচুয়াল'। গির্জার ভেতবে কর্মক্লান্ত কালো মানুষেব দল ঈশ্ববেব কাছে তাদেব সুখ-দুঃখ ব্যথা-বেদনাব কথা সুরের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে চাইতেন। এই হল নিগ্রো স্পিরিচুয়াল।

বাবা তাব গির্জায কাজ কবতেন। ফলে শৈশব থেকেই গির্জায নানা রকমেব প্রার্থনাব গান শুনেছেন বোবসন। লরেন্স ব্রাউন ছিলেন প্রকৃত অর্থে নিগ্রো সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ। পলেব অভাবনীয় কণ্ঠস্বরকে তিনি হাবিযে যেতে দেননি। একটাব পর একটা গান পল গেযেছেন ব্রাউনের অনুরোধে। ১৯২৫ সালের ১৯শে এপ্রিল প্রথম অনুষ্ঠান কবে নিগ্রো সঙ্গীত পবিবেশন কবেছিলেন তিনি। পাঁচ বছর টানা নানা জায়গায় গেযেছেন। পাঁচ বছর পব শিল্পী বোবসন আবও পবিণত হয়েছেন। মাত্রা নির্বাচন কবে গান গাইতেন এবপব। সব গানেবই স্নাযুকেন্দ্র লোক সংগীত। কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন নিজেই। 'লোক গান গাই কেন? পৃথিবীব সকল মানুষকে এই দিযে ছুঁতে পারি'। গাইতে গেলে শুধু গলা সাধলে চলবে কেন। পডাশুনো চাই গভীর। বই দিযে ভরিযে তুললেন নিজের ঘর। নানা দেশেব ভাষা না জানলে গানেব কথার মর্ম উপলব্ধি কববেন কেমন করে? ভাষা শিখতে চাইলেন পল। শিখলেনও। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয না,

চব্বিশটি ভাষা করায়ত্ত ছিল তার। আইরিশ, স্কটিশ, আরবীয়, সোয়াহিলি, ইডিস, ইতালিয়, গ্রীস, চেক, চৈনিক, জার্মান, জাপানী, ড্যানিশ, নরওয়ে-নিয়ান, পোলিশ, পারসী, ফিনিস, ফরাসী, রাশিয়ান, হিন্দী, জুলু, মেন্ডে, আশান্টি, ইকো, এফিক, ইওরুবে। গায়ক রোবসনের পশ্চাৎপটে এই ভাষাবিদ রোবসন অপরিচিত। এই বিষয়টি গভীর গবেষণার অপেক্ষায় আজও দিন গুনছে।

একটি গান আজ আট থেকে আশি সবার মুখে মুখেই ফেরে, 'উই শেল ওভারকাম'। গানটি কিন্তু গোড়ায় তা ছিল না। গানের কথা ছিল 'আই শেল ওভারকাম'। কোন দায়বদ্ধ শিল্পী 'আই' থেকে 'উই' করেছেন। বলবার কথা অন্য, এটি একটি নিগ্রো স্পিরিচুয়াল। ১৯৩৪ সালে রোবসন প্রথম সোভিয়েত গিয়েছিলেন। এক কালের জার শাসিত সোভিয়েত ১৯১৭ সালে অন্য চেহারায় ওঠে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রনাথের চোখেও আমরা সোভিয়েত দেখেছি। দেখে এসে লিখছেন রোবসন, 'প্রাচীন সংস্কৃতি নতুন সম্পদে সজ্জিত হয়ে বিকশিত হচ্ছে। যুবক-যুবতীরা বিজ্ঞান ও মানবিকী বিদ্যাকে করায়ত্ত করছে দ্রুত। হাজার বছর? না। বিশ বছর আগেই।' আইজেন-স্টাইনের কাছে রোবসন এক স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করেছিলেন, 'জীবনে এই প্রথম আমি নিজেকে মানুষ বলে ভাবতে পারলাম। এখানে আমায় কেউ নিগ্রো ভাবে না। ভাবে মানুষ।'

১৯৩৬ সালের কথায় আসছি আমরা। স্পেনে রিপাবলিকান সরকার জনমতের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফ্রাঙ্কো এই সরকার চায় না। ফাসিস্ত বাহিনী নিয়ে আক্রমণ শানায় ফ্রাঙ্কো। মানুষ মানবেন কেন এই অত্যাচার? রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। স্পেনের মানুষের পাশে এসে সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন 'আন্তর্জাতিক বাহিনী'। রালফ ফক্স, ক্রিস্টোফার কডওয়েলের মতো মেধা স্পেনের যুদ্ধে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। লণ্ডনের এলবার্ট হলে দাঁড়িয়ে বললেন রোবসন, 'প্রতিটি শিল্পী প্রতিটি বিজ্ঞানীকে এখন ঠিক করতে হবে, তিনি কোন দিকে আছেন, নিরপেক্ষ বলে কিছু হয় না। একজন শিল্পী হয় মুক্তি চাইবেন নয় তো দাসত্ব চাইবেন।'

দু'বছর পর ১৯৩৮ সালে স্পেনে গিয়েছিলেন রোবসন। রোবসনের আত্মজীবনী 'হিয়ার আই স্ট্যান্ড' পড়ুন। স্পেনের অভিজ্ঞতা লেখা রয়েছে সেখানে। আন্তর্জাতিক বাহিনীর জন্য তৈরি হল গান, 'ব্যালাড ফর

আমেরিকান্স'। এখানে রয়েছে লিঙ্কন বাহিনী। সাদা চামড়ার আত্মনিবেদিত কিছু আমেরিকার মানুষ নিগ্রো কিছু মানুষকে সাথী করে ফাসিস্ত ফ্রাঙ্কোর মৃত্যু কামনায় যুদ্ধে চলেছেন। আনন্দে আপ্লুত হলেন রোবসন, স্বদেশে ফিরে যাবেন তিনি। যতো বাধা যতো অবজ্ঞাই থাকুক, দেশের মানুষকে জড়ো করবেন।

বিলেতের মাটিতে পা দেবার সময় যতোটা অভিনন্দিত হয়েছিলেন রোবসন আজ আর তা পাওয়া যাচ্ছে না। বিলেতের কর্তাব্যক্তিরা পলকে একটু রয়ে সয়ে চলবার উপদেশ দিচ্ছেন। মানেননি পল। নানা আন্তর্জাতিক শান্তি সংসদের সদস্য হলেন তিনি। দেশে দেশে ঘুরে গাইছেন গান। মানুষকে সংগঠিত করার জন্য নানা কথা বলছেন।

যেই রোবসন কোন কিছু ভেবে জীবনপথের যাত্রা শুরু করেননি, যেই রোবসন মাঁরি সিটনের কথা না শুনলে হয়তো নিছক এক শিল্পীই থেকে যেতেন তিনি চারের দশকে এক পরিপূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করেছেন। নইলে ১৯৪০ সালে রাশিয়া ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধে বলছেন তিনি কেমন করে, 'সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রিকার লক্ষ লক্ষ কালো মানুষকে দাস করে রেখেছে, যে সরকার ভারত ও জামাইকাকে স্বাধীনতা দিতে রাজি নয়, সেই সরকারের কর্মবীর চেম্বারলিন ফিনল্যাণ্ডের সাধারণ মানুষের জন্য যুদ্ধ করছে, একথা ভাবতে আমি রাজি নই।'

ফিনল্যাণ্ডের পক্ষে একটা মতামত দিতে বলা হয়েছিল রোবসনকে। সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীতা করে রাশিয়ার পক্ষে উপরিউক্ত সংলাপ তিনি উচ্চারণ করেছিলেন। দীর্ঘকাল বিলেতে কাটিয়ে স্বদেশে ফিরলেন রোবসন। বিলেতে থাকলেও ঘর ছিল তার সারা পৃথিবী। একটার পর আর একটা দেশে বারবার গিয়েছেন। প্রতি দেশের লড়াকু মানুষকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছেন। নিজের দেশেও একই কাজ করে যেতে চান তিনি।

১৯৪১ সাল। ফোর্ডের মোটর কারখানায় ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন কর্মীরা। উৎসাহ জোগাতে গিয়েছেন রোবসন। মঞ্চ বলে কিছু নেই। কারখানার গেইটে দাঁড়িয়ে বললেন। গান করলেন। কালো মানুষদের নিজস্ব কিছু সমস্যা থাকলেও কালো আর সাদা শ্রমিকে ফারাক নেই কোন। কথাটা সেদিন জোর গলায় বলেছিলেন রোবসন।

পৃথিবীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছে।

যুদ্ধ সেখানে থামেনি। এরপর শুরু হয়েছিল ঠাণ্ডাযুদ্ধ। আমেরিকা তার নায়ক। অকুতোভয় রোবসন ঠাণ্ডাযুদ্ধের সেই সময়ে বলেছিলেন ট্রুম্যানকে, 'চতুরালি ছাড়ুন। সোভিয়েতের সাথে বসুন। আলোচনা করে মিটিয়ে নিন বিবাদ। দু'জন দু'জনের বন্ধু হয়ে যান'। কথাটা ১৯৫০-এর আমলে খুব সহজ বলে পাঠক ভাববেন না। মাননীয় ম্যাকার্থীর আগ্রাসন কাকে রেহাই দিয়েছিল সেদিন? আইনস্টাইন, পাউলিং, ওপেনহাইমার—বিশ্বের সর্বজনমান্য বিজ্ঞানীদেরও রেহাই দেওয়া হয়নি। কালো (!) চামড়ার রোবসন। তার আর তখন দাম কি ওদের কাছে?

রোবসন পৃথিবীতে একা ছিলেন না। এসব মানুষ কোন সময়েই পৃথিবীতে একা থাকেন না। একা কোন বিপদ থেকে মানুষদের উদ্ধার করে দেবেন—এমন সুপারম্যান স্বপ্ন দেখেন না। স্পেনের কথা আগে আমরা বলেছি। আফ্রিকার লড়াইয়ে রোবসনের অবদান অবিস্মরণীয়। আফ্রিকা বিষয়ক একটি সংগঠনের তিনি ছিলেন সভাপতি। দীর্ঘকাল আফ্রিকার জন্য লড়াই করেছেন। পাশাপাশি বলেছেন সত্যি কথা। আফ্রিকা নয় শুধু, পৃথিবীর সকল দেশের জাত বর্ণ ধর্মহীন মানুষকে প্রগতির লড়াইয়ে সামিল করতে চান তিনি। কি ছিল এসব কাজে রোবসনের হাতিয়ার? গান ছিল, বক্তৃতা ছিল। দুই-ই তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মতো বিঁধে অর্ধমৃত মানুষদের উজ্জীবিত করেছে। মিছিলের সারিতে হাজার হাজার মানুষকে সারিবদ্ধ করেছে।

শুধু কনসার্ট করে, শুধু গান গেয়ে অর্থ ও বিলাস চাইলে রোবসন প্রচুর পেতেন। একক সফলতার অর্থহীন স্রোতের জলে গা ভেজাননি তিনি। সবার জন্যে সবার হয়ে মিশে থাকতে চান রোবসন। কেন বলছি আমরা এমন করে? চলচ্চিত্রে তার অভিনয় প্রশংসা দেশে দেশে। ঘোষণা করছেন রোবসন, 'ওরা কালো মানুষদের চরিত্রকে কখনও যথাযথ দেখাবে না। আর চলচ্চিত্রে অভিনয় করব না।' আরও কিছুদিন পরের কথা। কনসার্ট শেষে বলছেন তিনি, আর বাণিজ্যিক পরিবেশনা নয়, এবার শুধু লড়াকু মানুষদের জন্য গান গাইব।' হেলায় অর্থকে ঠেলে দিয়েছিলেন পল রোবসন।

১৯৪৯ সালের 'পিকস্কিল' ঘটনা আজ ইতিহাস হয়ে আছে। হাওয়ার্ড ফার্স্ট লিখেছিলেন সেদিনকার সেই কাহিনী। রোবসন গান করবেন। রয়েছেন সাথে পীট সিগারও। প্রথম দিন অনুষ্ঠান হতে পারেনি। দ্বিতীয়

দিন রোবসন ঠিক করেছেন, সব বাধা ঠেলে অনুষ্ঠান করবেন। জানানো হল শান্তিরক্ষার বাহিনীকে। রোবসন গান ধরেছেন। গুণ্ডার দল আক্রমণ শানাল। শান্তিরক্ষার বাহিনী তখন নিশ্চল মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দলের সহযোগী কমরেড ছিলেন বেশ কিছু মানুষ। এরা গানের এই অনুষ্ঠান ভেঙ্গে দিতে সেদিন কিছুতেই দেননি। রক্তাক্ত পিকস্কিল হাওয়ার্ড ফাস্টের বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে এসেছে। প্রতিবাদে ধ্বনিত হয়েছিলেন তারপর অনেকেই। সাদা-কালোর বেড়াজাল ভেঙ্গে এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯৪৯ সালের ১২ই অক্টোবর তীব্র আক্রোশ ও পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ছুঁড়ে দেয়া হল রাষ্ট্র প্রধান ট্রুম্যানের দিকে। সেই চিঠির বয়ান আমরা নিচে দিচ্ছি।

প্রিয় রাষ্ট্রপতি,

১৯৪৯ সালের ২৭শে আগস্ট রাতে নিউইয়র্কের পিকস্কিলে আমেরিকার জনগণ ও তার অধিকারের ওপর খুনে বাহিনী নির্মম আক্রমণ চালিয়েছে।

সাতদিন পর, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, রবিবার আবার একই জায়গায় একই কায়দায় আক্রমণ করা হয়েছে।

আক্রমণের ছবি আমেরিকার সকল গণমাধ্যমেই ধরা রয়েছে। আক্রান্তদের চেহারা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকেও এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। গভর্নর থমাস ডিওয়ে ও তার কর্তব্যরত কর্মীরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। আমেরিকাবাসীর অধিকার, সম্পত্তি ও জীবন ওদের সামনেই লুণ্ঠিত হয়েছে সেদিন।

আমরা ঘোষণা করতে চাই, গভর্নর ডিওয়ে তার কাজের জন্য চূড়ান্তভাবে অনুপযুক্ত। ১৪ই সেপ্টেম্বরে দেয়া তার বিবৃতি মিথ্যায় পরিপূর্ণ। পিকস্কিলের ঘটনার জন্য তিনি প্রতিক্রিয়াশীলদের মতোই 'কমিউনিস্টদের কাজ' বলে অভিহিত করেছেন।

আমরা বুঝতে পারছি গভর্নর ডিওয়ে 'পিকস্কিল' মাথায় রেখে আরও একটি কমিউনিস্ট নিধন যজ্ঞে হাত পাকাতে চান। আমেরিকার জনগণ আরও একবার স্বেচ্ছাচারিতায় আক্রান্ত হবেন।

নিউইয়র্ক প্রশাসনের আজ আর সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষা করার সামর্থ নেই। রাষ্ট্রপতি মহোদয়, আমরা আপনাকে বলতে চাইছি, অ্যাটর্নি জেনারেল ও বিচার মন্ত্রকের মানবাধিকার কমিশনকে এক্ষুনি এ ঘটনার

তদন্তের নির্দেশ দিন। ২৭শে আগস্ট ও ৪ঠা সেপ্টেম্বরের প্রকৃত অপবাধীদের খুঁজে বের করা হোক ও দৃষ্টান্ত যোগ্য শাস্তি দেযা হোক।

পিকস্কিলের ঘটনা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয। দু'বছব আগে ইলিনয শহবেও পল রোবসনকে গান গাইতে দেওযা হয়নি। গত বছব বাষ্ট্রপতি পদ প্রার্থী হেনরি ওয়ালেস ও তার সমর্থকেরা নানা জাযগায অকথ্যভাবে লাঞ্ছিত হযেছেন। গত কয়েক মাসে ফ্লোরিডা, জর্জিয়া, আলাবামা, ইলিনয় ও আবও কযেকটি বাজ্যে নিগ্রো মানুষদের ওপব অত্যাচার বহুগুণ বেড়ে গিযেছে। পুলিশি প্ররোচনায় নিউইয়র্ক শহবে বহু মানুষ খুন হয়েছেন। প্রশাসন বিন্দুমাত্র ব্যবস্থা নেয়নি।

নিগ্রো বিবোধী অভিযান কোথায় পৌঁছুতে পাবে, পিকস্কিল তাব উদাহবণ। পিকস্কিল হিটলাবের জার্মানীকে মনে করিয়ে দেয়। জার্মানীতেও 'স্বদেশপ্রেম' আব 'কমিউনিজম বিবোধিতা'ব নামে ইহুদীদেব ওপর এ ধরনেব সংঘবদ্ধ আক্রমণ পবপব সংঘটিত হযেছিল। মাননীয় রাষ্ট্রপতি, ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট। এই বিকৃত আমেবিকাবাদ 'আন আমেবিকান' নামে শান্তিব যোদ্ধাদেব খতম অভিযানে নেমেছে। এরাই আজ 'আন আমেরিকান', যারা শান্তি ও সংবিধান রক্ষার শপথ নিযে জনগণেব পাশে দাঁড়াচ্ছেন!

আমেবিকাব সাধাবণ মানুষেব বিবুদ্ধে এই ঠাণ্ডাযুদ্ধেব দ্রুত অবসান দাবি কবছি আমরা। সময় এসেছে যখন আমাদের প্রশাসন যন্ত্রকে কাজে লাগিযে প্রকৃত ঘটনা উদ্ঘাটিত কবা প্রযোজন। মাননীয় বাষ্ট্রপতি, সারা পৃথিবী আপনাব দিকে তাকিযে আছে।'

১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্ববেব শুবুতে ঘটেছিল এই ঘটনা। অপরাধীদেব তো জানাই ছিল! কমিউনিষ্টদের দাযী কবলেন মার্কিন প্রশাসন। যেখানে যতো গণ্ডগোল, কমিউনিষ্ট ভিন্ন আব কববে কাবা!

আসলে পলেব দৃঢ়চেতা মননকে কিছুতেই কাবু করতে পারছে না মার্কিন প্রশাসন। ১৯৪৯ সালেরই এপ্রিল মাসেব ঘটনা, প্যাবিসে শান্তি সম্মেলন বসেছে। সম্মেলনে গান কবেছেন তিনি মন খুলে। ছোট্ট দু'চাবটে কথা বলেছেন।

'... লক্ষ লক্ষ সাদা আব কালো চামড়ার শ্রমিক তাদের বক্ত ও ঘামেব বিনিময়ে আমেরিকাকে গডে তুলেছেন। আমেবিকার সংসদেব উত্তরাধিকাব এইসব মানুষদেব প্রাপ্য। প্রাপ্য এইসব মানুষদের সন্তানেরা। আমবা

শান্তি চাই। যুদ্ধ চাই না। কারোর বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করব না। না, সোভিয়েতের বিরুদ্ধেও নয়।' মওকা পাওয়া গেল জোর। রোবসন আমেরিকার শত্রু। কেননা আমেরিকার চিরশত্রু সোভিয়েতের ভক্ত রোবসন। জোর প্রচার হতে থাকল রোবসনকে ঘিরে। পরিকল্পিত এক বিদ্বেষের প্রচার চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল পিকস্কিলে।

জবাব সেদিন ছিল রোবসনের কাছে। চমকে যেতে হয়। সেই জবাবের তীক্ষ্নতা ছিল আকাশচুম্বী।

রোবসনের রচনা সংগ্রহের দিকে তাকাই আমরা। লণ্ডনের 'রেনোল্ডস নিউজ' এর সাংবাদিক পলের সাথে কথা বলেছেন। পল বলছেন জোর গলায়, 'হ্যাঁ, আমি, আমিও একজন আমেরিকান'। পলের কয়েকটা কথা আমরা পরপর সাজিয়ে দিচ্ছি।

নিউ জার্সি পলের ছোট বেলার শহর। বড়ো হয়ে সেখানে গিয়েছেন, স্কুলের বন্ধুরা ঘিরে ধরেছে তাকে। জিজ্ঞেস করছে, 'পল, কী হল তোর, গোবেচারা গোছের ছিলি। এখন এমন দুঃসাহসী আর রাজনৈতিক হয়ে ওঠলি কি করে?'

স্বাগতোক্তির পর বলছেন রোবসন। বৃটেনের শ্রমিক আন্দোলন তাকে এমন দুঃসাহসী আর রাজনৈতিক হতে শিখিয়েছে। শুরুতে তিনি 'শিল্পী' হবেন বলেই বিলেতে এসেছিলেন। জীবনের যাত্রা এমন করে রচিত হবে, পল নিজে কখনও ভাবেননি।

অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছেন তিনি। 'আমেরিকার নিগ্রো মানুষের লড়াই আর যে কোন জায়গার নিপীড়ত মানুষদের লড়াইকে আমার এক বলেই মনে হয়।"

'...যে কোন প্রগতিশক্তির পক্ষে আমি। আমেরিকায় যারা লড়াই করছেন তাদেরও পক্ষে। পৃথিবীর সকল দেশে সকল প্রগতি শক্তির সমর্থক আমি। সবাইতো চাইছেন সাম্রাজ্যবাদের পতন হোক।'

'আমেরিকাকে ভুলব কেমন করে। দেড় কোটি নিগ্রো আমেরিকানের আমি একজন। আমি আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি। আমেরিকার মাটিইতো আমায় জন্ম দিয়েছে। আমার পূর্বপুরুষেরা আমেরিকারও পূর্বপুরুষ। সেই ১৬২০ সাল থেকে আমার পূর্ব প্রজন্মের মানুষদের এখানে ক্রীতদাস করে আনা হয়েছিল।'

'আজ আমি চোখের সামনে দেখতে পাই। বুঝতে পারি। আফ্রিকা মহাদেশের দশ কোটি মানুষের সম্পদ লুণ্ঠন করে 'মুক্ত সাম্রাজ্যবাদ' গড়ে তোলা হয়েছে। আমিও লুণ্ঠিত হয়েছি। আমার বাবা ছিলেন ক্রীতদাস। ১৮৪৩ সালে বাবার জন্ম। ১৮৫৮ সালে পালিয়ে মুক্তি পেয়েছেন। তার বছর পাঁচ পরে এই প্রথা রদ হয়েছে। সৈন্যদলে নাম লিখিয়ে আমার বাবা যুদ্ধ করেছেন।

আমি প্রগতিশীল আমেরিকার পক্ষে। যেই আমেরিকায় নিগ্রোরা একটা অংশ হবেন মাত্র। যেই আমেরিকা মানুষের স্বাধীকার ও মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার অধিকারকে শ্রদ্ধা করে আমি সেই আমেরিকার পক্ষে।

বিলেতের মানুষ জানেন না হয়তো, হিটলারের জার্মানীতে মানুষের অধিকার যেমন ধিকৃত ছিল, আজ আমেরিকাতেও তাই হচ্ছে।

আমি নাকি আমেরিকান নই! একটা কমিটি তৈরি হয়েছে। কমিটি অন আন আমেরিকান অ্যাকটিভিটিজ এইসব। ওরা আমাকে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছু বলতে দিতে চায়নি। বাধা দিয়েছে। অপরাধ কি আমার? নিজের দেশের কথা কম বলি। আর সব দেশের কথা নাকি বেশি বলি। ওরা বোঝেন না একথা বিশ্বাস হয় না। আজ কি কোন দেশ একা পৃথিবীতে বাঁচতে পারে? প্রতিটি জাতি পৃথিবীর এক একটা অংশ। আমি অন্য আমেরিকার বাসিন্দা। ফ্রাঙ্কোর পৃথিবীতে আমি বাস করি না। প্রজাতন্ত্রী স্পেন আমার ঘর। নতুন গণতন্ত্রই আমার প্রিয় বাসভূমি। আমি সেই আমেরিকার অংশ, যারা সোভিয়েতের সাথে বন্ধুত্ব কামনা করে।···আমি নতুন চীনের বন্ধু, ফ্যাসীবাদি জাপানকে আমি শ্রদ্ধা করি না।'

'ডেইলি ওয়াকার' কাগজের নামটির সাথে বহু পাঠকই পরিচিত। বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র। সুপরিচিত বিজ্ঞানী জে. বি. এস. হলডেন একসময় বহুকাল কাগজটির সম্পাদনা মণ্ডলীতে ছিলেন। সেই কাগজের ৪ঠা নভেম্বর ১৯৩৭ সংখ্যায় পলের একটা বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছিল।

তখন পল স্পেনের যুদ্ধে তার ভূমিকা পালন করছেন। স্পেনের শরনার্থী শিশুদের সাহায্য করবার জন্য একটা কমিটি তৈরি হয়েছিল সে সময়। কমিটি এলবার্ট হলে অনুষ্ঠান করছেন। উপস্থিত রোবসন বক্তৃতা করলেন সংক্ষিপ্ত। পৃথিবীর অন্যতম 'ঐতিহাসিক' ভাষণ হিসেবে আজও সবাই এর কথা উল্লেখ

করেন। আমরা আগে এই ভাষণের দু' এক লাইন কোথাও কোথাও ব্যবহার করেছি।

'বন্ধুগণ, পৃথিবীর একটা ভালো কাজে নিজেকে যোগ করতে পেরেছি বলে ধন্য মনে করছি। মানবিকতার সুরক্ষায় শিল্পী নিয়োজিত হবেন—এটাই মানুষের প্রত্যাশিত।…

প্রতিটি শিল্পী, প্রতিটি বিজ্ঞানীকে আজ ঠিক করতে হবে, কার পাশে তিনি দাঁড়াবেন। এছাড়া আর কোন ভাবনা নেই।…নিরপেক্ষ দর্শক বলে কিছু হয় না। নানা দেশে মানুষের ঐতিহ্য ধ্বংস করা হচ্ছে, মিথ্যা ও উগ্র জাত্যাভিমান জাগিয়ে তোলা হচ্ছে। একজন শিল্পী, একজন বিজ্ঞানী, একজন লেখক এতে আন্দোলিত হবেন না? চারপাশে যুদ্ধক্ষেত্র। কাছাকাছি কোথাও কোন আশ্রয় নেই।

আমাদের আজ এই দুঃসময়ের মুখোমুখি হতে হবে। সময় বসে থাকবে না। ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেয়া যায়, থমকে দেয়া যায় না। সমাজ যে সংস্কৃতি নির্মাণ করেছে, ফ্যাসিবাদ তাকে বিনাশ করার যুদ্ধ করছে। সংস্কৃতি একদিনে তৈরি হয় নি। বহু শ্রম ব্যথা ও ঘামের বিনিময়ে নির্মিত হয় একটা সামাজিক সংস্কৃতি। প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ শুধুমাত্র সেই সংস্কৃতি রক্ষার লড়াই করেন না। যুদ্ধ যাতে সংস্কৃতির মৃত্যু ঘোষণা না করতে পারে, তার জন্যেও অতন্দ্র প্রহরীর মতো কাজ করেন।

এ ভাবনা আজ অপ্রাসঙ্গিক, কে কি কাজ করেন। ফ্যাসিবাদ কাউকেই রেহাই দেয় না। মুখর ও নীরব উভয় মানুষই এর শিকার হন। গোয়েনিকার পথ আজ রক্তস্নাত। বাস্ক পাহাড়ের এই শান্ত সুন্দর গ্রামে এরকম হবার কোন কথাই ছিল না। জায়গায় জায়গায় বন্দিশিবিরে আজ শিল্পী ও বিজ্ঞানীরা বন্দিদশা কাটাচ্ছেন। এ এক অন্ধকার যুগের অভ্যুত্থান।

শিল্পী যারা, পক্ষ তাদের নিতেই হবে। ঠিক করতে হবে, স্বাধীনতার জন্য লড়াই করবেন নাকি ক্রীতদাস প্রথার জন্যে। আমি আমার পথ বেছে নিয়েছি। আমার কোন বিকল্প নেই। মানুষের অবমাননা ভিন্ন সাম্রাজ্যবাদের জয়যাত্রা ঘোষিত হয় না। এরা জমির নিজস্ব সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে। সব দেশে রয়েছে এরা। একজন দু'জনের মধ্যে কথা বলে। আইনের সমান অধিকারকে বুড়ো আঙুল দেখায়। মানুষের সাম্যের অধিকারকে বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেয় না। অন্ধ বিশ্বাস কিংবা ভয়ে আমি আপনাদের পাশে এসে

দাঁড়াইনি। সচেতনভাবে আপনাদেব সাথে পা মিলিয়েছি। স্পেনেব সাধাবণ মানুষ যে সবকার তাদের দেশে তৈবি কবেছেন, আমিও আপনাদের মতো সেই সবকারেবই সমর্থক।

আবাব বলছি আমি। একজন শিল্পী নির্জন কক্ষে জীবন যাপন কবতে পাবেন না। পূর্বসূবীদেব নির্মিত সংস্কৃতি আজ আক্রান্ত। একে না বাঁচালে আগামী দিনে আবও স্ফুবণ ঘটাবো কি করে আমবা? এই সংস্কৃতিব অধিকার শুধু মাত্র বর্তমান প্রজন্মের নয়। যুগ যুগান্তের। সব মানুষের এই সংস্কৃতিতে অধিকাব। আমৃত্যু একে বক্ষার জন্যে লড়াই কবতে হবে আমাদের। গণতন্ত্র ভালোবাসেন যাঁবা, তেমন প্রত্যেক শিল্পী, বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিককে এই একাত্মতাব মিছিলে সামিল কবতে হবে। বিলেতের প্রতিটি কালোমানুষও এই মিছিলে দাঁড়াবেন, এ আমাব প্রত্যাশা।

স্বাধীনতা ও সুবিচারেব প্রত্যাশায় অপেক্ষমান সকল নাবী পুরুষ শিশুর কাছে আপনাদেব এই বার্তা পৌঁছাক। স্পেনেব মুক্তি, ফাসিস্তদেব হাত থেকে স্পেনেব পুনবুদ্ধাব শুধুমাত্র স্পেনবাসীব কাজ হতে পারে না। পৃথিবীব যে কোন অগ্রণী মানবতাবাদী শক্তি স্পেনীযদেব পাশে দাঁড়াবেন।'

বোবসনেব সোভিয়েত-ভালোবাসাব কথা আগে আমরা উল্লেখ কবেছি। এ শুধু একটা ভূখণ্ডকে নৈসর্গিক সৌন্দর্যেব জন্যে ভালোবাসা নয। ঐদেশেব প্রশাসনের মানুষেব প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ও মমত্ববোধ তাকে ভালোবাসা জুগিয়েছে। তাব নানা বক্তৃতায় ও চিঠিতে এমন কি জেবাব সময় সোভিযেত প্রসঙ্গ বাববাব এসেছে। 'লাল সৈনিকেব প্রিয গান' এব একটা সংকলন ১৯৪১ সালে নিউ ইযর্ক থেকে প্রকাশিত হযেছিল। বোবসন আমেরিকায় ফিরেছেন বছব দুই হযেছে। অনুরুদ্ধ হলেন তিনি ভূমিকা লিখে দেযার জন্যে। কিছু লাইন আমবা তাব তুলে ধরছি।

'পৃথিবীব বহু দেশে শিল্প বিশেষ কবে সঙ্গীত জাতিব মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। অল্প ক'জন অভিজাত মানুষেব মনোবঞ্জনেব বিষয় হযে ওঠেছে সঙ্গীত। ওবা মনে কবেন, শিল্প ওদেব কথা মতো চলবে। ওবা যা ভালো বলবেন তা ভালো। যা খাবাপ বলবেন, তাই খারাপ।

আমেরিকাতেও মহৎ শিল্পী সত্বাব মানুষ কম বেশি বযেছেন। কিন্তু জীবনেব কোন ঝুঁকি এরা নিতে চান না।

প্রথম যেদিন সোভিয়েতে গিয়েছিলাম আমি, বিস্ময়ের সাথে দেখেছি

সাধাবণের সাথে ওদের শিল্পের প্রতিটি মহলেব কি নিবিড় আত্মীয়তা। পৃথিবীর বড় বড় সকল সুর স্রষ্টাব সিম্ফনি ওখানকাব মানুষ উপভোগ কবেন। পাশাপাশি লোকসংগীতের প্রতিও এদের গভীর ভালোবাসা। মাটি থেকে তুলে আনা সব গান। শিল্পেব নানা মাধ্যম ব্যবহাব করে মানুষেব কথা বলেন ওবা। আমেরিকাব নিগ্রো লোকসঙ্গীত জীবনের স্রোত থেকেই উৎসাবিত। জন হেনরিব ব্যালাডেব কি কোন তুলনা হয়? প্রতিবাদেব গান, বিশ্বাসেব গান, স্বপ্নেব গান-সবরকমের গানই আমাদেব মধ্যেও রয়েছে।

এসব অনুভূতিতে কথা বসিযেছেন সার্থক কাব্যকাব। সুব দিযেছেন সফল স্রষ্টাদেব অনেকে। নতুন আনন্দ, নতুন জীবন আর নতুন সমাজেব কথা দিকে দিকে ভেসে উঠেছে। কাবখানায, খনিতে যুব উৎসবেব দিনে ও আরও নানা উৎসবে দল বেঁধে মানুষ গেয়েছেন এইসব গান। লাল ফৌজ সমস্বরে দৃপ্তভঙ্গীমায এসব গান করেছেন।

আজ বলার দবকার নেই। এসব গান একসময়ে কি ভূমিকা পালন কবেছিল। লাল ফৌজের গানেব বেকর্ড আমরা শুনেছি। অনেক সোভিয়েত ছবি দেখেছি। সেই ছবিতে লালফৌজেব গানেব দৃশ্যও আমাদের চোখে পড়েছে।

এসব দেখলে বোঝা যেত, নাৎসী বাহিনীব অপ্রতিবোধ্য অগ্রগমণ কেন সোভিয়েতে এসে থমকে দাঁড়িযেছিল। সোভিযেতেব মানুষ নতুন পৃথিবীব সন্ধান দিযেছেন আমাদের। সভ্যতাকে বাঁচিযে বেখেছেন।

এই সংকলনেব গানে সোভিয়েত স্পন্দন উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত রয়েছে। সঙ্গীত দু'জন অপরিচিত মানুষকে খুব দ্রুত কাছাকাছি টেনে নিতে পারে। এই সংকলনকে আমরা তেমন কাজে লাগাতে পাবি।…'

'কমিটি অন আন-আমেরিকান অ্যাকটিভিটিজ' রোবসনকে একাধিকবাব নানা জাযগায জেরা কবেছে। প্রশ্নোত্তব পর্বে বোবসনের সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তা আমাদেব বোমাঞ্চিত কবে। সব কথা বলবাব সুযোগ এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। কিছু উল্লেখ্য অংশ আমবা পাঠকের কাছে হাজিব কবব।

১৯৪৬ সালের ৭ই অক্টোবর। কমিটি থেকে একটা অনুসন্ধান দল তৈবি করা হয়েছিল। দলের সদস্যরা রোবসনকে এই দিন ক্যালিফোর্নিয়াব ডেকে পাঠায়। জেরা কবে। জেরার ধরনটা পাঠক নিশ্চয়ই খেযাল করবেন।

কম্ব ঃ আপনি জানেন তাহলে, কি জন্যে আমবা আছি। মি. বোবসন, বহুকাল ধবেই আপনি গান ও অভিনয় করেন ?

রোবসন ঃ ১৯২২ বা ২৩ সাল থেকে।

কম্ব ঃ এই গান বা অভিনয়েব কাজে আপনি অনেকবার সোভিয়েতে গিযেছেন। তাই না ?

রোবসন ঃ ১৯২২ সালে ইউবোপে আমি প্রথম যাই। সোভিয়েতে এব পর থেকে আমি বহুবাব গিয়েছি।

কম্ব ঃ সবশেষ গিযেছিলেন কবে ?

বোবসন ঃ ১৯৩৭-এব শেষাশেষি, ১৯৩৮ এর শুরুতে গিয়েছিলাম।

কম্ব ঃ আপনাব পবিবাবে কাবা কারা বযেছেন ?

বোবসন ঃ স্ত্রী, এক ছেলে, ভাই, বোন, ভাইপো ভাইঝিরাও রযেছে।

কম্ব ঃ আপনার ছেলে কি সোভিযেতে লেখাপড়া শিখেছে ?

বোবসন ঃ আট থেকে বাবো বছর বযেস পর্যন্ত ছেলে ঐদেশে ছিল। ১৯৩৯ সাল। যুদ্ধ শুরু হল। আমি তখন লণ্ডনে। ছেলে আমার কাছে চলে আসে। লণ্ডনে সোভিয়েত স্কুল ছিল। সেখানে এসে ভর্তি হয়। বছব দেড়েক ছিল। বলতে পাবেন, গোডার লেখাপডাটা তার সোভিয়েতেই হযেছে।

কম্ব ঃ সে কি সোভিযেতেব নাগবিক ?

বোবসন ঃ সে আমেরিকায় জমেছে।

কম্ব ঃ আপনাব মতো তাবও নাগবিকত্ব তাহলে আমেরিকাবই ?

বোবসন ঃ হ্যাঁ। এখন সে কর্নেলে আমেবিকান সৈন্য দলে রয়েছে।

কম্ব ঃ অন্য কথায় আসছি। আমেবিকায কালো মানুষদের জন্যে দুটি সংগঠন রয়েছে। ন্যাশনাল নিগ্রো কংগ্রেস। ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফব দি অ্যাডভান্সমেণ্ট অফ কালারড পিপল। আপনি এই দুই সংগঠনেবই সদস্য ?

রোবসন ঃ হ্যাঁ।

কম্ব ঃ 'জযেণ্ট অ্যাণ্টি-নাজি রিফিউজি কমিটি' নামে কোন সংগঠনের কথা আপনি জানেন ?

বোবসন ঃ হ্যাঁ।

কম্ব ঃ ঐ সংগঠনের কর্মসমিতিতে ছিলেন আপনি কোন দিন ?

বোবসন ঃ না। জার্মানীতে হিটলাবেব কীর্তি শুরু হয়েছিল ১৯৩৩ সালে। আমি তখন লণ্ডনে। জার্মানী থেকে প্রচুর ইহুদী লণ্ডনে পালিয়ে এসেছিলেন। তাদেব সাহায্যের জন্য আমি প্রথম কনসার্ট করি।··· ফ্যাসিজম বিষয়ে আমি কিছু কম জানি না। এব পরিণতি কি আমি বুঝতে পাবি। আমি ফ্যাসিজম বিরোধী মানুষদের ববাববই যথাসাধ্য সাহায্য কবে এসেছি। নবওয়েতে কবেছি। ফবাসী ও স্পেনীয়দের কবেছি। আমি জানি ফ্যাসিজম কি। আবও আমায় করতে হবে।

ঐ কমিটির সভাপতি টেনি এবাব রোবসনকে জেরা করছেন।

টেনি ঃ আপনি নিশ্চয়ই মনে কবেন না একজন মানুষের কিছু টাকা থাকলেই তিনি বর্ণবিদ্বেষী বা নিগ্রোনির্যাতক হয়ে ওঠেন ?

বোবসন ঃ আমি ফ্যাসিজম-এব সংজ্ঞা দিচ্ছিলাম। মানুষেব মধ্যেকাব পশু-প্রকৃতিকে আমি ফ্যাসিজম বলতে চাইনি। সমাজে একটা অংশ আছে যারা সামাজিক পবিবর্তনের বিরুদ্ধে। পুবানো ধ্যান ধারণা টিকিয়ে বাখতে চায। এবাই ফ্যাসিবাদেব সমর্থক। ইউবোপে মানুষ পবিবর্তন চাইল। ফ্যাসিবাদীরা বলল, না। আমাব ধারণা, আমাদেব দেশেও এখন এই অবস্থা চলছে···

টেনি ঃ আপনি কি কমিউনিষ্ট পার্টিব সদস্য ? আমি সবাইকেই একথা জিজ্ঞেস করি। আলাদা কবে কিছু মনে কববেন না (হেসে)।

রোবসন ঃ না, মনে করছি না কিছু। এতোবাব শুনেছি এই প্রশ্ন যে আজ আর কিছুই মনে হয় না। সকল সাংবাদিকেবা দেখা হলেই জিজ্ঞেস করে। আমি আপনাকে উত্তব দেব। যদিও আপনি আমায জিজ্ঞেস করতে পারতেন, আমি বিপাবলিকান বা ডেমোক্রেটিক দলেব সদস্য কিনা। যদ্দুর জানি, আমেবিকায় কমিউনিষ্ট পার্টি করার কোন আইনি বাধা নেই। আমি মূলতঃ ফ্যাসিবিরোধী ও স্বাধীন। চাইলে আমি রিপাবলিকান, ডেমোক্রেটিক কিংবা কমিউনিষ্ট—যে কোন দলেই যোগ দিতে পাবি। না। আমি কমিউনিষ্ট নই।

টেনি ঃ আপনি নন ? অবশ্য আপনার কথাবার্তা থেকে মনে হয় রিপাবলিকান বা ডেমোক্রেটদেব চেয়ে কমিউনিষ্টদের আপনার পছন্দ বেশি।

রোবসন ঃ আমি কথাটা যেমন করে বলতে চাই শুনুন। আমি বলেছি শুধু, যে কোন এক দলে চাইলেই আমি যোগ দিতে পারি। হঠাৎ করে কমিউনিজমকে খারাপ বলার পেছনে তো কোন যুক্তি দেখি না। পৃথিবীর বহু দেশে বহু মানুষ এই ব্যবস্থাকে আহ্বান করছেন—আমরা তো দেখতেই পাচ্ছি। আমি মনে করি এই গ্রহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে না চাইলে আমেরিকাকেও একথা বোঝা উচিত। কমিউনিস্টদের সাথে নিয়ে চলার দিন ওদেরও এসেছে।

সাংবাদিকরা কেমন করে উত্ত্যক্ত করতেন রোবসনকে, সেকথা একটু আগে রোবসনের মুখেই আমরা জেনেছি। সোজাসুজি বলতেন তিনি, ইউরোপ সফরের সব কথা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস, ইউনাইটেড প্রেস ও আমেরিকান প্রেস বিকৃত করে ছাপায়। অর্ধেক কথা লেখে আমার। বাকি কথা মুছে দেয়।

একবার কাগজে বেরোল। মস্কোতে গিয়েছেন রোবসন। সেখানে তিনি বলেছেন, পৃথিবীর যে কোন দেশের চেয়ে রাশিয়াকে তিনি সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন।

জানতে পেরে ক্ষুব্ধ রোবসন। অর্ধসত্যের নির্লজ্জ দৃষ্টান্ত। ডেলি ওয়ার্কার-এর সাংবাদিক আর্ট শিল্ডন সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলেন রোবসনের। সেখানে বললেন খোলাখুলিভাবে।

'যে আমেরিকার সঙ্গে আমি একাত্মতা অনুভব করি তাকে আমি ভালোবাসি। ওয়ালস্ট্রিটের আমেরিকা আমার দেশ নয়। শ্রমজীবী মানুষের আমেরিকাকে আমি ভালোবাসি। আমি ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও পৃথিবীর প্রতিটি দেশের শ্রমজীবী মানুষকে সমান ভালোবাসি। পূর্ব ইউরোপের গণতন্ত্র ও সোভিয়েতকে ভালোবাসি। স্বাধীনতার যুদ্ধে ওদের আত্মত্যাগ আমার শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছে। ওরা আমাদের জন্য লড়াই করছেন। সারা পৃথিবীর শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের জন্যও লড়াই করছেন।' দেশপ্রেমের খামতি ছিল রোবসনের মনে ? মাথা উঁচু করে জবাব দিয়েছেন রোবসন, 'আমি মনে করি, আমি একজন সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। সে-ই সত্যিকারের দেশপ্রেমিক যে নিজের দেশের অপরাধকে ক্ষমা করে না। দেশের ভেদবুদ্ধিকে প্রকাশ্যে তিরস্কার করার ক্ষমতা রাখে।'

১৯৪৭ সালের ৭ই অক্টোবর 'আন আমেরিকান কমিটি' রোবসনকে জেরা করে। তার বেশ খানিকটা অংশ আগে আমরা দিয়েছি। এক বছরও যায়নি।

১৯৪৮ সালেব ৩১শে মে আবাব শমন। কাঠগড়ায দাঁড়াতে হবে। কমিটিব কর্তাদেব উত্তর দিয়ে তুষ্ট কবতে হবে।

বছব ঘুবতে না ঘুবতেই আবও বেশি কঠোব, আরও দৃঢ়চেতা বোবসন। ব্যঙ্গ কববার স্পর্ধাও অর্জন করেছেন। আমেবিকায সাম্যবাদ কেমন চলছে জানতে চাইলে সহাস্যে জবাব দিযেছিলেন, 'সাম্যবাদীদেব ঠিকানা কোথায ? ডু পণ্ট-এর আবাসস্থলে খোঁজ কবব নাকি ?' ফার্গুসন রোবসনকে আইন ভঙ্গকাবী বললে উত্তব দিলেন তিনি, 'হতে পারে। আমেরিকার ফ্যাসীবাদীদেব বিবুদ্ধে আমি আমৃত্যু যুদ্ধ করে যেতে চাই।'

অত্যন্ত বিবক্ত রোবসন। কাউন্সিল অফ আফ্রিকান অ্যাফায়ার্স-এব পক্ষ থেকে প্রেস বিলিজ বেবোল। ১৯৪৯ সালেব ২০শে জুলাই। গণপ্রজাতন্ত্রী জার্মানেব বোবসন সংগ্রহালযে গেলে আজও সেই বিবৃতি দেখতে পাওযা যায়। বিবৃতিটি বড়ো নয বলে আমবা অনুবাদ তুলে দিচ্ছি।

'নানা বর্ণেব মানুষদেব মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আমেবিকা ব্যর্থ। আন আমেবিকান কমিটি এখন ঠাণ্ডা যুদ্ধেব আবহকে আমেবিকান নিগ্রো মানুষদেব বিবুদ্ধে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে পরিবর্তন করতে চাইছে। ফ্যাসিবাদী কু-ক্ল্যাক্স-ক্লান এতে উল্লসিত। ফ্লোরিডা ও আরও কিছু জায়গায় এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠন বহু মানুষকে খুন করেছে। কালো মানুষদেব মধ্যে বিভেদ তৈবি করতে চাইছে এই কমিটি। কাবণ একটাই। চাকুবি, নিবাপত্তা আর বিচারের দাবি যেন কালোমানুষেবা ঐক্যবদ্ধ ভাবে কিছুতেই না কবতে পাবেন।

নিগ্রো মানুষদেব দেশপ্রেম নিযে আমাদেব কোন সন্দেহ নেই। ববংচ এই কমিটিব দেশপ্রেম সন্দেহাতীত নয। দেশেব মানুষদেব মধ্যে অন্তর্কলহ জিইযে বাখাব দক্ষতা কি দেশপ্রেমিকেব লক্ষণ ?

মনবো আব জর্জিয়াতে মাসিও স্নিপস ও রবার্ট মিলার্ড দম্পতি 'লিঞ্চিং' এব শিকার হয়েছেন। বাবো জন সন্তানেব জননী ছিলেন বোজা লি ইনগ্রাম। তাকে ও তাব দুই সন্তানকে জর্জিয়ার জেলখানায় আজীবন বন্দি করে বাখা হযেছে। অপরাধ কি ? মা ইনগ্রাম তাব আত্মসম্মান রক্ষায ব্রতী হযেছিলেন। রাজধানীর দৈনন্দিন জীবনে আজ কালো মানুষদের কোন দাম নেই। প্রতিটি যুদ্ধবাজ ফ্যাসিবাদী সংগঠন আজ উৎসাহিত। মানুষকে পিটিযে মেবে ফেললেও 'আন আমেবিকান কমিটি' নির্বাক। প্রশাসন ও আইন বিভাগ দেশে আছে বলেই মনে হয় না।

আমবা স্বাধীনতার জন্য লডাই কবি। 'ঘোটো' জীবনদশা থেকে আমবা মুক্তি চাই। মানুষের মর্যাদা বক্ষাব অভিপ্রাযে আমরা শান্তিব যুদ্ধে অগ্রসব হই। প্রতিটি আমেরিকাবাসীর নাগরিক ও সাংবিধানিক অধিকাব রক্ষার জন্য এই লড়াই। তিনি সাদাই হোন আর কালোই হোন। এই যুদ্ধে জিততে চাইলে আমাদেব চাই শান্তি। বিদেশেব মাটিতে যুদ্ধবাজ সাজতে চাইনা আমবা।

পৃথিবীব কোন দেশই আজ পর্যন্ত আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তা ভঙ্গেব হুমকি দেযনি। নিগ্রো আমেরিকার মানুষদেব জীবন, স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকাবেব প্রতি সোভিয়েত শ্রদ্ধাশীল। হুমকি আসছে ভেতব থেকে। এই হুমকি পর্যুদস্ত কবতে চাইলে কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্ট নির্বিশেষে সকল আমেরিকাবাসীকে এক হতে হবে। আমাদেব জীবন বিপন্ন করে তুলছে যাবা, কমিটিব চোখে তারা নিবপবাধ। আমি আমাব আক্রান্ত ভ্রাতাদেব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইনা। আমি আমেবিকায় গণতন্ত্র, শান্তি ও স্বাধীনতাব লড়াইয়ে সর্বতোভাবে দায়বদ্ধ।'

আমেরিকাব বিবুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ধ্বনিত হয়েছে পল রোবসনেব অনেক লেখা ও বক্তৃতায়। ১৯৫২ সালে 'ফ্রিডম' কাগজে লিখছিলেন 'হিযাব ইজ মাই স্টরি'। একটি অংশেব শিবোনাম দিলেন, 'হুইচ সাইড আব উই অন ?' মার্কিন বিদেশনীতিব তীব্র নিন্দা কবেছেন বোবসন। একটার পব একটা উদাহরণ দিযে চোখে আঙুল দিযে দেখিযেছেন তিনি। কোবিয যুদ্ধে মিলিটাবি পাঠিয়েছিল আমেবিকা। সত্যেব পক্ষে লড়বে। অসহাযেব পাশে দাঁড়াবে। অথচ দেখেছি কি আমরা ? বলছেন রোবসন, ' আমেরিকান সৈন্যরা পশুর মতো কাজ কবেছে। মায়েদের সম্মান হবণ কবেছে। শিশু হত্যা কবেছে। বন্দিদেব পেছন থেকে কাপুবুষেব মত গুলি কবে মেবেছে। নিউইযর্ক শহরের কংগ্রেস সভ্য অ্যাডাম পাওয়েল ঘুবে এসে বলেছিলেন 'আমেরিকা পৃথিবীব সবচেযে বেশি ঘৃণ্য জাতি'। খুব কি ভুল বলেছিলেন' ?

১৯৫০ সালের ৪ঠা আগষ্ট কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে পল বোবসনের পাশপোর্ট কেড়ে নেযা হল। আর দেশের বাইবে যেতে পাববেন না তিনি। বিদেশে যেতে না দেয়াটা ওদেব যেন কর্তব্য কর্মের মধ্যে পড়ে। আইনস্টাইন, পাউলিংকে পর্যন্ত হেনস্তা করেছেন ওবা। বাইরে যেতে বাধা দিয়েছেন।

বিশ্বখ্যাত ৩৪ জন বিজ্ঞানী 'বুলেটিন অফ অ্যাটমিক সায়েণ্টিস্টস' এর বিশেষ এক সংখ্যায় মার্কিন পাশপোর্ট নীতিব তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। নেতৃত্বে ছিলেন আইনস্টাইন। তার সাথে আমেরিকা, বৃটেন, ইতালি, ফ্রান্স মেক্সিকোর অ্যারও অনেক বিজ্ঞানী সই করেছেন। অভিযোগ পরিষ্কাব। মার্কিন সবকাব বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ও বাজনীতিব স্বাধীনতা হবণ কবছেন।

বিজ্ঞানীদের এই প্রতিক্রিযাকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন রোবসন। প্রিন্সটনে এক দু' বার আইনস্টাইন ও রোবসনের সাক্ষাৎ হয়েছে। কথা হযেছে। আইনস্টাইন তার অভিনয দেখেছেন। গান শুনেছেন। 'ওথেলো' দেখাব পর গ্রীনরুমে এসে প্রশংসা করে গিযেছিলেন।

১৯৫৬ সাল। তখনও রোবসন পাশপোর্ট পাননি। আবার সেই 'আন আমেবিকান…' কমিটি। ১২ই জুন তাবিখে ডেকে পাঠিযেছে রোবসনকে। জেবা কবা হবে তাকে। সত্য প্রকাশ কববে মার্কিন প্রশাসন! কিছু নির্বাচিত সংলাপ আমবা এই নিবন্ধে যোগ করব

পাশপোর্ট আটকে বাখা কেন ? দেশে কমিউনিস্টদের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। ব্যবসা কিংবা বেডানোব নাম কবে কমিউনিস্টবা ক্রেমলিনে যাচ্ছে। সভা কবছে গোপন। আমেবিকা ধ্বংসেব ফন্দি আঁটছে। এই কোপে বোবসনও পডেছেন। কমিটিব একজন সদস্য অ্যাবেন্স। জিজ্ঞেস করছেন রোবসনকে। ১৯৫৪ সালেব জুলাই মাসে পাশপোর্টের দরখাস্ত জমা দেবাব সময় পল কি লিখেছিলেন তিনি কমিউনিস্ট নন ?

উত্তব খুব সোজা। কোন শর্তেই এ জিনিস রোবসন লিখবেন না। আমেবিকার কোন আইন-ই এ জিনিস চাইতে পাবে না।

অ্যারেন্স : তাব মনে আপনি লেখেননি।

রোবসন : না। সেদিন লিখিনি। আগামীদিনেও লিখব না। এই বিষযে অন্ততঃ নিশ্চিত থাকতে পাবেন।

বহুকাল আগেব সেই প্রশ্নের পুণরাবৃত্তি।

অ্যাবেন্স : আপনি কি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ?

পাঠক বোবসনেব উত্তর খেযাল কববেন।

বোবসন : কমিউনিস্ট পার্টি মানে কি ? কি বোঝাতে চাইছেন ? কমিটির অন্য সদস্য স্কেরাব। সোজাসুজি উত্তব দিতে বললেন রোবসনকে।

রোবসন : কমিউনিস্ট পার্টি বলতে কি বুঝেন আপনারা ? যদ্দুর জানি,

রিপাবলিকান ডেমোক্রেটিকের মতোই এটিও একটি আইনি পার্টি।
সাধারণ মানুষেব জন্যে যাবা আত্মত্যাগ কবেছেন, সেই পার্টিব
কথা কি জানতে চাইছেন আপনি ?

নাছোড়বান্দা অ্যাবেন্স। এখন কি আপনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ?

রোবসন ঃ ভোট দেবার পব ব্যালট বাক্স ভেঙ্গে আমার ব্যালট পেপাবটি
দেখতে পারেন।

এমন বাঁকা উত্তর কার ভালো লাগে। রোবসন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সংবিধানের পঞ্চম সংবিধানেব মতে তিনি উত্তব না দিতে পাবেন। কবলেনও বোবসন তাই। বাববাব বলা সত্ত্বেও 'হ্যাঁ', 'না' কিছুই বলেননি। ছোট্টখাট্ট বক্তৃতা করছিলেন বাববাব। বিবক্ত হয়ে স্কেবাব বললেন, 'না, আব পাবছি না। কতো আব বক্তৃতা শুনব।'

অ্যারেন্স ঃ কমিউনিস্ট পার্টিতে আপনাব নাম জন থমাস। একথা আপনি
কি স্বীকাব কবেন ?

রোবসন ঃ বার বাব বলছি। আমি জবাব দিতে বাধ্য নই।

অ্যাবেন্স ঃ আপনি কি নাথান গ্রেগরি সিলভাবমাস্টাবকে চেনেন ?

বোবসন হাসছেন।

স্কেরার ঃ এ হাসির বিষয় নয়।

রোবসন ঃ আমার কাছে হাসিব ব্যাপার। বোকা বোকা।
ক্ষুব্ধ সভাপতি বলছেন রোবসনকে, সবুব করুন। বোকা বোকা
ব্যাপার কেটে গিয়ে আসল কাহিনী বেব হবে।

ভীত নন বোবসন। তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন। আমিওতো ঠিক তাই চাই। আসল কাহিনী বেরোক। মানুষ চিনুক, কে আপনারা।

আবার প্রশ্ন। নাথান গ্রেগরিকে কি চেনেন বোবসন ? উত্তব বারবাব তাব একই। **I invoke the fifth amendment.** স্কেরার মাঝে বলে ওঠলেন, বোবসনের গলা আমি শুনতে পাচ্ছি না।

মজা কবলেন নির্ভীক বোবসন। 'জানেন তো আমি অভিনেতা। দর্শকের অনুবোধে গলাব সববকম কাজই করতে পাবি'। হুবহু অনুবাদ দিলে ক্রুদ্ধ পাঠক এক চমৎকাব হাস্যবসেরও উপাদান পেতেন। একটার পব একটা নাম পড়ে যাচ্ছেন কমিটির মাননীয় সদস্যবৃন্দ। বোবসন বাব বাব বলে যাচ্ছেন, **'I invoke the fifth amendment'**।

সবশেষে জিজ্ঞেস কবলেন অ্যারেন্স। ম্যানিং জনসন বলে কাউকে চেনেন ?

শুনুন বোবসন। ১৪ই জুলাই জনসন এক বিবৃতি দিয়েছেন। পড়ে দিচ্ছি। গড়গড় কবে পড়লেন অ্যাবেন্স। মোদ্দাকথা এই, পল বোবসন বহুকাল ধবেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। কিন্তু বিষয়টা গোপন রাখতে বলা হযেছিল। অন্যতম সদস্য হিসেবে জনসন বোবসনকে অনেক কাল ধবেই চেনেন। প্রতিবাদ করলেন বোবসন। আনা হোক জনসনকে কমিটির সামনে। বোবসন জেরা কবতে চান।

ওপথে হাঁটলেন না অ্যাবেন্স। জানতে চাইলেন বোবসনের কাছে। কমিউনিস্ট 'ষড়যন্ত্রে' জনসনেব মতো তিনিও লিপ্ত ছিলেন কি না।

আবাব বোবসন **fifth amendment** উচ্চাবণ কবলেন। কিছুক্ষণ চলল এসব। বোবসন 'এক কথা'ব বেশি উত্তব দিচ্ছেন না। অ্যাবেন্স বললেন, ম্যাক্স ইয়েবসান বলে একজনও জনসনের মতো বিবৃতি দিয়েছেন।

উত্তেজিত বোবসন। এদেব সামনাসামনি ডাকা হচ্ছে না কেন ? কমিটির ছলাকলা চলতেই থাকে। পৃথিবীতে এধরনেব কথোপকথন খুব বেশি খুঁজে পাওয়া যাবে না। আগ্রহী পাঠক পুবো জবানবন্দিটি পড়ে দেখবেন।

থমাস ইয়ুং বলে এক ভদ্রলোক। জাতিতে নিগ্রো। গাইড পাবলিশিং কোং-এব সভাপতি। বোবসনকে অপদস্থ কবার জন্য তৈরি থাকতেন সব সময। অ্যাবেন্স তারও একটা বিবৃতি জোগাড় করেছেন।

'কেমন মানুষ পল ? সোভিয়েত আমেরিকা আক্রমণ করলেও নিগ্রোরা সোভিযেতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাবে না। নিগ্রোদের সাথে এখন রোবসনের আর কোন যোগাযোগ নেই। সাধারণ নিগ্রোরা রোবসনকে বুঝেনা। আমি নিজে শুনেছি বলতে তাকে, আমেরিকাব প্রতি তাব কোন আনুগত্য নেই। নিগ্রোবা এই লোকটিকে অবিশ্বাস কবে।'

এবকম হঠকারী চরিত্র ইতিহাসেব নানা মুহূর্তেই আমরা সন্ধান পেযেছি।

অ্যাবেন্স তখনও জেবা করে চলেছেন। চেকোশ্লোভাকিযায় গিযেছিলেন রোবসন। গান কবেছেন। ছোট্ট বক্তৃতা দিযেছেন। নিজেকে তিনি প্রগতিশীল আমেবিকা ও বিচাবাধীন বাবোজন কমিউনিস্ট নেতার প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। বুক্ষ স্কেরাব উত্তেজিত। কেন বোবসন শাস্তিপ্রাপ্ত কয়েদিদেব প্রতিনিধি হিসেবে বলবেন ?

রোবসন তার বিশ্বাসে অটল। বললেনও তাকে, বুঝতেই পারছি, সংখ্যালঘু হলেও বিচারপতি ব্ল্যাকের কথাই শেষ কথা বলে গণ্য হবে।

জোর গলায় বলেছিলেন সেদিন রোবসন। এই বিচার ছিল লোক দেখানো। কাজীর বিচার। এ তিনি মানেন না।

সেই স্কেরার জিজ্ঞেস করছেন রোবসনকে। রাশিয়া অন্ত অতো প্রাণ যদি, থেকে গেলেন না কেন রাশিয়ায় ?

ঐতিহাসিক জবাব দিয়ে ছিলেন রোবসন।

'কারণ খুব স্পষ্ট। আমার বাবা ক্রীতদাস ছিলেন। আমার প্রিয়জনেরা এই দেশ তৈরিতে প্রাণ দিয়েছেন। এখানে আমি থাকতে চাই। যেমন আপনি আছেন, তেমনি ভাবেই থাকতে চাই। কোন ফ্যাসিবাদী মানুষই এ দেশ থেকে আমায় তাড়াতে পারবে না। কথাটা বুঝতে পারলেন তো ?

সোভিয়েতের সাথে শান্তি চাই আমি। চীনের সাথে শান্তি চাই। ফাসিস্ত ফ্রাঙ্কোর সাথে আমার কোন মিতালী নেই। নাৎসী জার্মানীর সাথে আমি শান্তির সম্পর্ক পাতাতে চাই না। পৃথিবীর সকল সজ্জন মানুষের সাথে আমার বন্ধুত্ব হোক, এই আমি চাই।

দুর্বিনীত স্কেরার জবাব দিচ্ছেন, 'তার মানে তো আপনি এই দেশে কমিউনিস্ট ভাবনা ছড়াতে চাইছেন।'

ছোট্ট তীক্ষ্ন উত্তর দিলেন রোবসন, 'আপনাদের নানা কমিটিতে যে নিও-ফাসিস্ত ধারণা তৈরি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে আছি।'

অ্যারেন্স ঃ যখন মস্কোতে ছিলেন, স্তালিনের প্রশংসা করেছিলেন ?

রোবসন ঃ খেয়াল নেই।

অ্যারেন্স ঃ স্তালিনকে কখনও প্রশংসা করেছিলেন, মনে আছে ?

রোবসন ঃ সোভিয়েতের লোকদের সম্পর্কে আমি অনেক কথা বলেছি, পৃথিবীর মানুষের জন্যে এরা যুদ্ধ করেছেন।

অ্যারেন্স ঃ স্তালিনের প্রশংসা করেছেন ?

রোবসন ঃ খেয়াল নেই।

অ্যারেন্স ঃ স্তালিন সম্পর্কে এখন কি আপনার ধারণা বদলেছে ?

রোবসন ঃ স্তালিনকে নিয়ে যা ঘটেছে, সবই সোভিয়েতের নিজেদের বিষয়। যাদের পূর্বপুরুষ ছয় থেকে দশ কোটি ক্রীতদাসের জীবনের বিনিময়ে আমেরিকা নির্মাণ করেছে তাদের বংশধরদের সঙ্গে এ নিয়ে

আমি বিতর্ক চালাতে বাজি নই। তোমবা আর কারও বিষযে দযা কবে জিজ্ঞেস কবো না।

অ্যাবেন্স ঃ আমাদের বলুন, সম্প্রতি স্তালিন বিষয়ে কি আপনাব মত পাল্টেছে ?

রোবসন ঃ মহাশয়, এবিষযে যা বলবাব বলেছি। আমাব ছ' কোটি লোকেব হত্যাকাবীদেব সঙ্গে স্তালিন বিষয়ে কথা বলতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

কমিটি বিষযে আবও বিষোদ্গাব কবেছেন তিনি সামনাসামনি। এক প্রশ্নেব উত্তবে জানাচ্ছেন, 'শান্তি প্রতিষ্ঠায সোভিয়েত ও গণপ্রজাতন্ত্রী চীনেব ভূমিকা প্রশংসনীয। শুনেছি, আমাদেব রাষ্ট্রপতিও নাকি একই দলেই আছেন। সত্যি হলে এব চেয়ে ভালো কিছু হয় না। অবশ্য আপনাদেব মতো লোকেবা যারা নানা কমিটিতে বযেছেন তাবা যদি না এই প্রচেষ্টা বানচাল কবে দেন।' ঐ জেরাব সময়ে বোবসন একটা লিখিত বিবৃতি পড়তে চেয়েছিলেন। পড়তে দেয়া হযনি তাকে। ১৯৭৬ সালে পল বোবসন সংগ্রহশালা থেকে 'পল রোবসন ট্রিবিউটস, সিলেক্টেড বাইটিংস' বইটিতে ঐ বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়েছে। বিবৃতির শেষ ক'টি লাইন বলছি আমরা।

'কোন ষড়যন্ত্রেব সাথেই আমি লিপ্ত নই। একথা জলের মতোই সহজ। যদি সবকাব আমার বিরুদ্ধে সত্যিই কোন অপবাধ খুজে পেতেন তবে আমাকে এতোদিনে জেলখানায ঢুকিযে দিতেন। সকল সাধাবণ মানুষ ও নিগ্রো মানুষেবা নিশ্চয়ই এই সবল সত্য অনুভব করতে পাবছেন। ১৯৪৬ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় ওরা আমাকে একবাব জেবা কবেছিল। বলেছিলাম সেদিন, আমি কমিউনিস্ট পার্টিব সদস্য নই। এর মধ্যে কোন বহস্য নেই। এমন কোন কথা আমি বলতে বাজি নই যা একজন সাধাবণ আমেবিকাবাসী যে সাংবিধানিক অধিকাব উপভোগ করেন তাব বিবুদ্ধে যায়'। শেষপর্যন্ত ১৯৫৮ সালে সুপ্রিম কোর্টেব নির্দেশে রোবসন পাশপোর্ট ফিবে পান।

আমাদেব দেশে পল বোবসন ববাবরই শ্রদ্ধাব আসন দখল কবে আছেন। সাধাবণ ভাবতীয় তার সংগ্রামী সত্ত্বাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখেন। ১৯৫৮ সালে লেখা এক কবিব কবিতা দিয়ে নিবন্ধ শুবু কবেছিলাম। সেই সালেই আমাদেব দেশে শ্রীমতি ইন্দিবা গান্ধী 'পল বোবসন দিবস' উদযাপনেব জন্য একটা 'জাতীয কমিটি' তৈবি করেছিলেন। বোবসনের সাথে এই একাত্মতা

ছিল অন্য কাবণে। বর্ণবিদ্বেষবিরোধী লড়াইয়ে রোবসন অগ্রণী সৈনিক। দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে তার রয়েছে বহু কাজ। আমাদের মহাত্মা গান্ধী একসময য আফ্রিকা থেকে বিতাডিত হযেছিলেন। কমিউনিস্ট বোবসনেব সাথে গান্ধী কিংবা নেহরু পরিবাবের সদ্ভাব থাকার আব কোন কাবণ নেই। আরও একটা বিষযও পাঠককে খেয়াল রাখতে বলি। কিছুদিন পবই কেবালায় দেশেব প্রথম কমিউনিস্ট সবকাবকে ভেঙ্গে দেওয়া হল। নেহরু পরিবাব যে কমিউনিস্ট বিদ্বেষী নন, একথা প্রমাণেব জন্য সে সময রোবসন সম্বর্ধনাব প্রযোজন ছিল।

আমাদেব দেশে আমেবিকা থেকে যাবা প্রতিনিধি ছিলেন তাবা বিষয়টাকে ভালো চোখে দেখেননি। 'আমেবিকাব চোখে বোবসন একজন কমিউনিস্ট। তার বন্দনা করলে আমেবিকা খুশি হবে না'। অনেকদূব এগিযে গিয়েছিলেন জাতীয় কমিটি। ফেবা যায় না। তবে সান্ত্বনা দেওযা হল আমেবিকার প্রতিনিধিকে। আকাশবাণী কিংবা খববেব কাগজে তাব জন্মদিন নিযে হৈচৈ করা হবে না বিশেষ। একটা কাগজ গুরুত্ব দিয়েছিল খুব। 'ব্লিৎজ পত্রিকায বড়ো মাপেব লেখা বেরিয়েছিল আকর্ষণীয শিরোনামে, 'ভযেস অফ ব্ল্যাক গড'।

১৯৪৯ সালে নেহরু আমেরিকাব অতিথি হয়ে সে-দেশে গিয়েছিলেন। ট্রুম্যান তখন বাষ্ট্রপতি। নেহরু বোবসনেব সাথে কথা বলতে চেয়েছিলেন। 'বাষ্ট্রপতিব অতিথি'র সাথে দেখা করেননি রোবসন। সালটা পাঠক খেযাল করবেন। মার্কিন প্রশাসনেব জেবায় জেবায ক্লান্ত ও বিবক্ত বোবসন। ভাবতবর্ষেও এসময় কমিউনিস্টবা লাঞ্ছিত হচ্ছেন। হযতো এই সংবাদও তাব দেখা না কবাব অন্যতম কাবণ হতে পাবে।

নেহরুকে বোবসন চিনতেন বহুদিন থেকেই। স্পেন ঘুবে লণ্ডনে এসেছেন নেহরু। সাথে কৃষ্ণ মেনন। লণ্ডনের কিংসওযে সভাকক্ষে 'ইণ্ডিযা লীগ' এক সভাব আযোজন কবে। পবাধীন ভাবতবর্ষেব মুক্তিব দাবিতে সেদিনেব সভায বোবসনও বলেছিলেন।

১৯৫৮ সালেব ১০ই মে সুপ্রিম কোর্টেব নির্দেশে পাশপোর্ট ফিবে পেলেন বোবসন। লণ্ডন, প্রাগ, বার্লিন ও সোভিযেতে গেলেন। বছর পাঁচ নানা কাজে ডুবেছিলেন তিনি। ১৯৬৩ সালে আবাব স্বদেশে ফিবে এলেন। বাণিজ্যিক কাগজ বহু পবীক্ষিত বোবসনকে নিয়ে ব্যঙ্গ কবেছিল সেদিন।

'নিউইয়র্ক টাইমস'এর ভাষা ছিল, 'অবসর নিতে বোবসন আমেরিকা যাচ্ছেন'। কথাটাব নানা মানে। জন্মভূমি আমেবিকা যেন রোবসনের নয়। ধীবে ধীবে শবীব তাব ভেঙ্গে পড়তে থাকে। দীর্ঘ জীবনসঙ্গিনী এসলান্ডা ১৯৬৪ সালে চিরবিদায় নিলেন। ১৯৭১ সালে জীবনের অকৃত্রিম বন্ধু লবেন্স ব্রাউনের জীবনাবসান। যারা তাকে ঘৃণায দূবে ঠেলেছিলেন তাদেব কেউ কেউ প্রায়শ্চিত্ত কবছিলেন। 'নিউইয়র্ক টাইমস' ১৯৫৮ সালে 'হিয়াব আই স্ট্যান্ড' বইটিব বিষয়ে একটি লাইনও ছাপাযনি। ১৯৭১ সালে নতুন কবে বেরোলে সমালোচনাব যোগ্য (!) বলে বিবেচিত হয। ১৯৭৫ সালে হৃৎযন্ত্রে অসুবিধে বোধ কবেন। ১৯৭৬ সালের ২৩শে জানুযারি ৭৭ বছব বয়েসে রোবসন আমাদের ছেড়ে চলে যান।

সকল মানুষের মৃত্যুতে পৃথিবী বিষণ্ন হয না। পৃথিবীব সকল মানুষেব আপনার জন হিসেবে নিজেকে প্রমাণ দিতে হয়, দিয়েছিলেন পৃথিবীব অল্প ক'জন মানুষ। নিঃসন্দেহে পল তাদেব অন্যতম। তার কণ্ঠের 'জন ব্রাউন', 'জো হিল' কিংবা 'নদীর গান' কোনদিন কারও কাছে বিবর্ণ হবে না। স্পেনের 'আন্তর্জাতিক বাহিনী'ব সেনানীদেব মন প্রাণ দিয়ে গান শোনাতেন তিনি। সেই গানেব কলি আমাদের অন্যতম প্রিয় কবি শঙ্খ ঘোষের অনুবাদে পাঠকের কাছে হাজিব কবছি।

এই আমাদের দেশের প্রবল, এই আমাদেব দেশেব নবীন
এই আমাদেব দেশেব মহান গান এখনো হয়নি গাওয়া…
প্রতারণাব ভিতর থেকে, কোলাহলের ভিতব থেকে
হত্যা এবং অত্যাচাবের ভিতব থেকে
ফাঁপা কথাব ভিতব থেকে, দেশোদ্গাবেব ভিতব থেকে
অনিশ্চয় আব দোলাচলেব ভিতব থেকে…
জাগবে আবাব গান।
জাগবে আবার সেই আমাদেব অভিযানের গান,
প্রিয সুবের মতো সহজ, উপত্যকাব মতো গভীব
পাহাড়চূড়ার মতো উঁচু এবং তাদেব মতোই প্রবল
বানায যারা সেই আমাদের গান!

একশো বছবে পল আমাদের এই বাংলাদেশে অল্পবিস্তর চর্চিত হযেছেন। হয়তো আরও বেশি কাঙ্খিত ছিল। ফ্যাসিবাদ আমাদের মাটিতে আমবা

কখনও দেখিনি। দেখতেও চাই না। মাঝে মাঝে কোথাও তার হিংস্র পদচাবণা অনুভূত হয়। 'পিকস্কিল' এদেশের মাটিতে এখনও হয়নি। দেশেব এক মহানগবে প্রতিবেশী দেশেব খ্যাতিমান শিল্পীকে গাইতে দেওয়া হয না গান। বাংলাবই এক মফস্বল শহবে চিৎকৃত স্বরে বলে যায এক সংকীর্ণমনা, 'ওঙ্কারনাথ ঠাকুব তাব সঙ্গীত ঈশ্ববেব কাছে নিবেদন কবতেন, ফৈয়াজ খাঁ মানুষের মনোবঞ্জনেব জন্য গাইতেন। দুই শিল্পীব জাতেব বিষয়ে ভাবতেই হবে আমাদের'।

এবকম সংলাপে ভয হয়। ভয় হয কেন না দেশের এক কোণায় হাতুড়ি আব ছেনিব ঘা-য়ে তৈবি হচ্ছে নবমেধ স্থাপত্য।

এই সময়ে যে ক'জনেব কাছে বাববার যেতে পারি, তার একজন পল রোবসন।

———

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা ঃ অরুণ মিত্র

রাম রায়

॥ ১ ॥

সৃজনশীল শিল্পী মাত্রেরই মানস পটে শৈশব-কৈশোর থেকে এমন কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য জ্ঞাত-অজ্ঞাতসারে কাজ করে যা সঠিক পরিবেশে সঠিকভাবে লালিত হয়ে ধীরে ধীরে পরবর্তী জীবনে শিল্পী-ব্যক্তিত্বে এক মূর্তরূপ ধারণ করে। ব্যক্তি-চৈতন্যে সেই সব অভিঘাত থেকেই সৃষ্টি উৎসারিত হয় এবং বহির্জগতের নানা অভিজ্ঞতার স্পন্দনে স্ব-সৃষ্টি প্রবাহিত হয়। কবি অরুণ মিত্র এক সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব। সুতরাং তাঁর ক্ষেত্রেও এ-সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। এই প্রসঙ্গে 'আমার জীবন আমার সময়'—শীর্ষক কথিকা (আকাশবানী, কলকাতা) কবির সম্পর্কে অনেক তথ্য দেয়। এ-তথ্য অনেকেরই জানা। এইখানেই নিহিত আছে তাঁর কাব্য-ভাবনার পটভূমি ও সূচনা। যশোরের গ্রাম্য পরিবেশ, দুঃসাহসী-সাহিত্যানুরাগী-মনন পন্থী বন্ধু-বান্ধবদের অনুষঙ্গ, মামাবাড়ির সাংস্কৃতিক পরিবেশ কিভাবে তাঁকে লালিত ও অনুপ্রাণিত করেছিল সেকথা তো তিনি আমাদের বারবার শুনিয়েছেন। কার্যত সাহিত্য যে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, জীবনের অভিঘাতেই শুধু কবিতা নয় যে-কোনো সৃজনশিল্পের জন্ম হয় এই বিশ্বাসের ভিত সেই সময়ে অরুণ মিত্রের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। সাহিত্যিক কেউ নন, তিনি সর্বসাধারণেরই এক বিশেষ প্রবণতা ও ক্ষমতার অধিকারী অংশ এ-বোধও সেই সময় সঞ্চারিত হয়েছিল। এইভাবে অরুণ মিত্রের কবিব্যক্তিত্ব একটা বিশ্বাসে, একটা বোধে লালিত হতে থাকে কৈশোর থেকে। কিশোর বয়স থেকেই কবিতার প্রতি গভীর আকর্ষণে তাঁর কবিতাচর্চা শুরু হয় এক ভাব তন্ময়তার মাধ্যমে। তাই বলে ওঠেন—'বাঙালী ছেলের মতো আমারও প্রথম প্রেম রবীন্দ্রনাথ।' রবীন্দ্রনাথের কবিতায় যিনি আচ্ছন্ন হন তাঁর আত্মমগ্নচৈতন্যের স্বরূপ কেমন তা সহজেই বোঝা যায়। এইজন্যই আজন্ম লালিত অন্তর্মুখীন জীবনবোধ, পল্লিশ্রী সৌন্দর্যে ঘেরা মনন, বিশ্বপ্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শে মানুষকে মিলিয়ে ফেলার আগ্রহী-সত্তা প্রাথমিকভাবে

জল পেয়েছে রবীন্দ্র-জীবনানন্দ থেকে। বলা যায—এই সময় থেকে তাঁর কবি-ব্যক্তিত্বে পবিবেশ সচেতনতাব সঙ্গে আত্মমগ্নতাব মেলবন্ধন গডতে থাকে। তাছাড়া ধ্রুপদী সঙ্গীতের প্রতি যাঁব এমন গভীব অনুবাগ তাঁর জীবনচর্যায় ও কাব্যচর্চায ধ্রুপদী-মূর্ছনা বা স্পন্দন থাকাটা স্বাভাবিক। এ-বোধ তাঁব চৈতন্যলোককে ভিন্নতব এক আঙ্গিকে গঠন কবেছে। সমালোচকেরা যে যাই বলুন অবুণমিত্রের কাব্যবর্চায় এক সাঙ্গীতিক প্রভাবকে অস্বীকার কবে তাঁর কাব্য-বিশ্লেষণ অনেকটা অসম্পূর্ণ থেকে যায। এ-সত্য এই আলোচক ব্যক্তিগত-ভাবে বাব বাব অনুভব কবেছে তাঁর সঙ্গে নানা আলোচনায়, নানা প্রশ্নেব উত্তবে। এই প্রসঙ্গে তাঁর ফবাসী ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ বিশেষভাবে স্মবণযোগ্য। কেননা তা তাঁব কবি হযে ওঠার ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান হিসেবে কাজ কবেছে। এইভাবেই অবুণ মিত্র কর্মজীবনপূর্ব ছাত্রজীবনে নিজস্ব কাব্য-ভাবনাব পটভূমি তৈরি করেছিলেন।

অবুণমিত্রের পরবর্তী জীবন তো কর্মজীবন—আনন্দবাজাব পত্রিকায যোগদান। এই পত্রিকায কর্মবত জীবনই তাঁকে কবি হয়ে ওঠার প্রত্যয জুগিযেছে। জ্বলন্ত অভিজ্ঞতাব দুরন্ত অনুপ্রেবণা জনমুখী চেতনায় অম্বিত কবেছে। সাংবাদিক জীবনে খোলামেলা চোখে বস্তুনিষ্ঠ মেজাজে জীবনকে দেখাব সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। দেশ-কালেব প্রতিটি স্পন্দনে অনুভব-শক্তি গাঢ়তা অর্জন কবেছিল এই সময়ে। নিজেব দৃষ্টি ও ভাবনাকে, সমাজ সমকালকে সঙ্গে মিলিযে নেওযাব যে প্রবণতা তাঁব মধ্যে ছিল তা যেন এই সময়ে আবো বেশি প্রখব হযে ওঠে। এই সময়ে তিনি ভাবতীয় কমিউনিস্ট পার্টিব সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং পার্টিব বে-আইনি যুগে (১৯৩৫-৩৮) আত্মগোপনকাবীদেব সঙ্গে যোগাযোগ বক্ষা করাব কাজে নিজেকে যুক্ত কবেন। এই জন্যেই হযতো হীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায অবুণ মিত্রকে বলেছেন 'নিষ্ঠাবান মার্কসবাদী' এবং 'পার্টির একজন নিষ্ঠাবান সদস্য, (তবী হতে তীর)। একথা সত্য 'অবণি'-পত্রিকাব পর্বও অবুণমিত্রেব কবি-জীবনে এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই সমযটা ফ্যাসিবাদী আন্দোলনেব চূড়ান্ত পর্যায। এই 'অবণি'ব অভিজ্ঞতায সমকালেব উত্তেজনাব উত্তাপ তাকে এত বেশি স্পর্শ কবেছিল যে শিল্প-সাহিত্য সৃজন যৌথ বিষয় নয এধাবণা তাঁর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও তিনি কবিতায় অনেক বেশি উচ্চকণ্ঠী হয়ে উঠেছিলেন। এই উত্তেজনাময় উদ্দীপনায় তিনি লিখেছেন-'লালইস্তাহার,'

'কসাকের ডাক,' 'আন্তর্জাতিক', 'সাময়িক'-ইত্যাদি কবিতা। লিখেছেন সত্য কিন্তু অরুণমিত্র সমকালে এমন একজন কবি-ব্যক্তিত্ব যাঁর মধ্যে অবস্থান করছিল শিল্প-সাহিত্যের সৃজন-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ভিন্ন এক ধারণা। সেই কারণেই এই সময়ে সরাসরি রাজনৈতিক তাপে বসে তার প্রত্যক্ষ আবহাওয়ায় কবিতা রচনা করার প্রয়াস সম্পর্কে কোথায় যেন একটা আপত্তি দানা বাঁধছিল। এই দ্বৈত-ভাবনার দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সংশয় নিয়েই তাঁর কাব্যরচনার সূচনা। সে-দৃষ্টান্ত তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'প্রান্তরেখা'র নানা কবিতায় ছড়িয়ে আছে। তবে এই সূচনাপর্বেই 'প্রান্তরেখা' হয়ে উঠেছে উত্তেজনা, সংশয় ও উত্তরণের সম্মিলিত রূপ। কার্যত সমকালে বিশ্বরাজনীতিতে তীব্র সংকট কবিকে মুখর করে তুলেছিল। এই মুখরতার জন্য সমকাল তাঁকে বেশ কিছুটা জনপ্রিয়তা দিয়েছে সত্য, জনচেতনায় এর গুরুত্বও হয়ত অস্বীকার করা যাবেনা। তবুও বলতে হয় এই ভাষণই তো অরুণমিত্রের কবি-ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক প্রকাশ বা বিকাশ নয়। এইজন্যই 'প্রান্তরেখা' পর্বের নানা কবিতা সম্পর্কে কবির মধ্যে যথেষ্ট সংশয়, দ্বিধা দানা বেঁধে ওঠে। অরুণমিত্র স্বতন্ত্র এইজন্যই সৃষ্টির সূচনা পর্বেই স্বসৃষ্টি সম্পর্কে তাঁর সংশয় দেখা দেয়। সমকালে বোধহয় এ-দৃষ্টান্ত বিরল। 'প্রান্তরেখা'র শেষ দিকের কবি অনেক বেশি সংযত, সত্য-সন্ধানী ও উত্তরণের প্রবল প্রচেষ্টায় আত্মমগ্ন। যখন তিনি বলেনঃ 'হে হৃদয় মূল মেলো বিদীর্ণ পাষাণে'—তখন বোঝা যায় কবি কত নীচু গলায় নেমে এসেছেন। কত শান্ত অথচ তীব্র, মৃদু ঝঙ্কার কিন্তু তার গভীরতা অনেকখানি। এ-দৃষ্টান্ত আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের নানা কবিতায় রয়েছে। এখানেই কবিকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করার ইঙ্গিত পেয়ে যাই।

॥ ২ ॥

'প্রান্তরেখা'র পরবর্তী পর্বে 'উৎসের দিকে' (১৯৫৫) যাত্রা। এখানে আন্তর্জাতিকতার ব্যাপ্তিতে নিজেকে অকারণে মুখর করে তোলেন নি। বরং আত্মমগ্নচৈতন্যে স্থির প্রজ্ঞার মতো ধীর হয়ে উঠেছেন তিনি। জল-বায়ু-মাটি-মানুষ সবকিছুকে কেন্দ্র করে তাঁর জীবন ও সৃষ্টির মধ্যে তিনি অনেক বেশি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। তাই মাটির গভীর থেকে, মানুষের অন্তর থেকে কথা তুলে আনতে চান, অবক্ষয়ী সমাজের বিবর্ণতায় দেখতে চান প্রাণের অস্তিত্ব। 'উৎসের দিকে'র যাত্রী হিসেবে তিনি কঠোর সংগ্রামী। তাঁর এই সংগ্রামী চেতনা উত্তরোত্তর তাঁকে সমৃদ্ধ ও সংহত করেছে। হতাশা নয়, ব্যর্থতা নয়

জীবনেব জযযাত্রায তিনি বিশ্বাসী। এসব তাঁকে স্পর্শ করে কিন্তু বিচলিত করেনা। 'উৎসের দিকে'র কাবগ্রন্থেব 'স্মরণকাল' শিরোনামে যে কুড়িটি কবিতা আছে তাঁর বচনাকালটি দেশের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একে একে ঘটেছে মন্বন্তব, যুদ্ধেব অবসান, সাম্প্রদায়িক বাজনীতির বিস্তৃতি, দেশভাগ, ক্ষমতা হস্তান্তর ইত্যাদি। এই সময সীমায় দাঁড়িয়ে কবি কবিতাগুলি রচনা করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থ আলোচনা করতে গিযে শ্রদ্ধেয় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায মন্তব্য করেনঃ "অরুণ মিত্রেব সমকক্ষ কবি বাংলায খুব বেশি নেই। 'উৎসেব দিকে'র প্রায প্রত্যেকটি কবিতাই তার প্রমাণ।" একথা ঠিক অবুণ মিত্রেব কবিতা-পাঠককে অনেক বেশি পরিশ্রমী হতে হয। তাঁব কবিতা যেন গভীব জলাশয়। গভীবে ডুব দিয়ে জলকে স্পর্শ করতে হয। চিৎ সাঁতারে এর স্পর্শলাগে কিন্তু অনুভূতি জাগায় না। চোখ কান বেখেই পডতে হয়। যখন শুনি ঃ 'কবাতের দাঁত আমাদেব বক্তাক্ত করেছে, / চামডা ছিঁড়েছে ছিঁড়ুক / মাংস চিরেছে, চিরুক / হাড় পর্যন্ত আঁচড় লেগেছে, লাগুক / আমবা বাঁচলাম' তখন বুঝতে পারি কথায় কথায় অনুভবগ্রাহ্য পৃথিবীতে পারিপার্শ্বিকতাকে কিভাবে তুলে ধরেছেন। কথাগুলি সত্যিই বুক জ্বালিয়ে দেয়। কথাগুলো কত তীব্র অথচ সহজ পরিচিত শব্দের বাঁধন। অনুভবেব গভীরে গেলে জ্বলে উঠতেই হয। এরকম শান্ত অথচ গাঢ় স্ববেব উচ্চাবণ উৎসেব দিকে'ব নানা কবিতায ছড়িযে আছে।

ববীন্দ্রোত্তর আধুনিক কবিদের মধ্যে (৩০-৪০ দশকেব) অবুণমিত্রই প্রথম বাংলা কবিতায় নিয়ে আসেন সার্থক গদ্য-কবিতা, বরং বলা ভালো গদ্যে-কবিতা। এই একেবাবে টানা গদ্যে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁকে ফবাসী-সাহিত্যেব অনুষঙ্গ অনেক বেশি আত্মপ্রত্যয দিযেছে। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি টানা গদ্যে বচনার উল্লেখ কবা যেতে।

> "বাসনগুলো এক সমযে জলতরঙ্গের মতো বেজে উঠবে, তার ঢেউ দেযাল ছাপিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে ফেলবে, তখন হযতো এই ঘবেব চিহ্ন পাওয়া যাবেনা। তবু আশ্চর্যকে জেনো, জেনো এইখানেই আমার হাহাকাবেব বুকে গাঢ় গুঞ্জন ছিল।" (অমরতার কথা)

ববীন্দ্রনাথেব গদ্য-কবিতা আমাদের ভাবায় কিন্তু অবুণমিত্রেব গদ্য-কবিতা আত্মমগ্ন কবে তোলে। অবুণমিত্রের এ-গদ্য তো গদ্য নয শব্দ তবঙ্গেব মিছিলে হৃদয় দোলানো সুরঝঙ্কার, বিস্তৃত প্রান্তবে যে সমবেত বেদগান। হৃদযেব

গভীরে প্রবেশ করে। স্নিগ্ধ সূক্ষ্ম কলতানে পাথরে শরীর স্পর্শ করতে ঝরনা যেমন উঁচু থেকে নীচুতে নেমে আসে তেমনি অরুণমিত্রের গদ্য-কবিতার শব্দ তরঙ্গ চোখ মনকে স্পর্শ করতে করতে হৃদয়ের গভীরে নেমে যায়। বাংলা কবিতায় এ-শিল্পরীতি তাঁর নিজস্ব। এখন বুঝতে পারি কবি সঠিক বলেছিলেন 'উৎসের দিক থেকে এক স্বতন্ত্র ধাঁচ আসে' তাঁর কবিতায়।

* * *

ষাটের দশকে এসে অরুণমিত্রের কবি-সত্তা নিজস্ব প্রত্যয়ে স্বতন্ত্র গতি ও ভঙ্গীতে বিকশিত হয়ে উঠেছে। আর এই ষাট দশকেই তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ- 'ঘনিষ্ঠতাপ' (১৯৬০) এবং 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' (১৯৭০) রচিত। শেষোক্ত কাব্যগ্রন্থটি সত্তরে প্রকাশিত হলেও কবিতাগুলির রচনাকাল ১৯৬৩-৬৯। তাই আমরা এই কাব্যগ্রন্থটির ষাট দশকের সৃষ্টি প্রবাহে অন্তর্ভুক্ত করতে চাই। প্রথমে আমরা 'ঘনিষ্ঠতাপ' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি নিয়ে একটু ভাবতে পারি। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি রচনার সময়কালের দিকে একটু তাকালে দেখব এগুলি রচিত হয়েছে মূলত বাংলা বামপন্থী কবিতার পালা বদলের যুগে। যেমন ঘটেছে স্বদেশের ভূমিতে পরিবর্তন, তেমনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘটেছে নানা পরিবর্তন। স্বদেশীয় ভূমিতে তৎকালীন বামপন্থীরা বাম-দক্ষিণের নানা দোদুল্যমানতায় দুলছেন। স্বদেশে নেহেরুর নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে 'গণতান্ত্রিক সমাজবাদ'। ইতিহাসকে অস্বীকার করার উপায় নেই। রাশিয়ার ক্রুশ্চেভের শাসনকাল বয়ে নিয়ে এসেছে নানা পরিবর্তনের ধারা। আন্দোলন মুখরতার প্রত্যক্ষতায় যে-কবিতাচর্চার স্রোত বয়ে চলেছিল সে-উচ্ছ্বাসে যেন কিছুটা ভাটা পড়েছে। আন্দোলনের নানা ঘটনার পারম্পর্যে যে-আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি সেই অভিজ্ঞতার পোড়া মাটিতে দাঁড়িয়ে কিছুটা নিঃসঙ্গতা, কিছুটা বিষণ্ণতা এসে ভিড় করেছে সমাজ মানসিকতায়, বামপন্থী কবিদের মধ্যেও। উল্লেখ্য যে কবি সমকালে অবস্থান করেও এই অভিজ্ঞতার তাপ উপলব্ধি করেছিলেন অনেক আগে 'প্রান্তরেখা' পর্যায়ে। তাই তো তাঁর যাত্রা ছিল 'উৎসের দিকে।' সমকালের ভ্রান্তিবলয়ে দাঁড়িয়ে এ-অভিজ্ঞতা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন আবার নিজেকে নতুন করে যাচাই করেছেন। সেইজন্যই হয়তো ঘনিষ্ঠতাপ অনুভবে উন্মুখ। লক্ষণীয় যে, ভ্রান্তিবলয়ের হতাশা, নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতাকে তিনি বিদ্রূপ করেননি, করেন না, বরং অন্তরঙ্গতায় অত্যন্ত স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ে

জীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ ভাব সৃষ্টির কথা বলেন। তাদের ভ্রান্তি বোঝেন কারণ ও জানেন কিন্তু সেইসব সহযাত্রীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চান না, বরং তাদের নিয়েই এগুতে চান। তাদের দেখাতে চান নতুন বৃষ্টি, পাখি, চোখের মণি যা একদা তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা দেখেননি। এখানেই অরুণ মিত্র হয়ে ওঠেন স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র তাঁর উপলব্ধি। মানুষের প্রতি তাঁর আস্থাশীলতা, আন্তরিকতা কতটা গভীর ও প্রত্যয়ী তা স্পষ্ট হয়ে 'ঘনিষ্ঠ-তাপ'-এর নানা কবিতায়, তাই তো তিনি 'ঘনিষ্ঠতাপ'-এর যাত্রাতেই বলে ওঠেনঃ "ঠাহর করে দেখে বুঝলাম এ ভিড়ের মধ্যে যারা আছে তারা প্রত্যেকেই আমার খুব অন্তরঙ্গ।" আবার বলেন ঃ "আমার ভয়ানক ইচ্ছে হল তাদের সমস্ত হাতের উপর আমার হাত রাখি। তারা সব আমার রক্তের দোসর।" 'উৎসের দিকের কবিতায় যে মানসিক স্পর্শ হৃদয়ের অনুরাগে সঞ্চারিত 'ঘনিষ্ঠ-তাপ'-এ এসে তা সম্ভোগের পরমতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। পরিচিত পরিবেশের মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক জল-মাটি-গাছপালা-নদী-ঝরনা-পাখি এরা পরস্পর পরস্পরের থেকে অবিচ্ছিন্নভাবে অরুণ মিত্রের কবিতায় উঠে এসেছে। এদের নিবিড় সম্পর্ক কবি অনুভব করেন, অনুভূতির আশ্রয়ে তারা লালিত হয়। এই সমাজ বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে তিনি যে-সব মানুষের কথা বলেন তারা স্বপনচারী কেউ নয় বা অর্থ ও আভিজাত্যের গর্বে গর্বিত কোনো মানুষও নয়। তারা সমাজের প্রতিটি সুখ-দুঃখের অংশীদার, তুফানের ঝঞ্ঝায় আলোড়িত বিপর্যস্ত মানুষ। প্রতিকূলতার অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ এইসব মানুষই তো তাঁর কবিতার উৎস,। এই কাব্যগ্রন্থে কবি যেমন অনেক বেশি মাটি-জল-বাতাস-আলো ঘেরা মানুষের স্পর্শ পেতে চেয়েছেন তেমনি মানবাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয়ে ওঠার উপলব্ধিই যে হলো বেঁচে থাকা, টিকে থাকা এবং তা প্রত্যয়ী জীবনবোধে উত্তরণের হাতিয়ার এ-বিশ্বাস স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নানা কবিতায়। এখন তিনি অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত, স্থির প্রত্যয়ী, এক চরম উপলব্ধিতে উপস্থিত। এখানে যেন তাঁর কোনো নৈরাশ্য নেই, সংশয় নেই, নেই ধ্বসে যাওয়ার ভয়। চরম অভিজ্ঞতায়, মানবিক প্রত্যয়ে উপলব্ধির যে শক্তি-বেদী তিনি তৈরি করেছেন তা তো সহজে ভাঙার নয়, এতো সমাজের অভিঘাতে স্ব-চৈতন্যে গড়ে ওঠা আত্ম-বিশ্বাসের সেই বেদী যে-বেদীতে দাঁড়িয়ে দ্বিধাহীনভাবে বলতে পারেন ঃ "নিস্পন্দ শিখার সামনে আমরা এখন স্পষ্ট। আমরা অবাধে ছড়ানো।" এই কাব্যগ্রন্থে তিনি অনেক

বেশি গদ্য-আঙ্গিকে কবিতা লিখেছেন। একেবারে নিরাভরণ গদ্যে-লেখা এই কবিতাগুলি পড়লে কখনো মনে হয় না তার গঠন-প্রক্রিয়ায় কোথাও সামান্যতম ভাব প্রকাশে শৈথিল্য আছে। এবং আটপৌরে শব্দ, দেশজ শব্দ ও শব্দগুচ্ছের সংহত সারল্যে আমাদের পৌঁছে দেয় অন্য এক জগতে।

'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' কাব্যগ্রন্থটি 'ঘনিষ্ঠতাপ'-এর সাত বছর পরে প্রকাশিত। এই দীর্ঘ সাত বছর কালের পটভূমিতে কবিতাগুলি লেখা। প্রসঙ্গত বলতে হয় এই সাত বছর ও তৎপরবর্তী সময়কাল বাংলা ভাষার যে-কোনো কবির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই সময় আন্তর্জাতিক রাজনীতির নানা পরিবর্তন, এঁদেশের মাটিতে সাম্যবাদী আন্দোলন দ্বিধা-বিভক্ত, উভয়ের মতাদর্শগত বিরোধে দুটি দলের জন্ম। আর তার কিছুকাল পরে অনৈক্যের সূত্র ধরে স্বতন্ত্র বিপ্লবী রাজনীতির আত্মপ্রকাশ গড়ে তুলেছিল এক অস্থির রাজনৈতিক আবহ। মানুষের অন্তরঙ্গ আবহাওয়ায় যাঁর কবি-মানসিকতা লালিত এহেন কবি অরুণ মিত্রের পক্ষে নাড়া খাওয়াটা স্বাভাবিক। সমকালের জীর্ণ-দীর্ণ ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষ উল্লেখ হয়তো তাঁর কবিতায় নেই, তবে সমকালের হাওয়া যে তাঁকে স্পর্শ করেনি তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। অবশ্যই সমকাল কখনোই তাঁর কবিতায় প্রত্যক্ষতর হয়ে ওঠে না কিন্তু তার গন্ধ-স্পর্শ পাওয়া যায় নানা প্রতীকে নানা ভাব-ব্যঞ্জনায়। কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ অত্যন্ত ভাব-ব্যঞ্জনাময়। যেন এতদিন মঞ্চে ছিলেন এখন তিনি মঞ্চের বাইরে মাটিতে এসেছেন যেখানে মানুষ নিত্য কলরব কোলাহলে মুখর। সেইজন্যই হয়তো তিনি বলতে পারেন ঃ "মঞ্চে নয়, তার বাইরে মাটিতে দৃষ্টিহীনতার মধ্যে এক প্রখর সৌহার্দ্যের অবয়বে আমি জেগে আছি।" এযেন মানুষের কোলাহলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার প্রস্তুতিপর্ব। তাই 'মঞ্চের বাইরে মাটিতে' বাধা-বাঁধন, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অতিক্রম করে থাকে বলে একেবারে মাটির পৃথিবীতে নেমে পড়া। কবির বিশ্বাস মঞ্চের বাইরের মাটিতেই রয়েছে হৃদয়ের শান্তি স্থিতি। মানুষ-মাটি-জল-বাতাস-পাথরকে বাদ দিয়ে নিজের অস্তিত্ব খোঁজা যেন আত্মহনন করা। তাই কবি আহ্বান করে বলেন ঃ "আমার নিকটে এসো, আমরা অবোধ্য ফাটলে আমাদের শিরা উপশিরা বিন্যস্ত করি, তাহলে আমরা উৎসরণের মুখ পাব। আমাদের সব কথাকে শস্য আর পুষ্পের মাঠে রূপান্তরিত হতে দেখব।" অনেক সংশয়, অনেক দ্বিধা অতিক্রম করতে করতে যে-স্থির প্রত্যয়ে তিনি এখানে এসেছেন সেই প্রত্যয়ই তাঁকে শক্তি

জোগাবে। সময়চেতনার অগ্নিময় উপলব্ধি তাঁকে এক ভাবসাম্যে পৌঁছে দেবে। তাই এই কাব্যগ্রন্থের নানা কবিতায় আমরা অরুণ মিত্রকে এক স্বতন্ত্রস্বরূপে বিস্তৃত হতে দেখি। এযেন মাটির বুকে পড়ে থাকা সুপ্ত-প্রাণ বীজের শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে পড়া, বিকশিত হওয়া।

আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে অরুণ মিত্রের ব্যক্তিচেতনা নানা রঙে, নানা ব্যঞ্জনায়, নানা চিত্রকল্পে, নানা ভাবাশ্রয়ে যেভাবে ছড়িয়ে পড়েছে তা কিছুতেই বোঝা যায় না নিষ্ঠাশ্রয়ী পঠন ব্যতিরেকে। বস্তুত অরুণ মিত্র অনেক বেশি আত্মমগ্ন কবি। কবিতায় তিনি হয়ে ওঠেন প্রশান্তির প্রতিমূর্তি। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় সমস্ত পৃথিবী বস্তুপুঞ্জ হৃদয়ের গভীরে জারণ করে তিনি এক বিশুদ্ধ রূপান্তরে জন্ম নিতে চান। তাঁর এই ধ্যানমগ্ন কবি-ধর্ম স্মরণ করিয়ে দেয় আধুনিক ফ্রান্সের কাব্যনায়কদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি পল এলুয়ারকে। সত্তার এক বিশুদ্ধ অবস্থায় পৌঁছোনোর জন্য যে-প্রয়াস অরুণ মিত্রের মধ্যে "সক্রিয় পল এলুয়ারের ঘোরাফেরাও যেন সেই বিশুদ্ধতার আকাশে। একথা স্বীকার করতেই হয় যে কবি অরুণ মিত্র মঞ্চের বাইরের মাটিতে এসে একদিকে প্রত্যক্ষ করেছেন আকাঙ্ক্ষিত মানুষের উষ্ণ জীবন-প্রবাহ, অপরদিকে লক্ষ্য করেছেন সেইসব মানুষকে যারা কৃত্রিমতার আতিশয্যে আত্মঘাতী প্রচেষ্টায় নিজেদের জীবনকে প্রবাহিত এবং তা সত্য বলে বিজ্ঞাপিত করেছে। এই কাব্যগ্রন্থের কোনো কোনো কবিতায় কবি যেন পূর্ববর্তী নানা ঘটনার কিছুটা মূল্যায়ণ করতে চেয়েছেন, কোথাও কোথাও যেন তাঁর পূর্ববর্তী স্থির প্রত্যয়ে কিছুটা সংশয় দেখা দিয়েছে। আবার কোথাও চূড়ান্ত আত্মপ্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে এই ভেবে যে তিনি সঠিক বিশ্বাসে উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছেন। কেননা তিনি তো মানবিক স্থির প্রত্যয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সময়ের অস্থিরতা দেখে ভয় পাবেন কেন।' এমনিভাবে আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের নানা কবিতায় বিশেষ করে 'ঘরের পৃথিবী' অংশে ধরা দিয়েছে সময় ও সমাজ, প্রত্যাশা-সংশয় আবার সময়ের অস্থিরতা, তার থেকে উত্তরণের আত্মপ্রত্যয়ও ফুটে উঠেছে। ভারসাম্যে পৌঁছোনোর প্রশান্তি যেমন আছে, আছে পারি-পার্শ্বিকতার অস্থিরতায় অবিচলিত থেকে অতিক্রম করার অদম্য মানসিক শক্তি। সমকালের দিনযাপনের অসঙ্গতি প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর 'বেনামা সময়'-অংশের কবিতাগুলিতে।

* * *

সত্তব দশকেব সময়'সীমায় আমরা তাঁর দু'টি কাব্যগ্রন্থ পাই—'শুধু রাতের শব্দ নয়' (১৯৭৮), 'প্রথম পলি শেষ পাথব' (১৯৮১)। শেষোক্ত কাব্যগ্রন্থেব কবিতাগুলি বচিত হয়েছে ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৯ এব মধ্যে। প্রসঙ্গক্রমে এই সত্তব দশকেব বুপচিত্রটি উল্লেখযোগ্য। এই সময় বাংলাদেশেব জনজীবনে অশান্ত পবিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। বাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য এমনকি ঐতিহ্যপ্রবাহকেও এমনভাবে নাড়া দিযেছিল যে জনমানসে এ-ধবণের বিস্তৃত প্রতিক্রিযা আব কোনো সময়ে ঘটেছিল বলে মনে হয না। যারা আমবা প্রত্যক্ষদর্শী তাদেব এই দশকেব বক্তাক্ত ও যন্ত্রণাদীর্ণ দিনগুলিব কথা আজ মনে পডলে শবীবে ও মনে শিহরণ না জেগে পারে না।

'শুধু বাতেব শব্দ নয'—কাব্যগ্রন্থেব বেশ কযেকটি কবিতায় অধ্যাপনা জীবন থেকে ক'লকাতায পাকাপাকিভাবে ফিরে আসাব উত্তেজনা প্রকাশ পেযেছে। এই প্রসঙ্গে 'ফিবে আসা', 'দ্যাখো এই আমি এলাম', 'বদলটা অন্ধকাবে হয়' ইত্যাদি কবিতা স্মবণযোগ্য। অবশ্য এই ফিবে আসাব উত্তেজনা প্রকাশেব মধ্যেই কবিব বযে চলা প্রত্যযেব প্রকাশ ও ক'লকাতা তথা বাংলাকে নতুনভাবে দেখাব অভিব্যক্তিও প্রকাশ পেয়েছে। 'শুধু রাতেব শব্দ নয'—নামকরণটি যেন বেশ কিছুটা তাৎপর্যপূর্ণ। যে-কবি প্রান্তবেখাব শেষ পর্বে দ্বিধা-সংশয় অতিক্রম কবে 'উৎসেব দিকে' এক বিশেষ প্রত্যযে যাত্রা কবেছিলেন এবং ধীবে ধীবে সেই মানবিক প্রত্যয গাঢ় থেকে গাঢ়তব অবয়বে 'ঘনিষ্ঠ তাপ' ও 'মঞ্চেব বাইবে মাটিতে'-এব পর্ব অতিক্রম কবলেন তিনি হোঁচোট খেযেছেন সমযেব অন্ধকাবে সবকিছু অর্ধসত্য জেনে। চাবদিকে যেন অন্ধকাব ঘনিয়ে এসেছে, আব সেই রাতেব শব্দতবঙ্গ কবিকে উদ্বেলিত কবেছে। যে-কবি 'মঞ্চেব বাইরে মাটিতে' অনুভব করেছিলেন—'ছোট উৎস থেকে বেবিযে ভালবাসা / পৃথিবীব চওড়া মোহনায বিস্তৃত হয়েছে' তিনি দেখছেন ক'লকাতা শুধু শারীবিক পরিবর্তনে ক্ষান্ত হযনি, মানসিক পবিবর্তনও ঘটেছে। তাই 'কোটব' ও 'প্যাঁচাব' প্রতীকে ফুটে উঠেছে সমযকালেব জীর্ণতা, মানবিক অস্তিত্বেব অস্থিবতা। দুবন্ত সমযেব মানবিক মূল্যবোধেব বিক্ততা, শূন্যতা কবিকে কিছুটা সংশযান্বিত কবেছে। এও যেমন সত্য, আবাব দেখি মানুষেব থেকে অবিচ্ছিন্ন কবি-সত্তা পারিপার্শ্বিক অস্থিবতাকে বাস্তব বলে স্বীকাব কবে নেয। তাই বোধহয় চরম উপলব্ধিতে পোঁছোতে পাবেন এই বলে—এ শুধু রাতেব শব্দ নয। চলাব পথে ঝড তো উঠবেই কিন্তু মানবিক প্রত্যযে

আস্থাশীল কবি বিশ্বাস করেন সময় পাল্টাবে। তাই উত্তেজনার আগুনে দাঁড়িয়েও গভীর প্রত্যয়ে বলতে পারেনঃ "শুধু কি রাতের শব্দ? / আমি নিশ্চিত শুনি ভোরবেলার যাত্রার আয়োজন / আমার শেষ সমুদ্রে।" তিনি জগৎ ও মানুষকে যতটা মেধা মনন ও বুদ্ধি দিয়ে দেখেছেন তার চেয়ে অনেক বেশি দেখেছেন হৃদয় দিয়ে। তাঁর কাব্যে ও কবিতায় আদর্শসর্বস্বতার চেয়ে হৃদয়সর্বস্বতা তাঁকে সময়কালে অনেক বেশি স্বতন্ত্র করে তুলেছে। একথা বলতে দ্বিধা নেই বিপন্নতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কবি অরুণ মিত্রের মতো স্ব-নির্ভর আত্মবিশ্বাস ও উত্তরণের কথা বলা সমকালীন কবিদের মধ্যে বিরল। এত আত্মবিশ্বাস আছে তবুও সত্তর দশকের রক্তাক্ত ও যন্ত্রণাকাতর দিনগুলি কবিকে অনেক বেশি বিচলিত করেছে। তাই এই দশকের দু'টি কাব্যগ্রন্থেই নৈরাশ্য, অসহায়তা ও বিপন্নতার ছবি যে প্রকট হয়ে উঠেছে একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে 'প্রথম পলি শেষ পাথর' কাব্যগ্রন্থে অনেক বেশি আত্মসংহতি ও আত্ম-উত্তরণের কথা বলা হয়েছে। কোনো কোনো কবিতায় উঁচু সুরে চূড়ান্ত প্রত্যাশার গানও গাওয়া হয়েছে। গর্জনের সামনে দাঁড়িয়ে 'বুলা'র হাত ধরে যে-কবি দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন তিনি স্পষ্টই দেখতে পান 'অনেকখানি বুনো রাত', 'ভবদুপুরের আগুন'। সেখানকার অভিজ্ঞতায় তিনি কোনো 'উদ্দাম জলধারা' পাননি, 'কোনো খনিজের উজ্জ্বলতা' দেখেননি।

বস্তুত এই পর্যায়ের কবিতাগুলিতে সময়ের যন্ত্রণা, সংশয়, ব্যর্থতা, হতাশা অনেক বেশি প্রকট দেখে অনেকে মনে করেছেন অরুণ মিত্রের বিশ্বাসে যেন কোথাও ব্যর্থতা বাসা বেঁধেছে। আসলে কি তাই? আমার মনে হয় গর্জনের সামনে দাঁড়িয়েও তিনি হারিয়ে যেতে চান না। আসলে প্রকৃত কমিউনিস্ট কবির জীবন তো এমনিভাবেই চড়াই-উতরাইয়ের মাঝখান দিয়ে চলে মহৎ ভবিষ্যতের দিকে। এই প্রসঙ্গে ফরাসী সাহিত্যের বিখ্যাত কবি লুই আরাগঁ-এর কথা মনে পড়ে যিনি কমিউনিস্ট কবি হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। গাঢ় থেকে গাঢ়তর সংকটেও আরাগঁ জাগিয়ে রেখেছিলেন নিজেকে। অরুণ মিত্রের জীবনবোধে এই বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কেননা অরুণ মিত্র জানেন হতাশাই জীবনের শেষ নয়। এই জীবনবোধের প্রত্যয়ী আস্থার সঙ্গে আর একজন দায়বদ্ধ ফরাসী সাহিত্যিক ঝাঁ-পল-সার্ত্রে (Jean-Paul-Sartre)-এর জীবনবোধের কোথায় যেন একটা মিল খুঁজে পাওয়া

যায়। স্বয়ং সার্ত্রে জীবন সম্পর্কে মন্তব্য করেন ঃ " · **human life begins the other side of despair.**" এ-বোধ তো অরুণ মিত্র জীবনে চলার পথে পথে সঞ্চয় করে চলেছেন।

যাইহোক 'প্রথম পলি শেষ পাথরে'-এ এসে কবি যেন রাতের শব্দ-জর্জরিত অন্ধকারকে অতিক্রম করে অস্পষ্ট কুয়াশাভরা ঊষাকে দেখতে পান। অবশ্য এর জন্য অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষা করে তিনি উপলব্ধি করেছেন—'সময়ের বুকে যেমন আগুন ছিল তেমন আদর'। কঠিন প্রত্যয়ে তিনি বলতে পারেন—'আমি সূর্যের নিচে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছি', 'প্রত্যেক রোমকূপ দিয়ে শুষে নিয়েছি রোদের বিন্দু'। এই কাব্যে যেমন আশার আলো আছে, প্রত্যয়ী নিশানার কথা আছে, ফসলের প্রতীকে সবুজের প্রতীকে সফলতার ইঙ্গিত আছে তেমনি নৈরাশ্য আছে, সংশয় আছে, কাতরতা আছে। বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না ষাট-সত্তর দশকই অরুণ মিত্রের কবি-প্রতিভার চূড়ান্ত পর্যায়।

* * *

আশির দশকে তাঁর দু'টি কাব্যগ্রন্থ-'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর' (১৯৮৬), 'যদিও আগুন ঝড় ধ্বসা ভাঙা' (১৯৮৮)। একদা অরুণা মিত্র মন্তব্য করেন ঃ 'জনজীবন আমাকে বরাবরই প্রভাবিত করেছে' (কবিতা পরিচয় ১৩৭৭)। 'উৎসের দিক' থেকে যাত্রা পথের কাব্যধারায় তাই বারবার এই মানুষের অনুষঙ্গেই এসে গেছে মাটি-জল-ফসল-আলো-বাতাস-পাথর নানা প্রতীকে। এর মূলে রয়েছে জীবনের প্রতি এক নিবিড় প্রেম। এই সূত্রে ফরাসী কবি ঝ্যুল সুপের ভিয়েল (**Jules super vielle**)-এর কথা মনে পড়ে। পৃথিবীতে যা কিছু বিদ্যমান তার সঙ্গে অপূর্ব ঘনিষ্ঠতায় তাঁর কাব্যে উঠে আসে মানুষ-পশু, গাছ-পালা, পাথর সবকিছু। তাঁর জগতের কেন্দ্রবিন্দু মানুষ যার সংযোগেই সবকিছু তাঁর কাছে অর্থময় হয়ে উঠে। তাই বিলুপ্তি নিঃসঙ্গতা যন্ত্রণাকে ছাপিয়ে তাঁর কাব্য সৃষ্টি করেছে এক বিশাল জীবন কাহিনী। অনুরূপভাবে মানুষের অসম্ভব, সত্তা ও পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যে-অরুণ মিত্রের এমন নিবিড় সম্পর্ক তাঁর কাব্যে ঘুরে ফিরে নানাভাবে মানুষের কথা আসা স্বাভাবিক। সেই মানুষের কথা, পারিপার্শ্বিকতার কথা ঘুরে ফিরে 'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর'-এর নানা কবিতায় অন্তর্লীন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিবৃত হয়েছে। এক কাব্যগ্রন্থের বিশিষ্ট অংশ 'কামিলার দিনরাত' যা স্বতন্ত্র আলোচনার দাবী রাখে। অন্যান্য কবিতা

গুলি পড়তে পড়তে মনে হয় সময় প্রবাহের নানা সংঘর্ষে, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝখান দিয়ে তিনি স্থির উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন। এখন তিনি তাতেই স্থির থাকতে চান। তাই এই পর্বের কবিতা হয়ে উঠেছে তাঁর জীবন যাপনের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ এবং তাঁর অস্তিত্বের ঘনিষ্ঠ অংশ। তাই দেখা যায় 'খুঁজতে খুঁজতে এতদূর-এর মতোই 'যদিও আগুন ঝড় ধ্বসা ভাঙা' কাব্যের কবিতাগুলিতেও বাস্তব ও সময়কে একই লড়াকু মন দিয়ে ধরতে চেয়েছেন। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় এ যেন আশির দশকের সমাজ বাস্তবতার এক সমীক্ষার ধারা বিবরণী যা শুরু হয়েছে পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থে এখনও চলছে সমান তালে। তবে অনুভূতি প্রকাশের তীব্রতা বেড়েছে। বস্তুত তাঁর আশির দশকের এমন কি তৎপরবর্তীকালের কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে জনজীবনের কবিতা। জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার জগতে নিজেকে নিবদ্ধ রেখে যে-ভাবে সময়-মানুষ-পারিপার্শ্বিকতাকে দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন সেভাবেই তাকে প্রকাশ করেছেন। তাই কবিতা-গুলি হয়ে উঠেছে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির সুর-ঝঙ্কার, আলো-অন্ধকার। প্রতিবাদ-সমর্থন, আশ্বাস-দীর্ঘশ্বাস, আসা-নিরাশার সমন্বয়ী কথামালা, কেন না, অরুণ মিত্রের পর্যটন তো মানবিক সংবেদনার এলাকা ধরে চলে।

* * *

বর্তমান নব্বই দশক চলছে। এই নব্বই দশকে কবির সবচেয়ে বেশি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ পেয়েছে, আরো হয়ত পাবে। 'এই অমৃত এই গরল (১৯৯১), টুসি কথার ঘেরাও থেকে বলছি (১৯৯২), 'সারা-উর্বরায় চিহ্ন দিয়ে চলি' (১৯৯৪), 'অন্ধকার যতক্ষণ জেগে থাকে' (১৯৯৬), 'ওড়া উড়িতে কাজ নেই' (১৯৯৭), 'ভাঙনের মাটি' (১৯৯৮), কবি অরুণ মিত্র কবিতার যাত্রাপথে নব্বই দশকে পা ফেলেছেন। অনেক ঝড়-ঝাপটা সহ্য করে, অনেক উত্থান-পতনের জ্বালামুখ অতিক্রম করে সইতে সইতে দেখতে দেখতে খুঁজতে খুঁজতে অনেক আগুন ঝড় ধ্বসা ভাঙার থেকেও যে-মানুষের প্রত্যয়ে ঘুন ধরেনা, অভিজ্ঞতার বিপর্যয়েও যিনি বিশ্বাসের সলতে জেবলে আর একবার দেখে নিতে চান জীবন ও সমাজকে ; নানা অভিজ্ঞতার জারকে পরখ করতে চান চোখ-মেলে দেখা পারিপার্শ্বিকতাকে তাঁর পক্ষেই শুধু বয়সের তাড়নায় নয়—অভিজ্ঞতার উত্তেজনাহীন প্রাত্যহিক সচলতায়, জীবন প্রবাহের চলমানতায়

বেশি কথা বলা স্বভাবসিদ্ধ হয়ে পড়ে। কেননা জীবনকে, সমাজকে পারি-পার্শ্বিকতাকে কবিতা রচনার প্রাত্যহিকতায় মিলিয়ে ফেলতে চান এ-কবি। এ-মিলনের প্রকাশ অবশ্য তেমন গুরু-গম্ভীর হয়ে ওঠে না, বরং তা জিরিয়ে জিরিয়ে বলা হালকা চালে বলা, যে-ভাবে তাঁকে সত্তর-আশির দশকে কথা বলতে দেখেছি এখন তিনি সেভাবে কথা বলেন না। বিশ্বাসের স্থির বিন্দু পাল্টায়নি। তবে কথা বলার মেজাজ ভঙ্গী নব্বই দশকে অনেকটাই পাল্টে গেছে। এখন মেজাজ থাকে কখনো তির্যকতায়, কখনো বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মৃদুতায় ছড়িয়ে জনক-বিন্দুর মতো। অবশ্য অরুণ মিত্র এমন একজন কবি যে এই পরিবেশে থেকেও কখনো কখনো আত্মমগ্ন চৈতন্য উপলব্ধির গাঢ়তায় তীক্ষ্ম হয়ে ওঠেন। সে দৃষ্টান্ত অনেক কবিতায় আছে। কেন না অন্তর্মুখীন উপলব্ধিতে অরুণ মিত্র চিরদিনই তীক্ষ্ম স্বতন্ত্র। নব্বই দশকের উল্লিখিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে শেষ দুটি কাব্যগ্রন্থ-'ওড়া উড়িতে কাজ নেই' ও 'ভাঙনের মাটি'-আমাদের অন্যভাবে ভাবায়। কথকতার ভঙ্গীতেও যে অরুণ মিত্র কতটা তীক্ষ্ম ও আত্মমগ্ন হয়ে উঠতে পারেন তার দৃষ্টান্ত বহু কবিতায় আছে। এতো তাঁর সহজাত ক্ষমতা ও স্বাভাবিক প্রকাশ।

অরুণ মিত্র সতত সজীব, সচল। কবিতাগুলিকে আত্মদর্পণে সঠিকভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে দেখলে বোঝা যায় যেন এক মানবিক প্রত্যয়ে পরিশীলিত ও পরিণত কবি-ব্যক্তিত্ব কথা বলে চলেছেন আর তাঁর অণুভাবনাগুলি গড়ে উঠছে মাটি-মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিকতাকে ঘিরে। আমরা গর্বিত আজও অরুণ মিত্রই রবীন্দ্রনাথের পরে দীর্ঘজীবী সবাক, সচল কবি। সাতদশক ধরে কবিতা লিখেই চলেছেন।

———

অস্তিত্ব-র নানা রং

কার্তিক লাহিড়ী

প্রজেশ ভাবে ধ্রুব আর কেতনকে পড়াতে শুরু করলে কেমন হয় ?

ইচ্ছেটা মধ্যে মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। বেকার বসে থাকার চেয়ে এক-আধ-টা টিউশ্যানি করা মন্দ কি, সময়ও কাটে আর পরবর্তী প্রজন্মের সঙ্গে একটা যোগাযোগও রাখা হয়। তাছাড়া ধ্রুব কেতনকে তার পছন্দও বটে। দুজনেই বেশ বুদ্ধিমান, চট করে বুঝতে পারে, একবারের বেশি দ্বিতীয়বার বলতে হয় না, তা বাদে দুজনেরই পড়ার বই ছাড়া অন্য নানা জিনিষ সম্পর্কে উৎসাহ আছে, এটা প্রজেশের কাছে এক বাড়তি ব্যাপার। সে এমন ছাত্রই পড়াতে চায়, কিন্তু এদের সংখ্যা নেহাতই কম, প্রায় বেশির ভাগই পড়ার বই তাও আবার কোশ্চেন-অ্যানসারের বাইরে যেতে চায় না। প্রজেশ ওদের পড়িয়ে আনন্দ পেয়েছে বেশ, এবং ওরাও তার কাছেই পড়তে চায়।

কিন্তু মুস্কিল হয়েছে নিজেকে নিয়ে। নিজের মন মেজাজ কখন খুশ থাকে, কখন বিগড়ে যায় তা সে নিজেও জানে না। কোনো কাজে লাগলে প্রথম প্রথম সে কি উৎসাহ. তখন কোনদিকে তাকাবার ফুরসৎ পায় না, তার পর যে কে সেই। আলসেমি জেঁকে বসে, উৎসাহে ভাটা পড়ে, ক-দিন যেতে না যেতে ভুলেই যায় সে ঐ কাজে মেতে উঠেছিল দারুণ। ধ্রুব-কেতনকে পড়াবার সময়ও তেমনই ঘটে। সপ্তাহে দু-দিন যাবার কথা, সে রোজ যেতে থাকে মায় রবিবার অব্দি। তারপর যা হবার তাই হয়। সপ্তাহে যাবার দিন কমতে থাকে—পাঁচ থেকে তিন তারপর দুই, এরপর দু-সপ্তাহে দুই, তারপর মাসে দুদিন, শেষে ভুলেই যায় পড়ানোর কথা।

তবু অনিয়মিত যাবার জন্য নয়, অভিভাবকরাই তাকে লজ্জায় ফেলে দেন খুব। কামাই করলেও তাঁরা মাইনে কাটেন না, তাতেই বিপাকে পড়ে। ঠিকমত কাজ না করে টাকা নেওয়া শুধু অন্যায়ই নয়, ঠকানোও হয় একভাবে। তাই নিজের লজ্জা বাড়তে না দিয়ে পড়ানোই ছেড়ে দেয়। কিন্তু ছেড়ে দিলে কি হবে, ওরা ছিনে জোঁকের মত লেগে থাকে। বোঝায় তার না যাওয়ার কারণ, তবু ওরা নাছোড়বান্দা, না পড়ালে বাড়ির সামনে একদিন অনশন করবে বলে হুমকি দেয়, হুমকি ঠিক নয়, আবদার করে বলে। এতে প্রজেশ

খুশি হয খুব, এদের ভালবাসার সঙ্গে নিজের পড়ানো সম্পর্কে একটা উঁচু ধারণাও তৈরী হয়ে যায়। ফলে পড়ানোব বিষয় ঠেলে ফেলে দিতে পাবছে না, ভাবাচ্ছে বেশ।

টাকাব দবকাব নেই তাব। বাবা যা বেখে গেছেন তাতে মা ও তার হেসে খেলে চলে যাবে, এমন কি বিয়ে কবলেও কষ্টে পড়তে হবে না কখনো। এখন মা-ই সব কিছু দেখাশোনা কবেন, তাকে কুটোও নাড়তে হয় না। কিন্তু এভাবে কি চলা উচিত একজন মস্ত জোযানের? আজ কদিন হচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে এ বকম একটা ভাবনা উঁকি দিচ্ছে, কখনো বা চেপে বসছে, তাতে একটু চঞ্চল হযে উঠছে বই কি। তাই টিউশনি নেবার কথা যথেষ্ট গুরুত্ব দিযে ভাবছে।

কিন্তু ভাবলে কি হবে, কাজে কী কবে দেখাতে পারবে কখনো? প্রজেশ জানে, সে ঝপ করে একদিন পড়াতে শুরু কবে দিতে পারে, সপ্তাহে সবদিনই যেতে পাবে পড়াতে, পডাতে পড়াতে কেটে যেতে পাবে দু-তিন ঘণ্টা, বুঝতে পারবে না। পড়াবে যত গল্প করবে তত। কিন্তু এই উৎসাহ ক-দিন টিকবে—বডজোর এক দুই তিন সপ্তাহ, তাবপব আলসেমি, আজ নয় কাল পড়াতে যাবো কবতে কবতে মাস গড়াবে, তখন? সে স্পষ্ট দেখতে পায় নিজেকে, ফলে অস্থির হযে ওঠে, আমাকে বদলে ফেলতে এই ধরণ-ধারণ,—ঠিক কবতে না করতেই বই টেনে, আব অস্থিরতা কাটাবার জন্য মেলে ধবে একটা পাতা চোখেব উপর—

মাঠের পরে মাঠ, মাঠের শেষে/ সুদূব গ্রামখানি আকাশে মেসে। / এ ধারে পুরাতন / শ্যামল তালবন/সঘন সাবি দিযে দাঁড়ায ঘেঁষে। / বাঁধেব জল বেখা ঝলসে যায দেখা/জটলা কবে তীরে বাখাল এসে। / চলেছে পথখানি / কোথায় নাহি জানি, / কে জানে কত শত ··পডতে পড়তে চোখেব পাতা বুজে আসে, শত টেনে খুলতে পারে না আর। ঘুম অ-ঘুমেব টানাটানিব মধ্যে চলে যেতে যেতে দেখে—

একটা মেঠো রাস্তা। বাস্তাব দু-পাশে বিস্তীর্ণ ধান খেত। তাব মধ্যে দু-একটা ঢেঙা গাছ।

একজন যুবক হন্তদন্ত হযে ছুটে যাচ্ছে।

বাস্তার মাথায দালান। দালানের মাথায লেখা বাজিতপুর।

দালানের সামনেটা হলঘবেব মত। ডানদিকে জানলা। জানলায় লেখা

বুকিং অফিস তার নীচে, টিকিট ঘর।

টিকিট ঘরের সামনে লাইন টিকিট কাটার।

যুবকটি এসে দাঁড়ায় লাইনে। এদিক ওদিক তাকায়।

রেলিং।

রেলিং-এর পর প্ল্যাটফর্ম। প্ল্যাটফর্মে মানুষজন—চঞ্চল।

ট্রেন আসার শব্দ।

ট্রেন থামে।

একজন টিকিট কেটে এগিয়ে যায়।

আরও একজন।

ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টি বাজে।

যুবকটি অস্থির হয়ে ঠেলতে থাকে সামনে।

তার সামনের যাত্রী টিকিট কেটে বেরিয়ে যেতে সে টাকা শুদ্ধু হাত গলিয়ে দেয় জানলার ফোকরে।

টিকিট নিতে নিতেই ছুটবে যেন।

গেটে কালো কোট পরা টিকিট বাবু। টিকিট দেখিয়ে ছুটতে থাকে।

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে।

যুবকটি দৌড়ে কামরার হাতল ধরার চেষ্টা করছে।

হাতল ধরেছে, ধরেই হাত পিছলে যায়

আর সে··

মেঝেতে কাঁসা পিতল বা স্টিলের বাসন পড়ে যাবার দূরাগত শব্দ ঢুকে পড়ে এই ঘরে, প্রজেশের চটকা ভাঙে ঐ শব্দে, সে বিরক্তই হয়, কেন না সে সেই মুহূর্তে পেয়ে যাচ্ছিল গোটা গল্প সিনেমার চিত্রনাট্যর ঢঙে—কাটা কাটা দৃশ্য ছবির মত—চলন্ত ছবি।

চিত্রনাট্য! প্রজেশ অবাকই হয়, সে তো সিনেমাই দেখে না, কতবছর আগে দেখেছিল পথের পাঁচালী, বোধহয় অযান্ত্রিক রূপসী হলে। তারপর কি সিনেমা দেখেছে আর? মনে করতে পারে না, এমন কি টি. ভি সিরিয়ালও নয়, তাহলে চিত্রনাট্যর কথা মনে এলো কি করে? কোনো পত্রিকায়ও দেখেনি চিত্র নাট্য, তাহলে?

অবিন্দ্র এর কারণ বের করে ফেলত নির্ঘাত। বলতো নিশ্চয়ই কখনো

কোনো চিত্রনাট্যের টুকরো চোখে পড়েছে বা সিনেমা দেখতে দেখতেই ওর তৈরী প্রক্রিয়াটা তোর কাছে স্পষ্ট হযে উঠেছিল, বা বলতে পারে, এটা হচ্ছে কল্পনার নির্মাণ, এই শক্তি কেবল কবিবই থাকে, তুই ত কবি তাই · এসব শুনে সে হাসতো মনে মনে। আব অবাক হয়ে যেত তাব প্রতি অরিত্রব বিশ্বাস ও ভালোবাসা দেখে, এমন বন্ধু-ক-জনের ভাগ্যে জোটে !

ততক্ষণে মেঠো বাস্তাটা চোখেব সামনে সামনে ভেসে ওঠে আর আলো জ্বলে।

ভব সন্ধ্যায় শুযে আছিস ? মা-র মুখে কি বিবক্তি ? মা বিরক্ত হতেই পাবেন, তিনি পই পই করে বলেন—ভব সন্ধ্যায শুয়ে থাকতে নেই, অলক্ষীতে পায। প্রজেশ অবশ্য বুঝে ওঠে না, অন্য অসময়ে শুযে থাকলে কেন অলক্ষী ভব কবে না ? সে অবশ্য মা-কে তা জিজ্ঞেস করে না, ববং মা-ব দিকে তাকিযে থাকে।

অমন জুলজুল কবে দেখছিস কি ?

জানো মা, সে গভীবে চলে যাচ্ছে যেন, তুমি আলো জ্বালাবাব আগে একটা গল্পেব কথা ভাবছিলাম।

মা-র মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে খুশিতে। তাই দেখে উত্তেজিত হযে গড়-গড়িয়ে বলে ফেলে গল্পটা।

বলেছিলাম না ধৈর্য ধবতে, মা মাথায হাত বুলিযে দিতে থাকেন, লেখা ঠিক আসবে।

সত্যি বলছো ! আমি আবাব পারবো লিখতে ?

ঠিক পাববি, যাব ইচ্ছে শুকিযে যায় না, সে-ই পাবে, মা অনেক আদবে মাথা টেনে নেন বুকে, গল্পটা তো এসেই গেছে, এখন—

ওটাকে গল্প বলো না, ওটা হাড়গোড় মাত্র, প্রতিমাব খড় বাঁধা হযেছে, এব পব মাটি চাপাতে হবে, তাবপব দোমাটি, তাবপব, বলতে বলতে থেমে পড়ে দম নিতে, তাবপব বলে ওঠে, আচ্ছা মা, ছেলেটা কে, সে হন্তদন্ত হয়ে আসছে কেন স্টেশনের দিকে, এত তাড়া কিসেব, তাড়া থাকলে আগে বওনা দিল না কেন, আব সে ঐ গাঁযে—

মা চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলেন, এই তো মাটি চাপাচ্ছিস খড়েব উপব, একটু স্থিব হযে বোস্, দেখবি, কথাব মধ্যেই মা থেমে পড়েন, আর তাকান তার দিকে, হঠাৎ-ই বলে ওঠেন, ছেলেটাকে মেবে ফেলিস্ না যেন—

প্রজেশ হাসতে গিয়ে মা-র মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে, মা ঐ যুবকটির অন্তিম পরিণতি চাইছেন না, তা ভাবতে তাঁর চোখ সজল হয়ে উঠছে, যেন ছেলেটা সত্যিকারের ছেলে, চলন্ত কামরার হাতল ধরতে গিয়ে যার হাত পিছলে যাচ্ছে, আর—

ততক্ষণে মা ঘর ছেড়ে বের হয়ে গেছেন।

তাহলে লিখতে পারলে, প্রজেশ বিশ্বাস করতে পারছে না, এখন পর্যন্ত লেখাই হয়নি গল্পটা। শুধু সে তার রূপরেখাটা বলেছে, তাতেই, প্রজেশ সব আলসেমি ঝেড়ে ফেলে সঙ্গে সঙ্গে, আমাকে লিখতেই হবে।

প্রজেশ বসে পড়ে লেখার জন্য। বহুদিন টেবিল ফাঁকা, লেখার সরঞ্জাম নেই সেখানে—কাগজ কলম ক্লিপ আঁটাবোর্ড পেপার ওয়েট।

কোথায়, কোথায় ? সে খুঁজে পাচ্ছে না একটিও। ড্রয়ার টানে, তার ভিতরে পড়ে আছে ডট্-পেন, শুকনো খটখটে নিশ্চয়ই। সে তুলে নেয় পরীক্ষা করার জন্য, একটুকরো কাগজও নেই কোথাও, দেয়ালেও ক্যালেণ্ডার নেই, দূরে খাটের উপর পড়ে আছে সোনার তরী। যা ভেবেছে তাই, রি-ফিল শুকিয়ে কাঠ। অথচ সে লিখবেই লিখবে গল্পটা—সঙ্গে সঙ্গে মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠতে থাকে—

গাঁয়ের মেঠো রাস্তা, ছেলেটা দ্রুত আসছে। কেন ? সে কি এই গাঁয়েরই ছেলে ? তবে তার কি দরকার পড়ল স্টেশনে আসার ? আর যদি এখানকার ছেলে না হয়, তবে কেন থাকে এখানে, কি করে সে ?

প্রজেশের মাথা গরম হয়ে উঠছে। সে পেতে চাইছে কাগজ কলম। কিন্তু কোথায় তা ? এতদিন পর খোঁজ পড়লে থাকে কি সে সব ঠিক ঠিক জায়গায় ? প্রায় ঝেঁটিয়ে-বিদায় করেছিল এই সব, এমন কি অরিন্দ্রর দেওয়া অমন সুন্দর প্যাড, দামী কলমও।

আহ্ ! যদি থাকত্ এখন !

নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে , করার কিছু নেই তবু।

মা-কে বললে মা সঙ্গে সঙ্গে জোগাড় করে আনবেন কাগজ কলম নিশ্চয়ই, কিন্তু কাগজ-কলম পেয়ে গেলেই কি সে তখন তক্ষুনি বসে পড়বে লিখতে ? হয়ত বসবে, কিন্তু লিখতে কি পারবে এক ছত্রও তখন ? লেখার এ রকম আবেগ উত্তাল হয়েছে কতবার, লিখতেও বসেছে, কিন্তু লিখতে পেরেছে কি একটি পঙক্তিও ?

তার চেয়ে ববং নিজেই কাগজ-কলম জোগাড় করে পুবোটা লিখে মাকে তাক লাগিয়ে দেবে। ভাবতেই সে পাঞ্জাবি গলিয়ে নেয়, এবং একটু বেরুচ্ছি মা না বলেই বেবিয়ে পড়ে বাড়ি থেকে—

ছেলেটাব নাম হবে কচি বিশু রাম কিংবা অর্ণব। হ্যাঁ, অর্ণব নামটা ঠিক হবে, কিন্তু গ্রামেব ছেলেব নাম অর্ণব—একটু বেশি হয়ে যাবে, তাব চেয়ে কচি-ই থাক্ তাতে সামলানো যাবে অনেকখানি, কিন্তু কচি তো কাবো ভাল নাম হতে পাবে না, তাহলে? হাঁটার গতি একটু শ্লথ হয়, ভাল নাম হবে যোগেন বা বমেশ, হ্যাঁ সেই ভালো, ও চিঠি পেয়ে কলকাতা যাচ্ছে, সেখানে তাব বাবা চাকবি কবেন, অসুখ করেছে, বাবাব অসুস্থ হবাব খবব পেয়ে দৌড়েযাচ্ছে ট্রেন ধবতে, কিন্তু…

যোগেন বা বমেশ কি স্কুলে পড়ে! নাকি

প্রজেশেব চলাব গতি বাড়তে থাকে।

ছেলেটা ট্রেনেব হাতল ধবতে চেষ্টা করেছে, ধবেছেও, কিন্তু হাত পিছলে গেল, সে পড়ে যাচ্ছে প্ল্যাটফর্ম আর চলন্ত কামবার ফাঁকে, দু' কামরাব ফাঁক দিয়ে লাইনেব মধ্যে, কিন্তু এভাবে পড়লে তো কেউ বাঁচে না—শবীব থেতলে মেতলে একশেষ হয়ে যাবে, চেনাই যাবে না মোটে, একপিণ্ড·· না· না, এভাবে ফেলা যাবে না

মা চান—ছেলেটা বাঁচুক, তাহলে?

দীর্ঘশ্বাস পড়তে প্রজেশ সংবিৎ ফিরে পায়, দেখে—

সে এসে দাঁড়াচ্ছে কলেজটিলাব সেই মাথায় যেখান থেকে একটা পায়ে চলার বাস্তা টিলাব গা বেয়ে নেমে গেছে নদীর দিকে। চাব দিক অন্ধকাব! এখানে এলো কি কবে? কে তাকে টেনে নিয়ে এলো এখানে? সে আপন মনে চলে এসেছে এখানে নিশি পাওরা মানুষেব মত?

বাড়ি থেকে কখন বেরিয়েছিল, প্রজেশ মনে করতে চেষ্টা কবে, কেনই বা বেব হয়, মনে কবতে পাবছে না কিছুতেই। সে একটা গল্প পেয়ে গিয়েছিল আধো ঘুমের মধ্যে, গল্পেব প্রতিমা-র খড়ও বাঁধা হয় নি, মা-কে বলেছিল আস্তে আস্তে খড় বেঁধে মাটি চাপাতে চেষ্টা করে—কিছুই মনে পড়ে না। মনে না পড়ে সে গল্পলেখার তাগিদে বের হয়েছিল কাগজ ডটপেনের বি-ফিল কিনতে, কিচ্ছু, কিচ্ছু মনে পড়ে না, আর সে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বাগে নিজের চুল ছিঁড়তে গেলে একটা ঠাণ্ডা বাতাস তাকে ছুঁয়েই উধাও হলে

খুশি হয়, নিজেকে এখানে আবিষ্কার করে ক্ষোভ রাগ কিছুই থাকে না তখন।

প্রজেশ তো নদীর ধারেই আসতে চায়। এই খোলা মেলা আকাশের নীচে জল-সরে যাওয়া নদীর বুকে শীর্ণ ধারা পেরিয়ে দূরের টিলায় গাছ গুলোকে আকাশ ফুঁড়ে কোথায় উধাও হাওয়া দেখতে চায়। এখানে এসে সে হারিয়ে যায় না, নিজেকে খুঁজে পায় যেন। কিন্তু সেই নিজেটা যে কি তা সে ঠিক জানে না, জানতে চায়ও না বোধহয়।

সে একবার তাকায় চারদিকে, সেখানে অন্ধকার থাকে শুধু, আর থাকে বাতাস—তার ঠাণ্ডা ছোঁয়া। প্রজেশ সব ভুল-ভ্রান্তি উত্তেজনা পাঠিয়ে দিচ্ছে শান্ত হিম ঘরে, স্বস্তি পাচ্ছে এখন।

প্রজেশ বুক ভরে সেই বায়ু নিয়ে টিলা বেয়ে ঐ রাস্তা দিয়ে নামতে থাকে। দু-পাশে শটি গাছ, মধ্যে মধ্যে কাঁটা ঝোপ। টিলার নীচে অনেক খানি সমান জমি, সেই জমি পেরিয়ে আরও কিছু দূরে জলের ধারা, জমি আর জলের মধ্যে পড়ে থাকে আরও কিছু জমি, যা একটু বৃষ্টি হলে ভরে যায়—নদীর বুক-ই বলা যায়, যা এখন খা খা করছে, বর্ষার স্রোত থাকে তবু। পাহাড়ী নদীর সেই নিয়ম—উপরে পাহাড়ে বৃষ্টি হলে মাতাল হয়ে ভাসিয়ে দেয় সব, তারপর যে কে সেই—নালার মত পড়ে থাকে চুপচাপ।

এখন সে পা রাখছে নদীর বুকে, শুকনো খটখটে সেই বুক। প্রজেশ একটু এগিয়ে থামে, জলের ধারা দেখা যাচ্ছে না, জল ধারা বয়ে যাবার শব্দও নেই। সে ডান দিকে তাকায়—

ঘন অন্ধকার সেখানে, এমন কি সেই শিমুল গাছটাও লুপ্ত হয়ে গেছে ঐ অন্ধকারে। সেই অন্ধকার আস্তে আস্তে ঢেউ ছড়াতে থাকলে সে তাকায় বাঁ দিকে—

সেখানেও অন্ধকার, তবু অনেক অনেক দূরে ছোট্ট আলো যেন। কিসের আলো? আলেয়া নয় তো? আলেয়ার আলো তো দপ্ করে জ্বলে ওঠে, আবার নিভে যায়। কিন্তু এ আলো স্থির হয়ে আছে, বোধহয় ছোট্ট একটা আলোর বৃত্তও তৈরী হয়েছে—লাল মত আলো, চাঁদ লাল হলে যেমন হয়। অথচ আকাশে চাঁদ কোথায় তখন? কেবল তারা।

প্রজেশের শরীর শিউরে উঠছে, ঐ আলো কি লৌকিক নয় তবে? হিমেল

স্রোত এক কাঁপুনি ধরিয়ে দিতে চাইছে, এমন আলো তো আগে দেখেনি কোনদিন। সেই আলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে, সে জোর করে দৃষ্টি সামনে মেলে দিতে চায়। পারে না, ঐ আলোর দিকে চোখ ঘুরে যাচ্ছে কেবল।

কিসেব আলো? এত আকর্ষণী শক্তি তাব! আলো শুধু দৃষ্টিই নয় তার শবীরকেও টানতে থাকছে। সেই টান অমোঘ, তাকে এড়িয়ে যাবার শক্তি নেই প্রজেশের। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে আলোব দিকে, তাব করাব কিছুই নেই এগিয়ে যাওয়া ছাড়া।

প্রজেশ চলেছে, কোনদিকে তাকাতে পারছে না আর, লক্ষ্য সেই আলো। সাইকেলেব মাথায় যে কেরোসিনের আলো ঝোলে, তেমনই এক মাথাব আলো, তার পলতে বাড়ানো নয় তত, তাই আলো লাল উজ্জ্বল নয় মোটে, হাত দু-তিন মাত্র তবল আলোকিত করে।

সেই আলোয দুজন, সামনে কাগজ পাতা, কাগজের উপর রাখা আছে কি যেন। দুজন দেখছে, তুলে নিচ্ছে। দেখছে তুলছে। মগ্ন খুব তারা, চরাচব নেই যেন তাদের পাশে এমনি।

প্রজেশ পলকে চিনে ফেলে, চেঁচিয়ে ওঠে, বাবলু মাণ্টি···

তাব চিৎকার মগ্নতা ভাঙাতে পাবে না তাদের। সে আবার ডাকে, তাতেও কিচ্ছু হয নি, এবা কি তবে আমার মত মোহিত হযে এসেছে আলোব টানে, আমাব মত এরাও কি ভূতগ্রস্ত?

হাড়-কাঁপানো শীত প্রজেশকে জমাট করে দিতে চায়। সে আবার ডাকে, গলা দিযে স্বর বের হয না। তাহলে?

অসহায ভাবে কি করবে ভাবতে ভাবতে বসে পড়ে ওদের পাশে। ছোট্ট একটা ল্যাম্প। সাদা কাগজের উপর দানা ছড়ানো, কযেকটা শিশি। ওবা এক একটা দানা তুলে নিচ্ছে, কি যেন কবতে চেষ্টা করছে, পারছে না, দরদরি ঘামছে শুধু ·

দেখতে দেখতে প্রজেশের যে কি হয়ে যায, সে দুজনকে ঝাঁকাতে থাকে, বাবলু মাণ্টি।

এ্যাঁ! এতক্ষণে মগ্নতায চিড় ধবে ওদেব, বাদলদা, তুমি?

নিজের ডাক নাম শুনে আস্বস্ত হয় খুব, তাহলে ভুতগ্রস্ত নয··· তোমবা কি কবছো? আর, দানার দিকে তাকিযে জিজ্ঞেস কবে, এগুলোই বা কি?

সর্ষের মত মনে হচ্ছে।

সর্ষেই।

সর্ষে ?

হাঁ সর্ষে, এতে অবাক হবার কি আছে ?

প্রজেশ তাকিয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত, তারপব হাসে, তোমবা শেষে ওঝা হলে ?

ওঝা ? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

তা নইলে সর্ষে দিযে কি করছো ? শুনেছি ওঝারা সর্ষে দিয়ে ভূত তাডায। ভূত তাড়ায়,-কাবা ? হেসে ওঠে ওরা, কি বলছো তুমি ? সর্ষে দিযে দিয়ে ভূত তাডানো ? কেন কেন, ওঝাবা তো সর্ষে দিয়ে বলতে বলতে বেকুব বনে যায, অসহায ভাবে তাকায় তাদেব দিকে।

আমরা বরং তার উল্টোই কবছি, বাবলু বলে

উলটোটা ?

হাঁ, আমরা দেখছি সর্ষেব মধ্যে ভূত আছে কিনা, মাণ্টি উত্তর দেয, তাই এক একটা দানা কেটে দেখার চেষ্টা কবছি, কিন্তু...

সর্ষেব মধ্যে ভূত, এবার প্রজেশেব হাসার পালা, কি যা তা বকছো, ওটা তো কথাব কথা, বিশিষ্টার্থক শব্দ প্রবাদ প্রবচন, ওটা তো...

ওহ্ বাদলদা, তুমি কেবল গ্রামাব গ্রামার কর, তাই বাইবে যেতে চাও না, আবে বাবা সর্ষের মধ্যে ভূত না ঢুকলে কি তোমার গ্রামার বইতে ঠাঁই পেতো কথাটা ? নিশ্চয় ঢোকে, নইলে তাই তো, প্রজেশ ঢোক গেলে, না ঢুকলে কথাটাই জন্মাতো না হযত।

লেগে পড়ো তবে, মাণ্টি বলে, ব্লেডটা নাও আর...

মাণ্টি কথা না বাড়িযে সর্ষেব একটা দানা তুলে নেয়, বাঁ হাতের বুড়ো আঙুল আর তর্জনীব মধ্যে সেটা রেখে ডান হাতে ব্লেড নিযে বলে, ঠিক মধ্যিখানে ব্লেডটা চালাবে, ভূত দেখলেই ব্যাস্....

বোতলের মধ্যে ঢুকিযে ছিপি আটকে দেবো, জাষ্ট লাইক—

আরেবীয়ান নাইটস্, বাবলু মাণ্টি বলে ওঠে, তখন যাবে কোথায, শক্ত হাতে পড়েছে এখন

প্রজেশ তুলে নিচ্ছে সর্ষেব দানা, রাখছে দু আঙুলের চাপে, ডান হাতে ব্লেড নিয়ে কাটতে চাইছে। যতবার তুলছে দানা, রাখছে আঙুলেণ ফাঁকে,

কাটতে চাইছে মাঝামাঝি, ততবার ফসকে যাচ্ছে, যতবার দানাটা গলে মাটিতে পড়ে দৌড় লাগাচ্ছে কোথায় কোথায়, আলোর বৃত্তের বাইরে, আর হাত আঙুল নড়ে যাওয়ায় ব্লেডের ঘা লাগছে চামড়ায সঙ্গে সঙ্গে কেটে যাচ্ছে, রক্ত বের হচ্ছে।

বাবলু মাণ্টি আঙুল কেটে যাচ্ছে, রক্ত বেব হচ্ছে যে—

বাবলু মাণ্টি-ই বা কি বলবে, তাদেরও সেই একই হাল—সর্ষের দানা আঙুলেব ফাঁক থেকে খসে পড়ে যাচ্ছে মাটিতে, আর হাত নড়ে যাবার ফলে ব্লেড কেটে দিচ্ছে চামড়া, রক্ত ঝবছে···তিনজনেই কিছুতেই পারছে না দানা কে আধাআধি কাটতে, দানা ছুটে হাবিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে, ব্লেডে কেটে যাচ্ছে আঙুল, আব দরদবিযে ঘামছে শুধু···

যত পারছে না, তত বোখ চেপে যচ্ছে

ঘাম রক্ত যতই ঝবুক, থামলে চলবে না, দেখবো কোথায লুকিযে আছে ভূত, কতক্ষণ লুকিয়ে থাকবে আর

বাত বাড়ছে

ওরা তিনজনই সর্ষের এক একটা দানা তুলে নিচ্ছে, বাঁ হাতেব বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর মধ্যে বাখছে, ব্লেড দিযে কাটতে চেষ্টা কবছে আধা-আধি, দানা ফসকে হাবিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে, ব্লেডের ঘায কেটে যাচ্ছে আঙুল হাত, রক্তে ঘামে চটচটে হযে যাচ্ছে চবাচর

তবু তারা দানা তুলছে, আঙুলেব মধ্যে বাখছে, ব্লেড দিযে কাটতে চাইছে, দানা ফসকে হাবিয়ে যাচ্ছে, ব্লেডে ·

রক্ত ঘাম একাকাব

রাত বাড়ছে। বেড়েই চলে

———

'ফাইল ফেলে রাখবেন না'

জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়

চার্চের কাছে পৌঁছে হাঁপাতে থাকেন বিনয়বাবু। ছায়ায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে নিঃশ্বাস নিতে হয় অনেকক্ষণ।

মাথার ওপর ঠা-ঠা রোদ্দুর। গলগল করে ঘাম ঝরছে। গেঞ্জি ভিজে ন্যাতা, পাঞ্জাবিও লেপটে গেছে গায়ে। চশমা খুলে হাঁটুর তলা থেকে ধুতি তুলে চশমার কাঁচ মোছেন বিনয়বাবু, ঘসে ঘসে, যত্ন করে। চশমার কাঁচে ঘাম পড়েছিল বলে, নাকি যা দেখছেন সত্যিই তা দেখছেন কিনা বোঝার জন্যে, ঠিক ধরা যায় না। অনেকক্ষণ ধরে মুছে চশমা চোখে তুলে আবার তাকান বিনয়বাবু।

প্যাসেজে ঢোকার মুখে গেট জুড়ে কাপড়ের বিশাল তোরণ। তোরণের মাথায় মস্ত ফেস্টুন। 'জনগণের সেবাই আমাদের ব্রত।' শাদা কাপড়ের ওপর নীল রঙের বড় বড় পুরুষ্টু হরফে লেখা, তোরণের এ-মাথা থেকে ও-মাথা। তোরণও সাজানো হয়েছে রঙিন কাপড় দিয়ে, ফুল দিয়ে।

এক সার গাড়ি যেতেই বিনয়বাবু রাস্তাটা পার হন। তোরণ পার হয়ে পায়ে পায়ে ঢুকে যান প্যাসেজে। এক সময় এই পথে প্রতিদিন আসতে হতো তাঁকে। সে-ও অবশ্য অনেকদিন হলো। সময় কি দ্রুত চলে যায়! তবু এই বাড়ি, এই গেট, এই প্যাসেজ কি ভোলা যায়!

এতো চেনা অথচ আজ যেন কেমন অচেনা লাগে। পোস্টারে, ফেস্টুনে, ফুলে ফুলে দেওয়ালের চেহারাই বদলে গেছে। সেই প্রাচীন মলিন, চেনা চেহারা আর নেই। সেজেগুজে যেন ঝলমল করছে।

লাল ফেস্টুনে লম্বা লম্বা হলুদ হরফে লেখা, 'বকেয়া কাজ আজই সেরে ফেলুন!' শাদার ওপর নীল দিয়ে লেখা, 'কর্ম সংস্কৃতি উন্নয়নের আন্দোলনে যোগ দিন। নীলের ওপর শাদা দিয়ে, 'আপনার হাতে দেশের প্রাণ, দেশকে বাঁচান!' হলুদের ওপর লাল দিয়ে, 'ফাইল পড়ে থাকলে আপনি পড়ে থাকবেন।'

হরফগুলোর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বিনয়বাবু। তাঁর মনে হয়, শেষ পর্যন্ত ভগবান কি তবে মুখ তুলে তাকালেন! শেয়ালদা থেকে হেঁটে

আসার ধকলে তখনও তিনি হাঁপাচ্ছেন। তবু তাঁর মনে হয়, আজই যদি হয়ে যায়, কাগজপত্র হাতে নিয়ে যদি বাড়ি ফিরতে পারি, বৌমার মুখের ওপর ছুঁড়ে মারব। গুনে গুনে ফিরিয়ে দেব সব কথা। বলবি আব মুরগীর মাস্টার বলবি ?

আরে, মুরগী যে পুষি তাতে তো তোদেরই সুরাহা হয়! যতটুকুই হোক তোদেরই হয়। সপ্তাহে যে ছ'টা আটটা ডিম হয়, সে ডিম কি আমি খাই ? তোর ছেলে খায়! তোর সোয়ামীও খায়! মাসে যে একটা-দুটো মুরগী বিক্রী হয় তার টাকাটা অবিশ্যি আমিই রাখি। তার বেশির ভাগ তো মুরগীর ভোগেই যায়। তা ছাড়া আমায় নিজেরও তো এটাতে সেটাতে দু' চার পয়সা লাগে।

টুকুনের পড়া যেটুকু যা পারি সে তো আমিই দেখিয়ে দিই! তোর বিদ্যের দৌড় তো জানা আছে। সেই আমাকেই কিনা মুরগীর মাস্টার বলে গাল দিস ? হারামজাদী!

গালটা মনে মনেই দেন বিনয়বাবু, কেউই শোনে না, তবু লজ্জায় পড়ে যান তিনি। ছি, ছি! হাজার হলেও ঘরের বৌ, নিজে দেখেশুনে পছন্দ করে এনেছিলাম, তাকে কি তুইতোকারি করা যায়, না এমন ভাষায় গাল দেওয়া যায় ? সে যদি খারাপও হয়, আমি কেন···চশমাটা খুলে ধুতির খুট দিয়ে এবার মুখটা মোছেন তিনি।—তাছাড়া ওদেরও তো কষ্ট করেই চালাতে হয়। কতোই বা পায় বাবলু! ওদের অভাবের সংসারে আমি তো একটা বাড়তি পেট ঠিকই! যতো রকম ঝক্কি তার বেশির ভাগ তো বৌটাকেই—নানান জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে মাথাটা যদি কখনো-সখনো গরম হয়ে যায়, সে তো যেতেই পারে। সেসব ধরতে গেলে কি—পেনশনটা যদি পাওয়া যেত সবই একেবারে অন্যরকম···

তার চেয়ে বরং কিছুই বলব না, একটি কথাও নয় ; যেন কিছুই হয় নি। রাত্রে খেতে বসে, বা আরো ভালো হয়, খাওয়ার পর একটা বিড়ি, না বিড়ি নয়, একটা সিগারেট ধরিয়ে প্রথমে বাবলুকে ডাকব, তারপর বৌমাকে। বলব—

ভাবতে ভাবতে, বাবলু ও বৌমার সঙ্গে নীরবে সংলাপ বিনিময় করতে করতে পোস্টার, ফেস্টুন আর মাঝে মাঝেই ফুল দিয়ে সাজানো পথ ধরে হেঁটে যান বিনয়বাবু। যেতে যেতে পৌঁছে যান মিটিঙে।

ক্যাণ্টিনের বিশাল হলঘব। হলের এক প্রান্তে দেয়াল ঘেঁসে মঞ্চ, বেশ বড়সড়। তার সামনে সার সার কাঠেব ফোল্ডিং চেয়ার পাতা। হলের দেয়ালে দেযালে, মঞ্চেব পিছনে আরও পোস্টার, আরও ফেস্টুন, আবও ফুল। চারপাশে মাইক্রোফোনের বাক্স। বক্তৃতায় গমগম করছে হলটা। রীতিমতো জমজমাট মিটিং, যদিও ভিড় তেমন জমে নি।

বিনয়বাবুর মনে পড়ে, রিকুইজিশনে ডিস্ট্রিকটে চলে যাওয়ার আগে এই হলে কতো মিটিং শুনেছেন। তখন অবশ্য এতো মাইক, এমন মঞ্চ, এতো ফুলটুল থাকত না। ক্যান্টিনের টেবিলে দাঁড়িয়ে নেতাবা হ্যাণ্ড মাইকে বক্তৃতা দিতেন আব তাঁবা বক্তাকে ঘিরে গোল হযে দাঁড়িযে দাঁড়িযে শুনতেন।

একপাশে দাঁড়িযে বক্তৃতা শোনেন বিনযবাবু। আসল বক্তারা আসার আগে মিটিংটা ধরে রাখার জন্যে যেমন বক্তৃতা হয়, তেমনি হচ্ছে। অ্যাপ্রেণ্টিসবা বক্তৃতা কবছে। পবে এদের মধ্যেই কেউ কেউ প্রধান বক্তা হযে যাবে।

ফেস্টুনে যা লেখা আছে সেইসব কথাই ঘুরিয়েফিরিযে, নানাভাবে হচ্ছে। বারবাব জোর পড়ছে কাজের উন্নতি ঘটানোব ওপর। ফাইল ফেলে না রেখে দ্রুত ছেড়ে দেওয়ার ওপর। শুনতে শুনতে বিনয়বাবু যেন প্রায় নিশ্চিতই হযে যান, তাঁর পেনসনের একটা সুরাহা এবার হয়েই যাবে।

'দাঁড়িয়ে আছেন কেন, বসুন না! এতো চেয়ার খালি রয়েছে!'

ছাই রঙেব প্যাণ্টেব ওপর গোলাপী বুশ শার্ট, কালো ফ্রেমের চশমা, একটি যুবক তাঁর কাছে এসে বলে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা তো বটেই—'

বলতে বলতে একটা চেয়াবেব দিকে এগিয়ে যান বিনয়বাবু, কিন্তু বসেন না। কী মনে করে ফিবে আসেন।

'কী হলো?'

হাসিমুখে জানতে চায় যুবকটি।

'মানে, ব্যাপারটা হলো, আমি ঠিক মিটিঙে আসি নি।'

'তবে?'

যুবকটি তাঁর কথার মানেই বোঝে না। মিটিঙে আসেন নি তো মিটিঙেব মধ্যে কি করছেন ইনি?

'মানে, ব্যাপাবটা হলো—আমার একটা কেস, খুব জটিল কেস, অনেক-দিনের পুরোনো তো—আমাব পেনশন—আমার কেসটা একটু শুনবেন,

ভাই ? আপনারা তো ইউনিয়ন করেন—নেতা—'

'না, না, আমি নেতা নই। তবে যদি সংক্ষেপে—মিটিং-এর সময়—

বিনয়বাবু সাধ্যমতো সংক্ষেপেই বলতে আরম্ভ করেন। একটুখানি শুনেই যুবকটি হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে দেয়।

'আপনি বরং আশুদাকে বলুন কেসটা।'

'আশুদা ?'

'আমাদের নেতা। ওই যে স্টেজের পাশে বসে আছেন। চলুন!'

যুবকটি হাঁটতে আরম্ভ করে, তাঁর পেছন পেছন বিনয়বাবু।

স্টেজের পাশে একটু পেছনদিক চেপে, দেয়াল ঘেঁসে একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসেছিলেন আশুবাবু। ধুতি, গেরুয়া রঙের হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি, কনুই-ওপরে পরিপাটি করে ভাজকরা হাতা, বাদামি রঙের মোটা ফ্রেমের চশমা, এক-মাথা ঘন চুল, কালোর চেয়ে শাদাই বেশি, পাটপাট করে ব্যাকব্রাশ করা। একটু বেঁটে, অল্প একটু ভুঁড়ি।

'আশুদা, এঁর একটা প্রবলেম আছে, আপনি যদি একটু শোনেন—'

'নিশ্চয়ই, কী ব্যাপার বলুন তো !'

বিনয়বাবু তাঁকে নমস্কার করার জন্যে হাতদুটো বুকের কাছে জড়ো করেছিলেন। সেইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। বলেন,

'দয়া করে যদি আমার নিবেদনটা শোনেন, আপনার সামান্য একটু সাহায্য পেলেই আমার জীবনটা—বহুদিন হয়ে গেল আমার পেনশন—'

'নিশ্চয়ই শুনব, কিন্তু আপনি ওভাবে কথা বলছেন কেন ? হাত নামান, হাত নামান ! আর দাঁড়িয়ে আছেন কেন ? আপনি একজন সিনিয়র—সুবিমল ভদ্রলোককে একটা চেয়ার দাও না !'

যুবকটি প্রায় দৌড়ে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে আনে। বিনয়বাবুর পেছনে সেটা পেতে দিয়ে বলে,

'বসুন, বসুন !'

বিনয়বাবু কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। যেভাবে হেঁ হেঁ করে তিনি হাসেন, চেয়ারের কিনারে পেছনটা ঠেকিয়ে যেমন আড়ষ্ট হয়ে বসেন, বোঝাই যায় এরকম ব্যবহার তিনি আসাই করেন নি। এমন ব্যবহার পাওয়ার অভ্যাসই নেই তাঁর।

'বলুন, কী সমস্যা আপনার।'

'আমিও সরকারি কর্মচারী।'

বিনযবাবু আবার হেঁ হেঁ করে হাসেন। কথাটা বলেই বোঝেন কেমন কেমন বোকা বোকা হয়ে গেল। সয়কারি কর্মচাবী না হলে এখানে তাঁর পেনশনেব ফাইল থাকবে কেন?

'তবে বিটায়ার্ড!'

এমনভাবে বলেন যেন একটু রসিকতা করলেন। যেন বসিকতা দিয়ে আগের বোকামিটা ম্যানেজ করলেন। করতে গিয়ে বোঝেন আবার বোকামি বলো। রিটায়ার্ড না হলে পেনশনের কথা উঠবে কেন?

'আমাব পেনশনটা অনেকদিন ধবে—অনেক হাঁটাহাঁটি ধরাধরি কবেও—আজকেও দেখুন না, একজনের মান্হলি ধাব কবে—'

'কোন ডিপার্টমেণ্ট?'

'সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার। তবে ওরিজিন্যালি আমি কিন্তু—'

তাকে থামিযে দিয়ে আশুবাবু জিজ্ঞেস কবেন,

'ফিনান্সের ক্লিয়ারেন্স হয়ে গেছে?'

'বোধহয় আমি ঠিক—

'লাস্ট পোস্টিং কী ছিল?'

'কৃষ্ণনগরে থাকতে থাকতে, ঠিক কৃষ্ণনগরে নয়, বেথুয়াডহাবিতে—অসুস্থ হয়ে পডলাম—বাধ্য হযে ছুটিতে—নইলে প্রমোশনের সব একদম—তাব পরেই পাঠিযে দিল একেবাবে আলিপারদুয়াবে বিফিউজি ক্যাম্পে—'

বিনযবাবু আপনমনে বলে যান। আশুবাবু শুনতে শুনতে ঘাড় নেড়ে যান। তাবপব হাত তুলে তাকে থামিযে চোখ বুজে ভাবেন কিছুক্ষণ। ভাবা হযে গেলে বলেন,

'সুবিমল, ওঁকে ফিনান্সে বিজযের কাছে পাঠিয়ে দাও।'

বিনযবাবুর দিকে তাকিয়ে হাসেন তিনি।

'কিচ্ছু ভাববেন না, চলে যান, হযে যাবে।'

বিনয়বাবু বিনযে সংকুচিত হযে উঠে দাঁড়ান। তাঁর পিঠে একটা হাত রাখেন আশুবাবু।

'কোনও অসুবিধা হলে চলে আসবেন, আমরা তো আছিই।'

বিনযবাবুর চোখে জল এসে যায। তিনি মুখ ঘুরিয়ে নেন। বাবলু যদি এইভাবে কথা বলত! একদিনও যদি বলত! অন্তত একবারও!

আজ যদি সুবাহা হয়ে যায়, ফিরে গিয়ে, খাওয়াদাওরা সারা হলে—

'বাবলু, সামনের মাস থেকে সাহাবাবুর ওখানে খাতা লেখার কাজটা তুমি ছেড়ে দাও। সন্ধ্যেবেলাটা পড়শোনার জন্যে রাখো, এম কমটা দিয়ে দাও। বয়েস হয়ে যাচ্ছে, আর কবে দেবে ?'

বাবলুর তো চক্ষুদুটি ছানাবড়া, একেবারে হাঁ !

খুব গম্ভীরভাবে বলতে হবে কথাগুলো।

লিফট বন্ধ ছিল। বিনয়বাবুর তাতে আটকায় না, তিনি তখন আশ্বাসে হাসিতে, বিশ্বাসে হাতের স্পর্শে বলীয়ান।

তারপর বৌমাকে—'আর বৌমা, টুকুনের জন্যে একজন ভালো মাস্টার ঠিক করো, মুরগীর মাস্টারের কাছে পড়ে আর কাজ নেই ওর।'

বৌমা তো একেবারে থ। যে লোকের মস্তক অহোরাত্র নত থাকে, চোখ তুলে যে তাকায় না, এমন কি ভাতের খোঁটাতেও রা কাড়ে না, সেই লোকের মুখে খৈ ফুটছে ! আর বলার কি ভঙ্গি ! যেন পার্টির নেতা !

মোক্ষম কথাটা বলতে হবে যেন খুব নির্বিকারভাবে, জানলার বাইরে তাকিয়ে যেন হঠাৎই মনে পড়ে গেছে,

"আর হ্যাঁ, টাকার জন্যে ভেবো না, সে ভার আমার।"

পেনশনটা পাশ হয়ে গেলে—অ্যারিয়ারই তো হবে প্রায়—

দোতলার পর থেকে একটু কষ্ট হয়, তিনতলায় উঠে হাঁপাতে থাকেন বিনয়বাবু। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে দেয়াল হেলান দিয়ে একটু বিশ্রাম করতে ইচ্ছে করে। করেন না। লোকটা যদি বেরিয়ে যায় ! সুবিমলের নির্দেশ মতো চলতে থাকেন তিনি। "বড় বারান্দা থেকে পেছনের ব্রিজ হয়ে ছোট বারান্দার বাঁ পাশের ব্রিজ পার হয়ে ডান দিকের গলি দিয়ে এগিয়ে বাঁ দিকের ব্লকের ভেতর দিয়ে ছোট গলি পার হয়ে মাঝারি বারান্দা ছাড়িয়ে ডান দিকে ঘুরতে যে ব্লকটা পাবেন, সেটা ছাড়িয়ে—

সাত আট জনকে জিজ্ঞেস করে ঘণ্টাখানেক ঘুরে, একই জায়গায় বার পাঁচেক ফিরে এসে আবার সুরু করে—শেষ পর্যন্ত পেয়ে যান বিনয়বাবু।

"বিজয়বাবু, মানে বিজয় দত্ত ?"

"তা হতে পারে।"

"হতে পারে মানে ? যার কাছে এসেছেন, তার নামটাও জানেন না ?"

"ওই ওরা বলে দিলেন নিচে থেকে।"

"ওদের আর কী বলে দিয়েই—ব্যানার্জি, এই ব্যানার্জি।"

চারটে টেবিলের ওপারের টেবিলে পেছন ঠেকিয়ে কথা বলছিল ব্যানার্জি তাকে ঘিরে সাতআট জন দাঁড়িয়ে, বসে। সব কথা শোনা যায় না। মাঝ-খানের টেবিলগুলোর ওপর ফাইলের পাহাড় পার হয়ে কিছু শব্দ ভেসে আসে।

'—'সরকারি কমিটমেণ্ট—প্রাইস ইনডেকস পে কমিশন—বকেয়া ডি এ মামদোবাজি—অর্জিত অধিকার—'

"এই ব্যানার্জি।"

ব্যানার্জি হাত তোলে। ভঙ্গিতে অভয়দান, সঙ্গে ধৈর্য ধরার নির্দেশ! বিনয়বাবু দাঁড়িয়ে থাকেন।

ভদ্রলোক ফাইলের ওপর ঝুঁকে পড়েন। সেটা সেরে পরের ফাইলটা হাতে নিতে সময় লাগে, ততোক্ষণে ব্যানার্জি এসে পড়ে।

"বলুন কী ব্যাপার।"

"ইনি বিজয়বাবুকে খুঁজছেন।"

"বিজয়বাবু—মানে দত্ত তো?"

"হতে পারে।"

"ও তো অ্যারিয়ার বিল সেকশনে চলে গেছে, সেখানে খোঁজ করুন"—বলে পাশ ফিরে আবার সেই টেবিলের দিকে রওনা হয় ব্যানার্জি।

"তা হলে কী হবে?"

পেনশনটা যেন হাতে আসতে আসতেও এলো না বিনয়বাবুর। ব্যানার্জি ঘুরে দাঁড়ায়। তাঁকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, আপাদমস্তক, যেন এতোক্ষণে লোকটা তার চোখে পড়ল, এই প্রথম।

"কী ব্যাপার, বলুন তো?"

"ব্যাপার মানে—আমার পেনশনটা—কয়েক বছর ধরে—।

"ও পুরোনো কেস! এক কাজ করুন, নিচে চলে যান, ওখানে একটা মিটিং হচ্ছে—না, বরং মিটিংটা শেষ হলে আসুন। অথবা কাল কিংবা পরশু।"

—পেনশনটা যেন আরো দূরে সরে যাচ্ছে। মরিয়া হয়ে বিনয়বাব বলেন।

"ওঁরাই তো পাঠিয়ে দিলেন এখানে। আশুবাবু…" ব্যানার্জি আরো

একটু মন দিয়ে দেখে বিনয়বাবুকে, হয়তো আশুবাবুর নামটা শুনেই। তখনই তার চোখে পড়ে বিনয়বাবুর খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ি আর পাঞ্জাবির গলা থেকে বেরিয়ে পড়া গেঞ্জির ছেঁড়া ছেঁড়া সুতো।

"কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে রিটায়ার করেছিলেন ?"

"সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার, আমি কিন্তু ওরিজিন্যালি'—

"তবে সেখানে যান।"

"ওঁরা যে বললেন ফিনান্সে…।" ব্যানার্জি এবার বিরক্ত হয়।

"ফিনান্স বললেই তো হলো না। ফিনান্স একটা বিরাট ডিপার্টমেন্ট, এখানে কোথায় খুঁজবেন ? এখানে আছে কিনা, থাকলে ঠিক কোথায় আছে তা বলার দায়িত্ব আপনার ডিপার্টমেন্টের, তাদের কাছে যান।"

শেষ কথা বলে ব্যানার্জি ফিরে যায় সেই টেবিলে। বিনয়বাবু চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে দেখেন, ব্যানার্জি হাত নেড়ে নেড়ে কী সব বোঝাচ্ছে, আর তার চারপাশের সবাই হা করে বুঝছে। পায়ে পায়ে সেই ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ান বিনয়বাবু।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ তাকে দেখতে পায় ব্যানার্জি।

"আবার কী হলো ?"

"কী ভাবে যাবো যদি দয়া করে একটু বলে দেন।"

"জ্বালিয়ে খেলে।"

মুখ ঘুরিয়ে ঠোঁটের দুটো কোন দুপাশে ঠেলে গালদুটো থেবড়ে উচ্চারণ করে ব্যানার্জি। সবাই হেসে ওঠে। ব্যানার্জি বলে দেয়।

বিনয়বাবু বড় বারান্দায় বেরিয়ে পূব দিকে গিয়ে বাঁ দিকের গলি হয়ে ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় নেমে ডান দিকে এগিয়ে বাঁ হাতের ব্লকের ভেতর দিয়ে চাপা গলি পার হয়ে আর একটা বারান্দায় প'ড়ে বাঁ দিকে ঢুকে —ঘুরতে ঘুরতে জনা সাতেককে জিজ্ঞেস করে, বার কয়েক ভুল করে, ভুল সংশোধন করে শেষ পর্যন্ত পেয়ে যান।

"পেনসন ? পেনসন তো ফিনান্সে।"

"ওরাই পাঠাল এখানে।"

"তার মানে ফাইল হারিয়ে ফেলেছে।"

"আজ্ঞে ?"

"কতোদিন আগে রিটায়ার করেছিলেন ?"

বলেন বিনয়বাবু।

"এখান থেকে ?"

"আজ্ঞে না, কৃষ্ণনগর থেকে।"

"উফ, সে কথা হচ্ছে না, এই ডিপার্টমেন্ট থেকে ?"

ধমক খেয়ে কেমন চুপসে যান বিনয়বাবু।

"ওবিজিন্যালি আমি এডুকেশনের লোক, রিকুইজিশনে এই ডিপার্টমেন্টে

"তবে এডুকেশন আপনাকে পেনসন দেবে, আমরা কেন দেব ?"

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন বিনয়রবাবু। বেশ বুঝতে পারেন, পেনশনটা হাতের মুঠোয় আসতে আসতে পিছলে যাচ্ছে।

"তা হলে কী করবো ?'

"আপনি ববং ইউনিযন অফিসে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। না না আজ তো মিটিং আছে, ইউনিয়নের সবাই তো—আপনি সেখানে গিয়ে দেখতে পারেন।"

গলি বাবান্দা ব্লক সিড়ি পার হয়ে হযে আবার মিটিঙে ফিরে আসেন বিনয়বাবু।

মিটিঙ তখন পুরোদমে চলছে। মঞ্চের পাশে দাঁড়িযে সুবিমল কাকে কী একটা বোঝাচ্ছিল। বিনয়বাবুকে দেখেই কথা থামিযে জিজ্ঞেস কবে।

"কী হলো ? কাজ হয়ে গেছে ?'

"নাহ্।"

লম্বা একটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশে তাঁর বুক থেকে শব্দটা এমন ভাবে বেবিয়ে আসে, বিনযবাবুর সমস্ত ক্লান্তি আর হতাশা যেন এক অক্ষরের শব্দটিতেই বাঁধা পড়ে যায়।

"হলো না ? কী ব্যাপার ?"

বিনয়বাবু বলেন, বলতে সময় লাগে। সুবিমল তাব মধ্যেই আবো দু-তিন জনের কথা শোনে, জবাব দেয়, বোঝায়। অবশেষে বিনয়বাবুব চোখের দিকে তাকিযে বলে।

"আগে বলবেন তো এডুকেশনের কথা !"—একটু বিরক্ত হযেই বলে সুবিমল। "বলতে তো চেষ্টা করেছিলাম। আপনারা তো শুনলেন না"—বলতে গিয়েও বলেন না বিনয়বাবু। যদি রেগে যায়। মুখ নীচু করে

দাঁড়িয়ে থাকেন।

"এডুকেশনেই যেতে হবে আপনাকে।"

তাই যান বিনয়বাবু। সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে, সিঁড়ি যেন আর শেষ হয় না, বারান্দা পার হয়ে হয়ে কী দীর্ঘ সব বারান্দা ছোট বড় মাঝারি গলি পেরিয়ে নানা ব্লকের ভেতর দিয়ে, ব্লকগুলো অসম্ভব বড় মনে হয় তাঁর, নানা জনকে জিজ্ঞেস ক'রে ক'রে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে যান তিনি। পৌঁছে গিয়েও ভেতরে ঢুকতে পারেন না, দরজা ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দম নেন।

একটু সামলে নেওয়ার পর ভেতর ঢুকতে গিয়ে ঢুকতে পান না।

"কোথায় যাচ্ছেন ?"

"মৃত্যুঞ্জয়বাবু—

"এখন টিফিন, ভেতরে যাবেন না।"

ভেতরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বিনয়বাবু। দীর্ঘ হলঘর, অন্ধকার, অন্ধকার। অনেকগুলো বাদামী আলোর বালব জ্বলছে। অনেক টেবিল আর চেয়ার আর ফাইল।, টেবিলের ওপর ফাইলের স্তূপ। টেবিলের পাশে মেঝে জুড়ে ফাইল। দেয়াল ঘেঁসে ফাইলের গাদা। দেয়ালে লম্বা লম্বা তাকে ফাইলের ওপর ফাইল। ধূসর, বিবর্ণ কালো। মাকড়সার জালে ঘেরা। এরই মধ্যে কোথাও আছে আমার ফাইল। আমার পেনশন, আমার মুক্তি। এখন আর বাবলু কিংবা বৌমার কথা মনে পড়ে না। বিনয়বাবুর, পেনশন শব্দটা ছাড়া আর কিছুই মনে পড়ে না তাঁর। ফাইলের জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। অনেকক্ষণ পরে জিজ্ঞেস করেন।

"মৃত্যুঞ্জয়বাবু কি এসেছেন ?

"বললাম না যে এখন টিফিন !"

লোকটা খুব বিরক্ত হয়েছে বোঝা যায়, বিনয়বাবু চুপ করে থাকেন।

"এটা এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট তো ?"

"বললাম যে এখন টিফিন।"

বিনয়বাবু দরজা থেকে সরে যান, যেন ভয়ে ভয়ে। লোকটা যদি চটে যায়, পেনশনে বাগড়া দিয়ে দিতে পারে। দিতেও তো পারে। কতোজন তো দিয়েছে, হয়তো এখনো দিচ্ছে। নইলে এতোদিন পরে—।

বারান্দায় তখন টিফিন চলছে। সার সার খাবারের দোকান। টোস্ট,

ওমলেট, ডিম সেদ্ধ, ঘুগনি, আলুর দম, মাংস কাটলেট, চপ, পাকা পেপে পাকা কলা, অপেল, কফি, দুধ, কমপ্লান। ভিড় ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি। হঠাৎ বিনয়বাবু বুঝতে পারেন খিদে পেয়েছে। এদিক ওদিক তাকাতে দূরে একটা বেসিনের ওপর জলেব কল চোখে পড়তে টেব পান তেষ্টাও পেযেছে। জল খেযে চোখে মুখে ঘাড়ে জল দিযে তিনি আবার সেই দবজায ফিরে আসেন। দরজাটা এমন ভাবে ধরে দাঁডিযে থাকেন যেন দরজাটা কোথাও চলে যেতে পাে্র, হারিয়েও যেতে পাবে। যেতেও তো পারে। তাব পা টনটন করে, মাথাটা ভাব হযে আসে হাতদুটো অবশ ঠেকে। তবু দবজা ছেড়ে নড়েন না তিনি।

ধীবে ধীবে লোকজন ফিরে আসতে থাকে। একজনকে ধবেন বিনয়বাবু।

"টিফিন শেষ হলো?"

"মানে? কী বলতে চান আপনি?"

বিনয়বাবু থতোমতো, বাক্যহীন।

"না, মানে টিফিনের সময় শেষ হযেছে কিনা—'

"আমরা তিনটে অবধি টিফিন করি, এই বলতে চান তো?"

"আজ্ঞে না, সেকথা আমি একেবারেই—মানে টিফিনেব'

'বেশ কবি, তাতে কার বাপের কী? যতোসব!":

লোকটি শব্দ কবে পা ফেলে ফেলে ভেতরে চলে যায়। বিনয়বাবু ভয পান। ইনিই যদি মৃত্যুঞ্জয়বাবু হন কিংবা তাঁব বন্ধু বা পাশেব টেবিলের সহকর্মী?

বিনয়বাবুব ভয় সত্যি হয না। মৃত্যুঞ্জয়বাবু সেদিন অফিসে আসেন নি।

"এখন তাহলে আমি কি করি?"—বিড়বিড় করতে কবতে দবজাব দিকে এগিযে যান বিনযবাবু। ভদ্রলোক এমনভাবে তাকিয়ে থাকেন যেন পাগল দেখছেন। বিনয়বাবু ফিবে আসেন আবার।

"আচ্ছা, আব কেউ বলতে পারবে না?"

"কী"

"আপনি শুনবেন দযা করে?"

ভদ্রলোক উত্তব দেন না। বিনয়বাবু বলে যান।

"অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।"

"কোথায় পাব তাঁকে ?"

ভদ্রলোক আঙুল তুলে দেখিয়ে দেন। হলঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে টানা বারান্দার মতো জায়গায় খোঁপ খোপ ঘর। তারই একটাতে মিস্টার চৌধুরীর অফিস। সে অফিসে ঢোকার আগেই সুইং ডোরে হাত দিতেই,

"কাকে চাই ?"

"মিস্টার চৌধুরীর কাছে একটু—"

"এখন হবে না, সাহেব ব্যস্ত আছেন।",

"কখন হবে ?"

"জানি না। দরজা ছেড়ে দাঁড়ান।"

দরজা থেকে সরে এসে দেয়ালে হ্যালান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বিনয়বাবু। ততোক্ষণে তিনি বেঁকে গেছেন, সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা প্রায় ফুরিয়েই গেছে। তাঁর মনে হয়, এতো করে এতোটা পথ এসে ওই সুইং ডোরটা পার হওয়া যাবে না ? আর তো কয়েকটা পা, তারপরেই মিস্টার চৌধুরী এবং আমার পেনশন। এমনভাবে ভাবেন বিনয়বাবু যেন মিস্টার চৌধুরী তার পেনশন হাতে নিয়ে বসে আছেন। তিনি ভেতরে ঢুকলেই টুপ করে ফেলে দেবেন তাঁর অঞ্জলিতে।

কতো লোক ভেতরে যায় কতো লোক বেরিয়ে আসে। বিনয়বাবু দাঁড়িয়ে থাকেন। যুবকটি দরজার পাশে টুলে বসে তাঁর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকে যেন তার ওপরে নজর রাখার জন্যেই সরকার তাকে নিয়োগ করেছে।

"দুটো টাকা হবে ?"

চমকে ওঠেন বিনয়বাবু। তন্দ্রার মতো এসেছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঝিমোচ্ছিলেন। লোকটার মুখ তাঁর কানের পাশে। বিনয়বাবু হাসেন। পাঞ্জাবির পকেটে হাত দিয়ে খুচরোগুলো বের করেন। মোট একটাকা আটত্রিশ পয়সা।

"না, ওতে হবে না, দুটাকার কম নেওয়ার নিয়ম নেই।"

বলতে বলতে তাঁর হাত থেকে খুচরোগুলো তুলে নেয় লোকটা।

"আমি সাহেবের চা আনতে যাচ্ছি, যে লোকটা ভেতরে আছে, সে বেরোলে আপনি ঢুকে পড়বেন।"

"কী বলে যে তোমাকে আশীর্ব্বাদ করব বাবা !"

কৃতার্থ বিনয়বাবু বিগলিত হয়ে বলেন।

ঘরে ঢুকে ধমক খান তিনি।

"কী ব্যাপার, কী চাই আপনার ?"

"আজ্ঞে পেনশন।"

"পেনশন ? মানে ?"—মিস্টার চৌধুরী স্পষ্ট বোঝেন একটা পাগল কোন ভাবে ঢুকে গেছে ঘরে, নইলে এডুকেশনের অফিসারের কাছে কেউ পেনশন চায় না। বিনয়বাবুর পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়েই তিনি নিশ্চিত হয়ে যান, লোকটা পাগল।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার 'পেনশন', অনেকদিন ধরে আটকে আছে।"

"আমি আর কী করব, ফিনান্সে যান।"

বলতে বলতেই টেবিলের কাছে লাগানো বেলটা টিপে যাচ্ছিলেন মিস্টার চৌধুরী। কেউ আসছে না দেখে সুইং ডোরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, "লক্ষণ, লক্ষণ !"

বিনয়বাবু বোঝেন লক্ষ্মণ এসেই তাঁকে বের করে দেবে, তাঁর আগেই বলে ফেলতে হবে সব। মরিয়া হয়ে তিনি বুকের কাছে দুহাত জোড় করে বলেন।

"আমি স্যার, আপনারই স্টাফ, মানে এই ডিপার্টমেণ্টেরই, আমার নিবেদনটা স্যার, রিটায়ার করার পর থেকে সমানে ঘোরাঘুরি করছি, আজ পর্যন্ত—।"

বিনয়বাবু একটানা বলে যান, খুব বেশী সময়ও লাগে না। বারবার বলতে বলতে অভ্যেস হয়ে গেলে যেমন হয়। মিস্টার চৌধুরী ততোক্ষণে বুঝেছেন লোকটা ঠিক পাগল নয়, অন্ততঃ যতোটা ভেবেছিলেন ততোটা নয় কিংবা এখনও ততোটা হয়ে যায় নি। এবং আশ্চর্য, কেসটা তাঁর মনে পড়ে যায়। সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার আর ফিনান্সের সঙ্গে এই কেসটা নিয়ে অনেক চিঠি চালাচালি, আইনের প্যাঁচ কষাকষি হয়েছিল। সার্ভিস হারিয়ে গেলে ফাইল রিকনস্ট্রাকট করা পেনশন অ্যামাউণ্ট ফিক্স করা, বাজেট অ্যালটমেণ্ট থেকে সে অ্যামাউণ্ট—ইত্যাদির দায়িত্ব কার ? মাদার ডিপার্টমেণ্টের, নাকি যেসব ডিপার্টমেণ্ট সার্ভিস নিয়েছে—কেসটা ফিনান্স সেক্রেটারী হয়ে চিফ সেক্রেটারি পর্যন্ত গড়িয়েছিল। তিনি তার ড্রাফটিং-এর প্রশংসাও করেছিলেন।

বিনয়বাবু তখনও তাঁর দিকে তাকিয়ে, হাত জোড় করে নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন।

"এখন আমি কী করব স্যার ?"

তাঁকে দেখতে দেখতে মিস্টার চৌধুরীর অনেক কথাই মনে পড়ে

যায়। সেক্রেটারিকে তেলিয়ে ডিপার্টমেণ্টাল পলিটিকস করে ইউনিয়ন পুজো দিয়ে কতোজন উঠে যায—গাঙ্গুলি যদি কাঠি না দিত তাহলে এতোদিনে তাব ডেপুটি সেক্রেটারি হওয়া কে ঠেকায। এখনও তো যাবতীয় জটিল ব্যাপারে ড্রাফট কবার জন্যে আমাকে ডাকতে হয়। বিনয়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হয়, প্রমাণিত এফিসিয়েন্সির যদি কোনো দাম থাকে তবে এরকম একটা কেসেই একজনের প্রমোশন হয়ে যাওয়া উচিত।

"আমি এখন কোথায যাব স্যার ?"

"আপনি ফিনান্সে যান।"

"ওখান থেকেই তো এখানে পাঠাল স্যাব।"

সামনে ঝুঁকে নত হযে বলেন বিনয়বাবু।

"আবার যান। যা বলছি শুনুন, আমার সময় নষ্ট করবেন না।" —বিবক্ত হযে বলেন মিস্টার চৌধুরী।

"আমি যতোদূর জানি, এইসব পুরোনো কেস তাড়াতাড়ি ডিসপোজ অফ করাব জন্যে একটা স্পেশ্যাল সেল করেছে ওবা।—আপনাব ফাইল তাদেব কাছে আছে, আমবা যা কবার কবে দিযেছি।"

"কেমন করে যাবো স্যাব ?"

"মানে ?"

এবাবে বেগে যান মিস্টাব চৌধুরী।

"কোন বারান্দা দিযে—মানে কোন পথ দিযে কী ভাবে যাবো যদি দয়া করে— ।

"ইম্পসিবল"। হুংকাব দিযে ওঠেন মিস্টার চৌধুবী।

বিনযবাবু হতভম্ব হযে এবং একইসঙ্গে ভযে কাঠ হযে হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন তাব দিকে। সরকাবের এতোবড় একজন অফিসাবেব কাছে পথঘাট গলিঘুঁজির খবর যে জানতে চাওয়া যায় না, এই সাধারণ কথাটা তার মাথাতেই আসে না।

"ইমপার্টিনেণ্ট"। বিনয়বাবুর মনে হয় মিস্টার চৌধুরীর চোখ দুটো জ্বলছে। তিনি আর দাঁড়ান না। বাইরে বেরিযে হলঘব পার হযে লম্বা বারান্দা দিযে ব্রিজেব দিকে হেঁটে যেতে যেতে শুধুই ভাবেন, পুরোনো কেসের স্পেশ্যাল সেল ফিনান্সের স্পেশ্যাল সেল যেন বিড়বিড় কবে জপ করেন। কিন্তু সেখানে পেঁছিব কীভাবে ? কোন পথ দিয়ে ?

সিঁড়ির মুখে পৌঁছে হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে যায় নিচের মিটিঙের কথা।

তিনি সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সুবিমল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে তাঁর দিকে। ক'ঘণ্টার মধ্যে লোকটা এতো রোগা হয়ে গেছে কেমন করে? এতো কালোই বা হলো কী করে? টলছে কেন লোকটা?

"আপনি এখনো যান নি?"

মিটিং তখন শেষের দিকে। মাঝারি নেতারা নানা নির্দেশ দিচ্ছেন। মিটিঙের একটা চেয়ার ধরে দাঁড়িয়ে থাকেন বিনয়বাবু। কথা বলতে পারেন না। কিছুক্ষণ পরে যেন খানিকটা ধাতস্থ হয়ে বলেন সব কথা।

"তাই নাকি?"

সুবিমল গম্ভীর হয়ে যায়, কী সব ভাবে।

"অফিসারদের কারবারই তো ওই, মানুষকে তো মানুষ বলে মনে করে না ওরা। কিন্তু আপনার কাছ থেকে এক টাকা আটত্রিশ পয়সা—ছি, ছি! ছি, ছি! এই সব আনকালচার্ড লোকদের নিয়ে কি ওয়ার্ক কালচার ইমপ্রুভ করা যায়।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে সুবিমল। সব লজ্জা যেন তারই। তারাই তো পোস্টার লিখে, ফেস্টুন খাটিয়ে চেয়ার টেবিল পেতে ওয়ার্ক কালচারের মিটিং করছে।

"আচ্ছা, একটু দাঁড়ান আপনি।"

চেয়ার ছেড়ে সুবিমল উঠে যায়। একটু দূরে আশুবাবু একটা চেয়ারে গা এলিয়ে বসেছিলেন। সামনে পা দুটো ছড়ানো। মুখটা ক্লান্ত, একটা মিটিং করার পরিশ্রম তো কম নয়। ক্লান্ত মুখেও মৃদু হাসি, যেন তৃপ্তির কিংবা পূর্ণতার। মাথার পেছনে দুহাত জুড়ে হাতের ওপর মাথা এলিয়ে দিয়ে কথা বলছিলেন। তাকে ঘিরে গোল একটা ছোটখাট ভিড়।

মিটিং তখন ভেঙেই গেছে। হল প্রায় ফাঁকা। কারা সব গানটান গাইছে। প্রায় কেউই শুনছে না। নেতারা সঙ্গীসাথীদের নিয়ে বসে আছেন আড্ডার মেজাজে। মিটিং সফল হলে যেমন হয়। আশুবাবুকে ঘিরে বসে থাকা আড্ডায় একজনের কানের কাছে মুখ দিয়ে সুবিমল কিছু বলে, তিনিও কিছু বলেন, সুবিমল শুনতে শুনতে ঘাড় নাড়ে। তারপর ফিরে আসে বিনয়বাবুর কাছে।

"আপনাকে আর একবাব ফিনান্সে যেতে হবে।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন বিনযবাবু। সুবিমল বলে দেয় কী ভাবে, কোথায কার কাছে যেতে হবে।

বিনযবাবু আবাব বওনা হন। প্রতিটি সিঁড়ি তখন চারগুণ হয়ে গেছে। প্রতিটি বারান্দা তিনগুণ দীর্ঘ, প্রতিটি ব্রিজ অসম্ভব চাপা, প্রতিটি ব্লক পাঁচগুণ বড়, প্রতিটি গলিতে গভীরতর অন্ধকার। তবু হেটে যান তিনি একটু টলেন যদিও। এবং বেশ সহজেই পেঁাছে যান। স্পেশ্যাল সেলে।

সেল তখন বেশ ফাঁকা। ফাইলের পাহাড়ের নীচে অধিকাংশ চেয়ারই খালি। দু-চারজন টেবিলে মুখ গুঁজে কাজ করছেন। তাঁদের একজন, বেশ বযস্ক, খুব বোগা, বেশী পাওয়ারের চশমা, মযলা পাঞ্জাবি, কিংবা হয়তো হলদে আলোতে মযলা দেখায়, আসলে ময়লা নয়, ফাইল থেকে মুখ না তুলেই বলেন, "হ্যাঁ সেলেব অফিস। বলুন কী চান?"

বিনয়বাবু বলে যান। ভদ্রলোক মুখ তোলেন না, বোঝা যায় না শুনছেন কিনা।

বিনযবাবুব বলা হযে যায়। চুপ করে দাঁড়িযে থাকেন তিনি।

"কতো বছরেব কেস বললেন?"

বিনযবাবু বলেন।

"কোন ডিপার্টমেণ্ট থেকে পাঠিয়েছিল?"

বিনয়বাবু উত্তব দেন।

"ইণ্টার ডিপার্টমেণ্ট ডিসপিউট ছিল বললেন?"

বিনযবাবু চুপ কবে থাকেন।

"এখানেই আছে।"

"আছে?"....বিনযবাবু যেন আঁতকে ওঠেন। যেন ফাইল থাকাটা ভালো কথা নয, আশার কথা নয়। সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক এবং ভযংকর এক ইঙ্গিত-বাহী কথা।

"শচীনবাবুব নাম কে বলল? তাঁব কাছে ও ফাইল নেই।" বলতে বলতে চশমা খুলে ভদ্রলোক পাঞ্জাবিব পকেট থেকে একটা তোয়ালে রুমাল বেব কবেন। রুমালটার দিকে তাকিয়ে বিনযবাবু ভাবেন, এ রুমাল এখনও চলে? এতো আমাদেব সময়কাব জিনিস। ভদ্রলোক রুমালটা দিযে কপাল মোছেন। গাল মোছেন, ঠোঁট থুতনি গলা মোছেন।

কপালের দুপাশ টিপতে টিপতে, যেন মাথার দুপাশে খুব ব্যথা, বলেন—

"তা ছাড়া, এখন কিছু করা যাবে না ?"

"কেন ?"

"অফিসের চেহারা দেখছেন না ?"

"তা হলে ?"

"সপ্তাহখানেক পরে আসুন।"

"সপ্তাহখানেক ?"

"তার আগে দাশগুপ্তকে পাবেন না। ওয়ার্ক কালচারের ক্যাম্পেন শেষ হওয়ার আগে আসবে বলে মনে হয় না।"

"ও।"

"দেখছেন না অফিসেব অবস্থা ? আমরা এই কজন মিলেই যা হোক করে —সরকারি অফিস কীভাবে চলে আপনি তো জানেন। সরকারের সব অফিসে কয়েকজন থাকেন যাঁরা কাজ করেন। তাঁরা সংখ্যায় অল্প। তবু তাঁরাই চালান অফিস। কেন চালান কে জানে তবু চালান বলেই অফিস চলে, সরকার চলে। যেভাবেই চলুক চলে। তাঁরাও যদি বাকিদের মতো—"

বিনয়বাবু দবজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে গিয়েও ফিরে আসেন।

"কী নাম বললেন যেন ?"

"দাশগুপ্ত। আশুতোষ দাশগুপ্ত, যদি পান তো ওই টেবিলটাতে পাবেন।"

টেবিলটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বিনয়বাবু। পাঁজা পাঁজা ফাইল। টেবিলের ওপর ফাইল টেবিলের দুপাশে ফাইল, সামনে ফাইল, নীচে ফাইল। চেয়ারের এপাশে ওপাশে ফাইল, মেঝের ওপর ফাইল। ওরই মধ্যে কোনো একটিতে তিনি আছেন, তাঁর কষ্ট আছে, কষ্টের অবসান আছে, মুক্তি আছে। হঠাৎ কি খেয়াল হয় বিনয়বাবুর। তিনি ভদ্রলোকের সামনে ঝুঁকে বলেন।

"কী নাম বললেন, আশুতোষ ?"

"হ্যাঁ।"

"গেরুয়া পাঞ্জাবি, কাঁচাপাকা চুল ?"

"হ্যাঁ।"

"বাদামী চশমা ?"

যাবতীয় ক্লান্তি পার হয়ে বিনয়বাবু রীতিমত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

"হ্যাঁ।"

"একটু বেঁটে মতোন, অল্প ভুঁড়ি ?"

"আপনি তো দেখছি চেনেন।"

এতোক্ষণে মুখ তোলেন ভদ্রলোক, এই প্রথম। বিনয়বাবু লক্ষ্য করেন না তিনি তখন দ্রুত পায়ে ফিরে যাচ্ছেন। টলতে টলতেই।

নীচে তখন মিটিং ভেঙে যাচ্ছে। পোস্টার খোলা হচ্ছে, চেয়ার ভাঁজ করে সাজিয়ে রাখা হচ্ছে, ফেস্টুন গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে, ফুলের স্তবক খুলে ফেলা হচ্ছে, ছবি নামিয়ে নেওয়া হচ্ছে। খুব সাবধানে, কাঁচ না ভেঙে যায়। লোকজনও প্রায় চলে গেছে, দু-চার জন ছড়িয়ে ছিটিয়ে এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে বসে।

এদিক-ওদিক তাকাতেই আশুবাবুকে দেখতে পান বিনয়বাবু। তিনি তখন যাওয়ার পথে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একজনের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই বিনয়বাবুকে দেখতে পান আশুবাবু।

"কী খবর ? আপনি এখনো বাড়ি যান নি ?"

বিনয়বাবু মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

আশুবাবু হেসে জানতে চান,

"আপনার কাজ হয়েছে তো ?"

বিনয়বাবুর পা জোড়া তখন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, তেষ্টায় জিভ শুকিয়ে গেছে,পেট লেগে গেছে পিঠে, মাথা ঝিমঝিম করছে, শরীরটা বেঁকে গেছে ধনুকের মতো, যেন তিনি কুঁজো। ঘাড় সোজা করে মুখটা তুলতেও কষ্ট হয় তাঁর, তবু তোলেন বিনয়বাবু।

"আশু বাবু আপনিও সরকারী কর্মচারী, আমিও সরকারী কর্মচারী।"

"সে তো বটেই, আমিও একদিন আপনার মতো রিটায়ার করব।" বলেই আশুবাবু হাসতে হাসতে যোগ করেন।

"তার আর বিশেষ দেরীও নেই।"

"দেরী নেই ? তা হলে তো কথাটা জানা আপনার পক্ষে আরো বেশী জরুরী।"

"কী কথা বলুন তো ?"

"কাক দেখলাম কাকের মাংসও খায়।"

আশুবাবু তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। হাসিটা লেগেই থাকে মুখে। কিছু বলেন না, যেন কথাটার মানে বুঝতে পারেনা না।

"মানুষের মাংস তো খায়ই।"

হেঁ, হেঁ করে হাসেন আশুবাবু, বিনয়বাবুর রসিকতায়। তাঁর হাসির দিকে তাকিয়ে বিনয়বাবুর হাতের তালু মুখের চামড়া চোখের পাতা কেমন জ্বালা করতে থাকে।

"শালা, শুয়োর বদমাইস, কামচোর।"

বিনয়বাবু হঠাৎ এমন আচম্বিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন আশুবাবুর ওপর তিনি যেন সতেরো বছরের তরুণ, তাঁর গতি যেন সাপের, তাঁর শক্তি যেন শার্দুলের। আশুবাবুর বুকের ওপর পাঞ্জাবিটা ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে তিনি চিৎকার করতে থাকেন। আশুবাবু এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত, বিস্ময়ে একেবারে হতবাক, স্থির যেন স্ট্যাচু। সামলে নিতে কয়েক সেকেণ্ড লেগে যায়। তারপরেই লোকজন ঝাঁপিয়ে পড়ে বিনয়বাবুর ওপর। তাঁকে টানতে টানতে ধাক্কা দিতে দিতে একপাশে নিয়ে যায়। কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে।

"গায়ে হাত দিও না, গায়ে হাত দিও না, ও পাগল! পাগল!"

একটা চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া হয় বিনয়বাবুকে, জোর করেই। একজন তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন পাহারায় বাকিরা ছুটে যায় আশুবাবুর কাছে। তাঁকে ঘিরে ভিড়। বিনয়বাবু তখন শ্রমে, ক্লান্তিতে, হতাশায় গ্লানিতে বিপর্যস্ত। তেষ্টায় তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে, নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে যেন। কিছুক্ষণ পরে কাছাকাছি কোথাও জল আছে কিনা দেখতে পাশ ফিরতেই তার উরুর পেছনে কিছু বিঁধে যায়, ব্যথায় লাফ দিয়ে ওঠেন তিনি। চেয়ারের একপাশে একটা পেরেকের মুখ বেরিয়ে ছিল। নীচু হয়ে পেরেকটা দেখেন বিনয়বাবু, তারপর শরীরে পাক দিয়ে ঝুঁকে উরুর পেছনটা দেখতে চেষ্টা করেন। দেখতে পান না। আঘাতের জায়গায় আঙুল ছোঁয়াতেই জ্বালা করে, আঙুলে রক্ত লেগে যায়। আঙুলের ডগায় নিজের রক্তের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ তাঁর মুরগীগুলোর কথা মনে পড়ে যায়।

———

দেখা হবে নীল সিন্ধুপারে

লীনা গঙ্গোপাধ্যায়

—প্রমিথিউস বাউণ্ড কি মা ?

—প্রমিথিউস বলে একটা লোককে সমুদ্রেব তীবে বেঁধে বাখা হযেছিল ।

—কেন ? লোকটা দুষ্টু ?

—লোকটা স্বর্গ থেকে আগুন চুরি কবে এনেছিল পৃথিবীর মানুষের জন্য ।

—তাহলে তাকে বেঁধে রাখা হল কেন ?

—গ্রীক দেবতা জিউস নিজেকে সর্বশক্তিমান মনে কবত । প্রমিথিউস তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল । তাই ওই দেবতা ওকে শাস্তি দিল ।

—সমুদ্রের তীরে বেঁধে রাখাব শাস্তি ?

—শুধু তীবে বেঁধে বাখা নয । প্রতিদিন ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একটা কুমীর এসে তাব শবীবেব মাংসগুলো খেযে ফেলত । তার পব সন্ধে থেকে বাকি বাত তার হাড়ের ওপব আবাব নতুন কবে মাংস গজাত ।

—তাবপব ?

—তাবপব সকালবেলা কুমিবটা এসে আবাব সেই মাংস খেয়ে ফেলত ।

—তাবপব ।

—আবাব মাংস গজাত ।

—বোজ-ই এরকম হত ?

—বোজ । প্রত্যেকদিন । প্রতিদিন ।

অলকানন্দা অনেকক্ষণ থেকেই ডাকটা শুনতে পাচ্ছে । একটানা জল-প্রপাতেব মতো ভেসে ভেসে আসছে । ও এভাবেই ডাক দেয । সময নেই, অসময় নেই, যখনই ওব ইচ্ছে হবে তখনই ডাক পাঠাবে । যেন এতক্ষণ বাবুইযের সঙ্গে কথা বলছিল বলেই ওর এই ডাক অলকানন্দা শুনতে পাযনি । এখন বাবুই তাব নিজেব ঘবে চলে যেতে সে একা হযে চোখ বুজল । আর চোখ বুজতেই এবাব যেন তাব শরীবের ভেতব থেকেই জলপ্রপাতের প্রবল গর্জনে অলকানন্দার ওপর ঝাঁপিযে পড়ল । এই জলবাশির তীব্র আলিঙ্গণ আব গর্জনে

সে পর্যুদস্ত, পরাস্ত হয়ে ওই জলরাশিব মধ্যেই মিশে গেল। এ আঘাত তাকে ভাসিযে বাখল না। ওই জলেব শবীবে ডুবিযে দিল, মিশিযে দিল, মিলিযে দিল।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য ভেসে উঠল অলকানন্দা। বানভাসি অলকানন্দা। এখন ওব বোমশ বুকের ওপর অলকানন্দাব টুলটুলে মুখ। মুখের দুপাশে নদীব মতো বযে যাওযা চুলের ঢল। চোখেব গভীবে কুযাশা-মাখা বিষাদ। মুখের ডৌলে উদাসীন বেদনা··। কপালেব ফোঁটা ভেঙে-গুঁডিযে-ছড়িযে একাকাব।

—তুমি এভাবে এসে আমাব তছনছ কবে দাও কেন, শ্যাম ?

—আমি না এলে তুমি ভাল থাক ?

—স্বস্তিতে থাকি।

—স্বস্তি চাও, না শান্তি চাও ?

—আমার ভয করে, ভীষণ ভয কবে।

—কেন ?

—কেউ যদি দেখে ফেলে ?

—কেউ দেখলেই-বা। তুমি তো আমাব।

—তাই বলে যখন-তখন দস্যুর মতো ঢুকে পড়বে আমার অন্দরমহলে ?

—আমি তো চিবকাল এভাবেই আসি।

—এখন বাবুই বডো হযেছে। ইদানিং সুস্থিব ভাবি খিটখিটে হযে গেছে। একটু সাবধানে, সবদিক সামলে চলতে হবে তো !

—না, আমার যখন যেমন ইচ্ছে হবে, তেমনভাবে আসব। ঝড় হযে, বন্যা হয়ে, পাখি হযে···

—শ্যাম, সুস্থিবেব আসাব সময হযেছে। এখন তুমি এসো।

—তুমি আজকাল তোমার শরীব পবিস্কাব রাখ না ?

—কেন শ্যাম ?

—তোমায শবীবেব জাযগায জাযগায শ্যাওলা জমেছে। আমাব অসুবিধে হয। মাঝে মাঝে শ্বাস আটকে আসে।

—সময পাই না শ্যাম।

—আমাব জন্য তোমাব এখন আর সময় হয না, না ?

শ্যামের রেশমেব মতো চুল, ঘন দুর্বাব মতো নবম দাডিতে গাল

ঘষে দেয অলকানন্দা। গভীব আঘ্রাণ নেয়।

—তোমাব পাগলামি একটুও কমেনি।

—তুমি-ই তো আমাকে এভাবে গড়েছ।

—এবাব একটু শান্ত হও, শ্যাম।

এই সংলাপ অথবা কথোপকথন এভাবে হযত আবও কিছু সময চলতে পাবত। কিন্তু দরজায বেলেব আওয়াজ হতেই অলকানন্দাব চাপা গলায শ্যামকে তাড়া দিল —'সুস্থির এসে গেছে। যাও, যাও তুমি'। ধড়মড় কবে উঠে বসে এলোমেলো শাড়ি-জামা গুছিয়ে নিল সে।

শ্যামেব তখন-ও যাওযাব তাড়া নেই। সে অলকানন্দাব দুই জানুতে মাথা বেখে ভবা দীঘিব মতো স্বপ্নালু দু-চোখ পবিপূর্ণ মেলে দেখছে তাকে। দেখতে দেখতে তার কণ্ঠে গ্রীক দেবতাব ওবাকল বেজে উঠল ঃ

ফিবে আসবো বলে সেই ভোববেলা নৌকো ভাসিযেছি।
এখন দুকূল লুপ্ত ; অগ্নিময অমা
তোমাব বুমালে শুধু, ডেসডিমোনা হাবিযে ফেলো না।

দুদিকে বাঁধন। মাঝে একই নদী। এমন তো হতেই পাবে। সেই নদীব বুকে পবিচিত অভ্যাসেব পা ফেলে ফেলে যাওযা। কখনো বাধনদাবদেব লড়াই। এবাবে, এইভাবেই সমতল-অসমতল-ঢাল-উপত্যকা-অতলান্তিক খাদ ডুবে যাওযা, ভেসে থাকা। অপাতসবল প্রবহমানতাব ভেতব এসব থাকে। এসব তো থাকবেই। দৈনন্দিন এই অভ্যাস যাপনেব প্রথমদিকে পবিচিত অভ্যাসে সঠিক পা ফেলাব উচ্ছাসে কখনও শোনা যায তীব্র বিজযোল্লাস। হযতো নদীব বুকের খুবই গভীব থেকে একক চাপা দীর্ঘস্বব আর্তনাদের মতো এসে ঢেউগুলিকে খানিক এলোমেলো কবে দিযে যায। পবে আব এটুকুও থাকে না। কেবল অভ্যাসযাপন—অভ্যাসযাপনেব পুনরাবর্তন-পুনঃ পুনবাবর্তন।

কখনও-সখনও নদীর বুকে উত্তুবে বাতাস এসে লাগে। তাকে তছনছ কবে। তাব প্রবাহের গতিপথ পালটে দেয। তাকে তাব ডাক-নাম ধবে, প্রিয নাম ধরে ডাকে। তখন সে এমন আকুল হযে কাঁদে যে তার চোখেব জলে দু-দিকের বাঁধ প্রায নিশ্চিহ্ন হযে যায। অগত্যা তাব নতুন গতিপথে নতুন বাঁধ। নতুন বাঁধন। এইভাবে, এইবকম ভাবেই তো কতকাল ধরে নদী একা

একা বয়ে চলেছে, না ?

—কখন থেকে ডাকছি, শুনতে পাচ্ছ না ? কোথায় থাক তোমরা ? বাবুই কোথায় ?

—ছাদে। ঘুড়ি ওড়াচ্ছে।

—তুমি ? তুমি কি করছিলে ?

—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—আশ্চর্য !

অলকানন্দা এই প্রশ্নবান আর ধারাবাহিক বিরক্তির তোড়ে অসহায় বোধ করে। এই অসহায়তা ঢাকতে সে ছুটে চলে আসে রান্নাঘরে। এখন বিস্তর কাজ। বয়ম থেকে ময়দা নিয়ে থালায় ঢালে। তাতে ঠিকঠাক ময়ম দেয়। সুস্থির জামাকাপড় ছেড়ে, হাত-মুখ ধুয়ে আসার আগে টেবিলে গরম গরম লুচি, আলুর তরকারি সাজিয়ে দিতে হবে।

এখন বড় করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়ে অলকানন্দা। এই রান্নাঘরের আড়ালে সে অন্তত কিছুক্ষণ নিজের সঙ্গে কথা বলতে পারবে।

—সুস্থির, তুমি অত রাগী কেন ?

—পুরুষ মানুষের রাগ থাকবে না ?

—তাই বলে সব রাগ ঘরে ? আমার কাছে ?

—আর কার কাছে ? একমাত্র তুমি-ই তো আমার নিজস্ব রমণী।

—উঃ, আমি যে ভয়ে নীল হয়ে যাই। তোমার ওই আগুনের আঁচের মতো গনগনে মুখ। ভাবি ভাবি মাংসল হাত। বুকে পিঠে ঘন জঙ্গলের মতো রোম আর ওই বাজখাঁই গলা।

—এসবই তো পুরুষের লক্ষণ।

—শুধু এই সব-ই ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ এই সবই। তোয়াজে রাখলে মেয়েছেলে মাথায় ওঠে।

—সুস্থির, তুমি নদীর বুকে বসে ফসল ফলাচ্ছ। নদী তার জায়গা ছেড়ে দিয়েছে বলেই তো ?

বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। সুস্থিরের হয়ে গেছে। কড়াইতে আলুর টুকরোগুলো নাড়াচাড়া করে সবে জল দেওয়া হল। সেদ্ধ হতেও তো কিছুটা সময় লাগে ! এই রে, নুন কি দুবার দেওয়া হয়ে গেল ? তাহলেই আজ দক্ষযজ্ঞ ! দ্রুতহাতে ময়দার তাল কেটে লেচি পাকাতে লাগল

অলকানন্দা।

—ওকি শ্যাম! তোমার তো সাহস মন্দ নয়। তুমি আবার এসেছ?

—আমি তো যাই-ই নি।

—সর্বনাশ! কোথায় ছিলে?

—তোমাব বইয়েব আলমাবি থেকে একটা বই নিলাম।

—কি বই?

—'মৃত্যুব অধিক খেলা'

—এবাব যাও। যাও তুমি।

—তোমাব সাবা মুখে শিশিরেব মতো ঘামেব দানা। এসো। মুছিযে দিই।

—না, না। কিচ্ছু দবকাব নেই।

—দবকাব আছে।

—বলছি না।

—তোমাব এই বান্নাঘবটা বড্ড গুমোট। এখানে একটা পাখার ব্যবস্থা কবতে পাব না?

—আমি কি বলব বল? কর্তাব ইচ্ছেয কর্ম।

—তুমি কাজ কবো। আমি হাওযা কবি।

—না, না, সে কি! উঃ, তুমি এখন যাও।

—বাববাব এক কথা বলছ কেন? 'কোথাও যাব না / শুধু একা একা—সাবা বাত / জ্যোৎস্না বুকে কবে আমি পাথবেবই মতো শুয়ে বব'।

—আবাব কাব্যি হচ্ছে?

—চলবে না? তবে সবো, আমি তোমাব লুচি বেলে দিই।

—না, না, তুমি পাববে না।

—তোমাব মতো গোল হবে না। চালিযে নেব একরকম। তোমাকে ভালবেসে কি-না পারি?

—খুব হয়েছে। থামো।

—অলকা—, নন্দা—, অলকানন্দা, আমি কি সুস্থিরের সীমানায ঢুকে পড়ছি?

—পড়ছ তো? এ তো সুস্থিবেব বাড়ি, সুস্থিরের ঘর, সুস্থিবের সংসার।

—তুমি আমাব। সীমানায সীমানায যত ভাগাভাগি-ভাগাভাগি, সে তো শবীবটুকুতে। মনকে কি সীমানা দিযে বেড দেওযা যায? দিতে পেবেছো এত বছবে?

—না, পারিনি।

—মনেব কোন-ও দেশ নেই—সীমা নেই—কাল নেই।

—শ্যাম, দুটো লুচি এই বেলা মুখে পুবে দাও চুপিচুপি।

—না।

—কেন?

—আমাকে সুস্থিবের মতো থালায সাজিযে দাও।

—তা কি কবে হবে? তা হয না শ্যাম।

—তবে আমি খাব না। কিছুতেই খাব না।

—তুমি যে ফুলকো লুচি ভালবাস শ্যাম।

—হোক। আমাকে চোবেব মতো লুকিযে খেতে দেবে তাই বলে? শ্যাম বলে কি আমি মানুষ না?

অলকানন্দা যখন থালায পবিপাটি কবে লুচি-তবকাবি-মিষ্ট সাজিযে ঘবে তোলে, তখন সুস্থিব খববেব কাগজ পডছে। বাবুই তাব পডাব টেবিলে। সে সন্তর্পনে খাবাব টেবিলেব ওপব নামিযে বাখল। কাগজ পডাব সময জোবে শব্দ হলে সুস্থিব বেগে যায। তবকারি মুখে দিযেই চিৎকাব কবে উঠল সুস্থিব—এত নুন দিযেছ কেন?

—বেশি হযেছে?

—আবাব জিজ্ঞেস কবছ? মুখে দিযে দেখো না। তোমাব মন কোথায থাকে আমায বলবে?

—ভুল হযে গেছে।

—ভুল তো তোমাব সাবাদিনভব-ই হযে চলেছে।

বাবুই খাবাব মুখে পুবে হাততালি দেয়—মা, ওমা, আজ বেশ আলুব তবকাবি নয, নুনেব তরকাবি।

তবে বাতের বেলা সাবা বাড়ি নিঃঝুম হযে জল সুস্থিব অলকানন্দার সঙ্গে বেশ একটা সম্পর্ক তৈরি কবে নেয। যদিও তা সামযিক। তবু, সেটুকুই বা কম কিসে? এই সমব প্রথম কযেকটা মুহূর্ত অলকানন্দাব নিজেকে সামলাতেই কেটে যায। নিজেকে সামলানো এবং এখনকাব পরিস্থিতির সঙ্গে

মানানসই করে নেওয়া। যেমন আজ ঃ

—তোমার কাচাকাচি করতে কষ্ট হয়। সামনে মাসে একটা ওয়াশিং মেশিন কিনে দেব।

—ভালই তো।

—শুধু ভাল ? কি এমন নবাবনন্দিনী যে কোন-ও কিছুই গায়ে লাগে না।

—না কিনলে-ও চলে।

—অমনি রাগ হয়ে গেল ?

—না, আবার মিছিমিছি অতগুলো খরচ।

—ওই, ওই কথা ভাবছ ? একজনের একটা ফাইল অনেকদিন চাপা পড়ে ছিল। ক্লিয়ার করে দিয়েছি। সে কিছু দেবে।

—ঘুষ ?

ঘুষ আবার কি ? কাজ করে দিয়েছি। খুশি হয়ে দেবে। এ কাজ বার করতে ওর লালসুতো বেরিয়ে যেত না ?

—কাজ করার জন্য সরকার তো তোমাদের টাকা দেয়।

—ছাড়ো ছাড়ো। ওসব তোমার মাথায় ঢুকবে না। দুবেলা নিশ্চিন্তে সুখের ভাত খাচ্ছ !

অলকানন্দা এখন বড় সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছে। আজ এত দেরি করছে কেন সুস্থির ? শ্যাম আসার সময় হয়ে গেল যে ! সুস্থির, একটু তাড়াতাড়ি করো। প্লিজ ! ওই তো, ওই তো সুস্থির এগোচ্ছে। যেন সে কোন-ও মুহূর্তে ডুবে যেতে পারে এইরকমআশঙ্কায় সর্বশক্তি দিয়ে অলকানন্দার শরীরটাকে আঁকড়ে ধরেছে। অলকানন্দার পা দুটো একটু একটু সরে যাচ্ছে। দুটো পায়ের ব্যবধান ক্রমশ বড় হচ্ছে। সে বিপরীত স্রোত দিয়ে সুস্থিরকে ঠেকাচ্ছে। আচমকা তার শরীর যেন বিরাট পাথরের চাঁইতে ধাক্কা খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেল। ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল। শরীর থেকে মাংসগুলো কি টুকরো টুকরো হয়ে খুলে যাচ্ছে ? সুস্থিরের মাংসল শরীরের নিচে এখন-ও মুখ থুবড়ে রয়েছে অলকানন্দা। এই নিকষ অন্ধকার আর রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত শরীর সবটা মিশে ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে সে। এই অন্ধকার ভাঙতে ভাঙতে, দু-হাত দিয়ে সরাতে সরাতে এখনই আসবে সে। শ্যাম। শ্যাম, এসো শ্যাম।

দেবতাদের কাছ থেকে আগুন চুরি করেছিলেন প্রমিথিউস—তার ছেলের নাম ছিল দিওক্যালিওন। তাঁর মা প্যান্ডোরা—যাঁর বাক্স খোলা মাত্র পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট-রোগ-শোক ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই সঙ্গে আশা নামে একটি ছোট্ট পাখি ফুড়ুৎ করে উড়ে গিয়েছিল। এখন-ও তা সারা পৃথিবীতে ঘুরছে · ঘুরছে ঘুরছে।

—আশা ?

—শ্যাম ? আবার তুমি এসেছো ?

—আমি না এসে পারি না আশা।

—আমি আশা নই।

—তুমি-ই আশা।

—আমি সমুদ্রতীরে বাঁধা নারী, যার মাংস প্রতিদিন ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত একটা কুমির এসে খেয়ে যায়।

—তারপর সারা রাত ধরে একটু একটু করে আবার মাংস গজায়-ও তো আশা।

—আর গজাবে না।

—কেন ?

—শ্যাম আসবে না তাই।

—কেন আমি আসব না, আশা ?

—আমার সব কাজে ভুল হয়ে যায়, সংসার করতে পারি না। সবাই অভিযোগের তর্জনী বাঁচিয়ে ধরে।

—চল, ছাদে যাই।

—ন্‌না। না।

—কেন ?

—সন্ধে হচ্ছে।

—তাতে কি ?

—বাবুই খেলে আসবে। ওকে পড়াব।

—বাবুই তো এখন বড় হয়ে গেছে। একা একাই পড়ে।

—আমার বাড়িতে লোকজন আসবে।

—তুমি আমাকে এড়িয়ে যাচ্ছ অলকানন্দা।

—এড়িয়ে যাওয়ার কি আছে ? সত্যিই একখুনি আমার শ্বশুরবাড়ির

লোকজন আসবে।

—তবে আব কি। যাই ?

—যাই বলতে নেই, আসি।

—ওই হল।

—কোথায যাবে ?

—যাই একটু কলেজস্ট্রিট পাডায। পুবনো বইযেব দোকানে ঢুঁ মারব, নযত কফি হাউসে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা।

—আশা ?

—বলো।

—একটু কাছে আসবে ?

কেন ? না, না, এখন না।

—তোমার বুকে আমাব এক জোডা হাঁস রাখা আছে। একবাব ছুঁয়ে যাই !

—শ্যাম।

—আঃ, ছটফট কোরো না।

—শ্যাম, আমাকে মারো, মাবো, মেবে ফেল তুমি।

শ্যাম জানলা দিযে পাখি হযে গান গাইতে গাইতে উড়ে গেল। অলকানন্দাব চোখে-মুখে এমনকি গোটা শবীরে এখন একরকম উজ্জ্বল সোনালী আলো। এ আলো কোনওদিন কোন-ও উপত্যকায় পডে না। সমুদ্রে পডে না। পাহাডে পডে না। এমনকি প্রান্তরেও না। এ আলো কেবল হীবক খণ্ডেব মতো ভালবাসার ওপব পডে। বিচ্ছুবণ ঘটায।

অলকানন্দা সূর্যেব দিকে সরাসরি চোখ তুলে তাকায। ফলে চোখে অন্ধকাব দেখে। চোখ ফিবিয়ে বাডির সামনের কৃষ্ণচূডার দিকে তাকায়। কৃষ্ণচূডাব ডালে একটা ফিঙে। ও পাখি, অলকানদা ডাকে। ফিঙে লেজ নাডায। অলকানন্দাব ডাকেব উত্তর ? হতে ও পারে।

—শ্যাম কেমন আছে জান ?

পাখিটা উডে চলে যায। জানলা দিযে একসময গরম বাতাস ঢুকে পডে।

—ও বাতাস, শ্যাম কেমন আছে জান ? আমার শ্যাম ?

বাতাস যেমন এসেছিল তেমনই চলে গেল। অলকানন্দা এক ঘর থেকে অন্য ঘুরু, অন্য ঘর থেকে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

—শ্যাম, কেমন আছ তুমি? তোমাকে বড দেখতে ইচ্ছে করে। বাবুই ঘরে ঢোকে—মা খেতে দাও। কলেজের দেরি হয়ে যাবে।

—চল বাবা।

—মা, তোমার কি হয়েছে? সারাদিন আনমনা থাক। শরীর খারাপ?

—না—আ, ঠিক আছি।

—কি ভাব?

—কিছু না। অলকানন্দার ঠোঁটে একটুকরো হাসি খেলে যায়। হাসি না কান্না? অনেক হাসিব ভেতব তো কান্না-ও লুকিয়ে থাকে।

—মা, আজ কলেজ থেকে ফেরার সময় আমাব একজন বান্ধবীকে নিয়ে আসব।

—কতদিনই তো কত বন্ধু বন্ধুনি আসে। বলিস না তো?

—এ অন্যবকম।

—এ-কে তুই ভালবাসিস?

অলকানন্দার মাথা ছাডিযে অনেক উঁচুতে উঠে যাওয়া বাবুই এখন মাথা নামিয়ে নেয। তাব দু-গালে লালের ছোঁওযা।

—শ্যাম! শ্যাম। বিড়বিড করে অলকানন্দা।

—শ্যাম কে মা?

—বুকের ব্যথা।

অবাক চোখে তাকায বাবুই—'কি'?

অপ্রস্তুত হয় অলকানন্দা—ও কিছু নয়, বাবা। পেট ভরে খা। আর কিছু নিবি?

—বাবা ঠিকই বলে, তোমাব মাথার গণ্ডগোল। কখন যে কি বলো....।

বাবুই কলেজ চলে যায। সুস্থিব রিটাযাবমেণ্টের পব নতুন বাড়ি বানানোব কাজে ব্যস্ত। এ বাড়ি আপাতত শুনশান। এই নির্জন/নিঃশব্দ, শুনশান বাডিতে অলকানন্দা এক ঘব থেকে আর এক ঘর, আর এক ঘর থেকে অন্য আব এক ঘব, তাব গোপন বইয়ের আলমারি, আকাশ বাতাস গাছ-পাখি সকলকে ঘুরে ফিরে একই প্রশ্ন করে চলে—শ্যাম কেমন আছে তোমরা জান? আমার শ্যাম?

এখন অলকানন্দা কথা বলে না। বাড়ির লোকজন তার নির্বাক হয়ে যাওযা দেখে। ডাক্তার আসেন। চিকিৎসা চলে। কিছুই হয না। সুস্থির কাছে আসে—কথা বলো, অলকানন্দা। তোমাব জন্য ছাদের ওপর দক্ষিণেব জানলাওযালা ঘব করেছি।

অলকানন্দা চুপ করে।

ব্যবুই তার নতুন চাকরি, বন্ধু-বান্ধব সামলে হঠাৎ হঠাৎ পাশে এসে বসে। —মা কথা বলো মা। বলো তুমি কি চাও ?

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রতিবেশী আসেন। সকলেরই এক কথা— কথা বলো। কথা বলো।

অলকানন্দা শূন্য চোখে তাকিযে থাকে। এদের কথা তাব কাছে কোনও মানে নিয়ে আসে না। সে অবাক হয। আশ্চর্য হয। এরা কেবল ঠোঁট নাড়ে। কোন-ও শব্দ বেরয় না কেন এদেব ঠোঁট থেকে ? আজকাল অলকানন্দা ওদের ওই অর্থহীন ঠোঁটনাড়া আর খেযাল করে দেখে না। তার কি কাজ কম ? উত্তব পূর্ব গোলার্ধ থেকে পশ্চিমে গোলার্ধ উত্তব গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ গোলার্ধ কত নতুন নতুন পথ পেরিযে, নতুন নতুন উপত্যকা, পাহাড সমুদ্র, অরণ্য ডিঙিযে কত নতুন নতুন পদ্ধতিতে হেঁটে যাচ্ছে সে শ্যামের খোঁজে। কখনও দুপাশে ঘন আঁধার জড়িযে ধরে। অলকানন্দা শ্যাম বলে ভুল করে। কখনও আকাশ ভাঙা বৃষ্টি তার সাবা গায়ে জলপ্রপাতের মতো ঝরে পড়ে। অলকানন্দা শ্যাম বলে ভুল কবে। কখন-ও আকাশপোড়া আগুন তাকে দহন করে। অলকানন্দা শ্যাম বলে ভুল করে। কখন-ও চেনা ফুলের গন্ধ প্রিয় পাখিব গান ভেসে আসে। তাদের ঘ্রাণে শ্রবণে অলকানন্দা শ্যাম বলে ভুল করে।

একদিন আকাশ থেকে ডানা মেলে সত্যিই এলো শ্যাম। অলকা-নন্দার ছাযায বসল। ফলে প্রবল ঘূর্ণি উঠল নদীর আপাত স্থির-শবীবে।

—অশ্রুবিভাজিকা দিয়ে ঘেরা দ্বীপমালা

ভালো আছো ?

—শ্যাম ? আমার জীবন আমার মবণ, তুমি এসেছো—

—এসেছি অলকানন্দা। আমাব স্বপ্ন, আমার আশা, আমার চির অভিমান।

—আমার হাত ধরো শ্যাম। আমি আর একা আসতে পারি না।

—এসো। তুমি এসো।

—কই? কোথায় তুমি?

—এই, এই যে, আব একটু এসো।

—শ্যাম—আব কতদূর? আব কত বইব?

—আর একটু। আর একটুখানি…আশা?

—হুঁ-উ।

—সুস্থির কেমন আছে?

—কে সুস্থিব?

—তোমার স্বামী।

—আমার বাঁধন।

—বাবুই কেমন আছে?

—কে বাবুই?

—তোমার ছেলে।

—আমার বাঁধন।

—তোমাব সব বাঁধন কোথায় আশা?

—আমি সব বাঁধন ভাসিয়ে দিয়েছি শ্যাম। আমার চোখের জলে বুকের খানা খন্দ ভরে হ্রদ হয়ে গেছে। সব হ্রদ কেটে এই যে জলোচ্ছ্বাস। ভেসে যাচ্ছে আমার পোশাক, আমার সকল বাঁধন, আমার সাংসারিক পরিচয়, অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ। শ্যাম?

—বলো আশা।

—তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। ছুঁতে পাচ্ছি না কেন? তুমি খালি সবে যাচ্ছ।

—আব একটু এসো। আব একটু।

—আমি আব পারি না শ্যাম। তুমি আমাকে নাও। অলকানন্দা নদী হয়ে যাচ্ছে। তাব শাদা ফেনা তোলা জল বড বড পাথবে, বোল্ডাবে ধাক্কা খেয়ে লাফিযে উঠে কখন-ও ঝর্ণা কখনও পাহাড়ি কোবা, কখনও নদী হয়ে বয়ে চলেছে।

———

রণেশ দাশগুপ্ত ঃ শেষ সাক্ষাৎকার

মালবিকা চট্টোপাধ্যায়

[বহুদিন ধরেই আমাদের পরিকল্পনা চলছিল রণেশদার সাক্ষাৎকার নেওয়ার। ব্যক্তি হিসাবে যেমন বিশাল তাঁর মাপ, তেমনই সুদীর্ঘ সময়ের অগাধ গভীর ও মূল্যবান অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাঁর জীবন। স্বাধীনতার আগে ও পরে সাত দশকের অধিককাল জুড়ে চলে তাঁর কর্মকান্ড। চলে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে, কখনও প্রকাশ্যে, কখনও গোপনে, কখনও জেলখানার ভেতরে, কখনও বাইরে। রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক সর্বক্ষেত্রেই তাঁর অবাধ ও স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তাঁর সমস্ত কর্ম, ভাবনা ও সৃষ্টির মূলে একটিই স্বপ্ন—মানুষের মুক্তি। শুধুমাত্র ক্ষুধা ও দারিদ্র থেকে নয়, অন্তরে বাহিরে যাবতীয় পীড়ন ও বন্ধন থেকে মুক্তি। এই মুক্তির সংগ্রামে তাঁর মন্ত্র ও অস্ত্র মার্কসীয় জীবনবীক্ষা, মানবিকতার সাধনায় শ্রেষ্ঠতম দর্শন।

বহু চেষ্টার পরে অবশেষে নিজের সম্পর্কে মিতবাক, প্রায় মৌন মানুষ রণেশদাকে রাজি করানো গেল। আমি ও জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে লেনিন স্কুলের সেই বিখ্যাত ঘরে তাঁর এক দীর্ঘ সাক্ষাৎ-কার নিতে পারলাম। কথাবার্তা মূলতঃ তাঁর সঙ্গে জ্যোতিপ্রকাশেরই হয়। সেই সব কথা ক্যাসেট রেকর্ডারে ধরে রাখার দায়িত্ব শুধু পালন করি আমি। যতদূর জানি, এটিই তাঁর জীবনের শেষ রেকর্ড করা সাক্ষাৎকার। আমাদের প্রশ্ন ছিল অনেক। মাঝে মাঝে রণেশদা নিজেকে একটু গুটিয়ে রাখলেও প্রায়শঃই তিনি কথা বলছিলেন সহজভাবেই বন্ধুর মতো, খোলামেলা। প্রশ্ন অনেক রয়ে গেল, আজও রয়ে গেছে। তবে তাঁর যেটুকু কথা রেকর্ড করে রাখা গেছে, তার পরিমাণও কম নয়। রণেশদার স্নেহধন্য পরিচয় পত্রিকার সম্পাদক কবি অমিতাভ দাশগুপ্তের আগ্রহাতিশয্যে রণেশদার সেই সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকারের একটি অংশ ক্যাসেট থেকে লিপিবদ্ধ করে এখানে প্রকাশ করা হলো। ঔৎকর্ষের স্বার্থে অতি সামান্য কিছু সম্পাদকীয় সংশোধন ছাড়া সাক্ষাৎকারটি হুবহুই রাখা হয়েছে। —মালবিকা চট্টোপাধ্যায়]

জপ্রচ ঃ জেলখানা থেকে বেরিয়ে,—যখন আপনি পূর্ব-পাকিস্থানের পার্টির

স্পোকসম্যান,—যখন পাসপোর্ট পাওয়া খুবই কঠিন—সেই সময়—

রণেশ ঃ না স্পোকসম্যান নয়,—যখন আমি 'সংবাদ' কাগজের সহকারী সম্পাদক, এডিটোরিয়াল লিখতাম—তখন পার্টির তরফে যা কিছু করার—সংবাদ সংক্রান্ত সবকিছু আমার মারফৎই করা হোত, এবং সংবাদ কাগজের মারফৎই কমিউনিস্ট পার্টির প্রচার করা (যেতো)—

জপ্রচ ঃ কাগজের মালিক কে ছিলেন ?

রণেশ ঃ কবীর। এখনো আছেন।

জপ্রচ ঃ কাগজটা এখনো আছে ?

রণেশ ঃ হ্যাঁ, ওর মালিকানাতেই আছে। কবীর হচ্ছেন চল্লিশের দশকে মুসলিম ছাত্রদের মধ্যে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের একজন।

জপ্রচ ঃ প্রগতিশীল আন্দোলনে এসেছিলেন ?

রণেশ ঃ হ্যাঁ, মুনীর চৌধুরী, কবীর চৌধুরী—আরো অনেকে—

জপ্রচ ঃ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ?

রণেশ ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তারপর,—সে আর অন্য কিছু করতো না, কিন্তু 'সংবাদ' কাগজটিকে পার্টির মুখপত্র করতে তার একটা ভূমিকা ছিল।

জপ্রচ ঃ আর আপনি ছিলেন ওঁর দক্ষিণহস্ত ? তাত্ত্বিকও ছিলেন।

রণেশ ঃ না, না মানে—

জপ্রচ ঃ আপনি এডিটোরিয়াল লিখতেন—

রণেশ ঃ না, না, দারুণ সব তাত্ত্বিক ছিলেন তখন ; আমি না—

জপ্রচ ঃ কারা কারা ?

রণেশ ঃ খোকা রায়—একজন দারুণ সাংবাদিক, তাত্ত্বিক মণিদা—

জপ্রচ ঃ এঁরা তো পার্টি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন।

রণেশ ঃ হ্যাঁ, পার্টির পরিচালনা—তাত্ত্বিক সবই এঁরা। খোকা রায় ছিলেন বলতে গেলে পার্টির তাত্ত্বিক নেতা।

জপ্রচ ঃ তা আপনি এর পরে ভারতে এলেন কবে ?

রণেশ ঃ উনিশ শো একাত্তর সালে যখন—

জপ্রচ ঃ যখন খানসেনা আর রাজাকাররা অত্যাচার চালাচ্ছে ?

রণেশ ঃ　না, মানে, ছাব্বিশে মার্চ—যখন বঙ্গবন্ধু ডিক্লেয়ার করলো বাংলা-দেশেব স্বাধীনতা—যখন জিযাউল ঘোষণা কবলো চট্টগ্রাম বেতার থেকে—আমবা তখন তো বাধ্য হলাম ঢাকা ছাড়তে। আগরতলাব বর্ডাব দিযে আগরতলায ঢুকলাম। আমি, খোকা রায়. মণিদা—এই মণিদা ছিলেন দুর্ধর্ষ আন্ডারগ্রাউন্ড নেতা। আগরতলায এসে তাবপর তো কলকাতায চলে এলাম। দু-তিন মাস ছিলাম ভাবতবর্ষে—

জপ্রচ ঃ　তারপব আবাব ফিরে গেলেন কবে ?

রণেশ ঃ　ফিবে গেলাম যুদ্ধজযেব পব। ডিসেম্ববে যুদ্ধ শেষ হলো। আমি গেলাম ফেব্রুযাবীতে।

জপ্রচ ঃ　বাহাত্তবের ফেব্রুযাবীতে ? গিযে আপনি কি কবলেন ?

রণেশ ঃ　প্রথমেই ওবা আমাকে যথেষ্ট আপ্যাযিত করলো—'সংবাদ' কাগজে।

জপ্রচ ঃ　আপনাব পজিসন যেমন ছিল, তেমনিই বইলো ?

রণেশ ঃ　হ্যাঁ, সহকাবী সম্পাদক।

জপ্রচ ঃ　ততোদিনে আপনার কতগুলো বই বেবিযেছে ?

রণেশ ঃ　তা—সাত আটটা হবে।

জপ্রচ ঃ　ফযেজেব বই বেরিযে গেছে ?

রণেশ ঃ　প্রথম সংস্কবণ বেরিযেছে।

জপ্রচ ঃ　এটা তো দেখছি উনিশ শো উনষাট—এটা তো (বই হাতে নিযে) সেকেন্ড এডিশন উনিশ শো একাত্তব—এব আগেই বেবিয়েছে ?

রণেশ ঃ　হ্যাঁ—

জপ্রচ ঃ　ততোদিনে আপনাব সাত আটটা বই বেবিযেছে, কি বিষযে ?

রণেশ ঃ　প্রধানতঃ বাজনৈতিক ব্যাপাবে,—ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি সংগ্রাম বা আবো কিছু—

জপ্রচ ঃ　আব সাহিত্য সংক্রান্ত আপনাব প্রথম বই তো সাহিত্য সংক্রান্তই। সাজ্জাদ জাহীরেব ওপর—এই বইটা—।

রণেশ ঃ　তাছাড়া, উর্দু কবিদের ওপব (বইটা দেখিয়ে) এই বইটা দেখেন নি ?

জপ্রচ ঃ　না, আমাদের দুর্ভাগ্য, এটা—উর্দু কবিদের ওপর বইটা হাতে

নিয়ে—আপনাব সব বই-ই কি জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী বাব কবেছে ?

রণেশ ঃ হ্যাঁ। এই যে এটা সাজ্জাদ জাহীরেব ওপর, আর এটা অন্যান্য উর্দু কবিদের ওপব—

জপ্রচ ঃ হ্যাঁ, মখদুম মহীউদ্দীন, সৈযদ জাকীব আনোযাব, পরদেশ মলি-হাবাদী, পাবভেজ শাহেদী, ফৈয়জ আহমেদ ফয়েজ। পাবভেজ শাহেদী তো এখানকার, কলকাতাব। সাজ্জাদ জাহীর ও ববীন্দ্র-নাথকে নিয়ে লিখেছেন (দেখছি),—এটা বেবোলো কত সালে ? ওদের বইগুলো এখানে ডিস্ট্রিবিউট করে কাবা ? এই তো এটা অষ্টাশি সালে বেরিযেছে দেখছি।

রণেশ ঃ এখানে, 'নযা উদ্যোগ' নামে প্রকাশনী আছে, তাবা আমার সব বই আর বাংলাদেশেব অন্যান্য কিছু বই এখানে—ইযে ডিস্ট্রিবিউট—কবে।

জপ্রচ ঃ আপনি যে ঢাকা থেকে চলে এলেন সেটা কবে ?

বণেশ ঃ উনিশ শো পঁচাত্তবের অক্টোবরে, একুশে অক্টোবব।

জপ্রচ ঃ মুজিবব বহমানেব হত্যাব পবে ?

রণেশ ঃ সেটা তো পঁচাত্তবেব চোদ্দই আগস্ট।

জপ্রচ ঃ আচ্ছা ! আব আপনি চলে এলেন অক্টোবেবে। কেন এলেন ?

বণেশ ঃ এলাম। মানে—এলাম, কাবণ তখন ওখানে কিছু কবাব ছিল না। মুজিব হত্যাব পরে তখন তো সন্ত্রাস চলছে, আওযামী লীগেব একেবাবে ভাঙন,—প্র্যাকটিক্যালি মুজিবকে হত্যা কবেছিল আওযামী লিগেবই একটা সেকশন। পবে তো ভেঙে তিনটুকবো হযে গেল আওযামী লীগ—একটা গেল ইলেকশন-এ, একটা জাতীয পার্টি করলো—পবে সবাই আওযামী লীগেব উত্তবাধিকাব—।

জপ্রচ ঃ ওখানে থাকার তখন কোনও মানে ছিল না।

রণেশ ঃ আমি এসেছিলাম, মানে এই ফাঁকে একটু ঘুবে আসি (এই) ভেবে —এখন তো কিছু করার নেই। ওখানে তখন সম্ভবও ছিল না কিছু কবাব, কোনও হস্তক্ষেপ কবা তখন অসম্ভব। এইখানে থেকে আমি হস্তক্ষেপ কবেছি।

জপ্রচ ঃ তাই নাকি ?

রণেশ ঃ হ্যাঁ—মানে সত্তর সাল পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সঙ্গে আমার একটা—ইযে (যোগাযোগ) ছিল। শেখ ম্নজিবের সঙ্গে আমার অদ্ভুত একটা সম্পর্ক ছিল।

জপ্রচ ঃ পার্টির সঙ্গে আপনি তো ব্রীজ ছিলেন ?

বণেশ ঃ হ্যা মানে—একাত্তরে আন্দোলন হলো—মানে শেখ সাহেবকে কিছ্ন বললে তিনি সেটা মানে—(মানতেন)—

জপ্রচ ঃ তা তো বটেই, আপনারা একসঙ্গে জেল খেটেছেন, আপনাবা ম্নক্তিব জন্য তাঁবা জেলগেটে হত্যা দিযেছেন !

বণেশ ঃ পবেও একসঙ্গে থেকেছি, একসঙ্গে কাজও (কবেছি)

জপ্রচ ঃ ফলে আপনাব পক্ষে তখন চলে আসাটাই স্বাভাবিক ছিল।

রণেশ ঃ তার জন্য আসিনি যে শেখ সাহেবকে মেরেছে—মানে যখন মেরেছে, তখন আমি কলেজের একটা ফাংশনে ছিলাম। তখন ওইসব তো কবতাম আমি—ফাংশান—ওম্নক তম্নক—

জপ্রচ ঃ আপনি অক্টোবরে এলেন কেন ?

রণেশ ঃ পবিস্থিতি তখন খ্নবই ঘোবালো, আওয়ামী লীগেব অধিকাংশই তখন কলকাতায চলে এসেছে, তাই—

জপ্রচ ঃ তখন ওখান থেকে এসে কি আপনি সোভিযেত ইউনিযন গেলেন ?

বণেশ ঃ না, সোভিযেতে আমি যাই উনিশ শো চ্নযাত্তর সালে।

জপ্রচ ঃ ও, তাব আগেই গিযেছেন ?

বণেশ ঃ সেই সময যদিও অনেককে সোভিযেতে পাঠিযেছি, কিন্তু আমার যাওযা হয নি।

জপ্রচ ঃ ও আচ্ছা। তা প°চাত্তব সালে আপনি এখানেই এলেন ?

রণেশ ঃ হ্যাঁ, তখন আমার মা ভাইবোনেবা সব এখানেই—।

জপ্রচ ঃ কোথায ছিলেন তাঁরা ? খড়দা ?

রণেশ ঃ না, পলতা। তাঁদের সঙ্গেও তখন আমাব—

জপ্রচ ঃ আপনার সঙ্গে তো আমাদেব তখনই পরিচয়—

বণেশ ঃ হ্যাঁ—

জপ্রচ ঃ আপনি 'পরিচয়' দপ্তরে আসতেন—দীপেনদার সঙ্গে তো আপনার—

বণেশ ঃ দীপেনের সঙ্গে তো বিশেষ ইযে (ভালোবাসাব সম্পর্ক) ছিলই।

জপ্রচ ঃ দীপেনদা তো আপনাকে অসম্ভব শ্রদ্ধা করতো, আপনাকে

ভালবাসতো।

বণেশ ঃ হ্যাঁ। দীপেন তো তখন কালান্তরেও আসতো নিয়মিত।

জপ্রচ ঃ আমরা তো সব দীপেনদার বন্ধু, সাহিত্যের ব্যাপারে আমরা দীপেনদার চেলা—

বণেশ ঃ কালান্তরে তো ওকে বছরের পর বছর দেখেছি।

জপ্রচ ঃ ইন ফ্যাক্ট, দীপেনদা যে ওর শেষ উপন্যাসটা লিখেছিল, তাতে আপনার আদলে একটা চরিত্র ছিল।

রণেশ ঃ হ্যাঁ, (হাসি), শুনেছি।

জপ্রচ ঃ না, মানে দীপেনদার সঙ্গে এই নিয়ে আমার কথা হতো। ছাপা হবার পর আমি বলি যে আমি ধরে ফেলেছি। দীপেনদা বলে ঠিকই ধরেছ তুমি। ওই, একটা কমিউনিস্ট ক্যারেকটার ছিল—সেটাই আপনার আদলে নিজে ছিল একটা চরিত্র। এই মানে, খানিকটা আত্মজীবনীমূলক।

রণেশ ঃ হ্যাঁ, পরে পড়েছি, তবু—আমাকে নিয়ে যে এরকমভাবে লিখতে পারে কেউ, এমন সৌভাগ্য পরে মিলিয়ে—

জপ্রচ ঃ আচ্ছা পরে বুঝেছেন—।
এই যে কুড়ি বছর এখানে আছেন, এর মধ্যে আপনি কি বই লিখেছেন?

রণেশ ঃ পাক্কা কুড়ি বছর। তা ওখান থেকে যেসব বই বেরিয়েছে, সে তো সব এই সময়েই লেখা। এই যে এই বইটা দেখেছেন? "আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ"—পোলিটিক্যাল বিষয়ের বই (বইটা এগিয়ে দিলেন)

জপ্রচ ঃ দেখছি ভূমিকা লিখেছেন সেপ্টেম্বরে, বেরিয়েছে অক্টোবরে। উৎসর্গ করেছেন দেখছি বেগম সুফিয়া কামালকে—এটাই কি লাস্ট?

বণেশ ঃ না, পরেও আছে।

জপ্রচ ঃ এটা কি সাহিত্যের? গত কুড়ি বছরে আপনার কটা বই বেরিয়েছে?

রণেশ ঃ বারো তেরোটা বই হবে।

জপ্রচ ঃ আপনার কি নামগুলো মনে আছে?
বইগুলো সম্পর্কে যদি কিছু বলেন—।

রণেশ ঃ বলবো ? আয়ত দৃষ্টিতে আয়ত রূপ, তাছাড়া বিভিন্ন বিষয়ের ওপর লেখা, সাহিত্য, রাজনীতি, উর্দু থেকে নিয়ে লিখেছি।

জপ্রচ ঃ ফয়েজ, সাজ্জাদ জাহীর, আর ? কুড়ি বছরের কাজ—

রণেশ ঃ আরো সব—ঠিক মনে পড়ে না।

জপ্রচ ঃ আপনার কি কষ্ট হচ্ছে বসে থাকতে ? তাহলে না হয় অন্য সময়ে—।

রণেশ ঃ না, না, কষ্ট হচ্ছে না।

জপ্রচ ঃ আচ্ছা দু-একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করবো ?
এখন আপনার চলে কি করে ?

রণেশ ঃ এখন ? মানে বাংলাদেশের পাবলিশাররা যা পাঠায়, তাতেই চলে। প্রধানত তাতেই।

জপ্রচ ঃ নিয়মিত পাঠায় ওরা ?

রণেশ ঃ পাঠায় নিয়মিত।

জপ্রচ ঃ বাঃ এ-তো ভাবা যায় না। কলকাতার বহু পাবলিশারদের তুলনায় তো স্বর্গ ! তা ঢাকার সব পাবলিশার কি এমন, না শুধু আপনার পাবলিশারই ভাল ?

রণেশ ঃ হ্যাঁ, আমার সব পাবলিশারই ভাল। যারা পার্টির ধার ধারে না, তারাও আমার বই পাবলিশ করেছে, এবং—

জপ্রচ ঃ আপনার পাওনাটা দিয়েছে।

রণেশ ঃ হ্যাঁ।

জপ্রচ ঃ ওরা নিয়মিত যোগাযোগ করে আপনার সঙ্গে ?

রণেশ ঃ এখন ঠিক ততোটা পারে না। পার্টির ফাংশনে ছিল তো ওরা—মফিদুল হকরা—এখন তো আর—পার্টিও ভেঙেছে।

জপ্রচ ঃ এখন তো পার্টি ছত্রখান।

রণেশ ঃ এখন ওরা করেছে 'সাহিত্য প্রকাশ' আগে ছিল 'জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ'।

জপ্রচ ঃ জাতীয়টা বাদ দিয়েছে ? মফিদুল হকই করেছেন ? উনি তো মাঝে মধ্যে আসেন এখানে, বইমেলা টেলায়।

রণেশ ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ…

জপ্রচ ঃ পার্টির সঙ্গে আছেন এখনো ?

রণেশ ঃ না, না ইনডিপেন্ডেন্ট।

জপ্রচ ঃ কিন্তু, আপনার সঙ্গে সম্পর্ক বেখেছেন ?

রণেশ ঃ হ্যাঁ, আগের সম্পর্কই আছে।

জপ্রচ ঃ আপনার পাবিবাবিক দিকটা— ?

রণেশ ঃ হ্যাঁ, আমার এক ভগিনী আছেন, ইরা দাশগুপ্ত, আগে পার্টির কাজ কবতো। বিয়ে করেছে সত্যেন সবকারকে,—আমাদের সঙ্গে ছিল জেলখানায। স্বামী-স্ত্রী দুজন, আব এক কন্যা—ওরা হচ্ছে আমাব 'পিভট'—এখনো আমি যে যাই না, সত্যেন সরকার বান্না কবা মাছ বাটিতে কবে নিয়ে আসেন।

জপ্রচ ঃ বাঃ, ওরা থাকেন কোথায় ?

রণেশ ঃ এখানে, এই কনভেন্ট বোডে।

জপ্রচ ঃ আপনাব বাবা বড ফুটবল খেলোযাড ছিলেন, আর আপনি সেদিন এখানে রাস্তায ফুটবলের আঘাতে···

রণেশ ঃ হ্যাঁ, (হাসি), ছেলেবা পার্কে খেলছিল তো,—ওরাই আমাকে হাসপাতালে নিযে গেল।

জপ্রচ ঃ আচ্ছা রণেশদা, এই ঘরটাতে আপনি কতদিন আছেন ?

রণেশ ঃ তা অনেকদিন হলো।

জপ্রচ ঃ ছিযাশি সাল থেকে—ছিযাশি কেন ? আবো আগে থেকে বোধহয। কারণ আমবা যখন এখানে মিটিং করতাম, তখন আপনি এখানে ছিলেন।

রণেশ ঃ তা হবে, একবার চলে গিযেছিলাম, আবাব এলাম। পাকাপাকি বোধ হয ছিযাশি থেকে।

জপ্রচ ঃ আপনাব এইঘব তো ঐতিহাসিক ঘর। এখানে কালান্তরেব প্রথম ছাপাখানা। সম্পাদকীয দপ্তব—এই ঘরটাতে বোধহয সম্পাদক বসতেন।

রণেশ ঃ আমি যখন প্রথম এলাম, তখন আমাব জ্যাঠতুতো ভাই—বিভূতি-দাশগুপ্ত—এম. এল. এ ছিলেন, মন্ত্রী ছিলেন—তাঁব একটা কোযার্টাব ছিল।

জপ্রচ ঃ পুবুলিযাব ? তিনি তো বিরাট লোক।

রণেশ ঃ হ্যাঁ বিবাট লোক ছিলেন আমার জ্যাঠামশাইও, ওঁর বাবা। অনেক

কাণ্ড করেছেন তিনি—পুরুলিয়ায় আশ্রম করেছিলেন। বিভূতিদা তাঁরই প্রোডাক্ট।

জপ্রচ ঃ তা আপনি বিভূতিবাবুর ওখানে উঠলেন না?

রণেশ ঃ প্রথমে উঠেছিলাম, পরে ভাবলাম ওদের অসুবিধে হবে। তখন জ্যোতি দাশগুপ্ত ধরে নিয়ে এলেন।

জপ্রচ ঃ জ্যোতি দাশগুপ্ত তো তখন এডিটর।

রণেশ ঃ না, মানে কালান্তরের এডিটর ছিলেন—কিন্তু ওটার, মানে শান্তি স্বাধীনতা সমাজতন্ত্রের এডিটর ছিলেন না।

জপ্রচ ঃ জ্যোতিদা ওটাও দেখতেন।

রণেশ ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই যে একটা কোয়ার্টার ছিল•••

জপ্রচ ঃ পার্কসার্কাস ময়দানের গায়ে, ওরিয়েণ্ট রো•••

রণেশ ঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওখানেই প্রথম আস্তানা গাড়লাম। সেখান থেকে ··

জপ্রচ ঃ সেখান থেকে এখানে ?

রণেশ ঃ হ্যাঁ, বিরাশিতে জ্যোতি দাশগুপ্ত কালান্তর ছেড়ে চলে গেলেন তো? তখন আমার ওখানে থাকতে একটু অসুবিধে হচ্ছিল। প্রভাত দাশগুপ্ত ওখানে সে সময় এলেন, সপরিবারে·· তখন আর আমার ওখানে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। কিছু দিন গিয়ে থাকলাম শোভাবাজারে এক আত্মীয়ের বাড়ি, তারপর ওখানে কিছুদিন থেকে আবার এক আত্মীয়ের কাছে। যাই হোক, আত্মীয়দের কাছে ঠিক থাকতে পারলাম না। তারপর কিছুদিন গ্যাপ দিয়ে ছিয়াশি থেকে পাকাপাকি ভাবে এখানে (এই লেনিন স্কুলে)।

জপ্রচ ঃ আপনার এই যে হলঘরটা,এখানে তো কমিউনিস্ট আন্দোলনের বাঘা বাঘা লোকেরা মিটিং করে গেছেন, রাজেশ্বর রাও, রাজশেখর রেড্ডি, সোমনাথ লাহিড়ি, ভবানী সেন, বিশ্বনাথ মুখার্জী।

রণেশ ঃ এখানকর চা-ওয়ালাও এই কথা বলে। বলে কিতনা আদমী চা পিয়া ইধার।

জপ্রচ ঃ বলে, না? আমরা তো ওকে চাচা বলি। এখনো দেখা হলে জড়িয়ে ধরে। আপনি জানেন তো, একবার দাঙ্গার সময়—আমার ঠিক মনে পড়েছে না কোন দাঙ্গা—ছোটখাট কোন দাঙ্গার সময় এরা বিপন্ন হয়ে পড়ে। সেই সময় লাহিড়ি নিজে এসে এদের

রক্ষা করেন। পুলিশ আসার আগেই লাহিড়ি এসে যান, আমবা তারপর আসি।

আচ্ছা বণেশদা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি, এই যে বাংলাদেশের মুক্তিব পঁচিশ বছর হলো, তাব যে উৎসব হবে, তাতে এপার বাংলার কত শিল্পী, বাজনৈতিক নেতা আমন্ত্রিত হচ্ছেন। এখন যাঁবা বাংলাদেশে ক্ষমতায় আছেন, তাঁবা তো মুজিবব রহমানের পরিবাবে লোকও বটে, দলেব লোকও বটে তাঁরা তো মুজিববকে পোলিটি-ক্যালি বিহ্যাবিলিটেট করেছেন। আপনার ডাক পড়েনি ওপার বাংলা থেকে ?

বণেশ ঃ পড়েছে··· (হাসি)

জপ্রচ ঃ কি বকম ? কাবা ডাকছে ?

রণেশ ঃ আওয়ামীর লোকেবা আছে, আবার পার্টিব লোকেরা আছে,··· মানে ওখানে শেষ পর্যন্ত যা ছিল···। মানে ওখানে ইয়ংগাব সেকশনকে যাবা দেখাশোনা করতো, আমি ছিলাম তাদের একজন। তখনকাব বাংলাদেশে একটা মস্ত বড কাজ ছিল—সপ্তাহে একবার কবে দিনাজপুব, চট্টগ্রাম, যশোব—আমাকে ঘোরাফেরা কবতে হতো—

জপ্রচ ঃ মুজিবব রহমানেব পিবিয়ডে ?

বণেশ ঃ মুজিবব কেন ? সব পিবিয়ডে।

জপ্রচ ঃ আওয়ামী লীগেব ইযং সেকশনকে ?

বণেশ ঃ না, আওয়ামী লিগের না, পার্টিব ইযং সেকশনকে।

জপ্রচ ঃ তা, সে পার্টি কি আছে এখন ?

বণেশ ঃ না, সেইটেই মুশকিল হযেছে। পার্টি ভেঙে তিন টুকবো হযেছে।

জপ্রচ ঃ যাবা নিজেদেব পার্টিব লোক বলে বলছে, তারাও তো খুব ক্ষীণ—

বণেশ ঃ হ্যাঁ, তা তো বটেই। এই তো কদিন আগে জসিমউদ্দীন এসে-ছিলেন, কথা হলো—তাঁবা যে অংশে আছেন, আবার নতুন যে যে পার্টি হয়েছে—সকলেব অবস্থাই খুবই—খাবাপ।

জপ্রচ ঃ আমি একবার ঢাকায় গিযেছিলাম। তখন পার্টিব যে বাড়িটা দেখেছিলাম, উঠোন কোঠা একপাশে কুঁযো—সবটাই নাকি

পাঁচিল তুলে ভাগ হয়েছে। টাকা পয়সা সবই নাকি মিউচুয়ালি ভাগাভাগি হয়েছে। তা আপনাকে কোন ভাগ ডাকছে ?

রণেশ ঃ আমাকে—মানে—ঠিক বলা উচিত না—(হাসি)—দুটোই—

জপ্রচ ঃ উচিত না হলে বলবেন না।

রণেশ ঃ আমাকে মানে তিনটে গ্রুপই ডাকছে। যারা—মানে খুব বেশি মনে করে—সংগঠন যাদের আছে এখনো তারা বেশি ডাকছে।

জপ্রচ ঃ আর সবকার ?

রণেশ ঃ সবকার তো ডাকছে।

জপ্রচ ঃ কি হিসাবে ?—কি করতে বলছে ?

রণেশ ঃ কি করতে—মানে ওখানে গিয়ে থাকতে বলছে।

জপ্রচ ঃ কিন্তু ওখানে যে উৎসব হলো, আপনাকে হাজির হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ করেছিল কি ?

রণেশ ঃ হ্যাঁ, মানে, ওরা বলেছে—(হাতে একটা কাগজ তুলে দিলেন)

জপ্রচ ঃ এটা তো দেখছি স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত স্মারকগ্রন্থ, এটাতে লেখা চেয়েছে ?

রণেশ ঃ হ্যাঁ, ওই ধরনের আর কি ? ঠিকানা লেখার গণ্ডগোলের জন্য আসতে দেরী হয়েছে।

জপ্রচ ঃ আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি ? আপনার এখানে থাকতে কষ্ট হচ্ছে ?

রণেশ ঃ মানে কথা হচ্ছে কি—আমার আত্মীয়স্বজনেরা এখান থেকে আমাকে নিয়ে যেতে চায়, আমার ভাগ্নীরা, আরো অন্যরা—সবাই নিতে চায় (তাহলে) ভাল থাকা খাওয়া সবই হয়। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে কি, অন্য জায়গায় গিয়ে থাকলে আমার একটু অসুবিধে হয়। আমার থেকেও আমার সঙ্গে যারা দেখা করতে আসেন,—এখনো অনেকে আসেন—তাঁদের অসুবিধে হয়। আগে তো লেনিন স্কুলটা ছিল বাংলাদেশের অসুস্থ ব্যক্তিদের থাকার জায়গা—

জপ্রচ ঃ জানি তো, আর আপনি ছিলেন তাঁদের খুঁটি।

রণেশ ঃ কিন্তু আসল খুঁটি ছিলেন—

জপ্রচ ঃ জানি তো।

রণেশ ঃ এখন—আমি আর কি বলি—এখানে থাকার অসুবিধে—এতো

জল পড়ে—

জপ্রচ ঃ আর কি অসুবিধে ?

রণেশ ঃ ওইটাই, ঝরঝর করে জল পড়ে।

জপ্রচ ঃ আর বাথরুমটা ?

রণেশ ঃ ওইটাও—যে অর্থে বাথরুম সে অর্থে কোনরকমে চলে যায়। তবে অবস্থান হিসেবে এখানে খুব সুবিধে—একেবারে পট করে সবাই চলে আসতে পারে। যে কেউ চলে আসে।

জপ্রচ ঃ হ্যাঁ, যোগাযোগের খুব সুবিধে। রণেশদা, আমরা চাই আপনি অনেকদিন বাঁচুন, পা ভাঙুক, হাত ভাঙুক, কিন্তু আপনার মাথা যেমন কাজ করছে করুক। আরো অনেক বই লিখুন আপনি আমাদের জন্যে।—ভাবুন, লিখুন।

রণেশ ঃ ভাবছি, ভাবি, হ্যাঁ—ভাবছি।

মাঝে মাঝে এখানকার কিছু কাজও খুব ভালো হয়। যেমন এবারকার 'পরিচয়' বেশ হয়েছে, এলোমেলো নয়।

জপ্রচ ঃ সেটা নিয়ে কথা বলবো একদিন আলাদা করে।

রণেশ ঃ এখন কথা হলে—পাবলিকেশন অমুক তমুক ব্যাপারে, সময়টাকে ধরতে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ এখানে আগে যেমন ছিল। ঢিলে হয়ে গেছে এখন, সবাই ইন্টারভেন করতে পারে না।

জপ্রচ ঃ আপনার কাছে এখানকার সংগঠনের যারা মুখ্য পরিচালক, তাঁরা বা তাঁদের প্রতিনিধিরা যান আসেন ?

রণেশ ঃ আমার সঙ্গে মানে—মাঝে মাঝে আসেন। আমার সঙ্গে মানে—যাওয়া আসা ব্যাপারটাই কমে গেছে। আগে যেমন 'পরিচয়'—একটা দারুণ জায়গা ছিল, দারুণ জায়গা। আমার এক এক সময় মনে হত যে পরিচয় অফিসটাকে আরো একটু 'ইয়ে' করা দরকার। আমি একবার একটা জায়গায় গিয়েছিলাম, সেখানে হীরেন মুখার্জী ছিলেন। আমিও ছিলাম। হীরেন মুখার্জী আমায় বললেন, আমরা যখন প্রগতি লেখক সংঘ করেছিলাম, তখন সবাইকে আনতে পেরেছিলাম, এখন সবাইকে আনতে পারছি না। আমি বললাম আপনি এখন চেষ্টা করছেন না কেন ? সরকার তো ওকে একটা জায়গা দিয়েছেন।

জপ্রচ ঃ হ্যাঁ, একটা মিডিয়া সেণ্টাব কবেছে। উনি তো তাব ডিরেক্টর না চেয়ারম্যান—

রণেশ ঃ কিন্তু ওখানে তো—সবকাবী সংগঠনে যা হয—

জপ্রচ ঃ কিন্তু ওকে তো অনেক সুযোগ সুবিধে দিয়েছে বোধহয়।

বণেশ ঃ দিযেছে, কিন্তু সরকারী সেণ্টাবে বেসবকাবী লোকজন তেমনভাবে যেতে বোধহয, চায় না। প্র্যাকটিক্যালি—ঠিক আগে 'পবিচয'-এ গিযে বসলে যেমন হতো, যেমন লাগতো, সেরকম বোধহয নয়।

জপ্রচ ঃ আমরা চেষ্টা কববো, আমি বলবো। এখন যারা 'পবিচয' চালান বা যাঁবা ওখানে বসে আড্ডা মারেন, তাঁদের আপনার কথা নিশ্চয় বলবো। তাঁবা নিশ্চয়, যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে, শ্রদ্ধাসহকারে চিন্তা করবেন কি করা যায না যায়। আমি নিশ্চিত এ ব্যাপারে।

———

খাম

পার্থপ্রতিম কুণ্ডু

এক. খামহীন প্রশান্তর আবির্ভাব

সকালে ছোট্ট কাজ নিয়ে এসেছিল খামহীন প্রশান্ত। কাজটা আর কিছুই নয়, সামান্য একটা কাগজের রেখাপরিবর্তন। রেখাটা আর কিছুই নয়, সমান্তরাল দুটো রেখা, মাথা বরাবর উঠে গেছে। সেটার জন্য দু একজনকে একটু হেলিয়ে আর একটু উঠিয়ে দিতে হবে। নয়তো লাভের অংকটা নাকি তেমন হবে না। যদিও প্রশান্তর ভাষায়, লাভ নয়, ওটা না ওঠাতে পারলে লোকসানই হয়ে যাবে। ওটা প্রশান্তরই কথা। সকালে অন্য দিনের মত ঘুম থেকে উঠে, দাঁত মেজে এক কাপ লিকার চা নিয়ে সবে বারান্দায় বসেছি, এমন সময় প্রশান্তর আবির্ভাব।

দুই. প্রশান্তর পূর্ব পরিচয়

প্রশান্ত কুণ্ডু। আমাদের স্কুলেরই ছাত্র। বাল্যকাল থেকে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব। পড়াশুনোয় ছোটবেলা থেকেই তেমন দড় নয়। একটু 'পেছনের সারিতে বসা'-ই বলা যায়। কিন্তু অর্থের ভাগ্যটা ভাল। বাবার বিষয় সম্পত্তি বলতে তেমন কিছু ছিল না। কাঠা দশেক জমি। তার ওপর সাতঘর ভাড়াটে। ঘর বললে ভুল হবে। দরমার বেড়ার দেওয়াল, ওপরে টালির আস্তরন। দশ বাই দশ সারি সারি ঘর। সামনে সামান্য উঠান। একটাই পায়খানা। প্রথমে খাটা ছিল। সি, এম, ডি, এ'র দৌলতে সামান্য পয়সায় পাকা হয়েছে। আর নিজেদের থাকার ঘরটা একটু বড়। দুখানা। রান্নাঘরও আছে এক চিলতে। মা শচিবরুণা। হাঁপানির টান। বছর পাঁচেক হল মারা গেছেন। বাবা স্টেট ট্রানসপোর্টের কণ্ডাকটর। রিটায়ার্ড করার বছর না গড়াতেই মারা যান ক্যান্সারে। সামান্য পুঁজির সবটাই ব্যয় হয় বাবার চিকিৎসায়। মা সে ব্যথা সহ্য করতে না পেরে, এই অনটনের সংসারে আর বেশিদিন বাঁচতে চান নি। বাবার মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই তিন মাসের ব্যবধানে মাও মারা যান। তারপর প্রশান্ত একা। দশ কাঠা সাম্রাজ্যের সে একাই অধীশ্বর।

তিন. প্রশান্তর সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ ও পুনর্বাসন

সাতঘর ভাড়াটের সামান্য ভাড়াতে আর তার সংসার চলে না। হঠাৎ যোগাযোগ হয় পাড়ার অন্যতম শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্রের সঙ্গে। যোগেশবাবুর যোগসাজোসে ঐ সাতঘর ভাড়াটেকে উচ্ছেদ করতে বেশী সময় লাগে নি প্রশান্তর। মাত্র একটা রাত। দাউ দাউ শিখা, লেলিহান আগুন, প্রশান্তর গোটা সাম্রাজ্যকে উচ্ছেদ করে দেয় এক নিমেষে। অসহায় সাতটা অবাঙালী পরিবার, মূলত চটকলের শ্রমিক, সেই রাতে সর্বস্ব হারিয়ে, সকালে আকাশের দিকে যখন নির্বাক তাকিয়েছিল, তখন প্রশান্ত হাজির হল উন্মাদের মত। সে রাতে প্রশান্ত বাড়ি ছিল না। খবর পেয়ে সকালে আসা। ঐ সাতটা পরিবারের এখনই পুনর্বাসন দরকার। প্রশান্তর অতো টাকা নেই, যা দিয়ে নতুন ঘর গড়ে দিতে পারে, আর ভাড়াটেদেরও অর্থাভাব। নতুন ঘর গড়ার স্বপ্ন ফলতঃ অলীক থেকে যায়। সেই দিন, সেই কালাক্রান্ত সকালে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্রের হঠাৎ আবির্ভাব। যোগেশবাবু প্রশান্তর পূর্ব পরিচিত। তাই পূর্বপরিকল্পনা মাফিক এগোতে আর এতটুকু কষ্ট হয় নি। সাতটা পরিবারের পুনর্বাসন বাবদ যোগেশবাবু প্রত্যেককে দশহাজার টাকা করে দিতে রাজি হলেন। বিনিময়ে তাদের ঐ বাসস্থানের দখল ছেড়ে দিতে হবে। অসহায় সর্বস্ব খোয়ানো ঐ সাতটা পরিবারের এর চেয়ে বেশি আর কি চায়? তারা উচ্ছেদ হয়ে যায় যথারীতি, ঐ আগুন, আর ঐ অর্থ ছুঁয়ে ছুঁয়ে।

চার. প্রশান্তর সাম্রাজ্য বিস্তার যোগেশচন্দ্রের সাহায্য

এবার প্রশান্তর শুধুই বড় হবার পালা। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্রের যোগাযোগে ও যোগসাজোসে প্রথমে ঐ দশকাঠাকে কেন্দ্র করে প্রমোটার ব্যবসার সূচনা। যোগেশচন্দ্রের প্রমোটার ব্যবসার চতুর্দশতম ও প্রশান্তর প্রথম ফ্ল্যাট 'কেন্দ্রবিন্দু'র ষোড়ষতম ঘরে এখন প্রশান্তর বসবাস। ফলে অষ্টাদশী বধূ ও লাখ দশেক টাকা পেতে বিশেষ অসুবিধা হল না 'কেন্দ্রবিন্দু' কেন্দ্রিক অভিযানে। যোগেশচন্দ্রের লাভ নিশ্চয় আরো বেশী। সে কথা ভাবার বিষয় প্রশান্তর নয়। বরং নয় লাখ টাকা (বিবাহ বাবদ এক লাখ খরচের পর) হাতে নিয়ে এবার হাত বাড়ালো আর একটা পুকুরে। যে পুকুরে সে বাল্যে ডুব সাঁতারে এপার ওপার হয়েছে, তাতেই সে ডুবে রইলো কদিন, শুধুই বোজানোর তদারকিতে।

পাঁচ. হাতকাটা হাবু ও টিটাগড়ের ছাই-এর মাহাত্ম্য

এবার ব্যবসায় প্রশান্ত সম্পূর্ণ একা। যোগেশচন্দ্রের দাক্ষিণ্যে তার যে উচ্চমহলে পরিচিতি ঘটেছে, তাতে পুকুর বোজানোর অবাঞ্ছিত ঝামেলা অনায়াসেই কাটিয়ে উঠল। শুধু হাতে রাখল 'হাত কাটা' হাবুকে। এই হাবুর পূর্ব পরিচয় না জানালেও একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হল হাবুর অবস্থান। হাবু 'গুণ্ডা' শ্রেণীভুক্ত প্রাণী। অন্যেরা সমাজ-বিরোধী বললেও সাধারণের মধ্যে হাবু-র 'গুণ্ডা' নামকরণের বিশেষ হেরফের ঘটেনি। বরং বিধির লিখন হেতু তার দুহাত কাটা গেলেও, তার ব্যতিক্রমী চেহারা ও দিকনির্ণয়ের অভ্রান্ত জ্ঞানের জন্য তার অবস্থান সর্বদাই বৃহৎ কুলের পক্ষেই থেকেছে। আর ঐ কারণে প্রশান্তও, এই সসাগরা ধরিত্রীতে অসংখ্য হাত-যুক্ত মানুষ থাকা সত্ত্বেও ঐ হাতকাটা হাবুকে নির্বাচন করতে এতটুকু ভুল করে নি। কারণ পুকুর বোজানোর জন্য চাই কমদামী টিটাগরের ছাই। সি, ই, এস, সি-র নতুন প্রোজেক্ট-এর দৌলতে এলাকায় যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে লোডশেডিং বহুলাংশে কমেছে, তৈমনি ঐ বিদ্যুৎ উৎপাদন হেতু বিপুল পরিমান ছাই বর্জ্য হিসাবে জমা হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদক কোম্পানীর ঐ বর্জ্য-এর প্রতি তেমন নজর নেই বরং বর্জ্য অপসারণের জন্য তারাও তৎপর। কিন্তু পুকুর বোজানোর একমাত্র উপকরণ এই ছাই। তাই বর্জ্য ছাই-এর প্রতি অনুরাগ আর অহেতুক বলে বিবেচিত হল না। ছাই দখলের লড়াই অনেকটা জমিদখলের আদলে শুরু হল। ঝাণ্ডা পুতে ছাই এর সীমা নির্দিষ্টকরণ করা হল। লরির তালিকা, ছাই প্রাপকদের নাম সমস্ত কিছুই বিশেষ গুরুত্ব সহকারেই বিবেচিত হল। আর এরই মাঝে হাত-কাটা হাবুর নেতৃত্বে লরির পর লরি টিটাগড়ের ছাই পুকুরকে সমতল করে তুলল তিন মাসের মধ্যে। মিউনিসিপালিটির ঝামেলা দেখভাল করার জন্য নিয়োজিত হল নিয়োগীবাবু। তিনিই প্রশান্তকে চিনিয়ে দিলেন কাকে কত টাকার খাম দিতে হবে। পুকুর বোজানোর ক্ষেত্রে এই খামের ভূমিকাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হলেও যেহেতু এই খামের আদান প্রদান নেপথ্যে ঘটেছে তাই হাত কাটা হাবু ও টিটাগড়ের ছাই —এর মাহাত্ম্য লোকের মুখে মুখে ফিরল।

ছয়. প্রশান্তর দানধ্যান

পুকুরের উপর বিশেষ রেখার সাহায্যে বিভাজ্যকরণ সম্ভব না হলেও,

সমতলের ক্ষেত্রে সে অসুবিধা থাকে না। থাকার কথাও নয়। তাই বিভাজিকা রেখাগুলো গোটা পুকুরকে, অধুনা সমতলকে মোট বাইশ ভাগে ভাগ করল। চওড়া রাস্তা, ড্রেন ইত্যাদি ছবিতে বিশেষ ভাবে উল্লেখ থাকলেও চিহ্নিতকরণের বিশেষ কোনো উপাই ছিল না। ছবিতে আইন মোতাবেক শিশুদের খেলার জন্য একটি পার্ক দেখানো থাকলেও এলাকার ক্লাব সেটি দখলে রাখবে এমতই ঠিক হয়ে বেচাকেনা শুরু হল। কেনা বেচার প্রথম পর্বেই এলাকার কমিশনারকে দিল একটি প্লট। কমিশনার সেটিকে নিজের নামে রাখা শ্রেয় নয় বিবেচনা করে তৎক্ষণাৎ তিনি জামাই-এর নামে হস্তান্তরিত করলেন আপদকালীন তৎপরতায়। এই সমস্ত লেনদেন-ই 'অর্থ' হীন হলেও বিক্রয়-কবলা দলিলেই তা রূপান্তরিত হল।

সাত   প্রশান্তর নীট মুনাফার হিসাব

এর পর প্রশান্তকে পায় কে? 'কেন্দ্র বিন্দু' কেন্দ্রিক অভিযানে তার লাভ হয়েছিল মোট ৯ লাখ। পুকুর কেনা ও বোজানো বাবদ খরচ ৭ লাখ। খাম-লেনদেন ও হাবুর সাম্মানিক বাবদ খরচ ১ লাখ ৪০ হাজার। মোট, ৭ যোগ ১ লাখ ৪০ হাজার। ৮ লাখ ৪০। জমির প্লট মোট ২২ খানা। দানধ্যান বাবদ ১ খানা বাদ। থাকল ২১। বিক্রিবাবদ আয় ২১ লাখ টাকা। খরচ বাবদ ব্যয় ৮ লাখ ৪০। নীট মুনাফা ১২ লাখ ৬০ হাজার। মোট মূলধন হল ১২ লাখ ৬০ যোগ, আগের ৯ লাখ মূলধনের ব্যয় বাবদ ৮ লাখ ৪০ বাদে উদ্বৃত্ত জমা ৬০ হাজার অর্থাৎ ১৩ লাখ ২০ হাজার।

আট· প্রশান্তর গ্যারেজ অভিযান

এবার বি, টি রোডের পাশে ভাঙা গ্যারেজের দিকে মনোনিবেশ করলো প্রশান্ত। পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে ঐ গ্যারেজ কে স্থানান্তরিত করার দাবীতে এলাকার কমিশনার, প্রশান্তর তিনকাঠা জমি প্রাপ্ত এবং তড়িৎ গতিতে জামাই-এর নামে হস্তান্তরিত করা কমিশনার, বেশ জোরদার গণঅন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তিন মাস আগেই। জনমত সংগ্রহের জন্য গণসাক্ষর অভিযান করে হাজার পাঁচেক সই সম্বলিত দরখাস্ত পাঠিয়েছেন চেয়ারম্যান মারফৎ খোদ রাইটার্স বিল্ডিং-এর পলিউসন কণ্ট্রোল বোর্ডে। বেগতিক দেখে গ্যারেজ মালিক পুনর্বাসন বাবদ প্রশান্তর কাছ থেকে এক লাখ নিয়ে বিদায় নিল। আর ঐ গ্যারেজের জমির মালিক তিন জন। দুজনকে তিন লাখ করে, মোট ছ' লাখে

কাবু করে তৃতীয় জনের জন্য ছুটল বোম্বে। কিন্তু বোম্বেওয়ালাকে কাবু করতে লেগে গেল আরো চার লাখ। তাহলে মোট অঙ্কটা দাঁড়ালো এরকম।

১৩ লাখ ২০ হাজার —(১+৬+৪)=২ লাখ ২০

নয়, প্রশান্তর আপাত ব্যর্থতা

এবার ঐ ২ লাখ ২০ হাজার সামান্য পুঁজিতে অত বড় প্রোজেক্ট! যার ছবি করতে আর খাম দিতেই শেষ হয়ে গেল নিমেষেই। আবার প্রশান্তর পূর্বাবস্থা। পূর্বাবস্থা বললে ভুল হবে বরং এখনও দু' একটা খাম বাকি আছে। আর তাই বাড়ির রেখাটা সমান্তরাল আর একটু ওপরে তোলা যাচ্ছে না। খাম ছাড়া বলতে গেলে শুধুই হেলে যাচ্ছে, আর সেদিন, ঐ কারণেই, সামান্য একটা কাগজের রেখা পরিবর্তন-এর জন্য, রেখাটাকে একটু উঠিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় আমার কাছে আসা।

দশ. খামহীন প্রশান্তের অস্তিত্বসংকট

যতদিন টাকার জোর ছিল আমার কাছে আসে নি। আসার প্রয়োজনও হয় নি। কারণ মিউনিসিপালিটির নিয়োগীবাবু নিয়ন্ত্রিত গতিপথে সে বিচরণ করে সবই উদ্ধার করেছে। এখন খামহীন নিয়োগীবাবুর কোনো মূল্য নেই আর তাই প্রশান্তরও কোনো মূল্য নেই।

কিন্তু আমি কেন? অনেক লোকই তো প্রশান্তর চেনা। তবু খামহীন প্রশান্তকে কেউ চেনে না। চিনতে চায় না। খামহীন প্রশান্ত অস্তিত্বহীন। আর তার ওই অস্তিত্বের সংকটেই আমার কাছে এসেছে। আমি প্রশান্তকে চিনেছি খামহীন অবস্থায়। সে আমার বাল্যের বন্ধু। সে জানে খামের প্রতি আমার বিরূপতা দীর্ঘদিনের। খাম সমেত প্রশান্তর চলাফেরার চৌহদ্দিতে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ ঘটেছে দু'একবার। লজ্জা পেয়ে আমার কাছ থেকে একটা সাধারণ সিগারেট খেয়ে বিদায় নিয়েছে। কখনও নিজের দামী সিগারেট ভুলেও আমাকে দিতে চায় নি। কিন্তু আজ সে খামহীন। তাই আজ আমার কাছে আসতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় নি।

এগার. আমার স্বভাব প্রকৃতি

আমি মিউনিসিপালিটির-প্লান ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জ, চেয়ারম্যান, ভাইস

চেয়ারম্যান থেকে শুরু করে সাধারণ কমিশনারবরাও আমাকে নমস্কার বিনিময় করেন। অথচ আমারই প্রথম নমস্কার জানানোর কথা। কোনো দিনই আমাকে সেই সুযোগ কেউ দেন নি। অথচ অন্য ডিপার্টমেন্টের ইনচার্জরা, চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা হলেই 'স্যার' 'স্যার' বলে গদ গদ হন। প্রায়শঃই তাদের ডেকে পাঠান চেয়ারম্যানের চেম্বারে। অথচ আমাকে কোনো দিনই উঠতে হয়নি আমার চেয়ার ছেড়ে। যে কারণে খামহীন প্রশান্ত আজ যত সহজে আমার কাছে আসতে পেরেছে, সেই কারণেই খামস্পর্শহীন আমি কোনোদিনই কারো কাছে যেতে পারিনি। যাওয়ার সুযোগ ঘটে নি। এমন কি চেয়ারম্যান,ভাইস-চেয়ারম্যানের ঘরেও না। কেউ কোনোদিন আমাকে একটা সিগারেটও অফার করে নি, অথচ আলাপচারিতার সময় আমারই সিগারেট তারা অবলীলাক্রমে খেয়েছে। আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার এই সিগারেট —ব্যয়িতা সম্পর্কে আলোচনা করে জেনেছি, আমার স্বভাব প্রকৃতিই নাকি এর জন্য দায়ী। কারন তাদের সিগারেট 'অফার' নাকি তাদের কার্যোদ্ধারে আমার মনের মধ্যে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে, তাই আলাপ-চারিতার সময় নিজের প্যাকেটের সিগারেট খাওয়া ও আমাকে অফার করা, এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দুটিও স্বাভাবিক ভাবে করতে সাহস পায় না। বরং উল্টে আমার সিগারেটই ধ্বংস করে, আমার সঙ্গে বেশি একাত্মতা প্রমাণের তাগিদে। অন্যের স্বভাবের গতি প্রকৃতির সঙ্গে আমার স্বভাবের গতিপ্রকৃতি যে এমন ভিন্নমুখী জটিলতা সৃষ্টি করে তা, আমার স্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা না করলে, চিরদিনই আমার অজ্ঞাত থেকে যেত।

বার. আমার কাজের নিয়মকানুন ঃ খামের জটিলতা

খামহীন ব্যক্তির কোনো সামান্য অনিয়ম চেয়ারম্যান মারফৎ অনুরোধ এলে আমি রক্ষা করার চেষ্টা করি, কিন্তু খামসহ ব্যক্তির কোনো অনুরোধ সয়ং চেয়ারম্যান মারফৎ এলেও না রাখার প্রানপণ চেষ্টা করি। মাঝে মাঝে চাকুরির ঝুঁকি নিয়েও করি। আমার কাজের এই নিয়মকানুন সকলেরই জানা। এবং এও জানা কোনো ব্যক্তি খামহীন আমার কাছে এলে তাকে খামহীন বলেই বিবেচনা করি, যদিও অন্য সকলের কাছে তার প্রধান পরিচয়, 'শ্রীযুক্ত খামবাবু', তবুও। সে কথা চাক্ষুস প্রমান পেলেও বিবেচনায় আনি না।

তের. নিযোগীবাবুর খামেব গন্ধ ঃ আমাব বেঁকে বসা

আমাব অফিসেব সকলেই যখন একথা জানেন, প্রশান্তর না জানাব কথা নয়। অথচ ঐ প্লানটির ব্যাপারে কোনো ভাবেই কোনো কিছু কবতে না পেবে, প্রশান্তব মৌলবী নিযোগীবাবু ওবকম একটা ঘামেব গন্ধ শুঁকিযে ছিলেন কদিন আগে। হযতো প্রশান্তব অজ্ঞাতেই ঐ কাজ কবেছিলেন। হযতো খাম দেওযাব অভ্যাস বশে আমাকেও দিয়ে ফেলছিলেন। কারণ দীর্ঘদিনেব অভ্যাস, আমাদের স্নায়ুগুলোকে এমন অবচেতন কখনও সম্পূর্ণ অচেতন কবে দেয যে মস্তিকের নির্দেশ ছাড়াই হাত তাব কাজ কবতে থাকে। শরীরবিদ্যার এ এক অপূর্ব অধ্যায। যান্ত্রিক ভাবে নিত্য অভ্যাসেব বিষযগুলো আমাদেব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেমন নির্ভুল ভাবে কবে যায, তা এই খাম বিতবণকাবী নিয়োগী বাবুকে দেখলে বোঝা যায। আব ঐ কাবণেই নিযোগীবাবুও আমার কাছে চলে আসেন খামসহ। আব ঐ কারণেই এবার সয়ং চেয়ারম্যানের অনুরোধও বাখা সম্ভব হল না। প্রশান্ত এখনও সে কথা জানে না। হযতো আমাব এই বেঁকে বসাব জন্য চেযারম্যানই তাকে আমার কাছে পাঠিযেছেন।

চোদ্দ. চেযারম্যানের সই বনাম আমাব সই ঃ নির্দেশ ও কাজেব ফাবাক

চেযাবম্যান জানেন, প্রশান্তর বাল্যবন্ধু আমি। কিন্তু প্রশান্ত জানে না চেযাবম্যানের সই আমার ওপবে থাকলেও, আমার সই ব্যতিরেক চেয়াবম্যান সই কবতে পারেন না। প্রশান্ত এতদিন জেনে এসেছে, আমাব সই একটা নিযমমাফিক। তাই-ই জানার কথা প্রশান্তর, প্রশান্তব কোনো দোষ নেই। এই মিউনিসিপ্যাল এলাকার যত ফ্লাটের প্লান আছে, সব কটা প্লানেবই ছিটে-ফোঁটা বে-আইনী বেখাগুলোকে আইন-ই বেখায রূপান্তরিত করে সই কবেছি আমি-ই। আসলে আইনেব ফাঁক দিযে সকলে বেরোতে চেযেছে। আমিও বাঁধা দিই নি। এবং যাওযাতেব পথে আমি বহুবাব দেখেছি, ঐ বেখা-গুলোকেই যখন ক্রংক্রিটেব দেওযালে রূপান্তরিত করছে, তখন রেখা ও দেওযা-লেব মধ্যে বেশ ফারাক থেকে যাচ্ছে, এবং আমাদেব ফিল্ড ইনিস্পেকটববাও বেমালুম চোখ বুজে আমার কাছেই ওদেব 'ok' বিপোর্ট জমা দিচ্ছে। এসমস্ত কিছুই আমাব অজানা নয়। আবাব খামেব গন্ধ আমি সহ্য কবতে না পারলেও, খামের লেনদেন-এব ব্যাপাবে যে আমি ওযাকিবহাল, একথাও কারো অজানা নয। তাই আমাকেও কেউ ভয পায না। আমিও কাউকে ভয পাই না।

পনের.　লক্ষ্ণৌ-এর পাঞ্জাবীব মাহাত্ম্য ও ভাইসচেযাবম্যানেব ভয পাওযা

অথচ দেখি, আমি বাদে সকলেই সকলকে ভয পায। একদিন সযং ভাইস-চেযাবম্যান এক বেযাবাকে দেখে ভয পেযে চা-এব প্লেট উল্টে দিযেছিলেন। বিষয ঐ একই খাম। একটা খাম। এক ব্যক্তিব কাছ থেকে পেযে পাঞ্জাবীব পকেটে বাখতে গিযেছিলেন ছোকরা ভাইস চেযাবম্যান। এবার নতুন হযেছেন। খামেব বিষযে আগ্রহ থাকলেও এখনও অতোটা সাহসী হতে পাবেন নি। খামটা পেযে তড়ি-ঘড়ি পকেটে বাখতে গিযে তলায পড়ে গিযেছিল, আব তা-থেকে ছিটিযে গিযেছিল ক'একটা একশ টাকাব নোট। ছোকবা ভাইস চেযার-ম্যানের খেযাল ছিল না লক্ষ্ণৌব পাঞ্জাবীব একদিকেই শুধু পকেট থাকে এবং সেটা বাদিকে। আব ঠিক এরকম ঘন মুহূর্তেই বেযাবা ঢুকে পড়েছিল ঘবে কোনো আগাম নোটিশ ছাড়াই আব চাযেব প্লেট উল্টে ফেলা এরই স্বভাবিক ক্রিযা।

ষোল.　ভযেব সংক্রমন ও ভাইস চেযাবম্যানের ধমকানি

সমস্ত ক্রিযাবই একটা বিপবীত ধর্মী প্রতিক্রিযা থাকে। নিউটনেব এই অমোঘ নিযমে ভাইসচেযাবম্যানও কোনো ব্যতিক্রম নন। তাই তাঁর নিজস্ব ভয অচিবেই সকলের মধ্যে সংক্রামিত কবতে শুরু কবলেন। অধস্তন কর্মীবা থাকে ভয পেতে শুরু কবলো। এই ভয নিমেষে মিউনিসিপলিটিব সমস্ত কর্মীদেব মধ্যে ছড়িযে পড়ল। এই ভয-এব চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটল প্রকাশ্য বাস্তায। একদিন এই ভাইসচেযাবম্যান এক জমাদাবকে প্রকাশ্যে ধম-কাচ্ছেন আব ভযে জমাদাব হাউমাউ কবে পা জড়িযে কাঁদছে। কাবণ ঐ একই তবে সেটা খামহীন নগদে লেনদেন। মাত্র দু'টাকাব বিষয ছিল সেটা।

সতেব　খামহীন নগদে লেনদেন

খামহীন নগদে লেনদেনেব একটা গঠন প্রক্রিযা আছে, যাব আদব কাযদা সম্পূর্ণ ভিন্নতব। অনেকটা আদিম প্রকৃতিব। ওপরে কোনো আস্তাবণ নেই। বাখ-ঢাক নেই। সভ্য-প্রলেপেব ধাবে কাছে থাকে না এই খামহীন নগদে লেনদেন। দাতা অনেক কষ্টে খুচবো খুঁজে মনে মনে গালাগালি দিতে দিতে উপুড় কবেন হাত। আব গ্রহিতাও তাঁব ন্যায্য প্রাপ্য ভেবে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত না হযে গ্রহণ কবেন সেই নগদ। কিন্তু খাম থাকলেই এই লেনদেনেব চবিত্র বদলে যায। দাতা দিতে ইচ্ছুক। আব তাই খাম বাবদ একটা শতাংশ

ব্যবসাযিক হিসেব নিকেশে রেখেই নিজস্ব লাভেব অঙ্ক কষেণ। মনে মনে গালাগালি দেন না। ববং সকলেব সঙ্গে এই লেনদেনেব সম্পর্ক তৈবী করতেই সচেষ্ট হয। আব গ্রহিতাও কথাটা মুহূর্তেব জন্য থামিযে খামটা পকেটে রেখে বাকি কথার অংশ শেষ কবেন। যেন মনে হয খাম গ্রহণের পূর্বে অসম্পূর্ণ বাক্য এবং খাম পকেটে বাখাব পব সেই অসম্পূর্ণ বাক্য সমাপ্তিব প্রাবম্ভিক শব্দেব মধ্যে যে সময ব্যবধান, তা নিছকই মূল্যহীন। কাবণ অসম্পূর্ণ বাক্যেব শেষ শব্দ ও সেই অসম্পূর্ণ বাক্য সমাপ্তিব প্রাবম্ভিক শব্দ, উভয়ই যেন এবকম একটা নীববতা চেযেছিল। মাঝেব এই সময ব্যবধান যেন তেমন কিছুই নয। বাক্যব গঠন প্রণালীতে যা কিছুতেই সম্ভব নয।

আঠাব. খাম নয, খামহীন প্রশান্ত

গল্পটা খামেব নয। কিন্তু বলতে গিযে বাবংবাব হোচট খেতে হচ্ছে। উপকথন এত বেশি হযে যাচ্ছে যে মূল গল্পটাতে কিছুতেই আসা যাচ্ছে'না। গল্পেব পবিকাঠামো ঠিকমত না জানাই আমাব এই বিভ্রাট। পাঠক আশা কবি ক্ষমা কববেন। কিন্তু আমি তো গল্পটা বলতে চাই। শুধুই খামহীন প্রশান্তব গল্প। কিন্তু সমস্ত গল্পেবই কিছু পবম্পবা থাকে। আব থাকে বলেই গল্পেব কেন্দ্র থেকে গল্পটা সবে আসে। আবাব শুধু কেন্দ্রেই ঘুব পাক খেলেও তো আর গল্প হয না। তখন সেটা হযে যায নিছক ঘটনাব বিবরণ। তাই আগেব সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে আবাব ফিরে আসি সেই সকালে, যেখানে প্রশান্ত মানে, আমাদের খামহীন প্রশান্ত, মানে প্রশান্ত কুণ্ডু মানে, উঠতি প্রমোটাব প্রশান্ত কুণ্ডু আমাব কাছে এল তাব নতুন ফ্লাটেব নক্সা নিয়ে। আমি প্রশান্তকে খাতিবই কবলাম। প্রশান্ত আমাব এই আপ্যাযনে বোধহয বুকে বল পেল, আমি জিজ্ঞাসা কবলাম, কোথায কোথায তার এই নক্সা আটকাচ্ছে, অর্থাৎ মিউনিসিপালিটিব পক্ষে অর্থাৎ খোদ চেযাবম্যানেব পক্ষে এই নক্সাব sanction দেওযা সম্ভব হচ্ছে না। নক্সটা যখন প্রশান্ত কবাচ্ছিল নিযোগীবাবুব তত্ত্বাবধানে, তখন কেউই আমাব কথা খেযাল কবেনি। আমি যে এই প্লান্ ডিপাটমেণ্টেব ইনচার্জ, আমাব সাক্ষব ছাড়া যে কিছুতেই ঐ নক্সা Sanction হতে পাবে না, তা তাবা জেনেও তেমন গুরুত্ব দেযনি, হযতো একটিই কাবণে, তা হল প্রশান্ত আমার বাল্য বন্ধু। যোগেশচন্দ্র প্রমুখ প্রমোটাবদের বিল্ডিং নক্সার পূর্বে আমাব অস্তিত্বের

কথা সকলেই মাথায় রাখে। আর তাই সমস্ত বে-আইনী কাজেব আইন-ই পবামর্শ আগে ভাগে আমাব কাছ থেকেই নেয। আমার বর্তমানে আমাব প্রশংসা কবে। এমন এমন বিবল প্রশংসা কবে তা আমি কারোব ক্ষেত্রেই শুনি না। আমাব প্রশংসার ধাবাবাহিক বর্ণনাব আমি আপ্লুত হই। যা আমি আমাব এই অফিস গণ্ডির বাইবে কাউকে করতে শুনিনি। এমন কি আমাব স্ত্রীব নিকটেও না। সে তো সর্বদাই আমাকে 'বোকা' 'গোঁযার' এইসব সম্ভাষণেই আপ্যাযিত করে। অথচ প্রমোটাব সম্পর্কিত মহান মহান ব্যক্তিগণ এবং মিউনিসিপলিটির চেযাবম্যান, ভাইস চেযাবম্যান ও কমিশনাব গণ আমাব এই সততাব পঞ্চমুখ। আমি জানি যাঁবা আমার এই সততায পঞ্চমুখ, তাঁবা কেউই সৎ নন। আমি জানি তাঁদের অসৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ কবাব জন্যই আমাব এই প্রশংসা।

উনিশ. সৎ থাকাব আত্ম-কৈফিযৎ

তাতে কিছু আসে যায না। কাবণ আমি সৎ থাকি, সবল জীবন যাপন কবি আমাব নিজস্ব তাগিদে। আপন অস্তিত্বেব নিবিখে মাঝে মাঝে নিজেকে শূন্য মনে হয। শিক্ষাগত ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, যথাবীতি মানমর্যাদা না পাওযাব ব্যর্থতা., আমাকে বহু ক্ষেত্রে কুণ্ঠিত কবে। আমি যখন দেখি হাজাব হাজাব লোক সমাজেব প্রতিষ্ঠিতদেব নামে জযধ্বনি দেয, দল বেঁধে যখন ভোটে জিতিযে নিযে আসে তাদেব ঈপ্সিত ব্যক্তিকে, তখন সেই জযী খ্যাতিবান ব্যক্তি সম্পর্কে আমাব ঈর্ষা হয। তাদেব উত্তবণেব দৌড়ে ক্রমশঃ পিছতে পিছতে আমি যখন বাড়ি ফিবে আসি, তখন আমাব সামনে আব কেউ থাকে না। আমি সম্পূর্ণ একা হযে যাই। আমি কোনো খ্যাতনামা সৃষ্টিশীল ব্যক্তি নই যে, আমাব নিজস্ব সৃষ্টিব জন্য প্রশংশিত হব। আমি কোনো সার্থক অধ্যাপক, ইঞ্জিনিযার বা ডাক্তাব নই যে, আমাব অস্তিত্বকে প্রতিনিযত সকলে মনে রাখবে। এমনকি আমি খুব ভাল আর্কিটেক্টও নই যে, আমাব কাছে সকলে ভীড কবে আসবে তাদেব বাডিব নক্সা তৈবীব জন্য। তবে আমি কেন! —আমি কি? এই প্রশ্ন আমাকে তাডিযে নিযে বেড়ায। আপন অস্তিত্বেব এই সংকটে আমি মুহ্যমান।

কুড়ি. এবং আরো আগেব কথা

আজ থেকে বাইশ বছব আগে যখন আমি এই কাজে যোগ দিই, তখন

আমি জয়েণ্ট এণ্ট্রান্সে চান্স না পাওয়া একজন পলিটেকনিক ইঞ্জিনিয়র। উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পিতার সততা নিয়েই আমার কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ। কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের বেশ কিছুদিন আগে আমার বড়দাকে মেরে রাস্তায় শুইয়ে রেখেছিল এলাকার এক রাজনৈতিক নেতা একথা সকলেরই জানা। দাদা নক্সাল আন্দোলনের জোয়ারে ভেসেছিল। কেন ভেসেছিল, তা ঠিক মনে নেই। হয়ত বাবার স্বদেশী আন্দোলনের সমগোত্রীয়, এই ভেবে। বাবাও হয়তো ঐ একই কারণে কোনো প্রতিবাদ করেন নি। দাদার মৃত্যুর পর, মনে আছে মা সাতদিন শুধুই কেঁদেছিলেন। বাবা কিন্তু কাঁদেন নি। আমি তখন মার পরামর্শ মত দাদার থেকে একটু দূরে থেকেছি। পুলিশের নজর ছিল আমার ওপরও।

একুশ ঃ আমার ধরাপড়া ও ছাড়া পাওয়া

দাদার মৃত্যুর দেড় মাস পর পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে তিন দিন লক-আপে রাখে। ওদের গোয়েন্দা বিভাগ নানাভাবে দাদার বন্ধুদের সম্পর্কে বিশদ কিছু জানতে চেয়েছিল। মনে আছে, সিগারেটের ছ্যাঁকা...ইত্যাদি ইত্যাদি নানা রকম অমানুষিক অত্যাচার করেছিল আমার ওপর। কিন্তু যেহেতু আমি কিছুই জানি না, তাই কিছুই বলতে পারিনি। কিন্তু আমার এই ক্রমাগত 'জানি না' বলার ধারাবাহিকতা দেখে গোটা পুলিশ বিভাগ দু'-দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদল মনে করল, আমি পাকা আদর্শবান নক্সাল, তাই এত অত্যাচারের পরও আমার মুখ থেকে 'জানি না' বাদে দ্বিতীয় কোনো শব্দ বার করতে পারে নি। আর একদল মনে করল, আমি সত্যিই গোবেচারা। কিচ্ছু জানি না। না হলে কোনো জেদী নক্সাল মার খেয়ে আমার মত হাউ-মাউ করে কখনও কাঁদে না। আমার সম্পর্কে তাদের ধারণার দ্বিমত থাকলেও আমাকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে তারা সহমত পোষণ করল। আর আমি রক্তাক্ত গুহ্যদ্বার ও সমগ্র শরীরে সিগারেটের আগুনের চিহ্ন নিয়ে বাড়িতে ফিরে এলাম।

বাইশ ঃ আমার বাড়ি ফেরা, বাবা-মার প্রতিক্রিয়া

আমি যখন প্রথম বাড়িতে এলাম, দেখলাম মা একটুও কাঁদলেন না। দাদার মৃত্যুতে মা সাতদিন শুধুই কেঁদেছিলেন, এবার কিন্তু এক ফোঁটা

চোখের জলও ফেললেন না। আমার ক্ষতস্থানে হাত বুলতে বুলতে শুধু বললেন, 'ভগবান এত অত্যাচার আর সহ্য করবেন না। দিন বদলাবেই।' বাবার কিন্তু চোখে জল দেখেছিলাম সেদিন। আশ্চর্য হলাম, যে বাবা দাদার ঐ মর্মান্তিক মৃত্যুতেও এতটুকু কাঁদেন নি, তিনি আমার এই অত্যাচারের চিহ্ন দেখে চোখের জল ফেললেন! উত্তর পাই নি। আমার মত গোবেচারার মারের কষ্ট উপলব্ধি করে হয়ত চোখের জল ফেলেছিলেন। হয়ত ভেবেছিলেন, দাদার একটা আদর্শ ছিল, সেই আদর্শের জোরে দাদা সমস্ত কষ্টকে জয় করার মানসিকতা তৈরী করতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমার তো কোনো আদর্শ নেই। কিসের জোরে আমি এই কষ্টকে সহ্য করবো? আমার এই অসহায়তার কথা ভেবেই হয়তো এক ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন করেছিলেন, কিন্তু এসব কথা ভিন্ন। গল্পের আযতনে একে ধরবার চেষ্টা বৃথা।

তেইশ ঃ গল্প না হওয়ার যুক্তি ও দ্রুত গল্প সমাপ্তির কারণ।

সামান্য একটা 'খাম'। দুই বর্ণের এই শব্দটিকে একটি বাক্যে ধরতে চেয়েছিলাম গল্পের শুরুতে। কিন্তু কিছুতেই মনমত বাক্য রচনা করতে পারলাম না। প্রথমে ভাবলাম 'খামহীন প্রশান্ত' নয়, প্রশান্তহীন 'খাম' নিয়ে গল্পটা লিখব। কিন্তু প্রশান্তহীন 'খাম' এর কোনো চরিত্র নেই। খাম জড় পদার্থ। নিজস্ব কোনো গতি নেই তার। আর গতি ছাড়া 'খাম'-এর আদান-প্রদান অসম্ভব। তাই প্রশান্তকে নিয়ে এলাম 'খাম' এর চরিত্র নির্ণয়ে সুবিধে হবে বলে। কিন্তু বিপদ ঘটল অন্যত্র। প্রশান্ত আসার সঙ্গে সঙ্গে এসে গেল প্রশান্তর চারিপাশ। তাকে ধরতে হলে নিজেকে চিহ্নিতকরণ অবশ্যম্ভাবী। অথচ নিজেকে চিহ্নিতকরণ করতে গিয়ে আত্মকথন বেশি হয়ে গেল। ইতিপূর্বে উপকথনের আধিক্যের জন্য পাঠকের নিকট ক্ষমা চেয়েছি। এবার অতি-কথনের দোষে দুষ্ট হয়ে, এখন ক্ষমারও অযোগ্য। তাই পাঠকের আর ধৈর্য্য-চ্যুতি না ঘটিয়ে এর পরবর্তী বৃত্তান্ত আমি সংক্ষেপে বিবৃত করছি।

চব্বিশ ঃ গল্পের সংক্ষেপিত রূপ।

প্রশান্তকে আমি অভয় দিলাম। পরামর্শ দিলাম। উক্ত নিয়ম যেহেতু আমার নখদর্পণে, নিয়ম ভাঙার রাস্তা খুঁজে পেতে বিশেষ অসুবিধে হল না। আমার পরামর্শ অনুযায়ী দু' একদিনের মধ্যে প্ল্যানটি পুনরায় জমা দিতে নির্দেশ দিলাম। প্রশান্ত কৃতজ্ঞচিত্তে বিদায় নিল। যাবার সময় অভ্যাসবসে

নিজেব দামী সিগাবেট আমাকে দিতে গিযেও পকেটে পুবে, আমাব কম দামী-সিগারেট খেয়ে বিদায় নিল।

দুদিন পর চেযাবম্যান আমাব ঘবে ঢুকলেন, যথারীতি তাঁকে বসাব অনুবোধ কবলাম। তিনি বললেন, 'আপনাব সমস্ত কথা প্রশান্তবাবুব মুখে শুনলাম। আজকেব দিনে আপনি সত্যিই ব্যতিক্রম। আপনি যদি এই কেসটা 'সিমপ্যাথেটিক্যালি' না দেখতেন তবে ও বেচাবা মাঠে মার যেত।

—কেন আপনারা তো সকলেই ওর শুভানুধ্যাযী ?

—কিন্তু আইন বলে তো একটা বিষয আছে। যদি আইনেব ঐ বিষযটা আপনি না দেখতেন।

প্রশান্তর মুখটা আবাব ভেসে উঠল। চোখেব সামনে চেযাবম্যানেব মুখ। দেখলাম দুটো মুখেব আদলেই একই কৃতজ্ঞতাব ছাপ। অথচ দুই ব্যক্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন। একজন চেয়াবম্যান। প্লানেব স্যাংসানিং অথরিটি। অন্যজন ঐ প্ল্যানেব আবেদনকাবী। মধ্যবর্তী আমি, তাঁদের নিকট 'ব্যতিক্রম'।

———

আসলী ডায়মণ্ড

সাধন চট্টোপাধ্যায়

তাবপব মহিলাটি একের পর এক রুম পেরিয়ে, আন্তবিক ভঙ্গিতে দুজনকে নিজেব শোওযাব ঘরে এনে বসালেন। টিপ্‌টপ বিছানা। বছর চল্লিশের আসলি সেগুন কাঠেব ইংলিশ খাটে নরম কারলন গদীতে ধুপ কবে বসে টেব পেল এখানেই মহিলাব পাশে বিটায়ার্ড মামা শোন। ঘরটি বে-শ প্রশস্ত, লাগোযা ছিমছাম বান্নার আধুনিক বিধিব্যবস্থা। চব্বিশ ঘণ্টায় দুজনের পাশাপাশি অনালাপ চলাফেবা, একঘেযেমি চা-খাওযা, টুকিটাকি কিছু পাঠ, আহাব, কোনো ইস্যু নিযে পরস্পবের রুচিকে আক্রমণ, পোষাকের জন্য লোহার আলমাবি খোলাব শব্দ, উভযের চুপচাপ চেযাবে বসে থাকা, প্রসাধন, টাকেব পেছনে চিবুণি বোলাবাব অভ্যাস, ক্যাসেট শোনা কিংবা নিকট আত্মীয়ের সমালোচনা—সবই যে এই ঘরটাকে কেন্দ্র কবে—মনোময চোখ ঘুবিযে বুঝে নিল। চেযার ঠেলে ধরার ভদ্রতায মহিলাটি যখন শুনলেন 'ব্যস্ত হবেন না.... আপনি বসুন তো', ঈষৎ কৃতজ্ঞতায বয়সের চোখজোড়া আদুরে খুকি। এই যে তিন-তিনটে রুম পেবিযে হেঁটে আসা, টুকিটাকি সরানো চেযাব নাড়া-চাড়া, উত্তেজক খুশি—ক—ত দিন পব!—মনোময শুনল ধকলের জন্য মামিমাব দেহখোলের মধ্যে বাতাস-পথটি বেলো মাবছে। তবু সব কিছু ছাপিযে অন্য স্বাদের মুহূর্তে সফল—এ-দুজনেব হঠাৎ উপস্থিতি।

—মামা নেই? ববিবার তো?

ভাগ্নীর প্রশ্নে মহিলাটি কৌতুকের ছোট্ট হাসি ছড়িযে বলেন—বিকেলে বাড়িতে থাকার মানুষ তোব মামা? শুনেছিস জীবনে?

—স্বভাব বদলায় নি?

—না বদলাক!

—তুমি একা?

—দিনরাত পেছনে থাকবো ওর? শবীরটা ভালো থাকে না একেই আমার! অনুভা আর্তনাদের ভঙ্গীতে চেঁচিযে উঠল—তুমি কিছু কববে না কিন্তু। যখন আমি ফের চেযার ঠেলে শরীর তুলে বান্নাঘবেব উদ্দেশে কণ্টকব প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

হঠাৎ মনোময় পেল উগ্র গন্ধতেলেব ঘ্রাণ—যা মহিলাটি ওদের বৈঠকখানায বসিযে ড্রেস পাল্টাবাব অবসরে নিজেকে তৈবি কবছিল। কডি খোপা এবং একদা বাহাবি চুলের স্মৃতিমাখা মাথাটি ভীষণ চপ্‌চপ্ কবছে—মনোমষ মহিলার পেছনটায তাকিযে দেখতে পেল এবং ঘরের কোণে চুপসে থাকা রঙিন টিভিটাব স্ক্রীণে একটি স্থূল বেঁটে ছাযা সরে যায়।

—কিছু খাব না। শুধু চা। বাবণ করো কিন্তু! মনোময়ের ফিসফিস তাগাদায অনুভা উঁচু গলায শোনায—অমিও না। ভীষণ আঁই-ঢাঁই করছে!··

এ্যাণ্টাসিড পেলে—!

মহিলা খুশিতে ফিবে এসে বললে—খাবি? কাবমোজাইম আছে কিন্তু।

—না, না,! অনুভা লজ্জা পায।

—কেন? তালে টামস্? জেলুসিল? এসিগার্ড? সাত-আঠ ধবনেব অম্লনিবসনী বডিব নাম উচ্চাবিত হয এবং মনোময়েব চোখে পডে টি ভিব পাশেব টেবিলটিতে স্তূপাকৃত শিশিফাইল, কৌটো-ফাইলে—ওষুধে-ওষুধে ছযলাপ।

এখন বিকেল সাডে চাবটে শ্রাবণের আট-দশ তারিখ—সকাল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বর্ষণ ও ক্ষান্তিব পালায দিনটি যেন গুটিযে এসেছে অথচ আকাশে ছডিযে আছে একটি প্রার্থনাব রং—যাব মলিন আভায ঘরদোব জানলা ধবে বিধুব পবিবেশ। আলো জ্বালাই যেতে পাবে কিন্তু মনোমযের গ্যাঁট হযে বসাটি এতই দেওযাল ঘনিষ্ঠ—আবাসনেব অন্যান্য পাটিদের টিউবগুলো লাগছিল অসুস্থ সাদা হাডেব টুকবো। মামিকে তাই সুইস-এ হাত দিতে দেয়নি। সব কিছু পুবো আলোকিত হলে মনোময টেব পায নিজেকে হাবিযে ফেলেছে।

এবাব মহিলাটি নাটুকে অনুযোগেব সুবে অনুভাকে বলেন—তুই চা কর! এলি কদ্দিন পর! জামাইতো এ বাডিতে প্রথম—

—বুডো জামাইবেব প্রথম কি? বেশ, তুমি শুধু চা বানাও। দুধ ছাডা!

—বালাই ষাট! জোযান থাকতে আনিস নি কেন? শান্তি। একটু মিষ্টি খা।

—না, না! অনুভার তীব্র আপত্তি। ছোড়দিব বাডি থেকে একপেট

খেয়ে এসেছি।

—ওমা! টুটুনের বাড়ি গেছলি? কেমন আছে ওরা?—কতো দিন আসে না!

মহিলা 'টুটুনের বাড়ি' শুনে যতখানি উদ্দীপ্ত, ততটাই বিষণ্ণ ও মুষড়ে পড়েন 'কতদিন ওরা আসে না' ভেবে।

রাতে রান্না চাপানো, বাইরে থেকে বিশেষ খাবার আনানো, নানা উপাচারে পেটে ভরিয়ে দেওয়া—সব প্রস্তাব না-মঞ্জুর হওয়ায় ভদ্রমহিলা রান্নাঘর থেকে নাছোড়বান্দা হয়ে উঠলেন।

—দুটো ফ্রেঞ্চ টোস্ট করে আনি?

—উঁহু।

—ঘরের মিষ্টি খা তবে? ওমা!

--বিশ্বাস করছ না তুমি?

—তালে কিছু ফল কেটে দেই!

—কিচ্ছু নয়।

—শুধু মনোময়ের জন্য চাইনিজ…তুই না, না করবি না।

মনোময় জোর দিয়ে বলল—প্লিজ, আপনি কিছু করবেন না।

—রান্না মাংস আছে ফ্রিজে। কিছুটা গরম করে দেই?

—মাংস আমি খাই না!

এই আলো, উগ্র তেলের ঘ্রাণ এবং চারপাশের বাতাস জলসিক্ত থাকায় ঘরে মনোময় সব কিছুর মধ্যে সোঁদাল গন্ধ প্রভব করে। কাবলন গদী, বেড-কভার, বালিশের ঢাকনা, ঘরের কোণ, দেওয়ালে পুরনো স্নোসেম্‌ পেইণ্ট, টেপ-টি-ভির পলি-পপ্‌লিন কভার, পলিথিন জ্যাকেট—এমন কি পাশাপাশি দু-দুটো মজবুত লোহার আলমিরা থেকেও। তাহলে কি মহিলা অপরিচ্ছন্ন, এলো-মেলো থাকেন? মনোময়ের পেট সামান্য গুলিয়ে ওঠে। অনুভা ঘাড় লম্বা-করে কানের কাছে ফিস ফিস করল—বিয়ের সময় মামি দারুণ সুন্দরী ছিলেন।

—নিজে দেখেছিলে?

—আমাদের বাড়ি থেকেই বিয়ে হয়েছিল ··দেখেশুনে বাবা-ই করে-ছিলেন! —১৬।১৭ বছর বয়স আমার, দেখব না? স্বামীর সামান্য খোঁচায় বিরক্ত হয়।

—বলছিলে তোমাব কোন মামি যেন ভালো গান....

—এই, এই তো ! মঞ্জু মামি !—ভাবি মিষ্টি গলা ছিল তখন !

—এমন কি দাঁডিযেছে ?

এব মধ্যেই বিশেষ গন্ধ, আলো এবং ঘবটিব পবিবেশে মনোময় সযে গেছে এবং অলস দৃষ্টি বিলাসিতায জানলা ভাসিযে এলাকাটিকে উপভোগ কবছিল। এ অঞ্চলে সে কোনোদিন পা দেযনি। যেখানে থাকে. কলকাতা ছাডিযে এটি ঠিক বিপবীত মেরুতে। মনে হচ্ছিল. বার্ণপুর, শিলিগুড়ি বা হলদিযাব কোথাও বসে আছে।

মহিলাটি প্রচেষ্টায দেহভারেব সাম্য রেখে দুলতে দুলতে চাযেব ট্রে-টা বসিযে 'চিনিব কথা তো জিজ্ঞেস কবলাম না ?' বলে, মনোমযের সম্মতি-দৃষ্টিতে 'থাই তবে কম' শুনে নিশ্চিন্ত মুখভঙ্গিতে ফেব গিযে বযে আনলেন ক্রিমক্র্যাকাব শোযানো দামি বেকেলাইটের ফুলকাটা প্লেটটি, ফেব গিয়ে আনলেন কুচি পাঁপডভাজাব পিবিচ, ফের গিযে হলদিবাম ভুজিওযালার ঝাল চানাচুব, ফেব গিযে এক প্লেটে শোনপাপডি, ফেব গিযে অনুভার জন্যই শুধু ফ্রীজেব একটি ছানাব জিলিপি, ফেব গিযে , তখনই অনুভা খাট থেকে লাফিযে হাত টেনে জোবজবস্তি চেযারে বসিযে দেয় মহিলাটিকে।

—বললাম গল্প করবো !—দবকাব নেই কিছু।

—কী-ই বা করতে দিলি ?

—না-দিলাম তো না-দিলাম ! অন্য একদিন হবে।

মঞ্জুমামি খুকি-চোখে মজা করলেন—বিযেব পর তিবিশ বছরবাদে এলি ! —তাও মেয়েব বিযেব নিমন্ত্রণ বযে—ফেব যখন আসবি, মামা-মামি থাকবে না, দেখে নিস !

সবল ভঙ্গিতে মামিব অনুযোগে অনুভা যথাযথ জবাব দিতে পারে না। অথচ বিযেব আগে মামার এই কোযার্টার্স-এ ক-ত বার এসছে ! মামার দুই ছেলে—মিণ্টু এবং ছোটন—জিভ মোটা বলে অনুভাকে ডাকত 'লাঙ্গা দিদি'। 'র' উচ্চাবণ স্পষ্ট হত না। ছ ভাই-বোনদেব মধ্যে অনুভাই ঠাণ্ডা—শান্ত-শিষ্ট ছিল বলে, ছোট মামাব পক্ষপাতিত্ব ছিল। নিয়ে ধর্মতলায ভালো ইংবিজি বই দেখানো, বীজগণিতেব কঠিন কঠিন অঙ্ক দিযে ঠকানো, আলু-কাবলি—ফুচকা খাওয়ানো—কত আবদার ! এই মামা মৃদুভাষী, বায়ুগ্রস্থ, খুঁতখুঁতে এবং এমন কঠোর নিয়মবিলাসী যে বাইবের উপহাস গায়ে মাখেন

না। অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে অবসরের পরও যা মাসে পান—অনেকের কাছেই তা স্বপ্নের মাইনে। ওনার মত অনুমত এতই সূক্ষ্ম, জটিল এবং অনমনীয় যে সংসারে তিনি বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপ। অথচ কত বিষয়ে তাঁর কত জ্ঞানতথ্য।

চায়ে চুমুক পড়তেই মহিলা প্রশংসার প্রত্যাশায় জানতে চাইলেন—হয়েছে কিছু? লিকার-চা ভালো বানাতে পারিনা।

—ফা—স্ট—ক্লা—শ! মনোময়ের ভুরু নাচানোর ভাষাতে ইনি 'যাঃ!' বলে বালিকার মতো লজ্জা পেলেন। ছোট চোখদুটি হাসির টানে-টানে ঝিকের চটিতে ডুবে গেল।

—তোর মামা ভালো চা করে। বুঝলি অনু।

অনুভা যেন আনমনা, এই সব প্রসঙ্গে নেই। হঠাৎ মহিলাটির বাঁ হাতের পাতাটির আঙুল জড়ো করে তুলে ধরল।

—কিসের আংটি গো?

—বি-ডিয়ার!

—আমেরিকান ডায়মণ্ড?

—আসলি। প্রচ্ছন্ন হতাশার অনুভার ফাঁশ থেকে হাতটি ছাড়িয়ে, তাজা শ্বাস নিয়ে জরুরি ভঙ্গিতে 'ছেলে কেমন? কি করে রে?' বললেন, যেন মূল্যবান কিছু তথ্যের জন্য নিশপিস করছেন। অনুভাকে ক্ষমা করে দিলেন।

মনোময় কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে সব দেখে নিয়েছে। মহিলাটির হাতের পাতা ছোটখাট লাবণ্যহীন বহু পুরনো ত্বকের নিচে শিরা-উপশিরা, নখের মাথাগুলো বোতামের মতো, বহুদিন নেইলপালিশ ছেড়ে দিয়েছেন বলেই জৌলুষহীন ম্যারম্যারে, মধ্যমায় একটি পলার আংটি আছে বটে—জীবনের বহু শৌচ-বৈঠকের ধকলে ম্রিয়মান। অথচ পাশাপাশি অনামিকার 'বি—ডিয়ার' টি সুবিন্যস্ত কাটিং-এর ফলে মায়াময় একটি সফেদ ডালিম রোওয়ার মতো। বিকেলের প্রার্থনারত আলোর মধ্যে, ঘরে অদ্ভূত আভিজাত্যের দ্যুতি ছড়িয়ে দিয়েছিল যখন অনুভা আঙুলকটা মেলে পরীক্ষা করছিল। শুনেছিল; কিন্তু হীরা যে এমন বৈভবে জ্বলে প্রথম চাক্ষুষ দেখল মনোময়।

ওরা দুজন—অনুভা ও মনোময়—ঠিকানার চিরকুটটি হাতে সামান্য

খোঁজখবরের পর যখন ব্লকটির মুখে দাঁড়িয়েছিল—বৃষ্টি ধরে গেলেও চারপাশে চিহ্ন ছড়িয়ে আছে। ঘাসের গোড়ার কাদা-জল উপচিয়েই ছেলেরা খেলছিল ফুটবল, আর একতলার মরকুটো গন্ধরাজটির জলে ধোয়া ফ্যাকাশে পাতাগুলো মোটা পাপড়ির গোটা-চার টাটকা ফুল ফুটিয়ে যেন চিকন গরিমায় স্থির। এরই আড়ালে, বারান্দার চেয়ারে বসা বৃদ্ধটির নিরাসক্ত কর্মহীন চোখ। 'কাকে চাই' বা 'কোথায় যাবেন'—এমন কৌতূহল বাহুল্য ও-দৃষ্টিতে! অসুবিধে হয়নি মনোময়ের। সর্বত্রই এমন চিহ্ন-বিজ্ঞান যে খুঁজেপেতে বেশি পাক খেতে হয় না।

দোতলার সিঁড়ি ছায়া-ছায়া পরিবেশে লম্বা মইয়ের মতো লাগছিল—হেলে আছে যেন। ওরা ধাপ পেরিয়ে সামান্য ধকল সামলে, বহু স্পর্শের ময়লা সুইস-টায় হাত দিতেই ভেতরে শুনতে পেয়েছিল কিচ্‌মিচ্‌ পাখির ডাক। কয়েক সেকেন্ড পরেই ল্যাচ্‌ ঘোরানোর খুট শব্দ, একপাল্লা দরজার কিছুটা ফাঁকপথে মনোময়ের যা মনে হয়েছিল—এখনের মাসিকে দেখে সবটা মেলাতে পারবেনা। বেঁটে একটি মহিলা কাঁধ থেকে পায়ের গোছা পুরনো রূপটা একটি সেমিজের খোলে ঢাকা, কবরে চুপচাপ বসে থাকা কোনো অনাথা খৃষ্টানের কাউকে দেখে চমকে ওঠার মতো—অপ্রত্যাশিত বেলবাজনায় এতক্ষণের অপ্রাণ আসবাব সাজসরঞ্জামের মধ্য থেকে একাকিত্ব ভেঙ্গে ওপাশ থেকে মুহূর্তের বিস্ময়ে চমকে ছিলেন।

—ওঃ। এসো। অনুভাব পাশে মনোময়কে দেখে সহজেই আন্দাজ করে নিয়েছে। নইলে পঞ্চান্ন বছরের অদেখা কোনো পুরুষকে সহজেই 'এসো' বলা যায় না।

ওদের বৈঠকখানায় বসিয়ে 'আসছি' বলে ফাঁকা একটি রসের পর্দা নামিয়ে আঠারো মিনিট পর ফিরে এসেছিলেন এই মাসি হয়ে। এখন মনোময় বলে দিতে পারবে কী কী তিনি বদলে ফেলেছিলেন।

সাজানো সোফা ও গদীচেয়ারে যে-যার মতো দুজন বসেছিল। দুচারটে ক্যাকটাসের হাঁড়ি, একটি বুদ্ধ মূর্তি, বাতিল ক্যালেন্ডারের দামি ছবি দেয়ালে—মনোময়ের ধারনা হচ্ছিল অন্তত বছর চল্লিশ পুরনো না হলে আবাসনের আধুনিক জীবনযাত্রায় এতগুলো ঘর, বৈঠকখানা, পেছন বারান্দা—প্রশস্ততা জোটেনা। মনোময় বুঝেছিল মহিলা বর্তমানে একাই আছেন কিন্তু একমাথা নীরবতায় কী এমন সরাচ্ছে গোছাচ্ছে যে এখনও ফ্রেস হয়ে

আসছেনা ? ক্যাকটাস পরিচর্যা কে করেন, মামা না মামি ? খুঁতখুঁত স্বভাবেব—শুনেছি অনুব মুখে—বুদ্ধমূর্তি পছন্দ ? বউযের দিকে তাকিয়ে মনোময জানতে চায়—মামিও বিটাযার্ড ?

—না, বোধহয় !

—কোথায যেন ?

স্কুলটির নাম শুনতেই মনোময বলেছিল—সে তো উত্তর মেরুতে !

—তায মর্নিং।

— তখন সামলান মামা !

—তাই হবে !

—বিকেলে ফেব উনি—মামা নেই ! বাতে ? নিজের কৌতুকে নিজেই জবাব দেয়—দুজনেই আছে—আবাব কেউ নেই ! ক্রশিং স্টেশন !

অনুভার ইঙ্গিতে চেপে যেতেই, মহিলাটি পর্দা দুলিযে 'এ ঘরে আয়' বলে, দুজনকে একেব পব এক রুম পেরিয়ে এই ঘরটিতে নিয়ে এসেছিলেন। প্রত্যেক ঘবেই বিছানা পাতা, টেবিল, বই-ব্যাকেটের চিহ্ন, ধুলো, বেধেছেঁদে কিছু তুলে বাখা—মনুষ্য বসবাসের ইঙ্গিত নিয়ে পবিত্যক্ত। এই যে চারটে ঘবে উঁকি দেওযাব অভিজ্ঞতা, মনোময়েব বোধ হল একটি চিনেবাদাম ভেঙ্গে তিনটে খালি খোপের পব এ-বিতেই কেবল দানা। কাবণ সমস্ত আসবাবে ঠাসা থাকলেও এটিতেই কেবল ২৪ ঘণ্টায কেউ না কেউ রক্তমাংসেব শবীব ঘুবে বেডায।

এখন মনোময বলে দিতে পাবে উনি কী ভাবে এই মামি হযেছিলেন। সে নিজের খোল বদলে পবে ছিলেন তাঁতেব শাড়ি, মুখধুযে সুগন্ধী তেল মেখে ভালো কবে মাথা আঁচডে ছিলেন যাতে ধবা যায খুবই কোঁকডানো চুল ছিল যৌবনে। বাঁধানো দুপাটি দাঁত পবেছিলেন, সোয়েটের টিপ কপালে সামান্য বাঁকাভাবে, ঘডি এবং ডি-বিযার্সেব আংটি। সব কিছুব মধ্যে তডিঘড়ির ছাপ। তবে তিনি ডি বিযার্স কেবল বাডিতে অতিথি এলেই পবেন, নইলে তোলা থাকে। উনি যে ভীষণ খুশি হযেছেন দুজনকে কাছে পেযে, মহিলাব নিঃশব্দ ছটফট ও চোখডুবিয়ে হাসির মধ্যেই ধবা যাচ্ছিল।

—আপনার কি সুগাব ?

—কেন ? মামির চোখের ছটায বিস্ময় দেখে মনোময় লঘু কণ্ঠে বলে—

না, মিষ্টি নিয়ে খুঁতখুঁত করছিলেন তো।

হঠাৎ অনুভা মনোময়কে শুনিযে জোব দিয়ে বলে বসল—জানো, মামি গান জানে।

—কি গান? সবাসবি জিজ্ঞাসায় মহিলা সহজ ভঙ্গিতে 'আধুনিক—নজরুল' বলেই তাকান।

অনুভা ওব হযে জবাব দেয—তুমি বহু পুরনো রেকর্ড পাবে এখানে।

—বেকর্ড?

—হ্যাঁ হ্যাঁ ডিস্ক্!

তখনই মনোমষ গহরজান বিবি থেকে উমা বসুতে পৌঁছল কিন্তু বোধ হল উনি এ-সব তাম কিছুই শোনেন নি, যদিও ক্রম বিস্ময়ে ওনার আগ্রহ ঘন হচ্ছিল। উনি এ প্রসঙ্গে ভীষণ বৈচিত্র পাচ্ছিলেন। সত্যিই তিনি নাম শোনেন নি অথচ ঘরেব এই আলোহীন আলোব মধ্যে ঐ ফাঁকা রুমগুলো পেরিয়ে তাঁরা যেন একে একে হাজির হলেন।

—আপনি কাব ভক্ত!

মনোমযের হঠাৎ প্রশ্নে, হঠাৎই জবাব।

—প্রতিমা।

অনুভা জানতে চাইল—গলার প্রবলেমটা চলছে?

—ভীষণ ভোগাচ্ছে। ভয় হয।

—ক্লাশেও বকতে হয়।

এইসব কথার ফাঁকে মনোময লক্ষ্য করে মহিলার হাতদুটি তুলনায খুবই সরু এবং বিপবীতে, দেহ ফুলোফুলো চর্বি-জলে এমন গেঁজিয়ে উঠছে গ্রীবাটি ভীষণ মোটা, খাটো হয়ে গেছে। অনু বলছিল ভীষণ সুন্দরী ছিলেন! হবে হয তো! তখন মনোময়ের এল স্মৃতিবিধুরতা।

—প্রতিমাব ঐ-গানটা জানেন? বলেই দুতিনটে গানের প্রথম লাইনগুলো বলে যেতে মহিলা হ্যাঁ বা না—বিনা উচ্চারণে হাসি ছড়িয়েই রইলেন।

—একটু গেযে শোনান তো?

অনুভার দিকে তাকিযে 'গলা খারাপ হয়ে গেছে'. বললেন এমন ভঙ্গিতে যেন অনুরোধ মনোময করেনি।

—বলছে যখন, গাও না!

এইটুকুই যথেষ্ট। উনি, অতীতে ফিরে, ঈষৎ চোখবুঝে, অসুস্থ ফুলো—

আকর্ষণহীন শরীরের মধ্য দিয়ে যখন গাইলেন, মনোময়ের বোধ হল ভারি মিষ্টি রঙিন একটি প্রজাপতির শরীরে ধুলোর আস্তরণ পড়ে গেছে।

হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠতেই, 'কোথায় চললে?' অনুভার প্রশ্নে উনি খুশির ধমক দিয়ে বললেন—চুপ কর! সব জবাবদিহি করতে হবে তোকে?

—আমরা উঠব এখন।

মহিলাটি যেন ক্লাশ রুমের দিদিমনি এখন। চায়ের সরঞ্জাম সাজাত সাজাতে এমন আকার ইঙ্গিত করলেন—যেন এবার চায়ের সঙ্গে শোনপাপড়ি গুলো শেষ করতেই হবে।

মনোময় বউকে খাটো গলায় সাবধান করে—দেরি করো না বাড়ি ফিরতে দশটা।...কাউটা দিয়ে দাও...জলকাদার দিন, কিছু মিলবেনা রাতে।

অনুভা বোঝে, কিন্তু দু-জনের আড়াল মিসমাসে মামি কিছু অর্থ করতে পারেন ভেবে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল—মিণ্টু ছোটনরা এখন কোথায়?

—পুনা। দুজনেই।

একজন বউ নিয়ে, ব্যাকিটির ব্যাবস্থা হয়নি। দুজন একশ কিমি তফাতে থাকে। অনুভা শোনালো আমার দুই পুত্র—দুটিই রত্ন। ঢুকেছেই বিশ হাজার নিয়ে।

—লাস্ট এসেছিলাম মিণ্টুর বিয়েতে।

আমি ছিলাম? মনে পড়ছে নাতো?

—তুমি দিল্লী তখন। কলেজের ছাত্র নিয়ে—

হঠাৎ মনোময় স্মৃতিরেযেই প্রতিমা এবং তৎকালীন দু-চার শিল্পীর কিছু খ্যাত গান গুনগুন করল। উনি ফিরে এলেন।

—মিস্টুকে আজ দেখলাম রে অনু! টি. ভিতে।

—কি রকম?

—ওদের কম্পানির প্রোগ্রাম! ও পাশে ছিল!

—জানতে?

—ফোনে জানিয়েছিল।

মনোনয় দেখে মহিলাটি এবার চাযে চুমুক দিয়ে, চেয়ারে দোলখাওয়ার ভয়ে ছোট্ট পা দুটি ছুঁড়ে মারছেন। বিশেষ ছন্দে। ঘড়ি দেখে বললেন —দুটো ভাত বসাই?

—মাথা খারাপ? জল-কাদার রাতে ··

—টারমিনাস এখানেই। ভাবছিস কেন?

মনোময় এ অঞ্চল কিছু চেনে না। মনে হচ্ছিল, যতই রাত বাড়ছে পথ হয়ে উঠছে দীর্ঘ।

—তোর মামা কি বলে জানিস? মহিলা হাসেন।

—কি?

—আমি নাকি তার চেয়ে বড। বয়সে ঠকিয়েছি! অবোধ হাসিতে মহিলাটি যেন একটি মজার খুনসুটি শোনাচ্ছে ভগ্নিকে।

—স্কুলে আজকাল গাও তুমি?

—ফাংশনে এক-আধবার ধরলে গাই।

—মামাকে নিয়ে বসবে। ও-তো গান ভালোবাসে! শুনি সব বিকেলেই আজকাল রবীন্দ্রসদন—শিশিরমঞ্চের কাছে পিঠে ঘুরে বেড়ায়?

—তাই! মাসির কৌতুহলী ছোট্ট চোখ দুটি খুশিতে ডোবে। শুনবি তবে?

—কি?

—গান ভালোবাসার কাণ্ড—আজকের মতো একদিন এ-ঘরেই আড্ডা—স্কুলের দিদিমনিরা এসছে, যে-যার হাজবেণ্ড নিয়ে। কথা ছিল, যেমন গলাই থাক, সবাই গাইবে।—ওমা। তোর মামাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারলামনা। বড়দির অসুস্থ স্বামী ফ্যাস ফ্যাসে গলায় গাইল, কমলার বরতো সুরের কাছ দিয়ে হাঁটেনা, অনুরোধে গাইল। ওমা! সব্বাই হৈ হৈ করছি—তোর মামাকে দেখি পাশের ঘরে চুপচাপ কলা খাচ্ছে!—বসতে বলছিস? পাগল তুই! মহিলা বাঁধানো দাঁতে ঠুকঠুক করলেন, উপভোগ করলেন ঘটনাটি।

—আমিও বলেছি—যদি ঠকিয়েও থাকি, এখন আর বদলাতে পারবে না!

—আপনি সিওর?

মনোময়ের রসিকতায় উনি খুশিতে দু হাতে তালি বাজালেন ছোট্ট।

ইতিমধ্যে অনুভা বাথরুম সেরে, শাড়ির ভাঁজ বাছতে বাছতে বলে—দারুণ বাথরুম! পাশের সিঁড়িটা কিসের?

—মামার পাগলামো। ছাদে একখানা ঘর করেছে।

—আবার ঘর?

মনোময় জিজ্ঞেস করে—কী হবে!

মহিলা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নেব জবাব না দিয়ে, হেসে তাকিয়ে থাকেন।

—একটু মিস্টি বার করে দেই ?

—না।

উনি তখনই অনুভার কাছে টুটুন, বুবি, শোভাদের কথা, তাদেব পুত্র-কন্যা ও সংসাবের নানা খুটিনাটিব সন্ধানে মাতোয়াবা। আড়ালে প্রচুর জল পেযে গাযে ঢেলে বালকেব চানে যেমন অফুবন্ত, উনি অনুভাকে পেযে সব্বাইকে স্পর্শ কবতে চান।

—মামাব ফিবতে ফিবতে ?

—আমি খেযে তখন শুয়ে পড়ব।—শরীর ভালোনাতো আমাব—সকালে বেরুতে হয। হাসতেই থাকেন মহিলাটি। হঠাৎ মনোমযকে বলেন—তখন কাদেব নাম বলছিলে ? পুবোনো ?

'কি প্রসঙ্গে ? মনোমযের বিস্মবণে, ধবিয়ে দিলেন—রেকর্ড'! গান!—আমাব আছে কিছু, দেখতে চাও ?

—নামাবেন ? এখন ? কটা বাজল অনু ?

—ভাবছ কেন, এখানেই টাবমিনাস।—তুলে দেবো—দেখতে দেখতে পৌঁছে যাবে! ছুটিব দিন বলে নো অসুবিধা!

—আপনি ববং আব একটা শোনান। গায়ত্রী বসুর কোনো গান!

—উঃ! কী ভীষণ ভালো গাইতেন গাযত্রী বসু। হঠাৎ লজ্জায ঘন হয়ে বলেন—গলা কি আর আছে ভাই ? প্র্যাক্‌টিস চাই!

—কবেন না কেন ?

—ছেলেবাও লেখে চিঠিতে।—কিছু লুচি ভেজে দেই ? দাঁড়া অনু।—বিয়েব আগে খেতে চাইতি, ভীষণ বকতুম, মনে আছে ? —আজ তোর মেযের বিয়ে।

—এটাইতো জীবনেব ছক, কি বলেন ? মনোমযের জবাবে, মহিলা নীরব হাসিব দ্যুতি ফুটিযে ফেব শুনতে পেলেন—ছকে বিশবাস করেন ?

শুনতে পেলেন না যেন, ধকল সয়ে ময়লা একটা বাক্স টেনে বার কবতেই, মনোময দুটো হাঁচি দিল।

—বড্ড ধুলো! খোলাটোলা হয না। উনি লজ্জা পেযে জানালেন।

—কেন খোলেন না ? মনোময হাল্কা প্রশ্ন কবতে, উনি ছাত্রেব খাতা যেন সংশোধন করে দিলেন—ঐ যে বললে ছক ? মানুষ কি ছিমছাম থাকতে পারে?

এলোমেলো হতেই হবে।—অনেক কিছু বইতে হয় জীবনকে, এড়িয়ে চলা যায় না। এটাই চ্যালেঞ্জ।

মনোময় ধাক্কা খায়। শুনতে পেল অনুর অস্পষ্ট গলা—এ বিয়েতে তোমাদের দুজনকেই চাই কিন্তু।—দরকার হলে থাকবে দুদিন—এমন কী পিছুটান ?

ওদের এগিয়ে দিতে সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নামতেই উনি হাঁপাচ্ছিলেন। এদের অনুরোধ শোনেননি। ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। পোষাক বদলের প্রয়োজন হয়নি, শুধু একটি ম্যানিব্যাগ—যা খালি ঘরগুলোর যে-কোনো বিছনার ওপর ছুঁড়ে রাখা হয়—সাবধানতার দরকারই হয় না—সঙ্গে নিয়ে বেরুলেন। পুরনো আবাসনটির প্রায় সব্বাই চেনে মহিলাকে। উনি এদের নদী দেখালেন, পাহাড় দেখালেন, অরণ্যের ইঙ্গিত দিলেন, ওরা দেখল একটি সুইমিং পুল, কংক্রীটের বিশাল ডায়নোসর এবং ঘন গাছে ঘেরা সাজানো বীথিপথ।

বাসটারমিনাসে হঠাৎ অনুভা মিস্টিপাতার পান খোঁজ করতেই মহিলা ভীষণ খুশি। নাচতে নাচতে দুজনকে দুটো খাইয়ে, কাগজে মুড়িয়ে সঙ্গেও দিয়ে দিলেন। তার আগে জোর করে থাম্পস্ আপ। বাড়ির জন্য একমুঠো ক্যাডবারি অনুর কাঁধের ব্যাগে ঢুকিয়ে দিলেন।

টাইমকিপারের খুপড়ির পাশে আলো নেভানো একটি সরকারী বাস। ভেতরে অনেকগুলো ছায়া সিট্ দখল করে আছে।

—উঠে পড়। ভীড় হবে।

—ছাড়বে কখন ? এটাই তো ?

—হ্যাঁ। মিনিট দশ—আমি তো সকালে এ-বাসেই যাই।—ভালো ছোটে

—কেন বাস চালাচ্ছ ?—ট্যাক্সিতে স্কুলে যেতে পারো !—গাড়ি কিনলেও এখন চমকাবার কিছু নয়।

—মিস্টু কি লেখে জানিস ? ট্যাক্সিতে যাতায়াত না করলে আমার চাকরি ছাড়তে হবে। শর্ত।

—মানছনা কেন ?

মহিলাটি সরল ভঙ্গিতে জানান—তালে আমার কষ্ট বাড়বে !

বাস না ছাড়া পর্যন্ত বাইরে ছোট্ট কালভার্টের মতো উঁচু বেদিতে অপেক্ষা করলেন। বাস ছাড়তেই এমন হাত নাড়লেন যেন দূরে ট্রেন যাত্রায় কোনো প্রিয় আত্মীয়কে বিদায় জানাচ্ছেন। তারপর ছক ভাঙ্গায় নিজেও বাঁধানো দাঁতে —পান কিনে খেলেন।

ফের সিঁড়ির গোড়ায়, অন্ধকারে শোয়ানো সিমেন্টের পইটা দেখে, এতক্ষণের বুকের হাঁপ ভীষণ বেড়ে গেল। তবু একটি একটি সিঁড়ি ভাঙ্গলেন মহিলাটি। যেন চ্যালেঞ্জ। দরজা খুললেন। ফাঁকা বিছনায় ম্যানিব্যাগটি ছুঁড়ে নীরব টেবিলে ডি-বিয়ার্সটি খুলে রাখলেন। পরে আলমারিতে ঢোকালেন। ঘর তিনটে পেরিয়ে গেলেন।

শিশি ফাইল থেকে দুটো বড়ি গিললেন। শুলেন টানটান। আলো নিভিয়ে দিলেন। জানলা দিয়ে সিক্ত বাতাসের ঢেউ এল। উনি অন্ধকারে সারা ঘরে দেখলেন ডি-বিয়ার্স এর টুকরো আলো। ভাসতে ভাসতে সব মিলেমিশে গলন্ত ধাতুর মতো বুকের মধ্যে বেয়ে নামতেই ভেতরটা আলোর ছটায় ভরে গেল। তিনি বিস্ময়ে বাহাতটি তুলে দেখলেন নিরাভরণ। অদ্ভুত খুশিতে স্থির চোখ, কিছু পরই টের পেলেন ঘরটা ফের আগের মতো হয়ে উঠতে চাইছে। আলোজ্বালিয়ে ঘড়ি দেখলেন।

তখনই শুনলেন অনেক দূরে ছোট্ট বাক্স থেকে কিচ্‌ কিচ্‌ ধাতব পাখি ডাকছে।

———

সংক্রান্তি

অজয় চট্টোপাধ্যায়

প্রথা ভাঙল ; অর্থাৎ সদব দপ্তব আগলে থাকা নরেশ গণকর্মসূচীতে নেতৃত্ব দিতে বাজি হল। দুদিন দুটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। গায়ে গাযে লেগে থাকা একটি হিন্দু আর একটি মুসলিম প্রধান গ্রামেব। মন্দিব এবং মসজিদের ভিত্তি প্রস্তব বসাতে হবে। নবেন যে রাজি হল তা ঝোঁকেব বশবর্ত্তি হযে নয়। চিন্তা প্রসূত সিদ্ধান্ত। নেপথ্যে দুটি দিক আছে যা তাকে প্রবোচিত কবল। এক। ভোট আসছে, প্রাদেশিক চাব শীর্ষ মাথা এক হযেছিল চাব দিন আগে। বিস্তব যুক্তি তক্কো গপ্পোব পব ঠিক হয বিধায়ক হিসেবে তাকে লড়তে হবে, সিটটা হাবা-জেতাব জড়াজড়িতে ঝাপসা, ২% ভোট পক্ষ-বিপক্ষ শিবিরকে নিয়ে খেলে। ছলনা করে, '৭৭-এব পব থেকে কেন্দ্রটায ফ্রণ্টেব গুবুদশা চলছে। ভোটের ছাযা এখনো পড়েনি। কিন্তু অভিজ্ঞ কানে পদধ্বনি শোনা যায়, টেব পাওযা যায় বাজনীতিব অন্দবমহল নড়েচড়ে বসছে। যেহেতু যাত্রী নরেশ স্বয়ং—চায় সবেজমিন তদন্ত। জমি কতটা জননীয চায তাব যাচাই। শঙ্কা কিছুটা আছেই, মুর্গি না বনে যাই। আবো একটা দিক আছে। দ্বিতীয় দিক। এ দিকটা ব্যক্তিগত, তাব যে সত্তা ছিল পার্টি শৃঙ্খলাব অবগুণ্ঠনে, আজ তা আত্মপ্রকাশেব তাড়নায ছটফট কবছে। প্রশ্নাতীত আনুগত্যেব খোলস ছাড়তে উদগ্রীব। তাব যে অনেক বলাব আছে, পার্টি মোতাবেক বেতনভুক কর্মী মানেই মজুব শ্রমিক এই আপ্ত ধারণা গ্রাহ্য নয। মাসকাবী কর্মীদেব বিপুল অংশ শেয়াবে ফাটকায় টাকা লগ্নি কবছে। সঞ্চয় ভেঙে। কর্জ কবে। এইভাবে সে যুক্ত হচ্ছে পুঁজিব সঙ্গে। মুনাফাব সঙ্গে, হযে পড়ছে মালিকানাব অংশ। পবিণত হচ্ছে মালিক-শ্রমিক মিশ্র সত্তায। পার্টি এই জটিল সত্তাব স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞ। বিজ্ঞ প্রচাব মিটিং মিছিল সম্মেলন ধর্মঘট সম্পর্কে। অর্থাৎ আদায। গ্রহণ। প্রাক ধনতান্ত্রিক কাঠামোয চলছিল বেশ, গোল বাধল পটভূমি সবে যেতে। পঞ্চাযেত গ্রামসভা জেলা পবিষদ পুবসভা এমনকি ২/৩টি রাজ্যে দল আজ শাসক দল, শুধু আদায়ে নয় নতুন বোল প্রদানেব। এই ভূমিকায় পার্টি ব্যর্থ, বিবর্ণ, দিশাহারা।

নব চালচিত্রে নরেশ নিজেকে বিভ্রান্ত বোধ করে। মনে হয় যেন বিধ্বস্ত এক মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে, শ্মশানের ভস্মমাখা ধ্বংস স্তূপের পটভূমিতে না বলা যায় কথা, না লেখা যায় লেখা।

বয়সের ছবি মনে রেখেও নরেশের রোক চাপে লেখার। সে লিখবে পার্টির মধ্যবিত্ত প্রবণতা—যার যতিপাত খুব জরুরী। সংখ্যায় এবং উদ্ভাবনী শক্তিতে প্রধান পিছড়ে বর্গকে যোগ্য গুরুত্ব দিতে হবে। অধস্তনদের দিক দিয়ে সে গোটা সমাজকে দেখতে চায়। এ বিষয়ে পড়াশোনা এবং অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার তার মাথায় ঠাসা। কিছু কিছু নোটস রেখেছে।

আয়ুর দিক দিয়ে নরেশ উপান্তে, আজ সে বড় দড়ের নেতা, ক্ষমতাবান, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হল তার ভাবমূর্তি থমকে আছে সংগঠক হিসেবে। দলীয় পরিবেশে চোরা গুঞ্জন আছে বিদ্যাচর্চার সঙ্গে তার নাকি আড়ি। সে নামী কিন্তু মানী নয়, কেচ্ছা এই। রাজনৈতিক জগতের নাগরিক হিসেবে এই ইমেজ বিরলে তাকে বিষণ্ণ করে, মনে হয় খাটো। রটনা ঝাড়ে বংশে উৎখাত না করে তার শান্তি নেই। সাথে সাথে তার উপলব্ধিতে এও আসে যে মানী হতে গেলে বিদগ্ধ সমাজে পাত্তা চাইলে তাত্ত্বিক বনতে হবে। মুদ্রিত অক্ষরে রেখে যেতে হবে স্থায়ী স্বাক্ষর। এখানেই সমস্যার বীজ। তার দেখাশোনা পড়ার মূলধন ৮০%। বাকি ২০% কিন্তু ফিল্ড ওয়ার্ক দিয়ে ভর্তি করতে হবে। রসদ সংগ্রহ করতে হবে মাটি থেকে। রচনায় মৃত্তিকা সংযোগের সোঁদা গন্ধ চাই। তবেই ধারণা সম্যক আদল পাবে। পাঠক খাবে। পাঠক দাবীকে মাথায় রেখে নরেশ প্রস্তুতি নিয়েছে, পেশাদারী সংস্থাকে দিয়ে তৈরী করেছে প্রশ্নমালা। প্রশ্নের ভিত্তিতে বিভিন্ন স্তরের মানুষদের কাছ থেকে সাক্ষাতকার নেবে। প্রাপ্ত উত্তরমালা ডাটা কমপিউটারে ঢুকিয়ে দেবে। কমপিউটার সব ঘেঁটে গিলে নেবে, ফের উগরে দেবে। বেরিয়ে আসবে শতাংশ, মূল রচনার সঙ্গে সার্ভে রিপোর্ট, সারণি জুড়ে দিতে হবে। তবেই প্রবন্ধের ওজন, জাত, খেলা হচ্ছে এই। নরেশ মনস্থ করেছিল প্রচুর অবকাশ মিললে ধীরেসুস্থে কাজটায় হাত দেবে। অবকাশ জোটেনি। বয়সের কথা ভাবলে এই অবকাশ মিলবে কিনা সংশয় জাগে, অপেক্ষা আর না করে কাজটায় হাত দিতে চায়। পাড়ে দাঁড়িয়ে নয় প্রপারে যেতে হবে। মানে আটপৌরে সমাজে ঢুকতে হবে। এটাই ফিল্ড ওয়ার্ক। এখানেই তার দুর্বলতা। প্রস্তুতির এই অনটন ভরাট করতে নরেশ

গ্রহণ কবল কর্মসূচী। অঞ্চলটা বাছার ক্ষেত্রে হিসেব আছে। হিন্দু অঞ্চলে কিলবিল করছে পিছড়ে বর্গ। লাগোয়া গ্রামে আছে সংখ্যালঘু সমাজ, মুসলিম। মাটি পরীক্ষার উর্বর ভূমি বৈকি।

॥ ২ ॥

শিবতলাকে শিবমন্দিরে পরিণত করা গ্রামবাসীর প্রাচীন অভিলাষ। প্রতিবন্ধী ছিল অর্থ, সম্প্রতি বিভিন্ন বাণিজ্য সংস্থা, সেবামূলক সংগঠন, আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার, কেন্দ্রবাজ্য সরকারী দপ্তর স্পনসর করছে এই ধরণের উদ্যোগ। অবশ্যই ধরা করা থাকলে অনুদান সংগ্রহ করা সম্ভব, কল্যাণ সমিতি চায় অর্থ। পার্টি চায় গ্রাম সংগঠনে কর্তৃত্ব। অতএব জোট বন্ধন।

এটা ঠিক—ধর্মের সঙ্গে দলের সংঘাত এককালে ছিল বাস্তব। আজ কিংবদন্তি, হলাহল নেই আছে আবেশ, অন্তত বয়সী কমবেডদের। নরেশ যে বিশুদ্ধ চিন্তা আঁকড়ে নেই দৃষ্টান্ত রাখল সভায়। স্বর কম্পন, মড়ুলেশনের ওঠানামা, আবেগ মাখামাখি করে যুক্তিজাল ছড়িয়ে দিল বাতাসে। ছাঁকলে নির্যাস হচ্ছে ঃ হিন্দুদের আরাধ্য দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটি, এর মধ্য থেকে শিবকে নির্বাচন তারিফ যোগ্য। শিব হচ্ছে জ্ঞান এবং মঙ্গলের প্রতীক। যুক্তি ও মঙ্গলের সাধনা মানেই মানবিক বন্ধন। মানুষের প্রতি ভালবাসার ইন্ধন। চাট্টিখানি কথা নয়, বৌদ্ধিক শক্তির জোরেই চীন জাপান মালসিয়াতেও শিব উপাস্য, যুগ যুগ ধরে। এরপর নরেশ নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা জোড় দেয়, ব্যাখ্যা করে ; সুপ্রাচীন কাল থেকে উত্তর ভারতের আর্যাবর্ত সভ্যতা ব্রাহ্মণ্যবাদী, যার মৌলিক চরিত্র রক্ষণশীলতা। শঠতা অসহিষ্ণুতা এবং ক্রুরতায় আস্থাশীল, তাই দেখা যায় উত্তর ভারতের আদিবাসীরা সামাজিকভাবে সবচেয়ে অবহেলা এবং নিগ্রহের শিকার। আজ অর্থনীতির আঙিনা পেরিয়ে আগ্রাসী থাবা সংস্কৃতি ও ভাষার ক্ষেত্রেও প্রসারিত, অথচ পূর্ব ভারতের মানচিত্রে আলাদা। শৈব ধর্ম এই ভূখণ্ডে প্রধান, শৈব ধর্মের কাঠামো গণতান্ত্রিক, জাতপাতের উর্দ্ধে, এখানকার রাজন্যবর্গও অধিকাংশ শিবভক্ত ছিলেন, তাঁর যজ্ঞ বিদ্বেষী কারাত, মেচ, কাফিং, চাকমা, হাজাং, খস প্রভৃতি জাতির সঙ্গে সখ্যতা—সহযোগিতার সম্পর্ক গড়েছিলেন, কাল প্রবাহে এই ধারা ক্ষয়িষ্ণু হলেও পূর্ব ভারতীয় সমাজের গাঁটে গাঁটে মানবিক ধারা গেঁথে আছে।

চালটা নরেশের কূট চিন্তা প্রসূত, এক, উত্তব ভাবতের পদ্মফুল শাসনকে তুলোধোনা করে হেয় কবল। দুই। ব্যাখ্যাব মোড়কে কৌশলে প্রচার কবল পঃবঙ্গেব শাসন ব্যবস্থা ব্যাপক অর্থে মানবিক ঐতিহ্যের রক্ষা কবচ।

সব ভাল যাব শেষ ভাল। নরেশের বিশ্বাসে, পাবলিক মানেই ধোয়া তুলসী নয। ববং হাবামিব জাত। গালভরা প্রতিশ্রুতিতে আস্থা বাখে না। ক্ষেপায়। বলে, ডাকাতিযা বাঁশি শুনে আর কাজ নাই। এসবে নরেশ অবহিত। হাতখালি অবস্থায না এসে বযে এনেছে নগদ। (চেকেব নামান্তবে)। চামড়ার ফোলিও থেকে নরেশ বাব কবে ৩০ হাজায টাকার ব্যাংক ড্রাপ্ট। অর্পণ করে সমিতিব সভাপতি স্থানীয প্রধান শিক্ষকের হাতে। সঙ্গে সঙ্গে জেগে ওঠে ফটোশিল্পীব ঘন ঘন সাটার টেপার টিক টিক শব্দ। প্রবল করতালি। উল্লাসের লহব।

দ্বিতীয দিন। দ্বিতীয় সভা। এই সভার পটভূমি ভিন্ন, মুসলিম প্রধান গ্রাম। একটা কথা স্বীকার্য, এই সমাজের রীতিনীতি প্রথা সম্পর্কে গড় পড়তা হিন্দু নেতাদেব মত নরেশের ধারণাও ভাসা ভাসা, জ্ঞানের দৈন্য আড়াল কবে স্মার্টনেসের ভরতুকি দিয়ে। এই দক্ষতার নেপথ্যে আছে প্রাথমিক যৌবনেব সাহিত্য প্রীতি। জীবনেব অঙ্গন থেকে সাহিত্য চর্চা প্রবাসে। টিকে আছে আচ্ছন্নতা, প্রাসঙ্গিকতা আছে কি নেই উহ্য বিষয়। প্রাসঙ্গিকতার বাতাববণ তৈরী করে যে কোন ইসুকে ছকে বন্দি করা নরেশেব বাতিক। পটুও বটে। বিষয় এখানেও ধর্ম, মসজিদ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান। নরেশ শুরু করল গম্ভীরভাবে, ধর্মের ওপব আন্তর্জাতিক চাদর জড়িয়ে দিল এইভাবে ঃ আল্লাব কাছে শান্তি এবং আত্মসমর্পণের প্রার্থনাই হচ্ছে মুসলিম শব্দের অন্তর্গত অর্থ। বিসর্জন দিতে হবে। কি জলাঞ্জলি দেব? নিজের সমগ্র সত্তা, কামনা-বাসনা-অহং,—অর্থাৎ ক্ষুদ্র আমিত্বকে বিপুলের পায়ে লীন কবে দিতে হবে, দিতে হবে, কবিব ভাষায আমাব যে সব দিতে হবে। ব্যাপক অর্থে যিনিই আল্লাব কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন তিনিই মুসলিম। যে ধর্মের এমন মানবিক আবেদন তার টান অনুভব করেছিলেন স্বযং গ্যেটে। ইসলাম অর্থই যদি আত্মসমর্পণ হয় তাহলে আমি ইসলামে বাঁচি ইসলামে মরি। গ্যেটের সাফ স্বীকারক্তি।

ধর্ম এবং সাহিত্যের মাযাময় ককটেল ঢেলে নরেশ অপসৃত যৌবনেব জাবর

কাটল। একটু থেমে আড়ে আড়ে এফেক্ট লক্ষ কবল, ফল ফলেছে। মুগ্ধতা এবং গর্বে জনগোষ্ঠী টসটস করছে।

হাদিশেব মহিমাময তাৎপর্য ব্যাখ্যা সহকারে কথক ঠাকুরেব ভঙ্গিতে উদগার করে যাচ্ছে নরেশ। ফ্লো এসে গেছে। তেড়ে বলতে গিয়ে নিষেধ পায়। ভেসে আসা আজানেব সুরেলা শব্দ, নবেশ থামে। থেমেই ক্ষান্ত হয় না, গিমিকেব আশ্রয় নেয়। তডিঘড়ি, আচমকা মাইক ছেড়ে বসে পড়ে হাঁটু মুড়ে। জনতাকে পেছন দেখিযে জড়ো কবা দু'হাত তুলে ধরে আকাশ পানে।

ত্রস্তে চিমটি কাটে সভাপতি, হিসহিস কবে,—কবেন কি কমবেড। হেলান সূর্যেব দিকে মুখ কবেন। মক্কা পশ্চিমে।

চকিত নবেশ নিমেষে সামলায, উপুড় কবা ধামার মত পশ্চাৎদেশ পুনরায় গোছগাছ কবে, যথাযথ হয।

সব ভাল যাব শেষ ভাল। নরেশের বিশ্বাসে, সংখ্যালঘু মাত্রই সাত্ত্বিক নয, সবার উপবে কাটাবা হচ্ছে বামখচ্চব, বিশ্বাস ঘাতকতা বক্তে। আশ্বাসে মন গলে না, ভেঙায়, বলে কিনা সব দাদাই বেদের মেযে জ্যোৎনা, কথা দিয়ে ফাঁকি দেয।

জ্ঞানী নবেশ, আখের গোছাতে সতর্ক নবেশ সঙ্গে বেখেছে মোটা চেক, ৩০ হাজাব টাকাব ব্যাঙ্ক ড্রাফট, মন্দির-মসজিদ সমান ভাগ, হাবি জিতি নাহি লাজ, ড্রাফটা মৌলবীব হাতে অর্পণ মাত্র বিপুল কবতালি। ঝড়েব দাপটে বিপন্ন পাতার মত ঘনঘন মাথা নাড়া—তোবা! তোবা, ধ্বনিতে মুখবিত প্রাঙ্গণ।

গণ কর্মসূচী দুই দিনেব, চুকে গেছে, রাজনৈতিক দাযিত্ব থেকে এক মাসেব ছুটি। ব্যক্তিগত উপভোগেব অখণ্ড অবসব। অবকাশ যাপন, ছয বাই সাড়ে সাত বড আকারের তক্তোপোশ, তাব ওপব পুরু তোশক, তোশক ঢাকা আছে পাট ভাঙা সাদা শয্যা আবরণে। ঘবেব মাঝখানে সোফা সেট। তিনটি মোড়া আছে দেওয়াল ঘেঁসে, বসে আরাম করবার সুব্যবস্থা বেকার, নবেশ কোলেব ওপব পাশবালিস নিয়ে বালিশেব ওপব কনুই রেখে আধশোওযা, প্রভঞ্জন পা ছডিযে মাথা বালিসে ঠেস দিযে এলিযে, যেমন দেখা যায় ছবিতে, কংগ্রেস অধিবেশন মঞ্চ, তাকিয়া কালচাব, সেই মত আদল, পূর্বাভাস স্পষ্ট—দুই বন্ধু আড্ডায তাতবে, এখন শুধু নিভৃতিব অপেক্ষা।

নবেশ নজব কবে আনত এক কাঠামো হাত দিয়ে তাব পা হাতড়াচ্ছে। প্রণাম সেরে মাথা জাগাতেই সালোযার কামিজে আবৃত যুবতী তাব মুখোমুখি।

—ভাইঝি, হোস্টেলে থেকে পড়ে।

নবেশ তালু এগিযে আনে। মাথাব ওপব আলতো ঠেকিযে শুধোয,—তোমার নাম কি মা!

—সুচবিতা।

—চমৎকার নাম। কবিগুরুব অত্যন্ত প্রিয নাম, তাই তিনি তাঁব শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের নায়িকাকে এই নাম দিযেছেন। তুমি কী পড় মা!

—এম. এ.

—সাবজেক্ট?

—পল সায়েন্স, বলে বাড়তি ফোগ কবে—সত্যি বলতে কি ওটা নিছক ডিগ্রি পাবপাসে, আসলে আমাব প্রিয বিষয সাহিত্য।

—প্রিয হবি কি মা, নবেশ জিজ্ঞাসাবাদে রত হয।

—পবচর্চা।

নবেশ চমকিত, বলে কী! এমন অভিনব হবি, বিস্মযেব ঘোর ছিন্ন হতে, বুদ্ধি তোলপাড় হতে মনে আসে বৈকী, হ্যাঁ মন্দ বলেনি কুড়ি-একুশ-এর আলে হাঁটা মেয়েটি। সাহিত্য ত এক প্রকাব পবচর্চাই। সাহিত্য-নিপুণভাবে সিঁধ কেটে ঢুকে যায় চবিত্রেব অন্দবে। ক্রিযা কবে অন্তস্থল ব্যেপে। যা কিছু গোপন গভীব নিভৃত হবণ কবে। হবণ কবে হাট কবে, হাটে হাঁড়ি ভাঙে। কেচ্ছাব সাহিত্য আর সাহিত্যেব ধর্ম জানতে কাবো বাকি নেই।

আত্মমগ্নতা ঝেড়ে নবেশ চোখ ফেলে সুচবিতার ওপব। সুধোয,—সাহিত্যে যদি ঝোঁক বাংলা বা ইংবেজি না নিযে পল সাযেন্স নিলে কেন।

—আমাদেব আবাব মতামত। গার্জেন যে স্ট্রীমে জুড়ে দিয়েছে সেই খাতে সেট হযে গেছি।

—অল্প বযস আবেগের বযস। এই বযসেই সব মানিয়ে নিচ্ছ। পদে পদে বফা কবছ। নিজেব বিকাশটাও তো দেখবে। আমবা কিন্তু বযসকালে যথেষ্ট প্রতিবাদী ছিলাম।

সুচরিতা মিটিমিটি হাসছে, ঘনঘন নাকের ডগা ভাঙছে, চোখেব তাবা অস্থিব। চাপা দেওয়া চাগাড় দেওয়ার দ্বন্দ্বমূলক অভিঘাতে ফিচেল বিভঙ্গ,

সমূহ মুদ্রা লক্ষ্য করে নবেশ। বলে,—তোমাব চোখ মুখ বলছে তুমি কিছু বলতে চাও, কিন্তু কিন্তু কোব না মা। প্রকাশ কবো।

আসকাবা পেযে সুচবিতা চপল হয।—গুরুজনদের এটা একটা বাতিক মেশোমশাই। বর্তমান মানেই সব ঝুটা। হা—হা—। অতীত মানেই উজ্জ্বল। কতো কি। প্রতিবাদী ছিলেন? আর ঘাঁটাবেন না—। বলে, ক্ষণিক চুপ থেকে দিল ঘেঁটে।—প্রতিবাদী থাকলে যখন হ্যারিসন বোড আর চিৎপুব রোড নাম লেপে দিযে বড় বাজাবেব ঝাঁকামুটে মহল্লায় গান্ধীজী আর চিৎপুবেব গণিকা পল্লীতে ববীন্দ্রনাথকে দিল সেঁটে, কী কেলো, অথচ যুবশক্তি হিসেবে আপনারা কি প্রতিবাদ করলেন? মোল্লা, তখন গুডবয, বাধ্য ছেলে, রুখে দাঁড়ালে প্রশাসন পারত অমন কুকর্ম সারতে। বুঝলেন মেসোমশাই আত্মসর্বস্বতার হাতে খড়ি আপনাদের কাছে। কী উদ্ধত ভঙ্গি, কী সাহস। তাব দিকে আঙুল উঁচিযে তর্ক করে। নবেশেব বাগ হয। কেন যে বটনা হয তবুণী সঙ্গতায় আমোদ আছে, নবেশ তিতবিরক্ত। ইচ্ছে হয় কড়া ধমক দিতে। দেয় না।

ভাতপিট একটু বিছানাগত হতে ইচ্ছে হয। কিন্তু জো নেই। নিযন্ত্রণ সত্ত্বেও পব পর প্রার্থী আছড়ে পড়ছে। যাবতীয় প্রার্থনা এককাট্টা কবলে ফুটে ওঠে এক দাবী। চাকবি চাই। কাজ চাই। নরেশ আশ্চর্য হয দেখে যে বেকাববা প্রসাধনে পোশাকে পবিপাটি। নবেশ বিষণ্ণ হয়। উন্মনা হয। কোথায় গেল সেই সব উস্কোখুস্কো চুল খোঁচা খোঁচা দাড়ি যুবক। ক’ বছরেই তাবা কি বিরল প্রজাতি।

ছোঁড়াগুলোর আর্জিব কী ভঙ্গি। ভাষাব কী ছিড়ি। তারও পব ভাষা দ্ব্যর্থবোধক। মুখের ভাষা আব মনের ভাষা আলাদা। ব্যাজস্তুতি শ্লেষ করুণায় পুষ্ট বাচালতা। এই ডাকছে কমবেড বলে, এই ডাকছে কমবেড কাকু। এই মেসোমশাই এই মামা। আব আবেদন বল মতামত বল সব বিদ্রূপে চোবান। উপহাস আব ঠাট্টাব পাত্র কবে তুলোধোনা করছে।

নরেশ রাগে গরগব করে। ঠেস স্নেহ—যোগেও হজম কবা শক্ত। প্রবল তাডনা আসে নাক টেপা দুধের বাচ্চাদের গালে ঠাস করে চড় কসায়। কিন্তু কিছুই করেনা নরেশ। সাংস্কৃতিক উপবীত তাকে সংযত রাখে। তাছাড়া উৎপাদন উৎপাদিত মাল কেনা বেচার প্রক্রিয়াই হচ্ছে গ্রাহক পরিষেবা। এই

নিয়েই তো জগৎসংসাব। আব রাজনীতিক হিসেবে আমজনতাকে তোয়াজ করা গ্রাহক পাবিষেবার অন্তর্ভুক্ত।

নাকানি চোবানিব এক একগুচ্ছ অভিজ্ঞতা গল গল কবে উগরে প্রার্থীবা বিগত।

নবেশ হাঁফ ছাড়ে। প্রভঞ্জন জুৎ কবে বসে। অবকাশ পায অন্তবঙ্গ হতে। এবাব অনর্গল হবে।

প্রভঞ্জনেব তব সয় না। ফাঁকা হতেই মুখ খোলে।—যুব সমাজটা কি আমাদেব হাতছাড়া হয়ে গেল।

—হবে না। চারিদিকে শুধু ভোগ ভোগ ইসাবা। অথচ পা-পোষেব মত বাইবে পড়ে থাকে। চাকবি নেই। চাকরি না থাকা মানে ভোগ নেই। ভোগ নেই ভোগেব হাতছানি আছে। কম কষ্ট। কদ্দিন আব প্রতীক্ষা কববে! প্রতীক্ষাব কাল যে নিববধি কাল হযে যাচ্ছে।

—কাব পাপে? প্রভঞ্জন প্রশ্ন ছোঁড়ে।

—কাব আর, ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাব। বৃটিশরা ভাবত ছাড়ল। ভারত সবকাব স্বদেশী ছাডল। গান্ধীজী টা-টা। কুটির শিল্প বাই-বাই। ১৫ আগস্ট '৪৭ এক অর্থে স্বাধীনতাব বার্থ আব এক অর্থে স্বাধীনতাব এববশন। শিরোমনি নেহেরু। হাইটেক দার্শনিক—তার পযদা: কলে কারখানায অফিসে বাণিজ্য জগতে ঘুঘু চড়ছে। ইতিহাসের মার। আরে বাবা কাছা খুলে দিলে সবাই পেছন মাববে এ আব আশ্চর্য কি। আই এম এফ-বিশ্বব্যাংক—গ্যাট পড়ে থাকে কেন।

প্রভঞ্জন আত্মসমালোচনা করে।—আমাদের পার্টিও বুদ্ধি দিযে গতি স্রোত বাঁধ দিতে চেযেছিল। ফেল মাবল। অথচ দেখ অনুভব দিযে আঁচ কবতে পেরেছিল বাজকাপুর। সেই লেট ফিফ্টিজে। মেবা জুতা হ্যায় জাপানি, ইযে পাৎলুন ইংলীসস্তানী। সব পে লাল টুপি রুশি। মনে পড়ে।

ক্ষমতার উৎস বন্দুকের নল মার্কস তত্ত্ব খাবিজ হয। ক্ষমতার উৎস হিসাবে গ্রাহ্য হয কথা। চলে কথা নিযে মাকু ঠেলাঠেলি।

নবেশ আপত্তি জানায।—সব দোষ নন্দ ঘোষে চাপালে চলবে না। ভোগ ভোগ—মানসিকতাব লাইনে নাটেব গুরু হচ্ছে বিদ্যাসাগব। লেখাপড়া করে যে / গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। মনে পড়ে হিতোপদেশ!

প্রভঞ্জন প্রশ্ন তোলে,—স্বদেশী আন্দোলন গণআন্দোলন মানুষের ত্যাগের

আন্দোলন—এত যে আন্দোলনের জোয়ার, তার কোন মূল্য নেই ফল নেই !

কেউ টের পায়নি নিঃশব্দ চরণে কখন রেবা ঘরে এসেছে। চোখে পড়তে দেখল তার হাতের বেড়ে ট্রে। সন্তর্পনে ট্রে নামায়। পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে বিরক্তি ঝরায়,—ঢেঁকির স্বভাব গেল না। দু মাথা এক হলেই তক্ক। পরক্ষণে হয়ে পড়ে তত্ত্ব আলোচনার অংশ।—আন্দোলনের মানুষের ইতিহাস চিরকাল বলির পাঁঠার ইতিহাস। বেলপাতা চিবোয়। তাছাড়া ক্যাডারদের ত্যাগের আঠাই বা কই। প্রত্যেকে নিজের কোলে ঝোল টানতে ব্যাস্ত। পার্টি আজ ছিন্নমূল।

কথাটা নরেশের মনে ধরে। সে সমর্থন করে।—ঠিক বলছ বৌঠান। মানুষের সঙ্গে দলীয় কর্মীদের যোগাযোগ ছিন্ন। মানুষ ছাড়া হয়ে পার্টি খাবি খাচ্ছে।

চশমার আড়ালে চোখদুটো ঝকঝক করে প্রভঞ্জনের। প্রতিবাদ জানায়।

—আমার কি মনে হয় জানো, বিচ্ছিন্নতা নয় অতিরিক্ত লগ্নতাই দলের বিপন্নতার কারণ।

ব্যাখ্যার অভিনবত্বে নরেশ থ। প্রভঞ্জন তখনো বলে যাচ্ছে,—কর্মীরা মানুষের কাছে যায় চাঁদা তুলতে। মিছিলে জড়ো করতে, কিছু গৎ ওগরাতে। টোটাল সিসটাই গ্যাঁড়াকল। মাড়াইকল। কে আর পেষাই হতে চায়। নীতিফিতি গোল্লায় গেছে। ফ্রম টপ টু বটম কামানই কাজ।

প্রভঞ্জন ইঙ্গিত দিচ্ছে দলের খোল নলচের দিকে। নরেশ ইঙ্গিত ধরে। অসহিষ্ণু হয়। চাপা স্বরে গরগর করে।—দলের ওপর তোমার কি আস্থা নেই কমরেড। এতদিনের বিশ্বাস থেকে কি সরে আসছ।

—আমি মতাদর্শের বাঁড় নই।

কটু মন্তব্য। নরেশ ঘা খেয়ে চুপ করে যায়। প্রভঞ্জনও বাকরহিত। অগত্যা বাঁজা তর্কে যবনিকাপাত। এদিকে বেলা গড়িয়ে গড়িয়ে কখন পড়ে এসেছে। হেমন্তর বেলা। হেমন্ত যেতে যেতেও যেতে দ্বিধাগ্রস্ত। রিলিজ অর্ডার পাচ্ছে না। জড়তার অকূল পাথারে পথ আগলায় শীতকে। এক প্রকার আলস্য আছে। মন উদাস হয়। হু হু করে বুক। কিঞ্চিত পীড়নমূলক আবহাওয়া। বড় সংক্রামক। নরেশকে, প্রভঞ্জনকে অন্যমনা করে তোলে। প্রভঞ্জন ভাবে নরেশ এসেছে কিছুদিন থাকবে বলে। কাজেই মত চালাচালিতে ব্যগ্রতার

কিছু নেই। তবু একটা তাড়া যেন প্রভঞ্জনকে ধাওয়া করছে। প্রভঞ্জন নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। ফেটে পড়ল।—সত্যি করে বলতো কেন তুমি এদ্দিন পর এখানে এলে।—পার্টি কেরিয়ার তৈরী করতে। দাঁড়াচ্ছি। এম. এল. এ হব। দলিলটাও লিখে ফেলতে চাই। প্রভঞ্জন ওকালতি জেরা শুরু করে।—রাজা উজির বানাবার লাটাই তোমার হাতে। অমন আসন ছেড়ে জনতার আদালতে নেমে এলে কেন। এ লাইন বড় পিছল। এই কোল দেবে এই পেড়ে ফেলবে।

পরীক্ষা কেন্দ্রে আনকমন প্রশ্নপত্র হাতে পেলে ছাত্রর যে অবস্থা হয় নবেশের মুখ তেমনি। অপ্রতিভ। বিহ্বল।

ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলান প্রভঞ্জনের স্বভাব বিরুদ্ধ। এটা কোন পর্যায়ে পড়ে তা নিয়ে দোটানায়। সবশেষে দ্বিধা ঝাড়ে। মন খোলা হয়।—ভাবের ঘরে কেন সিঁদ কাটছ। দলিল লিখতে নয়, বিধায়ক হতে নয় তুমি এই শহর গাঁ-শহর নির্বাচন করেছ যেহেতু এই শহর সুধার শহর।

নবেশ ধাক্কা খায়। ছলাৎ করে রক্ত। এই কী স্মৃতির বিড়ম্বনা। গভীর অন্ধকারে ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিতঃ / আমাকে কেন জাগাতে চাও? / হে সময় গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি হে হিম হাওয়া / আমাকে জাগাতে চাও কেন।

আরো অপেক্ষায় ছিল। প্রভঞ্জন তাকে পেড়ে ফালা ফালা করে।—তুমি এসেছ নেতা হতে নয়। নায়ক হতে।

॥ ৩ ॥

সকল কামনা হাতের মুঠিতে অন্তর্বাস, কেমন কালো। চেয়ারের পিঠে পিঠ হেলান দিয়ে মাথা নিচু করে আছে মহিলা কাঠামো। ক্রুশকাঠি আর পশমের বুননে চোখ নিবদ্ধ। কাঁটা—আঙুল সঞ্চরণে ফুটে উঠছে জোড় সাপ প্যাটার্ন। শীত বরণের আয়োজন। বুননে মনযোগী হলেও উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠাময় প্রতীক্ষা যে তার আছে—তা তার থেকে থেকে কেঁপে ওঠা, চকিত চাউনি ইত্যাদি মুদ্রায় প্রতিফলিত।

এদিকে নবেশের উত্তেজনাও তীব্র। যথা সময়ে পৌঁছতে হাতে সময় নিয়ে সে পথে নামল। বছরের পর বছর কাবার। তাতে কি। পথঘাট অলিগলি নখদর্পণে। তাছাড়া পথ চলার আনন্দ উপভোগ—এটাও বিরাট প্রাপ্তি। তাই সে কাউকে সঙ্গী করেনি। নবেশ রিক্সার দিকে পা বাড়ায়। আবার সরিয়ে আনে। পথটুকু হেঁটে মেরে দিতে আগ্রহী।

কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ বা দ্বিতীয়া—চাঁদ উঠেছে পর্দায় আঁকা গোলকের মত আকাশজুড়ে। অতীতে শহর এবং গ্রামের অনেক রাত্রিকে যেমন করেছে মোহময়। আজো সেই স্বভাবে স্থির। জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে নরেশ হাঁটতে শুরু করে। ওর পায়ের পাতার গড়ন ধ্যাবড়া গোড়ালি ফেলে তেরছা ভাবে। থেৎলে টেনে টেনে চলে।

সরু সরু আঙুলের সঞ্চরণ স্তব্ধ হয়। ঘাড় বাঁকে। গড়ান উলবল গুটোয়। ঝরা চুল আঙুল চালিয়ে ঠিকঠাক করে। খসা আঁচল কাঁধে জড়ায়। সময়ের কিছুটা ত্রস্ত অবক্ষয়। ইতিমধ্যে পুরুষটি ভেতরে এসেছে। সুধা তাকাতেই চোখাচোখি।—কী কান্ত। আঠারো বছর পর। ভাবা যায়! সর্বাঙ্গে চোখ বুলিয়ে,—ইস কী দশা হয়েছে তোমার। ছিপছিপে গঠন বাবরি চুল করে খোয়ালে। অপ্রতিভ নরেশ মাথায় থাবা বসায়। আদর করে। বলে,— সময়ের দাম সময়কে মিটিয়ে দিচ্ছি। তারপর সুধার আগাপাসতালা লক্ষ করে, হাসে, হেসে হেসে বলে,—এখন গোবর হাসি হাসছ—কিন্তু তুমিও লাইনে আছ ম্যাডাম। যে রেটে ফুলছ গ্লাকসো বেবীর বিজ্ঞাপন হবে শিগ্রি।

নরেশ বসে আছে সোফায়। সুধা খাটের কিনার ঘেঁসে খাঁড়া। দরজার দিকে মুখ করে হাঁকল।

—পুস্প কফির দুধটা বসা।

সঙ্গে সঙ্গে নরেশের মুখ মেঘলা। চোখ ম্লান। দুঃখিত স্বরে আপত্তি জানায়।—কফি থাক।—সে কী কফিতে তোমার অরুচি। অবাক চোখে তাকায় সুধা। পরক্ষণে গূহ্য কারণ মনে পড়তে হাসিতে লাস্য হয়।—আরে বাবা পুষ্পকে শুধু দুধটা জ্বাল দিতে বলেছি। কফি আমি নিজের হাতে বানাব। যন্ত্রবৎ পরেশের মুখ প্রসন্নতায় ছেয়ে যায়। পরিবেশ শান্ত। কি নরেশ কি সুধা উভয়ের মুখে কুলুপ।- প্রচুর কথা ভেতরটায় জড়াজড়ি হলে এমন হয়। কে আগে কোনটা পরে তা নিয়ে চলে রৈ রৈ কান্ড। স্তব্ধতা প্রথম ছিন্ন করে নরেশ।—রাজনৈতিক জীবন এখন আমার কাছে বিষ। অতি ক্লান্ত আমি—তুমি বরাবর ক্লান্তিপ্রিয়। এ তোমার সখের ক্লান্তি। প্রকৃতই যদি ক্লান্ত হতে—বিশ্রামের সন্ধান করতে। আমার কথা মনে আসত। আমি প্রস্তুত ছিলাম। হত্যে দিয়ে পড়ে ছিলাম। তুমি সাড়া দাওনি।

—নির্মলকে তুমি স্বেচ্ছায় বাছলে।

—বাধ্য হয়ে। তুমি খ্যাতির খোয়াবে ভাসছ। এদিকে আমি চল্লিশের

কোঠায পা বেখেছি। তোমাব নজব পাচ্ছি না। সব সময় শূন্য শূন্য লাগে। এই বযসটা মেযেদের বেলায বড করুণ। বড কষ্টেব। একদিকে পাওনা জুটছে না। ভেতবটায খবা। আব একদিকে নিবাপত্তাব অভাব। এমন অবস্থায পডলে তব সয না। ধৈর্য থাকে না। আস্থা নষ্ট হয। বাম শ্যাম যদু মধু সবাই সমান। মুড়ি মুড়কিব এক দব। নির্মলকে পেলুম। ঝুললুম।

—এমন অবস্থায আমায জানান উচিত ছিল। সোজা আমাব কাছে চলে আসোনি কেন।

—যে আমাকে পাত্তা দেয না তাকে ভুলতে চাইলুম। গোঁ ধবলুম আর যেন নাহি লাগে তোমাব বাতাস / ফেলেছি ঘাডেব বোঝা / হয়েছি খালাস। / চাইলুম আব যেন দেখা না হয।

—অথচ প্রাণ চাইত। প্রাণ চায, চক্ষু না চায। কেমন তাই না।

সুধা পীডাবদ্ধ। স্বীকৃতিব দ্যোতক। ঘোব সামলে আস্তে আস্তে মাথা জাগায। বলে,—আমাব জীবনে সুখেব চাবা লাগিয়ে বেচাবা নির্মলটাও মাবা গেল।

—নির্মলেব মৃত্যু ভেবি স্যাড।—তুমি কেমন সখা হে দুঃসমযে আমায ডাকো না। চোখ ডাগব কবে সুধা।—উবি শ্বাবা। তোমায ডাকব। তুমি এখন মগডালেব কেষ্টবিষ্টু।

আবাব চুপচাপ। সুধা ঢোকে ঢোকে কফিটা শেষ করল। তাবপর বলল,—দ্যাখ মানুষে মানুষে সম্পর্ক অনেকটা টিভিব কাণ্ডকাবখানা। যাব এক পাবে বিসিভিং সেট আব এক পাবে ট্রানসমিটিং স্টেশন। যে আসবে তার ব্যাকুলতা চাই যে আনবে তাব চাই সুববাধা দেহ। উভযেব যোগাযোগে শুভযোগ।

—কাসুন্দি ঘেঁটে লাভ নেই। এই দুর্লভ জীবন স্বেচ্ছাচাবিত দুর্ভিক্ষে ক্ষয কববার কোন মানে হয না সুধা। যা ঘটাব তা ত ঘটেই থাকে। ব্যক্তি যা ঘটায তাই তো ইতিহাস। এসো আমবা জোট বাঁধি। ক্ষয-ক্ষতিব দাযিত্ব দুজনে ভাগ কবেনি। আমাদেব মতন কবে আমাদেব জীবন তৈবী কবি।

আকুলতা তীব্র। হাহাকাব মর্মস্পর্শী। তবু সুধাব মন গলে না। বলে,—আমি কি এমন ন্যাড়া যে বাববাব বেলতলায় যাব।

নরেশ ইঙ্গিত ধবতে পাবে। আত্মপক্ষ সমর্থনে কাতব অনুনয ফোটায।

—অতীত খননে কী লাভ। নির্মলেব মৃত্যু স্যাড। তারপর তুমি

দেবদত্তকে পাঠিয়েছ অনেকবাব। প্রতিবাব তাকে সাহায্য কবেছি। করিনি? ওকে বিসিভ করাব মধ্য দিয়েই কি তোমাব কাছে আমার আসা নয়।

—সেখানেই আফসোস। তোমাব সুধাকে নিবাপত্তাব বিনিময়ে খাজনা দিতে হচ্ছে। তোমাব অনবদ্য সুধা লাট খাচ্ছে। অথচ তুমি নির্বিকাব। বন্ধুত্বের প্রতাবণা তোমায় ক্রুদ্ধ কবে না—তুমি কেমন সখা হে। আসলে আমায় গন্য কবেছ বাখনি। ভাগাভাগিব ভোগ চাও? না বাবা গঙ্গা পাব না। কী যেন সহসা মনে পডল। ঠোঁট কামড়ে বলে,—ইস, সাঁজ বাতি দেওয়া হল না। তোমাব জন্য পথ চেয়ে চেয়ে হুঁশ নেই। একটু বোস লক্ষ্মীটি। যাব আব আসব।

শবীব আলগা কবে হাত পা ছডিয়ে বসে নবেশ। বুদ্ধিব গোডায দম দিতে ক্লান্তি ঝাডতে সিগাবেট ধবায। ফুক ফুক টান দেয। দৃষ্টি ছডিযে দেয। দৃষ্টিব আওতায আসে গোটা ছবি। বাবান্দা, বারান্দা থেকে দুধাপ সিঁডি বেযে ছোট ছোট পাযে এগিযে যাচ্ছে সান বাঁধান একচিলতে উঠোনেব কোণে, তুলসী মঞ্চেব সামনে স্থিব হল কাঠামো। কাঁধে আঁচল জডিয়ে বাতি হাতে গড হচ্ছে। ক্ষণকালেব আচাব। সুধা দ্রুত ফিবে আসছে। এদিক ওদিক ঈষৎ কাত হযে। সন্ধ্যা নামলে জলে যাওযাব তাডা নাবীব স্বভাবধর্ম। আব সন্ধ্যা অস্ত হলে নাবীব দাবী সজ্জা। সুধা জলেব দাবী সজ্জাব দাবী পূবণ কবেছে। সুধাকে নবম এবং শুদ্ধ লাগছে। নবেশেব চোখে।

নবেশ উপলব্ধি কবে উপভোগ বযস নিবপেক্ষ। বযস বাডে। অস্থি মজ্জায ঘুণ ধবে। সামর্থ ঝবে যায। অথচ কামনা ঝবে না। নাবীকে নানান ভাবে দেখে : ভালবাসা ঘৃণা আক্রোশেব অনুভব দিযে ভুলতে চেযেছিল নাবীব টান। হাডে হাডে টেব পাচ্ছে সকল উদ্যম বৃথা।

সুধা আন্দাজ পায় নবেশ এখন ঘোব সুধাপ্রবণ। সুধা ধীবে ধীবে নবেশেব কাছে আসে। ঘনিষ্ঠ হয। কাঁধে হাত বাখে। আঁচড কাটে।—কী গো কথাব মিস্ত্রিব অমন থম মেবে গেলে কেন। এ্যাই এই সমযটা আমাব না কেমন বিবহ বিবহ লাগে।

নবেশ শবীব ঝাপটায। সুধা পাযে পাযে ঘাটেব কাছে যায। পা ঝুলিযে বসে। মুখ চলছে। সাথে সাথে পাও দোলাচল। সোফা ছেড়ে নবেশ এগিযে আসে। নতজানু হয়। ইতস্তত কবে। দ্বিধা ঝাডে। নেতাসুলভ গবিমাব অন্তর্জলী। দুহাতেব কবপুটে টেনে নেয সুধার জোডা পা। সুধার কাতুকুতু লাগে। পা ঝাপটায়।—আঃ ছাড়। কী করছ কি।

পা আঁকড়ে আব্দাব জানায় নবেশ।—আমি ফিরে যাওয়াব জন্য আসিনি। অতীত খুঁড়ে কি লাভ। কথা দাও—। আকুতিপূর্ণ আবেদন ছড়িয়ে নবেশ স্থিব। স্থিব বিগ্রহেব সামনে বিহ্বল সেবক। প্রতীক্ষা·· জবাবের প্রতীক্ষা । জবাব দেবে দেবে এমন সন্ধিক্ষণে শব্দেব ছাঁট ঘর ভাসায়। শব্দ আগে পিছে পিছে পুষ্প। হাতে এক দলা ধনে বাটা নিযে, দেখায, শুধোয়, —বৌদি আব লাগিবে ? প্রশ্নেব টানে সুধা সাবেকী খাট থেকে ডোঙা মেবে নামে। কলসিপাছা বুকভাবি হ্রস্ব দেহ মন্থব পাযে টেনে নিযে যায়। চৌকাঠেব এপাবে দাঁড়িযে পবখ কবে। বায দেয।—ওতেই হবে।

পুষ্প নড়ে না। আবো জিজ্ঞাসা আছে।—মাছেব ডালনা কি মাখো-মাখো না ঝোলঝোল।

—মাখোমাখো। অল্প কাই থাকবে।

পুষ্প অদৃশ্য হতেই সুধা ফস করে বলল,—তুমি কেন এলে। আমার তো ছুটিব ঘণ্টা বাজল বলে, বলে আব মিটিমিটি হাসে। চোখ নাচায়। চপলমতী হয়।

—আমি যন্ত্রণা পাচ্ছি। তুমি বগড় কবছ।

—রগড নয গো। সত্যি আমি চলে যাচ্ছি। সামান্য নীরব থেকে যেন নিজেকে নিজে শোনাচ্ছেঃ আমাব সেই ভয়ংকব দিন সমাগত—যে দিন অন্য লোকে বাক্য কবে আমি রব নিরুত্তর। বগড় করে বললেও হালকা বেশ নেই। সব ছাপিয়ে কেমন ভাব ভার। নরেশ ধাক্কা খায়। নজর পড়তেই লক্ষ্য করল কন্ঠেব অভিব্যক্তিতে সুধাব মুখ ভাঙচুর হচ্ছে। ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে আভাসিত দাঁতে জিইযে বেখেছে হাসি। হাসি হাহাকাব হয়ে ঝবছে। নরেশ বিহ্বল। যেন সুদূব থেকে ভেসে আসছে সুধাব গলা,—বুগীকে এড়িযে আত্মীযদের সঙ্গে ডাক্তাব যখন ফিসফিস কবে তখনই সন্দেহ জাগে। মনে হয ষড়যন্ত্র চলছে। খাবাপ কিছু। তাই চাপাচুপির চেষ্টা। চিকিৎসার ধরনধাবণ পবিজনদেব সঙ্গে ব্যবহাব বুঝিযে দেয বুগী গাড্ডায পড়েছে। আমি তো তেমন বোদা নই কিছুই বুঝব না। বুঝে গেছি শরীবে কর্কট বোগ থাবা বসিযেছে। ক্যান্সাব যে হযেছে তা না বোঝাব মত বোকা আমি নই।

নবেশ মুহ্যমান। এ এমন সংবাদ যাব কোন জবাব নেই। যাবতীয় তর্ক প্রবণতা টুঁপি খুলতে বাধ্য। নবেশ স্তম্ভিত। অপলক। আতুব প্রার্থনাব ওপব স্তব্ধতাব যবনিকাপাত। না নিরঙ্কুশ নয, দেওযালে টাঙান সেকেলে টুং টাং শব্দটা সোচ্চাব হচ্ছে। বাড়ছে ক্রমশ, দুঃসহ ধ্বনিতে প্রতি-ধ্বনিতে চেতনাব গভীব তোলপাড় কবে অবশেষে মিলিযে যাচ্ছে গাঢ় অবসাদ রেখে। অবসাদ। যে অবসাদের অন্ত নেই। অবধি নেই।

শতবর্ষের আলোকে
বের্টোল্ট ব্রেশট ও তাঁর থিয়েটার

হিতেন ঘোষ

I, Bertolt Brecht, come from the black forests.
My mother took me into the towns while I was in her womb.
And the chill of the forests will be in me until I die.
I am at home in the asphalt city
... equipped...with newspapers and tobacco and liquor.
Suspicious and idle and in the end contented.

॥ এক ॥

নাটকের কোন চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতার একাত্মতা বের্টোল্ট ব্রেশটের নাট্যরীতির পরিপন্থী। শুধু চরিত্রই নয়, মঞ্চে উপস্থাপিত ঘটনার প্রতিও অভিনেতা-অভিনেত্রীর মনোভাব হবে বিচারকের, সমালোচকের। নাট্যঘটনার কুশীলব একই সঙ্গে ঘটনার কথক—তারা চরিত্রের রূপদান করে, আবার ঘটনা-ধারা ও চরিত্রের আচরণের বিচার-বিশ্লেষণও করে। অনেকটা কথকঠাকুরের রামায়ণ গান করার মতন। তিনি কখনও বিভিন্ন চরিত্রের কথাবার্তা, আচার-আচরণের অনুকরণ (mimesis) করছেন, আবার কখনও বা বাইরে থেকে তার বর্ণনাও দিচ্ছেন। বর্ণনা দেবার সময় প্রচলিত ধর্মবিশ্বাস, নীতি ও আদর্শ অনুসারে ঘটনা ও বিভিন্ন চরিত্রের আচরণ সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মন্তব্যও জুড়ে দিচ্ছেন।

পৃথিবীর সব দেশে মহাকাব্য বা এপিক, সাগা বা বীরত্বগাথার এই একই উপস্থাপন রীতি। অনেক দিন আগে যেসব ঘটনা ঘটে গেছে, যেসব নরনারী তাতে অংশ নিয়েছিল, তাদের কথা শ্রোতার সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য, এই উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের নীতিশিক্ষা দেওয়া, মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা, অতীতের ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া এবং সর্বোপরি মানুষের জীবন ও তার পরিস্থিতি সম্পর্কে তার যুক্তিবুদ্ধিকে

সজাগ কবে তোলা। শুধু কথকতা নয, আমাদেব যাত্রাগান এবং পৃথিবীব সবদেশেব লোকনাট্যেব এই একই ধাবা। অতীত ঘটনাব বর্ণনায কিংবা চবিত্রদেব আচবণেব অনুকৃতিতে আবেগ ও বিচাব-বিশ্লেষণেব আনুপাতিক হাব কী হবে সে সম্পর্কে বিভিন্ন দেশেব ঐতিহ্যগত পার্থক্য আছে। কিন্তু কোথাও, সে যাত্রাই হোক আব কথকঠাকুবেব বামাযণ গানই হোক, নিছক আবেগ তাব উপাদান বা উপজীব্য কখনও ছিল না। মানুষেব যুক্তিবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন কবে তাকে শিক্ষা দেওযা যায না, একথা প্রাচীনেবা ভালোই বুঝতেন। আবেগও নীতিশিক্ষাব বাহন হতে পাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মানুষেব নীতি বা আদর্শচেতনা সচেতন বুদ্ধিকে আশ্রয কবেই গডে ওঠে।

এই হোল ব্রেশটেব এপিক থিযেটাব ও এলিযেনেশন তত্ত্বেব মূল কথা। এপিকের ভঙ্গি অ্যাবিস্টটেলীয় নাট্যবীতিব সম্পূর্ণ বিপবীত। ব্রেশটেব মতে, পাশ্চাত্যদেশে ইসকাইলাস থেকে ইবসেন পর্যন্ত এই শেষোক্ত নাট্যবীতিবই অনুবর্তন। এবং সেই কারণেই আধুনিক থিযেটাবে সম্পূর্ণ বর্জনীয। কথাটায অতিশযোক্তি আছে, এবং কিছুটা ঐতিহাসিক অসত্যও। পুবনো বীতি বা প্রথাকে ভাঙাব তাগিদে এ ধবণেব অতিশয়োক্তি নব্যবীতিব প্রবর্তকদেব স্বভাবসিদ্ধ। গ্রীক নাটকেব একাধিক উপকবণ এসেছে দিওনিসাসের উপাসনা ও তাব আনুষঙ্গিক নৃত্য ও সঙ্গীত অনুষ্ঠান থেকে। এই উৎসব ছিল পুবোপুবি লোকাযতিক, সামাজিক মানুষেব জীবন ও জীবিকা ছিল এব উৎস। ক্ল্যাসিকাল যুগে গ্রীকদেব প্রধান উপাস্য দেবতা অ্যাপোলো, যুক্তিবুদ্ধি ও প্রজ্ঞাব প্রতীক। গ্রীক ট্র্যাজেডিব জন্ম—অবচেতনেব আদিম অসংবৃত আবেগ, যাব প্রতীক দিওনিসাস, এবং সত্যেব আলোক ও জ্ঞানেব প্রতীক অ্যাপোলোব মিলনেব ফলে। অনেক ঐতিহাসিকেব মতে, গ্রীক সভ্যতাবও আবির্ভাব ও অভ্যুদয যুক্তি ও আবেগেব এই অভূতপূর্ব সমন্বযেব পবিণাম।

ইসকাইলাসের অবেস্টিযান ট্রিলোজিব শেষ সিকোযেন্স 'ইউমেনিদিসে'ব মূল বক্তব্য বা থীমই হল সচেতন বুদ্ধি ও আদিম অবচেতন আবেগেব সমন্বয়। মাতৃহত্যাব পাপে অভিশপ্ত অবেস্টিস নাবীব মর্যাদা ও অধিকাব বক্ষায সদাসতর্ক আদিম দেবতা 'ফিউবি'দেব হাত থেকে বাঁচাব জন্য আপোলোব মন্দিবে আশ্রয় নিযেছিল। ফিউবিদেব দাবি ছিল, তাদের হাতে অবেস্টিসকে সমর্পণ কবতে হবে, যাতে তাবা তাকে চিবাচরিত প্রথা অনুসাবে শাস্তি দিতে

পাবে। অ্যাপোলো অরেস্টিসের বিচারের ব্যবস্থা করেন। জুরিদের ভোট তার পক্ষে ও বিপক্ষে সমানভাবে ভাগ হয়ে যায়। তখন বিচারক এথেনার কাস্টিং ভোটে অরেস্টিস মুক্তি পায়। ফিউরিরা এতে ক্ষুব্ধ হয়, ফলে অ্যাপোলো তাদের দাবি অনুসারে মর্ত্যের এই আদিম প্রবৃত্তি ও আবেগের দেবী, নারীর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় তৎপর ফিউরিদের গ্রীক সভ্যতার উন্নত, সুসংস্কৃত যুক্তিবুদ্ধির প্রতীক দেবতাদের পাশে সমান আসন ও মর্যাদা দান করেন। 'ফিউরি' (হিংস্র প্রবৃত্তি) রূপান্তরিত হয় 'ইউমেনিদিস' বা ক্ষমা ও করুণায়। পণ্ডিতেরা বলেন, গ্রীক ভাস্কর্য ও স্থাপত্যে যে আশ্চর্য সুষমা, সামঞ্জস্য ও প্রশান্তি বা সিরিনিটির ভাব আমরা লক্ষ্য করি তার অন্তরে আছে এক প্রবল অথচ সুসংযত আবেগ ঃ **"Apollonian sublimation of Dionysiac passion."**

নাট্যকাহিনী বা নাটকের চরিত্রের সঙ্গে অভিনেতা ও দর্শকের অ্যালিয়েনেশন বা অসাযুজ্য অভিনেতা ও দর্শককে মঞ্চে উপস্থাপিত ঘটনাবলীর তাৎপর্য বুঝতে সাহায্য করে। নাটকের বিষয় সম্পর্কে আবেগমুক্ত এক কঠোর বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধির উদ্রেক করে দর্শককে এর প্রতিকারের, অবস্থার পরিবর্তনের জন্য সচেষ্ট হতে বাধ্য করবে। দুরারোগ্য ব্যাধির কারণ নির্ণয়ের জন্য বিজ্ঞানী যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান, নাট্যকার-প্রযোজক ব্রেশটও তেমনি থিয়েটারকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন ব্যাধিগ্রস্ত সমাজের রোগ নির্ণয়ের ল্যাবরেটরি হিসেবে। রোগ নির্ণয় সফল হলে যেমন তার প্রতিকারও মানুষের আয়ত্তে আসে একালের নাটকও তেমনি মানুষকে দুঃসহ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের পথ দেখাবে। বিজ্ঞানীকে রোগ বা রোগের কারণ সম্পর্কে ব্যক্তিগত ভাবাবেগকে দূরে সরিয়ে রাখতে হয়, রোগীর মন বা অনুভূতি সম্পর্কে থাকতে হয় উদাসীন, নিস্পৃহ। নাট্যকার, প্রযোজক, অভিনেতা, দর্শক সকলকেই নাটকের বিষয় সম্পর্কে এই দূরত্ব অর্জন করতে হবে, মঞ্চে উপস্থিত নরনারীর সুখদুঃখ, হাসিকান্না সম্পর্কে ভাবাবেগে আপ্লুত না হয়ে কঠোর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করতে হবে।

আপাতদৃষ্টিতে ব্রেশটের এই বিধান নাটককে রাজনৈতিক প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের সপক্ষে পরোক্ষ দাবি বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা জানি নাটক বা সাহিত্যকে সরাসরি রাজনৈতিক প্রচারের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন ব্রেশট। সোবিয়েতের সোশ্যালিস্ট রিয়েলিজম

তত্ত্বকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন (তার নাটক কোনদিন সোবিযেত ইউনিযনে প্রদর্শিত হযনি, ববং কঠোবভাবে সমালোচিত হয়েছে)। ব্রেশটেব নাটক ও থিযেটারকে কমিউনিস্ট সমালোচকেবা ফর্মালিস্ট বা আঙ্গিকসর্বস্ব বলে নিন্দা কবেছে। এমনকি গর্কির 'মাদার'এর যে নাট্যরূপ তিনি দিযেছেন, যাকে ব্রেশটেব একমাত্র বাজনৈতিক বিপ্লবের আদর্শে অনুপ্রাণিত নাটক বলা চলে, তাব মধ্যেও সোবিয়েত সমালোচকেবা **Pelageya Vlasova** (মা)ব চবিত্রচিত্রণে সংগ্রামী শ্রমিকবমণী সম্পর্কে ব্রেশটের অজ্ঞতার নিদর্শন দেখতে পেয়েছেন।

না, চবিত্র বা ঘটনার সঙ্গে দূরত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্য স্থূল রাজনৈতিক প্রচাব নয। মানুষের জীবন, প্রাকৃতিক জগতে ও সমাজে তাব অবস্থান, মানুষেব পাবস্পবিক সম্পর্ক, তার জৈবিক প্রবৃত্তি ও প্রয়োজন, তার সমস্ত মানবিক অনুভূতি ও আবেগ তাব নীতি-দুর্নীতি মূল্যবোধ, যা তাব সামাজিক ঐতিহাসিক পবিবেশেব দ্বাবা প্রভাবিত, নিযন্ত্রিত—দূরত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্য এদেব নিস্পৃহ, নিবাসক্ত বিশ্লেষণ, মূল্যায়ন। এক কথায় যে মানুষ, দেশে-কালে সীমাবদ্ধ মানুষ, শিল্প-সাহিত্যেব উপজীব্য, তাকে নিযে উচ্ছ্বাস আবেগ ভাবালুতাব দিন শেষ হয়েছে। মানব-ইতিহাসেব চবম দুর্দিন ও সংকটের যুগে প্রয়োজন নির্মোহ, নিবাসক্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানুষের জীবনের সার্বিক বিশ্লেষণ। অন্য সব ঘটনাব মতই মানুষেব সংকটেবও বস্তুগত কাবণ আছে। জড পদার্থ, মনুষ্যেতব প্রাণীসমাজেব মত মানুষেব হীনতম প্রবৃত্তি ও মহত্তম আদর্শেব, তাব জীবনেব সব বিপর্যয়েব বৈজ্ঞানিক কাবণ বিশ্লেষণ কবেই প্রতিকাবের পথ খুঁজতে হবে।

॥ দুই ॥

ব্রেশটীয থিয়েটারে সামাজিক ব্যাধিব প্রতিকাব, যা সমাজেব বৈপ্লবিক পবিবর্তনেব মধ্য দিযেই সম্ভব, নাটকেব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাব অন্তর্গত নয়। এমনকি আভাসে ইঙ্গিতেও এই পবিবর্তনের কোন সম্ভাবনা দর্শকের চেতনায ধবা দেয না। দর্শক শুধু পবিবর্তনেব প্রযোজন অনুভব করবে, সংগ্রামী মনোভাব নাট্যকার সৃষ্টি করবেন না, দর্শকেব মনন ও বিচাব শক্তি তাকে সংগ্রামী কবে তুলবে—এটাই ছিল ব্রেশটেব আশা ও আকাঙ্খা। এ-ব্যাপাবে, অর্থাৎ দর্শকের প্রত্যাশিত প্রতিক্রিযা সম্পর্কে ব্রেশটেব সাফল্য সন্দেহাতীত নয। ব্রেশট তাঁব নাটকে সমকালীন সমাজে মানুষেব যে লোভ ও ত্যাগ, নীচতা

মহত্ত্ব, একই ব্যক্তির অন্তরে হীন ও উচ্চ বৃত্তিব সমাবেশ, নিছক ভালোমানুষিব শোচনীয ব্যর্থতাব যে চিত্র এঁকেছেন, তা আমাদেব একদিকে যেমন মানুষেব স্বভাব ও আচরণ সম্পর্কে নির্মোহ সত্যদৃষ্টি লাভ কবতে সাহায্য কবে তেমনি আমাদেব আবেগ-অনুভূতিকেও নাড়া দেয। ম্যাকহীথ কিংবা ক্র্যাগলাব, মাদাব কাবেজ কিংবা গ্যালিলিও, পণ্টিলা কিংবা শেন-তে, সবাই কোন না কোনভাবে আমাদেব হৃদযমনকে স্পর্শ কবে যায। তবে আমাদেব বিচাব-বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন কবে সহানুভূতি বা 'এমপ্যাথি' মনকে সম্পূর্ণ অধিকাব কবে ফেলে না। দর্শক ঘটনা ও চবিত্র থেকে দূবত্ব বজায বাখে কিন্তু সেই দূবত্ববোধ থেকে বৈপ্লবিক পবিবর্তনেব আবেগ তো নযই, এমনকি প্রযোজন-বোধও দর্শক বা পাঠকেব মনে সঞ্চাবিত হয কিনা সন্দেহ। কারণ নিউ ইযর্ক শহবে 'থ্রিপেনি অপেবা'ব দীর্ঘস্থাযী সাফল্য কিংবা পশ্চিম ইওবোপেব প্রধান শহবগুলিতে ব্রেশটেব শ্রেষ্ঠ নাটকগুলিব জনপ্রিযতা এই দেশগুলির সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থায আজ পর্যন্ত কোন পবিবর্তন আনতে পেবেছে বলে মনে না। অন্যদিকে যে পূর্ব জার্মানীতে ব্রেশট বসবাস কবতেন সেখানে এবং পূর্ব ইউবোপ ও খোদ সোবিযেত ইউনিযনেই সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে বিপর্যয, যে বাজনৈতিক বূপান্তব ঘটেছে তা ব্রেশট কল্পনাও কবতে পাবেননি।

ব্রেশটেব বাজনৈতিক বিপ্লবেব স্বপ্ন ব্যর্থ হলেও ধনতন্ত্রেব ধ্বংসেব কোন আশু সম্ভাবনা না থাকলেও তাঁব নাটকেব আবেদন তো বিন্দুমাত্র কমেনি। এব কাবণ কি এই নয যে, তাঁব সৃষ্ট চবিত্রগুলি ও মঞ্চে উপস্থাপিত ঘটনাব মধ্যে আমবা আমাদেব নিজেদেবই প্রতিচ্ছবি আমাদেব জীবনেবই প্রতীক আবিষ্কাব কবি? চিবন্তন মানবপ্রকৃতি বলে কিছু আছে স্বীকাব না কবলেও ব্রেশটেব নাটকে যে শযতানি ও ভালোমানুষিব দৃষ্টান্ত আমবা পাই তা কি ব্রেশটেব সমকালীন সমাজ-পবিবেশে মানুষেব এক শাশ্বত বূপ নয? চুবি, জোচ্চুবি, বাটপাড়ি না কবে কেউ বড়লোক হয না, বেন জনসন থেকে সুবু কবে সব স্যাটাযাবিস্টই তো বলে এসেছেন। ব্রেশটেব ম্যাকহীথ কি তাব শযতানিতে তাব দেশ ও কালকে অতিক্রম কবে যায না? আবাব ব্রেশটের ভণ্ড ও শযতানদেব আমবা পুবোপুবি ঘৃণা কবতে পাবি কই? তাবা তো শেকসপীযাবের ভিলেনদেব মতনই তাদের প্রবল, প্রগলভ জীবনাসক্তি দিযে আমাদেব মনেব একটা দিককে জয় কবে নেয। তাবা দ্বিমাত্রিক টাইপ হযে

থাকে কই ? তাদের সঙ্গে এমপ্যাথি বা সহমর্মিতা আমরা এড়াতে পারি না কেন ?

অর্থাৎ ব্রেশটের নাট্যতত্ত্ব আর বৈপ্লবিক উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে গেছে তাঁর নাটকের চরিত্র ও কাহিনী। পিরানদেল্লোর ছ'টি চরিত্র নাট্যকারকে খুঁজে বেড়ায়, ব্রেশটের চরিত্রগুলি যেন তাদের নাট্যকারকে এড়িয়ে চলে, তাঁর উদ্দেশ্য থেকে দূরে, ক্রমশ আরও দূরে সরতে থাকে। জাঁ পল সার্ত্র দেখিয়েছেন যে, ক্লাসিকাল ফরাসী নাটকে, যেমন রাসিনে, ব্রেশট কথিত এলিয়েনেশনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করার সময় অভিনেতা চরিত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম হয় না, একটা বিচ্ছিন্নতা বা দূরত্ব তাকে রাখতে হয়। বিশেষত পুরনো নাটকে, যেখানে স্বগতোক্তির মাধ্যমে সে দর্শকের কাছে আত্মবিশ্লেষণ আত্মোদ্ঘাটন করে, সেখানে অভিনেতা ও অভিনীত চরিত্রের মধ্যে এই দ্বান্দ্বিক বা ডায়ালেকটিকাল সম্পর্ক অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। এমনকি শেক্সপীয়ারের হ্যামলেট, যা তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে সিমপ্যাথেটিক চরিত্র, তাঁর সঙ্গেও দর্শকের বা পাঠকের একাত্মতা সম্পূর্ণ নয়। রোমান্টিক যুগে গ্যয়টে ও কোলরিজ হ্যামলেটকে নিয়ে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন আমাদের যুগে শেক্সপীয়ার গবেষকেরা এই নাটকের উৎস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, তাঁদের কল্পিত হ্যামলেট চরিত্র বা নাটকের মূল্যায়ন কত অর্থহীন, অবান্তর। ওফেলিয়ার প্রতি হ্যামলেটের আচরণ এমনকি তার মা গার্টরুডের সঙ্গে তার সংলাপ তার চরিত্রের এমন একটা অন্ধকার দিক উন্মোচিত করে যার সঙ্গে কোন সুস্থ স্বাভাবিক পাঠক বা দর্শক একাত্মবোধ করতে পারে না। আবার, হ্যামলেটের নিজের উক্তি—Something is rotten in the state of Denmark কিংবা the time is out of joint : O cursed spite,—that I was born to set it right কখনই আমাদের মনে শুধু বেদনা ও ব্যর্থতাবোধই জাগিয়ে তোলে না, আমাদের ভাবায়, জগত ও জীবন সম্পর্কে আমাদের যুক্তিবুদ্ধিকে জাগ্রত করে।

শেক্সপীয়ারের কোন নাটকের কোন পরিণতিই বিশ্ববিধানের অমোঘ নিয়ম কিংবা চিরন্তন মানব চরিত্রের অনিবার্য পরিণাম বলে আমাদের মনে হয় না। চরিত্রগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, সমাজ-পরিবেশ ও প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে মানুষের সংঘাত-সহযোগ, মানুষের অন্তর্দ্বন্দ্ব নাট্যঘটনাকে তার

অনিবার্য পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। এর ফলে করুণা ও ত্রাসের মধ্য দিয়ে যে ক্যাথার্সিস বা চিত্তশুদ্ধি ঘটে, তার উদ্দেশ্য জীবন ও জগতের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক বিষয়ে তাকে নিশ্চেষ্ট, অদৃষ্টবাদী করে তোলা নয়। ট্রাজেডির ঘটনাধারা দর্শক বা পাঠকের যুক্তিবুদ্ধিকে অসাড় করে দেয় না, তার চেতনাকে উদ্দীপ্ত করে। যে জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ মণীষী সক্রেটিস বলেছেন, An unexamined life is not worth living—সেই গ্রীকদের এপিক বা ট্র্যাজেডির ফলশ্রুতি, catharsis, কখনই ত্রাস ও করুণায় দর্শককে আচ্ছন্ন করতে পারে না—জগত ও জীবন সম্পর্কে নির্মোহ সত্যানুসন্ধানই তার লক্ষ্য। আবেগের স্থান সে জাতির মননে, প্রজ্ঞায়, জীবনচর্যায় স্বীকৃত। কিন্তু 'ক্যাথার্সিস' ভাবাবেগে গা ভাসিয়ে দেওয়া নয়, যেমন সংস্কৃত কাব্য-তত্ত্বের রসানুভূতি স্থূল জৈব আবেগের অনুবৃত্তি নয়, তার নান্দনিক রূপান্তর, aesthetic transformation.

ব্রেশট তাঁর থিয়েটারে 'এলিয়েনেশন এফেক্ট' সৃষ্টির জন্য যেসব কৌশল আমদানি করেছিলের তার অনেকগুলি উপকরণই পৃথিবীর সব দেশে, সব যুগের নাট্য-ঐতিহ্যের অন্তর্গত। গ্রীক নাটকের কোরাস নায়ক-নায়িকার আচরণ ও নাটকের ঘটনাধারা থেকে দর্শক ও শ্রোতার দূরত্ব, বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। মধ্যযুগের শেষে যে 'মরালিটি' 'মিরাকল' নাট্যধারা প্রচলিত ছিল, তা পুরোপুরি স্টাইলাইজড, কৃত্রিম—বস্তুসদৃশতা বা verisimilitude-এর কোন প্রয়াস সেখানে ছিল না। শেকসপীয়ারের নাটকে কোরাসপ্রতিম চরিত্র-গুলি, Fool বা বিদূষক, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতীকী ব্যবহার দর্শকের চেতনাকে নিছক ভাবাবেগে আপ্লুত হতে দেয় না। 'ম্যাকবেথে'র পোর্টার মত্ত অবস্থায়, হত্যাদৃশ্যের পরেই যে অশ্লীল স্বগতোক্তি করে সেই খণ্ডদৃশ্য মুহূর্তে বহির্জগতের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার দমকা হাওয়ায় হত্যাদৃশ্যের অস্বাভাবিক অসহ্য দমবন্ধ করা আচ্ছন্নতা থেকে মুক্তি দেয় আমাদের।

কাজেই এলিয়েনেশনের ব্যবহার প্রথাগত থিয়েটারেরও অপরিহার্য অঙ্গ বলা চলে। তবে যুগের প্রয়োজনে নিজস্ব ভঙ্গিতে ব্রেশট এর নানা উপকরণ থিয়েটারের আঙ্গিকে এনেছেন। এ-ব্যাপারে জার্মান একপ্রেশনিস্ট থিয়েটার, রাজনৈতিক থিয়েটারের জনক পিসকাটর, এজিটপ্রপ, মেয়ারহোল্ড, টাইরভের কাছে তাঁর ঋণের কথা আমরা জানি। আধুনিক থিয়েটারে এর সব উপাদানই আমাদের মুখস্থ। পোস্টার, সংবাদপত্রের কাটিং, সিনেমার

স্লাইড ও মুখোশের ব্যবহার, দর্শককে সরাসরি নাটকের বিষয় ও চরিত্রের আচরণ সম্পর্কে জানানো, মঞ্চে দর্শকের চোখের সামনেই বাদক ও বাদ্যযন্ত্রের উপস্থিতি ও মহড়া, অভিনেতা-অভিনেত্রীর মহড়া, অভিনয় সম্পর্কে আলোচনা —এলিয়েনেশন এফেক্ট সৃষ্টি করে। দর্শকেরা বুঝতে পারে তারা অভিনয় দেখছে, একটা ঘটনার বিবরণ প্রত্যক্ষ করছে তার মূল্যায়ন, বিশ্লেষণের দায়িত্ব নিয়ে। ঠিক এইভাবে না হলেও, আমাদের যাত্রানুষ্ঠানে এলিয়েনেশনের একাধিক প্রকরণ আমরা নিজেরাই মনে করতে পারি। ব্রেশট বলেছেন, তাঁর এপিক থিয়েটারের উদ্দেশ্য হল কোন অতীত ঘটনার এমনভাবে উপস্থাপন যাতে দর্শকের মনে কোন মোহ বা বিভ্রান্তির সৃষ্টি না হয় যে, সে সমকালীন কোন বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষ করছে, যাতে সে মঞ্চে উপস্থাপিত ঘটনা ও চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতার তাগিদ অনুভব না করতে পারে। এর ফলেই ঘটনা বা চরিত্র সম্পর্কে তার বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকবে। ঘটনার অগ্রগতি বা সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে কোন সাসপেন্স, রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা, বা ঐ জাতীয় কোন স্থূল আবেগ দর্শকের মনে সৃষ্টি করা নাট্যকার-প্রযোজকের উদ্দেশ্য হবে না।

॥ তিন ॥

গ্রীক বা পৃথিবীর অন্য যে কোন ক্লাসিকাল নাটকের বিষয়বস্তু অতি প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনী থেকে নেওয়া হত। ঘটনার আরম্ভ, অগ্রগতি ও পরিণতিতে দর্শক বা শ্রোতার অপ্রত্যাশিত কিছু থাকত না। অতি পরিচিত কাহিনীর পুনরনুষ্ঠানে দর্শক নতুন অনুভূতি ও চিন্তার খোরাক পেত। নতুন করে তার মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ করত। শেকসপীয়ারের নাটকেও তাই। শেকসপীয়ার কোন নতুন কাহিনী সৃষ্টি করেননি। অতি পরিচিত, প্রচলিত কাহিনীর নতুন ভাষ্য রচনা করেছেন মাত্র। ব্রেশট বলেছিলেন পরিচিত ঘটনা ও মানুষগুলোকে নতুনভাবে দেখানো, চিরপরিচিতের মধ্যে অপরিচয়ের বিস্ময় সহসা উদ্ভাসিত করাই নতুন থিয়েটারের উদ্দেশ্য—যাতে মানুষ বর্তমান পৃথিবীতে তার অবস্থান ও সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। মানুষ ও তার পরিস্থিতি সম্পর্কে নতুন বোধের এই আশ্চর্য উদ্দীপন কি পুরনো অথচ চিরায়ত নাটকগুলোতে আমরা পাই না? নোরার শেষ আচরণ তার চরিত্রকে একটা নতুন আলোকে আমাদের চোখে উদ্ভাসিত করে না? 'পিগম্যালিয়নে'র এলিজা ডুলিটল প্রফেসর হিগিন্সকে ছেড়ে যখন

তাব প্রেমিক যুবককে বিবাহ কবে তখন তার আচবণে যে অপবিচয়ের বিস্ময় আমবা অনুভব কবি, তাব অভিঘাত কি ব্রেশটেব চরিত্রগুলিব আচরণেব চেয়ে কিছু কম ? ঐতিহ্যগত নাট্যকলাব বিরুদ্ধে যত বড় বিদ্রোহী হোন না কেন, পৃথিবীব সব দেশের সব যুগেব নাট্যবচনা ও মঞ্চশিল্পের সকল সজীব ধাবা থেকে ব্রেশট তাঁর থিয়েটারেব উপকবণ নিযেছেন, তাতে নতুন প্রাণসঞ্চাব কবেছেন। অস্ট্রিয়া ও ব্যাভেবিযায লোকনাট্যেব বীতি, ইউবোপের প্রাচীন, মধ্যযুগীয ও বেনেসাঁস পববর্তী নাটকেব ঐতিহ্য, ভাবত, চীন ও জাপানেব প্রাচীন নাট্যশিল্পেব প্রয়োগবিধিব বিচিত্র বিমিশ্র প্রভাব আমবা ব্রেশটেব থিয়েটাবে লক্ষ্য কবি।

তাহলে ব্রেশটেব অভিনবত্ব কোথায, কিসের বা কাব বিবুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ ? প্রত্যেক বিদ্রোহী শিল্পীই জেহাদ ঘোষণা কবেন তার অব্যবহিত পূর্বসূবীদেব প্রচলিত বীতিব বিবুদ্ধে। সেই সঙ্গে তিনি তাঁব উৎস বা শিকডেব সন্ধান কবেন প্রাচীনতব কোন প্রথা বা বীতিব মধ্যে। এটাই শিল্পের বূপান্তবেব ডায়ালেকটিক্স। বোমাণ্টিক কবিদেব বীতি ও প্রত্যয়কে বর্জন কবে এলিয়ট আধুনিক ইংবেজি কবিতাব উৎস খুঁজেছিলেন মেটাফিজিক্যাল কবিতায। অব্যবহিত বীববসের ধারাকে অতিক্রম কবে ববীন্দ্রনাথ তাঁব লিরিকের প্রেবণা পেয়েছিলেন বৈষ্ণব পদাবলীব মধ্যে। আধুনিক মঞ্চসজ্জা ও কৃত্রিম আলোর ব্যবহাবেব পূর্বে নাটকে বাস্তব জীবনেব অনুকৃতিব কথা ভাবা যেত না। দর্শক অভিনয়কে অভিনযই ভাবত, নাটককে জীবনেব দর্পণ মনে কবত না। তাব কৃত্রিমতাকে লুকিয়ে বাখাব কোন প্রযাস নাট্যকাব-প্রযোজক করতেন না। স্বাভাবিকভাবেই অভিনযে আতিশয্য থাকত। কিন্তু মঞ্চসজ্জা, চরিত্রেব বেশভূষায স্বাভাবিকতা, অস্বাভাবিক উচ্চগ্রামেব অভিনযরীতিব সঙ্গে বেমানান ছিল। ভিক্টোরীয় যুগেব ঐতিহাসিক নাটকগুলি এবং ব্রেশটের নিজের যুগেব জর্মন নাটকেব প্রযোজনায এই অসঙ্গতি প্রকট হযে উঠেছিল। এব বিবুদ্ধেই ব্রেশটেব নব্যবীতিব বিদ্রোহ। সেই সঙ্গে ঊনিশ শতকের শেষ দুই দশকে এবং বিংশ শতাব্দীব গোডায় নাটকে বাস্তব সমাজচিত্র ও দৈনন্দিন জীবনেব হুবহু প্রতিবূপ দেখানোব যে বীতি গড়ে উঠেছিল ব্রেশট তার বিবুদ্ধেও বিদ্রোহ কবেছিলেন। প্রসেনিয়াম থিযেটাবে বাস্তব জীবনেব এই প্রতিবূপ তুলে ধবাব প্রযাসটাই তো কৃত্রিম। ঘবোয়া জীবনেব অন্তঃপুরে যে সাজানো ঘটনা ঘটছে দর্শক আড়ি পেতে অনুপস্থিত চতুর্থ দেয়ালেব মধ্য দিয়ে লক্ষ্য

তাকে দু কোটি দেবো। দু কোটিব কমিশান দু লাখ আপনি ঘরে বসে পাবেন! ঠিক আছে?

—ঠিক আছে। আমি অবশ্যই ভাববো। অবশ্যই আপনাব হয়ে প্রচাব করবো।

—করুন। কামাবাব সুযোগ পেয়েছেন, কামিযে নিন। দুদিন পবে সব ডালভাত হযে যাবে। এসব জিনিস তখন মুদিব দোকানে দু'-পাঁচ টাকায বিকোবে। তখন আব কামাবাব সুযোগ পাবেন না।

—আমি ব্যাপারটা সিবিযাসলি নিলাম। ধবে নিন আপনাব পাশে আছি, থাকবো। আপনি আমাব উপকাব কবেছেন।

—ধন্যবাদ। প্রশংসা শুনতে আমাব ভালো লাগে।

শাইলক আবাব বেল বাজায়। পোরশিয়া আবাব এসে দাঁড়ায। শাইলক নির্দেশ দেয—আন্তোনিও। একটু পরে আন্তোনিও ঘবে ঢোকে।

—আন্তোনিও!

—ইযেস বস্!

—তুমি মিস্টাব সিকান্দারেব সঙ্গে যাবে।

—না না তাব দবকার হবে না। এ টাকা নিয়ে যাওয়া কিছু কঠিন ব্যাপাব হবে না। তাছাড়া আমি একটা ট্যাক্সি ধবে সবাসবি বাড়ি চলে যাবো। বাস গাড়িব ঝামেলায যাবো না।

—তবু একজন দক্ষ লোক আপনাব সঙ্গে থাকলে ভালো। আন্তোনিও চৌকস লোক। দক্ষ শুটার। ওব কাছে সব সময় অত্যাধুনিক অস্ত্র থাকে। ও আপনাব দেখ্‌ভাল কববে। মনে বাখবেন, আপনি এখন একজন মানিডম্যান। আপনাব নিবাপত্তা জবুবি।

—না না দবকাব হবে না। আমি খুব সামান্য মানুষ হলেও নির্বোধ নই। আমি নিজেব দেখাশোনা করতে পাবি।

—তবু আন্তোনিওকে আপনার সঙ্গে নেযাব দবকাব আছে! শাইলক এবাব মৃদু হেসে যথাসম্ভব মোলায়েম কণ্ঠে আবাব বলে—আপনাব নয, আমাব দবকার। আপনি আমাব কাছে যা বিক্রি করেছেন তাব কোনো বস্তুগত আকাব নেই। সবটাই আপনার কাছে গচ্ছিত। ঠিক?

—তা ঠিক।

স্ত্রীব অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, বাড়িব যাবা ছোট, মানে আপনাব সন্তানদের ভবিষ্যৎ বিক্রি করে দিতে পাবেন। এখন আমাব কেনাব পালা। ভালো দাম দেবো, মনে বাখবেন, ধীবে ধীবে দাম কমে যাবে। এই ব্যবসা এখন নতুন। লোকে নানা কাবণে সহজে এগিযে এসে তাদেব এসব মাল বেচতে চাইবে না। তাবা জানে না যে এটাও এক ধবনেব পণ্য, এসব মালও বাজাবে বিকোয। তাই তাবা প্রথম প্রথম সন্দেহেব চোখে দূবে দাঁড়িয়ে দেখবে। যখন তাদেব ভবসা হবে তখন সব হুড়মুড় কবে ছুটে আসবে। তখনই দাম কমতে থাকবে। সে জন্যে বলছি, আপনি আমাব প্রথম ক্লায়েণ্ট, আপনি দুটো পয়সা বেশি পান, আপনাব শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, এটা আমি সত্যিই চাই। সুতবাং বাড়ি যান, বাড়িব লোকেব সাথে কথাবার্তা বলুন। আপনাব গোটা পবিবাবেব অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সবই আমি কিনে নেবো। এছাড়া আরো অনেক কিছু বিক্রি কবাব আছে—যেমন, আপনার হৃদয, স্বপ্ন, আপনার আত্মা! এসব জিনিস সত্যিই মূল্যবান। আপনাব আত্মাব জন্যে, যে কোনো লোকেব হৃদয স্বপ্ন কিংবা আত্মাব জন্যে আমি আবো বেশি টাকা দিতে পাবি। দেখুন, ভাবুন।

সিকান্দাব সত্যিই ভাবনায পড়ে যায। আত্মাব দাম আবো বেশি? বেচে দেবো? যাক, দুচাব দিন যাক। তাবপব দেখা যাবে। যদি তদ্দিনে দাম কমে যায? তবু আপাতত থাক। অতো লোভ ভালো নয। অন্তত দুটো দিন ঠাণ্ডা মাথায ভাবি। সে শাইলকেব হাত ছেড়ে এবার গম্ভীবভাবে বলে—নিশ্চয ভাববো। এমন হতে পারে আমি কাল, না কাল হবে না, পরশু তবশু আপনাব এখানে আবাব আসবো।

—বেশ, আসুন। আমাব দবোজা সব সময আপনাকে স্বাগত জানাবে। আমি সবাইকে বলে বাখছি—আপনি এলেই এবা সবাসরি আপনাকে আমাব কাছে পাঠিয়ে দেবে। একটা কথা, আপনাব এলাকায যতো পাবেন, ব্যাপাবটা চাউব কবে দিন—আপনাব মাধ্যমে যতো লোক আসবে—তাদের কাছ থেকে যে দামে মাল কিনবো তাব টেন পার্সেণ্ট আপনাব কমিশান থাকবে। ধরুন, দু'চাব দিনেব ভেতব যদি কেউ তার আত্মা বিক্রি কবে, মানে আপনার মাধ্যমে, তাহলে

এসে দাঁড়ায়। শাইলক ঘাড় অর্ধেকটা ঘুরিয়ে নির্দেশ দেয়—ব্যাংক ম্যানেজার! পোরশিয়া ফিরে যাওয়ার মিনিট খানেকের ভেতর একটা ফাইল হাতে মধ্যবিত্ত চেহারার মাঝবয়েসি বাঙালি ম্যানেজার ঢুকল। তাকে কিছু বলার দরকার হল না। সে সবকিছু জেনে, প্রস্তুত হয়েই এসেছিল। টাইপ করা নাম ঠিকানাসহ সে ছাপানো ফর্ম এগিয়ে দেয় সিকান্দারের দিকে। সিকান্দার পরপর সই করে। একই সাথে অতীত বিক্রির দলিল দস্তাবেজেও সই সাবুদ করা হয়ে গেল। এর মধ্যে আর একজন এসে সিকান্দারের ছবি তুলল। এবং আশ্চর্যের ব্যাপার, সঙ্গে সঙ্গে ছবির প্রিন্টও পাওয়া গেল। আজকাল কলকাতায় নাকি এসব ক্যামেরা হাতে হাতে ঘুরছে। পোলারয়েড না কি যেন বলে। ফর্মে ছবি সাঁটা হল। এ্যাকাউন্ট হয়ে গেল। টাকা জমা পড়ল। সিকান্দার দশ লাখ ক্যাশে নেয়। সব মিলিয়ে এক কোটির হিসেব মেলার পরও কাল রাতের এক লাখ হাতে থেকে যায়। সিকান্দার পাঁচশ টাকার দুটো বাণ্ডিল শাইলকের দিকে এগিয়ে বলে—আমার এক কোটির হিসেব এদিকে মিলিয়ে দিয়েছেন। এটা আগের, কাল রাতে দিয়েছিলেন, আপনার খেয়াল নেই।

—খেয়াল আছে। ওটা আপনাকে বোনাস হিসেবে দিলাম। আপনি আমার প্রথম বিক্রেতা। আমি আপনার খরিদ্দার হলেও এক্ষেত্রে আসল ব্যাপার উল্টো, আপনিই আমার খরিদ্দার। আপনার মাধ্যমে এই কেনাবেচার ব্যাপারটা নিশ্চয় বহু মানুষের কাছে ছড়িয়ে যাবে। অন্তত আপনার অঞ্চলে। তাতে আমারই লাভ। আমি মাল কিনে আপাতত গুদামে ঢুকাবো। তারপর সুযোগ মতো চড়া দরে বেচবো।

সিকান্দার টাকাটা পকেটে ঢুকিয়ে মৃদু হাসে। পাগল খেপে গেছে। খেপুক! এক কোটির উপর বাড়তি এক লাখ বোনাস। ভালো! যা আসে—এসব পাগলের দেখা সারা জীবনে এক আধবারও মেলে না। যো ওয়াপ্‌সে আতা হ্যায় উও হালাল হ্যায়! হারামের মাল দিয়ে যা বাপ্‌, আমরা হালাল করে খাই! সিকান্দার উঠে দাঁড়ায়। শাইলক উঠে দাঁড়িয়ে ওর দিকে হাত বাড়ায়। সিকান্দার হাত মেলায়। শাইলক হাতটা শক্ত ক'রে চেপে ধরে বলল—আপনি ইচ্ছে করলে যেটুকু বাকি আছে মানে আপনার বর্তমান ভবিষ্যৎ, আপনার

একজন তার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে অথচ ডাকেনি। মানে ডাকতে সাহস করেনি। তার মানে ভি-আই-পি হয়ে গেলাম নাকি! নয় কেন কোটিপতি মানেই তো ভি-আই-পি। অবশ্যই!

বিশাল চেম্বারে ঢুকতেই মৃদু হেসে স্বাগত জানায় শাইলক। সামনের চেয়ার দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করে। লোকটার দিকে তাকাতে কেমন একটা সংকোচ লাগে। একটা পাগল ঠকিয়ে কোটি টাকা ঝেড়ে দিলাম! বাইরে তাকায়। অনেক দূরে বহুতল বাড়ি, মেঘ, কিছুটা আকাশ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। ক' তলায় আছি? কম করে আট-দশ তলা তো হবেই। শাইলকের দিকে ফিরে সিকান্দার প্রশ্ন করে—এটা কি হোটেল?

—না, আমি পুরো বাড়িটাই কিনে নিলাম। এদেশে বড়সড় কিছু করতে চাই। অফিস বড় না হলে বড় কাজ করা যায় না। ওসব হোটেল-ফোটেলে যারা কারবার করে তারা ছিঁচকে বেনে। আমার ওসব চলে না। যাইহোক, শুনুন। কাগজ-পত্র রেডি। আপনার টাকা রেডি। আপনি বলে ছিলেন অর্ধেক টাকা ক্যাশে নেবেন, অর্ধেক চেকে। সবই প্রস্তুত। তবে আপনার হয়ে একটা প্রশ্ন করছি—আপনি তো মফস্বলে থাকেন, ওখানে ফাইভ মিলিয়ান আই মিন, পঞ্চাশ লাখ টাকা ক্যাশ নেয়া কি ঠিক হবে? কোথায় রাখবেন? কাছাকাছি ব্যাংক আছে তো? ব্যাংক থাকলেও রাতারাতি আপনার টাকার অংকটা চারপাশে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াতে পারে। আমি অবশ্যি ভালো জানি না, এদেশের হালচালও আমার পুরো জানা নেই, তবে এসব ক্ষেত্রে এমনটাই হয়ে থাকে। আপনি যদি চান —এখানে, কলকাতায় একটা ব্যাংক একাউণ্ট করে নিন। যতোটা দরকার ক্যাশ সঙ্গে নিয়ে বাকিটা ব্যাংকে ফেলে দিন। কোনো ঝামেলা থাকবে না। কেউ কিছু অনুমান করতেও পারবে না।

—আপনি যে আমার জন্যে এতোটা ভাবছেন···

—ক্লায়েণ্টদের জন্যে ভাবনা আমাদের ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ একটা পার্ট।

—কিন্তু একাউণ্ট করার ঝামেলা তো কম নয়; ছবি তোলা···ফর্ম ফিলাপ, গ্যারাণ্টার···সে তো দু-এক দিন লেগে যাবে।

শাইলক মুচকি হেসে বেল টেপে। সঙ্গে সঙ্গে পাশের ঘর থেকে পোরশিয়া

সেই দুধসাদা কেকের মতো কি যেন জিনিসটা আগে মুখে নিয়ে কামড় মারার সাথে সাথে গলে গেল। আহা, মধু! মধু কিরে, মধুর বাপ! এসব জিনিস যারা খায় তাদের চেহারা কোমল না হয়ে পারে। তবে চেহারা কোমল হলেও মনটা বোধ হয় সেই অনুপাতে কঠিন হবে? তাই তো মনে হয়। সমাজ বিজ্ঞান তো তাই বলে। ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান কি বলে? বোধ হয় সমাজ বিজ্ঞানের বাইরে কিছু বলবে না। ট্রে-টার এক পাশে একটা সাদা খাম। মাঝখানে ছাপানো নাম—মিস্টার নসীব সিকান্দার। এতো তাড়া তাড়ি ছাপানো যায়? ও হ্যাঁ, আজকাল তো কিসব টাইপ মেশিন বেরিয়েছে, কম্পিউটার টাইপ বোধ হয়, একেবারে ছাপার বাবা! খামের ওপরে কোম্পানির উড়ন্ত ঈগলের লোগো। ঈগল? বাজপাখি? ভালো! ঈগলের ডানপাশে চমৎকার টাইপে লেখা—শাইলক এ্যান্ড সিকোফ্যান্ট্স্। সিকোফ্যান্ট্স! মানে টা কি যেন, কি যেন·· ও হ্যাঁ, মনে পড়ছে—স্তাবক, হীনতম স্তাবক, চাকর বাকর আর কি! কি আশ্চর্য। এমনতর কোম্পানির নাম কেউ ভাবতে পারে? এ যে চূড়ান্ত দম্ভ, অসভ্যের মতো দম্ভের প্রকাশ। টাকা থাকলেই দম্ভ থাকে। যার যতো বেশি টাকা তার ততো বেশি ক্ষমতা যার যতো বেশি ক্ষমতা তার ততো বেশি দম্ভ। মলয়, যে কিনা এখনো দু পাঁচ লাখ টাকাও এক সাথে জড়ো করতে পারেনি—ছোট বেলার বন্ধু, পর পর তিন দিন এতো দূর থেকে এসেও দেখা পাইনি অথচ কোনো তাপ উত্তাপ নেই। ভাবটা এমন, গরজ যখন তোর তোকে তো আসতেই হবে। আমার যখন অতোটা গরজ নেই আমি তো বেরিয়ে যেতেই পারি। আমি যতোবার বাইরে থাকবো তোকে ততোবার ছুটে ছুটে এখানে আসতে হবে, তোর জমির দামটাও ততো কমবে। তোর যখন আর গতি নেই, তখন তোকে একটু খেলাতে দোষ কোথায়? খেলা দেখাচ্ছি! আজ খেলাটা আমিই দেখাবো!

সিকান্দার খামটা খুলে পড়ল। শাইলক দেখা করতে লিখেছে। বেশ, যাচ্ছি। না, লোকটা দাম্ভিক হলেও প্রোফেশনাল। এতো ঝামেলার ভেতরেও ঠিক আমার কথা মনে রেখেছে। ব্যবসা করতে গেলে অবিশ্যি ছোট বড় সবাইকে মনে রাখতে হয়। তবে সবাই রাখে না। অন্তত এই ভদ্রতা বোধ সবার থাকে না। ভদ্রতা বোধ? নয় কেন? অবশ্যই। যার যেটুকু আছে তা স্বীকার করতেই হবে।

সিকান্দার ঝোলাব্যাগটা কাঁধে নিয়ে দরোজা খুলে বাইরে আসতেই দেখে

তিন

স্বপ্নের ঘুম ভাঙতে সিকান্দারের একটু দেরি হল। তা হোক, এখন দেরিতে ঘুম ভাঙলেও কোনো অসুবিধে নেই। তাড়া নেই। অর্থ রোজগারের উদ্বেগ নেই। এখন নিরাপদ তন্দ্রায় সারাদিন কাটিয়ে দিলেও কারো কিছু বলার থাকবে না। সারা জীবনের রোজগার একটি মাত্র রাতের একটি মাত্র প্রহরে করা হয়ে গেছে। তবু শারীরিক নিয়মে ঘুম ভাঙে, শারীরিক কারণেই উঠে বসতে হয়। বেলা প্রায় দশটা। পুরনো প্রায় অথর্ব, জঘন্য-দর্শন হাতঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফেরায়। আর এসব পুরনো অচল জিনিস চলবে না। আজ থেকে সব পাল্টে যাবে। বাড়ির সমস্ত আসবাব বাড়ির চারপাশ বাড়ি সব পাল্টে যাবে। সব কিছু নতুন তকতকে ঝকঝকে হবে। পুরো জীবনটাই ঝকঝকে তকতকে নতুন করে নিতে হবে। টাকাটা আছে তো? দরিদ্র লোকের স্বভাববশত সে প্যান্টের দুপকেটে হাত ঢুকিয়ে টাকার বাণ্ডিল দুটো বের করে। না ভয়ের কিছু নেই, সব ঠিক আছে। স্বপ্নের মতো রাতটা স্বপ্ন নয়, বাস্তব, পুরোপুরি অর্থময়।

সিকান্দার হাত মুখ ধুয়ে নিজেকে একটু গোছ গাছ করে। বাথরুম থেকে ফিরে এসেই দেখে চা জল খাবার প্রস্তুত। ঘন করে মাখন লাগানো পাউরুটি, ডিম, দুধ, কলা, আপেলের টুকরো, আঙুর, কাজু বাদাম, একটা দুধ সাদা কি যেন! কেক? হয়তো বা জন্মেও এ জিনিস দেখিনি! জলখাবার যদি এই হয় তো আসল খাবারের দাপট কি হতে পারে? এতো সব খাওয়া একজন লোকের কর্ম্ম নয়। ব্যাগে ঢুকাবো? ধুর! ইতরামো! পকেটে এখন কড়কড়ে এক লাখ। একটু পরেই এক কোটি হাতে আসবে। সামান্য জল খাবার ব্যাগে পুরতে হবে? ছোটলোক আর কাকে বলে! না, ওই ছেলেমেয়ে গুলোর কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তা মনে পড়ুক। আজ সন্ধ্যার পর ওরা ভুরিভোজ খাবে। প্রতিদিন খাবে। আর কোনো চিন্তা নেই, কোনো দুশ্চিন্তা নেই। মলয়! তোকে আজ একটু দেখাবো! একটু না দেখিয়ে পারবো না। টাকা থাকলে একটু দেখাবার ব্যাপার এসেই পড়ে, কিছু মনে করিস না ভাই। ধান্দাবাজি করে এ পর্যন্ত কতো কামিয়েছিস? পাঁচ লাখ, দশ লাখ, বিশ লাখ? তার বেশি কিছুতেই না। আর এদিকে দেখ, এক রাতে এক কোটি! আজ একটু বোঝাপড়া হবে রে, মলয়! একটু দেখাদেখি হতেই হবে!

বাসানিও লরেনজো, গোবো, আন্তোনিও এমনকি নিজেব মেয়ে জেসিকাও শাইলকের বিরুদ্ধতা করেছিল, এরাই ছিল তাব প্রধান প্রতিপক্ষ এদের জন্যেই তার পতন ঘটে। আমার ক্ষেত্রে তেমন ঘটনা ঘটবে না। কাবণ সমস্ত প্রতিপক্ষই আমাব বেতনভুক্ কর্মচাবী অথবা আমার কাছে ঋণী। আমাব মেয়ে জেসিকা আমার বিরুদ্ধতা করবে না। কারণ, সে তার যে কোনো কর্মচাবীকে বিয়ে করলেও আমার কোনো আপত্তি নেই। আপত্তি নেই তাব কাবণ, জেসিকার সাথে বিয়ের আগেও তারা যেমন আমার পোষ্য বিয়ের পরেও তেমনি পোষ্য থাকবে। কোনো বড় মানুষেব বন্ধু থাকে না। জেসিকাবও থাকবে না। স্বামী হবে তাব বেতনভুক্ কর্মচারী অথবা রক্ষিত, আত্মীয় স্বজন হবে তার অনুগ্রহপ্রার্থী। তথাকথিত বন্ধুরা হবে বিদূষক, ভাঁড়, মোসাহেব। সে থাকবে সম্রাজ্ঞীর মতো স্বরাজ্যে স্বরাট। এই স্বপ্নের জীবন ছেড়ে সে আমার বিরুদ্ধতা করার দরকার বোধ করবে না। শেক্সপীয়বেব শাইলকের ধর্ম ছিল, তাই খৃস্টান বিধর্মীর সঙ্গে মেয়েব প্রণয়ে তাব ধর্মীয় অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। আমাব ধর্ম নেই তাই সেবকম সমস্যাও নেই। মোদ্দা কথা, শেক্সপীয়বের শাইলকেব লোকবলেব অভাব ছিল, সংখ্যালঘু হিসেবে তার নিবাপত্তাব সংকট ছিল, উদ্বাস্তু বলে পায়ের তলাব মাটি অশক্ত ছিল, সংস্কার-কুসংস্কাবেব দুর্বলতা ছিল, এবং শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল তাই তার পবাজয় ছিল অবশ্যম্ভাবী। অথচ আমার ধর্ম নেই, সংস্কাব নেই, নিবাপত্তাব সংকট নেই, লোকবলের অভাব নেই, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, আমাব কোনো প্রতিপক্ষ নেই। আমার সমস্ত প্রতিপক্ষকে ডলার ধার দিয়ে তাদের কোমর ভেঙে দিয়েছি। তাদের বিরোধিতা কবার ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস কবে দিয়েছি। তাই কখনো আমাব পরাজয় ঘটবে না। ঘটতে পাবে না। অবশ্যম্ভাবী আমাব বিজয়। আপনাবা যাকে খোদা, বিধাতা বা ঈশ্বব বলেন—আমি তাই! অমনিপ্রেজেন্ট, অমনিসায়েন্ট, অমনিপোটেন্ট!

—পোবশিযা ! তোমাব কাছে হবে কিনা দেখ। শাইলকের নির্দেশে পোরশিযা ব্রিফকেস খুলে আব একটা পাঁচশ টাকাব বাণ্ডিল বেব কবে তাব হাতে দিল। দুটো বাণ্ডিল একসঙ্গে সিকান্দাবকে দিয়ে শাইলক বলল—

—টাকাটা পকেটে বাখুন। দেখুন, ভালো লাগবে। টাকা মানে শুধু কাগজ নয, মানুষেব স্বপ্ন, বাসনা, কল্পনা। যা পাইনি তার অনেকটাই হাতের মুঠোয পাওযা। আপনি টাকাব বাণ্ডিলে আলতো ভাবে হাত বুলোন দেখবেন অদ্ভূত একটা সুখের অনুভূতি জাগছে, এই সুখ শুধু মানসিক নয, অনেকটা শাবীবিক। দেখবেন কিছুক্ষণ হাত বুলোবাব পব আপনার শারীবিক শিহবণ জাগবে, উত্তেজনা আসবে, এক ধবনেব চবম আনন্দের দিকে আপনার শরীব আপনাব মনকে এগিযে নেবে। এই জন্যে মানুষ টাকা ভালোবাসে। যতো বেশি টাকা আপনাব হাতে থাকবে, মানে আযত্তে থাকবে ততো বেশি সুখেব অনুভূতি জাগবে, ততো বেশি শাবীরিক উত্তেজনা আসবে ততো বেশি চবম আনন্দের কাছাকাছি পৌঁছে যাবেন। এই জন্যে আমবা বেশি টাকা চাই, আবো বেশি, আবো বেশি, অফুরন্ত —পৃথিবীব সব টাকা, সব সম্পদ সব আনন্দ আমার চাই। বাসানিও ! ড্রিংক্‌স্‌ !

সিকান্দাব টাকাটা পকেটে পুরে বেশ তৃপ্ত মুখে বেনসনেব প্যাকেট থেকে আব একটা সিগ্রেট বেব কবে ধবায়। তাবপব তারিযে তাবিয়ে টানতে টানতে বলে—আপনাব লোকদেব নামও দেখছি আপনার নামের মতোন পুরোপুবি শেক্সপীযাবিযান। শাইলক মদেব পাত্রে চুমুক মেরে গাঢ় স্বরে বলে—

—তা মিথ্যে বলেননি। তবে নামেব মিল থাকলেও কামে ও দামে তফাৎ আছে। যেমন, শেক্সপীযবেব শাইলক ইহুদী, আমি তা নই। শেক্সপীযবেব শাইলক ক্রুব প্রতিহিংসাপরাযণ ঈর্ষাকাতব অর্থবান, নিষ্ঠুব এবং নির্বোধ। আমি নির্বোধ নই। শেক্সপীযবেব শাইলক তাব প্রতিপক্ষেব কাছে অর্থাৎ আন্তোনিওর কাছে পরাস্ত হয়। আমি কারো কাছে পবাস্ত হবো না। শেক্সপীযরেব শাইলক পোবশিযাব মতো এক বালিকার বুদ্ধিতে ধরাশাযী হযে পডে। আমি হইনা। এরা, অর্থাৎ পোরশিযা

আমাকে বিশেষ নিরাপত্তা দেযাব প্রতিশ্রুতি থাকে। অর্থাৎ কোনো দেশে ঢোকাব জন্যে যে অনুমতিব দবকাব হয় আমাব ক্ষেত্রে আসলে তা সেই সবকাবেব করুণ আবেদন। পৃথিবীব প্রতিটি দেশেব সবকাব তার দেশেব নাড়ি-নক্ষত্র স্বেচ্ছায দেখাবাব জন্যে আমাব কাছে আবেদন কবে। কাবণ আমাব অফুবন্ত টাকা আছে, মানে ডলাব আছে। আব পৃথিবীব প্রতিটি দেশেব প্রত্যেক সরকাবেব ডলার দবকাব। যাব বেশি আছে তাব বেশিটা নিরাপদে গচ্ছিত রাখাব জন্যে আবো বেশি দরকাব। তাই তাদের আমাকে দবকাব। আব আমারও ডলাব বাড়াতে গেলে আপনাব দেশের নরম মাটিব মতো মাটি চাই। আপনাব দেশেব কোমল সরকাবেব মতো নতজানু সবকার চাই। সুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমাকে রাতবিরেতে ঘুবতে হয আমাব দবকাবে, আর আপনাব সরকাব আমার ঘোবার বিষযে সম্পূর্ণ নিবাপত্তা দেয তাব দবকাবে। যাক, এবার বলুন, আপনার টাকা কিভাবে নেবেন ?

—অর্ধেক চেকে, অর্ধেক ক্যাশে।

—বেশ তো, ক্যাশটা ডলারে দিই ?

—ডলার ভাঙাবো কোথায ? আমাদেব এখানে আমাব মতো লোক এতো ডলাব ভাঙাতে গেলে বিবাট ঝামেলায পড়ে যেতে পারি।

—তাহলে এক কাজ করুন, আমাব সাথে কলকাতায় চলুন। কাল সকালে আপনাকে ভাবতীয টাকায পেমেণ্ট করবো। ঠিক আছে ?

—ঠিক আছে।

—আচ্ছা একটা কাজ করুন আপনি ফিল করুন যে আপনাব হাতে টাকা আছে, আপনি এখন মানিড ম্যান। আন্তোনিও ! তুমি ওঁকে হাণ্ড্রেড থাউজেণ্ড ইণ্ডিযান রুপি দিযে দাও। এক লাখ টাকা আপনি নিজেব কাছে বাখুন। নইলে আপনাব মনে হতে পাবে সবটাই কাগুজে ব্যাপাব, আপনাব আশংকা, দুশ্চিন্তা, সন্দেহ বাড়বে। তাব চেযে এই ভালো, কিছু টাকা পকেটে বাখুন।

—আমার কাছে হাণ্ড্রেড থাউজেণ্ড ইণ্ডিযান রুপি নেই। আন্তোনিও তার ব্রিফকেস খুলে একটা পাঁচশ টাকাব বাণ্ডিল বের কবল।

ফেলবো। জীবনটাকে এবার জীবনের মতো ভোগ করতে হবে। জীবন একটাই, এই একটা জীবন ঠিক বাঘের মতো ভোগ করা চাই! বাঘের মতো, সিংহের মতো! এখন যা চলছে এর নাম জীবন? ছোঃ! সিকান্দার কাগজটা জেসিকাকে ফেরত দিয়ে শাইলকের দিকে তাকায়। শাইলক ওর দিকেই তাকিয়ে ছিল। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই বলল—টাকা ক্যাশে নেবেন না চেকে? আপনি চাইলে এখনই পেমেণ্ট ক'রে দিতে পারি।

—এখানেই?

—হ্যাঁ এখানেই। তবে একটা অসুবিধে হতে পারে। আমার কাছে আপনার দেশের কারেন্সিতে অতো টাকা হবে না। আপনাকে ডলার নিতে হবে। তাই নেবেন?

—আপনি অতো টাকা সঙ্গে নিয়ে এতো রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?

শাইলক মৃদু হাসল। হাসতে হাসতে মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল—

এতো রাতে শুধু শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছি না। ব্যবসার কাজে ঘুরছি। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কয়েকটা দেশে কাজ সেরে বাংলাদেশ, বাংলাদেশ থেকে এখন কলকাতায় ফিরছি। যেখানে টাকা ঢালবো সেখানকার মাটি চিনবো না তা হয় না। আমার এই হাঁটাপথে ভ্রমণের, মানে গাড়িতে ঘোরার অন্য উদ্দেশ্য আছে, এই গরীব দেশগুলোর নাড়ির মূল স্পন্দনটা ধরা। এখানকার জমি কতোটা নরম, শেকড় ধরে টান দিলে কতোটা উঠে আসবে, কতোটা উঠিয়ে কতোটা নতুন গাছ পোঁতা যাবে তার একটা হিসেব নিতে চাই। যাই হোক সেসব আমার ব্যাপার। আপনি এসব ঠিক বুঝতে পারবেন না। বোঝার তেমন দরকারও নেই। আর এতো টাকা সঙ্গে নিয়ে এতো রাতে ঘুরে বেড়াবার কথা যদি বলেন তাহলে বলতে হয়, আপনি যতো টাকা ভাবছেন তার চেয়ে বহুগুণ টাকা আমার সঙ্গে আছে, থাকে। অতো টাকা সঙ্গে রাখতে হলে যা যা করা দরকার মানে যেটুকু সতর্ক থাকতে হয় সেটুকু সতর্ক আমি সব সময় থাকি। আপনার পেছনে সামনে ডানে বাঁয়ে যাদের দেখছেন ওরা সব আমার লোক। সবাই সশস্ত্র। অত্যাধুনিক ভাবে সশস্ত্র। ওরা যে কোনো দেশের ছোট খাটো একটা সেনাবাহিনীর সঙ্গে টক্কর দেয়ার ক্ষমতা রাখে। তাছাড়া যখন আমি যেসব দেশে যাই সেসব দেশের সরকারি অনুমতির সঙ্গে

—বলছেন কি ? আশি লক্ষ টাকা !

—কম মনে হচ্ছে ? বেশ, আপনার কারেন্সিতে পুরো ফিগাব করে দিচ্ছি—এক কোটি ! বলুন, রাজি ? তাহলে এক্ষুণি কাগজপত্র তৈরি করে ফেলি ।

—এখানেই ?

—হ্যাঁ, অবশ্যই । জেসিকা ! কাগজপত্র তৈরি করো !

সিকান্দাব হাঁ হয়ে গেল । তাব যেন আব বা কাড়ার ক্ষমতা নেই । একি শুনলাম ! এক কোটি টাকা ! আমাব ফুটোফাটা অতীতেব দাম এককোটি ! আমাব অতীতে আছেটা কি মুলো ? ভালো করে বলতে বললে দেড় মিনিটও লাগবে না । একদিন কুক্ষণে জন্মালাম, চার পাঁচটা ভাইবোনের সাথে ধাক্কা-গুঁতো খেয়ে বড হলাম । স্কুল-কেলেজে কিছুদিন ঢুঁ মাবলাম । চাকরি-বাকবিব তালে কিছুদিন জুতোর শুকতলা ভোগে দিলাম । অবশেষে বাপের তালে পড়ে বিযে কবলাম এবং যথাবীতি তিন তিন খানা বাচ্চার জন্ম দিলাম এবং সবশেষে বাচ্চাদেব মানুষ করতে গিযে বাত দুপুরে হাটে মাঠে ঘুবছি—এই তো আমার অতীত । এব মূল্য এক কোটি ? হোক, তাই হোক, যো ওযাপ্‌সে আতা হ্যায উও হালাল হ্যায !

জেসিকা তার পাশেব ব্রিফফেসটা টেনে খুলে ফেলল । ব্রিফকেস নয, কম্পিউটার ! কম্পিউটার খুলে কোলেব উপর রেখেই টাইপ শুরু করে দিল । হঠাৎ থেমে মধুর কণ্ঠে জিগ্যেস কবে—ইওব নেম ? আই মিন....মানে আপনাব নাম, বাবাব নাম, ঠিকানা, পুলিশ স্টেশান, বযস, পেশা এসব এই কাগজে লিখে দিন । পিনকোড লিখবেন ।

সিকান্দার কাগজটা টেনে খস খস করে লেখে । হাতটা যেন একটু কাঁপছে । উত্তেজনায় ? তা হবে হযতো । উত্তেজনা হবাবই কথা । কাজটা ভালো কবছি না মন্দ ? পাগল লোকটাকে ফাঁকি দিয়ে এতোগুলো টাকা হাতিযে নিচ্ছি, এটা কি ঠিক হচ্ছে ? নাকি পাগলা আমাকে ফাঁকি দিযে বড়-সড কোনো ঝামেলায় ফেলছে ? এমন কেনা-বেচা করতে হচ্ছে যাব মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না । যা হবার হবে ! টাকা হাতে থাকলে ঝামেলা ঝক্কি সামলে নেযা কোনো ব্যাপাবই নয । তাছাড়া টাকা কামাতে গেলে গায়ে একটু আঁচ লাগবে না, টাকা বাড়ি হেঁটে আসবে এতো সস্তা নয় । যা হবার হোক, কিন্তু টাকা আসুক । এক কোটি টাকা ! জীবন পুরো পাল্টে

লোকটা যা বলছে তার ভেতর যুক্তি আছে। কিন্তু পাগল ছাগলের কথার ভেতরেও অনেক সময় যুক্তি থাকে। পয়সাঅলা পাগল নয় তো! টাকা আছে বলে যা খুশি করছে যা ইচ্ছে বলছে, তাই যদি হয়? হলে হোক, আমার কি? আমি যদি তালে গোলে কিছু পয়সা পেয়ে যাই, মন্দ কি? আমার জমি বেচতে হল না অথচ ফোকটে জমির দাম পেয়ে গেলাম। খারাপ কি? আমি তো আর সমাজ সংস্কারক নই, সাধু সন্ন্যাসীও নই। কেউ যদি পাগলামিতে টাকা নষ্ট করতে চায়, নষ্ট করে আনন্দ পায় তাতে আমার কি বলার থাকতে পারে? তাছাড়া এতোগুলো লোক, মহিলা পুরুষ মিলিয়ে বারো চোদ্দ জন তো এখানেই দেখা যাচ্ছে। ওপাশে আরো আছে কি না কে জানে? এতোগুলো পয়সাঅলা পাগল একসঙ্গে দলবেঁধে পাগলামি করতে বেরিয়েছে? না, এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাহলে আসল বিষয়টা কি? কেমন যেন মাথার ওপর দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে মনে হয়। অতীত কিনে অতীত বেচা? বাপের জন্মেও এমন কথা শুনিনি। অবশ্যি আমি আর কতোটুকু শুনেছি? থাকি মফস্বলে, সেখানে সব আমার মতো পণ্ডিতদের আস্তানা। ভালো ক'রে ইংরেজি কাগজ পড়তে গেলেই গায়ে ঘাম ছোটে। দুনিয়ার হালচাল আমার জানার কথা নয়। আচ্ছা, সত্যি যদি এ লোক আমার অতীত কিনতে চায়—সত্যিই চায় মনে হচ্ছে। বার বার ঘুরে ঘুরে একই প্রসঙ্গে ফিরে আসছে, তো দামটা কি বলবো? এই উদ্ভট বস্তুর কি দাম ধরা যায়? একটা কিছু তো বলতে হবে। কতো বলব? পঞ্চাশ হাজার? ধুর! এতো টাকা দেবে? না পঁচিশ হাজার বলি। পঁচিশ যদি ফোকটে মেলে তারপর জমিতে যদি চল্লিশ হয় তবে আর চিন্তা নেই। কারো কাছে আর ধার দেনার ঝামেলা থাকবে না। তবে পঁচিশই বলে দিই? হ্যাঁ, তাই সই।

—কি হল বলুন?

—দেখুন আমি এসব তো কেনাবেচা করিনি, আপনি একটা ধারনা দিলে ভালো হয় না?

—আমি বলবো? বেশ, হান্ড্রেড থাউজেণ্ড ডলারস্।

— মানে?

—এক লক্ষ ডলার!

—কি বলছেন!

—কেন কম মনে হচ্ছে? বেশ, টু হাণ্ড্রেড থাউজেণ্ড ডলারস্!

—এক সঙ্গে অনেক গুলো প্রশ্ন কবে বসলেন। আমি সহজ কথায় আপনাকে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা কবছি—মালিকানার প্রধান শর্ত—দখল কবতে পাবা এবং দখলে বাখতে পাবা। যারা চাঁদ দখল কবেছে এবং দখলে রাখছে তাবাই চাঁদের মালিক। তাবাই চাঁদের জমি বিক্রি করছে। যারা ওখানে হোটেল বানাচ্ছে তাবা মালিকদের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই কবছে। যাবা হোটেল বুক করছে বা জমি কিনছে তাবা নিশ্চিন্ত মনে কিনছে। কাবণ যাব জিনিস সে বিক্রি কবলে কিনতে বাধা নেই। আব কবে চাঁদে হোটেল হবে কিংবা বাড়ি হবে তবে সেখানে বেড়াতে যাবো ততোদিনে বেঁচে থাকবো কিনা এসব প্রশ্ন অবান্তব। অবান্তব এই জন্যে মালিকানা শুধু নিজেব জন্যে নয় ভবিষ্যতের উত্তবাধিকাবীদের জন্যেও বটে। এই যেমন ধবুন আপনাদেব কলকাতাব যতোটা বিপোর্ট আমি পেযেছি—এখানকার সল্টলেক কিংবা তাব আগের বালিগঞ্জ, নিউ আলীপুর, যোধপুব পার্ক এলাকা যখন বিক্রিবাটা হয তখন নাকি দিনের বেলাতেও লোকে ঢুকতে সাহস কবতো না। সল্টলেকে নাকি এখনো বাতে শেয়ালের ডাকে ঘুমোনো যায না। আরো কাছের ঘটনা আপনাদের ইষ্টার্ন বাইপাস। ওখানে যারা এখন জমি কিনছে তারা কি বোকা ? অথচ দেখুন, সন্ধ্যেব পর ওখানে নাকি চুবি ছিনতাই ডাকাতি ধর্ষণ খুন সবই চলে। চলে, চলছে, এটা সত্যি। আবার জনবসতি বেড়ে গেলে এসব কমে যাবে, এও সত্যি। যারা দূবদর্শী তারা এখনকাব জন্যে কিনছে না। যখন জাযগাটা জমে যাবে, বিপদ আপদ কমে গিয়ে নতুন সুখের বসতি হযে উঠবে তখন যাবে। চাঁদেব ব্যাপারেও তাই। যারা চাঁদে জমি কিনছে তাবা থাকাব জাযগাব অভাব আছে বলে কিনছে না, ভবিষ্যতের জন্যে কিনছে। এক কথায ভবিষ্যৎ কিনছে! এটা সবাই পারে না। যাব ক্ষমতা আছে সে পারে। যে টাকা বসিযে বাখতে পাবে দু দশ বছর এমনকি বিশ পঞ্চাশ বছর, যার টাকা বসিযে বাখাব ক্ষমতা আছে তাব রসিযে রসিযে ভবিষ্যৎ কেনাব যোগ্যতা তৈবি হযেছে। যাকগে, এখন আপনার অতীতের দাম বলুন। আমি আপনার অতীত কিনতে আগ্রহী।

ওঠে—একটা ব্যবহারিক মূল্য তো পেতেই হবে···

—চাঁদের মাটির কি ব্যবহারিক মূল্য আছে ?

—তা অবশ্যি নেই।

—বার্লিনের দেয়াল ভাঙা ইটের টুকরোর কি ব্যবহারিক মূল্য আছে ?

—তা নেই। কিন্তু স্মৃতি বলুন, এর পেছনের ইতিহাস বলুন—

—সে কথা বললে বলবো, আপনার স্মৃতি আছে, আপনারও ইতিহাস আছে—আমরা আপনার সমস্ত স্মৃতি সমস্ত ইতিহাস কিনে নিতে চাই !

—কিন্তু আমার মতো নগণ্য মানুষের ইতিহাস-স্মৃতি কোথায় বেচবেন, কে কিনবে ?

—আমার কাজ নিয়েই আপনি বেশি ভাবছেন। কোথায় বেচবো সেটা সম্পূর্ণ আমার ব্যাপার, সেটাই আমার ব্যবসায়িক দক্ষতা, আমার যোগাযোগ, বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত আমার নিজস্ব নেটওয়ার্কস। আপনি আমার অতীত কিনে বেচতে পারবেন না, আমি আপনারটা কিনে পারবো। কারণ আপনার বেচার ক্ষমতা যোগাযোগ এবং নেটওয়ার্কস নেই, আমার আছে। আমার আছে বলেই আমি কিনতে পারি বেচতেও পারি।

—যাই বলুন, অবিশ্বাস্য ব্যাপার মনে হচ্ছে

—সেটা হতে পারে। তার কারণ—এই ব্যবসাটা এখনো খুব বড়ো স্কেলে চালু হয়নি। দু'এক বছর পর দেখবেন এটা ডাল ভাতের মতো সহজ লাগছে। আচ্ছা, চাঁদে জমি বিক্রি হচ্ছে, লোকেরা কিনছে, চাঁদে হিলটন কোম্পানি হোটেল বানাচ্ছে এবং লোকেরা অগ্রিম ঘর বুক করছে, জানেন ?

—আমি মফস্বলে থাকি। পুরো ব্যাপার জানিনে। তবে কাগজে দেখেছি। লোকেরাও মাঝে মাঝে বলাবলি করে। সত্যি কথা কি আমি এখনো এই ব্যাপারটা ভালো বুঝে উঠতে পারিনি। চাঁদে কার জমি কে বিক্রি করছে ? কার জমিতে কে হোটেল বানাচ্ছে ? তারা হোটেল বানাবার অনুমতি কোত্থেকে পায় ? কে তাদের জমির দখল দিল ? কারা সেখানে থাকবে ? কবে ? কতো শতাব্দী পরে ?

দাম বলুন।

—আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

—কেন বুঝতে পারছেন না ?

—আমার অতীত কিনে আপনি কি করবেন ?

—ব্যবসা করবো !

—বিস্ময়কর··

—আপনি অকারণে পরপর বিস্মিত হয়েই চলেছেন। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অতীত নিয়েও ব্যবসা করা চলে।

—কি ব্যবসা ?

—কেনা-বেচা !

—মানে আমার অতীত আপনি কার কাছে, কিভাবে বেচবেন ?

—সে সব আমার ব্যাপার। আপনি দাম বলুন।

—কিন্তু ব্যাপারটা আমার মাথায় ঢুকছে না…

—কেন ঢুকবে না, খুবই সোজা ব্যাপার। লোকেরা রক্ত বিক্রি করে, জানেন ?

—হ্যাঁ, সে তো আকছার করে। আগে আরো বেশি করতো। এখন বোধহয় একটু কমে গেছে।

—এখন লোকেরা কিডনি বেচে, চোখ বেচে অন্যান্য অঙ্গপ্রতঙ্গও বেচে, জানেন ?

—হ্যাঁ, তা শুনেছি কিন্তু এসব জিনিস তো চোখে দেখা যায়, একটা ব্যবহারিক মূল্যও আছে, অতীতের কি এমন ব্যবহারিক মূল্য থাকতে পারে ?

—ব্যবহার করলেই ব্যবহারিক মূল্য তৈরি হয়। ব্যবসায়ীদের কাজ কোনো নতুন জিনিসের ব্যবহার শেখানো। এছাড়া দেখা না দেখার প্রসঙ্গে বলি—যা কিছু আপনি দেখেন তাই শুধু বিক্রি হয়, আর যা কিছু দেখেন না তা কেনেন না এমন নয়।

—যেমন ?

—যেমন, কোনো কোনো অসুখে রুগীকে অক্সিজেন দিতে হয়। অক্সিজেন আপনি দেখতে পাবেন ?

—তা ঠিক কিন্তু তবু তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বোঝা যায়, রুগী সুস্থ হয়ে

দের বরঞ্চ শাইলকের চর, চেলা অথবা অনুগৃহীত বলতে পারেন। যাইহোক, মূল প্রসঙ্গে আসি—আপনি কি বিক্রি করতে চান, বলুন ?

হ্যাঁ, এতোক্ষণে ঠিক সময় এসে গেছে। লোকটা বার বার কেনার কথা তুলছে। তার মানে ষোল আনা আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এবার টুক করে ছুঁড়ে দিলে গিলে নেবে। দামটাও আশা করি ভালোই পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে আমি একেবারে আনপড় নই। রীতিমতো শেক্স-পীয়রের সমালোচনা করে ছাড়লাম। আশাকরি এখন থেকে একটু অন্য চোখে দেখবে। গরীব হতে পারি কিন্তু নির্বোধ নই। উহ্ ! নিজেকে বুদ্ধিমান প্রমাণ করার কি প্রাণান্তকর চেষ্টা ! আমার বোধ বুদ্ধি দিয়ে এলোকের কি হবে ? সে চায় ব্যবসা। তার যদি পোষায় আমার জমি কিনবে নইলে না। আমার জ্ঞানবুদ্ধি-পাণ্ডিত্যে তার কিছুই আসে যায় না। যতোসব ! আসল কথাটা না বলে শুধু ভ্যানতাড়া ! যাক্ এবার বলেই ফেলি। এখনই ? না, আর একটু পরে। মানে দুচারটে অন্য কথার মধ্যেই টুক করে জমির কথাটা ছুঁড়ে দেবো। তার আগে ছোট্ট করে একটু ভূমিকা দিয়ে নিই। আরে, সবাই কি আর নির্লজ্জ ব্যবসায়ী না কি ! ঠেকায় পড়ে জমি বেচতে হচ্ছে, এটা বলতে কি খুব ভালো লাগে ? বিশেষত যার নাক কান এখনো কাটা যায়নি, ছিটে ফোঁটা হলেও সম্ভ্রমবোধ আছে ! আরে বলছি, বলছি, এখনই বলে ফেলবো। তার আগে একটু অন্য দিকে ঘুরে আসি।

সিকান্দার তখনো পুরো সংকোচ কাটিয়ে জমির কথাটা তুলতে পারছে না। সে শাইলকের কথার পিঠে কথা জুড়ে বলল—বিক্রি ? তা অতীত ছাড়া আমার আর তেমন কিইবা আছে

—আমরা আপনার অতীত কিনতে পারি !

—কি বলছেন !

—বলুন, আপনার অতীতের দাম কতো ?

—আপনি তামাশা করছেন।

—না। আপনি বলুন, আপনার অতীতের দাম কতো ? আমি এক্ষুণি, এখানেই আপনার দাম মিটিয়ে দেবো !

—আশ্চর্য !

—কিছুই আশ্চর্য নয় মিস্টার সিকান্দার। আপনি আপনার অতীতের

হযতো তখনকার চালু ইংরেজ সেণ্টিমেণ্টকে গুরুত্ব দিতে গিযে, আবো পবিষ্কার ক'বে বললে, অশিক্ষিত ইংবেজ পাবলিকেব মনো-বঞ্জন করতে চেযে তাঁকে অমন অশালীন একটা চবিত্র বানাতে হয়েছিল। খুবই অন্যায়, অত্যন্ত জঘন্য কাজ করেছিলেন একথা বলতেই হবে। শত শত বছর ধবে এই সব অসাহিত্য কু সাহিত্যকে ঢাক ঢোল পিটিযে ইংবেজরা মহৎ সাহিত্য বলে চালিযেছে। প্রকাবান্তবে সাবা দুনিযায ওবা ইহুদী-বিদ্বেষ ছডিযেছে। হিট-লাবেব ইহুদী নিধনেব মূলে শেক্সপীযবের এই জঘন্য নাটকটিব ভূমিকা কম নয। নাটকটাও একটা বাজে নাটক। কোন সাহিত্য-মূল্য নেই। যুক্তিহীন ভাঁডামোব পব ভাঁড়ামো। ওটা নাইন টেনেব ছেলেমেযে লিখলে মানা যায় কিন্তু শেক্সপীয়ার না, কিছুতেই মানতে পাবা যায় না।

—অপনি মূল প্রসঙ্গ থেকে সবে যাচ্ছেন। বোধহয আপনি ভাবছেন, আমি ইহুদী হযেও চেপে যাচ্ছি। না, একেবারেই না। আপনি আমাব কথা বিশ্বাস করুন। আগে একটা সময ছিল, যখন ব্যব-সাযীদের কোনো একটা ধর্মবিশ্বাস থাকতো, অথবা অন্যভাবে বলা যায—প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদাযেব ভেতর একদল লোক জীবিকা হিসেবে কিংবা পেশা হিসেবে ব্যবসা কবতো। এখন ঠিক উল্টো, একদল লোক, তারা আগে যে ধর্মেই বিশ্বাসী থাকুক না কেন ব্যবসা করতে এসে আগেব ধর্মবোধ থেকে সম্পূর্ণ সরে গিযে নতুন ভাবে এই বাণিজ্যধর্মে দীক্ষা নিয়েছে। বলতে পারেন এরা কনভার্টেড। ধর্মান্তবিত।

—চমৎকাব বললেন। তাহলে এই নবদীক্ষিত কিংবা ধর্মান্তবিত লোকদেব কাবো কাবো নামঃশাইলক ?

—ঠিক বলেছেন। এটা একটা উপাধি বলতে পারেন আবার নামও বলতে পারেন। অর্থাৎ একই সঙ্গে নাম এবং উপাধি। তবে উপাধি হলেও সবাই এমন উপাধি পায তা ভাববেন না। কিংবা অন্যভাবে বলা যায়, সবাই এমন নাম নিতে পাবে বা পেতে পারে তাও নয। এর জন্যে একটা পর্যাযে উঠতে হবে। অর্থাৎ খুব বড় মাপেব ব্যবসায়ী না হলে তাদের শাইলক বলা চলে না। ছোট ব্যবসাযী-

এবং দরিদ্র ··

—ব্যাখ্যা করাব দরকার নেই। আপনি যে অর্থবান নন তা যে কেউ আপনাকে দেখে বুঝবে। আমি চাই আমাকে দিযে আপনাব কোনো উপকার হোক। তাছাড়া আব একটা কথা, ব্যবসাযীদের কাছে ধনী দরিদ্রেব পার্থক্য নেই। বিশেষ করে যখন আপনি ব্যবসাব প্রসঙ্গে ভাববেন। গবীব লোকেরা যেমন আমাব খরিদ্দার বড লোকেবাও তেমনি। উল্টো ভাবলে আমবা গরীব লোকেব জিনিসও কিনি অর্থবানদের মালপত্রও কিনি। আমাদেব কাছে সব সমান। আপনি নির্দ্বিধায বলুন, কি বিক্রি কবতে চান্ ?

—তাব আগে আমাব আপনাব পবিচযটা ভালো ক'বে হোক। আমি একজন···সামান্য সংসাবী মানুষ। ছেলে মেযে বাবা মাকে নিযে মাঝারি সংসাব। তেমন বিশেষ কোনো পেশা বা জীবিকা....আমাব নাম নসীব সিকান্দাব।

—আমাব নাম শাইলক।

—শাইলক! শাইলক কাবো নাম হয ?

—হবে না কেন ? হয তাব প্রমাণ আপনাব সামনেব এই শর্মা।

—সে তো শেক্সপীযরেব বইতে পড়েছিলাম—আব কোথাও তো শুনিনি।

—শেক্সপীয়ব হাওযা থেকে নামটা পাননি। কাবো না কাবো ছিল বলেই তিনি নামটা কাজে লাগিযেছিলেন।

—তা হলে আপনি একজন ইহুদী ?

—না। আমাব কোনো ধর্ম নেই। আমার ধর্ম ব্যবসা!

—আপনি তামাশা কবছেন।

—মোটেই না। আপনি বিশ্বাস করুন, যারা যথার্থ ব্যবসাযী তাদেব ব্যবসা ছাড়া আব কোনো ধর্ম থাকতে পাবে না।

—আপনাব কথা কিন্তু হেঁযালিব মতো শোনাচ্ছে।

—অনেক কথা আছে যা হেঁযালিব মতো শোনায কিন্তু সে কথা আর পাঁচটা চালু সত্যেব চেযেও বড সত্য।

—শেক্সপীয়র শাইলক চরিত্রের মাধ্যমে গোটা ইহুদী জাতিকে হেয কবেছিলেন। তাঁর মতো বড়ো শিল্পীর এটা করা উচিত হয়নি।

জমির কথাটা বলবো নাকি ? বলে ফেলবো ? এতো বড়ো ব্যবসাযী যখন এক কথায কিনে নিতে পারে। হয়তো মলযের চেযে আবো বড়ো হোটেল—বিসোর্ট করে ফেলতে পারে । হযতো আমাকেই দেখভাল কবার দাযিত্ব দিতে পারে। বলে ফেলবো ? কত টাকা চাইবো ? একটু বেশি না পেলে মলযকে ছেড়ে এদেব দিযে লাভ কি ? হাজাব হলেও মলয ছোট বেলার বন্ধু। মলয় দুহাজাব করে কাঠা বলছে। বাজারে এখন সত্যি বলতে কি এব চেযে বেশি দব ওঠেনি। তা যদি এবা তিন হাজাব কবে কাঠা দেয তবে এক ধাক্কায কুড়ি হাজাব লাভ। হ্যাঁ, ষাট সত্তব হাজার এক সাথে হাতে পেলে যা হোক কিছু একটা শুরু করা যাবে। বেশ, তবে বলেই ফেলি। একটু বেশি বলবো, চার হাজার কবে কাঠা চাইবো। তাবপর যেখানে গিযে ঠেকে। না, ঠিক এক্ষুণি না। আর একটু বাজিযে দেখি।

—কি হল, কিছু একটা বলুন ? যে কোনো কিছু আপনি বেচলে বলুন কিনলেও বলুন। আজ রাতে আপনার সঙ্গে একটা কারবার হয়ে যাক। জানেন তো, ব্যবসাযীরা লাভেব গন্ধ পেলে ছটফট করে ওঠে।

বস্ এবাব প্রাণ খুলে হাসতে হাসতে কথা বলছে। তাব হাসি দেখে একটু আশাব সঞ্চাব হয। হতে পাবে, এ লোককে দিযেও উপকার হতে পারে। কে জানে, হযতো মলয়ের কাছে যাওযাব দরকার পড়বে না। ছোট বেলাব বন্ধু, পবপর তিনদিন এতো ভোব ভোর করে গিযেও ধবতে পারিনি অথচ কোনো তাপ-উত্তাপ নেই। দুলাইন চিঠি লিখে যা অন্তত কাউকে কিছু বলে যা। 'না কিছু বলে যাযনি।' সেই এক মুখস্ত ডাযালগ। শুনতে শুনতে ঘেন্না ধবে গেছে। তাবপব সেই একই মুখস্ত কথা, চা খাবেন ? যেন খাবো বললেই ঝাঁটা নিয়ে ঝাঁপিযে পডবে, এতো অসভ্য ! দুটো পযসা হয়েছে বলে মানুষকে আর মানুষ জ্ঞান কবছে না। আবে, অকারণে কোনোদিন তোর ছায়া মাড়াই না। কথায় কথায় সেদিন কথা হলো, তুই আগ্রহ দেখালি আমাবও বেচাব দবকার এই তো ব্যাপার। এখন কিনলে কিনে নে, নইলে ছেড়ে দে। অসভ্যের মতো দৌড় কবাচ্ছিস ক্যানো ? যাকগে, এদিক থেকে যদি একটা ব্যবস্থা করতে পারি তো এইসব নতুন জানোয়ারদের কাছে আব যাওয়া লাগে না। লোকটা এবার বুদ্ধিমানেব মতো হিসেব করে কথা বলতে শুরু কবে—দেখুন, কেনার ক্ষমতা আমার নেই। আমি খুব সামান্য মানুষ। সামান্য

যাবে না। যা ভাবার ভাবুক, কথা বন্ধ কবতে পারবো না। আরে, ভুখা নাঙ্গা হতে পারি একেবারে গবেট তো নই। পেটে তো দু-চাব লাইন হলেও বিদ্যে আছে। যে যাই বলুক, বিদ্যে থাকলে ভাষণও থাকে। বিদ্যে আর ভাষণ মা-মেযেব মতো। একটা থাকলে আর একটা থাকবেই। চুলে চুলে সম্পর্ক। হ্যাঁ, কখনো কখনো চুলোচুলি হযে যেতে পাবে, প্রাযই হয। তাই বলে একটা আব একটাকে চেপে দিতে পারবে না। যা থাকে কপালে কথা বলতেই হবে!

—তা আপনি বুঝি ট্রেডার, ম্যানুফ্যাকচাবাব নন?

—সব—ট্রেডার ম্যানুফ্যাকচারার, মার্চেণ্ট, ফিনান্সাব, সব। দাদন, লগ্নি, মহাজনি, বন্ধকী এমন ব্যবসা নেই যা আমরা করি না।

—তবে তো আপনার বিশাল ব্যাপার।

—তা বলতে পাবেন। বিরাট তো বটেই। বিশাল বলতে ঠিক কতোটা বোঝায বলতে পারছি না তবে সারা পৃথিবী জুড়ে আমাদের কাববার চলে।

—তাই?

—তাই।

—আপনি কোন্ দেশের লোক? আপনাকে ঠিক এ-দেশের লোক বলে মনে হচ্ছে না।

—সে অর্থে আমার কোনো দেশ নেই। যেখানে যখন ব্যবসা জমাট বাঁধে সেখানে তখন কিছুকাল থাকতে হয। বিশেষ করে বড় কিছু শুরু করাব আগে ঝোপ খোপ স্বচক্ষে দেখে নিতে হয়।

—তাব মানে এদেশে বড় কিছু শুরু করতে যাচ্ছেন?

—শুরু করে দিযেছি!

—কি ধবনের?

—কেনা বেচা।

সে তো আগেই বললেন। মানে, কি ধরনেব কেনাবেচা?

—সব ধবনের। যে কোনো জিনিস কিনতে অথবা বেচতে পারি। যা কিছু আপনি ভাবতে পারেন। বলুন, যে কোনো বস্তুব নাম বলুন—আপনাব লাগলে আমরা আপনার কাছে বেচবো, আপনি বেচলে আমবা কিনবো!

আমাব দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে আর আমি মুখ লুকোতে বাইরে তাকাবো। তাই হয় না কি? তা ছাড়া বাইবে তাকাবো কোথায়? বাইবে মানে তো অন্ধকাব। ঘুট ঘুটে অন্ধকাবে চোখ বাখা যায না। তার চেযে এই ভালো, দু পাঁচটা কথা বললে তো আব খেযে ফেলবে না। আমি এমন কিছু খাবাপ কথাও বলছি না। সবচেযে বড় কথা, ওবা তো নিজেবাই আমাব সাথে আলাপ জমাতে চায়। নইলে বাত দুপুবে নিজেদের কামবায টেনে এনে কফি খাওয়াবে কেন? সে পকেট থেকে একটা সস্তা সিগাবেট বের কবে ধবাতে যাবে কিনা ভাবছে। এদের সামনে সিগারেট খাওযা ঠিক হবে? আজকাল তো সিগারেট না খাওযাব ধুম পডে গেছে। বস্ ইঙ্গিত করতেই গোবো এক প্যাকেট বেনসন এণ্ড হেজেজ বাড়িযে দিল। বস্ লোকটার দিকে প্যাকেট এগিযে দিযে বলল—এটা খান।

বাব্বা! একেবারে বেনসন! দুনিয়ার সেরা সিগারেটের একটা! আজ কার মুখ দেখে উঠেছি! সে প্যাকেটটা নিযে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে। কেমন একটা সংকোচ বোধ হচ্ছে। নিজের পোশাক পবিচ্ছদের দিকে চোরাচোখে একবাব তাকায়। গাড়ির টিমটিমে আলোতেও তার দারিদ্র এতো প্রকট যে সংকোচ আরো বেড়ে গেল। সংকোচ কাটাতেই সে দক্ষ হাতে প্যাকেট খুলে একটা ধবায়। তারপর প্যাকেটটা বস্‌কে ফেরত দিতে তার দিকে বাডিযে ধবে।

—আপনাব কাছেই রাখুন। আমি সিগ্রেট খাইনা।

—সে কি, আপনি খান না অথচ সঙ্গে রাখেন?

—ব্যবসায়ীদের এমন অনেক কিছুই সঙ্গে বাখতে হয, যা তারা নিজেবা ভোগ করেনা।

—তা অবশ্যি ঠিক।

আবার! ব্যবসায়ীদের সম্পর্কে আমি কি জানি? আমার চোদ্দপুরুষের কেউ কোনো কালে ব্যবসা-বাণিজ্যেব ধাব ধারেনি। আব আমি কিনা পাকা ব্যবসাযীব সামনে পাকা ব্যবসাযীব মতো বাতেলা মাবছি! এই জন্যেই আমাব কিছু হল না। যেখানে যা নয সেখানে ঠিক তাই বলে ফেলবো। মাঝবাতে গরম কফি পেযেছিস খা, দুনিয়ার সেরা সিগ্রেট পেযেছিস খা, আরো যদি কিছু আসে বিনা বাতেলায় সাবড়ে দে। ওদের আছে, দিচ্ছে, গরীব ভুখা খেয়ে মর। অবান্তর ভাষণে দরকার কি? তাই বলে চুপচাপ থাকাও

কাপ বাড়িয়ে দিলে হাতে নিযে বস্ বলল—এবাব খান। চিন্তার কিছু নেই। এটা নির্ভেজাল কফি।

তবু চিন্তাব কিছু থেকে যায় বই কি! কাপটা তো আর আমাব নয। আগে কিছু মিশেল দেযা আছে কিনা কে জানে। লোকটা তবুও কফিতে চুমুক দিচ্ছে না দেখে বস্ আবার তীক্ষ্ণ চোখে ওব দিকে তাকাল। নিজেব কাপটা বাঁ হাতে রেখে ওর কাপটা ডান হাতে টেনে নিযে নিজেই প্রথমে চুমুক দেয। তাবপব একটু হেসে বলল—আপনি খুব সতর্ক লোক। সতর্কতা ভালো। বেশ, এবাব একাপ থেকে নিশ্চিন্ত মনে খান। আমবা চোব ডাকাত নই। ব্যবসাযী। খান।

বাবা! ভাবার আগেই সব বুঝে ফেলে। এতো দেখছি রীতিমতো অন্তর্যামী! লোকটা বসেব কাপটা হাতে নিয়ে এবার কিছুটা সাহস করেই চুমুক মাবে। দাবুন! এমন কফি জীবনেও ঠোঁটে ছোঁযাযনি। সে এবার তাবিযে তাবিযে কফিটা শেষ কবে। তৃপ্ত চোখে বসেব দিকে তাকায়। কৌতূহল বশত প্রশ্ন করে—কিসেব ব্যবসা আপনাব?

প্রশ্নটা কবেই কেমন একটু সংকোচ লগে। এ লোক যে সে লোক নয বোঝাই যাচ্ছে। তার পোশাক-আশাক হাবভাব মুখেব ভঙ্গি ঠিক সাধারণ মানুষেব মতো নয। বেশ বড় সড় একটা ব্যাপার আছে, সত্যি বলতে কি ঠিক এই ধবনেব মানুষেব সঙ্গে লোকটা জীবনে কখনো সামনা-সামনি বসার সুযোগ পাযনি। একেবারে সরাসবি এমন প্রশ্ন না কবে একটা সম্মানজনক সম্বোধন করা উচিত ছিল। যেমন স্যাব, স্যার বললে ভালো হতো। স্যার বললে লোকে খুশি হয। কিন্তু অন্য একটা ব্যাপাব আছে, ভেতো বাঙালিরা ভেতরে ভেতবে এক ধরনেব চাপা অহংকারী, সহজে কাউকে স্যার বলতে মুখে বাধে। সেক্ষেত্রে অন্তত দাদা বলা যেত। লোকটা কি ভাবছে কে জানে। কতো বড মানুষ তাই বা কে জানে! শেষকালে আবাব হিতে বিপবীত না হয়। কি দবকার ছিল এসব আলফাল প্রশ্ন করাব? এ লোকেব ব্যবসা দিয়ে আমাব কি কাজ? নিকুচি কবি জিভের! এই জিভের জন্যেই সাবা জীবন পস্তে গেলাম। যেখানে যা বলার নয়, ঠিক সেখানে তাই বলে বসবে।

—কেনা বেচা।

যাক, বিরক্ত হযনি। তাহলে কথাবার্তা চালিয়ে যাওযা যায। এক গাদা লোকের সামনে বোকার মতো বসে থাকা তো আরো বোকামো। সবাই

—তোলো তবে একটু খেলিয়ে তোলো ! কারো উপকার করার আগে তাকে ভালো ভাবে বুঝিয়ে দাও যে সে যা পাচ্ছে তা সুলভ নয়। তবেই সে অন্তত কিছুকাল মনে রাখবে।

—আব বোঝাতে গেলে উপকাব কবাই হবে না !

—তা হলে এটাই মোক্ষম সময়।

তুবাল ইঙ্গিত কবলে ছুটন্ত লোকটার হাত ধরে গোবো তাকে একঝটকায় গাড়িতে তুলে ফেলে। ছুটতে ছুটতে লোকটা এতো ক্লান্ত যে ভালো ভাবে হাঁপাতে পর্যন্ত পারছে না। ওই অবস্থা দেখে ওদের একজন সবে গিয়ে তার বসাব ব্যবস্থা করে। সে বসতে গেলে বস্ তাব সামনের আসনটা দেখিয়ে সেখানে বসাব ইঙ্গিত দেয়। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বসের সামনে বসল। গোবো এবাব দরোজার কাছে থেকে সরে এসে ওদের সামনে দাঁড়ায়।

—কফি ! বসেব নির্দেশ পেযে গোবো ফ্লাস্ক্ থেকে কফি ঢেলে লোকটাব দিকে কাপটা বাড়িযে ধরে। লোকটা কফির কাপ হাতে নিয়ে ওদের দিকে তাকায়। মেবেছে ! বাত দুপুবে কাদেব পাল্লায পড়লাম ! এদের চেহারা ছবি ডাকাত গোছের না হলেও কেমন যেন অস্বাভাবিক। এরা কোন্ দেশের লোক ? এতো রাতে কোথায চলেছে ? সঙ্গে দেখি কয়েকটা মেয়েও আছে, এদেব কি ভয় ডর নেই ? এ দেশের অবস্থা জানে না, নাকি এরা নিজেরাই ডাকাতেব দল চালায ? আজকাল গাড়িতে ছিনতাই বাহাজানি খুন কি না চলছে ? তাছাড়া বোজই সব নতুন নতুন ফন্দি আবিষ্কার হচ্ছে। নতুন নতুন কাযদায যাত্রীদের সর্বনাশ করা চলছে। কাগজে তো প্রাযই লেখে—ডাকাত দলের লোকেরা যাত্রীদের সাথে ভাব জমিযে ওষুধ মেশানো চা কফি খাইয়ে ঘুম পাডিয়ে দেয। তারপব ঘুমন্ত লোকেব যথাসর্বস্ব লুট ক'বে কেটে পড়ে। কেউ কিছু বুঝতে পাবে না, জানতে পাবে না, হল্লা নেই আওযাজ নেই, টুঁ শব্দটি নেই, অথচ লুটেব কাজও নির্বিঘ্নে সমাধা হয়। লোকটা কফিব কাপ হাতে বেখে ওদের ভালোভাবে লক্ষ কবে। চুমুক দেওযাব সাহস হয না। চিনি না জানি না, কোনো কালেও এদের এলাইনের গাডিতে দেখিনি। লোকগুলোও যেন দেখতে কেমন কেমন। শেষকালে কফি খেযে বিপদে না পড়ি।

লোকটা কফি হাতে নিযে দ্বিধা করছে বুঝে বস্ তার দিকে তাকিযে মৃদু হাসল। তারপর গোবোকে আর এক কাপ ঢালতে ইঙ্গিত করে। গোবো কফির

নেই, ব্যবসা-বাণিজ্য নেই শুধু এক চিমটে জমির ওপর কি ছ-সাত জনের সংসার চলে ? না, এভাবে চলবে না। যে ভাবে হোক বিকল্প পথেব সন্ধান কবতে হবে। যদি মলয় জমিটা নেয় ভালো, নইলে আর কাউকে ধরতে হবে। আসলে অন্য কেউ নেযার চেয়ে মলয নিলে একটু সুবিধে আছে। ওব কাছে জমিব দাম ছাড়াও ধার হিসেবে উপরি কিছু চাওয়া যাবে। আশা কবা যায, আপত্তি কববে না। ছোটবেলাব বন্ধু, হাড়ির-নাড়িব খবর সব জানে। কিছু একটা কবতে চাই শুনলে কিছু ধার কর্জ দিতে না করবে না। তবে জমিটা কিনলেই এ প্রসঙ্গে বলা যাবে। নইলে আগবাড়িযে শুধু ধার চাওয়া যায না। সম্পর্ক অতোটা গভীব নেই আব। যাই হোক কাল সকালে এসপার ওস্পার কবেই তবে বাড়ি ফিরবো। হয় মলয নেবে নইলে এদিকে যারা কিনতে চাইছে তাদেব কাউকে ধরবো। কালকের মধ্যেই যা হোক কিছু একটা কবে ফেলতে হবে। আর দেবি করা যাচ্ছে না। যতো দেরি হচ্ছে ততো সমস্যা বাড়ছে। শেষ কালে এমন হবে যে, জমি বেচে যা পেলাম তা খুচরো দেনা শোধ কবতেই বেবিযে গেল। তখন কি হবে ? বেচার মতো তখন চোখ কান হাতপা ছাড়া আব কিছু থাকবে না !

তিন

আবে, গাড়ি যে বেবিয়ে গেল ! ছোটু, আবো জোরে, আরো জোরে ! কলার খোসা ফোসা নেই তো ! যা থাকে কপালে। এ গাড়ি ধরতেই হবে। আব একটু, আর একটু জোরে। আরে দেখ কাণ্ড দরোজা আটকে বেয়াক্কেলটা দাঁড়িযে আছে, সববি তো ! কি আশ্চর্য ! উঠতে দেবে, না কি—মহামুশকিল !

ওকে প্রাণপণে ছুটতে দেখে সবাই ওব দিকে তাকায। খানিকটা কৌতূহলে খানিকটা কৌতুকে। উঠতে পারবে তো ? না, মনে হচ্ছে, পাবতেও পাবে। আব একটু জোবে ছুটলে হয়তো পেরে যাবে। কিন্তু গাড়ি স্পিড তুলে দিয়েছে। এসব বৈদ্যুতিক ট্রেনেব স্পিড তুলতে কযেক সেকেণ্ডও লাগে না। না, লোকটা বোধ হয আর পারল না। না হে, আবাব এগিযে আসছে। হয়তো পেবে যাবে। পাববে বললে তো আর পাবা যায না। দবোজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে গোবো। বসের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত সে দবোজা থেকে সববে না।

তুবাল বসের দিকে তাকায। চোখাচোখি হতে জিগ্যেস করে—তুলবো ?

আসে ভোর চাবটে নাগাদ। বাড়ি থেকে স্টেশান অব্দি ভ্যানরিক্সা পেলেও আধঘণ্টা, তাব মানে রাত সাড়ে তিনটে। বেরুবার প্রস্তুতি নিতে অন্তত আরো আধ ঘণ্টা। তাব মানে তিনটে। বাত তিনটেয় ঠিক ঠিক ঘুম ভাঙা, হাত মুখ ধোবা, জামা কাপড় পবা তাবপব ভ্যানরিক্সা পাওযা সোজা ব্যাপাব না। এ ছাড়া এখন বৃষ্টি বাদলার দিন। ঠিক বেরুবার মুখেই যদি ঝম-ঝমিযে বৃষ্টি নামে তো হযে গেল! তার চেযে এই ভালো। এ গাড়ি ঝিমিযে ঝিমিযে সেই ভোব নাগাদ শিযালদা পৌঁছাবে। আব যদি ভালো মানুষেব মতো ঠিক সমযে মানে মাঝরাতে পৌঁছায তো মন্দ কি, স্টেশানে চা ফা খেযে ঘণ্টা দুযেক সময় কাটাতে পারলেই হল, ভোর ভোব কবে বাস ধরে ছ'টাব আগেই মলযেব বাড়ি পৌঁছে যাওযা যাবে। কি আর করা! গরজ বড বালাই। নইলে কি আব বাত দুপুবে বেরুতে হয়? ওকে পাওযা দরকাব। যে কোনো উপাযে একটা পথ বেব কবতে হবে। দিন যে আর চলে না। দিন যদি না চলে তবে আর জীবন চলে কি ভাবে? সংসাব বেড়ে যাচ্ছে, ছেলে মেযেরা বাড়ছে, তাদেব চাহিদা বাড়ছে অথচ চাহিদা মেটাবার মতো অর্থকড়িব যোগান নেই। সামান্য যেটুকু জমিজমা আছে তাতে আব কুলিয়ে উঠছে না। আগে সংসার ছোট ছিল, জিনিস পত্রেব দাম কম ছিল। মোটা মুটি টেনে টুনে চলে যেত। এখন টেনেটুনেও আর চলছে না। বিকল্প ব্যবস্থা না কবতে পারলে সামনে বিপদ।

বাড়িব সামনে বাস রাস্তার পাশেই বিঘে খানেক জমি আছে। আজকাল গাঁ-গেবামেও নানান ব্যবসা বাণিজ্য কলকাবখানা চালু হচ্ছে, বিশেষ কবে বাস বাস্তাব দু'পাশে। মলয ছোটবেলার বন্ধু। টাকা পযসা কবেছে। জমিটা কিনতে উৎসাহী। একবাব বলছে বাগান বাড়ি কববে। একবার বলছে হলিডে হোম কববে। আজকাল নাকি এসব হলিডে হোম-রিসোর্ট ধাঁচের হোটেল ব্যবসায খুব বমবমা। সে যা পারিস কবগে। যাব এমনিতে বমবমা তার নতুন কিছুতে আবো বমরমা হবে সে আর বিচিত্র কি। এখন ভালোয ভালোয জমিটা বেচতে পাবলে নগদ টাকাটা দিযে একটা ছোটখাটো কিছু শুরু কবা যাবে। নইলে বাচ্চা কাচ্চা নিযে একেবারে দাঁড়িযে দাঁড়িযে শেষ হয়ে যেতে হবে। এটুকু জমি ছাড়া বেচাব মতো আব হাতে কিছু নেই। একটু একটু করে, একটা একটা কবে সব গেছে। যাবে না কেন, খবচা বাড়ছে অথচ আয কমছে। আয কমছে মানে কি, পুরোপুবি শূন্য। চাকরি বাকরি

॥ উপন্যাস ॥

শাইলকের বাণিজ্য বিস্তার

শাহ্‌যাদ ফিরদাউস

এক

শেষ গাড়ি।

যে কোনো মূল্যে গাড়ি ধরতেই হবে। এদিকে কাউণ্টারে লোক নেই। ওরা ভেবেছিল, আর প্যাসেঞ্জারের ঝামেলা হবে না। রাতের শেষ গাড়ির শেষ যাত্রী উঠে গেছে। আজকের মতো শান্তি। কিন্তু শেষ মুহূর্তে আর এক-জন এসে চিৎকার চেঁচামেচি লাগানোয় আবার কাউণ্টারে ফিরে আসতে হয়। এই ফিরে আসার ব্যাপারটা বিরক্তিকর। রাত অনেক। ঘরে ফেরার তাড়া আছে, হিসেব নিকেশের পাট চুকিয়ে দেয়া হয়েছে, তারপর ফের উৎপাত। কাউণ্টারের লোকটা ধীর পায়ে এসে ধীর গতিতে কাউণ্টারে বসে। গাড়ি পারলে ধরবে না পারলে না তাতে কাউণ্টারের কি যায় আসে? কিছুই না! কিন্তু যে বেচারা কাউণ্টারের সামনে আছে তার তো অবস্থা খারাপ। গাড়ি ছাড়ার হর্ন বেজে গেছে, গাড়ি চলতে শুরু করেছে, এখনো টিকিট হাতে নেই। অথচ কাউণ্টার পেরিয়ে প্লাটফর্ম, প্লাটফর্মটা কমসে কম বিশ পঁচিশ ফুট চওড়া, এতোটা দৌড়ে তবে গাড়ি ধরার ব্যাপার। তাছাড়া গাড়ি চলতে শুরু করেছে তার মানে গাড়ির সাথে সাথে খানিকটা ছুটতে হবে। আরে, এখনো টিকিট হাতে এল না! আবার চিৎকার চেঁচামেচি, অবশেষে টিকিট হাতে পাওয়া তারপর পড়িমরি ছুট্। যে কোনো মূল্যে গাড়ি ধরতেই হবে। কেন, কোথায় যাওয়া হবে? শেষ যাত্রায়?

দুই

যেতেই হবে। পর পর তিন দিন গিয়েও মলয়কে ধরা যায়নি। আগেই বেরিয়ে গেছে। মছলন্দপুর থেকে শিয়ালদা, শিয়ালদা থেকে আবার টালিগঞ্জ—সকাল সাতটার আগে পৌঁছানো সম্ভব? সম্ভব, যদি প্রথম গাড়িটা ধরা যায়। তবে ঝঞ্ঝাট বেশি ছাড়া কম নয়। প্রথম গাড়ি স্টেশানে

ভট্টাচার্যের স্মৃতিতে প্রতি বছর কতখানি গুরুত্ব দিয়ে নিমাই তাঁর জন্মদিন পালন করত নাটক বক্তৃতা গান কবিতায়—তা ভোলার নয়। গৌড় নাট্য-রসিকেরা জানেন, নিমাই ছাড়া আর কেউ ধারাবাহিক ভাবে এ-কাজ করেন নি।

মধ্যপর্বে নিমাই একটি যাত্রা পালা সংস্থা গঠন করে—গন্ধর্ব অপেরা। বিভিন্ন সময়ে নিমাই মহেন্দ্র গুপ্ত, উৎপল দত্ত, সমরেশ বসু, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সমীর লাহিড়ী, শ্যামল ঘোষ, বিভাস চক্রবর্তী-সমেত অনেক বিশিষ্ট ও বিখ্যাত লেখক, নাট্যকার, নাট্য পরিচালক ও অভিনেতাকে সংস্থার সঙ্গে যুক্ত করতে পেরেছিল। তবে, গন্ধর্ব অপেরার সাফল্যের পেছনে নিমাই-এর অভিনেত্রী-সহধর্মিনী ছন্দা চট্টোপাধ্যায়ের নিরলস ভূমিকা সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে।

বছর তিনেক আগে নিমাই একদিন পরিচয় পত্রিকার দপ্তরে এসে হাজির হয়। তারপর থেকেই পরিচয়-এর একজন নিরলস ও দায়িত্ববান কর্মী বিশেষ সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। মৃত্যুর পূর্বাহ্নেও বলশেভিক উদ্যম ও দায় নিয়ে সে এই কাজ করে গেছে। কিছুদিন আগে, যথারীতি হাসি হাসি মুখ নিয়ে পরিচয় দপ্তরে এসে আড্ডা দিয়ে নিমাই যখন বেরিয়ে যায়, তখন আমরা কেউ ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারি নি, এই তার শেষ যাত্রা।

ব্যক্তিগত ভাবেও পরিচয় পত্রিকার তরফ থেকে নিমাই-এর শোকতপ্ত পরিবার-কে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

অমিতাভ দাশগুপ্ত
সম্পাদক, পরিচয়

বিদায়, নিমাই শূর

নিমাই শূরের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৫৭ থেকে। তখন সে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির বাগনান লোক্যাল কমিটির সম্পাদক। এক বছরের জন্য এম এ-ক্লাশে পড়া স্থগিত রেখে পানিত্রাস হাই স্কুলে বাংলার মাস্টারিতে লেগেছি। সেখানে হঠাৎ এক দুপুরে বিশিষ্ট গণসঙ্গীত গায়ক হারাধন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিমাই এসে হাজির। আমাকে শিক্ষকদের বিশ্রামের ঘরে থেকে প্রায় ফুসলে বাগনানে ওর বাড়িতে নিয়ে গেল। গিয়ে দেখি, ওদের দোতলা মাটির বাড়ির ওপরকার একটি ঘরে বসে আছে পূর্ণেন্দু পত্রী।

বাগনানে তখন আই পি টি এ-র খুব রবরবা। লাগোয়া অঞ্চলগুলিতে তো বটেই, দূরের বিভিন্ন এলাকাতেও তখন সংস্থার প্রাণপুরুষ নিমাই-এর পরিচালনায় নিয়মিত অভিনীত হচ্ছে 'নীলদর্পণ'। মনে হয়, দু-একবার 'রাহুমুক্ত'-ও হয়েছিল। ঐ ভ্রাম্যমান নাট্য সংস্থার সঙ্গে সেঁটে গিয়ে কত গাঁ-গঞ্জও যে ঘুরে বেড়িয়েছি সে-সময়, তার হিসেব নেই।

মনে পড়ে, নিমাই অসামান্য সংগঠন ক্ষমতার পরিচয় দিয়ে কিভাবে বাগনানের বুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন সফল করে তুলেছিল। এখনও স্মরণে আছে, ঐ সম্মেলনে আগত এক লোকগায়কের গান—"আমি থাকি দূরে দূরে, / ডেকে আনে নিমাই শূরে।" নিমাই-এর মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্যভাবে আমার স্মরণে এসে গেল তার অকালপ্রয়াত, প্রথম স্ত্রী আরতি-র কথা, যে ছিল আমাদের সর্বকর্মের ইন্ধনদাত্রী।

রাজনীতিই করুক আর সংগঠনই করুক, আবেগপ্রবণ নিমাই-এর শোণিতে সব সময় বহমান ছিল নাটক। বাগনানের পাট চুকিয়ে কলকাতায় এসে সে 'আনর্তম' নামে একটি নাট্যসংস্থার প্রতিষ্ঠা করে। এই দল কয়েকটি নাটক অভিনয় করেছিল। দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাই বারিক' বেশ কয়েকবার সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজক ও পরিচালক—দুই-ই ছিল নিমাই।

এই পর্বেই বাংলা নাটকের কিংবদন্তি বিজন ভট্টাচার্যের সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। মূলত তাঁরই প্রেরণায় বেঙ্গল থিয়েটার ও পরে ক্যালকাটা থিয়েটারে যুক্ত হয় নিমাই এবং অচিরাৎ সংস্থার প্রথম সারির নাট্যকর্মী হয়ে ওঠে। ক্যালকাটা থিয়েটার-পরিচালিত বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন', 'গর্ভবতী জননী', লাশ ঘুইর‍্যা যাউক' ইত্যাদি মঞ্চসফল নাটকে সে খালি অংশ গ্রহণ করেনি, অনেক সময় পরিচালনার দায়িত্ব-ও গ্রহণ করতে হয়েছে তাকে। বিজন ভট্টাচার্যের মৃত্যুর পর ক্যালকাটা থিয়েটারকে বাঁচিয়ে রাখতে, এক কথায়, সে নিজেকে পুরোপুরি নিংড়ে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, প্রয়াত বিজন

তা ঘটছেও। ধনতন্ত্র সম্পর্কে সর্বত্র সব দেশে সব প্রত্যন্ত প্রদেশে জড়িয়ে পড়ার ফলে যে আঞ্চলিক (spatial) সম্প্রসারণ অতীতে অনেক সমস্যার নিরসনে সহায়ক হয়েছে তার আর কোনও সুযোগ থাকছে না। সর্বজনীন হয়ে ওঠার যে ঝোঁক (impulse) কাজ করছে তা তার শক্তির পরিচায়ক নয়। এই বৃদ্ধি, এই প্রসারিত তার একটি ব্যাধি। অসাধ্য ব্যাধি। এটা সমস্ত সমাজকে ধ্বংস করে দেয়। (It's a disease a cancrous growth, If It destrap the social fadric just as it destraps nature (Hood MR june 1997 p 8) এটা একটা অন্তর্দ্বন্দে বিদীর্ণ পক্রিয়া। ধনতন্ত্র বিদীর্ণ প্রক্রিয়া। ধনতন্ত্র এমনই একটা বন্দোবস্ত যা সর্বজনীন ভাবে সাফল্য অর্জন করতে পারে না, যা সকলের জন্য জীবনমুখী প্রয়োজন পূরণ করতে পারে না, নিরাপত্তা আনতেও পারে না। ধনী ও দরিদ্রের দ্বন্দ্ব যেরকম সর্বজনীন হতে পারে তাই হয়ে উঠছে।

অন্তর্দ্বন্দ্বের নানা দিকের তীব্রতা বৃদ্ধি ঃ

শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলা এখন আর ফ্যাশন নয। ধনতন্ত্রেকে অতিক্রম করে (beyond capital) সমাজতন্ত্রের অভিমুখে যাওয়ায় অর্থে আন্দোলনগুলিকে এখানে বলা হচ্ছে শ্রেনীসংগ্রাম। কিন্তু ধনতন্ত্রের সর্বজনীতার প্রবণতাই শ্রেণী সংগ্রামের নতুন নতুন সুযোগ উন্মুক্ত করতে পারে, তা করছেও।

সমস্ত কিছুই, বিনোদন বিশ্রাম পর্যন্ত হয়ে উঠছে পণ্য আশির দশকে নির্দোষ হরেক রকম ভোগ্যপণ্য থেকে শুরু করে জীবন-প্রক্রিয়া ধ্বংসকারী ড্রাগ বা মাদক বা গুলি বন্দুকে ক্ষেপনাস্ত্র ভয়ংকর সব পণ্য সামগ্রী নিয়ে পণ্যবাত।

আর একটা দিক হচ্ছে বিযুক্তি, শ্রমিকের নিজের উৎপন্ন এবং এক ধাপ এগিয়ে নিজের শ্রমশক্তির থেকে বিযুক্তি। এমন যেটা চরম রূপ নিয়ে সমস্ত মানবিক প্রযোজনের থেকে সরিয়ে নিয়ে বিযুক্ত করে দিচ্ছে পণ্যোৎপাদনকে (সৌরিন) কিন্তু ধনতন্ত্রের সর্বজনীনতার প্রবণতাই শ্রেণী সংগ্রামের নতুন নতুন সুযোগ উমুক্ত করতে পারে পারে তা উন্মুক্ত করছে। এই পরিস্থিতিতে প্রযোজন হ'ল মার্কসবাদ ও শ্রেণী সংগ্রাম সম্পর্কে চিন্তার নবায়ন। "It is not only that we do not know how to act against capitalism but that we are forgetting even how to think aganst it. Ep Thompson, Historian, socialist MR January 1984. p 10)।

সঙ্গে সঙ্গেই আসছে উত্তর-ফোর্ডিয় সাংগঠনিক রূপ (কল্যাণ পৃ—১১)। জাপানি Lean production Method ও শ্রমিকেব উপর পুঁজিব অবসান পুঁজিব মিশ্রনকে শিথিল কবে নি।

ধনতন্ত্রের totalising effets (সার্বিকীকরণের নানা দিক) সমসাময়িক সমাজ ও সংস্কৃতিব প্রতিটি ক্ষেত্রে এমনই ঢুকে পড়েছে যে মার্কস যে সামাজিক শক্তিকে ধনতন্ত্রের কবব-খননকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন সেই (poletariat) শ্রমিক শ্রেণীও ধনতান্ত্রিক মতাদর্শ ও সংস্কৃতিতে আচ্ছন্ন হযে পড়ছে। শুধু অগ্রসব ধনতান্ত্রিক দেশেই যে এমনটা হচ্ছে তা নয়—আমাদের দেশেও তা ঘটছে। ধনতন্ত্র এমনই সর্বব্যাপক হযে উঠছে।

ওপবে যা বলা হলো তার থেকে এবকম মনে করাটা গুরুতব ভুল হবে যে ধনতন্ত্রেব এই সর্বজনীন হয়ে ওঠা, যাকে বলা হচ্ছে বিশবাযণেব প্রক্রিযা—তা শুধু বর্তমানেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য নয, তা ভবিষ্যতেব পক্ষে অবশ্যম্ভাবী আব তাব ফলে তাব বিরুদ্ধে গণ সংগ্রাম এবং উৎপাদিকা শক্তিব আরও বিকাশেব পরিপন্থী।

কিন্তু এখানেই রযেছে একটি paradox বা ধাঁধা বা হেযালি। উপরে যা বলা হলো তাব মধ্য দিযে মার্কসবাদের সর্বাধুনিক সমালোচকদেব ফুকিযামা থেকে শুরু কবে উত্তর আধুনিক, উত্তর মার্কসবাদীদেব পর্যন্ত নানাজনেব বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হচ্ছে। ধনতন্ত্র একটা সর্বব্যাপী সর্বজনীন প্রকৃতি পেযেছে। আব এটাও ক্রমশ দেখা যাচ্ছে যে, ধনতন্ত্র বেশি বেশি কবে সর্বজনীন হযে ওঠাব পবিনতিতে বেশি বেশি কবে মানুষ ধ্রুপদী মার্কসবাদ ও তাব তাত্ত্বিক দিক (concern) থেকে দূবে সবে যাচ্ছে। মার্কস যখন 'ক্যাপিটাল' প্রভৃতি লিখেছিলেন, তখন পুঁজিবাদেব অন্তর্বিরোধেব কাল। সেই পর্ব থেকে বেরিযে যাবার আব কোনও পথই দেখা যাচ্ছে না। কাজ ও বিকল্প সামাজিক শক্তিব দেখা যে পাওয়া যাচ্ছে না তা শুধু নয। সে বকম শক্তিব আবির্ভাবের সুযোগও থাকছে না। পুঁজিব জযের দম্ভ, উল্লাস জন্ম দিচ্ছে পবাজিতের মানসিকতা।

পুঁজিব এই সর্বজনীন ও বিশবাযিত হযে ওঠাব অর্থ অবশ্য nation state এব অবলুপ্তি বা এমন কি তাব ভূমিকাব গুরুত্ব হ্রাস নয।

কিন্তু মার্কসের পদ্ধতি ও বিশ্লেষণেব মধ্যেই বযেছে এই পবিস্থিতিকে অতিক্রম কববাব সম্ভাবনা। মার্কসবাদের যে relative বা বিশেষ তত্ত্বেব অর্থাৎ ধনতন্ত্র সম্পর্কে তত্ত্বেব কথা আগে বলা হয়েছে তাব মধ্যে রযেছে ধনতন্ত্রেব অসমাধেয় (insoluble) অন্তর্দ্বন্দ্বেব কথা। ধনতন্ত্রেব সংকট ও অন্তর্দ্বন্দ্ব ন্যায অন্যায বা নৈতিকতাব সঙ্গে যুক্ত নয। সে প্রশ্ন বাদ দিযেই ধনতন্ত্রের নিজস্ব গতিবেগ সংকট সৃষ্টি কবছে, মার্কস তা দেখিযেছেন এবং

ভিয়েতনাম এখনও সমাজতান্ত্রিক বলে দাবি করলেও সেখানেও এই প্রক্রিয়া কাজ করছে বলে অনেকেই মনে করছেন।

কিন্তু তিনটি কথা এখানে বলা জরুরি : প্রথমতঃ ধনতন্ত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা বলার মানে এই নয় যে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ভারে পুঁজিবাদ আপনা আপনিই ভেঙ্গে পড়বে এবং ধনতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে সমাজতন্ত্র অবশ্যম্ভাবী। অবশ্য এই অতি সরলীকৃতভাবে একথা এখন কেউ আর বলেন না। যান্ত্রিক বা orthodox দৃষ্টিতে অবশ্য এমনটা ভাবা হয়েছিল কিন্তু অভিজ্ঞতা হলো যে, ধনতন্ত্র শক্তি ও উজ্জীবনের নতুন উৎস ও উপায় বারে বারে খুঁজে পেয়েছে। মার্কস বলেছিলেন "no social order even perishes before all the production for which there is room in it have developed"—যতই সংকটগ্রস্ত হোক ধনতন্ত্রের এখনও দীর্ঘ আয়ু রয়েছে। ঐ preface এই মার্কস লিখেছেন : at a certain stage of their development thc material poductive force of society come into conflict with the existing relation of force from forms or development of the productive force these relation of turns into their fetters Fatal blow on captalism Millibond (p. 12—B)

দ্বিতীয়ত, এখানেই এসে পড়ে রূপান্তরের উপায় হিসেবে মানবিক শক্তির (human agency) বিশেষত শ্রেণী ও অন্যান্য সামাজিক শক্তির সচেতন সক্রিয়তার সমাবেশের কথা। তৃতীয়ত, শ্রেণী ও শ্রেণী সংগ্রাম দিয়ে সব কিছুর ব্যাখ্যা হয় না এবং সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শ্রেণী ভিন্ন অন্যান্য শক্তির কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেই এমন নয়।

এই প্রসঙ্গে এ কথাটি অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পুঁজিবাদের বিশেষত পশ্চিমী পুঁজিবাদের এবং তার সাংগঠনিক রূপের অভাবিত পরিবর্তন। মার্কসের সময় থেকে বিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত পুঁজিবাদের যে সাংগঠনিক রূপটি চালু ছিল তাতে পরিবর্তন ঘটতে থাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই। তারপর যে রূপটি আসে ও প্রায় ষাটের দশক পর্যন্ত চালু ছিল তার নাম ছিল assembly ভিত্তিক ফোর্ডিয় মডেল। তার মূল বৈশিষ্ট্য দুটি বড় বড় কারখানার standardised গণ উৎপাদন আর টেনরীয় পদ্ধতিতে শ্রম বিভাজনকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম স্তরে নিয়ে গিয়ে শ্রমপর্যায়ের উপর নৈর্ব্যক্তিক নিয়মাবলীর প্রবর্তন। (কল্যাণ সান্যাল, বারোমাস, এপ্রিল ৯২)।

কিন্তু প্রযুক্তি বিপ্লবের ফলে সত্তরের দশক থেকেই এই মডেল থেকে সরে আসার ঘটনা ঘটছে একটু একটু করে। পুঁজির নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে জোরের সঙ্গেই বলা হচ্ছে যে, ফোর্ডিয় মডেলের দিন শেষ হয়ে আসার

কার্যকরী বা সার্থকভাবে ধনতন্ত্রের systemic logic বা ধনতান্ত্রিক বন্দোবস্তের অন্তর্নিহিত নিজস্ব logic ব্যাখ্যা করার কাজ করেছেন।

হামেশাই বলা হয় দেড়শ বছর আগে লেখা কমিউনিস্ট ইশতাহারের এখনকার দিনে আর প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? মার্কস ও এঙ্গেলস ভবিষ্যৎবাণীর মত করে সমস্ত চীনা প্রাচীর চূর্ণ করে ধনতন্ত্রের প্রসারের কথা বলেছিলেন এমন একটা সময়ে, যখন ধনতন্ত্র কার্যত ছিল বৃটিশের ভৌগলিক বা স্থানিক গণ্ডিতে আবদ্ধ। (It compels all nations on pain of extinction to accpt the bourgeois mode of production it calls civilisation into their model i. e. to become bourjeos is themselves In one word it creates a world after its own image S. N I. p 102

কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোর প্রায় দুই দশক সময় পরে ১৮৬৭ তে প্রকাশিত Capital-এর প্রথম জার্মান সংস্করণের ভূমিকাতেও মার্কস ও এঙ্গেলস জোরের সঙ্গে ধনতন্ত্রের specificity-র ইতিহাস বিশিষ্টতা স্থান কালের গণ্ডিতে বাঁধা এবং তখনকার মত তার স্থানিক বৈশিষ্ট্য (localised phenomenon) এর কথা বলেছিলেন। আন্তর্জাতিক বাজার অন্য দেশ দখল প সে সব দেশের সম্পদ লুণ্ঠন ইত্যাদি ধনতন্ত্রের বিশ্বের উপর নানা প্রভাব ও ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে যে কোনও গুরুত্ব দেননি তা নয়। Genesis of the Industrial capital অধ্যায়ে তার বর্ণনা ও তাৎপর্যের বিশ্লেষণ রয়েছে। কিন্তু ধনতন্ত্র তখনও সর্বজনীন হয়ে ওঠে নি। সেই মুহূর্তে তা ছিল খুবই স্থানিক phenomenon। তা শুধু যে ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকাতে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, তা অন্তত পরিণত শিল্প-ধনতন্ত্ররূপে ভৌগলিক দিক দিয়ে গণ্ডিবদ্ধ ছিল একটি দেশে, অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে। ঐ ভূমিকাতেই তিনি লিখেছিলেন যে, ভবিষ্যৎ-এ জার্মানরাও ইংল্যাণ্ডের পদাংক অনুসরণ করবে। বলেছিলেন—"De te fabnla marratur." জার্মানদের সতর্ক করে দিয়ে তাঁরা বলেছিলেন—Capital এর বিশ্লেষণ শুধু ইংল্যাণ্ডের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। "The country that is more developed industrially only shows to the less developed in the image of its own future" (পৃঃ ১৯১)।

গোটা বিশ্ব জুড়ে এই প্রক্রিয়া এখন নানা মাত্রায় নানা স্তরে কাজ করছে। প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিতেও ঘটেছে ধনতন্ত্রের restoration বা পুনঃ প্রতিষ্ঠা। তৃতীয় দুনিয়া বলে কথিত অংশের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলিতেও ঘটছে ধনতন্ত্রের অভূতপূর্ব প্রসার। ধনতন্ত্রের এই সর্বজনীন হয়ে ওঠার মধ্যে দিয়ে মার্কসের বিশ্লেষণের যথার্থতা প্রমাণিত হচ্ছে। চীন ও

এই চিন্তাধারার বিশেষ মূল্য রয়েছে সামাজিক শক্তি হিসাবে শ্রেণীর সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে শ্রেণী সংগ্রামেব। এখানে বলে নেওযা যেতে পারে, শ্রেণীকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেও অন্যান্য সামাজিক notion ইত্যাদিব তাৎপর্য মার্কস ও এঙ্গেলস অস্বীকাব করেন নি। তবে অনেক কিছুই অনির্দিষ্ট। পূর্ব নির্ধাবিত সূত্র দিযে তার পুরো হিসেব পাওয়া যায় না। কার্যকাবণ সম্পর্কেব গতিপথে অনেক বাঁক।

মার্কসীয় তত্ত্ব-কাঠামোতে উৎপাদনেব উপব বিশেষ জোর দিলেও, কোনো পর্বে তাই হযে পড়ে অর্থনৈতিক নির্ধাবণবাদ—তাকে কখনোই শুধুমাত্র অর্থনীতিতে আবদ্ধ সমাজ সংস্কৃতির উপাদানেব থেকে আলাদা করে দেখা হয নি।

ইতিহাসেব এই ধাবাতেই এল ধনতন্ত্র। মার্কসবাদেব অন্যতম বিষয বা বিশেষ মূল theme (specific basic theme) হলো এই ধনতন্ত্র। পুঁজি সঞ্চয পুঁজিব কেন্দ্রীকবণ, লাভমুখীমতা এবং দুর্দশাব বৃদ্ধি। মানবিক প্রযোজন থেকে সবে গিযে পণ্যবতি বা পণ্যাসক্তি এবং বিযুক্তি। আজ যখন মার্কসবাদ অচল বনে ফুকিযামাবা ঘোষণা কবছেন তখনই কিন্তু ধনতন্ত্র, যাব law of motion-এব অনুসন্ধানে মার্কস নিজেব জীবনের অধিকাংশ সময ব্যাপৃত ছিলেন। "It is the ultimate aim of this work lay bare the economic law of motion of modern society" to (Capital vol no one p 20)। তা অতীতের যে কোনও সমযের তুলনাব অনেক বেশি বেশি করে একটা universal বা সর্বজনীন মাত্রা নিচ্ছে। আমবা এমন একটা সমযে বাস কবছি বাস্তবপক্ষে যখন প্রথম ধনতন্ত্র একটা সর্বজনীন ব্যবস্থা হযে উঠেছে। ধনতন্ত্রকে মার্কস অবশ্য সমাজ সংস্কাব থেকে বিচ্ছিন্ন বিযুক্ত করে শুধুমাত্র একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে দেখেন নি, ধনতন্ত্র তাঁব কাছে একটা পূর্ণায়বযব সামাজিক জীবনবৃত্ত (সোরীন)। ধনতন্ত্র স্বর্জনীন হযে উঠেছে শুধু এই অর্থে নয যে তা এখন বিশ্বব্যাপী, বিশ্বযাত (global), শুধু এই মর্মে নয় যে আজকেব পৃথিবীতে প্রত্যেকেই ধনতন্ত্রের logic বা যুক্তি অনুসারে কাজ কবছে এবং ধনতান্ত্রিক বন্দোবস্তেব প্রত্যন্ত অঞ্চলে (outermost periphery) যাবা বযেছে এমন কি তাবাও ধনতন্ত্রের logic-এর আওতাভূক্ত হয়ে পড়েছে। ধনতন্ত্র আজ সর্বজনীন এই অর্থেও যে, পুঁজি সঞ্চযের প্রক্রিয়া পণ্যাযন, ও মুনাফার সর্বোচ্চকরণ এবং প্রতিযোগিতা মানুষেব জীবন ও প্রকৃতির প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাব penetration বা অনুপ্রবেশ ঘটেছে এমন ভাবে যে দুতিন দশক আগেও ছিল না। তাই মার্কস আগেব যে কোনও সময়ের তুলনায বেশি প্রাসঙ্গিক, কারণ তিনি অন্য যে কোনো ব্যক্তির থেকে অনেক

গণতন্ত্রই নানা জটিল ধাবাব ঘাত প্রতিঘাতেব মধ্য দিয়ে প্রগতির শেষ কথা, অন্তত উত্তব আমেরিকা এবং ইউবোপে ও জাপানে। আর মাকর্সবাদ যেহেতু ইতিহাসনির্ভব, তাই মার্কসবাদেরও অবসান ঘটেছে। আব একথাও বোধ হয় অস্বীকাব কবা যায না যে, মার্কসবাদী চিন্তা ভাবনায় অনুপ্রাণিত কর্মকাণ্ড আজ প্রথম দুনিযাতেই আব তৃতীয দুনিযাতেই যেন তাব গতিশীলতা আব শক্তি হারিয়ে দুর্বল হযে পড়েছে, মার্কসীয় চিন্তা অনুযাযী সমাজতন্ত্রের স্বপ্নই প্রায় উঠে গিযেছে।

স্তালিনীয় বিকৃতি ও ব্রেজনেভের আমলেব বদ্ধদশায় বাস্তবে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতনেব পর তৃতীয দুনিযায দুনিযায ধারণাটিও কি আজও অর্থবহ?

এই পটভূমিতে সন্দেহ নেই যে মার্কসবাদ একটা সংকটের মধ্যে রযেছে আর তাব মতাদর্শও সংস্কৃতিব ক্ষেত্রে Post-enlightenment উত্তব আধুনিক। উত্তর মার্কসবাদ কিম্বা আমাদেব দেশে সাবঅলটার্ন বা নিম্নবর্গীয ইতিহাস চর্চা জনপ্রিয। এসবের মধ্যে ইতিবাচক, সদর্থক, প্রগতিশীল দিক নেই এমন নয। কিন্তু সে সব চর্চাব চাপে মার্কসবাদ আজ অচল পর্য্যাযে পবিগণিত হচ্ছে। এই প্রশ্নেব নানা দিক বা আযতন রযেছে। সে সবেব মধ্যে অনেক জটিলতা বযেছে। সে সবের আলোচনা, এমন কি সে সবের আভাস দেওযাও এই লেখাব পরিসবে সম্ভব নয়, সে সাধ্যও নেই। তবে আবও আলোচনাব সহাযক হতে পাবে মনে কবে এখানে শুধুমাত্র কযেকটা দিক সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত অসম্পূর্ণ আলোচনা কবা হচ্ছে।

প্রথম কথা হলো, মার্কসবাদ সমাজবাস্তবতা বোঝা ও বিশ্লেষণের একটা কালনির্ভব সৃজনশীল পদ্ধতি—শুধুমাত্র কতকগুলি মত ও তত্ত্বেব সমষ্টি নয (সুশোভন সরকায: সম্প্রসাবণ ও সংশোধন)। এই পদ্ধতির মধ্যেই নিহিত বয়েছে যা মার্কসবাদেব প্রক্রিয়াকে তুলনায় আবও ভাল কবে জানতে ও বুঝতে যা সাহায্য কবে। এমন আব কোনও পদ্ধতি ও তত্ত্ব কাঠামো নেই। অবশ্য উত্তব আধুনিকরা এই পদ্ধতি ও তাব থেকে সঞ্জাত তত্ত্বকাঠামোর মধ্যে দেখেছেন তাঁদেব বিবেচনা অনুযাযী, মার্কসবাদেব মূলগত দুর্বলতা—তাব গুরুত্বব নেতিবাচক দিকগুলি অর্থনৈতিক নির্দ্ধারণবাদী প্রবণতা। এখানে তা নিযে আলোচনা কবা হবে না।

মার্কসের বিশ্ববীক্ষা—সামাজিক রূপান্তরের ইতিহাসের বস্তুবাদী ধারণা

এ ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এব মূল কথা হলো উৎপাদনের শক্তি ও উৎপাদনের সম্পর্কের মধ্যে কার্যোকাবণগত (Causality) ঢং। পদ্ধতিব পবিবর্তন পুরস্পব সংশ্লিষ্ট তিনটি আযতনের মধ্যে জটিল সম্পর্ক। ইতিহাসের জটিল গতিধাবায পর্যাযে পর্যাযে সমাজেব স্বরূপ ও অন্তর্বিরোধ।

মার্কসবাদ প্রাসঙ্গিক কিন্তু কী অর্থে ?

রণজিৎ দাশগুপ্ত

[রণজিৎ দাশগুপ্ত 'পরিচয়' পত্রিকার জন্য এই বিশেষ নিবন্ধটি খসড়া আকারে রেখেই প্রয়াত হন। বিশিষ্ট মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবী রণজিৎ দাশগুপ্তের এটাই শেষ লেখা। রণজিৎ 'পরিচয়' পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য ছিলেন।

—সম্পাদকমণ্ডলী]

গত এক দশকের মত সময়ে, বিশেষতঃ ১৯৮৯এর বার্লিন প্রাচীর গুঁড়িয়ে দেওয়া ও তারপর সোভিয়েত ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশের কমিউনিজম বা বাস্তবে বিদ্যমান সমাজতন্ত্রের পতনের পর চীনে যা ঘটছে তাতে সেখানে সমাজতন্ত্র কতটা বা কি রকমের আছে তা নিয়েও অনেক প্রশ্ন রয়েছে। চীনও সমাজতন্ত্র থেকে ধনতান্ত্রিক হয়ে উঠছে—একই সঙ্গে দুটি ব্যাপার পুঁজির জয়োল্লাস ধনতন্ত্রের কবর দেবার বদলে মার্কসবাদেরই কবর খোঁড়া হয়ে গিয়েছে এবং সমাজতন্ত্র নিয়ে গভীর বৈরাগ্য ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে। সেই সঙ্গে দেখা যাচ্ছে মার্কসবাদের প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন। এমন কি প্রগতিশীল ও বামপন্থী বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন কিংবা এখনও মার্কসবাদে আস্থার কথা সজোরে ঘোষণা করেন এমন অনেককেও বলতে শোনা যায়—অভ্যাসের দরুণ অনেক কথা বলতে হয় কিন্তু বিশ্বায়িত ধনতন্ত্রের যুগে সত্যই কি কোনও বিকল্প রয়েছে? আর থাকলে কি সেই বিকল্প সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে শ্রেণী দ্বন্দ্বের কি কোনও ভূমিকা থাকছে?

সত্তরের দশকে ১৯৭১-এ বিলেতে রক্ষণশীল দল সরকারি ক্ষমতায় আসীন হবার পথ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান নিরস্ত্রীকরণ এবং বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার চৌহাদ্দির মধ্যেই শ্রমিকদের অর্জিত অধিকার ও কল্যাণরাষ্ট্রের ব্যবস্থাগুলিকে যখন একের পর এক ভেঙ্গে ফেলা হচ্ছিল তখন মার্গারেট থ্যাচার তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে ঘোষণা করছিলেন—বৃটিশ অর্থনীতিকে সংকট থেকে উদ্ধার করার জন্য আর কোনও বিকল্প নেই। পরে সর্বস্তরে এমন কি বামপন্থীদের মুখেও শোনা যেতে থাকে There is no alternativc বা সংক্ষেপে TINA। আর সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশে কমিউনিজ্‌ম বা সমাজতন্ত্র বলে যা চলে আসছিল তা যখন ধসে পড়লো তখন মার্কিন আমলা ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা ঘোষণা করলেন 'ইতিহাসের অবসান!" এর মর্মার্থ কি? ধনতন্ত্র ও ধনতান্ত্রিক

বিষ

পঞ্চানন মালাকর

এখন পৃথিবী বিষাক্ত বিষবাষ্পে
ভরে উঠবেই, মানুষের বাহুবলে
পৃথিবীব বুকে ক্ষমতাবানের ধ্বজা
উডবেই তাই মানুষের বুক জ্বলে।
অহংবোধের প্রযুক্তিব জয়গানে
বুক পেতে দেবে শত শত পোখবান
মানুষ এখন ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে
সাগ্রহে কষে পবমাণু খতিযান।
শতাব্দি শেষে অকাবণ আশ্বাসে
মানুষ খুঁজবে বাঁচার নব্য-মন্ত্র।
মানবিকতাব মৃত্যু-পতাকা হাতে
মানুষের বুকে জমা হবে ষড়যন্ত্র।

ছু-মন্তর

শতরূপা সান্যাল

ছু-মন্তরে হঠাৎ হযেছি পর
অথচ বলতে, মন্তব মানো না তো!
রাত্রে চলেছ লণ্ঠন হাতে নিযে
আমি রইলাম নিঃসীম আঁধিয়াবে।
পাছে সুর ভুলি আছি তাই ভযে ভযে
রাগ রাগিনীবা ঘুমিযে পড়েছে কবে
গুণ গুণ চলে আমার সাধনা ব্রত
পাছে ঘুম ভেঙে ওরাও তোমার মত
আমায় একলা ফেলে চলে যায় দূবে
আলপথে হাঁটা সবুজ খেতের দিকে।
আমাব আঁধার আমাকেই ঘিরে থাক
সেখানে এসো না আগন্তুকেব মত
তোমাদেব ছাদ জানালা বিছানা ঘরে
এ অন্ধকার নিতান্ত অনাহূত।

নদী বয়ে যায় বেন সে চেতনাধারা
পারোনি ফাটল ধবাতে এ বিশ্বাসে
ছাড়ো বিষ হাওয়া, সময়ে হবে সে সারা।

সেই মেয়েটা

মধুছন্দা ভট্টাচার্য

সেই মেয়েটা দোষ করেনি
নির্দোষ তাব রূপ
কে সে বেজোড়
দেযনি নজর
স-ব দেখি নিশ্চুপ।

ঐ মেয়েটা—দোষ কবেনি ?
দেহে সে চাঁদ হাসে
জানত না কি বৈবী নিজেই
হবিণী তাব মাসে

দোষ করেনি, নিশ্চযই দোষ
দোষ নয তাব গুণ,
শোধবাতে চাও তাই তো ছোটাও
বিষ ওষুধেব তূণ।

সেই মেয়েটার এই তো বিচার।
ঠিক বিচারই বটে,
তাব জলে সই পাপ গুলেছে
নিন্দে তো তাই রটে।

সেই মেয়েটা তাও কি আছে
শিখতে বাঁচাব মানে
কে সে স্বজন তার যে আপন
কে আছে কেউ জানে ?

আজন্মের পাপ

জিয়াদ আলী

আমাকে তৃষ্ণার জল দিতে গিয়ে তোর হাত
কেন কাঁপে জানি,
আসলে অন্ধকারে যে দেখাবে পথ
তারই চোখে লেগে আছে গ্লানি।

তুই তো হাসনুহেনা বুকে নিয়ে ঘুমের ভিতরে থাকা
অসহায় নারী,
আজন্মের এই পাপ তার
যে তোকে শমন করে জারি।

বিষ হাওয়া

ধূর্জটি চন্দ

বন্ধ করেছি দরজা, বিষ হাওয়া
ঘুলঘুলি দিয়ে ঢুকে যে পড়লো ঘরে
জানলা খুলেছি, প্রবাহের আসা যাওয়া
প্রতিবিপ্লবীর বাক্ যে সরে না আর।

বোসো দুর্গম, রুধির এখনও বাকি
উপবাসী সুখ নিভৃতে পরাণ খোলে
সন্ধ্যা এসেছে জ্যোৎস্না কপালে মাখি
থামো হে প্রবাহ, মিশে যাই তালগোলে।
আমাদের তুমি চিনেছ হাজার বর্ষে
প্রতিবাদী আর আপোসের করি সন্ধি
আমরা এখানে অসমাপিকার হর্ষে
করি জয়গান, নিজেকে নিজের বন্দী।

দেখি পাখিদের নীড় বাঁধা গাছে গাছে

নিহিত বুকেব মালভূমির উপর
চিত্রীয় ব্যঞ্জনায় কবিদেহ
নির্জীব সৃজনে উৎসব করছে
আর ছুঁতমার্গ ধুয়ে মুছে দিবালোকে

তোমাব ফাঁপবে হাতদুটি
বানানো কাঁটাতার ভেঙে বেরিযে পড়েছে

বিছানায শুয়ে শুযে
তোমাব চোখের পান্ডুলিপি বড় বেশি
　　নিকটের মনে হচ্ছে

একবিংশ শতককে মনে রেখে

অত্রি ভৌমিক

এখনো নীল দিগন্তের কাছে
ভালোবাসা ছোঁয়া বিকেল স্বপ্নের গোধূলি হয়ে ওঠে।
তবুও বুকভরা সংশয—
আগামী শতকের ভোর
　　কিভাবে ছোঁবে জীবন-বোধকে
　　কতটা আবেগ নিয়ে।

এখনো আকাশ ভরা মেঘ
বৃষ্টি হয়ে ঝরে সবুজ দেখবে বলে।
তবুও শঙ্কা আসে মনে—
কতটা সবুজ পাবে ঐ আগামীর কিশোর
　　সে এক হাতে অস্ত্র এক হাতে দারিদ্র নিযে
　　আগামী শতকের দিকে চলেছে এগিয়ে।

নিরপেক্ষ

দুলাল ঘোষ

ও আমার বাড়াভাতে ছাই দিয়েছে
ও দিয়েছে পাকা ধানে মই
আমি এখন কোনো দলেই নই

সারাটা দিন নিজের মাচা নিজেই বাঁধি
নিজের ঢোলে নিজের কাঠি
সঙ্গে থাকে রহিম কানাই
দু'চারজন সই

তবু
থাকতে হয় তক্কে তক্কে
এটাই যা হোক হচ্ছে রক্ষে
বিড়াল-ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ে
কখন জোটে
—ওঁ গোবিন্দায খই।

চোখের পাণ্ডুলিপি

নীলাদ্রি ভৌমিক

একরৈখিক কাহিনী বিন্যাসে তোমাকে ডেকেছি
অবসব আর অসুস্থ সন্ধ্যায
মন খারাপের ডাকে শুশ্রূষা গান বেখে
ক্রমশই মুছে যাচ্ছ
কলেজ পাড়ায় ··

এইভাবে মুছে যেতে যেতে সমসময়ের স্বরে
ঘরে ঢুকে এল ঃ

শুয়ে পড়বে অগ্নিকুণ্ডে—আর তুমি
চণ্ডউল্লাসে হা হা হেসে উঠবে।

এখন সময়কে তুড়ি মেরে বলতে পারো—
আমাকে ফিরিয়ে দাও সেই স্বর্ণাভ দিনগুলো।

মুখোশ পার্টি

প্রদীপ পাল

আরও একটা সার্কাস পার্টি এলো ভাবতে, এলো গেঁড়ি-গুগলি নিয়ে
এবাব গোটা ভারত গবু খাওয়া ছেঁড়ে ঘাস চিবোবে, হাম্বা ডাকবে
ঘ,স চিবোতে চিবোতে ছেলে-বুড়ো ঘাস-বিচালি, ঘাস-বিচালি করবে
খাকি হাফ প্যাণ্ট আর সাদা জামার গেঁড়ি-গুগলিরা হাততালি দেবে

আবও একটা সার্কাস পার্টি এলো ভাবতে, এলো গেঁড়ি-গুগলি নিয়ে
এখন মিডিযাব শত মুখ, কখনও গেঁড়িকে, কখনও গুগলিকে
তোল্লাই দেয
দিতে হয, কেননা কোন এডিটব কখন কার কাছে ঘুষ খেযেছেন
চাপা দেবার জন্য, সংসদদেব মতো মাঝে মধ্যেই লাইন পাল্টাতে হয়

সার্কাস পার্টি'র দোসর গেঁড়ি-গুগলিবা হাততালি দাও, জোরে
হাততালি দাও
বোলো রাম, বোলো রাম, রামেব 'মুখোশ' এঁটে আমবা রাবণ এসেছি

মৃত্যুগন্ধ

দেবাশিস চন্দ

আকাশেব দিকে তাকালে
কোনো বঙ চোখে পড়ে না ;
নিচে নোনা মাটি, গৈরিক
উদ্ভিদ দেয সাংকেতিক বার্তা

ইচ্ছা-মৃত্যু নয, মৃত্যুর ইচ্ছাও নয় ;
শশ্মান ডোমের মত রূঢ় আচরণ
গলা টিপে ধবে প্রতিটি মুহূর্ত ,
বাবান্দায় টবের সবুজ ক্রমশ
হলুদ হয, বাজে বিষাদ জল-তরঙ্গ

অভিনেত্রী

শংকর বসু

একে একে ঝরে গেছে শবীবের সকল খোলস।
আজ তুমি বসে আছ উইংসেব পাশে
হাবিযে গেছে গালিস পবা পবিচালকের দল
কোথায গেল সেই সব দিন ?

সেই ক্ল্যাপষ্টিক
সেই চোখের গাণ্ডীবে বণবোষ
সেই ডালিম ঠোঁটে ঝুলে থাকা একফোঁটা মধু
সব কোথায গেল ?
আচ্ছা, তাবা যদি আবার ফিবে আসে,
তখন তুমি ডিমারেব নিচে অ্যানা পাভলোভা।
মূর্ত কবতালিব মাঝে
রাজমহিষীব একটি সঙ্কেতে সহস্রমুণ্ড

এক স্বগত অশ্রু লিপি

অপূর্ব কর

তোমাকে প্রজাপতি বলে ডাকি নি কোন দিন
ডেকেছি নদী বলে
বাহারী কোনো কিছুর কাছে কী দুঃখ-পট খোলা যায়?
উড়ন্ত মেঘ, সেও কতটা বোঝে বেদনার পদাবলী ?

তার চেয়ে ভালো উধাও নীল আকাশ
নক্ষত্রের আলোরও বেশী, অশ্রুভাষা কিছুটা তো
বোঝে এরা, কিছু বোঝে,

মৌন মাটি, পাথরকে, এমন কি দিগন্ত জোড়া
হু হু হাওয়ায়, বটের রসের মতো থকথকে জোৎস্নাকে
দেখাতে দেখাতে আমার হৃদয়ের গহণ পুরা
আমি সব শেষে বৃদ্ধ এক বটের নিচে এসেছি।

বুকের ভেতর অলৌকিক হাতে ঢুকে আমার
শবান কাঠের সিন্দুকগুলো ভাঙো, পড়ো যত দলিল দস্তাবেজের
চর্যালিপি, সন্ধ্যা ভাষায় মানুষ যে কত দুঃখ
লুকিয়ে রাখে, আমিও রেখেছি

তুমি গান গাইতে বলো তারপর আমাকে শাদা পাথরের
ভাষায় , ক্লান্ত, বড়ো ক্লান্ত এক সময় আমি ঘুমিয়ে পড়ি
সঙ্গম দাও তুমি আমাকে রাত্রির ত্রিযাম প্রহরে

নদী তুমি দুঃখের জলাঞ্জলি, প্রজাপতি তুমি স্বপ্নালুতা,
প্রিয় নারী তুমি সুধা দাও, জীবন কণ্টক বনে সুধা দাও,
কত ক্ষত নিয়ে যে হাজার বছর আমি তপ্ত বালুর উপর
হাঁটছি—হাঁটছি—নদীতে ডোবাবো বলে সব দুঃখের ভাসান।

ফুল

প্রতিমা রায়

এসো ফুল

অস্তিত্ব নির্ভুল হয়ে ওঠে যখন জ্বলতে থাকো
ঐ যৌগে।

জ্বলো, জ্বলে ওঠো স্নায়ুতে।
ইন্দ্রিয়ের হাহা নীল আকাশে চলো উড়ে যাই কাঁপতে কাঁপতে
ঘুরপাকে উল্টিয়ে নৃত্যরত হংসের মতো,
দুটি আঙুলের ডগা হতে।

আর একটু পরে বিকেল হলে ভালো হতো

বিশ্বনাথ কয়াল

আর একটু পরে বিকেল হলে ভালো হ'তো,
এখনও মেঘের কোনা জুড়ে
অনেক সূর্যবান বয়ে গেল কুরুক্ষেত্র তূণে,
শত্রু মিত্র অনেকে যেহেতু রাতের শেষে যুদ্ধ পাবে না।

আর একটু পরে বিকেল হলে ভালো হ'তো,
বন্ধুরা এখনও সব পাশাপাশি আছি,
এখনও নারী ও পুরুষ দেওয়ালে ছবি হয়,
কাঁকর মাটি ফুঁড়ে সারা বাগান জুড়ে ফুল হয় শিশু মাসি, পিসি।

এখন অস্ত্র নয়

জয়ন্তী রায়

যুদ্ধ চাইনি
তবু নিয়তই যুদ্ধভেবী বাজে,
পাবমাণবিক বোমা বিস্ফোরণে
ফেটে পড়ে মাটির গভীরে,
শান্ত মাঠ পুড়ে যায় অগ্নিবিভায়,
গাছেব সবুজ পাতা
কেঁপে উঠে বলে—
'এখন অস্ত্র নয,
মসৃণ রেশম ছিঁড়ে
এখনই বেবিযে আসবে মথ
কুযাশা পেবিয়ে উডবে
নীল প্রজাপতি,
দুর্লভ শব্দের গান
কবিতায লেখা হবে আজ,
শাশ্বত বঙিন চিত্রে
দেখে যাক ধ্বসব দেয়াল,
বৃষ্টি বাহনেব গান
গেযে উঠবে চারণ বালক ঃ
আব অস্ত্র নয, বিস্ফোরণ নয়,
অন্নজল নিযে এসো
ধাত্রী জননী।

স্মৃতির মতো অধিকন্তু বিকেলের আলো তখনও প্রতীক্ষায় স্থির, যেন এইবার বেজে উঠবে নির্ণাযক টাইব্রেকারের বাঁশি। তুলো ওড়ে। প্রতিটি মেঘের পাল প্রতীক্ষায স্থির। তুলো ওড়ে। প্রতিটি মুহূর্ত স্থির। তুলো ওড়ে। তবু বাঁশিটি বাজে না আর। ওহে তুমি, সারল্যের ধামধরা বুড়ো দারোযান, জেনে রাখো এ খেলায় হারজিত নেই, ড্রও নেই, শুধু সারাটা সময় জুড়ে নিদারুণ ব্যস্ত থাকে স্ট্রেচার বাহিনী যাতে একেকটি গাঢ় ম্লান অনুভূতি ঠিকঠাক পেতে পারে আধুনিক চিকিৎসার সম্পূর্ণ সুযোগ, আর তারপর মরে যেতে পারে। ওহে তুমি, সারল্য সন্ধানী কবি, সারল্য কথাটার মানে বস্তুত কি জেনেছ জীবনে কোনও দিন ?

বৃষ্টি

পংকজ সাহা

আমার কোন স্বদেশ নেই
আমার কোন স্বজন নেই
বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে
আমি পথ হাঁটছি
বৃষ্টি থামলে আমি কোন দিকে ?

কিংবা পথ যাবে কোন দিকে !

দূর থেকে এসে দূরে গেছে এই পথ
আমি বৃষ্টিতে ভিজছি
হযতো একটু পরে রোদ
তখন কি দেখা দেবে একটি দেশ
আমার স্বদেশ ?

কিন্তু এই মুহূর্তে
আমার কোন স্বদেশ নেই
আমার কোন স্বজন নেই।

দিনযাপন—৫

প্রদীপচন্দ্র বসু

সারাদিন অসহায় সারাদিন মূর্খের ঈশ্বর
সারাদিন ইতিহাস সারাদিন ভাষা বর্তমান
সারাদিন পাহাড়ের সারাদিন পাতালের নুড়ি
সারাদিন ছাইভস্ম পাঁচ তারা চড়ি জুড়িগাড়ি।

সারাদিন কলহাস্য সারাদিন বিষন্নতা মুখে
সারাদিন মাত্রাবৃত্ত সারাদিন ছন্দহীন যতি
সারাদিন রিমঝিম সারাদিন সমুদ্রের ধ্বনি
সারাদিন প্রতীক্ষায় সারাদিন আমি আমি আমি।

সারাদিন জ্যোতির্ময় সারাদিন পূর্ণগ্রাস রাহু
সারাদিন চমকানো সারাদিন এক ঘেয়ে শুচি
সারাদিন হাততালি সারাদিন বিদ্রূপের বাণ
সারাদিন আবির্ভাব সারাদিন শূন্যে তিরোধান।

সারল্য সম্বল যার

ঋজুরেখ চক্রবর্তী

অথচ এসবই একাকার হয়ে ছিল একদিন। জ্বর এলে ঠাকুমার ছেঁড়া আলোয়ান বুকে চেপে খুব একা একা শুয়ে থাকা জানালার ধারে—অথবা দরজায় অচেনা করাঘাত থেকে ধীরে-ধীরে ফুটে ওঠা একটি কোমল হাত —কবিতার মকশো করা ছেঁড়া খাতা—পাড়াগেঁয়ে ফুটবল ম্যাচ—সবই ছিল। আর ছিল গোপন ক্ষয়ের মতো ভালবাসা তবু দেখো, সারল্য সম্বল যার, তাকেও তো শেষমেশ মিশে যেতে হল ঠিকই বাজারের সনাতন ভিড়ে! চারকোণা ঘর এক, উচু আলো, আর সেই আলোর ঘেরের নিচে জুয়ার টেবিল ঘিরে সার সার চৌকো চৌকো মুখ—কোথাও কান্নার কোনও দাগ নেই—মাথাব্যথা নেই কোনও শরীরের ব্যবহার ছাড়া। সুবন্য শরীর, আর তার মানে রেশমের মতন জীবন। তুলো ওড়ে। বিলীন

ভাঙা মাটির চণ্ডীর কেশে যতো ধুলো জমে,
তার নীচে রাষ্ট্রতন্ত্রের ছাতা বলিবদ্ধ পাতাটি চিরোয ;
গ্রামে ও মফঃস্বলে রাজনীতি নারীকে অর্ধনগ্ন করে,
আর মাঝে মাঝে অধিবাস মুকুট পরায় ।
নেকড়েও গল্পের শেষে বককে খাবেই,
মেছো ডোবা কখনও কি সমুদ্রের কাছে যাবে
কবিতার প্রতীকের মানে খুঁজে নিতে ?

ডিরোজিও-র সমাধি প্রাঙ্গণে কবিতা পাঠ

অজিত বাইরী

পশ্চিম দিগন্ত থেকে অপসৃযমান আলো
পিছ্লে পড়ছে প্রশস্ত সমাধিভূমির উপর ।
সপ্ত আর অষ্টাদশ শতাব্দীর স্মৃতিসৌধগুলি
ভিজে উঠছে দিনান্তের রশ্মিচ্ছটায ।

স্মৃতি ফলকগুলিকে ঘিরে প্রহরী তরুশ্রেণী
শান্ত আর নিবিড় হয়ে আসা বিকেলে
রচনা করেছে ছায়াসরণি ।

এখানে অপার্থিব আলোয খুলে বসেছি
নশ্বর কবিতার খাতা ।
একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে,
এপ্রিলের এই স্মৃতিবিজড়িত সন্ধ্যা
ছুটে যাবে আরেক এপ্রিল সন্ধ্যার দিকে ।

আর স্মরণের পথটিকে বারবার
আলোকিত করে দাঁড়াবেন ডিরোজিও ।

সুরাহা

অরুণ মিত্র

ইয়াববকসিদেব নিয়ে বড়কর্তাব জমাট মাইকেল। চলছে নাচা আব গানা এবং নানা খানাপিনা। কেননা পাওনাগণ্ডা আদায় হয়েছে বেশ ভালো অর্থাৎ বঙিন আলো জ্বালিবাব তেল জুটেছে। অবিশ্যি একটু পেটাপিটি এড়ানো যাযনি। তা খিটিমিটি তো' লেগে থাকে সুখী পরিবাবেও, তাই ব'লে কি কেউ ভাবে সত্যি সত্যি লড়াই চলছে চলবেও এবং আমরা কজন লুটে খাচ্ছি? তেমন হলে কবে এই যৌথ সংসারটা লাটে উঠত, কবালা পাট্টা তৈবি হত। তা যে বস্তুত হযনি তা নয। কিন্তু সে কথা কবুল করলে উন্নতিব বাবোটা বাজত নিশ্চয। আমাদের কি কখনো স্বীকাব করা উচিত আমাদেব মাতৃভূমিব স্বর্ণময ভবিষ্যৎ ক্রমে তাম্রময়েব পথে? পথে কি, বলা যায পৌঁছেই গ্যাছে। আমরা যে বেজায প্যাঁচে আছি সেটা ধামাচাপা দিতে খুব জোব আওযাজ একান্ত দবকার। কাঠা-কাটি ছাড়া আর কোনো উপায়ে তা সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা দুপায়ে এগিয়ে পেছিয়ে সেলাম ঠুকে মহাজনদেব জানিযে দিয়েছি আমরা তাক-তুকে খানিকটা ভরসা বাখি, বেশির ভাগটা এখন বাখি ফাটানোতে। ওই দেখুন লোকজন পাকাপাকি ফযসালার জন্যে দাঁড়িযে খালি পায়ে খালি পেটে। এখন
দর্পে'গর্বে' আদব মাতিযে দিতে হবে নইলে শিয়বে কামন।
আপনারা অবশ্যই বুঝে নিয়েছেন সামনেব সময়টা খুব কঠিন,
অতএব আমাদের ফাটাতে দিন ফাটাতে দিন ফাটাতে দিন।

সত্যের ভিতরে যেতে

অনুরাধা মহাপাত্র

সত্যেব ভিতরে যেতে মানুষের সন্দেহ হয
তাব চেয়ে নিশীথের জ্যোৎস্নায়
        জাম বৃক্ষেব ডালে
                ওই ক্রৌঞ্চীর বিষাদ ভালো।

[একটা পেষাই-কল চলার যান্ত্রিক আওয়াজ]

যান্ত্রিক-ঘর্ঘর : কিলোটন—ফিসন—ফিসন
ফিউসন—
ফিউসন
কিলোটন—

(ভেসে আসছে
বিড়বিড় গলায় পাঠ) : ভাঙ্ অণু-ভাঙ্, মহাতেজ-বিকিরণ
ইউরেনিয়ম-প্লুটোনিয়ম
সৌর-তেজ—হিলিয়ম—চাই বিকিরণ—বিকিরণ
ভাঙ্-ভাঙ্ অণু-ভাঙ্ অণু-জোড়-ভাঙ্

(নির্দেশে) : ওরে পরমাণু-চুল্লীর হোম-যাগটা
এই বেলা সেরে নেবে, কপালে ফোঁটা-তিলক কাট—
আর, সবুর সইছে নারে, ওই দ্যাখ—

[কিছু আর দেখার রইল না—শুধু পোখ-
রানের মরুর আকাশে মহাকুণ্ডলীর ধ্বংস-
তেজের ছত্রমেঘ সর্বনাশে উঠে যাচ্ছে]

পরিশিষ্ট :

অন্য-স্বর : 'কোথায় লুকাবে ধু-ধু করে মরুভূমি,
ক্ষ'য়ে ক্ষ'যে ছায়া মরে গেছে পদতলে···
কোথায় পালাবে ছুটবে বা আর কত'

অন্য-দর্শক : অন্ধ হয়েছ, প্রলয় বন্ধ হয়নি
(প্রতিধ্বনিতে) কোথায় পালাবে, পালাবে কোথায়—
তুমি !!

অন্যস্বরে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পঙ্ক্তি ব্যবহৃত।

৩ ঃ কে যেন সেদিন বলেছে রে, সেনা-ছাউনিতে,
হোমড়া-চোমড়া কেউ,—'যুদ্ধ এখনই নয়'

১ ঃ ওরে হাঁদা-বোকা
তার মানেই তো দাঁড়াল—
যুদ্ধ হ'লেই হয়

[দূর থেকে আবার আওয়াজটা ভেসে এল]

এদিকে, ঘোষক ঃ আকাশ ফুঁড়ছে মহাশূলে
দ্যাখ আজ—
মসনদ রাখ্
তোল আওয়াজ
মসনদ রাখ্
জো-হুকুম, জোরসে হাঁক
মসনদ রাখ্

বাজনদার, দোহার ঃ আমরাই খাঁটি দেশসেবক.
দেশের কারণে···
সেটা যাই হোক, সেটা যাই হোক্—
দেশবাসী পুড়ে হয় হোক খাক
বোমায় উড়েই থাক—
আমরাই খাঁটি দেশসেবক
সেটা যাইহোক্,—সেটা যাইহোক্

আবার দোহার ঃ জোরসে কদম
কুচকাওয়াজ,
গদিতে রাখ, গদিটা রাখ

ঘোষক ঃ কান খুলে শোন—
মরু-পাহাড়ের দু'পারে তোদের
বানিয়ে দেবই মনের মতন—
মরুর-শ্মশান ছেয়াই-গোরের অতি-বাহারের
জঙ্গী-জাহান, রাষ্ট্র-মন্দিরং

আমারটা দেখে

সমূহ সর্বনাশ!

ঘোষক (এদিকে, কাছে) ঃ কুচকাওয়াজ
বন্দুক ধর
ভূখা জনতাই
কামান খোরাক,
দেশটাকে তাই
বানাতেই চাই
হুকুম-বরদার—

ড্রামবাদক ঃ দ্রিমি—দ্রিমি—দ্রিমি
দ্রিমি—

দোহার ঃ আমাদের প্রভু সাগরপারের
তিনি

হাটের পসারীরা, ১ ঃ শোনরে, এগোচ্ছে এখনই
কুচকাওয়াজ—
দূরে আওয়াজ
কাছে আওয়াজ—

২ ঃ দরদামে সব আগুন লেগেছে আজ
বোমা-ফাটানোর টানেই বাজারে
বন্ধ—ঝাঁপ—
পড়েছে মাথায়, ভাতের থালায় হাত

হাটের লোকজন, ১ ঃ বাড়িতে মেয়েরাও পড়েছে ধন্দে
কী রাঁধবে-বাড়বে, দেবে পাতে,
ওরে, আর রথযাত্রা নয়রে, ভাজা-পাঁপড়ের মেলায়
ফূর্তি ক'রে কেনায়-বেচায়—

২ ঃ সমঝে নে বোস্,—এযে কুচকাওয়াজ—
পুরোদস্তুর যুদ্ধে-যাওয়ারই সাজ!

অন্য-দর্শক (নাগরিক) ঃ　ওরা বলছে, বোমা-ফাটানো তপ্ত মরুবালি
দেশময় ছড়িয়ে নাকি করবে পুণ্যার্জন—
বিপদের একশেষ, তেজস্ক্রিয়
সে হবে সাক্ষাৎ যম—

হাটের লোকেরা ঃ　বালি ধুলো, ধুলোবালি
এ কী ছেলেখেলা।
ওরে চল, সবে পড়ি
এই বেলা—

অন্য-স্বর (নাগরিক) ঃ　'কোথায় লুকাবে, ধু-ধু করে মরুভূমি'···

ঘোষকের গলা
(দূর থেকে) ঃ　হাইড্রোজেনের গর্জায় বাজ
প্রভু-সেবকের মাথা-জোড়া তাজ
শক্তি পীঠের সেবকরা হাঁট্, হাঁট্—
মালমশলার ভারে নুয়ে গেলে
দেশের লোকের পিঠ গেলে বেঁকে, যাক,

দোহার ঃ　মাথা করে হেঁট্, হাঁট্··

ঘোষকের গলা
(জোরে) ঃ　হাইড্রোজেনের গর্জায় গুরু বাজ
প্রভু-সেবকের মাথা-জোড়া তাজ—
'জয় বিজ্ঞান'—(উল্লাস বাধ)
ওরে, নে-নে বোমার ছাইয়ের বিভূতি অঙ্গে মাখ্

ঘোষক
(আবার দূর থেকে) ঃ　ওপারে—

কে রে

ইতোনষ্টে···

পাহাড়ে ফাটাস

অন্য-দর্শক, নাগরিক,
(জনান্তিকে) ঃ এদেব ব্যবসাব হিসেবটা মিলছে না যে.
নাকি খুলল হিসেবেরই আর-এক হাল খাতা,
বথযাত্রা নয আর, এ পুরোদস্তুর কুচকাওয়াজ,
নেখে নাও গে, সত্যি এবার
যুদ্ধেবই কড়া সাজ !

[সেনা-সেবক দলের প্রবেশ]

ঘোষকের গলা
(ক্রমে চড়া) ঃ বণভূমি যদি না মেলে, তাই তো
তৈবি করেছি জমি,
রেগিস্তানের মরুব ঝড়ের
তাণ্ডব বুনি, আমরা বুনি…

ড্রাম বাদক ঃ দ্রিম্—দ্রিম্—দ্রিম্—দ্রিম্—দ্রিমি

দোহাব ঃ আমবা তৈবি করেছি জমি,—দ্রিম্-দ্রিম্-দ্রিম-দ্রিমি
আযরে, এক্ষুনি
বানাবো আমবা শক্তিপীঠ, দূবে হুই মরুভূমি—

ঘোষকেব গলা
(আরও চড়া) ঃ অণু-বোম ফাটে, মহাবোম ছোটে
শোন্ আওযাজ,
পিছোস্ নে ডরে, এগিযে যা
বল বোম্-বোম্, কুচকাওয়াজ

হাটুরেরা
(একে-অন্যকে) ঃ কত বথযাত্রা দেখেছিরে
এ যে কলা বেচার অধম—
অণু-বোমা-যুগের আওয়াজের
সঙ্গেই যেন হাঁকাচ্ছে—
হর-হর ব্যোম-ব্যোম—(পুরোনো যুগে যেমন),
কতদিক সামলে টানছে রে, টানাপোড়েনে কার্যক্রম

হাটুরেবা, ১　ঃ　চলরে, বেবিযে তো পড়েছি
হাটেবই দিকে—
দেখব খড়ম-ঠাকুরেব রথযাত্রা

২　ঃ　সে আবার কীরে

১　ঃ　কেন জানিস নি, সেই ত্রেতায নিজেই
বেবিযেছিলেন ভরতরাজা, শ্রীখড়ম মহাবাজ
মাথায—

২　ঃ　আর, এবাব বেবুলেন এঁবা, ঘোর কলিতে ?

৩　ঃ　কোথায়—কবে জন্মেছিলেন শ্রীলালা
কে দেখতে যাচ্ছে তা,
তবুও বানাবে ওখানেই, সোনার ইঁটের ধাঁচা—

৪　ঃ　বল্, ইতিকথাটা যে বদলেই লেখা
—হয রে, হয় না !
খুব নাকি বেধেছিল হাঙ্গামা, বথ বেবুলে—

১　ঃ　লেগে তো ছিলই, একী—যে—সে কথা
এক্কেবাবেই হিসেব পাকা—
মাথায পাদুকা

মেযেদের কথা, ১ ঃ　চল্ ভাই, বেবিযে পড়ল ব'লে—

২ ঃ　বথের পেছনে
দেখ্বি নে, সভাসদ—পুরুত—পাণ্ডা—মোড়ল—

৩ ঃ　পেছনে সৈন্য সামন্ত,
—যদি রক্ষকই না হন ভক্ষক—
ধনপতি শেঠিব দল, খাজাঞ্চি, নিযে
হিসেবের খেরো খাতা

॥ কাব্যনাট্য ॥

রথযাত্রা-কুচকাওয়াজে

সিদ্ধেশ্বর সেন

সন্ন্যাসী : সর্বনাশ এল। বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী, ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।

প্রথমা : এ কী অকল্যাণের কথা ঠাকুর···আজ রথযাত্রার দিন—

সন্ন্যাসী : দেখতে পাচ্ছ না। লক্ষ্মীর ভাণ্ড আজ শতছিদ্র, তাঁর প্রসাদ ধারা শুষে নিচ্ছে মরুভূমিতে—"

('কালের যাত্রা ঃ রথের রশি'—রবীন্দ্রনাথ)

[কথাবার্তার টুক্‌রো, হাটে যেতে যারা পথে বেরিয়েছিল, তারা দেখেছে]

ঘোষক : কুচকাওযাজ, কুচকাওযাজ
ফেলো পা, জোর কদম্‌—

ড্রামবাদক : দ্রিম্‌—দ্রিম্‌—দ্রিম্‌—দ্রিম্‌

বাজনদারের দোহার : চলো কুচকাওযাজ, কুচকাওযাজ
রাষ্ট্রমন্দিরং!

ঘোষক : গড়ি মন্দির প্রভু সেবার—
ভেঙে গম্বুজ, ছিল যে কার,
পৌঁছেও গেছি
খোদ কেল্লার মসনদ

ড্রামের আওযাজ
(এগিযে) : দ্রিম্‌—দ্রিম্‌—দ্রিম্‌
দ্রিম্‌

আর তাঁর হাতের মুঠিতে ধরা প্রাণভোমরার টুঁটি,
গোপন ইচ্ছায় বাঁধা প্রত্যেকটি ভবিষ্যতের গান।

এই তো সময়, যখন তর্জনী তুলে এগিয়ে আসছে ঝড়,
আর ঘূর্ণীতে ঘূর্ণীতে বিশ্বতরঙ্গের ধ্যান।
ফুলে উঠছে সাগর, তার ভীম-ভীষণাকার রূপে ;
আমাদের বাঁচতে দিচ্ছে না কেউ, বাঁচতে দিচ্ছে না আর।

এই তো সময়, যখন মিছিলে দেখেছি তার মুখ
অবিকল আমারই নিজের দেখা আয়নার !

এই তো সময়, যখন অজস্র পায়ের তালে তালে
আমারও পারের গান বাজে আকাশে, হাওয়ায় !

ঘরের কথা
চৈতালী চট্টোপাধ্যায়

ভাঙা মাসে ওরা খোলেনি হিসেবখাতা
আসবাবহীন বিছানা-উপুড় রাতে
জল থইথই, বাথরুমে বাল্‌ব নেই
পোকা আছে, কিছু কুসুম সাজানো আছে

এ-সবই ঘরের কথা কেউ-কেউ ভাবে
ব্যঞ্জনাছাড়া ধু-ধু আর শাদামাটা
ওরা তা ভাবেনি, ওরা জানে ফাঁকা মানে
ভরে তুলবার অজস্র উপকথা

সর্বত্র আড়াল খোঁজে
ভযার্ত মানবী—
কেবল বিক্ষত দৃশ্য
চারদিকে প্রসারিত আনবিক ছবি।

খেলাতে পারি না কিছু।
ইতিহাস
যেন আর পরিশ্রুত নয—
ভাঙনের প্রতিশব্দ
কেবল আহত করে নিষ্ঠুর সময়।

তবুও বিশ্বাস রাখি
এইখানে মানুষের
অন্য এক শতাব্দীর ভিন্ন অভিসারে।
সাতটি বিবল হাঁস
উড়ে যায
অন্য এক শতাব্দীর নির্জন ওপারে।

এই তো সময়

প্রমোদ বসু

এই তো সময়, যখন প্রত্যেকেই এসে বলবে, 'বেশ
সাজিযে নিয়েছো তোমার নিজস্ব ঘুঁটি।
এখন শুরু করা যাক অতি মানবিক মতে
নির্জন পোখরানে আজ পারমাণবিক খেলা।'

এই তো সময, যখন ঘুঁটি উলটে ঘুঁট পালটে চাল।'
দিতে বসেছেন দক্ষ বাজিকরের কোনও চলা।

অভিজ্ঞতায় খবব বেখেছে কোথায জলেব জন্য
অথবা খাদ্যে বিষক্রিযায উদ্বেগ ছড়িযে পড়ছে,
ঘামকে জমির মত বেচে দিতে অসম্ভব দ্রুত, কারা
জলাধাব ভেঙে ছড়িয়ে পড়ছে সীমানা ডিঙিযে।

একটি শব্দ আমি পেযে গেছি খবব-কাগজ পড়ে
একটি শব্দ সে-যৌনযুবতী কবি তা নিযে কবিতা লিখছে
যখন ষাটোর্ধ্বো কঠিন মন্ত্রে বাঁধে সমগ্র পৃথিবী
উত্তবদাযভাগ টানে শুধু প্রতিবাদী মুষ্টিমেযকে।
একটি শব্দ আমি পেযে গেছি মানুষকে খুঁড়ে
একটি শব্দ উলটে দেয শুধু পুবনো মাটিকে।

অনুভব

আশিস সান্যাল

সাতটি বিবল হাঁস
উড়ে যায
দেখি চেযে স্বপ্নময় বিহ্বল বাতাসে
অন্য এক শতাব্দীব
প্রত্যাশায অনুগত আবেক আকাশে।

এখানে দেখেছি শুধু
বহমান অন্ধকারে অজগব ভীতি,
দেখিনি কোথাও আর
স্বাভাবিক অভিসাবে
অপবূপ উদ্ভাসিত প্রেমিক সম্প্রীতি।
এখন দেখছি চেযে
চাবদিকে ধ্বজাধারী কেবল মুখোশ।

শম্ভু মিত্র

গণেশ বসু

কোনো অভিমান নয়। কার প্রতি অভিমান? নীরব নিঃসঙ্গ
চলে যাওয়া

ঢের বেশি উজ্জ্বলতা, সহজ সারল্য এই রাজকীয় বিনা আড়ম্বর
নক্ষত্র-প্রস্থান। থেকে যায় কিছু চাওয়া-পাওয়া
ঢেউয়ের চূড়ায় সমুদ্রের নিজস্ব বলয়ে দায়বদ্ধ প্রকীর্ণ প্রহর
নচিকেতা, তোমার মননে।

স্তাবকতা অভিশাপ বুঝেছিলে একা একা মেঘের ভিতরে
নিজেকে আড়াল করে, রক্ত অশ্রু আবেগের নিবিড় ক্ষরণে
চাঁদ বণিকের পালা, কিছুতে কাঁপে না ভিত, অন্ধকার তোমার শরীরে।

আমিও কি রাগী প্রৌঢ়? স্বতন্ত্র মুদ্রায় এই আমিও কি একা?
স্বপ্ন গুঁড়ো গুঁড়ো হয়, একাকীত্ব ফুলে ওঠে, মুখোশের ভিড়ে
কত নিন্দা কত ঈর্ষা, তাই
তোমারই ভিতরে যেন নিজেকেই চিরে চিরে দেখা।

উত্তরদায়ভাগী

দীপেন রায়

সময়কে, নিজেকে মাটি-পাট-তুষে মেশানো মানুষ
তৃষ্ণা বুকে ছটফটে সারাটা দুপুর একা ঘরের ভিতর
অথচ আগুন ও কল্পনায় যতদূর টেনে নিয়ে গেছে
ছাপিয়ে উঠেছে প্রতিদিন কঠিন ও জটিল বাস্তব।
এই সব ষাটোর্ধ, উত্তরদায়ভাগে, পথে, প্রতিবাদে
সকলের আগে বেরিয়ে এসেছে সাবলীলতায়,

শতজল ঝর্ণার ধ্বনি

(জীবনানন্দকে নিবেদিত)

সুশান্ত বসু

এই অন্ধতমসের পথ বেয়ে উজান যাত্রায়
স্বভাব স্বতন্ত্র এক পথিকের পায়ে পায়ে হেঁটে
আমরা চলেছি যারা তারা কি চলেছি ?
না কি সময়ের বৃত্তপথে ঘোরা, শুধু ঘোরা ?
তাকেই কি গতিমান সত্য বলে
আমাদের ক্লান্তিহীন ক্লান্তিময় চলা ?

দিনের প্রহারে পাংশু অস্তিত্বের নিহিত গোপনে
পথের প্রদীপ জ্বালা যে পথিক
শত শত শতাব্দীর উত্তরাধিকারের স্নাতক
সে তো অন্য আরও এক অনাময় দ্বিতীয় সত্তার
শিকড়ের ডানা-মেলা বিশ্বাসের শাশ্বত প্রদীপ
দিয়ে যায় আমাদের হাতে।

সমাকীর্ণ সন্ধ্যাভাষা তাঁর সেই অচেনা ভাষার
অমল তাপের কাছে খুঁজে পায় এ বাঁচার নতুন আখর!
শতাব্দী শেষের এই বধির খরার বাঁজা পাথরে পাথরে
শোনে এক বেজে ওঠা শতজল ঝর্ণার ধ্বনি।

ধাক্কা

শ্যামলকান্তি দাস

মাটির ফাটলে ডিম আগলায় কেউটে
এখনও একটি সন্ধ্যা প্রদীপ নেভেনি

দমকা বাতাসে খুলে যায় ভাঙা দরজা
বৃষ্টির ছাটে বিছানা-বালিস ভিজছে

থালায় থালায় বাসী ডালভাত ছড়ানো
বঁটিতে এখনও আলু-পেঁয়াজের টুকরো

মাটির চাঙড়ে সারাদিন ধরে ধাক্কা
তবুও ওঠেনি কাঁথায় জড়ানো রাত্রি

ভাঙা হাঁড়িকুড়ি, ইটকাঠ সব সাজানো
কয়লা; লম্ফ কেরোসিন, ফাটা বালতি

শাবলে কোদালে উঠে আসে শায়া গেঞ্জি
তবুও রক্ত ওঠেনি এখনও শূন্যে

তবুও ওঠেনি ফাঁসে আটকানো স্বপ্ন
বিড়ির আগুন. কান থেকে ছেঁড়া মাকড়ি

মাটির চাঙড়ে সারাদিন ধরে ধাক্কা
ধোঁয়া ছাই ধোঁয়া ছিটকে পড়ল শূন্যে

সাদা খটখটে পাথরের নীচে গহ্বর
উঠে দাঁড়িয়েছে একঘটি জল, মৃত্যু

উঠছে উঠছে প্রবল শব্দে উঠছে
আকাশজাগানো দুটি মুখ, চিরকান্না।

ক্রোধের দিন

রত্নেশ্বর হাজরা

উঠে এসো
ভেজানো তুলোর মধ্য থেকে
ক্রোধ, উঠে এসো।
ওষুধের তীব্র গন্ধ থেকে
সমস্ত ক্ষতের মুখ থেকে
উঠে এসে এখানে দাঁড়াও।
বসো
হাতের তালুতে কিংবা চক্ষুর মণিতে
ইচ্ছে হলে—ঠোঁটের উপরও বসতে পারো—

উঠে এসো
ফুলে ওঠা শিরাগুলো থেকে
ক্রোধ, উঠে এসো—
সবুজের মধ্য থেকে ওঠো
অনন্ত বিনয় থেকে ওঠো
রক্তের ভিতরে ওঠো, ক্রোধ।
হৃৎপিণ্ডের ছন্দ দ্রুত করো
বাতাসের পিঠে বসে দশদিকে ছড়িয়ে পড়ো
ক্রোধ।

উঠে এসো
আগুনের মতন উঠে এসো
ভীতুটাকে ক্রুদ্ধ করো, ক্রোধ
কারণ ক্রোধের দিন ভীতুরাও একটু বেঁচে ওঠে—

পুনর্বাসন

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

আমরা সবাই খুব কাছাকাছি চলে আসছি
হাত বাড়লেই ছুঁয়ে ফেলা যায় দুই গোলার্ধের
শুভরাত্রি, হ্যাপি বার্থ ডে
আমাদের টাই কিংবা টাকে, কঙ্কণে-কুন্তলে
মুক্তোর কুচির মত আনবিক ভস্ম ঝরতে পারে
কেন ভাবছ সবটাই অস্তিত্বের পক্ষে ক্ষতিকর
তা হলে কি শুশ্রুত চরক স্বর্ণভস্মের বিধান দিতেন !

নাগালের এত কাছে এসেও বন্ধুরা
জলের উপরে ভাসমান তেল, অসম্পৃক্ত
আমরা জলের নিচে বুদ্ধু মাছ
দমবন্ধ কুম্ভক-রেচক-যোগমগ্ন
আমরা সমুদ্রের তীরবর্তী অসহায় উড়ুক্কু প্রজাতি
আজকে এখানে, কাল মাননীয় মহাকাল
আমাদের পুনর্বাসনের কথা ভেবে রেখেছেন ।

পৃথিবীর শেষতম উপগ্রহ 'শান্তি' এক
বায়বীয় ল্যাবেনচুষ
প্রতিদিন লক্ষবার পাক খাচ্ছে কক্ষপথে

শিশুরাও হতোদ্যম, হাততালি থামিয়ে দিয়েছে ।

আগুনে পুড়েছে হাত
শত ঝাঁঝরা হয়েছে এই বুক
তুমি কি জানো না আজ
পৃথিবীর গভীর অসুখ

যতই উতলা হও যতই জড়াও তুমি জালে
এই গ্রীষ্মে দাবদাহে
ইশারায় সে আমাকে
ডাক দেয় গূঢ়অন্তরালে

অনুপমা, ক্ষমা করো

যদি ভুলি স্মৃতির নির্দেশ
এতকাল কাছে থেকে
কি করে ভাঙবো বলো
সন্দেহের ছদ্মবেশ

তবু যদি আবার সে ডাকে—
মায়াবী আলোয়
ত্রিভুবন ভাসে যদি ফের
সপ্তডিঙা খুলে দিয়ে চলে যাব
দূরের সাগরে
তুলে আনবো মণিমুক্তা ঢের ,

ঘরে-বাইরে

রাণা চট্টোপাধ্যায়

ঘরে ও বাইরে বহু অপবাদ নিয়ে থাকি
পায়ে-পায়ে অনেকটা পথ হাঁটা হলো
মনে হয় মহা নিষ্ক্রমণ হলে, এই আঁখি
আর হবে না ছলোছলো।

ঘরে-বাইরে মানুষ তো কম দেখিনি
কেউ-কেউ বড়ো আপন হয়ে ওঠে
কেউ বা অকারণে ভালবেসে হয় স্বৈরিণী
কেউ পাঁক ঘেঁটে পদ্ম হ'য়ে ফোটে।

তবু আ'জো ভাবি মন্দির-মসজিদে যাব না।
বুকের ভেতরই আছে নিখোঁজ ঈশ্বর,
আজ রাত শেষ হলে ভোরের ভাবনা
মানুষের দিকে নিয়ে যাবে ক্ষণিকের স্বর।

ঘরে ও বাইরে আজো অপবাদ সহ্য করি একা
মানুষের মুখের মিছিলে, অফুরান জয়ধ্বনি আঁকা ।।

নিয়মতান্ত্রিক

অনন্ত দাশ

সকাল দশটায় গিয়ে
ফিরে আসবো পাঁচটায় ঠিক
কি করে ভাবলে তুমি
আমি হবো একটাই নিয়তান্ত্রিক

ফেলে গেছ তোমার ঘুঙুর

বাসুদেব দেব

তোমার জন্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
আমি কখন গাছ হয়ে গেলাম
আর, সব কথা ভুলে গিয়ে
মেঘ হয়ে ভেসে গেলে তুমি
আমাদের বিষয়বুদ্ধির ওপর দিয়ে
সেই থেকে এই বিরহ
সেই থেকে এই প্রতীক্ষা

সেই থেকে এই অপূর্ণতা
এই অসংলগ্ন জীবন, পাতা ছেঁড়া বই-য়ের
ভিতর অসম্পূর্ণ গল্পের টান
যেন অন্য কার সংসারে ঢুকে পড়েছি ভুলে
কেবল হারানোর উৎসব আর ঝরানোর কান্না

এখনও আমি তোমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকি
ভাঙা রাতিথাম, শহরের ওপর দিয়ে
উড়ে যাও তুমি শীতের পাখি
ঠিকানা পোষাক আর শরীর বদল হয় কতবার
আমি তোমাকে পাই না

কত গল্প কবিতা লেখা হতে থাকে আজো
কিন্তু কেউ তোমাকে পায় না
না মাটি না আকাশ না স্মৃতি না স্বপ্ন

কেবল আমার বুকে তোমার ঘুঙুর জমা আছে।

আমায় ঘৃণা শিখিও না হে

ব্রত চক্রবর্তী

ভালবাসতেই একটা জীবন যাক ;
আমায ঘৃণা শিখিও না হে।
যতবাব মন্থনেব শিব, অমৃত ওগবাই,
বিষ নিজে নিই।
আমায ঘৃণা শিখিও না হে।
প্রভুত্ব পছন্দ নয কারও,
একটু নবম কবে বললে ববং
নিজেব তীরই অন্যের ধনুকে বসিয়ে দিযে
বলি, মারো। আবও অনেক বাগে আমার এখনও
যেতে বাকি, জানি বলেই বলি ও বায়েন
হাত তালে বাখো শ্রীখোলে,
যারা বসিয়ে দেয় তাবাই চেপে ধরবে
বাগ ভুল হলে!
যতবাব ভালবাসতে যাই, টেব্ পাই,
বিশ্ববীণারব নাগালে, পালে হাওযা,
নদীময অনায়াস যাওয়া সকলেব
সমুদ্রের কাছে।
আমায় ঘৃণা শিখিও না হে!

ভালো একটু ভালো জায়গায়

নীরদ রায়

বুগ্ন নদীটির পাশে আমাদের গ্রাম জোরে কথা বলেনি কোনোদিন,
ডাক্তারবিহীন যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি বছরে অন্তত সাতমাস
নিজেই ভোগে সর্দি-কাশি ও আন্ত্রিকে—
দু দশটা পাড়া গাঁ ঘুরে যে পাতলা রাস্তাটি কাশতে কাশতে
এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে এক হাঁটু ধুলোবালি আর কাদার সমাবেশে
তার মাথার কাছেও তো বছরে একবার শরৎকালে
এসে থেকে যায় কিছুদিন।
আমন ধানের সবুজকে সাদা কাগজের পৃষ্ঠা ভেবে
কেউ না কেউ তো জ্যোৎস্নার কালি দিয়ে এখনো
রচনা করে গান ও কবিতা।
সেই সব গান ও কবিতার খবর কোনো বিখ্যাত দৈনিকের
সম্পাদকীয় দপ্তরে কোনোদিন এসেছে কিনা—
এইসব জটিল প্রশ্ন যেমন ছিলো ও আছে, থাক—
চারপাশে ভাঙতে ভাঙতে যেটুকু ভালো এখনো
আমাদের কাছাকাছি—
বড় রাস্তার বগলে ঘাড় মটকে ফেলে দেওয়া যেটুকু শুভেচ্ছার
শরীরে আছে এখনো নিঃশ্বাসের ধিকিধিকি—
শুধু সেটুকুই তুলে রাখতে চাই একটু ভালো জায়গায়,
দেশ-কাল ও দুর্নীতি নিয়ে বিকেলবেলাগুলি আজকাল
স্থান-কাল-পত্র না মেনে উত্তেজিত হয়ে ওঠে—উঠুক—
প্রিয়বরেষুদের রাগ অভিমান ও যন্ত্রণা নিয়ে এক একটা মাস যদি
হঠাৎ মন খারাপ করে চলে যায় আজ কোনো প্রদেশে—যাক—

আমরা আপাতত শুধু ভালোকে একটু রাখতে চাই,
ভালো জায়গায়।

অবসাদ

প্রণব চট্টোপাধ্যায়

আগুন হাতে গান গেযেছিল সেই নাবী
সেদিনই সে ক্ষণে সময়েব সাথে পবিচয
থব্ থব্ কবে কেঁপে উঠেছিল বাড়ি
কেউ বলেছিল সময়েব নাম মহাশয় !

জ্যোৎস্নার ঘবে ঢুকেছিল এক বোকা
ভুলে ফেলে গেল বোদ বাঁচানোব টোকা
সেই ভুলেব পরিণাম হল স্থাযী
সেই গানকেই করেছিল তাবা দাযী !

কি পোশাক পবে ঢেকেছিল অপরাধ
কেউ দেখেনি দেখেছিল বাজসাক্ষীবা
এনিযে বাতাসে কাবা ছডালো প্রতিবাদ
গম্ভীরা গায অভিজাত ভিখারীরা !

বেহুলা দেখেনি তাব ছায়া ভেসেছিল জলে
শরীব ভিজেছিল অন্ধকার গলে গলে
পূর্ণিমার চাঁদ দেখা ছিল তার সাধ
হল না তা , জমা হল অবসাদ !!

হোমানল

তুলসী মুখোপাধ্যায়

এক দুই দশ লাফে
বন্ধুবান্ধবরা উড়ে গেছে
তিন চার সাহারা মাড়িয়ে
পাঁচ ছয় পাহাড় পেরিয়ে
সাত সাতটা সাগর ডিঙিয়ে
এক দুই দশ লাফে বন্ধুরা উড়ে গিয়ে
সবুজ সব দ্বীপ কিনে আজকাল আকাশবিহারী
কাকভোরে তাদের দুয়ারে ধর্ণা দেয়
রোজ কতো কৃপার ভিখারি
রোদ্দুরে পাহারা দেয় দুইচার ছায়া ছত্রধারী
ডাবের জলের মতো গোলাপ সুন্দরীরা রাতের মশারী···

রক্তে ভেজা অন্ধকার ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে
শত্রুরা একে একে সোনাঝরা পুবালী সকাল—
এবং তারা আজ রাজ-ঢাক
তারা আজ রাষ্ট্র-তন্ত্রে দিগ্বিজয়ী কালের রাখাল।

আমি আর আমার মতো
গুটি কয় হাবাগোবা আকাট যৌবন
মাটি কামড়ে পড়ে আছি
আকৈশোর নির্দিষ্ট ভূগোলে—
শেষ বিন্দু রক্তের স্পন্দন
শেষ অর্ঘ্য অঞ্জলি দেব
প্রজ্জ্বলিত মহামুগ্ধ শুদ্ধ হোমানলে।

আয় শহর, মফস্বল,
আয় ঘন কোমল জল,
কেমন আছিস অর্চনা ?
উছল তো বুকের ঢেউ ?

আযবে কেউ দল বেঁধে,
একা একা ।
আয় সকল গানপাগল,
বস খেপা ।

আয় শ্রাবণ বৃষ্টি মেঘ,
আয় বনের গাছগুলি,
আয বনা, টেকসনা,
আয টিয়া, বুলবুলি ।

আয হাওযা শাল বনের,
হো উড়াল মৌ ফুলের
গন্ধ আয, ডুংবী আয,
আয ডুলুং লাচ কাঠি ।

আয় দূরের বন পাহাড়,
আয় কুড়া, আয কুড়ি ।
আয মাদল মানভূমের,
সিংভূমের লোকগাথা ।

ঝাঁকড়া চুল সাঁওতালের,
আয় কালো সঙ্গিনী ।
আজ পরব, আজকে লাচ,
বন্ধুদল—বন্ধুনী,

আয় তোদের সঙ্গে নি ।

তবে কী বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ হাতে হাত মিলিয়ে
চুক্তি করার মতো
পরিকল্পনা করেছে পণ্ডিচেরিকে একটি আধ্যাত্মিক
কারখানা বানাবার
তবে কী তাঁর 'সাবিত্রী' বা 'দিব্য জীবন' সংকেত-
বার্তা টের পেয়েছে ওরা
শুধু একজন সহকর্মিনী কোনো অপ্রত্যাশিত বিদেশিনী
সহযোদ্ধা
এসে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন সাম্রাজ্যবাদের নব রূপায়ণ অর্থাৎ
সাংস্কৃতিক আগ্রাসন
অর্থাৎ নয়া উপনিবেশবাদের তত্ত্ব ইউরোপীয় মার্কিণ পুঁজিতন্ত্র
কী ভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করেছে
তিনি অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মাতৃ মন্দিরের
ছদ্মবেশবাসে একটি দুর্গ
একদিন তৈরি হবেই
এখন শুধু আকাশের মতো অপরিসীমে
হেঁটে চলেছেন অরবিন্দ
বন্ধমূল বৃক্ষগুলি কোনো কথা বলছে না যেহেতু
কিছুই বলার নেই তাদের।

পরব

নন্দদুলাল আচার্য

আয় আমার আলোর রাত,
অন্ধকারে আয় থাকি।
আয় মারি বন্ধুনী,
এক ঢিলে দুই পাখি।

এই দিনরাতগুলি বদলে দেবে একদিন, এবকম কিছু ?
লোভ আব ক্ষমতাব উৎসাবিত বিষে
নীল হযে যাওয়া সব শিশুদেব গালে
চুমা দিযে হাতে তুলে নিযেছিল বোমা
পবাক্রান্ত স্বৈবাচাব কবে নাই তাকে কোন ক্ষমা ।

পঁচিশ বছব পবে দেখা হল, এসো,
এইখানে বসে মুখোমুখি, কথা নয,
শুধু তার কথা ভেবে বাত কবি ভোব
এখানেই একদিন স্বপ্ন দেখেছিল এক অমল কিশোব ।

কী চেয়েছিলেন অরবিন্দ

অমিতাভ গুপ্ত

দেবদাবুর মর্মবেব মতো হেঁটে চলেছেন অরবিন্দ
তাঁবই যত্নে সাজানো এই
প্রায নির্জন পণ্ডিচেবি—একটি আবাহনেব মতো সমুদ্রকে ছুঁযে আছে
এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ থেকে খাইবার-তলযাব-চমক জাহাজ থেকে
যাবা অনায়াস পালিযে আসতে পাবত আবো কঠিন প্রতিজ্ঞা নিযে
তাবা এল না কেউ
খুব বেশি দূবে নয তেলেঙ্গানা কিন্তু সেখান থেকেও
এই সহজ মুক্তাঞ্চলের
দিকে এল না বিপ্লবীবা অথচ তাদেব অন্তত
অজ্ঞাত থাকার কথা নয কী ভাবে অবিন্দ সমগ্র বিপ্লবেব
সমস্ত উদ্যোগ বরবাব গ্রহণ কবেছেন বাববাব বারীন ঘোষেব মতো
ভাইদেব ব্যর্থ দেখে প্রয়াস নিযেছেন অন্যতব
তবে কী তাঁব চাতুর্য ও বাজনীতিবোধ সবই ধবা পড়ে গিযেছে

সেই কথাটুকু ভুললে ব্যর্থ অস্তিত্বের আশিরনখর।

সেই কারণেই আমাদের চারপাশের সকল মহিমা গায়ক
দিনরাত এত কৌশলে রোজ আমাদের মনটিকে
উৎসাহে ধুনো গোলগোল দেয়, সে সবকিছুর গুণে
আমরা তো রোজ অস্তিত্বের সবখানি রাখি টানটান, তাই

এ জীবন এক সার্থকতার যাত্রা, সে বিশ্বাস
তুরীয়ানন্দে নিত্য নিত্য নানা বিভঙ্গে ফোটে।

পঁচিশ বছর পরে

অরুণাভ দাশগুপ্ত

এসো, এইখানে মুখোমুখি বসি।
আজ এ মাটিতে কোন দাগ নেই
একদিন ছিল,
উৎপন্ন ঘাসের পরে রক্ত জমে ছিল,
আজ নেই, এসো এইখানে বসি মুখোমুখি।

দীর্ঘ মিছিলের শেষে
যে রকম ক্লান্ত পায়ে ঘরে ফেরে নির্মোহ মানুষ
আমরা দু'জনে সত্তরের কোন এক বিপন্ন নিশীথে
এইখানে, একটু জিরোতে এসে দেখি অকস্মাৎ
রক্তে ভেজা মাটি আর পরে আছে কিশোরের লাশ!
যেন চন্দ্রাতপে সে রাত্রির প্রথম প্রহরে
জোৎস্নার মায়াবি স্পর্শে স্নাত এক আরক্ত পলাশ।

সে কি স্বপ্ন দেখেছিল?

আলোয় এসেছো ; সেই যৌবনের উত্তাল তাণ্ডব
শুরু হয়েছিলো, আর শুরুতেই তুমি পরিযায়ী
পাখি হয়ে উড়ে গেলে, নিভে গেলো দুরন্ত উৎসব।

তারপর কতো রাত্রি তারাদের নিরুচ্চার ভাষা
বুঝে নিতে কেটে গেলো দিন, সে তো অনুরূপ নয় ;
তোমার পাখার ধ্বনি শুনে যাবো, এমন দুরাশা
বুকে নিয়ে, বহুবার বহু মৃত্যু জয়
করেছি ; শরীর থেকে ঝরছে পালক, আজ—
বিদায়ী আলোয়, তুমি ফিরে এলে পরিযায়ী পাখি।

প্রকৃত প্রজ্ঞা

শুভ বসু

এমনি রাতেই, সেই দ্বাপরের মহান প্রপিতামহেরা
অনেক রক্তপাতের পরেও প্রাজ্ঞ, উদাসীন,
জেনেছিলেন কালের হাতে অসংখ্যবার ঠেকে
এমন অনেক কথা যা আজ পাঠ্য বইয়েও আছে

জেনেছিলেন সেদিন তারা, এক আঠারজন অক্ষৌহিণীর রক্তে
স্বজন হননে নয়, পৌরুষ পায় যথার্থ অভিজ্ঞান
যদি শ্রীচরণ কমলটি চিনে করা যায় ঠিক যথার্থ জলসিঞ্চন।

আমরা তো এত শত কষ্টের কৃচ্ছ্র সাধনে না গিয়েও
স্বভাববশত অনায়াসে জেনে নিতে পারি বেশ আজকাল,
সময়ের গূঢ় বিশাল প্রবল দাক্ষিণ্যের দয়াতে ?
প্রভু যখন হাসেন সে হাসি অনায়াসে এত মণি ও মুক্তা ছড়ায়

প্রস্তাব

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

মাঠে একা দাঁড়িয়ে রয়েছে ঢ্যাঙা গাছ,
যেন এই মাঠের প্রহরী। ঐ দৃশ্য দেখাতে আমি পারি,
যদি দেখতে চাও।

ওখানে ঘাসের বনে ঘাস কাঁপে, ঝিরিঝিরি হাওয়া,
তেতুঁলের পাতা কাঁপে, তেঁতুলের ছায়া। এ দৃশ্য
দেখাব নয়, অনুভবে পাওয়া। শহরতলিতে যেও
একদিন, ঠিক পেয়ে যাবে।

আকাশে জমেছে মেঘ, দুর্দিনের নয়, যেন পেঁজাতুলো,
তোমাকে তা দিতে পারি, যদি চাও, নাও এই গুলো।

শহরে চশমা আছে সকলের, তোমারও একটা লাগবে, নাও।
আমি ধার দিতে পারি, কিংবা একটা আজই কিনে ফেলো,
চশমা ছাড়া সঠিক হবে না দেখাটাও।

বিদায়ী দিনের শেষ আলো

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

বিদায়ী দিনের শেষ আলো এসে পড়ছে শরীরে ;
এখন নিশ্চিত জানি, আমার ভ্রমণকাল শেষ
হয়ে এলো। তারাগুলি ফুটে উঠছে রাতের গভীরে
দারুণ উজ্জ্বল। তুমি, হে অসীমা! দীর্ঘ স্বপ্নাবেশ
থেকে কী নিষ্পাপ মুখ নিয়ে আজ দিনের বিদায়ী

যদি কেউ ডেকে নেয়, তবে যাওয়া যায় ;
কিন্তু বিনা প্রয়োজনে কেউ কাউকে ডাকে কিংবা খোঁজে
ভিতরে ঢুকিয়ে নিতে ? তাই ঠায় ভিজছি আমি দাঁড়িয়ে রাস্তায়।

চড়ুয়ের কতো ঘর গ্রামে ও শহরে ! তবু কেন ভিজছে বোকা ?
মানুষেরই ঘর নেই ! হাচোন বাইদ্যার জাত, নিত্য যাযাবর !
এ রাস্তায় ভিজছে আজ, ও রাস্তায় কাল রোদে পুড়ে পুড়ে
ঝোকা—
পরশু অন্য রাস্তা থেকে উড়িয়ে, ফুঁড়িয়ে নেয় ঝড় ॥

পেঁছিলাম যেখানে

শান্তিকুমার ঘোষ

শুধু কুয়াশা—স্রেফ বাষ্প ঃ
বছর চল্লিশ উজিয়ে
পেঁছিলাম যেখানে—
অবিকল সেই তটভাগের নীচে
দুলছিল মৃত্তিকা রঙের জলরাশি,
যার উপর ফেরোজা-নীল পাল তুলে
এক-একটা নৌকা
যাচ্ছিল ভেসে চিরকালের দিকে।
প্রতিটি লতাকুঞ্জ থেকে
তখনো সুরভি,
অদেখা হরেক পাখির গলায়
অমরার গান ॥

মঞ্চসাজে সাজ

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘ ছিঁড়ে যেতে থাকে, পালক ভরে ওঠে কাঁচা আলো।
বাঁশির ফুৎকারের মধ্যে ঢেউ ভাঙে, জমে ওঠে জ্বালা।
খালি বদলে বদলে যাওয়া ম্লান দৃষ্টিরেখা বরাবর
তমালতালের শান্ত বিধুনন—তলা দিয়ে আমারই পুরোনো
আদ্‌রা ফুল কেটে উঠে পুড়ে গেল। যে আমি জ্বলজ্যান্ত
ম্যানহোলে নেমে উঠেছি এইমাত্র, মাথায় চুড়ো হয়ে আছে পাঁক,
হাতে-পায়ে পাঁক—জানি এ দুঃখ বিনিময় করার নয় কারও সাথে।
জানি, তবু শত রোমকূপে-কূপে ফুঁসে ওঠে—আছি!
আমি আছি! চারিধার
ভরে উঠছে জেনারেটরের শব্দ, শব্দ আর চোখজ্বলা ধোঁয়া!
নিশ্চল অতিকায় একটা ছাইকাঁকরের মূর্তি হয়ে
উঠেছে যে জনস্রোত, সে কারও কথা শুনতে পায় না।
শুধু বিগলিত হয়ে তুমুল হাততালি দিয়ে ওঠে
ভাঁজ ভাঙা আদ্দির ভেতর থেকে উঠে আসা দরদী বাণীর
মঞ্চসাজে সাজা ওই মাইক্রোফোনের সঙ্গে সঙ্গে।

ঝড়

প্রফুল্ল কুমার দত্ত

কার্নিশে দাঁড়িয়ে ভিজছে　　চড়ুইটা একাকী
আমি ভিজছি উল্টো দিকে　　রাস্তার দাঁড়িয়ে।
চড়ুই যে কোনো একটা　　ঘরে ঢুকে যেতে পারে না কি?
কে ওকে বারণ করবে?　　কে দেবে তাড়িয়ে?

আমি তো মানুষ, কারো　　ঘরে ঢুক্‌তে পারি না সহজে—

পাখি, পাখি

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

ভিতরে পুষেছি এত ঘরভাঙা পাখি।
দেহ তার পোষমানা ছিল না কখনো
তবু তার কাছে আসা !
···ভালোবাসা নাকি ?

যৌবনে কখনো ছিল, শ্রাবণের দিন ছিল কোনো।

আষাঢ় শ্রাবণে কোন্ দূরে ওড়ে পাখি,
আমার ভিতরে ঝরে পালকের জল।
স্বপ্নে ঘন বর্ষা নামে
—কাকে নিয়ে থাকি !

ভিতরে পুষেছি এক ঢেউভাঙা নদী চলাচল।

শৈশবের খেলা দেখি—লুকোচুরি পাখি···
খুনসুটি দিনরাত, চলে তার খেলা।
সকলেই উড়ে গেছে।
কেউ আছে বাকি ?

আমি আছি—এই সত্য জানে শুধু দীর্ঘ কালবেলা।

কল্পনা করি দুজন, আলাদা বাড়ি
দৌলত নিয়ে নেই দাবি, কাড়াকাড়ি।
ছেলে গেছে বনে, মেয়ে হস্টেল থেকে
এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঢুঁ মারে যখন খুশি।

স্বাভাবিক, তবু আচমকা ফোন এলে
'দুঃখিত' বলে নামিয়ে রেখো না জেদি,
'সল্ট-লেকে এসো' বলতেও বাধা নেই,
(সেখানে দুজন সমান স্বাগত আছো)
তোমাদের এ তো বোঝাপড়া বিচ্ছেদই।

কবির বউ

অমিতাভ দাশগুপ্ত

কবির বউ ঘুমিয়ে আছে কবির পায়ের কাছে,
মাঝখানে এক আউল জাগে মধ্যরাতের আঁচে,
ঘুম ছিঁড়ে যায় নিঃশ্বাসে তার হঠাৎ অচিনপুরে
ঐ ক্ষ্যাপা তার হাত রেখেছে নারীর শরীর জুড়ে।
কবি তো স্রেফ পদ্য লেখে শব্দে ঝালাপালা,
ফাঁকতালে তার যাচ্ছে চুরি শান্ত কুসুমবালা,
অন্য পুরুষ গুণ করেছে পতিব্রতা নারীর
মেরুনরঙা দুটুকরো মন এবং খরর হাঁড়ির।
একটুকরো ভাত বেড়ে দেয় মগ্ন কবির পাতে,
অন্যটুকু পান সেজে দেয় আউলচোরের হাতে।
কবি যখন পদ্য লেখে, তখন ঘুমের ছলে
কবির নারী পরপুরুষের পিরিত বুকে তুলে
সুতোর ওপর জাহির করে চলার কারিগরি—
কবির ভার্যা ঘুমোয়, কবির বউ শুধু যায় চুরি।

সে আর নিয়ম মানবে না তবু ডাক্তার বলছে আমি নাকি ভাল হয়ে যাবো
হায় ! কাকে বলে ভাল থাকা, ভাবো
যখন এ পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ
বারবার হারিয়ে ফেলছে হুঁশ
সব কিছু হয়ে যাচ্ছে বাঁকা,
তখন যন্ত্র কতদিন আর আমাকে নিশ্বাসে রাখবে।
যদি আরো কয়েকটা বছর বেঁচেই থাকি
কারো কি সত্যিই কিছু এসে যাবে !

বোঝাপড়া বিচ্ছেদ

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়

হাত ধরাধরি পরিণয় হয়েছিল
ক'বছর ? আজ কত বছরের কথা ?
কলমের গাছে একাধিক সন্তান
ফলেছে। ওরাই শরীরের জয়গান।

শুনলাম, নাকি বোঝাপড়া বিচ্ছেদে
তোমরা এবার চলেছ সাক্ষী দিতে।
রুদ্ধ কক্ষ—একা সে বিচারপতি
হিন্দু বিবাহে গাঁঠছড়া খুলবেন।

স্পর্শে তো থাকে প্রেম তিক্ততা, ঘৃণা—
চিড় খেয়ে গেল কলহ বা ক্ষোভ বিনা ?
প্রতি লোমকূপ যার অতি পরিচিত
কাল থেকে তাকে বেমালুম ভোলা যাবে ?

তোমাকে গড়েছি বংশিধারী কৃষ্ণ বা খড়্গ ধারিণী মহেশ্বরী

দয়াময়
আমারই আপন সেই কল্পনার কাছে
হাঁটু ভেঙে বসেছি
ঐ খাদ্য খাদকের নিত্য ভিড়ে
ঈশ্বর তোমাকে দেখবো বলে।

বাঁচা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

ডাক্তার! এত যন্ত্র বুকে লাগাচ্ছো কেন? বামপন্থী শুলে
মেশিন কি শেষ অবধি বাঁচাবে আমাকে? কাত শুয়ে
নিজের হৃৎপিণ্ডে রক্তের অবাক ওঠা নামা দেখছি ইকো ডপলারে!
জন্মের সূচনা থেকে প্রায় সমাপ্ত বয়সে পৌঁছিয়ে
বাইরের পৃথিবী ছাড়া এতদিন ভিতরের কিছুই দেখিনি
নিজের স্পন্দনকেন্দ্র আজ এই বাহবাযন্ত্র দিচ্ছে চিনিয়ে।

যন্ত্রের কাজ শেষ হলো। নার্স, এবার আমাকে ওঠাও, তুমি বড়
সুভদ্র রমণী
বহুদিন অসুখের কাছাকাছি আছো তবু নিজে অসুখী হওনি!
আমার নিজস্ব আয়ু অক্ষরই নিয়ে গেছে বেশি
যা চেয়েছিলাম তা কি শুধু পয়ারের রমণীবিলাস!
এখন আমাকে আঙুল দেখিয়ে সব মুখর পড়োশি
বলছে ঐ যে শব্দ মাতাল যায়! সকালের ঘুম ভাঙা ঘাস
শিউলির শিশিরগাহন গন্ধ লিখতে পারিনি বলেই এই পরিহাস
আমাকে টুকরো করে মেধা আজকাল বড় এলোমেলো খঞ্জনী বাজায়
বুকের স্থাবর রক্তে আরো বেশি অস্থির রণন

মনেও হয়নি কিন্তু ঐ শ্যামল মাঠ
ঠিক যখন সোনা সোনা গড়ন
কাবো খালানে গোলা ভরাবে
কারো উঠোন শূন্য রাখবে
মনে পড়েনি ঐ মা-মা রমণীও
দরজায় কুলুপ টেনে বন্দী বেখেছে নওল কিশোব
পাছে বন্দেমাতরম বা ইনক্লাব হাঁকা উলি ঝুলি চুল হাভাতে
স্বদেশীব সঙ্গে দু-পা হাঁটে

সে সব দিনেও মনে স্বাধীন হবাব সাধ ছিল
আর সত্যি স্বাধীনই ছিলাম।
যেমন ফড়িং প্রজাপতি যেমন ভোবে
নিওর নিংড়ানো ঠাণ্ডা হাওয়া।
দুপুবের মধ্যমাঠে পিপুলেব পান-আদল পাতায
যেমন রৌদ্রেব হাসি পুকুরে খলবল পুঁটি
ছলাৎ ছলাৎ ঢেউ খেলায

তাবপর এ গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছি ভিন্ন গ্রামে
ফের নতুন ঘর-সংসাব পাতা
বুড়ো শিবেব থানে বটতলায়

এত বডো দেশ দয়াময়, এত বড়ো দেশ,
বুক ভবে ওঠে এই হিমালয়ে ঠেসান দেওয়া
সসাগরা ভাবত ভুবন মনে করে
তবু দেখে যেতে হলো
শিশু ও নারীব রক্তে মাখামাখি ধাবালো মাঞ্জায কাবা
আমাকেই দুখণ্ড তিন খণ্ড কবছে লাল ঘুড়ি উডিযে

আমি ঐ দোবগুলিতো মিছেই ধবেছি
আমার যা ইস্ট তুমি আমাবই তো সৃষ্ট দযাময়,
এই ব্রজভূমি ঢের দুঃখে বেদনায় ভেঙে ভেঙে

কাগতাড়ুয়া বিষের বাঁশি বাজিয়ের
সঙ্গী হবে বলে

আর ছিলাম সত্যিই কাঙাল
আঙিনায় বসাব জন্য পিঁড়ি বা আসন কেউ এগিয়েও দেয়নি,
এমন কি তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে এক আঁজলা জলের জন্য
ইঁদারার পাশে দাঁড়িযে আছি তো আছিই
কোনো কোনো তরুণী বৌ ভ্রমর চোখে একটু আধটু দবদের
দরজা খুলে দিতো

তারা দেখেছে
দোবে দোবে ভিখ মাগা স্বদেশী ঘরছাড়া
ঘবের মা পিছনে ফেলে মস্ত বড়ো দেশজোড়া
বিশালাক্ষী মা খোঁজে বালক

'সে সব কি দিন ছিল হে
জনগণকে চেনো,
তারা ছিল ভালবাসাব বিপুল ভাণ্ডার'
রাইটার্সের্ব পুল কাবে গা ভাসাতে বলছেন সাংসদ

মিথ্যে কথা, গ্রাম শহবে হঠা বাহার বলে
ঘরে ঘরে ধাওড়ায় ঝোপড়িতে ঝাঁপ বন্ধ হতো তর্জনি তুললেই

মাথা ভেঙে ফেলছে রোদ
চুবিয়ে দিচ্ছে আষাঢ় শ্রাবণ,
মেঠো রাস্তায় সবুজ নধব ধান খেসারি মটব বোয়া মাঠ পাব হতে
বুক ভরে গিয়েছে এই শ্যামল সুন্দরী দেশ দেখে
আনচান কবেছে মনটা ঠিক উপেনের মতোই
গ্রামেব প্রৌঢ়া ঐ মা-মা দেখতে বমণীকে
একবার মা ডাকি

এক বৃদ্ধ বিপ্লবী আমাকে বলেছিলেন

তরুণ সান্যাল

জীবন কি তা জানা হলো না, সিঁড়ি ভাঙা ভগ্নাংশ গণিতে
হয়তো সমাধান আছে শেষ এক শূন্যই

কিংবা ব্রহ্ম হয়ে, এক,
এত যে গাছপালা, আলোক লতা ধুঁধুল, এত খাদ্য ও খাদক
এত প্রসাধন বঙে আর রঙে, সত্যিই কী বোঝা গেল না।

দুর্দাব পাথর ঠেলে ঝর্ণা নামছে পা ডুবিয়ে ঘাড় নীচু শিঙেল,
গাছের আড়ালে ঘাপটি বসে রযেছে পবকলায ফ্ল্যাশ জ্বালিয়ে চিতা
এস্পার ওস্পার করতে বোলডারেব ঘাড়ে চড়েছে কালচে হলদে
হাঁ-মুখ পাইথন

এবং বিদ্যুৎ লাফে ঝর্ণা পার হতেই
কঙ্করের ঘাড়ে বিঁধেছে ভোমরা মুখ থ্রিনট থ্রি বুলেট

যখন এসব ঘটছে কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ পান্তায়
নিবানি বা বীজতলায় বা রোয়ায় এমন বিহানে
বাঁচাব সুলুক জানা যায় ?

দযাময়
এ বযসে তোমাবইতো দোর ধরলাম প্রভু

বালক বয়স থেকে এব দাওযায ওব উঠোনে ঠেক
ঘাড়ে নিশান কাঁধে ঝুলি এতোল বেতোল
কর্তা চোখ বাঙায় তার চাষ-পালানো ছেলেটিকে
গিন্নিমার কড়া নজর ঘাট ফেরত মেয়েটিকে
ঠোকবাচ্ছে খাঁচার কাঠি ওরা
মেঘ আর নীল মাখামাখি বিল বা হাওরে পথ হারানো জল কাদায়

আপনজনের হাবানো কথারা জলেব শরীব নিয়ে
মিশে যাচ্ছে কীর্তিনাশাব স্রোতে
দুকূল ছাপিয়ে তাবা গিযে মিশবে
লোকাযত ভাষার সমুদ্রে।

এখন সন্তান আসছে

বিতোষ আচার্য

এখন সন্তান আসছে মাতৃত্বের মুগ্ধকোল জুড়ে
　　এখানে সন্তান আসবে অনেকদিন পর
　　　　অন্ধকাব নড়ে উঠছে
　　　　　　শেষ রাতের তাবা যেতে যেতে বলে যায়
　　　　　　　　কী ইঙ্গিতে সবটুকু বুঝিনে…

প্রতীক্ষাব নিঃশব্দ সময়
　　যেন বা নিথর নদী—গর্ভ খুঁড়ে তার
　　　　কারা যেন রক্তপদ্ম থরে থবে বেখে গেছে
　　　　　　দু'পাড়ে পাহাড়ঃ
এখন চুপ যাও সব, শিগগিবই সন্তাম আসবে অনেকদিন পব

ভুলে গেছি, শেষ কবে এসেছিল ঃ
　　খালি কবে স্নিগ্ধ কোল কোন অবেলায
　　　　ফেলে বেখে দুধের ভাণ্ডাব
　　নীলকমল-লালকমল বাছারা আমার
　　　　যুদ্ধে গিযে আর ফেবেনি—
　　মাতৃত্বেব বুক টনটন ব্যথায
　　　　জীর্ণ, দীর্ণ হযে শেষে
　　　　　　মিশেছে হাওযায়।
এখন চুপ যাও সব, এখানে সন্তান আসছে অনেকদিন পব ॥

গিঁট লেগেছে ভাবনাতেও, হারিয়ে গেছে খেই
সবাই যেন বজ্রাহত, ঠায় দাঁড়িয়ে আছে
কোথায় যাবে, কোনদিকে, তার হদিশ জানা নেই
চতুর্দিকে গহ্বরেরা চেঁচিয়ে ডাকে কাছে।

চতুর্দিকে দুর্নীতির মত্ত মহোৎসব
বালুর ওপর দাঁড়িয়ে কারা জলের ছায়া খোঁজে
শ্মশানে যায় শুদ্ধতম অনুভূতির শব
কানে একুশ শতাব্দীর পদধ্বনি বাজে।

হারানো কথা

কৃষ্ণ ধর

একফোঁটা সময় রাখেনি তার জন্য
সে ছিল কিছু কথার প্রতীক্ষায়

হাততালি কুড়োতে কুড়োতে তোমার দিনমান চলে গেল
ফুলের মালার সুরভিতে আচ্ছন্ন থাকো সারাক্ষণ
চমক লাগে তোমার সভাঘরের ভাষণে
সবাই বলে, সাবাস্ !

তবু কথার খেলাপ করলে তুমি
তার জন্য সময় রাখোনি একটুও

চারদিকে স্তূপ হয়ে জমেছে সব মানপত্র
তার তলায় চাপা পড়ে যাচ্ছে আপন কথা
আর পারুল বোনটির কাহিনী।

স্মৃতি বিস্মৃতির জাফরি

জবাযুব আঙুব বাগানে এলো ত্রয়োদশী চাঁদ এমন সময
অবাক বিস্মযে বলেছিলে হলুদ পাখির গল্প বাতেব জঙ্গলে
গাছগাছালির সমুদ্র গর্জনে, বিদ্যুতের দ্যুতিময ক্ষুধিত আলোয
গ্রহ উপগ্রহের বারুণী শুদ্ধতা আড়ি পেতে শুনেছিল শব্দের সঙ্গীত
জল ডুমুবেব ডাল ধরে ঝর্ণার আনন্দেব মতো।

তারপব শঙ্কা বুকে পুষে দৃশ্য সংযত
জেলে ডিঙি ঠেলে দিয়ে হাঙর তবঙ্গে, চলে গেলে।

এখন একলা আমি। আত্ম বচনার পর্ব। নিঃসঙ্গ সাধনা
এবং ক্ষতের মধ্যে তুমি,
বলয় গ্রাসের উজ্জ্বলতা, নিশীথের মৌন গন্ধরাজ।

এই হাওয়া, এই পরিবেশ

চিত্ত ঘোষ

চতুর্দিকে অন্ধকারের আড়ত
মাফিয়া ডন দুষ্কৃতিব জমজমাট মেলা
প্রতারণার মরুভূমি, লুণ্ঠনের সুসজ্জিত রথ
উচ্চাশাব তাঁবুতে চলে সার্কাসের খেলা।

দিন দিনই লম্বা হয জিঘাংসার হাত
তাজা বুলেট মাঝে মাঝেই বক্ষভেদী হয়
আগুনে পোড়ে যৌবনেব আত্মঘাতী রাত
ট্রেনের মতো এ্যাক্সিডেন্টে দুমড়ানো সময়।

আকাশের ক্লান্ত পাখিদের প্রিয়তম বাসা হতে পাবে
নীলমণি মঞ্জবীব বিদ্যুৎ আঙুলে
কপালেব ভাঁজগুলো খুলতে খুলতে বলেছিলে
জীবনেব ভাব সত্যিই অসহ্য
সমুদ্রেব এক টুকরো উন্মাদনা নিযে সাজাতে পারো না বোধ
দুপুরেব পাখিদের নিঃসঙ্গ ডাকের সঙ্গে মিলে মিশে
জাগাতে পারো না তুমি মুখশ্রী অনন্য
অলক্ষ্যের হাওয়া এসে তখনই বাজাতে পারে আত্মার তম্বুবা
আবম্ভই নেই যার তার নেই নিঃশব্দ বিনাশ
সবই নিত্য বর্তমান, পলকে পলকে, ঝলকে ঝলকে হযে ওঠা
অশ্বত্থেব পাতায ধ্বনিত বৃষ্টির বন্য গান শুনতে শুনতে
রাত্রির কৃষ্ণাভ মদে হয়ে যাও স্বর্গীয মাতাল।

স্বেচ্ছা নির্বাসনে আছে আত্ম আবিষ্কার
উপস্থিতি তাব লাবণ্যের রূপকথা
দীর্ঘাঙ্গী নাবীর সিক্ত আঁখি পল্লবের নীচে
নন্দিনীব বৃক্ষের জন্ম
এবং হলুদ পাতাব তলায সমাধির নিবিড় সুগন্ধ
ভোমবা ও প্রজাপতি নিযে রঙিন বঙ্গনা ঠমক দেখায।

কি হবে নিজেকে খুঁজে শব্দার্থে বা জ্যামিতিক প্রতিজ্ঞায় শুধু
অনিশ্চিতেব বাঘনখ জেগে থাকে
জীবনের মর্মে ও শিকড়ে
সামুদ্রিক ঝড় এসে কাঁধে কবে নিয়ে গেছে জেটি ক্রেন সব—

সময়ের খোঁজে আমি

মণীন্দ্র রায়

জীবনের মঞ্চে আমি নাদির শাহের মত
ঝড়ের ঝটিকার বেগে লুঠপাট খুন হত্যা অগ্নিসংযোগের শেষে
নারী আর ক্রীতদাস নিয়ে রক্তে পদচ্ছাপ ফেলে যাব না বেড়িয়ে
অথবা বুদ্ধের মত পাদ্য অর্ঘ্য নিয়ে,
বচনে চলনে, মনে শান্তিস্পর্শ দিয়ে,
স্মরণীয় হব না কখনও ইতিহাস।
কালের খোঁজার মত পুরো সৃষ্টি হবে না এ মনে
এ প্রকৃতি কেন তবে এনেছিলে অনুর্বর জগতে আমায়
বৃষ্টি দাও সৃষ্টি দাও এই অনড় মাটিতে আমার
শাখায় ফুল যদি নাই আসে
আসুক ধুতরা, একদিন হয়ত আসবে রক্তের ভিতর থেকে
লাল কৃষ্ণচূড়া

আলো আঁধারির জাফরি থেকে

রাম বসু

কেন এসেছিলে কেন-ই বা চলে গেলে
এ সব নিষাদ প্রশ্ন উজ্জীবিত হবার আগেই
নক্ষত্রের কক্ষপথ থেকে আমি তার সম্মোহনী স্মৃতিস্বর শুনে
বুঝতে পেরেছি প্রদীপের ক্ষীণ আলো আর ধোঁয়া
ক্রমশ বিছিয়ে যায় সত্তার শিকড়ে
সময়ের কারুকার্য করা ভবিষ্যতে জায়মান ছায়ায় সুগন্ধি
হাসির প্রবাল কণা তরঙ্গের শীর্ষতম বিন্দুর মতন
রামধনু হতে পারে সপ্তলোকে লোকান্তরে গিয়ে

পযসা ঢ্ুকে গেছে। বাবা তো আসতে পারলেন না। মাবা গেলেন। মা বর্ধমানের বাড়ি ছেড়ে আসবেন না। ঠাকুমাব পযসা, বাবাব পযসা, আমাব ঠাকুমা আমায় যা দিযেছিলেন আব কি—এখন যদি না থাকতে পাবি! চলে আয, আমবা এক সঙ্গে থাকি—চারপাশে মানুষ বড় কমে যাচ্ছে, ছোট হযে যাচ্ছে

কিন্তু পবিমল যেন দেখছে তাব ঠাকুর্দা অবিশ্বাসেব হাতে চাবিটা এগিযে ধবেছেন। আব পবিমল নয়, পবিমল তো নয তার বদলে সোফার এপাশে যেন বসে আছে—নগেন পাল—

পবিমল শাদা হতে থাকে। ঘামতে থাকে। গলা দিযে কি বকম একটা আওযাজ ওঠে। সোফাব পাশে মেঝেতে পড়ে যাচ্ছিল, জীবনানন্দ চেঁচিযে ওঠেন—মালা শিগগির জল নিযে এস—

———

খাবে এখন। উনি মালাকে কি ইশারা করলেন।

মালা ভেতর ঘরে গিয়ে একটা কি নিয়ে এলেন। পরিমল দেখেনি।

—শোন পরিমল আমি ভেবেছি। বৌকে সোদপুরে রেখে তুই কলকাতায় কাজে আসবি দেরি করে ফিরবি, হঠাৎ একদিন ঝামেলায় পড়বি—

—কি করব—

—কলকাতায় আসবি—কলকাতার কাছে—

—কোথায় ?

এবার মালা হঠাৎ বলেন, কেন এখানে ? তোমার কাকুর কাছে শুনেছি তোমার দুটো ফুটফুটে বাচ্চা আছে ! ওই দুই বাচ্চার সঙ্গে খেলে, তোমার বৌএর সঙ্গে গল্প করে আমার সময় দিব্যি চলে যাবে। আমি তো এতদিনে যদি দুটো ভাইপোও পেয়ে যাই—

পরিমল অবাক চোখে ওদের দেখে—

জীবনানন্দ বলেন, আচ্ছা পরিমল, বেড়ালের মৃত্যুতে তুই এখনও শোকসভা করিস ! জীবনানন্দ হাসেন। পরির বেড়াল বুঝলে আমার ঘরের একটু দূরে একটা ঝোপের কাছে সাপের সঙ্গে খেলছে। ফনা তোলা গোখরো সাপ। পরিমলের বেড়াল কাঁধ সোজা করে মাথা তুলে থাবা তুলেছে—এই মাহেন্দ্রক্ষণে একটি ছেলে ছুটে এসে সাপের মাথায় তিনটি বাড়ি মারার চেষ্টা করল—তিনটেই পড়ল পরিমলের বেড়ালের মাথায়। বেড়ালটা কাত হয়ে পড়ে গেল—সাপটাও ফনা নামিয়ে একে বেঁকে পালিয়ে গেল।

—বেড়ালটা মরে গেল ? মালার প্রশ্ন।

—না মরে নি শেষ মেষ সত্যি। তাও পরিমলের চেষ্টায়—কুলোর বাতাস ঝুড়ি চাপা। আধঘণ্টা বাদে বেড়ালের জ্ঞান ফিরলে পরির কান্না থামল।

তুমি ওখানে কি করছিলে ?

আরে আমি যে বেড়ালের ডাক্তার নই পরিমলকে তখন কে বোঝাবে ! কাকু তুমি একটু দেখ—

ছোট বেলার স্মৃতি মেজর দৃষ্টির চরাচরের সামনে পরিমলের, এখন একটি চাবি। চাবিটা মালা কাকির হাত থেকে জীবনানন্দ কাকুর হাতে চলে এল—

পরি ওপরে চলে আয়। চারতলার ফ্ল্যাটটাও আমার। তিন প্রজন্মের

খুঁড়িয়ে ওই ইট বালি, সিমেণ্ট লোহার কর্মযজ্ঞের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে অশীতিপর সেই নগেন পাল।

—কাকু দেখ আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।

মালা বললেন পরিমল বাবুর মুখটা ফ্যাকাশে—

পরিমল আঁৎকে উঠে বলে, কাকিমা আমায় বাবু বলছেন কেন!

জীবনানন্দ পরিমলকে দেখতে দেখতে বলেন, না না বাবু বলতে হবে না মালা, একে আমি ইজের পরতে দেখেছি—আর এখনও এর মুখ চোখ দেখছ না। একে ছোট বেলা পেড়ে ফেলেছে—

আসলে কাকু, বাড়িটা দখল করায় আমার রাগ হয়নি, তুমি নিয়ে গিয়েছিলে তো—কুমোরটুলির সরস্বতী ভেঙে কী করে দিয়েছিল বল—তালা ভেঙে, প্রতিমা ভেঙে ফের মিথ্যে কথা—

তুই ফ্ল্যাট নিবি?

—ঠিক করিনি কাকু—

—কভি নেহি। শোন তোর যা টেম্পারামেণ্ট তুই পারবি না। চারপাশের লোকজন—শোন আমার নিচের ফ্ল্যাটের বিনোদবাবু দু'মাস আগে এসেছেন বলে মালিকসুলভ হাবভাব দেখান, সিঁড়ির কাছের যতটা স্পেশ পেরেছেন ফুলের টব, হ্যানা ত্যানা দিয়ে দখল করেছেন। কেয়ার টেকারের এখনও ঘর হয়নি বলে আমাদের পালা করে একঘণ্টা করে এবেলা ওবেলা পাম্প চালাতে হয়। পালা করে দরজা দিতে হয়। তা নিয়েও অশান্তি—আজ তোর কাকিমাকে নিচের বাসিন্দা বলেছে, শুনুন ম্যাডাম কালকে আপনি বোধ হয় ঘড়ি ধরে একঘণ্টা পাম্প চালান নি!

—চালিয়েছি। বরং মিনিট পাঁচেক বেশী হবে। কম নয়। তোর কাকিমা বলেছে।

—কী জানি কি যে হয় আমার তো জলটল কিছু ছিল না—বিনোদ বাবুর অবিশ্বাস মেটেনি।

রাত এগারোটার সময় সদর গেটে তালা দেয়ার কথা। নীচের বিনোদবাবুর কাল দশটা পঁয়ত্রিশে ফিরে দেখি গেটে তালা। তোর কাকীমাকে ডেকে আমি তালা খুলি।

আরও ঝামেলা আছে। আগে বিনতার কথা বল। কেমন আছে? পকেট থেকে কাগজ বের করে পরিমল। এ ওষুধটা থাক বুঝলি—শুধু টনিকটা

জীবানানন্দ কাকু আমি এসে গেছি। সওযা আটটা। কলিং বেল এবং চীৎকাব।

—আপনি মালা কাকিমা? আমিই জীবনানন্দ কাকুব পবিমল। পবি। ছোটবেলায আমি ওনাব খুব ন্যাওটা ছিলাম জানেন—এতদিন বাদে আবার যোগাযোগ হযে গেল। ওপবঅলাই কবিযে দিলেন—ভাগ্যিস বৌটাব ওবকম একটা প্রবলেম হ'ল, ভাগ্যিস জীবনানন্দ কাকু এসে পড়লেন…

অ্যাই থাম, কি কথাবে! ভাগ্যিস বৌটাব—জীবনানন্দ বললেন, এই পরিমল, আমার একটা কনফিউশন হচ্ছে।

ওই হতছাড়া লোকটাব নামটা কি ছিল বে! ঐ যে, যে ব্যাটা দ্বিতীযবার তোদেব বাড়িটা দখল কবল। সবস্বতীকে তালা ভেঙে উপদ্রব কবে মেঝেতে ফেলে দিল—নগেন পাল না—?

পবিমল হাতে সবে জলেব গ্লাস নিযেছিল, জলে চুমুক দিতে যাচ্ছিল—জল চলকে গলায আটকে, পরিমল চোখ করে কাশতে লাগল—

এমা একি!—মালা এগিযে আসেন জীবনানন্দও, বলেন, এমা একি হল রে তোব। বেষম লেগেছে? গ্লাসটা নামিয়ে রেখে, কাশি থামিযে একটু সুস্থ হযে বলল পবিমল, ভয়ার্ত পবিমল, কাকু—এখানেও নগেন পাল!

জীবনানন্দ হাসেন—কেন বে আমরা বুড়োবুড়ি তোব ছেলেবেলার কাণ্ড-কারখানা নিযে আলোচনা কবছিলাম সেখানে তোর পবোপকারেব কথাও উঠল—নগেন পালেব কথাও তাই—

ভীত পরিমল বলল, মুখ চোখে তাব কেমন যেন বেদনাব ছাপ—কথা উঠবে কি এতদিন পবে তাকে আমি জ্যান্ত দেখলাম আজ সকালে, এই দ্যাখ কাকু আমাব বুক ধবাস্ ধবাস্ কবছে—

মালা অবাক চোখে পরিমলকে দেখছেন। জীবনানন্দ বললেন, আবাব উঠে দাঁড়ালি কেন, বসে নে। অশোকনগবে গিয়েছিলি? দেখলি কোথায? বেঁচে আছে—?

কাকু আজকে সকাল বেলা আমি ফ্ল্যাটের খোঁজে বেবিযেছিলাম—ব্যাবাক-পুরেব ওদিকটায়—হাউসিং প্রকল্প হচ্ছে—এক্সপ্রেসওযেব একটা ধারে—একটা লোক আমায় খুব ঘুবিযে ঘুরিয়ে ফ্ল্যাটগুলো দেখাল—কোনটা আমাব নাগালের মধ্যে (লোন পেলে অবশ্য), কোনটা বাইরে, বেরিযে আসছি হঠাৎ আমার বুক কাঁপিয়ে, হৃদস্পন্দন, দেখি একটা লাঠি নিয়ে খুঁড়িয়ে

সবাই ওনাকে মানত। পবামর্শ নিত। আমায় ও স্নেহ করতেন।

ওই পাড়াতেই নামটা ভুলে যাচ্ছি, পরিমল এলে কনফার্ম কবে নেব, একটা বেচেড শযতান ছিল। নগেন-পাল মনে হয। একদা বাড়িতে তিনি জবব দখল ছিলেন। মুস্কিল হয়েছে নগেন পালের এক ছেলে পরিমলদের সঙ্গে খেলত।

...বব দখল করা বাড়ির... মিলিটারিতে ছিলেন, বছর পাঁচেক ধরে ভদ্রভাবে বুঝিয়ে সুঝিযে... অনেক চেষ্টা কবে শেষ মেশ হতোদ্যম হযে একদিন মিলিটারি ট্রাক নিযে... জবরদখল তুলে দেন। সে এক বিতি-কিচ্ছিবি কান্ড।

নগেন পালের বিড়ির ব্যবসা, 'নবযুগ বিড়ি'। সব জিনিসপত্র উল্টে ফেলে দিযে গেল মিলিটারি। ওদেব একদম রাস্তায তুলে দিল। আমি যে বাড়িটায ছিলাম, তার পাশের বাড়ির মালিক থাকতেন কলকাতায, অতএব ফাঁকা, সে চাবিটা ছিল মাস্টামশাই পরিমলের দাদুর কাছে। পবিমলেব সঙ্গে আমাব প্রথম জানলা দিযে আলাপ। ও মাঝে মাঝে বই নিযে ফাঁকা ঘবে পড়তে আসত, পড়ার ফাঁকে পড়ার শেষে, আমাদেব নানা রকম গল্প চলত—

পবিমল বন্ধুর দুঃখে, বন্ধুর বাবার দুঃখে বিগলিত হযে ঠাকুর্দাকে কান্নাকাটি করে বিচলিত করে, শয়তানটাকে আর একটা জবর দখলেব সুযোগ করে দিযেছিল।

পবিমলেব ঠাকুর্দা চাবিটা নাতির কান্নাটিব জন্যই হাতছাড়া করে ছিলেন।

একমাস থাকতে দিন মাস্টামশাই। উঠে যাব। একটা জাযগা ঠিক করে নিই।

মাস্টামশাই বলেছিলেন জানবেন আমাব নাতির জন্যই ঘবের চাবিটা পাচ্ছেন। গণেশ বাবুকে পাঁচছর অপেক্ষা করতে হল, আপনি ব্যবস্থা করেননি —তাই তো মিলিটারি—এখন বলছেন একমাসে।

—দেখবেন মাষ্টারমাশাই—

আমরা কি দেখলাম জানো মালা? একটা ঘবে ঢুকেছিল। সাত দিনের মধ্যে পাশেব ঘরেব তালা ভেঙে আমাদেব কুমোরটুলি থেকে আনা সরস্বতীকে মেঝেতে উপুর করে দিযে তাবা বাড়ির সীমানায় গাছ পুঁতেছে, দেয়াল তুলছে—

বছবের বাচ্চা এবং কোলেব শিশু, বৌ নিযে বেশ নাজেহাল হযেছে পরিমল। সোদপুবে থাকে। কলকাতায় অফিস্। কলকাতা, বৌ বাচ্চা সোদপুব সামলে বেচাবা একদম···

মজাটা কি জানো সবাব বিপবে ছেলেটা ঝাঁপিয়ে পড়ে অথচ ওব দুর্দিনে—

ওব বাড়িঅলাব কথাই ধব। আমি শুনে[illegible]বাড়িঅলাব মেযেব অ খেব সময ও অফিস ছুটি নিযে এধাব-ওধাব করে[illegible]ডাক্তাবেব কাছে নিযে গেছে রাত জেগেছে অথচ দেখ অসুস্থ বৌটাকে নি[illegible]বাসায ফিবল দু'দিনও হযনি বাড়িঅলা ওকে উঠে যেতে বলল। কাবণ কি? বাড়িটা নাকি এখুনি রিপেযাব করা প্রযোজন। উনি আব ভাড়া টাড়া দেবেন না। ছেলে বড হচ্ছে। একতলাটা ছেলেব লাগবে। অথচ দেখবে পরিমল বাড়ি ছাড়বে, বাড়িতে একটু প্যাচ ওযার্ক হবে। তারপব দেড়া ভাড়ায়, ডাবল অ্যাডভান্সে বাড়িটা ফেব ভাড়া দেবে।

পবিমল ভাইপো তোমাব ভাড়াটা একটু বেশী করে দিলেই তো পাবত—

বলেনি বুঝি? বাড়িঅলা নাকি ওসব কথা ভাবছেই না। বাড়ি ভাড়াই দেবে না।

জীবনানন্দ কোলেব বইটা বন্ধ করে ফেলেন। ছেলেটা ববাবরই একটু সবল, সাদাসিধে। একটু বোকাও বলতে পাব। খুব ইম্পালসিভ, ইমো-শনাল। বেশ ভালো, পবপোকাবী।

মালা হাসে—ওব ব্যাপাবে তোমার একটা নস্টালজিযাও কাজ করে।

কবেই তো। ফাস্ট প্লেস অব পোস্টিং। ও তখন কত ছোট। ঘুরে ঘুরে আবাব দু'জনে ফেব দেখা হযে গেল। ওদের কিশলয সংঘেব পুজোয হঠাৎ সুভেনির ছেপে এলে দেখলাম আমি সভাপতি।

—সেই আনন্দে ছেলেগুলোকে ফুসলে কুমোরটুলি নিয়ে গেলে।

হাফপ্যান্ট পরা ছেলেগুলোব সেই চকচকে চোখ, হাসিমুখগুলো জানো মালা আমার এখনও মনে পড়ে।

মালা হাসেন। তোমাব তখন বোগীটোগি হত না নিশ্চযই। বাচ্চাদেব সঙ্গে এত সময ব্যয কবতে—

পরিমলেব একটা কাণ্ড শোন। পরিমলের ঠাকুর্দা তখন বেঁচে। সারা-জীবন হেডমাস্টারি করেছেন স্কুলে। ভালো মানুষ, পরোপকারী, পাড়ার

সতেরোশো ভাড়া। কখন ফিরবেন? কাল সকালে গিয়ে সব ঠিক করে আসবেন। তাড়াহুড়োর দরকার নেই, ডাক্তার বাবুর কাছ থেকে ঘুরে আপনি আসুন। একটু মন খারাপ করছে আমাদের, আপনারা খুব দূরে চলে যাচ্ছেন না—

॥ দুই ॥

সাতটা সওয়া সাতটা নাগাদ মালা সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার ভালোমানুষ দেওরটি তো এখনও এল না।

—দেওর কি গো! ওতো আমায় কাকু বলে ডাকে।

—যাক আমি তবে কাকিমা! মালার মুখে হাসি। কি করে বুঝব বল! কেউতো আর মা বলে ডাকেনি। ডাকল না।

জীবনানন্দ বললেন, এই দেখ, আবার ওসব শুরু করবে নাকি!

মালা বললেন, না গো না। আসলে জানো, তোমায় বলা হয়নি, নীচের তলার বিনোদবাবু সকালবেলা মেজাজটাই নষ্ট করে দিয়েছেন।

—বলনি কেন। কি হয়েছে।

—তুমি কিন্তু আজকাল আর আমায় দেখে কিছুই বুঝতে পার না।

—কি হয়েছে বলবে তো!

—এখন থাক। পরিমলের কথা বল।

—সেই ভালো। জীবনানন্দ বললেন, আবোল-তাবোল লোকের আবোল-তাবোল কথায় মেজাজ নষ্ট করে লাভ নেই। খুব ভুল হয়ে গেছে জানো, এরকম একটা ফ্ল্যাটে এসে আমাদের ওঠা ঠিক হয়নি। কেনা ঠিক হয় নি। তবে বিনোদবাবুকে, বিনোদ বাবুদের নেক্সট্ মিটিং-এই আমি বুঝিয়ে দেব ফ্ল্যাটে দু মাস আগে এলেই মাতবরি করার অধিকার জন্মায় না—মালিকসুলভ হাবভাব আমি দু'দিনে··

মালা হাসলেন। আমি তো ভুলে গেলাম। তুমি এখনও পুরনো কথা নিয়ে · তোমার পরিমল বোধহয় আজ আর এল না।

আসবে আসবে। জানলে ভালো ছেলেটা খুব বিপদে পড়েছে। ওর স্ত্রী এখনও পুরো সুস্থ হয়নি। তোমাকে বলেছিলাম। অপারেশনের পর জ্ঞান ফিরছিল না। হঠাৎ আমায় নার্সিং হোম থেকে ফোন করে। গিয়ে দেখি আমাদের সেই অশোক নগরের পরিমলের বৌ। যাকগে সেটা সামলাল। পাঁচ

—ধুর বেটা, একমাসের নোটিশ আমার বাসা পাল্টাতে হবে।

কি বলালি, ওপাশে হৈচৈ। তাব মানে অরূপের আশে পাশে আরও দু'একজন আছে—বৌ পাল্টাবি পবিমল!

হেঃ হেঃ এই বযসে সে ধকল সইবে? পবিমল ফোনটা ছেড়ে দেয। বিরক্ত পরিমল ফোনটা ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ গুম মেবে ছিল। বাড়িঅলা বিজিত বাবু ফোনের দিকে নজর, কান সবই তাক করে ছিলেন।

বাসস্টপে দাঁড়াতে দাঁড়াতে ছটা চল্লিশ। গতকালেব ফোনের কথা মনে পড়ায আব একটা কথাও মনে পড়ে যায় পবিমলেব। প্রতিবেশী কলেজেব এক সহপাঠীব পিসেমশাই মিঃ মজুমদাবেব বিকেলে একটা খবব দেযার কথা। গতকাল বাজারে মজুমদাববাবু পরিমলেব সমস্যাব কথা মন দিযে শুনেছিলেন। স্ত্রী অসুস্থ। অত ছোট বাচ্চা। মজুমদাববাবু ম্লান হাসলেন, আমবা তো ভাবতেই পাবছি না, ওদেব জন্য এত কবলেন, এখন উঠে যেতে বলছে, বললেই হল। আপনি সময় চান। আমি দেখছি। আরে দাঁড়ান আমাদেব লাইনেই তো একদম মাঠের কাছে দাসমশাই-এব একতলাটা তো খালি থাকাব কথা—দাঁড়ান দেখি। বিকেলে বাডি থাকবেন? নয় তো বৌমাকে বলে আসব। গতকাল সেই দাসমশাইকে ধবা যাযনি। আজ নিশ্চযই মজুমদাব বাবু—কিন্তু বাড়িঅলাকে ফোন কবা যাবে না, দোতলায় বিনুব এখনও উঠতে কষ্ট হয।

তবে পাশের বাড়িব বিনুব বন্ধু মহিলাকে। উনিতো কতবাব বলেছেন আমাব ফোনটা ব্যবহাব কবতে পাবেন—কোন খবব থাকলে জানলা দিযে বিনু বলে দিতে পারবে। মহিলা তো সব জানেন। বাস্তার উল্টোদিকেব লটাবিব দোকানেব পাশেই টেলিফোন বুথ। পবিমল নম্ববটা পেয়ে যায। পাশের বাডিব বৌদিই ধবেন। একটু আগে আমি আপনাদেব বাসা থেকে এলাম। সব ঠিক আছে। আপনাব বডটা এখন আমাব কাছে। ছোটটা ঘুমচ্ছে। আপনাব স্ত্রী ঠিক আছে। আজ আমবা অনেক গল্প করলাম। দুঃখটা এই—আপনাদেব এপাড়াটা ছেড়ে যেতে হবে। এত ঝামেলা গেল আপনাদেব আমি হ'লে কিন্তু এই বিপদেব সময ভাডাটেকে উঠে যেতে বলতাম না। ও শুনুন কালকে আমাদেব পেছনেব দিকটায, দক্ষিণ পাডায বাডি দেখতে যেতে হবে। মজুমদাবদাব সঙ্গে বিনতাব হযে বাড়িটা আমি দেখে এসেছি বাবুকে নিয়ে। সামনে একটা মাঠ আছে। বাবু খেলতে পাববে। চাব হাজাব অ্যাডভান্স।

যাব না ? একঘণ্টা হয়ে গেছে বসে আছি। এবপব বাগুইহাটিতে বিপোর্ট কবতে যেতে হবে। ফিবব কখন ! সেই সকাল থেকে ছুটছি জানিস, ব্যাবাকপুব সোদপুব—তুই যে সেই ভাডার কথা বলেছিলি, নাগেববাজাবে। বাসাটা আছে ? পাওযা যাবে ?

অনন্ত বলল যা শ্বা বা। এই জন্য তোব এত তাডা। আমি ভাবলাম কি না কি !

লোকে জীবন পাল্টে ফেলে। দুম কবে উইথ আব উইথ আউট প্রিপাবেশন জীবন সঙ্গিনী পাল্টে ফেলে—তুই মাত্র একটা বাড়ি পাল্টাবি তাতেই এত মুষডে পডেছিস। জানিস আমাদেব অফিসেব দেবনাথ কুডি বাব বাসা-পাল্টেছে—ইনফ্যাক্ট ওই ফ্ল্যাটটাব কথা আমায দেবনাথই বলেছিল—ওব সঙ্গে দেখা হোক কথা বলি—

ও এখনও বলিসনি। থাকিস তো হোটেল দি পাপায। আমাদেব সমস্যা অনন্ত বুঝবে না তুমি—আজ পালাই, বাগুইহাটি যাবো। একটা ওষুধ হযতো পাল্টাতে হবে।

তুই যা বসে বসে কফি খা। আমি বসতে পাবছি না।

না, যেদিকে হয পবিমল চলে যাবে। বাডিঅলাকে বুঝিযে দিতে হবে একদিনও আব তাব ফ্ল্যাটে পবিমল থাকতে চায না। যত তাডাতাড়ি হয সে বাসটা ছেডে দেবে। মুস্কিল হয়ে গেছে বিনুটা অসুস্থ হয়ে পডায। মুস্কিল হযে গেছে একটা একদম গ্যাদা শিশু হওযায। নয়ত পবিমল এক দিনেই ঠিক একটা হেস্তনেস্ত কবে নিত। এত ভাবার কিছু ছিল নাকি !

কাল হঠাৎ অফিসেব অবুপ বাডিওযালাব নম্ববে ফোন কবেছিল। ফোনটা ধরতেই অবুপেব গাল, কিবে তোব ব্যাপাবটা কি বল তো। গতবাব গেট টুগেদাব-এ আসিসনি। বলালি বৌ-এব শবীব খাবাপ। পবশু মিটিং আছে ব্যাচেব, চলে আয। বঘুনাথ কি বলেছে জানিস, পবিমলকে একটু বলে দিস গাডি থাকলে যেমন সার্ভিসিং কবাতে হয় তেমনি আমাদের সংসাবেব গাডিকেও মাঝে সার্ভিসিং কবাতে হয। একটা ভাল গাইনিব ডাক্তাবকে দেখিযে খোলনলচে সার্ফ সুবতো কবে নে।

পবিমল দাঁত চেপে বলে আস্তে বল।

—মিটিং এ আসছিস—

বাসা পাল্টাচ্ছে পরিমল

সুদর্শন সেনশর্মা

পবিমল চাবদিক দেখছিল। অনন্ত তখনও আসেনি। গত সপ্তাহেই তো অনন্ত বলেছিল নাগের বাজাবের দিকে মোটামুটি একটা ভাল ফ্ল্যাট—আগে তো আসুক। সাড়েছ'টা হতে চলল। সকাল থেকে তাব ছোটাছুটি চলছে। এখান থেকে বাগুইহাটিতে জীবনানন্দ কাকুকে বিপোর্ট কবতে যেতে হবে। বিনতাব এখনও কফি হাউসেব সিঁড়িতে ওঠাব সময পবিমল দেখেছে আনতশিব অধোবদন এক তবুণীকে—চোখে জল। তোমাদেব এত কি দুঃখ দিদিমনি! পড়তে পরিমলেব মত ঝামেলায, দম বেবিযে যেত। মেযেটিব ঠিক উল্টোদিকে দাঁড়ান ছেলেটিকে, প্রথম মেযেটিব বন্ধু আবেকটি মেযে খুব ধমকাচ্ছে—দ্যাখ তোদেব এভাবে একজনের লাইফ আব একজনেব স্পযেল করার কোন বাইট নেই। মহিমাকে তুই ছেড়ে দে স্বপন। তোবা ইনকম-প্যাটিবল। উঠতে উঠতে পবিমল স্বপন নামেব সদ্য যুবকটিব স্খলিত কণ্ঠ শোনে, নারে চাঁদনি—আমি তো জানি আমাব কোন মহিমা নেই—

না না অনন্তটা আজ বোধহয ডোবাল। পবিমল ওঠে। দবজাব দিকে এগোয। কলঘবেব দিক থেকে মাথায চিবুনি বোলাতে বোলাতে এক তবুণ জিজ্ঞেস করে, হ্যারে নাবু তোব তিন্নিব খবব কি বে!

নাবু নামেব ছেলেটি বলছিল, আব ইউ ইণ্টারেস্টেড? তিন্নি ইজ নাউ ইন ডেলহি। সি টোল্ড মি নাবু লেটমি রিটার্ন ফর্ম ডেলহি, দেন আই উইল হ্যাভ এনাফ টাইম টু মেক লাভ উইথ ইউ!

—বিয়েলি!

বাট আই অ্যাম নট ইণ্টারেস্টেড, আমাব স্ত্রী লেফট নো সিংগল বিসেপটর ইন মাই সেল্ফ।

আনস্যাটিসফাইড। তুই নিবি।

পবিমল বাগতে থাকে। চুপি চুপি বলে, স্টুপিড। নট ইণ্টারেস্টেড। ইণ্টাবেস্ট দেখিযেই দ্যাখনা কম্পাউণ্ড ইনটাবেস্টে কি হাল হয—পবিমল দবজা দিযে সিঁড়িব মুখে চলে আসে—অনন্ত তাব হাত ধবে টানে, পালিযে যাচ্ছিস যে বড—

সেই বুবুন যেদিন তুলিকে সঙ্গে নিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল, তুলিকে দেখিয়ে বলল, মা, একে বিয়ে করতে হবে।

তৃপ্তি হেসে তুলিকে কাছে টেনে বলেছিল, 'কথার কি ছিরি। বিয়ে করতে হবে মানে।'

তখন বুবুন তার মাকে বুঝিয়েছিল বিবাহ-তত্ত্ব। বুবুন তুলির সঙ্গে টানা দু'বছর একত্রে আছে। ওরা সব ব্যাপারে একমত না হলেও একটা কমন আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং আছে। তুলি চাইলে এই একত্র থাকার ইতি ঘটাতে পারে যে কোনও সময়। বুবুনের ক্ষেত্রেও একই কথা। চলছিল এ ভাবেই। মাকে পর্যন্ত জানায়নি বুবুন এত দিন, ঠাকুর্দা-ঠাকুমাকে তো নয়ই। এখন স্টেট্‌স্-এ যেতে গেলে একটা ফর্মাল ম্যারেজের ডকুমেণ্ট দরকার হবে। কারণ তুলি এখন অবধি ও দেশের কোনও অ্যাসাইনমেণ্ট পায়নি। সী ইজ টু গো এ্যাজ বুবুন'স ওয়াইফ। এজন্যই এই ফর্মালিটির মধ্যে যাওয়া।

শুনে নির্বাক ছিল তৃপ্তি। সারাটা জীবন ধরে বিয়ে আর বিবাহোত্তর জীবনের কসরৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যাকে, সে এখন আত্মজের কাছ থেকে একি কথা শুনছে!

বুবুন বুঝিয়েছে, আমাদের পৃথিবীটা এখন অনেক বড় হয়ে গিয়েছে মা। কেউ আর কোন একজনকে আঁকড়ে থাকবে না। কোনও একটা আইডিয়াকে আঁকড়ে বেড়ে ওঠার যুগও শেষ। পৃথিবীটা দ্রুত দৌড়চ্ছে। থেমে দাঁড়িয়েছো কি ছিটকে পড়বে।

তবু বুবুন তার বিবাহিতা পত্নী তুলির হাত ধরে হাত নাড়তে নাড়তে তৃপ্তিকে কাঁদিয়ে চলে যায়।

———

ব্যাগ, হাতে দুলছে জল খাবার বোতল। দৌড়ে ছাদ পর্যন্ত পৌঁছে তৃপ্তি সামনে এসে একেবারে থমকে দাঁড়ায় ছেলে। তারপব ভ্রূ কুঁচকে, 'তুমি আমার মা ?' বলে ঝাঁপিয়ে পড়ে কোলে।

বুবুন এসেছে, বুবুন। আকস্মিক উচ্ছ্বাসে তৃপ্তি ভুলে যায় সব কিছু। এত দিন বাদে ছেলে কি ভাবে এলো, কে আনল এসব কথা যুক্তি মনেও আসে না। পেটের ভেতরে আব একটা প্রাণ যে মাঝে মধ্যেই ঘাই মাবে তার নিরাপত্তার কথাও ভুলে যায়। তৃপ্তিব সর্বস্ব জুড়ে একটিই বার্তা, বুবুন এসেছে, বুবুন।

বুবুনেব বয়স তখন পাঁচ বছব। সেই পাঁচ বছব থেকে এই চব্বিশ বছর পর্যন্ত নিয়মিত যোগাযোগ বেখেছে ছেলে। কখনও কখনও মাযেব হাতেব রান্না খেযে গিযেছে। এ বাড়ি এসে সাবাটা দিন ছোট বোন তপুব সঙ্গে খেলে কাটিযেছে। রবিব সঙ্গে বুবুনের সম্পর্কে জড়তা লক্ষ্য কবা যাযনি, কিন্তু হৃদ্যও হয়ে ওঠে নি তা। বুবুন এলে ববি খুশীই হতো। সে স্বভাব নিবীহ, জীবন যাপনের সূত্রে মেযেকে আদর করত, বৌকে ভালবাসত কিন্তু সে ক্ষেত্রেও উচ্ছ্বাস প্রকাশিত হতো না। রবি ঠিক যান্ত্রিকও নয, তার আচরণে মানুষী উত্তাপ পাওয়া যায—বাড়াবাড়িটা পাওয়া যায না। ফলে বুবুনকে ভালবাসাব ক্ষেত্রেও একটা চাপা ভাব কাজ কবেছে।

বুবুন বোন তপুকে খুব ভালবাসে। ও সব জায়গায়ই বলে, আমাব একটা মাত্র বোন।

আব তপু। এই সেদিন পর্যন্তও কেউ কিছু বললে বলত, দাদা আছে না ?

ভাই বোনের এই ভাব দেখে তৃপ্তি স্বভাবতই খুশী। একদিন দু'জনের সামনেই বলে, 'তোবা দু'জন এক জায়গাযই থাকবি। একসঙ্গে থাকাব অর্থই আলাদা।'

বুবুন অক্লেশে সম্মতি জানাত। আর ছলনা কবে বোনকে ক্ষেপাবাব জন্যই বললত, 'কিন্তু ও তো দাদাকে ছেড়ে এন. আব. আই. ধবে পালাবাব জন্য পা তুলে আছে।'

তপু এন. আব. আই-দেব চেনে না, দাদাকে চেনে। তাই দাদরে কৃত্রিমতাকে নিজেব কৃত্রিমতা দিয়ে কাটিয়ে দিত, যাবই তো এন. আব. আই কেন এ. বি. সি-ডি থেকে জেড্ পর্যন্ত হাতে নিয়ে যাবো।

হচ্ছে এই আশাব আলো কৃষ্ণ-গহ্বরেব নিবেট অন্ধতায মাঝে মাঝে আলো ফেলে। তৃপ্তি রবির মধ্যে একটা মানুষ খুঁজে পাওয়ার সাধনায় সমর্পন করে করে তাব সমযকে। এখানে অবকাশেব শৃংখল নেই, কাজেব ধারাবাহিকতা আছে। রবিব জীবন কোনও দিনই গুছানো ছিল না। বাইরেব আড্ডা, হৈ হুল্লোড়ের টানটা তাব বড় বেশী। তাসেব আড্ডাব অনর্থক চেঁচামেচি আব অলস স্পেকুলেশনে নিবর্থক জীবন কাটানোতেই তার সুখ ছিল। তৃপ্তি তাব জীবন থেকে ওই অনর্থক অভ্যাসকে ছাঁটতে চায। রবি গণমান্য হযে উঠবে এমন আশা সে কবে না, কিন্তু পাঁচটা মানুষ তাকে অকর্মা বলে হেয জ্ঞান করুক এমন অবস্থাকে বদলাতে চায। এই বদলেব জন্য যে ধৈর্য দবকাব তৃপ্তিকে তা আয়ও করতে হবে।

রবিব গৃহিনী হয়ে তৃপ্তিব একটা সুবিধা হযেছে, এখানে সে প্রকৃত অর্থেই স্বাধীন। রবি তাব ওপর খববদারি কবতে চায না। স্বভাবেই খববদাবিব বীজ নেই যাব, তাব কাছ থেকে স্বাধীনতা পাওযাব মধ্যেও কোন 'চার্ম'' খুঁজে পায না তৃপ্তি। ববং চিরদিন দমিত থাকাব ফলে মনেব মধ্যে যে মুক্তিব ছবিটা এঁকে এসেছে এতদিন তাব সঙ্গে কিছুতেই মেলাতে পারে না নিজেব জীবনকে। রবিব মধ্যে একটা সাপ্রেশন কাজ কবে, তৃপ্তিব কাছ থেকে জোব কবে কিছু কেড়ে নিতে চায না। বৌ-এব হাতে মাইনেব টাকাটা তুলে দিযে সংসাবের দিকে আব তাকাতে চায না সে। এমন কি জীবনের যৌন-সম্পর্কেব ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। তৃপ্তিও এসব সমযে লজ্জা ছেড়ে এগোতে পাবে না বলে জমে ওঠে না কিছুই। এবকম চলতে চলতেই একদিন তৃপ্তি রবিকে জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি আমাদেব দু'জনাব একটা ছেলে-মেযেও চাও না ?'

রবি খুব অপবাধ কবেছে এমন ভাব কবে বলে, 'ঠিকই তো, তুমি বড একা পড়ে গেছো। আমি তোমাব যোগ্য হলে হযতো এ জিনিসটা হোত না।'

কথা শুনে তৃপ্তি কাঁদল, রবিব বুক ভিজিযে সে কান্না। তাবপব অনেক দ্বিধা ঝেড়ে ফেলেই বলে, 'তুমি আমাব, তুমি আমাবই। আমাদের ছেলে-পিলে হলে তুমি তার যোগ্য বাবাই হবে। আমি চাই ওরা আসুক।'

এতটা মেলে ধবাব জন্য তৃপ্তিকে যে পবিশ্রম কবতে হয তাব মূল্য রবি দেয, ক্রমশ কর্তা হযে ওঠে সংসাবেব। এমনই একটা দিনে। পেটে তখন তপু এসেছে, তৃপ্তি বাড়ির ছাতে হেলান দিযে দাঁড়িযে। হঠাৎ দেখে বাড়িব গেট টপকে, সিঁড়ি দিযে দুদ্দাব ছুটে আসে একটি ছেলে। পিঠে স্কুলেব

কান্নাব স্বাদ কি তা তো জানি, এখন হিযাব পবশেব দিকটাকে কাল্টিভেট কবতে চাই। তৃপ্তি এইভাবেই নিজেব সিদ্ধান্তেব অনুকূলে যুক্তি সাজায। ববিকে বিযে কবে প্রবল বাস্তব বিবোধিতাব মধ্যেই।

তিন

বুবুনেব ফ্লাইট আজ সন্ধ্যা ছ'টায। বুবুন তুলিকে বিয়ে করেই আমেবিকা পাড়ি দিচ্ছে। আব হয় তো ফিববে না ও। হযতো কেন আব ফিবে আসবে না বুবুন। দুয়াবেব কছে দাঁড়িযে একটু ঝুঁকে পড়ে আব তো বুবুন বলবে না, 'মা, তুমি আমার মা ?' দমদম এযাব পোর্টে দাঁড়িয়ে শূন্যে হাত নাড়তে নাড়তে এবাব চোখ ঝাপসা হযে যায তৃপ্তিব। বুকের ভেতবে একদিন ধবে যে কৃষ্ণ-গহ্ববটাকে পুষে রেখেছিল তা আজ ভাবি হয়ে তাকে ক্রমশ নিচেব দিকে টানে। চবাচর বিস্তৃত উন্মুক্ত আকাশে অন্ধকার নামে পাখিব ডানাব মত নৈপুন্যে। তৃপ্তি এই প্রথম অনুভব কবে বুবুন তাকে ছেড়ে সত্যিই চলে গেল।

ববিব সঙ্গে ঘব বাঁধার কথা জানার পরে মিত্রবাড়ির লোক এসে বুবুনকে নিযে যাবাব ফবমান জাবি কবে। কর্তাবাবু সুভাষ মিত্র বলে পাঠিয়েছেন, ভাস্বব মিত্রপবিবাবেব ছেলে, মিত্রপবিবাবের ছেলেব মতই বড হবে। ওব বাবার নাম অনিন্দ্য মিত্রই, কোনও হ্যাগার্ড বকবাজ ভাস্বরেব পিতৃত্বেব দাবিদাব যেন না হয। আর ভাস্ববকে মানুষ কবে গড়ে তোলাব প্রশ্নে তৃপ্তিব ওপবে বিন্দুমাত্র ভবসা নেই তাদের। বুবুন, দুধেব বাচ্চা বুবুন তাই ঠাকুর্দা-ঠাকুমাব কাছে চলে যায মানুষ হওযাব জন্য।

চাইলে তৃপ্তি যে ছেলেকে ধবে বাখতে পাবত তা সে জানে। কিন্তু জোব দিযে সেও চাইতে পাবে নি তা, ববং বুকেব মধ্যে একটা কৃষ্ণ-গহ্বর তৈবি কবে বুবুনেব স্বার্থেই তাকে ছেড়ে দেয। অনিন্দ্যব চলে যাওযা ছিল বুটিন মাফিক প্রস্থান, বুবুনেব নির্বাসনকেও সেই বুটিনেব জেব বলে ভাবতে চায তৃপ্তি। ভেবে একটু শান্ত হতে চায়।

বুবুনকে ঘিবে অশান্তি বাড়াতে চায়নি বলেই মিত্র বাড়ির সঙ্গে কোনও সঙ্গে কোনও কাজিযা বাঁধে নি। তবু বক্তক্ষবণ তো থামাতে পাবে নি। টুপটুপ কবে বক্ত ঝরে ঝরে সিক্ত হযেছে মাযের হৃদয়। 'হিয়াব পরশ লাগি হিযা মোর কান্দে' কথাব অর্থ একেবাবে অন্য প্রাসঙ্গিকতায় ঘিরতে থাকে তাকে, তবু হৃদয় শূন্য হযে যায় না। বুবুন ভাল আছে, বুবুন মানুষ

কিভাবে এগোবে তাব স্পষ্ট ধাবণাও অন্তত দ্বিতীয় বিয়েব মুহূর্তে তাব মনে নেই। অনিন্দ্যর সঙ্গে বিযেটাতেও ছিল অনিশ্চযতাব ঝাঁপ দেওয়া, রবির সঙ্গে ভেসে পডাতেও সেই নিরুদ্দেশ যাত্রাবই ইঙ্গিত।

বরং রবি তাব অনেক চেনা। সাহস কবে তৃপ্তিব সঙ্গে কোনও দিন কথা বলতে এগিযে আসেনি ববি। কিন্তু আকৈশোব চোখে চোখে তাকিযে মুগ্ধতার হাসি হেসেছে। হঠাৎ শুভদৃষ্টিব আসবে নিথর নীরব দুটি চোখেব চেয়ে তা খারাপ হবে কেন? তৃপ্তি মিত্র বাডি থেকে ফিবে আসাব পবে ববির আচবণে সামান্য পবিবর্তন হয, একটা ভাগ্যবিডম্বিতা মেয়েব জন্য যে মাযা সেই মমতাবোধকে সে কিছুতেই বাধা দিতে পাবে না। অনিন্দ্যব মৃত্যুব পরে সহানুভূতি আব করুণাব প্লাবনে তৃপ্তি একেবাবে ডুবে গিযেছে। কে কতটা খাঁটি দুঃখ নিযে এসেছে তা মেপে দেখার অবসব তাব হযনি। ববিব স্পর্ধা ছিল না করুণার ডালি নিযে কাছে এসে দাঁডানোব, তবু আব পাঁচটা লোকের ভীড়ে মিশে গিয়েও ববিব চোখের মমতাব যথার্থতা বুঝতে সময লাগেনি তৃপ্তির। ববির সম্পর্কে সচেতন হযেই ধীরে ধীবে মনেব দবজাকে খুলতে শুরু করে সে। একটু একটু কবে জমতে জমতে কখন যে সিদ্ধান্তেব নিশ্চিন্ততায পৌঁছে যায তার হিসেব বাখা আর সম্ভব হয় না।

নিজের সঙ্গে নিজেই যুদ্ধ করে তৃপ্তি। এবাব আর মা-বাবা নয়। এবাব তৃপ্তি এবং তৃপ্তিব মধ্যে আলোচনা। তৃপ্তিব সঙ্গে তৃপ্তিব কথা চালাচালিব সময় বুবুন এসে পথ আগলে দাঁড়িযেছে বারবাব। বুবুন, একমাত্র বুবুনই তাকে দু'হাত দিযে জড়িয়ে ধবে রাখতে চেয়েছে। আর বুবুনেব প্রতিপক্ষ হয়ে কবেকাব কোন এক জ্ঞানদাসেব পদাবলী ভ্রমবের মত দুই ডানা মেলে দুই তৃপ্তিব মনেব মধ্যেই গুঞ্জন তুলেছে—'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে / গুণে মন ভোব / প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে / প্রতি অঙ্গ মোব।' কবির এই আর্তি তৃপ্তির শিবায় শিরায় মাদকেব আসক্তি ছড়ায়। কথাগুলি আর নিছক বইয়ে পড়া শব্দ থাকে না, ক্রমে তৃপ্তিকে অসহায় করে ফেলে। প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতি অঙ্গের কান্নায় মূর্ত রূপ তার চব্বিশ বছরেব যৌবনের সকল জৈবিকতাকে উন্মাদ কবে দেয। তৃপ্তি তবু নিজেকে ভুলে যায় না। অনিন্দ্য তো জীবনে এই প্রতি অঙ্গেব কান্নাকে উসকে দিয়ে সবে পড়েছে এবার আব এব সীমাব মধ্যে থাকতে চাই না, এবাব আমাকে 'হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে', কথার অর্থ অন্বেষণে বেরোতে হবে। রূপের জন্য কান্না বা প্রতি অঙ্গের জন্য

তাকাল যে সবসীব মনে হল এ মেযেব চোখেব বিষাদের জন্য সেই দাযী। চব্বিশ বছবেব একটা মেযেব সাবাটা জীবন পড়ে আছে এই শূন্যতাব ছাযা মাখা হযে। মা এবার কাঁদেনও না, মেযেব গায়ে হাত বোলান।

বুবুন আব একটু বড হয। মিত্র-বাড়ি থেকে তার দেখাশোনা কবায ঘাটতি পড়ে না। বুবুন বড় হতে থাকে, শোক কালেব কোলে দুলতে দুলতে ক্রমে হ্রাসমান নিযমেব অঙ্গীভূত হয। তৃপ্তিব দৈনন্দিনতাযও একটা পরিবর্তন আসে। বুবুনেব যখন দু' বছব বয়স, তৃপ্তি একদিন ঠিক কবে রবিকেই সে বিযে কববে। আবাব বিবাহ। এবার উলু দেবাব লোক নেই। রবিবাব হাত ধবে বেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বিনা ফুল-মালাব দু'জনে একত্রে জীবন কাটানোব অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওযা। রবিব কোনও পে-ডিগ্রি নেই, ডিগ্রিও না। কলকাতা কর্পোবেশনে এমন একটা চাকবি তাব যাতে খেয়ে পরে বাঁচা যায, ছা-পোষাব সংসাব কবা চলে তাব বাড়তি কিছু বলাব থাকে না। তৃপ্তি এই ববিকে ভব কবেই জীবনের বাকী দিনগুলোকে বাজি ধরে।

রবি ওদেব পাড়াব অকম্মা ছেলেদেব একজন। লোকের কাছে বাঙা-মূলো নাম পেয়েছে ওর গুণেব অযোগ্য রূপের জন্যেই। তৃপ্তি কি কেবল চোখের দেখাব ওপব নির্ভর কবেই মানুষটাকে বাঁধল জীবনে? ববি অনিন্দ্যব একেবারেই উল্টো পিঠ। সর্বাগ্রেই ভিন্ন মেরুব বাসিন্দা সে। ববির হৈহৈ কবা বাউণ্ডুলে বকবাজ জীবনকে জরিপ কবতে গিয়ে তৃপ্তিকে যে হোঁচট খেতে হযনি তা নয। তবু নিষিদ্ধ জীবনের দিকে মানুষেব যে একটা চোরা টান থাকে তৃপ্তিব সেই টানটা দিনবাত তাব কানে মন্ত্রণা যুগিযেছে। অনিন্দ্যর মৃত্যুব পরবর্তী জীবনে দুটি বিকল্পেব মুখে এসে দাঁড়াতে হয়েছে তাকে। এক মিত্রবাড়ির বিধবা হয়ে তাদেব সম্পদ-বৈভবেব অংশীদারিত্বেব জীবনকে আগলে আগলে চলা। নয় তো বাপেব বাড়ি থেকে নিজেব পাযে দাঁড়াবাব চেষ্টা কবা। মা-বাবাব স্নেহেব আড়ালে বেড়ে ওঠা, আবার পড়াশোনা করে নিজেব আয়ে নিজে চলাব বাস্তায় হাঁটা। এব কোনওটাই তৃপ্তি গ্রহণ কবে না। মিত্রবাড়িব বিধবা হওয়ার গ্লানির চাপ সহ্য কবাব মত মানসিক জোর তার নেই, আব দ্বিতীয় পথের যে শ্রমসাধ্যতা তাকে গ্রহণ কবাব মত মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠে নি সে। জীবনে একটা অবলম্বন ছাড়া বাঁচাব পথ এর আগে কেউ দেখায নি তাকে। বাবাকে সে তো সত্যিই বলেছিল, আগেকার জীবনে ফিরে যাওয়া যায় না। কিন্তু পরেকার জীবনটা কতদূর

জন্য দেহ-মন উন্মুখ হয়ে থাকে এখন। তৃপ্তি ঠিক করে এই অসহ পীড়নের হাত থেকে বাঁচতে হবে। আর বাঁচার প্রথম পদক্ষেপ এ বাড়ির এই অনিন্দ্য-ঘেরা পরিবেশ থেকে চলে গিয়ে নিজের কুমারী জীবনে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা। বুবুনকে নিয়ে একদিন আবার বাপের বাড়ি চলে আসে তৃপ্তি। মনকে কঠোর-কঠিন করে এবার অনেক দিন বাদে আবার ভেতরের মেয়েটাকে জাগিয়ে তোলে, মুখোমুখি বসে ফয়সালা করার নিমিত্তে।

বাবা এসে বলেন ঃ এবার আবার পড়াশোনাটা শুরু কর নতুন করে।

মেয়ে বলে ঃ আমি সব ভুলে গেছি। লেখাপড়া আর হবে না আমার।

মা বলে ঃ তুই কি ও বাড়ি আর যাবি না ? বুবুন তো ওদের ছেলে।

মেয়ে বলে ঃ বুবুন আমার ছেলে, আমি তাকে পেটে ধরেছি। আমি তোমার মেয়ে তুমি আমায় পেটে ধরেছো।

বাবা বলে ঃ আমার যা কিছু আছে তার ভাগ তুই পাবি। বুবুনকে নিয়ে পথে দাঁড়াতে হবে না।

মেয়ে বলে ঃ আমার শুনতে একদম ভাল লাগছে না, চাও তো ও বাড়ি গিয়েই থাকি।

এইভাবে চলতে চলতে তৃপ্তির অন্তর্গত আর একটা মেয়ে তাকে খোঁচাতে থাকে। স্বপ্নে তৃপ্তি অনিন্দ্যকে দেখে, অনিন্দ্যকে নয় তার হাত, তার পা, মদে ভেজা পুরুষ্টু ঠোঁট আর শরীরের খিদেকে।

মা বলে ঃ চল যাই ঘুরে আসি কাশী বা পুরীতে।

মেয়ে বলে ঃ আমি বুড়ি হইনি। কাশীর বুড়ি বিধবারা খুব সুখে থাকে না মা।

হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে সরসী মেয়ের কথা শুনে। স্ত্রীর কান্নার সূত্র ধরে ডাক্তারবাবু বলেন ঃ তুই মা একটু আগের মত হ'তো। একেবারে আগের মত।'

বুবনের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে তৃপ্তি বলে ঃ পারা যায় বাবা ? তুমি তো মস্ত বড় ডাক্তার তুমি বল, পারা যায় সব ভুলে একেবারে আগের মত হতে ?

বাবা কি বোঝেন বোঝা যায় না। শুধু মাথা নেড়ে বলেন, হয় তো যায় না। কিন্তু অনিন্দ্যকে তো আর তুই ফিরে পাবি না।

সন্ধ্যা নামছিল নিভৃতে। সদাশিবের কথা শুনে তৃপ্তি এমন নিষ্পাপ চোখে

করে কাব উদ্দেশে নাড়ে—তৃপ্তিকে বা ভাস্ববকে টা-টা জানায় বোঝা যায না। মিত্র বাড়িব ব্যালকনি থেকে বড বাস্তা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। তৃপ্তিও বোজ দেখে নরম পালকেব মত নীল ফিয়েট বাতাস সাঁতবে ছোট থেকে বড় রাস্তায পড়ে, তাবপব আবো বড়তে মিলিযে যায। কিন্তু এ দিন গলিপথ দিয়ে বেরোতে না বেবোতেই যমেব বাহনেব মত লবি এসে হুড়মুড় কবে পড়ে। লাফিযে ওঠে নীল ফিযেট, একটা আকাশ চেবা শব্দ, একটা আর্তনাদ তারপব চাবপাশ থেকে ছুটে আসা দলবদ্ধ মানুষেব হল্লা। বুবুনকে শক্ত কবে ধবে বেখে তৃপ্তি চাবিদিকটা শাদা দেখে। কেন সেই মুহূর্তে সে অতটা নিঃসাড় পডেছিল, কেন একটা শব্দও বাব করতে পাবছিল না মুখ দিযে পবে ভেবেও তাব কিনাবা কবতে পাবে নি। উন্মত্ত লরিটার আঘাত অনিন্দ্যকেই শুধু কোমায আচ্ছন্ন কবে নি, তাকেও অসাড় কবে দিয়েছে। টানা পাঁচটা দিন ঘুমেব নিঃসীম অতলে তলিয়ে থাকাব পব অনিন্দ্য এ জীবনেব বন্ধন ছিঁড়ে বেবিযে যায়। ওব শেষ সময়ে তৃপ্তি শয্যার পাশে ছিল, একটা বক্তমাংসেব মানুষ এইভাবে হারিয়ে যাবে ভাবতেও ভয হয তাব। শোকের অবয়ব কি তা সে জানে না, কিন্তু জীবনের মূল্যহীনতাব স্তব্ধতাকে অনুভব করতে পাবে। শেষ নিঃশ্বাসটা ছাডাব আগে অনিন্দ্য একবাব চোখ মেলে, সে চোখের ভাষা পড়া মুশকিল। এক শুভদৃষ্টির লগ্নে যে চোখ ছিল নিথব, নীবব সেই চোখ এবার বক্তপদ্মেব উপমা হয়, শেষ আলো পড়া সেই চোখকে তাব ভালবাসাব ধন বলে মনে হয। তৃপ্তিব মধ্য থেকে কে বলে ওঠে, তুমি কি কিছু বুঝতে পেরেছো? কিছু কি টেব পেযেছ, ব্যথা বা বেদনা? অনিন্দ্যর রক্ত-পদ্ম-চোখ বোজাব আগেই তৃপ্তির চোখ ঝাপসা হযে হযে দৃষ্টিতে শাদা পর্দা ঝুলতে থাকে।

অবসাদের বেলা অতিক্রান্ত হলে তৃপ্তির মধ্যে তীব্র একটা অভাববোধ তাকে পাগল করে দেয। অনিন্দ্যব সঙ্গ তাকে যে এতটা সুখ দিত, সহবাস যে এতটা কাম্য ছিল তাব কাছে, তা অনিন্দ্য চলে না গেলে এমন করে বুঝতে পারত না সে। এটাবই নাম ভালবাসা কিনা জানে না সে, এই পেশীর পেষনের জন্য উন্মুখ হযে থাকাব আডালেই প্রেম লুকানো থাকে কি না তাবও হদিস তাব জানা নেই কিন্তু অনিন্দ্যব জন্য তাব মন কাঁদে এ সত্য সে অস্বীকাব করতে পারে না। শ্বশুব বাড়িতে সবই আছে, কেবল সে নেই, তার উপহারের রাত নেই। সেই মাতাল হযে আসা ঘৃণা জাগানো পশুশক্তির

সহাবস্থানে সহবাসে পুরুষ আর রমণী রাত আর দিনকে ভাগ করে নেয় জীবনে। এইভাবেই তৃষ্ণা-বিতৃষ্ণার জৈবিকতায় চলতে চলতে একদিন রমণী জননী হয়। তৃপ্তির ছেলের নাম রাখা হয় ভাস্বর, মিত্র বংশের উপযুক্ত নাম। ডাক নামটা তৃপ্তির দেওয়া, ভাস্বরের ডাকনাম বুবুন।

দুই

বুবুনের বয়স যখন দু'বছর তৃপ্তি রবিকে বিয়ে করে। অনিন্দ্য মারা যাওয়ার ঠিক এক বছর চার মাসের মাথায় তৃপ্তির এই সিদ্ধান্তে সবাই ছিছি করতে থাকে তাকে। মা এতটাই ভেঙ্গে পড়ে যে তাকে নিয়ে সমুদ্রের পাড়ে চলে যেতে হয় বাবাকে। তৃপ্তির দ্বিতীয় বিয়েটা সে নিজেই করেছে, বাপের বাড়ি শ্বশুর বাড়ির প্রবল বিরোধিতাকে উপেক্ষা করেই। এ ছাড়া তৃপ্তির সামনে অন্য কোন পথও খোলা ছিল না। বেঁচে থাকার অন্য কোন অর্থ।

বুবুনের বয়স যখন কেবল আট মাস, দু-চারটে ভাত চটকে খেতে শুরু করেছে কেবল, তেমনই একদিনে অনিন্দ্য চলে যায়। তৃপ্তির জীবনে যে ব্যাপ্ত শূন্যতার সৃষ্টি হয় তার কথা সে আগে কখনও অনুমান করতে পারেনি। একটা পাথুরে দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিয়ে চলে গেছে অনিন্দ্য, আর সেই আঘাতে সব কিছু ভোঁতা, নিরেট হয়ে যায়। তৃপ্তি হয়ে যায় বোবা। স্বাভাবিক মানুষের এই পরিণতিই হয়, যে চলে গেছে তার জন্য শোক তো আছেই যে মেয়েটা একটা কচি শিশুকে নিয়ে রয়ে গেল তার শূন্যতা কে ভরাট করবে? সদাশিব—সরসী বা সুভাষ মিত্ররা তৃপ্তির চার পাশে এসে দাঁড়ালেও কার্যকর কোনও পথ দেখাতে পারে না। তৃপ্তির অভাব একান্ত তৃপ্তিরই, তার শূন্যতার ভাগ নেবার কেউ নেই।

অনিন্দ্যর মৃত্যু তৃপ্তিকে আর একটা প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়ঃ অনিন্দ্য কি বুঝতে পেরেছে যে সে সব কিছু ছেড়ে চলে গিয়েছে? মাথার পেছনে যখন আকস্মিক আঘাত এসে লাগে অনিন্দ্য নামের ভালমানুষ ব্যক্তিটি তখন কি তা অনুভব করতে পেরে ছিল? এ চিন্তা তৃপ্তির মাথা গরম করে দেয়। ভুলতে চাইলেও স্বামীর মৃত্যুর অনুপুংখ দৃশ্য তার চৈতন্য থেকে নির্বাসিত হয় না।

অনিন্দ্য নিত্যদিনের মতই সেদিনও ইস্পাত—নীল ফিয়েট গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। তৃপ্তি বুবুনকে নিয়ে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে দেখছিল গাড়ির নিষ্ক্রমন। বাড়ির গেট পেরোবার মুহূর্তে অনিন্দ্য ডান হাত বার

মেঘে ঢাকা কাঞ্চনজঙ্ঘা ভাললাগা চোখ চেয়েছিল একটি প্রাণবন্ত যুবককে, যার মুঠি ধরে অনেকটা পথ হাঁটা যায়, পরিবর্তে বড়ঘরের ভাল ছেলে এসে হাজির তার কাছে। শুভদৃষ্টির আঘাত তবু সামলে নিতে হয় তৃপ্তিকে। গাঁটছড়া যখন বাঁধাই হয়েছে তাকে পোক্ত-শক্ত করার দায় তো তারও—এরকম ভেবেই একেবারে নতুন একটা অধ্যায়ে ঢুকে পড়ে তৃপ্তি।

অনিন্দ্যর জীবনও বড়ঘরের প্রথায় চলা, পারিবারিক ব্যবসাকে আরো বড় আরও বিস্তৃত করার দায়টা তার ঘাড়ে এসে পড়ায় ছেলেটা আর নেহাত ছেলে হয়ে থাকতে পারে না, ঘড়ির মত, যন্ত্রের মত চলতে হয় তাকে। তৃপ্তি পায় সাজানো ঘর, সুদৃশ্য লন আর লম্বা লোমের বিলাতি কুকুর। বড় বৌ সে, কিন্তু মাথার ওপরে শ্বশুর-শাশুড়ী জাগ্রত দেবতার মত থাকায় কোনও কাজেই হাত দিতে হয় না। এ বাড়িতে পুরানো কালের রীতিতে অন্দর-মহল বাহিরমহল আছে। অন্দরমহলে কেবল শাঁখ বাজে, কোনও বই পড়ার বাহুল্য মানা হয় না। অনিন্দ্যর দু'ভাইই পড়াশোনা করে বাইরের মহলে বসে, তৃপ্তির সঙ্গে তাদের চোখে চোখে দেখাই হয় বেশী, কথা বলার সুযোগ ঘটে না। ভেতর বাড়িতে একটা গ্রামোফোন আছে, আছে একটা রেডিও-ও, কিন্তু সুখী গৃহকোণে সে গ্রামোফোন শোভা বর্ধন করার জন্যই থাকে। ওরা বাজে না। অন্দরমহলে কেবল শাঁখ বাজে।

অনিন্দ্য ছেলেটিকে সবাই ভদ্র লাজুক বলে জানে। সারাদিন এই ভদ্র ছেলেটি বাইরের জীবনে কি কি করে তৃপ্তি জানে না। বাড়ি ফিরে রাতে যখন তার ওপর যৌন-নিপীড়ন শুরু করে তখন বোঝা যায় তাকে। তৃপ্তির দেহ-প্রত্যঙ্গকে পশুর মত ব্যবহার করে লোকটা। সেই পীড়নের সময় প্রতিদিন ধর্ষিতা হতে হতে তৃপ্তি চোখ বুজে দেখতে পায় শুভদৃষ্টিতে দেখা সেই নিথর পাথরের চোখ দু'টিকে। যে যে দিন কিছু মদ্যপান করে আসে অনিন্দ্য কেবল সে সে দিনই নিজের আচরণের কারণ ব্যাখ্যা করতে চায় সে। ম্যান ইজ্ এ্যান এনিমেল—বিবর্তনবাদে যদিও সুটবুট অর্জন করেছে কিন্তু পোশাক খুলে ফেললে । পোশাকটা একটু বেশী করেই খোলে অনিন্দ্য। তারপর রাতের অন্ধকার কেটে গেলে সূর্য উঠে আবার পোশাক পরিয়ে দিলে সেই ভদ্রলোক বেরিয়ে পড়েন।

তৃপ্তিকে মানিয়ে নিতে হয় সব কিছু। মানানো সহজ নয় জেনেও মানাতে হয়। মনে করে, এইভাবেই পুরুষানুক্রমী রথের চাকা গড়ায়, এইভাবেই

কবতে হয়নি যাব, পাবিবাবিক আবেষ্টনীর উষ্ণ নিবাপত্তা যাকে নিববলম্ব শূন্যতাবোধ থেকে বাঁচিযেছে, সেই মেযে হঠাৎই যেন অন্য একটা মেযেব দেখা পায নিজেব অভ্যন্তরে—গোপন অন্তঃপুবে। এখন এই মেয়েব রক্ষণাবেক্ষণেব পুরো দাযিত্ব তো তাবই ঘাড়ে।

পবীক্ষার ফল বেবোলে বিশ্ববিদ্যালযে যাবে এই মেয়ে, জীবনে একটা নতুন দুয়াব খুলে যাবে হযতো। হযতো আবও অন্য বকমেব 'কোনও জগৎ —এই চিন্তা যখন পাকাপাকি হযে যায তখনই মা ঠিক কবে ফেলেন তৃপ্তিব বিযে। তৃপ্তিব মত বা অমতেব কোন প্রশ্ন না তুলেই মিটাব বয়াল এস্টেট কোম্পানীব মালিক সুভাষ মিত্রেব বড় ছেলেকে জামাই কবাব কথা পাকা কবে আসে সবসী। মিত্রবা শুধু বড ঘবই নয়, ছেলেটি নিজেও ইঞ্জিনিয়ব, অতএব এ বিযেব ব্যাপাবে কোনও প্রশ্নই আসে না।

তৃপ্তিব কোনও স্বাধীন কামনা-বাসনা গডে না ওঠায বিযেটাকে সংসাবেব আব পাঁচটা নিযমেবই একটা ভেবে নিতে অসুবিধা হযনি তাব। মা তো এইভাবেই গডে তুলতে চেযেছেন মেযেকে। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। দেব-দ্বিজে ভক্তির মত মা-বাবাব সকল কাজকেই হাসিমুখে সমর্থন করার এই ধাবা-বাহিকতাকে আত্মজাব মধ্যে স্থাযী কবাই মা হিসেবে সবসীর প্রধান কর্তব্য বলে মনে কবত। যে অন্য মেয়েটার উন্মেষ সবেমাত্র তৃপ্তিকে বিহ্বল কবে তুলছিল বিযেব প্রস্তাব এসে তা স্বভাবতই চাপা পডে যায়। বিবাহ নামেব নতুনত্ব তৃপ্তিব কাছে খুব বোমাঞ্চ সৃষ্টি করতে পাবে না। এইভাবে একদিন একটি পুরুষেব সঙ্গে তাকে বেঁধে দেওয়া হবে, তারপব তাকে সন্তান ধাবণ কবতে হবে, সেই পুরুষেব সম্পত্তি হবে সেই সন্তান। তৃপ্তি পালন কবে বড় কববে, বক্ষা কববে এবং আবাব এভাবেই একদিন তাকেও সঁপে দিতে হবে আব এক পুরুষেব হাতে। তৃপ্তি নির্যাতিব এই প্রবহমানতাকে সহজভাবেই নেয।

প্রবল উলুধ্বনি আব হাসি-কলববেব মধ্যে শুভদৃষ্টিব সমযই অনিন্দ্যকে প্রথম দেখে তৃপ্তি। কোনও পুরুষেব চোখে সোজা চোখ বাখেনি এব আগে, এই পুরুষেব সঙ্গে তাকে সাবাজীবন বাঁধা থাকতে হবে ভেবেই সব কৌতূহলী দৃষ্টিকে হতাশ করে তৃপ্তি সোজা চোখে অনিন্দ্যকে দেখে। দেখে মনটা একেবাবে দমে যায। অনিন্দ্যব চোখ যেন কাদার ডেলা, নিথব নিরুৎসুক। তৃপ্তি অন্তত একটা মানুষ চেয়েছিল, এমন নিস্পন্দ পুতুলেব চোখ চাযনি।

বর্ষার ধ্বনি তাদের কথাকে ছাপিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। হঠাৎই কাকলী গান গেয়ে ওঠে, 'আজি ঝরঝর মুখর বাদল দিনে··' কাকলী অন্তরাতে পৌঁছতে না পৌঁছতে গান সমবেত হয়ে যায়। তারপর বর্ষাধারার সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে থাকে একের পর এক মেঘমল্লারে রবীন্দ্রনাথের গান।

একটু বাড়াবাড়িই করল তৃপ্তি। অবিশ্রান্ত বর্ষণে কলকাতার রাস্তা প্লাবিত। ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি সমুদ্র-যানের মত, নিথর দাঁড়িয়ে। এক সময়ে গান থামে, বৃষ্টি থামে না। পাগলা ঘোড়ার মত দক্ষিণ বাতাসে চড়ে বর্ষার ফলা তীব্র থেকে তীব্রতর, তীক্ষ্ন থেকে তীক্ষ্নতর হয়। বাড়াবাড়ি করতে বাধ্য হয় তৃপ্তি। প্রায় হাঁটুর কাছে শাড়ি তুলে জল ভাঙতে ভাঙতে, বৃষ্টিধারায় ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফেরে তৃপ্তিরা। বৃষ্টি ভেজার আনন্দ শুকোতে না শুকোতে বিছানা নিতে হয়। প্রবল জ্বরের মধ্যে তৃপ্তি কেবলই মেঘের ভেলায় ভেসে বেড়ায়, ঘন নীল নিবিড় মেঘ ফুঁড়ে মহাকাশে ছুটে চলা রকেটের সওয়ার হয়ে তৃপ্তি মহাশূন্যে মনোলোভা ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে আসে। জ্বরের ঘোরেও দিনগুলি আনন্দেই কাটে।

কলেজের নবীনবরণ উৎসবে তৃপ্তি গাইল রবীন্দ্রনাথের গান ঃ 'ভালবাসি, ভালবাসি, এই সুরে সুরে কাছে দূরে জলেস্থলে বাজে বাঁশী ·'। বি-এ'র ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ করে ভালপিসিদের সঙ্গে গেল দার্জিলিঙ বেড়াতে। ম্যাল নয়, টাইগার হিলের থেকে সূর্যোদয় দেখা নয়, কাঞ্চনজঙ্ঘাকে ঘিরে স্তূপ মেঘের রাশি সবচেয়ে ভাল লাগে তার। মেঘের ওপর সূর্যের রশ্মির ছটা আর একটু ফাঁক পেলেই ঝকঝকে পর্বত-শৃঙ্গের বেরিয়ে আসার মধ্যে কোমল-আবেশ আবিষ্কার করে সে। ভালপিসিদের সঙ্গে যাওয়ার ফলে মা-বাবার কড়া নজরে, সতর্কতায় বাঁধা থাকতে না হওয়াও তৃপ্তির অভিজ্ঞতার ঝুলিতে একটা বড় পাওনা। দার্জিলিঙ বেড়ানোর পরে আবার কলকাতায় ফিরে আসাটা কেমন বদলে দেয় তৃপ্তিকে। মুক্ত নিসর্গের জন্য তার মন কাঁদে না, নিজের মধ্যেকার একটা একান্ত আমির অস্তিত্ব তাকে এক ঠাঁই হতে দেয় না। তৃপ্তি স্পষ্টত বুঝতে পারে যে সে বড় হয়ে যাচ্ছে। মা-বাবার আওতা ছাড়িয়ে, এই ভবানীপুরের সাবেক পাড়ার গণ্ডি অতিক্রম করে এক পরিপূর্ণ নারী হওয়ার ডাক যেন সে শুনতে পায়। সে আনমনা, উন্মনা হয়ে নবলব্ধ এই আমির মুখোমুখি বসে, নতুন কোনও একজনকে একান্ত সান্নিধ্যে পাওয়ার এই মুহূর্তগুলি তৃপ্তিকে বিবশা করে যেন। নিজের জন্য কোনও দিন চিন্তা

বাড়ির মানু বা চক্রবর্তী বাড়ির হেমের সঙ্গে। কত্তার সঙ্গে খুব কালেভদ্রে যাওয়া হয়। আসলে ডাক্তার সদাশিবের ব্যস্ততার থেকেও দু'জনের রুচির ফারাক একত্রে সিনেমা দেখার পরিপন্থী। পথের পাঁচালী প্রথমবার রিলিজ করার পরে পরেই ডাক্তার বন্ধুদের কাছে সুখ্যাতি শোনেন। সেবার দেখা হয় না, তারপর বিদেশ থেকে পুরস্কার নিয়ে আসার পর আবার সে ছবি দেখানো হয়। সদাশিব সরসীকে নিয়ে দেখতে যান পথের পাঁচালী। সরসী চোখ বড় বড় করে দেখেও, কিন্তু বাড়ি ফিরে বলে, 'সিনেমা দেখতে যায় মানুষ স্বপ্ন দেখতে চাওয়ার মত করে। তোমাদের পুরস্কার পাওয়া ওই বই-এর চেয়ে সাগরিকা-শাপমোচন তা অনেক বেশী দিতে পারে।'

সদাশিব তর্ক করেননি, তর্ক করা তার স্বভাবে নেই। আবার তা তার পেশায়ও লাগে না, ফলে দু'জনের পথ দু'দিকেই থাকে, মধ্যে পুত্র-কন্যা এবং সংসার নামের সেতু তাকে আটকে রাখে। সরসীর তত্ত্বাবধানেই বড় হয়ে ওঠে তৃপ্তি। সোমেন বাবার মত ডাক্তার হওয়ার বাসনা নিয়ে ডাক্তারি পড়তে থাকে। তৃপ্তির পড়া বন্ধ হয় না, ফিলজফিতে অনার্স নিয়ে কলকাতার বড় কলেজেই ভর্তি হয় সে।

যে বছর সোভিয়েত রাশিয়ার ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা মহাকাশ ঘুরে এল সে বছরটার ঘটনা। মেয়েদের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। অন্নদাশঙ্কর ছড়া লিখলেন, 'মহাশূন্যে মনোলোভা / ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা / তোমার তরে ডালিয়া / পাঠাই আমার ডালিয়া।' ক্লাসের বাংলা অনার্সের ছাত্রী কল্যাণীর বাংলা হাতের লেখাটা বেশ আর্টিস্টিক। কয়েকখানা আর্ট-পেপার কিনে তার ওপর রঙিন চক দিয়ে অন্নদাশঙ্কর রায়ের ছড়াটা সুন্দর, স্পষ্ট করে লিখে কলেজের করিডোরে আর স্টেয়ার কেসে সাজিয়ে রাখল ছাত্রীরা। এ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিয়মানুবর্তিতা আর নিষ্ঠার জন্য নামেই চেনার মত। এ ধরনের পোস্টারিং এ কলেজে আগে হয়নি। মেয়েরা তবু চোখমুখ শক্ত করে অপেক্ষা করতে থাকে প্রিন্সিপ্যালের ডাকের। কিন্তু ডাক আর আসে না। বরং বর্ষা নামে ঝরঝরিয়ে। পাম গাছের মাথা থেকে জলের ধারা গড়িয়ে গড়িয়ে নেমে আসে একেবারে গোড়া পর্যন্ত। চোখের সামনেটা ঝাপসা হয়ে যায়। বৃষ্টির নূপুর আর সব শব্দকে স্তব্ধ করে দেয়। বর্ষাধারার ঢেকে সমস্ত আকাশ, আকাশের মেঘ কেমন স্বপ্নের মেদুর চাদর বিছিয়ে দেয়। মেয়েরা বসে থাকে, বসে থাকে আর নিজেদের মধ্যে কথা বলার চেষ্টা করে।

বিবাহ এবং বিবাহ

মলয় দাশগুপ্ত

এক

ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধবাব সঙ্গে সঙ্গেই মা-বাবাব মধ্যে আলোচনাব একটা বিষয় হল তৃপ্তিব বড় হওয়া। তৃপ্তি নাকি আর আগের মত যা খুশী তাই কবতে পারবে না। যাব-তাব সঙ্গে মেলামেশা কবাব ওপরও কড়া নজব পড়ল। এ ব্যাপাবে মা হলেন একেবাবে বাঘিনীর মত। বযস তো কেবল তৃপ্তিবই বাড়েনি, তৃপ্তিব দাদা সোমেনের বযসও এক ঠাঁই দাঁড়িয়ে নেই। সবু গোঁফে হাত বুলোতে বুলোতে সোমেন যখন দুদ্দাব বেগে ঘব ছেড়ে বেবিযে যেতে পাবে তখন তাকে মায়ের নজবদাবীব ভয় কবতে হয না। তৃপ্তিকে পাশেব বাড়ি যেতে হলেও কোনও না কোনও অজুহাত খাড়া কবতে হয।

তৃপ্তিব বাবা নামী ডাক্তাব, পযসা যেমন আছে খবচ-খরচাও কম না। মেযেকে লেখাপড়া শেখানোব ব্যাপারে বাবাব আগ্রহ কম নয়, কিন্তু মাব মতটা বাবাব মত অত স্বচ্ছ নয়। মেয়ে মানুষ যখন ঘব-সংসাব কবাটাকেই প্রথম আব প্রধান বলে মনে কবে তখন লেখাপড়াটা আর পাঁচটা অলঙ্কাবের মতই; হলে ভাল, না হলেও ক্ষতি নেই। তাই এই সময় থেকেই মা মেয়ের মাথায গৃহিনী হওযাব বীজ পোঁতাব কাজ কবে চলতেন। ঘরে যতটা পয়সা থাকলে মানুষ জীবনকে গুছিযে নেওয়াব পরিকল্পনা কবতে পাবে তৃপ্তিদেব ততটা পবিমাণ অর্থ ছিল। ফ্রক ছেড়ে শাড়িতে চলে আসাব পব তাই তৃপ্তিব জন্য এক একখানি গযনা গড়াবাব সঙ্গে সঙ্গে চেনাজানা ছেলেব খোঁজ-খবব চলতে থাকে। তৃপ্তিব মা'ব একটা নিজস্ব ধারণা ছিল: গাছে কুঁড়ি ধবলে যেমন ফলবতী হওযাব আয়োজন শুরু হয, মেয়েবা ঋতুমতী হলেই ঘোটক খোঁজাব ইঙ্গিত আসে তেমনই। প্রকৃতিব এই নিয়মেব বিরুদ্ধতা কবা বিশ্বস্রষ্টাব ইচ্ছাব বিরুদ্ধে যাওযা। এমনিতে পুজো-আর্চায সময কাটানোর মধ্যে থাকেন না সরসী। তার নেশা বইপড়া আব বাংলা সিনেমা দেখা। নিজে উত্তম-সুচিত্রাব ছবিব ভক্ত, কিন্তু সিনেমাব জীবন আব বাস্তবজীবন যে এক নয়— এ কথা বিশ্বাস কবতেই বেশী আগ্রহী। সরসী সিনেমা দেখতে যান দত্ত-

মনে মনে ওঠার পদ্ধতিটা একবার শিখতে পেরে তৃণার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব হয়নি। দেওয়ালগুলো এখন আর তাকে ভয় দেখাতে পারে না। রাতে নগ্ন একা শুয়ে, অনুভব করতে পারে—সে এসেছে। কে? কে? আগে প্রশ্ন করতো কিন্তু এখন করে না, শুধু গ্রহণ করে নিবিড় অদৃশ্য এক হাতের স্পর্শ অনুভূতি। যন্ত্রণায় ঠোঁট দুটো কামড়ে অগোছালো হাত দুটো এলিয়ে দেয় বিছানায়। কখনো খিঁমচে ধরে দেহের নরম অংশ। তৃণা কান পেতে রাখে দরজার খটাখট শব্দের মধ্যে ঘোড়ার ক্ষুরের প্রতিধ্বনিতে।

তৃণার এই স্বপ্ন, বেঁচে থাকার এইটুকু সম্বল, এখন রাতের ঘেরাটোপ টপকে দিনের ভেতরও উড়ে বেড়ায়। কখনোই মনে হয় না নিজেকে একা। রবিন, প্রসূন নয়, কেউ কোথাও কোনোভাবে দুরন্ত আকৃতি নিয়ে তার কাছে আসবেই। শুধু তার কাছে নয়, বিভা লক-আউট কারখানার শ্রমিক, বিপ্লবী যুবক, সবার সামনে সে এসে দাঁড়াবে। তার এক হাতে তীক্ষ্ন অস্ত্র, অন্য হাতে গোলাপ। ঐ গোলাপের নির্যাসটুকু নেবে বলেই না তৃণার এতদিনের বেঁচে থাকা। নয়তো দেড়হাজার টাকা মাইনের কেরাণী, একা অফিসের বড়বাবুর চোখ রাঙানি, পয়সার অভাবে মাঝে মাঝে মাইলের পর মাইল হেঁটে, খেয়ে বা না খেয়ে বাঁচে কোন সাহসে। শুধু একটু অপেক্ষা। সেটুকু তৃণা দিব্যি পারবে। সেই অশ্বারোহী দূর থেকে চিৎকার করে ওদের সবাইকে বলছে—একটু অপেক্ষা করো, বিভা তুমি, তোমরা মরে যেয়ো না—তৃণা যে এসব স্পষ্ট দেখে। আর দেখে বলেই না নীল যন্ত্রণায় ধাপে ধাপে ওঠার পদ্ধতিটা শিখতে পেরেছে।

ঘোড়ার ক্ষুরে ক্ষুরে কর্কশ মাটি থেকে জল উঠে ঝরণা হচ্ছে। হাজার হাজার তৃষ্ণার্ত মানুষ সেই জল পান করতে হাতে হাত ধরে ছুটে আসছে। তৃণা অবাক হয়ে দেখে সেই তৃষ্ণার্তদের মধ্যে মৃত বিভা কারখানার শ্রমিকটিও ছুটে চলেছে। ওরাও তাহলে বেঁচে উঠল। মরার পরেও তৃষ্ণা থাকে? জীবনের এত স্বাদ?

ছুটন্ত বাস থেকে মাথা বের করতেই কণ্ডাকটর তৃণার সীটের পাশে এসে চেঁচিয়ে উঠে—দিদিমণি, 'আপনাকে অনেকবার বাইরে মাথা, হাত রাখতে বারণ করেছি'। তৃণা মাথাটাকে আরেকটু বার করে বলে—"আমার ভালো লাগছে।'

———

মাঝে মাঝে একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গেলে মাসের শেষে তৃণার হাতে কিছুই থাকে না। টিফিনে শুধু চা আর অনেক পথ হাঁটা ছাড়া উপায় থাকে না। তৃণা হিসেব করে দেখেছে—বাড়িভাড়া দিয়ে, সকালে একবার ভাত ডাল তরকারী আর রাতে চিঁড়ে মুড়ি খেয়ে কাটালেও সে যা মাইনে পায়, তাতে একেবারেই চলে না। আরো চলে না কারণ ঐ বই কেনা আর এদিক সেদিক বেড়িয়ে পরার বাতিক। যা সে কোনো মূল্যেই ছাড়তে নারাজ, তাতে যদি ঐ একবেলার ভাতও বন্ধ হয়ে যায়, স্রেফ দুটো শুকনো রুটি খেয়েও থাকতে হয়। এসবের জন্যে চাই কিছুটা টাকা পয়সা। বড়-বাবুর মাইনে কাটার হুমকিতে তৃণা বেশ ভয়ই পেয়েছে। লোকটা ওর দুর্বল জায়গাগুলো জেনে ফেলেনি তো! জানতে অসুবিধেও নেই, মানুষের স্বভাবই তো অন্যের আনাচে কানাচে খোঁজখবর নেওয়া। আবার সে অবিবাহিতা, একা থাকে—সুতরাং মানুষের কৌতূহল, সন্দেহটাও বেশি। অনেক রাতেই তার বন্ধ দরজায় খড়্‌খড়্ করে কে কড়া নাড়ে। ছোট ভাই এর থেকে আলাদা হয়ে সে যখন এই ভাড়া বাড়িতে ঢুকল, রাতে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে ভীষণ ভয় পেত। একদিন বন্ধ জানলার ওপিঠ থেকে রাত দুটোয় কে যেন ফিসফিস করেছিল—'দরজা খোলো দরজা খোলো'। ভয়ে দুহাত দিয়ে কান চেপে মৃত মাকে ডেকেছিল তৃণা। কিন্তু ছয় সাত বছর একা থেকে এখন জমাট বাঁধা ভয় বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে। বাষ্পের ওপর রামধনুর চালচিত্তির কাটতে পারে তৃণা। রামধনুর রঙিন নেশা আগে শুধু রাতের আচ্ছন্নতায় ঘুরে বেড়াত। এভাবে সে স্বপ্ন দেখতে শিখেছিল। রাত যত দীর্ঘ হতো তৃণা রঙিন চালচিত্তিরে দুরন্ত ঘোড়া ছোটাত মাইলের পর মাইল। ঘোড়াগুলো ছুটতে ছুটতে যত ক্লান্ত হতো, তৃণা তত সতেজ হয়ে উঠত। মনে হতো ওদের জীবনীশক্তি সিরিঞ্জ দিয়ে টেনে নিচ্ছে, সে যেন আরব দেশের কোনো সম্রাজ্ঞী। রাতে অনাহূত মানুষের দরজায় কড়া নাড়া, শাপে বর হয়ে তৃণাকে যে এভাবে বাঁচার মন্ত্র শেখাবে—তা কে জানত। আসলে একই ঘটনা বিভিন্ন মানুষের কাছে ভিন্ন রূপে ধাক্কা দেয়। তৃণার বন্ধু বিভা জেনেছিল সিঁড়ি দিয়ে শুধু নামাই যায়, তাই নামতে নামতে সে হারিয়ে গেল গভীর অন্ধকার পাতালে। আর তৃণা কিভাবে জেনে ফেলে সিঁড়ি দিয়ে ওঠাও যায়, উঠতে উঠতে একেবারে আকাশের কাছাকাছি পৌঁছে তৃণা চিৎকার করে বলবে "আমি মরিনি।" তাদের দু'জনের সামনে একই ছবি ছিল—কয়েকটা সিঁড়ি।

ঝাঁঝবা কবে দিয়েছে, কিন্তু ঝাঁঝবা বুকেব বক্ত তাব মুখকে বিকৃত কবতে পাবেনি। বিছেবা জীবনেব থেকেও বড় হযে উঠতে পাবেনি।

ছুটন্ত বাসেব এক ঝাঁকানিতে চিন্তাব মোড় ঘোবে তৃণাব। দীঘায মাসিব বাড়ি বেড়াতে এসেছিল সে। দিন সাতেক বেশ ভালই কাটল। কিন্তু অফিসের বড়বাবু সাতদিনেব বেশি ছুটি দিতে নাবাজ। আব ছুটি তৃণাব কোনোদিনই বেশি জমে না। জমবে কেমন কবে, তাব এই মাঝে মাঝেই বেড়িযে পবাব নেশা অফিসেব সব ছুটি গিলে নিচ্ছে। ভাবতেব বিভিন্ন প্রান্তেব আত্মীয-স্বজন খুঁজে খুঁজে বেব কবেছে। আর তাবা না চাইলেও দু'তিন বছব অন্তব তৃণাব মুচকি হাসি মুখটা তাদেব দেখতেই হয। কোনো উপায নেই, একা একটা মেয়ে এসেছে অতএব থাকতে দিতেই হয। দিন সাতেক থাকো, তাবপব কেটে পবো। কিন্তু এভাবে সাতদিন কবে ছুটিগুলো আঙ্গুলেব ফাঁক দিযে সমযেব সঙ্গে বেড়িযে যায। এবাব বড়বাবু হুমকি দিযেছেন, ছুটি প্রায শেষ, ছুটি নিলেই মাইনে কাটা যাবে। না, মাইনে কাটতে দিতে বাজি নয তৃণা। সাতভাড়াটে বাড়ির একটা ঘবে, একটা বুক সেলফ্, একটা খাট, একটা টেবিল-চেযাব নিযে একা থাকে সে। পাশে একচিলতে বান্নাঘব, বলা যেতে পাবে বাবন্দা কাম-বান্নাঘব। বান্নাব আযোজন প্রায নেই বললেই হয। অফিস থেকে বাড়ি ফিবে অসম্ভব ক্লান্তি ঘিবে ধবে। একটু বিশ্রাম, একটু চাঙ্গা দিযে ওঠাব পব, চুপ কবে বিছানাব ওপব বসে ভাবতে থাকে সেইসব পুবোনো দিনেব কথা, স্কুল থেকে আসলেই মা ডাকতেন—"বিল্লু, খাবাব খাবি আয।" সেসময তৃণা তিনবাব ভাত খেত। আব এখন ভীষণ খিদে পেলেও সন্ধ্যেবেলায বান্নাঘবে ঢুকতে ই'চ্ছে কবে না। সুতবাং অগত্যায একবাটি চিড়ে-মুড়ি-দই কখনো গুঁড়, কখনো একটা কলা দিযে মেখে সাবাবাতেব মত খাওযা শেষ। পেট ভবে গেলে ভাতেব কথা আব মাথায আসে না। মাস-মাইনে পেযে দুটো বই কিনেছিল, নতুন বই দুটো জলজল কবছে বুক সেলফেব ভেতব। চোখে ঘুম জড়িযে আসাব আগে ঝটপট্ কিছু পৃষ্ঠা পড়ে ফেলতে চায। মনে হয, সাবাদিনে বাতে এইটুকুই সঞ্চয, আব সবটাই খবচেব খাতায। এই পৃষ্ঠাগুলোই ঠেসা-ঠেসি কবে থাকা চাব দেওযালেব মধ্যে মাঝে মাঝে বৃষ্টি নিয়ে আসে, কখনো বড় নীল-আকাশ ঘবেব ভেতব ঢুকে দু'হাত দিযে দেওযাল গুলোকে তৃণাব থেকে দূবে সবিয়ে দেয়। আকাশেব দু'হাত তৃণাব বন্ধু। এই বন্ধুতা বজায় বাখতে কিছু বইপত্তব তাকে কিনতেই হয়।

উড়ে গিযেছিল। হলেও ক্ষতি নেই, দুযে দুযে চাব হিসেবে পটু প্রসূন ঠিক কবেই ফেলেছিল, দ্বিতীয়বাব বিয়ে কবলে আবেক দফা যৌতুক, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স বাড়বে বৈ কম নয়। কিন্তু প্রসূন এও জানে না, সহজ অঙ্কেব থেকেও আবো জটিল অঙ্ক আছে; আছে অ্যাব্স্ট্র্যাক্ট্ অ্যাল্জেব্রা, টু দি পাওযাব ইন্ফিনিটি, যেখানে তৃণাব সঙ্গে তাব মিল হযনি। আব আজ ছোট একটুকরো শক্ত বস্তুকে মাঝে বেখে ওবা পরস্পবেব সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ববিনেব সঙ্গে ওব কি সম্পর্ক থাকতে পাবে? নিশ্চয কিছু আছে। ঘটনার স্রোত দুই মেরুর মানুষকেও কাছকাছি আনতে পাবে। কিন্তু আশ্চর্য! ওরা এত কাছে এসেও যোজন যোজন দূরে সরে যাচ্ছে, দুজনেব হাতেব খোলা ঝকঝকে ছুরি ওদের কিছুতেই এক বিন্দুতে আসতে দেবে না। না ওবা মানুষ নয়. ইঁট, কাঠ, পাথরেব মত দুটো শক্ত কিম্ভূত জীব—ববিন, প্রসূন।

তৃণাব আবো বিরক্ত লাগে, ওদেব দুজনেব পেছনে ছোটখাট এক একটা দলও এসেছে। তাদেব প্রত্যেকেব হাতে অস্ত্র। তৃণা শুনতে পাচ্ছে না, কিন্তু বুঝতে পারছে দুইদল সামনাসামনি পবস্পবকে ভয়ংকব গালিগালাজ কবছে। কি ভীষণ আক্রোশ আব ঘৃণা মুখেব প্রতিটি বলরেখায় ক্ষত সৃষ্টি কবে চলেছে। এই হচ্ছে মানুষেব আসল রূপ। অথচ সমীবণ, প্রসূন একদিন যখন তৃণাব পাশে এসে বসত, হাতে হাত. চোখে চোখ, একটু ভালবাসা (হযতো বা ভালবাসা ?) বিকেলেব হাওযায ওড়াওড়ি কবত, তখন ওদেব মুখ এত সুন্দব লাগত কি করে! তাহলে সবটাই কি মুখোশ ? নাকি স্বপ্ন দেখাব চোখটা হাবিযে ফেলেই যত ঝামেলা হয়েছে! ওবা এখন নিজেদেব ছাড়া কিছুই দেখতে পায় না। অবশ্য নিজেদেব ভেতবটা কখনোই দেখতে পাবে না, পাবলে আঁতকে উঠত—দিনে দিনে এত ক্ষয হযে গেছে, এত গর্ত আব হাজাব হাজাব বিছে সেখানে বাসা বেঁধেছে! এখন যে ওবা হিংস্র-ভাবে পবস্পবেব দিকে তেড়ে আসছে তাব কাবণ ঐ বিছেদেব ভযংকব দংশন। বিছেবা এক এক কামড়ে বিষাক্ত করে তুলছে বক্ত, বিকৃত হযে উঠছে মুখ। একটা অনিবার্য ধ্বংস তাবা কববেই। কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপ থেকে নতুন সুন্দব কিছু মাথা তুলে উঠবে না, কাবণ তাদেব ধ্বংসেব মধ্যে নেই কোনো স্বপ্ন, নেই কোনো লাগামহীন ছুটন্ত ঘোড়া।

কিন্তু তৃণার চোখে আছে ঘোড়াদেব ক্ষুবেব শব্দ। বিছেবা তাব বুকও

তাদেব অস্বীকাবেব প্রধান কাবণ কি ছিল। তাদেব কাছে তৃণা ছিল মবীচিকা, যে শুধু আশাব আলো দেখাতে পাবে, কিন্তু তৃণা তো মবুদ্যান নয। তাই তৃণাকে ববিনেবা গ্রহণ কবতে পারে না। ববিন এমন মেযেকে বিযে কবেছে, যৌতুকেব টাকায যাতে ভবিষ্যতে ফলজল পাওযা যায।

মাঝে মাঝে তৃণাব স্বপ্নেব মধ্যে অশুভ আত্মাব মত প্রসূনেবা ঘোবাফেবা কবে। এখন যেমন ছুটন্ত বাসেব মধ্যে বসে তৃণা উড়ন্ত ঘোড়াদেব দেখতে পাচ্ছে, আব ওবা মাঝে মাঝেই খামোকা সমস্ত পটভূমিব সামনে, চিন্তাব শাখা-প্রশাখাব মধ্যে কালো পতাকা নিযে মুখোমুখি এসে দাঁড়াচ্ছে। কালো-পতাকাব বিশ্রী ওড়াওড়ি তৃণাব চোখেব সামনে থেকে ঘোড়াদেব একটানে সবিযে দিতে চাইছে। ওদেব বক্তব্যটা কি ? শেষবাবেব মত শুনতে চায তৃণা। একটা ফয়সলা হযে যাওযা দবকাব। তৃণাকে ওবা কি শান্তিতে, একটু আনন্দে বাঁচতেও দেবে না ? ক্লান্ত এক কেবানীব বেঁচে থাকাব শেষ সম্বল-টুকু ওরা ছিনিযে নেয কোন অধিকাবে। পৃথিবীব অনেক প্রতিযোগীব মত ববিন, প্রসূন এখন পবস্পবেব সামনে মৃত্যুব অধিক প্রতিদ্বন্দ্বী। তৃণাব কথা তাবা কেউ মনে বাখেনি, অন্য কোনো বোঝাপবা কবে নিতে ওবা পবস্পবেব মুখোমুখি হযেছে। তাদেব কথা বুঝতে পাবে না তৃণা, এতদিনে ওদেব ভাষা তৃণাব বোধেব ভাষাব অনেকদূবে সবে গেছে, কিন্তু কালো পতাকা হাতে দুটো মানুষ যে কিছু একটা ভাগাভাগিকে কেন্দ্র করে ভয়ংকব হযে উঠেছে সেটা বোঝা যায তাদেব হাত-পা-মুখেব মুদ্রায। পরস্পবকে তাবা শেষ কববেই। কবুক। এটাই তাদেব নিযতি ছিল। যাবা আশাকে ভাবে মরীচিকা ; তাবা একে অপবেব বুকে ছুবি বসাবেই। মানুষগুলো বোকাও কম নয, জানে না একে একে দুযে মিলে জোড়ায জোড়ায় যে শক্তি, তা তাদেব প্রত্যেকেব চাহিদা ছিনিযে নেওযাব পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তা নয ছোট এক অংশে দু'জনে একইভাবে থাবা বসাতে চায। হাত তো নয়, থাবা। তাই শুভ কবে না। খিমচে কামড়ে পবম বন্ধুকেও শত্রু কবে। তা কবুক তৃণাব কিছু যায় আসে না, তৃণাব চোখেব সামনে থেকে সবে গেলেই হয। তৃণা চায় না ছুটন্ত ঘোড়াদেব সামনে ভ্রাতৃহত্যাব রক্ত, ঝবণার জলে মিশে যাক। তৃণা শুনেছে প্রসূনের প্রথমপক্ষ বৌ স্টোভ ফেটে মারা যায। অবশ্য পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অন্য কথা বলেছিল—স্রেফ বধূহত্যা। সেই রিপোর্ট চাপা দিতে যৌতুকে পাওয়া অর্ধেক টাকা প্রসূনের ভোজবাজির মত

মনে হয়। ইচ্ছে কবে চটিজোড়া পা থেকে খুলে ছুঁড়ে দেয় ছুটন্ত যানবাহনেব তলায়, এগুলো থেঁতলে যাক তৃণাব মত, বিভাব মত, ঐ হতভাগা শ্রমিকেব মত।

না, না এসব কি চিন্তা কবছে তৃণা। কযেকটা খস্‌খসে দেওযাল তাব দিকে পিটপিট কবে তাকিবে থাকে। না, এভাবে তৃণা কিছুতেই বাঁচতে পাবে না। ঘোডাব ক্ষুবেব শব্দটা যদি শ্যাওলাব আস্তবণে—চাপা পবে যায? সেখানে যদি আস্তে আস্তে পচা মাংস হাডগোব জমা হয? ভযে নীল হযে যায তৃণা। ঐ শব্দটাই যে তাব বাঁচা মবাব নিয়ামক। হয়তো ঘোডাটা দবজাব কাছে এসে দাঁডাযনি, কিন্তু একদিন সে আসবেই। তৃণা যে স্পষ্ট দেখে—দূবে মবুভূমিব ওপব দিয়ে সে ধুলো উডিযে আসছে। তাব ক্ষুবেব এমন গতি ধুলো সবে ভেতব থেকে জল ছিটকে বেড়চ্ছে। আব সেই জল জমে জমে জন্ম দিচ্ছে আবেকটা ঘোডাব। এক একটা ঘোড়া এক এক দিকে ছিটকে যাচ্ছে। এভাবে হয়তো তারা সাবা পৃথিবীতে ছডিযে পববে। যেখানে যত শুকনো শক্ত ধুলো ক্ষুবেব দাপটে উডিযে জল তুলবে সাদামাটা একটা ঝবণা তৈবিব জন্যে। সাদামাটাই বা ভাবছে কেন তৃণা। ঐ তো অনেক ঝবণা মিলে ভয়ংকব এক নায়েগ্রাব গর্জন দেখতে পায যেন। তাব এই দেখা বিশ্বাস এ সবেব নিশ্চয মূল্য আছে। ক্যানভ্যাসে ঘোড়াগুলো যত বড হতে থাকে তৃণাব সামনে ছবিটা জ্বলজ্বল কবে ওঠে—ঘোডাগুলোব অদ্ভূত বং বূপ; এমন গতি তাদেব যে দেহ দেখতে পাওযা যায না, শুধু বলিষ্ঠ পেশীব মাবাত্মক ওঠানামা বিস্মিত চোখে দেখে তৃণা।

তাহলে এমনও একদিন আসবে পৃথিবীতে আব কোনো তৃষ্ণার্ত থাকবে না! ঝবণাব এত জল! আব বিভাটা কিছুদিন অপেক্ষা কবতে পাবল না! বিভার জন্যে সত্যিই দুঃখ হয তৃণাব। সে যদি তৃণাব মত সবকিছু দেখতে পেত, তাহলে বুঝত পৃথিবী এখনও মবুভূমি হযে যাযনি, ট্রেন থেকে ঝাঁপিযে পবাব আগে সবুজ ঘাস, ঝবণা, ওম দেওয়া গোলাপি জীবন তাকে হাতছানি দিত, গুমোট ট্রেনেব কামবাব ঘর্মাক্ত মানুষদেব সঙ্গে গা-ঘেষে দাঁডানোব জন্যে। ভুল কবেছিল বিভা, কাবণ সে তৃণার মত স্বপ্ন দেখতে পাবেনি। যাদেব ছেড়ে এতপথ হেঁটে চলে এসেছে তৃণা—সেই প্রসূন, ববিন ওবাও স্বপ্ন দেখতে শেখেনি। বেঁচে থাকাব প্রাণ-ভ্রমরাকে ওবা ভাবত মরীচিকা। কোনো মরীচিকাকে সামনে রেখে চলা ওদেব পদে সম্ভব ছিল না। তৃণা এখন বোঝে

খুব ঠিকঠাক মনে হয়—অন্তত সমীরণের ক্ষেত্রে, হয়তো অনেক মানুষের ক্ষেত্রেই—খুব নরম, আদর করতে শিহরণ কিন্তু বড্ড ভীতু, সামাজিক খোঁচা দেখলেই মুখ গুঁজে লেজ গুটিয়ে পালায়। সমীরণ খরগোশই ছিল। আর রতন, বরুণ, প্রসূন খরগোশও নয়, একেবারে গিনিপিগ যারা অন্যের ইচ্ছে-অনিচ্ছে ওষুধের প্রতিক্রিয়া হওয়ার জন্যেই জন্মায়। কিন্তু তবু—কোথায় যেন একটা। 'তবু' থেকে যায় তৃণার মনে। মানুষ, হতে পারে খরগোশ বা গিনিপিগ কিন্তু মানসিক জটিল তন্তু ছিঁড়ে তৃণা আবিষ্কার করতে চেয়েছে বেঁচে থাকার একটুকরো সরু চাকলি।

তৃণা এ বয়সে কম তো দেখেনি। নিজের বড়দাদা মৃণালকে সে ভুলবে না কোনোদিন। বড়দাদা বলে নয় ছেলেটার দর্শন,.মেধা পাশের মানুষকে অন্য এক মাত্রায় নিয়ে যেতে পারত। ছোটবেলায় মৃণালকে আদর্শ পুরুষ মনে হয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য ক্যারীয়ার্ গড়ার সব ইচ্ছে ছেড়ে মৃণাল দেশকে অন্যভাবে, নতুন করে ঢেলে সাজানোর ইচ্ছেতে নিজেকে আহুতি দিল। হাসি পায় তৃণার, মৃণালের মত কত ছেলে যারা সমাজের অনেক উঁচু পর্যায়ে যেতে পারত, নিজেদের বলি দিল শুধু এক অতৃপ্ত স্বপ্নকে সত্যি দেখার জন্যে, তাদের স্বপ্ন করবে ঢুকরে কাঁদছে, বা আত্মারা রাতের অন্ধকারে পরস্পরের সঙ্গে ফিসফাস করছে, পরামর্শ করছে—অন্যভাবে স্বপ্ন সার্থক করা যায় নাকি! কিন্তু ঐ ওখানেই শেষ। সবকিছু ঠিক আগের মতই চলছে, কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই। সব মানুষের ভাল চেয়েছিল যেসব ছেলে তাদের দিকে পিঠ ফিরিয়ে সাধারণ মানুষ দিব্যি হেঁটে গেছে। কি আসে যায় কয়েকটা ছেলে কোন মহান উদ্দেশ্যে কি করতে চেয়েছিল—সেসব কথা ভেবে। সুতরাং সবকিছু একই ভাবে চলছে। লক-আউট কারখানার শ্রমিক, পরিবারকে খুন করে আত্মহত্যা করছে, বিভার মত অনেক বেকার নিরুপায় হতাশায় ট্রেন থেকে ছিটকে পড়ে মৃত্যুর সবুজ অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছে। টেবিলের তলায় টাকা নিয়ে নির্দ্বিধায় যারা জীবনের সুখ নেয়, তাদের আশীর্বাদে ধর্ষিতা মেয়ে নিষিদ্ধ পল্লীর পতিতা হয়ে যাচ্ছে আর তৃণা—একা মান মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে সকাল থেকে সন্ধ্যে অফিস টিউশনি—রাস্তায় রাস্তায় জীবনের বেশির ভাগ সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছে। ভাল একটা শাড়ি কতদিন যে সে পরেনি, আছেই বা কটা আর পরে হবেই বা কি। সারাদিন নিজের চটির চটাস্ চটাস্ শব্দ একএক সময় অসহ্য

কয়েকফোঁটা শিশিরের স্বপ্ন কেন যে মন থেকে যায় না । এই স্বপ্নটাই তৃণাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে । কখনো মনে হয় স্বপ্নটাই সত্যি, বাস্তবে যা ঘটছে তা মিথ্যে । কয়েকদিন তাতে আনন্দেই কেটে যায় । শরীরের ভেতর সূর্যের আলো বেশি করে অনুভব করে । মনে হয় প্রতি কোষে সূর্যের রশ্মি তালে তালে মৃদঙ্গ বাজাচ্ছে । তখন যেন প্রায় পাশেই এসে বসে—সে । কখনো তেমন মুহূর্তে তৃণাকে বিছানায় বুকে জড়িয়ে চুমুও যেন দিতে চায় । কিন্তু হঠাৎ, বাস্তবের প্রচণ্ড ধাক্কায়, চুম্বনের মধুর মুহূর্তের, মিলনের ঠিক আগেই ছিটকে যায় সে আর তৃণা । বাস্তবের ইঁট, কাঠ, বায়ুর-চাপ বড়বেশি চেপে ধরে তৃণাকে । হয়তো দেড় হাজার টাকার মাইনের কেরানীর যার আত্মীয়ের মধ্যে একমাত্র ভাই-এর সঙ্গেও তেমন সম্পর্ক থাকে না, চাওয়া-পাওয়াটা রিকটর স্কেলে খুব ওঠানামা করতে পারে না । তবু চাওয়াটা মাঝে মাঝে চাড়া দিয়ে অনেকটা উঠে গেলেও, পাওয়ার কম্পন প্রায়-আনুভূমিকই থেকে যায় । নয়তো স্কুলজীবনে রতন, কলেজে বরুণ, বেকার অবস্থায় প্রসূন, এমনকি অফিসে সমীরণ, তাদের একটুকরো অস্তিত্ব তৃণার অনুভূতিতে পুঁতে, এভাবে সরে যাবে কেন ? ওরা কেউই তো খারাপ ছিল না, মানে মানুষ যেমন হয়—ভালবাসার একটু সবুজ ইচ্ছে, একটা ছোট ঘর বাঁধার হাতছানি, এক টুকরো জমির ওপর পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে খুঁটি পুঁতে যাওয়ার প্রবণতা সবই ছিল, অন্তত তৃণার তাই মনে হয়েছিল , কিন্তু কেমন জানো তৃণা যখন তাদের ইচ্ছার চাকায় চড়তে যাবে, ঠিক তখনই চাকাটা অন্যদিকে ঘুরতে আরম্ভ করেছে, প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই । অফিসের সমীরণ তো সাফ কথা বলেই দিয়েছিল—"মা-বাপ হারা একা থাকে চাকরি করে, এমন মেয়েকে বিয়ে করি আমার বাড়ি থেকে রাজি হচ্ছে না ।" "তাহলে এতদিনের মন দেওয়া-নেওয়া আশা আকাঙ্খার কোন মূল্য নেই ?" নীরব ছিল সমীরণ, তার নীরবতা তৃণাকে বুঝিয়েছিল আসলে ঠিকঠাক সবকিছু মিললেই মানুষের কাছে মূল্য বেড়ে যায় । মানুষ যেন একটা ময়দার প্যাকেট বা আলুর বস্তা, জীবনে প্রতিমুহূর্তে সামাজিক মানদণ্ডে তার মাপামাপি হচ্ছে । একটা একক সত্ত্বা তার মন, অস্তিত্বের কোনো অর্থ নেই । নেই, নেই, নেই । কিন্তু তবু কেন তৃণা আজও সমীরণকে খারাপ ভাবতে পারে না । ওদের বাড়ির অবস্থাও যে খুব ভাল ছিল তাও নয় । তবু তৃণা কেন আজও অনুভব করতে পারে, সমীরণের ভেতরে একটা খরগোশের মত নরম মনকে ! খরগোশের উদাহরণটা তৃণার

আঙিনা থেকে, কখনো পূর্বদিকেব বান্নাঘবেব বন্ধ জানলাব পাশে হচ্ছে। অথচ পা টিপে টিপে সেখানে এসে উঁকি দিযে দেখেছে, কোনো ঘোড়া নেই, শব্দ নেই। এমনকি দবজায় টোকা শুনে, খুলে দেখেছে—শুধু একবাশ জ্যোৎস্নাব হাসি। তবু তৃণা জানে সে এসেছিল, শব্দ না কবে, চিঠি বা ফুল না নিযে, অনুভূতিব মধ্যে এলিয়ে দিয়েছিল সফেদ ভালবাসা। এমন কবে সে বাববাবই আসে। তৃণা যখন দুমড়ে মুষড়ে অন্ধকাবে হাতবাতে থাকে, আকাশটা ক্রমশ নিচু হতে হতে তৃণাকে মাটির সঙ্গে চেপে ধরতে চায়, তৃণাব হামাগুড়ি দেওয়ারও কোনো উপায় থাকে না, তখন আশ্চর্য ভাবে সে আসে। আকাশটাকে হাত দিয়ে ঠেলে ওপবে ছুঁড়ে দেয়, সূর্যেব টুকবো আলো বুলিযে দেয তৃণাব ঠাণ্ডা শবীবেব ওপব। হাত-পা সচল হলে তৃণা প্রথমে একটু হামাগুড়ি দিযে, একলাফে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায। চিৎকাব কবে ওঠে—"হুববে" বা "ইউবেকা"। আকাশ আবার উঁচুতে উঠে যায়। তৃণা দেখতে পায সূর্য, সন্ধ্যা আকাশে অসংখ্য তাবা আব চাঁদ—তৃণা বুক ভবে নিঃশ্বাস নেয।

বিভাব অনুভূতি, লক-আউট কাবখানাব শ্রমিকটিব অনুভূতি তৃণাব মতন নয। কেউ কাবুব মত নয। যদিও তাদেব প্রত্যেকের সামনেই মৃত্যুব লুকোচুবি খেলাটা হয়েই চলে। তৃণা বিশ্বাস কবে, প্রতিমুহূর্তে মবে থাকা, আত্ম-অবমাননাব আবেক নাম। তাই তার আশা—সে। ভুল, হ্যাঁ, জীবনে বহুবাব ভুল হয়ে গেছে তৃণার। এই যাওযা-আসাব পালায ঠিকঠাক পর্দা ওঠনো-নামানো তাব দ্বাবা হলো কৈ। নযতো এতদিনে অন্তত একবাক্স চিঠি, বা একগুচ্ছ ফুল তাব টেবিলেব ওপব ফুলদানিতে থাকতই, কোথায যেন একটু ভুল হযে যায। পর্দাটা যখন প্রায় টানাব সময় আসে, সবাই হাততালি দিযে বলে উঠে—'চমৎকাব হযেছে, এবাব পর্দা পডলেই অভিনয শেষ—তৃণা কেমন থমকে যায। পর্দা টানতে দেবী হয, আব পালাটাও যায ভেস্তে। দর্শকবা হা হা কবে ওঠে, আব তৃণা বোঝে এবারও হলো না। মানুষটা যখন ফুলটাকে বাডিযেই দিযেছে, তাডাতাডিতে তৃণা হাত বাড়াতে পাবেনি। অভিনযটা একটু হলেই শেষ হযে যেত, অথচ তৃণাব হাতে ফুল না আসাতে, পর্দাও টানা হলো না, নাটকের ক্লাইম্যাক্‌সেও যাওযা গেল না।

বাববাব তৃণা অপবাধীই থেকে যায়। প্রাইভেট ফার্মে দেড়হাজাব টাকাব মাইনের টাইপিস্ট তৃণা জীবনকে কম দেখেনি। উপলব্ধি কাঁটায় ভরা, তবু

তৃণা বুঝে নিয়েছে—মৃত আত্মারা তাদেব দলভারী কবতে চায়। তাদের অশরীবী যুদ্ধেব সঙ্গে জীবন্ত মানুষকে সর্বদা লড়াই করতে হয়। তাই মানুষের লড়াই দু'দিকে—একপাশে জীবন আব অন্যপাশে মৃত্যু। তৃণারও কি মাঝে মাঝে খুব, খুব মাবা যেতে ইচ্ছে কবে না? মৃত্যুর গাঢ় উত্তাল ঢেউ-এব মধ্যে বাধাহীন তলিয়ে যেতে ইচ্ছে কবে না? এই তো দু'তিন মাস আগে, বা আবো কিছু মাস আগে এমনই এক অনুভূতি ছড়িয়ে পড়েছিল—তাকে গ্রাস কবতে। আজকেব দিনটাব মতো, সেদিনটাও বাস্তব ছিল; তৃণা যেন স্পষ্ট দেখেছিল—ঘবের চাবপাশেব দেওয়াল সবে গেছে। আক্রোশে দেওয়াল-গুলোকে ধবতে চাইছিল তৃণা। কিন্তু ওরা থাকাব নয়—আলোব গতিবেগে সরে যাচ্ছিল ছিটকে, আব তাদেব জাযগা দখল কবতে চাবপাশ থেকে গাঢ় নীল অন্ধকার এগিয়ে আসছিল দুর্মব গতিতে। এই দুই বিপবীত গতিব মধ্যে বিমূঢ় তৃণাব শব্দহীন, অন্তর্ভেদী হাহাকার, খুঁজছিল অন্তত দেওয়ালেব মত কঠিন কোনো সান্ত্বনা। কিন্তু গাঢ় অন্ধকাব ক্রমশ মৃত্যুব উচ্ছ্বাসে তাব চাবপাশে নাচছিল। তৃণা জানত এই খলখলে নিয়তি একবাব আঘাত কবলে, সে কোনোদিনই আর দেওয়াল ছুঁতে পাববে না, যা বেঁচে থাকব পক্ষে ভযংকব জবুরী।

এমন অনুভূতি সেদিন, তাব আগে বা ভবিষ্যতেও তৃণাকে আচ্ছন্ন কববে। কিন্তু তৃণা মববে না। কারণ তৃণা, বিভা বা আজকের কাগজেব শ্রমিকটি নয। নাই বা হলো তৃণা যত্ন করে ফোঁটানো টবের ফুল। আগাছাতে বুনোফুলও তো জন্মায়, তাদেবও যন্ত্রণা নীল সৌন্দর্য আছে। সেই যন্ত্রণায তৃণা বাঁচতে চায়। হয়তো সে মবীচিকা দেখে, বেশি সাহসী কেউ তাকে ভীরুই বলবে। কিন্তু তৃণা শেষটা দেখবেই।

তাই, যেদিন মৃত্যু তাকে আঘাত কবতে তেড়ে এসেছিল, তৃণা সমস্ত শক্তি দিয়ে ভেবেছিল সে আসবে। আসবেই। দেওয়ালগুলোকে ঠিকঠাক ধরে বাখতে একটা খোলা দবজাব দরকাব। দবজা ছাড়া বন্ধ ঘরে সব অন্ধকার, মৃত মানুষ দেওয়াল ছুঁতে চায় না। জীবনেব সঙ্গে দরজা, আর দরজাব খোলা বাতাসে সে। আসবেই। নযতো তৃণা বাঁচবে কি করে!

ছুটন্ত বাসেব ভযানক গতিব মধ্যে তৃণা চিন্তার ঘূর্ণিপাকে মুখ কুঁচকে তাকায়। কিন্তু কালকে ঘোড়াব ক্ষুবেব শব্দটাকে কিছুতেই ধবতে পারেনি। সারাবাত মনে হয়েছে শব্দটা কখনো উত্তব কোণ থেকে, কখনো দক্ষিণের

ছিল না—মৃত্যুর পরেও জীবনের অন্যস্বাদ থাকে কি ? না, মেয়েটির সামনে কোনো অনৈচিত্যের আদর্শবান ঘড়িও আসেনি, যা তাকে জানাতে পারত বৃদ্ধ বাপ মায়ের উপর তার একটা কর্তব্য আছে। অথবা মনে পরেনি সেই প্রেমিকের মুখ, যা তার চলার পথে কিছুদিনের আশ্রয় হয়েছিল। তৃণা জানে—তখন মেয়েটির সামনে একমাত্র সত্য ছিল, ডায়মণ্ডহারবার লোক্যালের অনিবার্য গতি, জীবনের অন্য এক মানে দিয়েছিল সেই গতি, যার নাম ছিল মৃত্যু। বিভা এখন স্মৃতি। কোনো স্মরণসভা হয়নি, মৃত্যুর কারণও কেউ তলিয়ে দেখেনি, তেমন প্রয়োজনও ছিল না। ট্রেনে উঠলে কখনো সখনো বিভার মৃত্যুর ঘটনাটা তৃণারই একমাত্র মনে পরে। বিভার বাবা মা কয়েকদিন কান্নাকাটি করে বেঁচে থাকার অন্য উপায় খুঁজে নিয়েছিলেন। তৃণা সাক্ষী—মৃত্যু যে জীবনের থেকেও মধুর হতে পারে।

অথবা সেই মানুষটি, যে আজকের কাগজে, ৬-পৃষ্ঠার এককোণে, নিজের মৃত্যুর সুযোগে, গুঁড়িসুড়ি স্থান পেয়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত মৃত্যু। হয়তো কাগজ বেশিবিক্রির লোভে কাগজওয়ালারা ঘটনাটাকে গুরুত্ব দিয়েছিল। তাই তৃণাও জেনেছিল—লক-আউট কারখানার শ্রমিক দারিদ্রের সঙ্গে নাজেহাল পাঞ্জায় পরাজিত, স্ত্রী ছেলে মেয়েকে হত্যা করে, নিজের গলায় ফাঁস পরিয়েছে। তৃণা জানে কথাটা ঠিক নয়। বাঁচার মরীচিকা মানুষকে এমন-ভাবে লোভ দেখায় যে শুধুমাত্র লক-আউট কারখানা একজনের মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। যদি তা না হতো কারখানার অন্য শ্রমিকেরা ঠিক একইভাবে মারা যেত। যেমন করে তারা একসঙ্গে বহুদিন গলা মিলিয়ে প্রতিবাদ করেছিল—'আমাদের দাবী মানতে হবে।' আসলে বিভা বা শ্রমিকটির জীবনে মরূদ্যান বা মরীচিকা কোনোটিই ছিল না। মৃত্যু ছিল প্রিয়, সত্য।

কখনো স্টেশনে দাঁড়ানো ট্রেনের পাটাতনে পা দিলে, তৃণার মনে হয় পেছন থেকে কে ডাকছে—'তৃণা, বেঁচে থেকে কি লাভ ? গেটের সামনে হাল্কা ভাবে দাঁড়িয়ে থাকো, চলন্ত ট্রেন শন্‌শন্‌ বাতাস যখন টানবে, ছিটকে পরবে এক লহমায়। এসো আমরা তোমার প্রতীক্ষায় আছি'। শিউড়ে ওঠে তৃণা। পেছন ফিরে তাকায় না। ছোট বয়সে ঠাকুমার সাবধানতা মনে আছে তার—'অশরীরী ভয় দেখালে ফিরে তাকাতে নেই।' ফিরে তাকায় না তৃণা। কামরার জনতার ভিড়ে নিজেকে ঢুকিয়ে, বেঁচে থাকার ঘাম উপলব্ধি করে। তার অন্তর্বাস থেকে স্বস্তির ভাপ বেড়িয়ে আসে।

তৃণার চিবুক, চোখ, শাদা বুক ছুঁয়ে গড়িয়ে পরছিল—তৃণাকে ক্ষতবিক্ষত করার জন্যে। তৃণা এতকাল অনাবাদী, ভেবেছিল মাটি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে বোঝে, লাঙ্গলের একটু আলতো ছোঁয়ায় মাটির শিকড় থেকে সহজেই জল বেড়িয়ে আসে। আর সেই জলে দু'হাত মেলে দাঁড়িয়ে উল্লাস করছে সে।

তৃণা বুঝতে পারে না শুকনো মাটিতে এত জল আসে কোথা থেকে! মানুষটার সমস্ত শরীরে ঢেউ খেলে যায়, জ্যোৎস্নার এত রূপ তৃণা আগে দেখেনি। অথচ এই তৃণাই কয়েক সপ্তাহ বা কয়েকমাস আগে মরতে চেয়েছিল। এখন সে সবের কোনো অর্থ নেই। সে, তার শরীরের ঢেউ, তৃণার নিজস্ব ঝরণা, সবটাই কি বেঁচে থাকার পক্ষে যথেষ্ট নয়! মৃদু হাসে তৃণা! সকালের কাগজে একজন একাকী মানুষের আত্মহত্যার কোনো বিশ্লেষণ থাকে না।

দরজার কড়া নাড়ার শব্দটা যখন তৃণার অনুভূতির মধ্যে ঢুকে কমলা লেবুর রস ফোঁটায় ফোঁটায় ফেলছিল আর তার মিষ্টি গন্ধে তৃণা দেখতে পাচ্ছিল এতসব, তৃণা দরজা খুলে দেয়। ঘড়ির কাঁটায় ঠিক রাত দুটো। টং টং করে দু'বার বেজে দেওয়াল ঘড়ি জানায—একজন সাক্ষী আছে। হাট খোলা কপাটে জ্যোৎস্না মিষ্টি হাসে। অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা ঘোড়ার ক্ষুর থেকে ওঠা মাঝে মাঝে খটাস্ খটাস্ শব্দ রাতের বাতাসে হারিয়ে যাওয়ার আগেই, ঝটপট দরজা বন্ধ করেছিল তৃণা। না, বেঁচে থাকার এ অনুভূতি কিছুতেই নষ্ট করা যায় না।

কারণ, এখানে গিলোটিনের অভাব নেই, প্রতিদিন মৃত্যুদণ্ডেরও অভাব নেই। নয়তো সকালের কাগজে ওভাবে ফলাও করে একজন মানুষের আত্মহত্যার কথা সংবাদ হয়। তৃণা জানে—ঐ অতৃপ্ত মৃত আত্মা, মানুষকে কালো হাতছানি দিচ্ছে, বলিকাঠে মাথা রাখতে বলছে। আর সেই ঈশারা এত ভয়ানক, এত অনিবার্য যে মানুষের পেছনে মানুষ একবার মরার স্বাদ নিতে লোভীর মতন দাঁড়িয়ে পরছে। তাদের চোখে গড়িয়ে পরছে লোল, যেকোনো ভাবেই হোক নিজেদের তারা খাবেই।

কেন তৃণা নিজেই কি দেখেনি ফুলের থেকেও মিষ্টি মেয়ে বিভার, তার সহ পাঠিনীর চাকরির ইণ্টারভিউতে না পাবার দুঃখে ডায়মণ্ডহারবার—লোক্যাল থেকে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে মারা যাওয়া। সেখানে কোনো—প্রশ্ন

সে বাড়িয়ে দিবেছে বিবাট গাছেব ছায়াচ্ছন্ন এক ডাল—ডালেব ছায়াব মধ্যে চোখ বন্ধ করে এক আশ্চর্য জগতে ঘুবতে থাকে তৃণা। গাছটা যেন মাটি থেকে নয়, শিকড় পুঁতে বেখেছে অনন্ত নীল আকাশেব ঝলমলে হাসিতে। গাছেব ডাল বেয়ে আলোব গুঁড়ি গুঁড়ি হাসি তৃণাকে বাসন্তী রং-এব চাদবে জড়িয়ে ধরছে। সে চাদর এত হাল্কা, এত স্বচ্ছ অথচ তৃণার এতদিনের জমানো মলিন চাবপাশেব বাক্স-তোবঙ্গ একটানে সরিয়ে দিতে পাবে তা। খোলা আকাশেব নিচে এখন তৃণা আব সে। আব কোনো দ্বিধা নেই।

দ্বিধা নেই হাজাব হাজার ডালপালার মধ্যে ছুটে যাওয়া। অনন্ত আকাশের একটা ডাল বুঝিয়ে দিয়েছে ভয় নেই। ছুটতে থাকে তৃণা—একটা সবুজ পাতা হাতে নিয়ে । বুঝতে পাবে সে দৃষ্টি দিয়ে তৃণাকে গ্রাস কবছে।

কোনো শব্দ নয়, চিঠি নয়, হাত নয়, তবু কেন মনে হয় সামনে ছড়িয়ে আছে হাজার খানেক চিঠি? বহুদিনেব পরিচিত উষ্ম এক হাত, আর গোলাপেব ঝরে পরা পাঁপড়ির মত দুর্লভ কয়েকটা শব্দ। যা তৃণাকে কিছুতেই মরতে দেবে না।

তৃণাকে বাঁচাতেই হবে। এমনই ছিল প্রতীক্ষা। কয়েকদিন বা কযেক সপ্তাহ আগে, সে কিভাবে এসেছিল—ভাবাব চেষ্টা করে তৃণা। কোনো স্কুটারে, বা রিক্সায় চেপে বা একেবাবেই দুপাযে ভবসা রেখে! পাযে পায়ে 'আসছি' শব্দটাকে প্রতিধ্বনি করতে কবতে, তৃণার দরজায় টোকা দিযেছিল? সে প্রতিধ্বনি তৃণা কয়েকদিন ধরেই শুনতে পেয়েছিল, যেমন আজকেও পাচ্ছে। একলা তৃণা, পাযের মৃদু শব্দেব মধ্যে শুনেছিল জ্যোৎস্না-ধোয়া বাস্তায় জযী এক বাজাব অশ্বারোহনে আসার খটাখট। বহুদূর থেকে ঘোড়া ছুটে আসছে। ঘোড়ার চকচকে পিঠের আলো আঁধারিব ওপর, সে বসে আছে, ঠোঁটে অনির্বচনীয় হাসি—প্রেম। কেঁপে উঠেছিল তৃণা। মানুষটা যেন মৃত্যু আর জীবনের সীমানার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। পায়েব শব্দ নয়, জ্যোৎস্নায় ঘোড়ার ক্ষুবেব শব্দ—রাতের ফুল হয়ে ধীবে ধীরে স্পষ্ট, সুন্দর, মধুর, শিহরণে ফুটে উঠছে। তাবপব তৃণাব দবজায় একটানা কড়্‌কড়্‌ দবজা খোলার নিশিডাক। কান পেতেছিল তৃণা দরজায়। হ্যাঁ, একটা ঘোড়াই যেন অধীব ভাবে ঘাসে পা ঠুকছে, প্রতিবাদ করছে মনিবকে এভাবে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখাব জন্যে, মৃদু হেসেছিল তৃণা। তার রক্তিম আবেগ, চোখ,

প্যাণ্টের পকেটগুলো মনে হয় অনেকটা দীর্ঘ, এক সুরঙ্গ। হাজার হাজার চিঠি সেখানে ছুটোছুটি করছে, হাততালি দিচ্ছে, তৃণাকে দুয়ো দিচ্ছে। ঐ তো একটা চিঠি, পাটভাঙ্গা প্রজাপতির মতো, তার পকেটে হঠাৎ খুলে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে কত রঙিন লেখা নাচতে নাচতে বেরিয়ে পরল ছন্দে, সুরে। লেখাগুলো সুর হয়ে টুং-টাং পিয়ানোর ঝরণায়-তৃণার কানের পাশে ঝরে পড়ে। কিন্তু প্রজাপতিটাকে যখনই ধরতে চায় তৃণা, উধাও হয়ে যায় তার রঙিন ডানা, লেখাগুলো তৃণার বুকের ভেতর মিশে একাকার হয়ে যায় সুর, রং ঝরণার ঐক্যতানে। চিঠি নেই, ভাষা নেই। এমনকি সে এসে তেমন কোনো ভালবাসার কথাও বলে না। তৃণা ভীষণভাবে চায়—কিছু কথার ফুলঝুরি আঁচলে ঝরে পড়ুক, আগুনে পুড়ে যাক—এতদিনের অভ্যাস , বাক্সবন্দী জীবন না পুড়লে কি আকাশের নিচে দাঁড়ানো যায় !

কিন্তু শব্দ করে ভালবাসার কথা সে জানায় না। তার ঠোঁটের দিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তৃণা একসময় আবিষ্কার করে ফেলে, শব্দ নেই কিন্তু হালকা গোলাপি ফাগ তার ঠোঁট স্পর্শ করে, তৃণার শরীরে, মাথার ওপর ঝুর ঝুর করে ঝরে পড়ছে , আর তৃণা ক্রমশ গোলাপি হয়ে উঠছে। তৃণার ভেতর-বাইরে যত গোলাপি হতে থাকে, মানুষটিকেও সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভূত সুন্দর মনে হয়। গোলাপি-ঠোঁটে গোলাপি চোখে-তৃণা তার দিকে তাকায়, দেখতে পায় তার পদ্মচোখে শিশির বিন্দুর টলমলানি। শিশিরবিন্দু ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে—একপেয়ালা মদির, যা তৃণার বিস্মিত দুই ওষ্ঠাধারের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পরে—আকণ্ঠ পান করে তৃণা। তৃণার সমস্ত অনুভূতিতে আবেশ। অসহায় তৃণা হাল্কা ঘাসের মত কাঁপতে থাকে। আড়কাতে শুয়ে পরে বিছানায়। বুঝতে পারে সমস্ত শরীরে বৃষ্টির জল। ঠোঁটের ওপর দামী ফিরোজির গন্ধটা তৃণাকে পাগল করে তুলছে। ভাল করে ঠোঁটটা চেটে টানটান চোখে তাকায় তার হাতের দিকে। নিশ্চয় এবার তার হাত তৃণাকে স্পর্শ করবে।

সেটাই তো স্বাভাবিক ছিল। আদি অনন্তকাল ধরে তাই হয়ে আসছে, যেমন উপন্যাসে, নাটকে তৃণা পড়েছে—দেহ ভিজলেই, একধরণের মৃত্যুর কাছাকাছি এসে পরা। তবু, হাত সে বাড়ায়নি। তৃণার লুটোপুটি খাওয়া ভেজা শরীরে, সে মৃত্যুবাণ ডেকে আনেনি। অনেকক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ব্যর্থ তৃণা, হঠাৎ উল্লসিত হয়ে পরে। হাত নয়,

ড্রাইভারের কেবিনে বসার মজাই এখানে। একঘণ্টা আগে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথায় টন টন করলেও, সীটটা পাওয়া গেছে দারুণ। কেবিনের কাঁচের মধ্যে সামনের খোলা রাস্তা, একবার উঁচু হয়ে আবার ঢলে পড়ছে নিচে, আর বাসটা অনবরত চড়াই-উতরাই পেড়িয়ে, ধ্রুপদী সঙ্গীতের স্বরের ওঠা-নামায় ছুটছে কোন অনন্ত জীবনের তাড়নায়, দুরন্ত পিপাসায়।

বেঁচে থাকার আগুন ছড়িয়ে পড়ে তৃণার রক্তের অলিতে গলিতে। ঘাসের সবুজ রক্ত ভারী করছে স্তনবৃন্ত, দুই ঠোঁটে মহুয়ার মাখামাখি। আকাশের বুকে গাছের ডালের সমর্পণে, হাত দুটো এলিয়ে পড়ে সীটের ওপর। খেয়াল থাকে না, হঠাৎ বাঁকের মুখে বাসটা ঘুরলে হুমড়ি খেয়ে যে পড়ে যেতে পারে। বুকের মধ্যে তোলপাড়। আলো আর বাতাসের লুটোপুটিতে হোলি খেলতে থাকে তৃণা। বে-আব্রু শাড়ির ওড়াওড়ি, কাঁধের পিনকে ছিটকে ফেলে খিল-খিলিয়ে হাসতে থাকে যেন। এখানে কোনো পোশাক নেই। হিমেল বাতাসে এক খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে তৃণা, সম্পূর্ণ নগ্না, এমনই ছিল তার কালকের প্রতীক্ষা।

সে আসবে বলেছিল। অথবা বলেনি। স্পষ্ট করে একথা কি বলার দরকার পড়ে। হঠাৎ একদিন সে এলে ঘরের বাতাসে দোলা লাগে, তা সমস্ত আবরণ খুলে বুকের গহ্বরে বেশ কিছুদিন দাপাদাপি করতে থাকে। কিছু-দিন সেই বাতাসের দমকে, ইথার-তরঙ্গ-নীল-আভায় ঘর-বাইরে এক। তৃণা তরঙ্গের দোলায় ভাসতে ভাসতে অনেক দূর চলে যায়। কোনো প্রশ্ন, কোনো উত্তর তখন অর্থহীন, হঠাৎ সবকিছুর রূপ কেমন পাল্টে যায়—তৃণা বুঝতে পারে না, কয়েকদিন বা কয়েক বছর আগে জীবনটা কেন একঘেয়ে লাগত। সে আসাতে পথের সব কাদা এক মুহূর্তে ধুয়ে মুছে গেল। অথচ এসবের কোনো কারণই নেই। না, তার হাতে কোনো ভালবাসার চিঠি ছিল না। আশ্চর্য মানুষটা, ভালবাসায় দই-ইলিশ করে দুটো লাইন কি লিখতেও পারে না? কি ক্ষতি হয় তাতে? দেখা করতে যখন আসছোই, হাতের মধ্যে হাত মিলিয়ে, চিঠিখানাও নীরবে সহজে চলে আসতে পারে। না, চিঠি সে আনে না। নিদেন পক্ষে সবুজ বোঁটার একটা লাল গোলাপ পরাতে পারে তৃণার কোঁকড়ানো চুলের একপাশে, তাও নয়! সে আসার সঙ্গে সঙ্গে, তৃণা চোরা চাহনিতে, তার সমস্ত শরীরে উঁকিঝুঁকি মারে—বুক পকেট, বা প্যান্টের পকেট থেকে একটা চিরকুট অতর্কিতে বেরয় কিনা। তার শার্টের

ঘোড়ার ক্ষুরে, সে—

অদিতি বণিক

এত তাড়াতাড়ি জীবনটা শেষ হয়ে যাবে কে জানত। গোধূলির শেষ আলো তৃণার চোখে-মুখে শুকনো কমলালেবুর রং ছড়ায়। সম্পূর্ণ ধূসরতা গ্রাস করার আগেই শেষবারের মত গাছ, মাঠ, কুঁড়েঘর আলাদা আলাদা অস্তিত্বে দেখে নিতে চায় তৃণা। ছুটন্ত বাসের থেকে মুখ বার করতেই কণ্ডাকটর সাবধান করে—"মুখ ভেতরে নেবেন, পাশ দিয়ে যেকোনো দ্রুত গাড়ি মৃত্যুর কারণ হতে পারে।" এই মৃত্যুর পাশাপাশিই তো দশ মিনিট ধরে চলছিল তৃণা। যতক্ষণ আলো ছিল, অবাক বিস্ময়ে প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে, সবুজ আর নীলের খেলা তাকিয়ে দেখছিল। আকাশের আগুন সবুজের ভেতর ঢুকে কোথাও গাঢ়, কোথাও হালকার লুকোচুরি। তৃণার ভেতরে সবুজ-নীলের ছোট বড় ঢেউ ভেঙ্গে পড়ছিল। ঢেউগুলো ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে যখন তার মাথায় এসে ধাক্কা দিচ্ছিল, তখন তৃণা ি ত্তেই হয়ে উঠছিল বিশাল এক প্রান্তর, যার ওপর চুম্বন, শিহরণের কামার্ত ষ্টি নিয়ে আকাশ ঝুঁকে আছে। তৃণার ঠোঁট দুটো কেঁপে উঠে জানায়—'ভালোবাসি'। চুল উড়িয়ে কানের পাশ দিয়ে বাতাস বইছে, দূরে কাশফুলের ডগায় অদ্ভুত কাঁপন। জীবন। ফুলের ওপর তৃণা উড়ে যায় একটা প্রজাপতি হয়ে। উড়তে উড়তে আকাশে ছুঁয়ে যায় রঙিন ডানা। কিন্তু তারপর আর দেখা যায় না, প্রকৃতির সব রং-এর সঙ্গে মিশে যায় ডানার ভেজা প্রতীক্ষা।

এই গতি আর স্থিরতাকে নিজের বুকে এক করতে জানলার পাশে ছুটন্ত একটা ডাল খপ্ করে ধরতে যাচ্ছিল তৃণা। কিন্তু হাত সরিয়ে নেয়, সাবধানতা—"বাইরে হাত দেবেন না"। না, তৃণা কোনো কিছু স্পর্শ করবে না। ছুটন্ত গাড়ির সঙ্গে তৃণা, প্রকৃতি। মুক্তি। রাস্তার পাশে গাছের ডালপাতা নানা ভঙ্গিমায় নেচে নেচে ছোটে। আসলে তৃণাই ছুটছে, তার গতিরই প্রতিফলন হচ্ছে গাছের ডালে ডালে। তৃণা কাউকে ছোঁবে না, শুধু বিপুল অধীরতায় ছুটন্ত জীবনকে ধরতে চাইবে, জীবনের সমস্ত রস চুঁয়ে চুঁয়ে তার শরীরকে ভেজাবে, তৃণা ভিজতে চায়।

Circle, The Good Person of Setzuan। শেষ জীবনের এই নাটকগুলিব আবেদন নাট্যকাবেব ঘোষিত উদ্দেশ্যকে অতিক্রম কবে যায়। বিশ্বসাহিত্যেব শ্রেষ্ঠ কীর্তিগুলিব সমকক্ষ এই বচনাগুলি, জীবনেব যে জটিল, বৈচিত্র্যময় ব্যাপ্তি, যে গভীর মানবতা ও প্রজ্ঞার দ্বাবা অভিষিক্ত, তা ভিন্ন ভঙ্গিতে, ভিন্ন প্রকবণে একমাত্র গ্রীক নাটকে, শেকসপীযাবেব বচনায় আমবা পাই। সমাজ-বিপ্লবেব প্রেরণা নয, সব ব্যর্থতা, স্ববিবোধ, সত্তাব গভীবে অসহ্য দ্বন্দ্বকে অতিক্রম কবে মানুষ অপবাজেয—এই প্রত্যযই ব্রেশটেব নাটকেব, যেমন বিশ্বেব সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের, স্থায়ী ফলশ্রুতি। গ্যালিলিওর মানবিক দুর্বলতাব জন্য তাঁকে মানবতাব শত্রু ভেবে ঘৃণা করি না আমবা। তাঁব ট্র্যাজিক মহিমা আমাদেব অভিভূত করে, আবার মানুষেব মহত্ত্ব ও দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন, সতর্ক কবে দেয। মাদাব কাবেজের সব দুর্বলতা আমবা ক্ষমা কবি যখন যে যুদ্ধ থেকে সে জীবিকা অর্জন কবে, সেই যুদ্ধই তাব প্রাণাধিক তিনটি সন্তানকেই কেড়ে নেয়। বোবা মেয়ে ক্যাট্রিনেব গুলিবিদ্ধ দেহ মাটিতে লুটিয়ে পডার দৃশ্যে আমাদেব সহানুভূতি বিচাব-বিশ্লেষণে সীমাবদ্ধ থাকে না, তবে আমাদেব বিচাববুদ্ধি এইসব দৃশ্যেও ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়ে পডে না। এখানেই, সম্ভবত, ব্রেশটীয় থিযেটাবেব সঙ্গে সাবেকী থিযেটাবেব মূল পার্থক্য।

ব্রেশট জানতেন মানুষেব আবেগ অন্ধ হলেও তাব অদম্য জীবনপ্রীতি ও সৃজনশীলতাব উৎস। কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল এই আবেগ প্রবণতাকে তিনি সন্দেহেব চোখে দেখলেও শ্রদ্ধা কবতেন। তিনি বিশ্বাস কবেছিলেন একমাত্র কমিউনিস্ট সমাজেই যুক্তি ও আবেগেব সমন্বয় ঘটা সম্ভব। বর্তমান সমাজে আবেগেব নৈতিমূলক প্রকাশ তাঁব নাটকে ভাবীকালেব সমাধানেব ইঙ্গিত কতটা দেয সন্দেহ। সফোক্লিস বা শেকসপীয়াবে এই উত্তবণেব কোন আভাস নেই। ব্রেশটেব নাটকে আছে কি?

———

মদ্যপানেব প্রবণতা। ব্রেশটেব সব প্রধান চবিত্রগুলিব মধ্যে আছে একটা অসংযম ও যুক্তিহীন উচ্ছৃংখলতাব প্রবণতা। তাঁব গ্যালিলিও ঔদবিক, ইন্দ্রিয়পবাযণ—তাঁব বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসাব সঙ্গে ব্রেশট তুলনা কবেছেন প্রজননবৃত্তিব যা সমান অদম্য। মাদাব কাবেজেব তিনটি সন্তানেব জন্ম তিনজন বিভিন্ন পুবুষেব ঔবসে। তাব অর্থগৃধ্নুতা তাব পুত্রকন্যাব মৃত্যুব জন্য দাযী। ব্রেশট সেকাবণেই আবেগ-অনুভূতিকে সহজাত জৈব প্রবৃত্তি বলে ভাবতেন, সন্দেহেব চোখে দেখতেন। নাটক দেখতে দেখতে থিযেটাবেব দর্শকদের মুখেব দিকে তাকিযে তাঁব গা ঘিন ঘিন কবত। আবেগে-উচ্ছ্বাসে দর্শকদেব চোখ মুখ বিকৃত হযে উঠত, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পডত, তাদেব দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত হত। প্রায দশম দশায় উত্তীর্ণ সেই দর্শক শ্রোতাদেব আচবণ ব্রেশটকে থিযেটাবের নতুন আঙ্গিক ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভাবতে বাধ্য কবেছে।

নিজেব অবচেতন সত্তাব গভীবে যে যুক্তিহীন আবেগ তাব মনকে অধিকাব কবতে চাইত, তাকে সন্দেহেব চোখে দেখতেন বলেই, তাকে নিযন্ত্রিত কবাব তাগিদে ব্রেশট যুক্তিবাদী, বুদ্ধিনির্ভব থিযেটাবেব প্রবক্তা হযে উঠেছিলেন। সমকালীন জর্মানীব জনমানসে, সমাজজীবনে, অর্থনৈতিক নৈবাজ্যে আদিম প্রবৃত্তিব যে অভ্যুত্থান তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন, জর্মানীর ব্যবসাযিক জগত, হিটলাবেব নাৎসীবাদেব জনপ্রিযতায যাব প্রতিফলন ঘটছিল, জর্মান থিযেটাবে তাবই যেন একটা সংক্ষিপ্ত বূপ ব্রেশটেব চোখে ধবা পড়ছিল। তাঁব এপিক থিযেটাব ও এলিযেনেশন তত্ত্ব, ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনেব এই আদিম মানসিকতাব বিবুদ্ধেই প্রতিবাদ। ব্রেশটেব মার্কসবাদে প্রত্যয নিজেব এবং মানুষেব আদিম প্রবণতাব নেতিমূলক প্রকাশেব বিবুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিবোধ। তাঁব কাছে এপিক থিযেটার, যুক্তিবাদ, মার্কসীয় দর্শন ছিল সমার্থক। নাৎসী অভ্যুদযেব পিছনে জর্মানিব গণমানসেব যে নৈবাশ্য ও নৈবাজ্য প্রবণতা কাজ কবেছিল তাবও উৎস যুক্তিহীন আবেগ। যেহেতু তাঁব সমযে একমাত্র জর্মান কমিউনিস্ট পার্টি'ই এই অন্ধ বর্বব ভাবাবেগেব বিবুদ্ধে সংগ্রাম করছিল, সেজন্য ব্রেশট কমিউনিস্ট আন্দোলনে সামিল হযেছিলেন।

মার্কসবাদেব ডিসিপ্লিন ব্রেশটেব মনে যুক্তি ও আবেগেব যে সমন্বয ঘটিযেছিল, তাব ফলেই তাঁব পবিণত বযসেব নাটকগুলি আমাদেব হাতে এসেছে—**Life of Galilio, Mother Courage, The Caucasian Chalk**

সত্তাকে একটা স্থিব আশ্রয় দিতে পাবে। বিশের বা তিবিশেব দশকের যেসব কবি শিল্পী নৈবাজ্যমননেব স্তর পেবিযে ক্রমশ একটা স্থির উপলব্ধিতে পেঁছিতে পেবেছেন তাঁবাই শেষ পর্যন্ত তাদেব সৃজনকর্মে ক্লান্ত বা পবাস্ত হননি। এলিযটেব এ্যাংলো-ক্যাথলিসিজম, সার্ত্রেব এগজিস্টেনসিযালিজম-হিউম্যানিজম, কামুব গ্রীক পেগানিজমেব মতই ব্রেশটেব মার্কসিজম তাঁকে মানবজীবন ও মানবভাগ্য সম্পর্কে ঘোব নৈবাশ্য ও নেতিবাদেব হাত থেকে বক্ষা কবে তাঁব সৃজনশীলতাকে অক্ষুণ্ণ বেখেছে মৃত্যুব দিন পর্যন্ত।

॥ ছয ॥

ব্রেশট তাঁব প্রথম জীবনেব একটি কবিতা 'দ্য ব্যালাড অব মাজেপ্পা'য একজন কসাক বীবেব প্রাণদণ্ড সম্পর্কে যে প্রচলিত কাহিনী ব্যবহাব কবেছেন, তার থেকেই ব্রেশটের মানুষেব জীবন সম্পর্কে বোধ ও ধাবণা প্রকাশ পায। কথিত আছে, মাজেপ্পাকে একটা পাগলা ঘোডার পিঠে বেঁধে বাশিয়াব উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ স্টেপ বা প্রান্তবেব বুকে ছেডে দেওযা হয়। মৃত্যুব আগে মাজেপ্পাব চোখেব সামনে ছিল ঘূর্ণযমান আকাশ, তাব সূর্য-চন্দ্র-তাবা আব চাবপাশেব প্রাকৃতিক দৃশ্য। ব্রেশটেব কাছে মানুষেব ভাগ্যেব প্রতীক হল পাগলা ঘোডাব পিঠে বাঁধা মাজেপ্পা। আদিম, দুর্বাব প্রবৃত্তি ও প্রাকৃতিক শক্তিব সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা মানুষ অসহাযভাবে মৃত্যুর দিকে এগিযে চলেছে। নদীব প্রবল স্রোতে ভেসে-যাওযা গলিত শব বা জডপদার্থ—যা বাঁবোব 'মাতাল তবণী'ব কথা মনে পডিয়ে দেয়—এমনই আবেকটি ইমেজ যা ব্রেশটেব প্রথম জীবনেব কবিতায বাববাব ফিবে আসে। নিজেব জীবন ও মানুষেব জীবন সম্পর্কে এই অসহাযত্বেব অনুভূতি, অবচেতন স্তরে এই গভীব হতাশা, বিষণ্ণতা, অর্থহীনতা, শূন্যতা বোধ,—একে নিয়ন্ত্রিত কবতে না পাবলে, ব্রেশট জানতেন, তাঁব সচেতন বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন কবে ফেলবে, তাঁব সৃজন প্রযাসকে ব্যর্থ কবে দেবে। অত্যন্ত আবেগপ্রবণ ছিলেন এবং সেই আবেগেব প্রভাবে জীবন ও জগত সম্পর্কে গভীব নৈবাশ্যে আক্রান্ত হতেন বলেই যুক্তিবুদ্ধিব বাঁধ বেঁধে অবচেতনেব অন্ধ প্রবর্তনাকে ঠেকাবাব প্রযোজন ছিল তাঁর পক্ষে। ব্রেশটেব অবচেতন সত্তায যে স্ববিবোধ ছিল, যুক্তি ও আবেগেব যে দ্বন্দ্ব তাঁকে ক্ষতবিক্ষত কবত, মানুষেব ব্যক্তি ও সমাজজীবন সম্পর্কে যে গভীব নৈবাশ্য তাঁব কাব্যপ্রেবণাব চালিকাশক্তি, তাব এক নেতিমূলক দিকও আছে, যা শিল্পীকে দেয় আত্মহননের পরামর্শ কিংবা অসংযত ইন্দ্রিয়সম্ভোগ বা অতিবিক্ত

অভিনয় দেখে কনট্রোল কোরাস তিন বিপ্লবী কর্মীর কাজের অনুমোদন করে। ১৯৩০ সালে লেখা এই নাটকে প্রায় এক দশক পরেকার বিখ্যাত মস্কো ট্রায়ালের পূর্বাভাস ব্রেশটের মনশ্চক্ষে কী করে ধরা দিয়েছিল ? কমিউনিস্ট বিপ্লবের ঘটনা নিয়ে একমাত্র ট্র্যাজেডি ব্রেশটের লেখা এই নাটক এখনও আমাদের মনে একই সঙ্গে জাগায় করুণা ও ত্রাস এবং সচেতন আত্মানুসন্ধান। বুখারিনের ভবিষ্যৎ তরুণ কমরেডের জীবনে কীভাবে আভাসিত করলেন ব্রেশট এটাই বিস্ময়কর। তবে ব্রেশট আগাগোড়া নির্লিপ্ত নিরপেক্ষ থেকে এই ট্রাজিক ঘটনার অনিবার্যতাকে তুলে ধরেছেন : **you cannot make an omelet without breaking the egg.**

বলা বাহুল্য, **Die Massnahme** কমিউনিস্ট সমালোচকদের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েছিল। এ ঘটনা কমিউনিস্ট পার্টিতে ঘটে না, স্বাভাবিক মানববৃত্তিকে অগ্রাহ্য করে কমিউনিস্ট বিপ্লবের আদর্শ গড়ে ওঠেনি, ইত্যাদি ইত্যাদি। ব্রেশট কিন্তু তাঁর শিল্পীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বিপ্লবী আদর্শ ও কর্মপন্থার অমোঘ অনিবার্য কার্যকারণ সম্পর্ক সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছেন, যেমন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' উপন্যাসে। তবে ব্রেশটের নাটকে রবীন্দ্রনাথের কাহিনীর মতন ভাবপ্রবণতা বা সেণ্টিমেণ্টালিটির কোন স্থান নেই। এখানে আমরা পাই প্রকৃত ট্রাজিক পরিণতির অমোঘ কার্যকারণ আর নাট্যকারের নির্মোহ, নির্মম সত্যদৃষ্টি। পার্টির ডিসিপ্লিনকে ব্রেশট এক অমোঘ জীবনসত্য বলেই গ্রহণ করেছিলেন। তার ভালমন্দ দুইই তিনি নির্মম নিরাসক্ত চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন। ব্রেশটের কমিউনিস্ট মতাদর্শে বিশ্বাস বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনের পক্ষে কতখানি জরুরি ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। সে আন্দোলনেরই তো সব গুরুত্ব এখন প্রায় শেষ হয়ে গেছে। কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্ট ঠাণ্ডা লড়াইয়ের যুগে ব্রেশটের মতন প্রতিভাধর লেখককে মার্কসবাদের সপক্ষে পেয়ে কমিউনিজমের জয়যাত্রা কতটা বেগবান হয়েছিল বলা যায় না। কিন্তু একটা কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, যে মার্কসবাদে বিশ্বাস, ব্রেশটের সৃজনী প্রতিভার সহায়ক শক্তিরূপে কাজ করেছে। যে সামাজিক অস্থিরতা নৈরাজ্যবোধ এবং নিজের অন্তরে যে অনুভূতি ও যুক্তিবুদ্ধির দ্বন্দ্বে ব্রেশট সর্বদা ক্ষতবিক্ষত হতেন, তার হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাঁর পক্ষে প্রয়োজন ছিল এমন কোন প্রত্যয় ও আদর্শ যা সমকালীন সমস্ত জীবনদ্বন্দ্ব অনিশ্চয়তা নৈরাশ্যবোধ থেকে তার শিল্পী-

আবেগ অনুভূতির আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে। **Instinct** বা সহজাত অনুভূতির চেয়ে রিজন বা ডিসিপ্লিন অনেক বেশি মূল্যবান। কিন্তু ব্রেশটের এই সচেতন সিদ্ধান্ত তাঁর নাটকের পরিণতিতে দর্শকের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করে না। আবেগ অনুভূতির সঙ্গে যুক্তিবুদ্ধির সংঘাতে শেষ পর্যন্ত একটা ট্র্যাজিক উপলব্ধি পাঠক বা দর্শকের মনে ছড়িয়ে পড়ে। এ কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ আছে ব্রেশটের শিক্ষামূলক নাটক 'ডি মাসনাহ্মে বা দি মেজারে'। কোরাস ও চারজন সোলোয়িস্ট বা একক গায়ক (একটি নারী ও তিনজন পুরুষকে) নিয়ে রচিত এই গীতিনাট্য বা ক্যানটাটার বিষয় হল পার্টির বিপ্লবী কার্যক্রম পরিচালনায় শৃঙ্খলা ও ব্যক্তিগত মূল্যবোধের দ্বন্দ্ব। এ নাটকের কোরাস হল কমিউনিস্ট পার্টির বিবেক, সেইজন্য তাকে বলা হচ্ছে 'কনট্রোল কোরাস'। চারজন একক গায়ক পার্টির চার বিপ্লবী কর্মী যারা চীনের অভ্যন্তরে বে-আইনী বিপ্লবী—কার্যক্রমের দায়িত্ব নিয়ে গিয়েছিল। অভিযান শেষে দেশে ফিরে এসেছে তিনজন বিপ্লবী। একজনকে খতম করার প্রতিবেদন তারা পেশ করছে। একে একে তারা প্রত্যেকে নিহত কমরেডের আচরণ ও কী কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল, অভিনয় করে কোরাস অর্থাৎ পার্টির বিবেকের কাছে জানাচ্ছে। প্রথমে এই চারজন বিপ্লবী কর্মী মুখোশ পরে চীনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে (সময়টা বিশের দশকের শেষ দিক)। অর্থাৎ পার্টির বিপ্লবী কাজে অংশ নিতে হলে প্রত্যেক কর্মীকেই তার ব্যক্তিসত্তা, আবেগ অনুভূতিকে বিলুপ্ত করে দিতে হয়। নিহত কমরেড তার মানবিক দুর্বলতার জন্য পার্টির বিপ্লবী পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করেছে—এই হোল তার অপরাধ। শোষিত নির্যাতীত চীনা কুলিদের দুঃখকষ্ট সহ্য করতে না পেরে সে তাদের দুঃখ লাঘবের চেষ্টা করায় তাদের বিদ্রোহী মনোভাবের তীব্রতা হ্রাস পেয়েছে, বিপ্লব বিলম্বিত হয়েছে। এইরকম আরও অনেক পেটি বুর্জোয়া শোধনবাদী দুর্বলতার পরিচয় দেবার আগে সে অবশ্য তার ছদ্মবেশ ত্যাগ করে মানবিক স্বরূপ প্রকাশ করেছে এবং বিপ্লবী প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। বাকি তিনজন তার মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে এবং সেই বিপ্লবী আদর্শচ্যুত কমরেড নিজের দোষ স্বীকার করে শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছে। তাঁর তিনজন সাথী তার মৃতদেহ চূণের খনিতে নিক্ষেপ করেছে যাতে তার দেহাবশেষের সব চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে যায়। স্বদেশে ফেরার পর এই ঘটনার

জোবেই। তিনি জানতেন তাঁব প্রশ্নকর্তাবা কেউ জার্মান জানে না, জার্মান ভাষায তাঁব কোন লেখা তাবা পড়েনি। তাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নেব উত্তবে তিনি জানালেন, ইংবেজি অনুবাদে তাঁব নাটকের বা কবিতাব বক্তব্য বিকৃত হযেছে। মার্কিন সমাজেব বিরুদ্ধে কোন কথা তিনি কখনও লেখেননি। তিনি কমিউনিস্ট কিনা জিজ্ঞাসা কবলে তাঁর উত্তব—না, না, না, না, না, না—হুবাব না। এক্ষেত্রে, তিনি তাঁর সৃষ্ট গ্যালিলিও বা সোযাইকেব আচবণই অনুকবণ কবেছেন। অযথা সাহস বা বীরত্ব দেখিয়ে শহীদ হবার প্রবণতা বা ইচ্ছা ব্রেশটেব কখনও ছিল না। ব্রেশটেব একটা গল্পে আছে, একবার একজন যোদ্ধা এক হতভাগ্য গৃহস্থকে বলপূর্বক নিজেব সেবায় নিযুক্ত কবে। গৃহস্থ হাসিমুখে তাব সব হুকুম তামিল করতে থাকে। সে তার যোদ্ধা মনিবকে কোন কাজই কবতে দেয না। ফলে অলস লোকটি ভালো খাওযা-দাওযা কবে খুব মোটা হযে যায এবং শীঘ্রই মারা যায়। গৃহস্থ তখন যোদ্ধাব মৃতদেহ টেনে বাইবে ফেলে দিযে আসে। তাবপব আকাশেব দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে একবাব মাত্র বলে—'না'। অর্থাৎ ব্রেশটেব মতে 'হাঁ' বা 'না' বলাব একটা নির্দিষ্ট সময আছে। ব্রেশট সাবাজীবন তাই কবেছেন। তাঁব গ্যালিলিও, তাঁব মাদাব কাবেজ—সবাই। তাই ব্রেশটেব নাটকেব চবিত্রদেব আচবণ বুঝতে হলে বা ঘটনাব মূল্যাযন কবতে হলে যে **ironic detachment** দরকাব তাবই নতুন নাম এলিযেনেশন।

॥ পাঁচ ॥

১৯২৮ সাল নাগাদ ব্রেশট 'ডাস ক্যাপিটাল' পড়তে আরম্ভ কবেন। জার্মন কমিউনিস্ট পার্টি পবিচালিত মার্কসবাদের ক্লাসেও যোগ দেন। তিনি কোন কমিউনিস্ট পার্টিব সদস্য হযেছিলেন কিনা কোন নিশ্চিত তথ্য থেকে জানা যায না। তবে নিজেব মতন করে কমিউনিস্ট মতাদর্শ গ্রহণ কবেছিলেন সে বিষযে কোন সন্দেহ নেই। এই সমযে তিনি তাঁর শিক্ষামূলক নাটকগুলি লেখেন। এই লেখাগুলি তাঁব নতুন মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হলেও বাজনৈতিক প্রচাব তাদেব উদ্দেশ্য ছিল না। মোটামুটি ভাবে বলা যায যে কমিউনিস্ট মতাদর্শে অনুপ্রাণিত এই সমযেব নাটকগুলির বিষয হোল সহজাত আবেগ ও যুক্তিবুদ্ধিব বিরোধ। ব্যক্তিব নিজস্ব নীতিবোধ, দয়ামায়া ইত্যাদি অনুভূতিব সঙ্গে পার্টির শৃংখলা লক্ষ্য ও আদর্শেব বিরোধ। সবক্ষেত্রেই ব্রেশট এই বিরোধেব নিষ্পত্তি দেখিয়েছেন শৃংখলাবোধ এবং যুক্তির কাছে

superfluous men, outsiders । গ্যয়টের হেবর্টর থেকে কাফকার হতভাগ্য নায়ক পর্যন্ত সকলেই বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ। এই পরিস্থিতিতে কবি শিল্পীকে বিশ্লেষণ করতে হয শিল্প সৃষ্টিব প্রকরণকলাকে যাতে শিল্পের সঙ্গে সাধাবণ জীবনযাত্রার ব্যবধান বুঝতে পাবা যায়। কবিতা বা শিল্পেব ইলিউশন ভেঙে দিলেই তবে শিল্পী বা কবি সমাজেব সঙ্গে যথার্থ বোঝাপড়ায় আসতে পাববেন। ব্রেশটেব থিয়েটাব তাই দর্শকেব চোখেব সামনেই নাটকেব অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ভেঙেচুরে দেখায়। সমকালীন নৈবাজ্য বিশৃঙ্খলা বিভীষিকার উত্তবণ ব্রেশট খুঁজেছেন একদিকে আবেগমুক্ত নির্মোহ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্যে অন্যদিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ, তামাশায, হৈ-হুল্লোড়ে। সার্কাস-এবিনা কিংবা মেলাব পবিবেশ সৃষ্টি কবেছেন তাঁব নাটকে। ঠক, ভণ্ড, ভিখাবি-ব্যবসায়ী, খুনে-ডাকাত, বেশ্যার দল ভিড় জমায় তাঁর মঞ্চে—সেই সঙ্গে এদেরই সগোত্র সমাজেব আইন-শৃঙ্খলার রক্ষক, বিচারক, প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী ধনী। এই হল ব্রেশটেব দৃষ্টিতে বিশের দশকের ধনতান্ত্রিক সমাজ। এই সমাজের চিত্র তুলে ধবাব সময় ব্রেশট গুরুগম্ভীর নীতিবাগীশ তত্ত্ব প্রচাব করেননি। নিবানন্দ পিউবিটান পরিবেশ তাঁব নাটকে কল্পনা করা যায না, সে তিনি যত বড় অপবাধীকেই মঞ্চে উপস্থিত কবুন না কেন। চ্যাপলিনেব মঁসিয়ে ভার্দুর মতই তাঁব ভিলেনরা আমাদেব সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয না। এব তাৎপর্য হোল, ভিলেনি বা শয়তানি আমাদেব প্রত্যেকেরই স্বভাবের অঙ্গ, ব্রেশটেবও। সর্বকালেব সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীদেব অন্যতম হেলেনি ভিগেল (**Helene Veigel**) দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে তাঁব ঘব করেছেন, একনিষ্ঠ পত্নীরূপে। কিন্তু ব্রেশট নিজে ছিলেন বহুকামী। শেষ জীবনে পূর্ব বার্লিনে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও ব্রেশট তাঁর ব্রিফকেসে সযত্নে রেখে দিয়ে ছিলেন অস্ট্রিযাব নাগবিকের পাসপোর্ট, পশ্চিমী দুনিযার সঙ্গে তাঁর ব্রিজহেড, সেতুবন্ধ। ব্রিজ পুড়িয়ে দেননি তিনি। তাঁর সমগ্র রচনার গ্রন্থস্বত্ব ন্যস্ত কবেছিলেন পশ্চিম জার্মানিব প্রকাশক, **Suhrkamph Verlag, Frankfurt-on-main**-এর হাতে।

জার্মানিব ব্ল্যাক ফরেস্ট অঞ্চলেব কৃষক পরিবারের ছেলে ব্রেশটের সহজাত ধূর্তবুদ্ধি তাঁকে জীবনের অনেক সংকট ও বিপদ থেকে বাঁচিয়েছে। **Committee on un-American Activities**-এর সামনে জবানবন্দি দিতে গিয়ে ব্রেশট তাঁব বিচাবকদের বোকা বানিয়েছিলেন, এই সহজাত বুদ্ধির

কবেন। প্রথম বিশবযুদ্ধ শেষ হবাব মুখে ব্রেশট ডাক্তারি পডতে পড়তে সামবিক হাসপাতালে আহত সৈনিকদেব অপাবেশন রুমে ভযাবহ অভিজ্ঞতা অর্জন কবেছিলেন। 'ঐ পাটা কেটে ফেল', 'ঐ হাতখানা', 'ওই লোকটার খুলিটা খুলে বুলেটেব অংশ বেব ক'ব',—সার্জনেব এইসব নির্দেশ পালন কবতে কবতে মানুষের জগত ও পবিস্থিতি সম্পর্কে যে নতুন বোধ তিনি লাভ কবেন তার প্রতিফলন ঘটেছে ব্রেশটের প্রথম নাটকগুলিতে। তাঁব প্রথম ব্রেশটীয কবিতা 'মৃত সৈনিকের উপকথায্' যুদ্ধে সৈন্যাভাব ঘটায় কবর থেকে একজন মৃত সৈনিককে তুলে এনে আবাব যুদ্ধ কবতে পাঠানোর যে সুব-বিযেলিস্ত পবিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, পববর্তীকালে নাৎসীবা তাকে ব্রেশটের স্বদেশ ও স্বজাতিব প্রতি অমর্যাদাব নিদর্শন রূপে তুলে ধরেছিল। এই সময় থেকে সব বকম ফাঁকা বীবত্ব সাহসিকতা ও আত্মত্যাগেব মিথ্যা আদর্শকে বিদ্রূপ কবা সুরু কবেছেন ব্রেশট। তাঁর এপিক ও এলিয়েনেশনের ভঙ্গিরও জন্ম এইসব অভিজ্ঞতা ও তার শিল্পরূপায়নেব সমস্যার মধ্যেই। 'দ্য ড্রাম্স ইন্ দ্য নাইট' নাটকে যুদ্ধ ফেবৎ সৈনিক ক্রাগলাব যুদ্ধ শেষে ঘবে ফিরে দেখে তাব স্ত্রী অন্যের দ্বাবা গর্ভবতী। ঠিক সেই সময়ে ব্যাভেরিয়ার কমিউনিস্ট 'স্পার্টাকাস' বিপ্লবের দামামা বেজে উঠেছে। ক্রাগলার বিপ্লবে যোগ দেয় না, তার স্ত্রী বা তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসাব কথাও ভাবে না। এসব সাবেকী বীবত্বব্যঞ্জক আচবণ এযুগে অচল। ইন্দ্রিয়পরায়ণ সিনিক ক্রাগলাব তার অসতী স্ত্রীব সহবাসমুখে গা ভাসিয়ে দেয। বিপ্লব কিংবা শূন্যগর্ভ বীবত্বের প্রতি কোন আকর্ষণ সে অনুভব করে না।

বলা নিষ্প্রয়োজন বিশের দশকের এইসব রচনায় মানুষের জীবন ও জগতেব যে চিত্র ব্রেশট তুলে ধবেছেন, তাব সঙ্গে পশ্চিম ইওরোপের সবচেয়ে অগ্রগামী শিল্প-সাহিত্যের ভাবের পরিমণ্ডলেব কোন পার্থক্য নেই। সেই অবাজক, বিশৃঙ্খল, অনিশ্চিত, সন্ত্রস্ত, দুঃস্বপ্নেব দশকের প্রকৃত স্বরূপ বিধৃত হয়ে আছে সমকালীন শিল্পে, সাহিত্যে, নাটকে। ব্রেশটের জার্মানিতে এই পরিস্থিতি একটা তীব্র সংকটেব চেহাবা নিযেছিল, বিশেষত লেখক শিল্পীব জীবনে। সামবিক আদর্শে বিশ্বাসী জর্মন জাতীযতাবাদের সুদীর্ঘ ঐতিহ্যে কবি শিল্পী লেখকবা ছিল বিশেষভাবে অপাংক্তেয়, অবান্তর। যাদেব কাববার শুধু মানুষেব সূক্ষ্ম আবেগ অনুভূতি নিয়ে সমাজে তাদের প্রযোজন অস্বীকৃত। উনিশ শতকের রুশ বুদ্ধিজীবীদেব মতই তারা ছিল,

ছাপ পড়ছিল না। বের্টোল্ট ব্রেশট তাঁর নাটকে তাই নিয়ে আসছিলেন এমন সব কাহিনী, এমন সব চবিত্র যা নাটকেব প্রচলিত কাঠামোব মধ্যে কিছুতেই সম্ভব হোত না। 'বাল্', 'দ্য ড্রাম্স ইন দ্য নাইট', 'ইন দ্য জাংগলস অব দ্য সিটি'—প্রথম দিকের এই সব নাটকেব বক্তব্য বা থীম নাটকেব ঘটনাসংস্থানে ও চবিত্র পবিকল্পনায প্রচলিত নাট্যধাবাব বিপবীতে ব্রেশটকে চালিত কবেছে। এলিয়টেব **The Waste Land**, জয়েসের **Ulysses** যেভাবে যথাক্রমে প্রচলিত কবিতাব বা উপন্যাসেব ফ্রেম ভেঙেছে, ব্রেশটের নাটক বা থিয়েটারও তাই কবেছে। এই অর্থে ব্রেশটের নাট্যবীতি, আধুনিক কাব্যবীতি বা আধুনিক চিত্রকলার নব রূপান্তবের সঙ্গেই তুলনীয়। সমালোচকেবা বিশ্লেষণ কবে দেখিয়েছেন যে বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকে সাহিত্যে শিল্পে যে আধুনিকতাব জন্ম তা এক অর্থে সম্পূর্ণ ঐতিহ্যবিবোধী এবং যথার্থই অভিনব। সুতরাং ব্রেশটীয থিযেটারেব সঙ্গে ট্রাডিশনাল থিয়েটাবেব যে মিলেব কথা এতক্ষণ বলা হলো, ব্রেশট সম্পর্কে সেটাই চূড়ান্ত নয। এলিয়ট বিলকেব কবিতা, জয়েস কাফকাব উপন্যাস সম্পর্কেও এই একই কথা বলা চলে। এই সব কবি শিল্পী ঔপন্যাসিক নাট্যকাব তাঁদের শিল্প মাধ্যমে কতকগুলি নতুন আঙ্গিকেরই প্রবর্তন করেননি। জীবনে শিল্পেব প্রয়োজন বা ফাংশন সম্পর্কেই তাঁদের ধাবণার আমূল পবিবর্তন ঘটেছিল এবং সেই কাবণেই তাদের অভিনবত্ব।

শিল্পীব সঙ্গে সমাজের ও সাধাবণ জীবনযাত্রাব সম্পর্কে যে আমূল পরিবর্তন ঘটেছে, তাব আলোকেই সাহিত্যে শিল্পে আধুনিকত্বের বিচাব ও সংজ্ঞানির্ণয় করতে হবে। ব্রেশটীয় থিয়েটারের বিষয়, ভঙ্গি ও উদ্দেশ্যেব বিচাবও করতে হবে আধুনিকত্বেব এই নিবিখে। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ব্রেশটেব জীবনে তাব মানস গঠনেব সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কালটির দিকে তাকানো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন সুরু হয়, ব্রেশট তখন স্কুলেব ছাত্র। স্কুলেব ম্যাগাজিনে যুদ্ধেব বিরুদ্ধে তাঁব একটি কবিতা প্রকাশিত হয। এজন্য স্কুল থেকে বিতাড়িত হতে যাচ্ছিলেন তিনি। তরুণ বালক আসন্ন যুদ্ধেব বিভীষিকাব কল্পনায হতবুদ্ধি হয়ে এই কবিতা লিখেছে বলে কর্তৃপক্ষ ব্রেশটের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কবেনি। পববর্তীকালে ব্রেশট আক্ষেপ কবে বলেছিলেন তাঁব শিক্ষকদেব শিক্ষিত কবার এই প্রথম প্রয়াস ব্যর্থ হওযায তিনি নাটকেব মাধ্যমে দেশ ও জাতিকে শিক্ষা দেওয়াব ব্রত গ্রহণ

করছে, এই তো অধিকাংশ সমাজবাস্তব নিয়ে রচিত নাটকের উপস্থাপন রীতি।

ব্রেশটের এপিক রীতি এই নাটকের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ জেহাদ। ইবসেনীয় নাট্যধারার বিরুদ্ধে ব্রেশট প্রথম কিংবা একমাত্র প্রতিবাদ নন। বাস্তব সমাজ-জীবন, দৈনন্দিন চেনাশোনা মানুষ, তাদের সাধারণ কার্যকলাপ, সাধারণ গদ্যভাষায় তাদের সংলাপ—মানুষের অন্তরের গভীর সত্য, তার অনুভূতি-উপলব্ধির গভীরতর স্তরকে প্রতিফলিত করতে পারে না—একথা বলছিলেন যাঁরা কাব্যনাট্যের পুনরুজ্জীবন চাইছিলেন তাঁরা। বাস্তববাদী গদ্যনাট্যের প্রধান প্রবক্তা ইবসেন ক্রমশ তাঁর কাহিনীর ছকে, চরিত্রের কল্পনায় বা গদ্য-সংলাপের ব্যবহারে প্রতীকের আমদানি করছিলেন। দ্য ডল্‌স হাউস ও অ্যান এনিমি অব দ্য পিপলের লেখক অসাধারণ কাব্যময় প্রতীকী নাটক রসমারসহোম ও দ্য মাস্টার বিল্ডার লিখেছিলেন শেষ জীবনে। গদ্যসংলাপের অসম্পূর্ণতা, সাধারণ দৈনন্দিন ঘটনার তুচ্ছতার মধ্যে মানুষের জীবনের গভীর সত্য ও তাৎপর্য ধরা পড়ে না। ব্রেশট তার নাট্যকাহিনীর উপস্থাপনে যে প্যারেবল-ফেবলের ছক ও ভঙ্গি গ্রহণ করেছেন তাতে গতানুগতিক বাস্তব-জীবনের সংকীর্ণ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে আসারই প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। এই প্রয়াসের পিছনে ব্রেশটের উদ্দেশ্য ছিল, জটিল বৃহত্তর সমাজসত্যকে নাটকে উপস্থিত করা যা ঘরোয়া মানুষের সাধারণ দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে ধরা পড়ে না। প্রচলিত নাট্যধারার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ব্রেশট জীবন্ত থিয়েটারের উৎস খুঁজছিলেন প্রাচীন ও মধ্যযুগীয়, দেশবিদেশের বিভিন্ন নাট্য-প্রকরণে। আর সে নাটকের উদ্দেশ্য ছিল, লোকশিক্ষা, দর্শকের বোধ ও চেতনার উদ্দীপন।

॥ চার ॥

বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতম কবিতা যেমন ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতির সংকীর্ণ বৃত্ত থেকে বেরিয়ে নাগরিক জীবনের নৈরাশ্য, ব্যর্থতাবোধ নিঃসঙ্গতার একটা সাধারণ চিত্র তুলে ধরতে চাইছিল, ব্রেশট ও অন্যান্য প্রাগ্রসর নাট্য-কারেরাও তেমনি নতুন নাটকের বিষয় খুঁজেছিলেন সমকালের সর্বজনগ্রাহ্য সাধারণ অভিজ্ঞতার মধ্যে। অ্যারিস্টটেলীয় নাটকের প্লটের কৃত্রিম কঠোর নিয়মানুগ কাঠামোর মধ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর পশ্চিমী সমাজের নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, সার্বিক নীতিহীনতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয়কে ধরার চেষ্টা বৃথা। প্রথাসিদ্ধ নাটকের কাহিনীতে সমাজ ও সভ্যতার এই ধ্বংস ও অবক্ষয়ের কোন

—তা হলে আমার গচ্ছিত মাল, যা আপনার কাছে জমা আছে তা ইচ্ছে করলে আমার অসাক্ষাতে আপনি অন্য কাউকে আবার বেচে দেবেন না তার কোনো প্রমাণ রাখতে পারেন, মিস্টার সিকান্দার ?

—না, তা অবশ্য পারি না।

—তা হলে আমার মালের দেখ্‌ভাল করার জন্যে আমার নিজস্ব পুলিশ তদারক করবে তাতে আপনার আপত্তি থাকার কারণ দেখি না। তবে আপনার দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ওর যাবতীয় খরচ পত্র আমার অফিস থেকেই যাবে। আপনি ওর থাকার বন্দোবস্ত করে দেবেন। মানে আপনার খুব কাছাকাছি। দরকার হলে থাকার জন্যে ভাড়াও দেয়া হবে।

—না না, তার দরকার হবে না।

—আচ্ছা সে সব পরে দেখা যাবে। আপাতত আন্তোনিও আপনার বন্ধু। মনে রাখবেন, আন্তোনিও একজন উচ্চশিক্ষিত আধুনিক মানুষ। দুনিয়ার খোঁজ খবর রাখে, জানে। তাছাড়া একজন অতি দক্ষ নিরাপত্তা কর্মী। আপনার কাছে এমন একজন মানুষ থাকলে লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। একই সঙ্গে একথাও জানিয়ে দিই। ও আপনার শুধু বন্ধু নয়, পরামর্শদাতাও হতে পারে, গাইড হতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা আপনার সেবক—চাকর ! যে কোনো ছোট কাজও ওকে দিয়ে নির্দ্বিধায় করিয়ে নিতে পারেন। ওরা সে ভাবেই অভ্যস্ত। ছোট বড় যে কোনো কাজে ওকে ছায়ার মতো আপনার পাশে রাখবেন।

—আচ্ছা, বেশ তাই হবে।

—তাহলে আপনি পরশু বা তারপর দিন আসছেন ?

—অবশ্যই।

—আমি আপনার আত্মার দিকে আমার চোখ তাক করে আছি—মিস্টার সিকান্দার। আমি আপনার আত্মা কিনে নিতে চাই।

চার

এমন ঝকঝকে গাড়িতে কোনোদিন উঠেছি ? মনে পড়ছে না। মনে পড়বে কি ভাবে, ঘটনা না ঘটলে তো মনে পড়ার প্রশ্ন ওঠে না। না, সত্যিই এমন

গাডিতে কোনোদিন চডিনি। সারা জীবনে ক'দিন আর গাড়ি চড়ার সুযোগ পেলাম। এর সাথে তার সাথে এক আধ দিন। তাও এমন ঘেঁসে এতোটা পাশে যে চডার চেযে না চডাই ভালো ছিল। এখন কেমন একটা সুখের অনুভূতি আসছে। ভিড নেই, গাদাগাদি নেই, ঠেলাঠেলি নেই। গাডিটা চালাচ্ছেও ভালো। আন্তোনিও পাকা ড্রাইভার। শাইলক তো বলেই দিযেছে লোকটা উচ্চ শিক্ষিত, দক্ষ, সব কাজে ওস্তাদ। তা এমন একজন লোক এ্যাসিস-টেণ্ট হিসেবে পাশে থাকলে মন্দ কি। মাঝে মধ্যে দরকারে বেদরকারে লাগতে পারে। যেমন, ইংরেজিতে ড্রাফট করা। কোনো চিঠি পত্র কিংবা দরখাস্ত এসব ইংরেজিতে করার দরকার পড়লেই হ্যে গেল! এক পাতা লিখতে এক ঘণ্টা লাগবে। তাও বার বার কাটো বার বার ছেঁডো, অবশেষে যাও বা একখানা মাল দাঁড করালাম তা মনের মত হল না। আসলে ইংরেজির চর্চা নেই তো হবে কি ভাবে? এদিকে বলছে ইংরেজি হঠাও, ওদিকে ইংরেজি না জানলে এক পাও এগোনো যাবে না। মানুষ, সাধারণ মানুষ কি ভাবে বেঁচে থাকবে, ছেলে পিলে গুলো কি ভাবে চাকরি পাবে? আমার তো চাকরি না হওয়ার মূলে মনে হয় ইংরেজিটা ভালো ভাবে না জানা। এটাই একমাত্র কারণ। অবশ্যি চাকরি থাকলে তো পাওয়ার প্রশ্ন। চাকরি কোথায? সব ইংরেজি জানা ছেলেমেযে চাকরি পাচ্ছে? না, তবে না জানার চেযে জানা ভালো এটা মানতেই হবে! যাক, একজন ইংরেজি জানা ভালো এ্যাসিস্টেণ্ট পাওয়া গেছে। ওসব নিয়ে আর চিন্তা করতে হবে না।

—কোন্ দিকে যাবো? ডানে না বাঁযে?

গড়িযাহাট চৌরাস্তার মোডে এসে আন্তোনিও জিগ্যেস করল। 'সোজা' বলেই সিকান্দার আবার বলে—দাঁড়ান! গাডি সাইড করুন। কিছু জিনিস কিনবো। গাড়ি পার্কিং জোনে দাঁড় করিয়ে আন্তোনিও পেছনে ফিরে বলল —আমি গাডিতে বসি? সিকান্দর দরোজা খুলে নামতে নামতে জবাব দেয— না, আপনিও আসুন, একটু দেখে দেবেন। আন্তোনিও গাড়িতে চাবি লাগিযে ওর পেছন পেছন এগিযে গেল।

কোন্ দোকানে যাবে? আগে কিছু জামা কাপড় কেনা দরকার। ছেলে মেয়ে গুলোর কাপড় জামা কিছু নেই। ছেঁড়া নোংরা কাপড পরে স্কুলে যেতে চায না। ওদের তো নেই কিন্তু আর কারই বা আছে? মার শাড়ি ছেঁডা, আব্বার লুঙ্গি পানজাবি ন্যাকড়ার মতো হয়ে গেছে, সুরাইয়া কিছু বলে না

বটে কিন্তু ওর দিকে ভালো করে তাকানো যায় না। যুবতী মেয়ে, শরীর ঢাকতে হিমশিম খেয়ে যায়। বাড়ির মধ্যে এক আমার কাপড় চোপড় যাহোক একটু বাইরে বেরুবার মতো আছে। এটুকু না থাকলে আর সত্যিই বেরুনো যেতোনা। তবে এই একটাই। বছর খানেক ধরে এই এক প্যান্ট এক জামা। ভাগ্যিস তবু তো ছিল। যাক্ পেছনের ভাবনা আর ভেবে লাভ নেই। এক্ষুণি সব ব্যবস্থা করছি। বাচ্চাদের জামাকাপড় ঝুলতে দেখে সেই দোকানে ঢুকল ওরা। দুই ছেলে এক মেয়ের জন্যে মোটামুটি জনা কুড়ি বাচ্চার মতো কাপড় চোপড় কিনে তবে বের হয়। হোক, বেশি হয় হোক, নিজেরা না পরতে পারলে অন্য কাউকে দেবে। তবু মন ভরে নাড়াচাড়া করুক। বাচ্চা কাচ্চা, কোনোদিন কিছুই সেভাবে দেয়া যায় নি। এখন পয়সা আছে, দেবো না কেন? এবার কোথায়? শাড়ির দোকানে। শাড়ির দোকানের অভাব নেই। বড় একটা দোকানে ঢুকে আগে মায়ের জন্যে খান পাঁচেক কেনা হল। এবার সুবাইয়ার। প্রথমে ভেবেছিল, খান পাঁচেক ঘরে পরার আর খান পাঁচেক একটু বেশি দামের কিনবে। এই হাজার খানেক করে এক একটা। বাইরে যাওয়ার মতো শাড়ি কাপড় নেই বেচারির। কাপড়ের অভাবে বাপের বাড়ি পর্যন্ত যেতে চায় না। প্রথমে যেটা পছন্দ সেটার দাম পাঁচ হাজার পাঁচশ। এটাই সবচেয়ে কম দামের। বাকি চারখানা মিলিয়ে সুবাইয়ার বাইরে পরার শাড়ির দামই শুধু সাঁইত্রিশ হাজার পাঁচশ। তা হোক, কোটিপতির বউ বলে কথা। এবার একটা টি ভি। একটু হেঁটে টিভির দোকানে ঢুকে তো চক্ষু চড়ক গাছ। এতো সব সৌখিন জিনিস মানুষ ব্যবহার করে? সুতরাং শুধু রঙিন টিভিতে হল না, থ্রি-ইন-ওয়ান, ওয়াকম্যান, একটা ক্যামেরা একটা ভি-সি-আর এবং আরো খুচরো টুকিটাকি। এবার কোথায়? নিজের জন্যে তো কিছু কাপড় দরকার। রেডিমেড প্যান্ট শার্টের দোকানে ঢুকে প্রথমে ভেবেছিল, মোটামুটি মাঝারি দামের মধ্যেই কিনবে। কিন্তু এমন চোখ, যেটা চোখে ধরে সেটার দাম শুনেই ছিটকে পড়ার মতো অবস্থা। অবশ্যি পকেট এখন এতোটা উঁচু যে ছিটকে পড়তে গিয়ে পকেটে হাত পড়ে আর সঙ্গে সঙ্গে নিজের গলা দিয়ে নিজের অজান্তেই আওয়াজ ওঠে—বেশ তো, প্যাকেট করুন। পুরুষদের জামা কাপড়ের দাম যে এতোটা বেড়েছে জানা ছিল না। দোকানের বিল কতো হল, সেসব বাহুল্যে না গিয়ে শুধু প্যান্ট আটকাবার বেল্ট এর দামটা শুনিয়ে দিলেই একটা ধারনা পাওয়া যাবে—আঠোরো শ! হ্যাঁ, মাত্র

একটা বেল্টেব দাম.! তো নসীব সিকান্দাবেব নসীব মানে কপাল তখন সিকান্দার মানে সম্রাট আলেকজান্ডাবেব মতোই উঁচু। সুতবাং এখন উঁচ-কপালে সিকান্দার একটু উঁচুতে খেলবে সে আব বিচিত্র কি ? হ্যাঁ, এবাব একটু গযনাগাটি ? নিশ্চয! দুটো মেযে আছে, বড়ো হচ্ছে, গয়না-গাটি থাকলে দোষেব কিছুই নেই। বরং পরে কাজে লাগবে। আর মেযেব যখন হচ্ছেই সেই সাথে মেযেব মাযেব দু একখানা হবে না, তাই কি হয ? সুতরাং ঘণ্টা খানেক দোকান বাজাব করতেই মোটামুটি আডাই লাখেব মতো বেরিয়ে গেছে। তাও অনেকটা হাত চেপে! এখনো কিছু কিনতে গেলেই মনে হয়, না থাক, পবে দেখা যাবে। একটা হাত চাপা ভাব বয়েই গেছে। দুচার দিন আরো লাগবে, তাবপব হাত ঠিকই খুলে যাবে। টাকাব বাণ্ডিল পকেটে থাকলে হাত খুলতে কতোক্ষণ ?

নসীব সিকান্দার মালামাল গুলো গাডিতে ঠেসে ঢুকিয়ে নিজে গ্যাট হযে বসতে না বসতে জানলা দিয়ে আন্তোনিও মোলাযেম কণ্ঠে বলল—স্যার, কাপড প্যাল্টে নিতে পাবেন। আমি বাইবে আছি।

'স্যাব' ? নয় কেন ? আমি তো ওব বস্। লোকটা যতোই উচ্চ শিক্ষিত হোক যতোই দুনিযাদাবির খোঁজ খবব বাখুক আসলে তো আমাব এ্যাসিস-টেণ্ট মানে, চাকব। স্যাব তো বলতেই পাবে। বলা উচিত। অবশ্যই। নিজেব সম্পর্কে বেশ একটা মনোবম ধাবনা তৈবি হচ্ছে। হ্যাঁ, একটু ধীব গতিতে। তা হোক, এই আত্মপ্রত্যযটা খুব দরকারি। বড় মানুষের ক্যালানে স্বভাব মানায না। তাদেব হতে হবে দৃঢ, প্রত্যাযী কর্তৃত্বব্যঞ্জক। সিকান্দাব হাতেব কাছে প্রথম যে প্যাকেটটা পায সেটা খুলেই প্যাণ্ট জামা পাল্টায। অসাধারণ! জামা প্যাণ্ট দুটোই খুব রুচিশীল হযেছে। গাঢ় রং ওব পছন্দ নয। ওসব তৃতীয শ্রেণীব রুচির প্রকাশ। ক্যাটকেটে লাল, নোংবা নীল, জঘন্য সবুজ, ইতব হলুদ—ওসব কোনো বং নয, অন্তত পুরুষেব জামা প্যাণ্টেব রং হতে পাবে না। হ্যাঁ, এই হল আসল বং, ধূসর। ধূসব বং-এর ওপব খুব সূক্ষ্ম কালো স্ট্রাইপ, চমৎকার। প্রায় একই রংযের প্যাণ্ট। লাভলি। ও দ্রুত হাতে কাপড পাল্টে গাডির আয়নায নিজেব মুখ দেখতে চায, পাবে না। আবো সবে যেতে হবে। দবকার নেই। পবে দেখা যাবে। নতুন কেনা ব্রিফকেসেব ভেতর টাকাব বাণ্ডিল এবং আগেব নোংবা নোটবুক আব টুকি-টাকি কাগজ ঢোকায। পুবনো প্যাণ্ট জামা আব চপ্পল জোডা আগেব নোংরা

ঝোলা ব্যাগে ভরে ব্যাগটা গাড়ির জানলা দিয়ে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে। পুরনো জীবন খতম। এবার সম্পূর্ণ নতুন সমৃদ্ধ, প্রত্যয়দীপ্ত এক জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

পাঁচ

মলয়ের বাড়ির গলিতে গাড়ি ঢোকে না। আন্তোনিওকে গাড়িতে রেখে ব্রিফকেসটা হাতে নিয়ে নসীব সিকান্দার বেরিয়ে এল। একটু অস্বস্তি লাগছে। নিজের পরিবর্তিত রূপে নিজেই সংকোচ বোধ করে। পায়ের দামি চপ্পল জোড়া খুব মোলায়েম সন্দেহ নেই, তবে সড়গড় হতে দু এক দিন সময় লেগে যাবে। পায়ের পাতার ওপরের দিকটায় ব্যথা লাগছে, ফোসকা পড়তে পারে। মোটকথা, নিজের পরিবর্তিত ভাগ্যের সঙ্গে মানিয়ে নিতে, অভ্যস্ত হতে একটু সময় দিতে হবে। কিন্তু সে সময় দেয়ার মতো সময় নেই। বাধ্য হয়ে জোর করেই স্বাভাবিক হতে হবে। সে দৃঢ় পায়ে কিন্তু ধীর পদক্ষেপে গলি দিয়ে এগিয়ে চলল। পাড়াটা চেনা। দু একজন ওকে দেখেছে, মুখ চেনে। প্রায় দশ বারো বছর ধরে মলয় এই বাড়িতে আছে। নানান দরকারে বেদরকারে সিকান্দারকে এখানে আসতে হয়েছে অনেকবার। যারা ওকে চেনে তারা ওর দুস্থ রূপটাই দেখেছে। এখন হঠাৎ, রাতারাতি চেহারা পাল্টানোয় তারা একটু বিস্মিত চোখে ওর দিকে তাকায়। তবে দু একজন। এই গলিতে ঠিক দুপুর বেলায় কে আর বাইরে থাকবে। লোকেদের বিস্মিত দৃষ্টিকে আমল না দিয়ে ও মলয়ের বাড়ির গেট পেরিয়ে সিঁড়িতে পা রাখলো। চমৎকার! চপ্পলটায় কোনো শব্দ ওঠে না। গাড়লদের মতো থপথপ ঝপঝপ মচমচ শব্দ তুলে হাঁটতে ভালো লাগে না। ব্যাপারটা রুচিহীন। ভদ্রলোক হাঁটবে নিঃশব্দে। কাউকে বিরক্ত না ক'রে চমকে না দিয়ে। পায়ের জুতোও তেমন হওয়া চাই। ও নিঃশব্দে দোতলায় উঠে কলিং বেলে হাত রাখে। মলয় কি বাড়িতে থাকবে? না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। না থাকলে আর জমানো যাবে না। ওর বউকে আর কি দেখাবো? ওকেই একটু রং দেখাতে চেয়েছিলাম। ঠিক হ্যায়, ও বাড়ি না থাকলে ওর বউ অন্তত খানিকটা দেখে রাখুক। মলয় বাড়ি ফিরলে বলবে। বলবে তো অবশ্যই। কাল ছিলাম দুস্থ, দুর্বল, কৃপাপ্রার্থী, নোংরা জামাকাপড়ে বেমানান একটা নগণ্য মানুষ। আর আজ?

দরজা খুলল মলয়। ওকে নতুন বেশে দেখে কয়েক পলক হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর দ্রুত নিজের বিস্ময় কাটিয়ে স্বাগত জানায়। আরে, আয়, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

—তোরা মনে হচ্ছে দরোজা আটকে দাঁড়ানোটা ভালোই রপ্ত করেছিস! দরোজায় দাঁড়িয়ে থাকলে লোকে ঢোকে কিভাবে?

--কি রে ব্যাটা, খুব রং নিচ্ছিস, ভোল পুরো পাল্টে ফেলেছিস, লটারি মেরেছিস না কি!

ওদের কথার ফাঁকেই মলয়ের বউ পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সিকান্দারের আগামাথায় চোখ বুলিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মলয়ের বউকে দেখেই সিকান্দারের চাপা রাগটা জেগে ওঠে। যা বলার যেটুকু ঝাড়ার আগে ঝেড়ে নিতে হবে। একবার অন্য কথায় ঢুকলে আর ঝাল মেটানো যাবে না। সিকান্দার মলয়ের কথার জবাব দিল ওর বউয়ের দিকে তাকিয়ে—লটারি না মারলে তো তোরা কারো সাথে ভদ্র ব্যবহার করতে পারিস না। মছলন্দপুর থেকে টালিগঞ্জ, সকাল আটটা সাড়ে আটটায় পরপর তিনদিন এসে ফিরে গেলাম, একটা খবর পর্যন্ত রেখে যেতে পারিস না, আশ্চর্য! নিজেদের কি ভাবিস তোরা বলতো? তোর এখানে আটটায় পেঁৗছোতে গেলে আমাকে কটায় বাড়ি থেকে বেরুতে হয় বলতো?

—আরে বোস, বসে কথা বল্, আগে শোন্…

—ছাড় তোর শোনাশুনি! তোর বউকে জিগ্যেস করলে সেই এক ডায়লগ—'কিছু বলে যায়নি তো'। একটা মানুষ সাত সকালে ঠেঙাতে ঠেঙাতে অতো দূর থেকে এখানে এলো, মানুষটা অচেনা কেউ নয় ছোটবেলার বন্ধু, একটু বসতে বলতে হয়, একটু দম নেয়ার সুযোগ দিতে হয়। সেসব বালাই তো তোদের নেই। বউকে এটুকু শেখাতে পারিসনি যে পুরনো বন্ধুরা এলে অন্তত এক গ্লাস জল আর এক কাপ চা অন্তত দুধ ছাড়া এক কাপ লাল চা খাওয়ানো দরকার। এটা সাধারণ ভদ্রতা, এর জন্যে পঞ্চাশ পয়সা খরচা করলেই হয়ে যায়।

—আরে কি মুশকিল…

—ছাড় তোর মুশকিল! কার মুশকিল নেই বল্‌তো? মুশকিলে পড়েছি বলেই তো পরপর তোর পাঁয়তারা সহ্য করেও আবার

আসতে হচ্ছে, আরে মুশকিলে পড়েছি বলেই তো তোর বউ ঘরের দরোজা আটকে দাঁড়িয়ে বলবে—'কই কিছু বলে যায়নি তো!' ব্যস্, হয়ে গেল! তারপর ঘামতে ঘামতে সিঁড়ির শেষ ধাপে নামার পর পেছন থেকে শোনা যাবে—একটু চা খেয়ে যাবেন না! বউকে একটু শেখা—কোনো ভদ্দর লোকের ছেলে এমন ভদ্রতার গুঁতো খেয়ে সিঁড়ির শেষ ধাপে নামার পর ফের চা খেতে ওপরে ওঠে না! তোর বউকে আরো একটু শেখা—আমরা পুরনো বন্ধুরা গরীব হতে পারি, দুস্থ হতে পারি, কিন্তু চোর ডাকাত গুণ্ডা বদমাশ কিংবা রেপিস্ট নই।

—আরে থাম্ থাম্···আগে বোস···

—বসার আগে একটু জিগ্যেস করি—তোর বাড়িতে এলে এক কাপ শুকনো চা খাওয়াতে পারিস না অথচ আমার বাড়ি এই কুড়ি-পঁচিশ বছরে অন্তত একশবার গেছিস, এই একশ বারের ভেতর একবারও কি ভাত না খেয়ে আসতে পেরেছিস? বল্, বুকে হাত দিয়ে বল্···

—আরে সিকান্দার, কি আরম্ভ করেছিস, প্লিজ ··

—গুলি মার তোর প্লিজ! আমি বিরিয়ানি পোলাও না খাওয়াতে পারি অন্তত দুটো ডাল ভাত না খাইয়ে অবেলায় কাউকে ছাড়িনা। জীবনেও ছাড়িনি। আর তোরা তোদের বউকে এক কাপ চা বানিয়ে খাওয়াবার শিক্ষা দিতে পারিস না!

মলয় এবার এগিয়ে এসে ওকে জড়িয়ে ধরে চেয়ারে বসায়। স্ত্রীর দিকে একবার রুক্ষ চোখে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলে—বোস, শান্ত হয়ে বোস। ও খুব অন্যায় করেছে। সত্যিই মারাত্মক অন্যায় করেছে। ওর হয়ে আমিই ক্ষমা চাইছি।

মলযের স্ত্রী কি করবে বুঝতে না পেরে আমতা আমতা করে—আমি তো—উনিই তো দাঁড়াতে চান না—ওনাকে দেখে খুব ব্যস্ত মনে হয়, তাই—

—থামো! আমারই ভুল। আমি একটা খবর রেখে যেতে পারতাম। যাকগে, ঠাণ্ডা হয়ে বোস, সিকান্দার, রাগ করিসনে। যতোটা বাজে ভাবছিস অতোটা বাজে আমি হইনি এখনো। বিশ্বাস করবি? আমি এই তিনদিন তোর কাজটার জন্যেই ভোর ভোর

কবে বেবিয়েছি। শোন্, আমি এখনো সেই পর্যাযে উঠতে পাবিনি যে ইচ্ছে করলেই যে কোনো মুহূর্তে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজাব বেব করে দিতে পাবি। কিছু টাকা আমার হযেছে সত্যি, তোব কাছে লুকিযে লাভ নেই। তুই কম বেশি জানিস—কিন্তু সে টাকা এদিক ওদিক খাটছে। চট কবে বের কবা যাবে না। একটা পেমেণ্ট পাওয়াব কথা চলছিল দিন সাতেক ধবে। সেইটেব ভবসায তোকে আসতে বলেছিলাম। লোকটা পব পব এমন ঝোলান ঝোলালো, বোজই বলে কাল ভোবে আসুন, দিযে দেবো। শেষে গতকাল বেশ একটু চোটপাট কবতেই আজ সকালে টাকাটা হাতে পেলাম। আমি ভাবছিলাম, একবাবে টাকাটা নিয়েই তোব সাথে মছলন্দপুর যাবো, একদিনেব ভেতর কোর্টকাচারিব ঝামেলাটা মিটিয়ে নিশ্চিন্ত হবো। তাছাডা টাকাটা তোব জরুবি দরকাব। শোন্, ওখানে যা কিছু করি—বিসোর্ট হোক কিংবা ওল্ড এজ হোম যাই হোক তোকেই দায়িত্ব নিতে হবে। আমার পক্ষে ওখানে গিযে দেখা শোনা করা সম্ভব না। তোর ভরসাতেই কবছি। যা আসবে তুই কিছু রাখবি আমায কিছু দিবি। ঠিক আছে ?

না, একটু বেশি চোটপাট হযে গেল। মলয় তো সত্যিই খুব একটা খাবাপ ছেলে নয়। ছোট বেলা থেকেই তো দেখছি। ওব বউটাই যা অভদ্র। অবশ্যি দিন কাল যা পড়েছে, বাডিতে পুরুষ ছেলে না থাকলে বাইবেব লোককে আগ বাডিযে কজন বসতে বলাব সাহস কবে ? তাছাডা বাডিতে আর কেউ নেই। ওদের দুটো বাচ্চা আব ওরা দুজন। বাচ্চা দুটো সকাল সকাল নিশ্চয স্কুলে যায। তাব মানে, বাডিতে ও একা। একেবাবে একা। ওর পক্ষে বাইবের একজনকে বসতে বলা মুশকিল। কিন্তু আমি কি সত্যিই খুব বাইরেব ? কুড়ি পঁচিশ বছবেব বন্ধুত্বেব পবও একটা মানুষ আপন হতে পাবে না ? একটা পবিবাবেব মানে এই সব শহুবে পরিবারেব বিশ্বাসভাজন বন্ধু হতে গেলে কতো বছবেব বন্ধুত্ব জরুরি ? মনে হয, দু পাঁচ হাজার বছর লাগবে ! তাব কমে সম্ভব নয। না, ঠিকই হযেছে। একটু ওষুধ দেয়া দবকার ছিল। যা খুশি ব্যবহাব করবে অথচ মুখ বুজে সহ্য কবে যেতে হবে ? আরে জানোযাব ! নিজেব বাড়িতে যদি কাউকে দশ মিনিট বসিযে এক কাপ চা খাওযাবার যোগ্যতা না থাকে তো অন্য লোকের বাড়ি গিযে দিনেব

পর দিন ভাত গিলতে লজ্জা লাগে না ? ঠিকই হয়েছে। ছোট লোকের দল !

মনটা বেশ ফুরফুরে লাগছে। কাউকে ঝেড়ে কাপড় পরাতে পারলে মনে আনন্দ আসে। মেজাজ ঠিক হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, যাই বলি না কেন, পকেট যদি আজ গরম না থাকতো, ওর কাছে সাহায্যের আশায় আজও আসতে হতো তবে কি আর এতো কথা বলতে সাহসে কুলোতো ? অসম্ভব, সব কিছুর গোড়ায় সেই নোট, চকচকে নোটের বাণ্ডিল। যাকে ভালো বাংলায় বলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। অতীত বেচি আর ভবিষ্যৎ বেচি, সত্তা বেচি আর আত্মা বেচি কোনো সমস্যা নেই। শুধু নোটের বাণ্ডিল ঠিক মতো হাতে আসছে কিনা খেয়াল রাখো। আরে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে আর সব জায়গায় দাসত্ব করবো সেও ভালো। টাকার বাণ্ডিল হাতে এলে সমস্ত দাসত্বই মধুর, মনোরম, উপভোগ্য !

মলয়ের বউ চা মিষ্টি এনে সিকান্দারের সামনে রেখে কাঁচুমাচু হয়ে বলল—সিকান্দারদা, কিছু মনে করবেন না। সিকান্দার জবাব দেয়ার আগেই একটা একশ টাকার বাণ্ডিল এনে মলয় ওর সামনে রেখে বলে—নে, এটা তোর কাছে রাখ, কোনো লেখাপড়ার দরকার নেই। কাল পুরোটা নিয়ে আমি সকাল সকাল আসছি। লেখাপড়া যা করার কাল করা যাবে। তুই সকালে বাড়ি থেকে বেরুবি না। একসঙ্গে সকাল সকাল কোর্টে যাবো। আরে গর্দভ। চিরকাল ওভার বাতেলা মারতে মারতে ভবিষ্যৎটা ফর্সা করে ছেড়েছিস। নে, এখন ঠাণ্ডা হয়ে মালটা পকেটে ঢোকা।

মলয় কথা বলতে বলতে ওর দামি জামাকাপড়ের দিকে বার বার চোখ বোলায়। মলয়ের স্ত্রীও তাই। ওরা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। হঠাৎ লোকটার ভোল পাল্টে গেল কি ভাবে। যদিও সিকান্দার ছোটবেলা থেকেই বাক্‌পটু, কখনো কখনো কর্কশ, খানিকটা বগচটা কিন্তু মানুষটা অসৎ নয়। বন্ধুবৎসলও বটে, এক ধরনের উদারতাও আছে। এক ধরনের এই জন্যে, তার চেয়ে বেশি উদার হতে গেলে বা ধরণ পাল্টাতে গেলে পকেটে কাগজের বাণ্ডিল দরকার। আর এই কাগজের বাণ্ডিল জিনিসটা পকেটে আনতে গেলে যেটুকু উদ্যোগ উদ্যম এবং চাতুর্য দরকার সেটুকু সিকান্দারের নেই। সেই রকমের এক আহাম্মক হঠাৎ রাতারাতি ভোল পাল্টায় কি ভাবে ? সিকান্দার ব্রিফকেসের পাশ থেকে একটা ক্যাডবেরির বড় টিনের প্যাকেট বের করে বলল

—তোর জবাবটা পরে, আগে তোর বউয়ের জবাব দিয়ে নিই—কিছু মনে করবো না দুটো শর্তে—এক, এই ক্যাডবেরির প্যাকেটটা আপনার বাচ্চারা ফেরা মাত্রই হাতে ধরিয়ে দেবেন।

—দেখ কাণ্ড! এতো অনেক দাম, এসব কেন?

মলযের স্ত্রী সলজ্জ হাসি হেসে প্যাকেটটা হাতে নেয। মলয মৃদু হাসতে থাকলেও তার মনে প্রশ্নটা ক্রমশ জোরালো হতে থাকে। কি ব্যাপার, কোত্থেকে টাকা পেল? সিকান্দার ওদের সংগে হাসতে হাসতে আবার শুরু করে—দুই নাম্বার শর্ত—আমি আপনার এখানে জল স্পর্শও করবো না। প্রতিজ্ঞা! কারণ, ভীষণ রাগ গেছি! রাগের কারণ—সকালে অতি ওভার ব্রেকফাস্ট! মানে এমন গেলা গিলেছি যে জলও খেতে পারবো না।

—সেকি! অন্তত চা খান, প্লিজ, না হলে ভাববো, এখনো রেগে আছেন।

সিকান্দার এবার সশব্দে হেসে উঠল। হাসতে হাসতে জবাব দিল—সত্যিই রেগে আছি। আর রাগটা ভাঙবো বলেই তো এতো রাগ দেখালাম। যেন এরপর থেকে নিয়মিত চা পাই। না, সত্যিই এখন চা-স্পর্শ করবো না। আপনি এবার উল্টে রাগ করবেন না যেন। এবার শোন্, তোর অই পঁচিশকে টাকার বাণ্ডিলটা যেখানে ছিল সেখানে রেখে আয়। আমার জমি বিক্রির দরকার নেই। আমার পকেট এখন গরম, খুব গরম! তোর দরকার হলে আমিই তোকে ধার দিতে পারি।

—কোত্থেকে পেলি? চুরি ডাকাতি করিসনি তো? সত্যি কথা বল্?

—তুই কোত্থেকে পেলি? ব্যাটা, দুবছর আগেও তো মছলন্দপুর যাওয়ার পর ফেরার গাড়িভাড়া আমাকেই দিতে হতো। এই দুবছরে কলকাতায় বাড়ি, দোকান, আরো কি সব করেছো তলে তলে কে জানে। বল্ কোত্থেকে পেলি, চুরি করে না ডাকাতি করে?

—আরে দুবছর মানে তো দুই দুটো বছর, দুই রাত তো নয। তুই দুই রাত আগেও ছিলি—এখন তো সত্যি সত্যি সিকান্দার মনে হচ্ছে। কিভাবে বস্, রহস্যটা বল তো।

—আমি আমার অতীত বিক্রি করেছি।

—কি বলছিস? তোর মাথা খারাপ হল না কি?

—না। পুরোপুরি ঠিক আছে। একটা মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানি এই সব কেনাবেচা শুরু করেছে। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সব বিক্রি করা যাবে। ইচ্ছে করলে তুইও বিক্রি করতে পারিস। তোর বউ ছেলে মেয়ে সবাই পাবে। আমি এখন ওদের এজেণ্ট। বিশাল অঙ্কের টাকা পাবি। যদি চাস কাল সকালেই আমার বাড়ি চলে আয়। সব ঠিক ঠিক বুঝিয়ে দেবো। কিন্তু দেরি নয়, তাড়াতাড়ি, কালপরশুর মধ্যেই আসবি। যতো দিন যাবে দাম কমে যাবে। যে কোনো নতুন মাল বাজারে এলে যেমন চড়া দাম থাকে তার পর আস্তে আস্তে পড়ে যায়। এটাও তেমনি।

—নারে ভাই, ওসব উদ্ভট ব্যাপারে আমি নেই। তোর অতীত তুই যেখানে পারিস বেচে দে, আমার দরকার নেই।

—সিকান্দার বেনসনের প্যাকেট বের করল। একটা মলযের দিকে এগিয়ে দিয়ে একটা নিজে ধরায়। দুজনে ধোঁযা ছাড়তে ছাড়তে দুজনের মুখ অস্পষ্ট করে ফেলে। একটু দূরে দাঁড়িযে মলযের স্ত্রী সিকান্দারের কথা শোনে। এও কি সম্ভব? অতীত বিক্রি! কখনো শুনিনি। সে বিস্ময়ের ঘোর কাটিযে বলে—কতো টাকা দেয?

সিকান্দার এবার দক্ষ এজেণ্টের মতো খেলতে শুরু করে। মলযের স্ত্রীর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে মলযের দিকে তাকায। চাপা, কর্তৃত্বব্যঞ্জক গলায প্রশ্ন করে—

কতো টাকা হতে পারে, বল্? এনি অ্যামাউণ্ট। যা মনে আসে বল্। অনুমান কর।

—আমি বলবো?

—বলুন।

—একলাখ।

মলযের স্ত্রীর কথায অবজ্ঞার হাসি হেসে সিকান্দার জবাব দেয—বেশ তো, আপনার অতীতের জন্যে এখনই আপনাকে একলাখ দিতে পারি। তবে একটা শর্তে—আর চাইতে পারবেন না। এক লাখের ওপরে যা পাবো আমার। রাজি? কথা বলতে বলতে সে ব্রিফকেসটা এমন ঘুরিয়ে খোলে যেন পাঁচশ টাকার বাণ্ডিল গুলো ভালো ভাবে ওদের নজরে পড়ে। তারপর দুটো বাণ্ডিল তুলে মহিলার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—নিন। লেখাপড়ার

দরকার নেই। লেখাপড়া কাল হবে।

স্বামী স্ত্রী দুজনে পরস্পরের দিকে তাকায়। এমন উদ্ভট কথা কেউ কখনো শোনেনি। মলয় ব্যবসায়ী মানুষ। সে অবস্থাটার আঁচ পেতে জিগ্যেস করে—তুই কতো দামে বেচলি ?

সিকান্দার টাকার বাণ্ডিল ব্রিফকেসের উপর রেখে জবাব দেয়—আমার প্রসঙ্গ ছাড়। আমার দামের সাথে তোদের দামে নাও মিলতে পারে। শোন্‌ আজ তোরা ভাবনা চিন্তা কর। যদি ইচ্ছে হয়, কাল সকালে আমার বাড়ি আসতে পারিস। এতোদিন ধরে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যা কামিয়েছিস তার দশগুণ পাবি! মনে রাখিস, এ সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে গেলে পরে পস্তাতে হবে। আরে, অতীত ফতিত এর মূল্য কিরে ? অতীত ভবিষ্যৎ যার যার পকেটে রেখে নোংরা করে পচিয়ে ফেলে কার লাভ ? তার চেয়ে যদি ভালো দামে বেচতে পারি কেন বেচবো না ? শোন্‌, দুনিয়া পাল্টে গেছে, এখন সব কিছুই পণ্য। সব কিছুই বাজারে বিকোয়। সব কিছুই পেটেন্ট করে বাজারে ছাড়া হচ্ছে। এই মওকায় যা আছে সব বেচে দে। আমরা অভাবী মানুষ। চোদ্দ পুরুষের রোজগার যদি এক হাতে করে যেতে পারি তো ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত। দিনকাল খারাপ। ভবিষ্যৎ বেচেই ভবিষ্যৎ গোছাতে হবে!

মলয় গভীর চিন্তায় ডুবে যায়। সে কোনো সিদ্ধান্ত করতে পারে না। ব্যবসায়ী মানুষ। মোটা টাকা নাকের ডগায় নাচতে থাকলে লোভ সামাল দেয়া মুশকিল। তাও কিনা খাটা খাটুনি ছাড়াই। কিন্তু পুরো ব্যাপারটার ভেতর কোথায় যেন অস্বাভাবিকতা আছে। বিপদে পড়বো না তো ? লোভে পড়ে টাকা নিয়ে শেষে কাদের খপ্পরে পড়ি কে জানে! সে স্ত্রীর দিকে তাকায়। স্ত্রী সিকান্দারের দিকে। সিকান্দার ওদের দোনোমনা ভাব দেখে একটু পেছনে টানে। ব্রিফ কেসের ভেতর টাকাগুলো ঢুকিয়ে ব্রিফকেস বন্ধ করে উঠে দাঁড়ায়। মলয়ের দিকে একবার তাকিয়ে দরোজার কাছে যেতে যেতে বলে—আমি চললাম। ভেবে দেখ্‌। জোরাজুরির ব্যাপার নেই। কেউ তোর মাল জোর করে কিনতে পাবে না। তবে এমন দিন খুব বেশি দূরে নেই যখন তোর অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব পুরনো কাগজের মতো ফেরিও অলাদের কাছে বেচে দিতে হবে। কতো দামে? তিন টাকা কেজি। বড়জোর চার কিংবা পাঁচ। আর এখন ? তোর ছেলেমেয়ে তোর বউ আর তুই, পুরো

পরিবারের এসব বাড়তি মাল বেচে দিলে কম করে এক কোটি দেবো। মনে রাখিস কড়কড়ে এক কোটি টাকা !

সিকান্দাব দবোজা পেরিয়ে বেরিয়ে যাওয়াব মুখে মলয অস্পষ্ট স্বরে বলল—এক কোটি !

ছয

গাডিতে উঠে আন্তোনিওকে নির্দেশ দিল—নর্থ, এক্সট্রিম নর্থ। কুইক ! আন্তোনিও গাডিতে স্পিড দেয। মলযেব পাডা ছেড়ে গাড়ি বড় বাস্তায পড়ে। এখন দুপুবেব কোলাহলে বাস্তা মুখব। যানবাহনের ভিড প্রচুব। আন্তো-নিও পাকা হাতে ওভাবটেক কবতে করতে দক্ষিণের পথ ছেড়ে দ্রুতবেগে উত্তরে এগিয়ে চলে।

—আন্তোনিও !

—স্যাব ?

—আপনি কোন্ দেশেব লোক ? ইটালি ?

—আমার কোনো দেশ নেই। যেখানে শাইকল এণ্ড সিকোফ্যাণ্ট্স্ সেখানেই আমি। পৃথিবীর সর্বত্র আমার দেশ। অন্যভাবে বললে বলা যায, আমবা, মানে শাইলক এ্যাণ্ড সিকোফ্যাণ্টস কোনো দেশেব অস্তিত্ব মানি না। যেখানে লাভেব সম্ভাবনা আছে, যেখানে টাকা আছে সেখানেই আমরা আছি। সেটাই আমাদের দেশ।

—আপনি চমৎকাব বাংলা বলেন। যদিও একটু বিদেশি টান আছে, তবু বলবো, আপনি অনেক বাঙালিব চেযেও ভালো বাংলা জানেন।

—আমি এগাবোটা ভাষা জানি। প্রত্যেকটাই মাতৃভাষার মতো ব্যবহাব কবতে পাবি।

—আপনার মাতৃভাষা কোনটা ?

—প্রত্যেকটাই আমার মাতৃভাষা।

—আন্তোনিও !

—স্যাব ?

—একজন মানুষের এগারোটা মা থাকতে পাবে না !

—পারে।

—আপনার বস্ মানে, শাইলকের ক'টা মা ?

—কুড়িটা। তবে কোম্পানির মা ধরতে গেলে পৃথিবীর সব মা'ই তাঁর মা। আমাদের কোম্পানিতে এখন পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বহীন মিলিয়ে মোটামুটি ছ'শর ওপর ভাষায় কাজ করা হয়।

—ছ'শ! বলেন কি ?

—আরো শেখানো হচ্ছে। আশাকরা যায়, আগামী দু'বছরের ভেতর পৃথিবীতে এমন কোনো ভাষা থাকবে না যে ভাষায় আমাদের কাজ কর্ম চলবে না।

—সে তো হাজার হাজার।

—হ্যাঁ, তাই। তবে একই সঙ্গে অন্য একটা প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে, সেটা অনেক বেশি আধুনিক, বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রচেষ্টা।

—কি রকম ?

—পৃথিবীতে মাত্র একটাই ভাষা থাকবে।

—কি ভাষা ?

—ইংরেজি।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, সেই প্রক্রিয়া এমন দ্রুত এবং ব্যাপক ভাবে চালানো হচ্ছে, আশা করা যায় আসছে বছর দশেকের ভেতর পৃথিবীর অন্য সমস্ত ভাষাকে বিলুপ্ত করে দেয়া সম্ভব হবে!

—দুটো ব্যাপার তো পরস্পর বিরোধী হয়ে গেল। এক দিকে হাজার হাজার ভাষা শিখছেন, অন্যদিকে সমস্ত ভাষা বিলুপ্ত করছেন, কণ্ট্রাডিকটারি হয়ে গেল না ?

—আপাতদৃষ্টিতে। 'আসলে দুটোই একটা মূল উদ্দেশ্যের সহায়ক। একটা সূক্ষ্ম নীতির কৌশলগত প্রয়োগ।

—কি সেই নীতি ?

—পৃথিবীকে একটা ভাষাভাষী দেশ করে তোলা, পৃথিবীকে একটা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা। পৃথিবীকে একটা বড় বাজারে রূপান্তরিত করা। পৃথিবীর সমস্ত অনুন্নত এবং বিচ্ছিন্ন সংস্কৃতি ধ্বংস করে একটা মাত্র সংস্কৃতির আয়ত্তাধীন করা।

—কি সেই সংস্কৃতি ?

—কেনা বেচা !

—মানে ?

—ক্রয় বিক্রয়।

—সে তো বুঝলাম। আসল মানেটা কি ?

—বাজার।

—কিছুই বুঝলাম না।

—বাজার তৈরি করা। বাজারি সংস্কৃতি তৈরি করা। বাজারি ঐতিহ্য তৈরি করা। বাজারি ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, দর্শন বিজ্ঞান, সমাজ নীতি, রাষ্ট্রনীতি সবই বাজারের আওতায় নিয়ে আসা। সবই পণ্যের মানে উন্নীত করা। যদি আপনি একবার পণ্যের মানে উন্নীত করতে পারেন, সে বস্তু বা বিষয় আপাতদৃষ্টিতে যতোই বিমূর্ত মনে হোক, বাজারে বিক্রি করা সম্ভব।

—সেটা ভাষার বেলায় খাটে ?

—অবশ্যই।

—অসম্ভব। আমার ভাষাকে আমি কি ভাবে পণ্য করতে পারি ? কি ভাবে তার বিক্রি বাটা সম্ভব ? কি ভাবেই বা মানুষের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে নতুন ভাষায় তাকে কথা বলবেন ? পৃথিবীকে একটাই ভাষাভাষী দেশে রূপান্তরিত করবেন ? এই ভাবনাটাই ইউটোপিয়ান, আজগুবি, অবৈজ্ঞানিক।

—সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিক। কারণ বিজ্ঞান ইতিমধ্যেই পণ্য।

—তাই ? ব্যাখ্যা করুন।

—আপনার দেশ ক'দিন আগে যে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়, যারা ঘটায়, যারা এর পেছনের কারিগর অর্থাৎ বিজ্ঞানী তাদের আপনারা বাহবা দিয়েছেন, তাদের নিয়ে গর্ব করেছেন এবং করছেন, একথা ঠিক ?

—তা ঠিক।

—তাহলে এবার একটু ঠিক ভাবে ভাবুন—পরমাণু বোমা একটা পণ্য। এর কারিগরি দিক আপনাকে কিনে আনতে হয়। এর প্রধান যে উপাদান কোনো দেশের হাতে না থাকলে তা কিনতে হয়।

তার বাজাব দরও আকাশছোঁয়া। তাহলে দেখুন এর গুরুত্বপূর্ণ দুটো দিক—একটা উপাদানগত একটা তত্ত্বগত বা কারিগরি দুটোই কিনতে হয় দুটোই পণ্য। কোনো কোনো দেশ আবার বানাবার ঝামেলায় না গিযে সরাসরি পরমাণু বোমা কিনছে। এখনো খোলাবাজারে না মিললেও গোপনে, চোরাপথে বিক্রিবাটা হচ্ছে। এবার বলুন, বিজ্ঞানেব এতো বড় আবিস্কাব তা পণ্য হিসেবেই বাজারে বিক্রি হচ্ছে এবং যাব যেমন দরকাব সে তেমন তেমন কিনছে। এছাড়া বিজ্ঞানের যে কোনো শাখাব দিকে তাকান, ফলিত বিজ্ঞান কিংবা বিজ্ঞানেব তত্ত্বগত দিক সবই পণ্য, সবই বিক্রয যোগ্য মাল। জানেন তো, আজকাল থিসিস পেপার বিক্রি হয, থিম বিক্রি হয ?

—হ্যাঁ, তা শুনেছি। ঠিক আছে, বিজ্ঞান যে পণ্য এটা না হয মেনেই নিলাম কিন্তু সারা পৃথিবীতে একটাই ভাষা চালু করবেন, ভাষাও একটা পণ্যে রূপান্তবিত হবে, কি ভাবে ?

—স্যার ?

—বলুন।

—আমি মাঝে মাঝে দু একটা কঠিন শব্দ ব্যবহার কবতে পাবি ? মানে আমার বক্তব্যের জোরটা ভালোভাবে বোঝাবাব জন্যে আব কি ?

—বেশ তো, কবুন।

—আপনাব বাংলা ভাষায যাবা বড় বড় গবেষক, তাত্ত্বিক, পণ্ডিত, মনীষী গোছের ভাষাবিজ্ঞানী বলতে যাদের বোঝায আর কি তাবা অনেক কাল আগে থেকেই বিদেশে গিযে তাদেব মাতৃভাষা শিখে আসতো, তা জানেন ?

—হ্যাঁ, সে তো অনেকেই গেছে। এখনো যাচ্ছে।

—তাহলে এবাব আমবা একটা সিদ্ধান্ত করতে পারি—আপনার দেশেব সেই ভাষাবিজ্ঞানীর দলই আমাদের প্রথম এজেণ্ট, মানে দালাল !

—কি ভাবে ?

—তারাই আপনাব ভাষাকে পণ্য কবার পথে প্রথমে আমাদের সাহায্য কবেছে এবং ধারাবাহিক ভাবে এখনো সাহায্য কবে চলেছে !

—কি ভাবে ?

—যে জাতির লোক তার মাতৃভাষা শেখাব জন্যে অন্যের দেশে যায়, অপরের দ্বারস্থ হয তাব ভাষা কোনোদিন টিকে থাকতে পারে না। আপনাব ভাষাও টিকবে না।

আমাদেব নির্ভবযোগ্য দালালদেব হাতেই আপনারা আপনাদের ভাষাব উৎকর্ষের দাযিত্ব চাপিযে দিয়েছেন।

—বুঝলাম। কিন্তু কি ভাবে ?

—খুব সহজভাবে। আমবা যে ভাবে এইসব ভাষা-দাদালদেব ভাষাব ঘোপ ঘাপ বুঝতে শেখাবো তাবা সেভাবেই শিখবে। তাবা সে-ভাবেই শিখে এসে তোতাপাখিব মতো আপনাদেব শেখাবে। আপ-নাবা তোতাপাখির মতোই একে অন্যকে সেই শেখানো বুলি শেখা-বেন। আমরা শেখাবো—ভাষাব মূল একটাই, একটাই তার গর্ভা-গাব, আপনাবা শিখবেন একটাই গর্ভাগাব। আমবা শেখাবো সমস্ত ভাষাব মূলে একটাই জননী-ভাষা, সেই জননী-ভাষাব গর্ভ থেকে বহু ভাষাব জন্ম হযেছে। আপনারা শিখবেন, একই জননীব গর্ভ থেকে বহু ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে। আমরা শেখাবো, ধ্বনিগত দিক থেকে, মানুষেব স্বরক্ষেপণেব দিক থেকে মূলত একটাই ক্রিয়া পদ্ধতি বযেছে। আপনাবা শিখবেন—মূলত ক্রিয়া পদ্ধতি একটাই। এবং সব শেষে আমবা শেখাবো—সবই যখন একই উৎস থেকে একই পদ্ধতিতে বিস্তৃত হযেছে তখন বাংলাকে রোমান হবফে লিখতে পাবলে সুবিধে অনেক, কম্পিউটারে প্রোসেস কবতে সুবিধে বেশি। সুতবাং আপনাবা রোমান হবফে বাংলা শিখবেন। তারপব আমবা শেষ বিদ্যেটা শিখিযে বলবো—রোমান হরফে আব বাংলাব ঝামেলায গিযে লাভ নেই। সবাসবি ইংবেজিটাই ভালো, অনেক বেশি বিজ্ঞান ভিত্তিক। আপনাবা শিখবেন—বাংলাব চেয়ে ইংবেজি ভাষা অনেক বিজ্ঞানসম্মত। সুতবাং আপনাবা এব পব থেকে ইংবেজি শিখতে হামলে পড়বেন। স্যার ?

—বলুন।

—আপনাবা কি ইংবেজি শিখতে ইতোমধ্যেই হামলে পডছেন না ?

—তা ঠিক।

—আপনারা ইংবেজি না জানলে কি মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকবি পেতে পাবেন ?

—না, সম্ভব নয়।

—আপনারা ইংবেজি না শিখলে সর্বভাবতীয কোনো সংস্থায চাকবি

পেতে পাবেন ?

—না, সত্যিই মুশকিল।

—হ্যাঁ, এই মুশকিল আসানের জন্যেই বাংলা ছেড়ে ইংরেজি শিখবেন, শিখতে বাধ্য হবেন। আমরা সারা পৃথিবীতে এভাবে প্রতিটি আঞ্চলিক ভাষাকে ধ্বংস করে ধীরে ধীরে ইংরেজি শিখতে বাধ্য করবো। যারা শিখবে না অথবা শিখতে পারবে না তাদের ভাতে মারবো ! আর সব শেষে সহজ সিদ্ধান্ত হল, যে বিদ্যা আয়ত্ত করলে ঘরে ভাত আসে যে বিদ্যার বিনিময়ে অর্থ আসে সে বিদ্যা অবশ্যই একটা পণ্য। আর তাই একই প্রজাতির ছোট পণ্যকে বড় পণ্য দিয়ে গিলে ফেলা হবে। এবং আপনার ভাষাকে অবশ্যই সংকুচিত করতে করতে কোণঠাসা করতে করতে একসময় ধ্বংস করে দেবো, তাই অবশ্যই আপনি ইংরেজি শিখতে বাধ্য হবেন এবং অবশ্যই পৃথিবীতে একটা মাত্র ভাষা থাকবে—তার নাম ইংরেজি।

—আন্তোনিও !

—স্যার ?

—আপনার কথাবার্তা কর্কশ। নির্মম। আপনি নিষ্প্রাণ, হৃদয়হীন লোকের মতো কথা বলেন্।

—শাইলক এ্যান্ড সিকোফ্যান্ট্স্-এর চাকরিতে ঢোকার সময় আমার হৃদয় বন্ধক রাখতে হয়েছে।

—সে কি ?

—হ্যাঁ। আমার হৃদয় বন্ধক দিয়ে আমি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছি ! যেমন আপনি আপনার অতীত অর্থাৎ ঐতিহ্য বিক্রি করে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছেন !

সন্ধ্যার এখনো অনেক বাকি সন্দেহ নেই। তবে রোদের তেজ কমে গেছে। এই দুর্বল রোদ যে বেশিক্ষণ আলো দিতে পারবে না সেটাও নিশ্চিত। বাস রাস্তা থেকে সিকান্দারের বাড়ি হেঁটে গেলে মিনিট পাঁচেক লাগবে। মাটির রাস্তা। দু এক জায়গায় একটু আধটু গর্তটর্ত আছে। দু একটা উঁচু ঢিবিও আছে। গাঁয়ের পথ যেমন হয়। তবে পথটা যথেষ্ট চওড়া। গাড়ি যেতে পারে। ঝকঝকে নতুন গাড়িটা যখন পাকা রাস্তা ছেড়ে সিকান্দারের বাড়ির দিকে ঢুকছে তখন পাকা রাস্তার ধারে ছোট্ট চায়ের দোকানে যারা বসে

আড্ডা মারছিল তারা দু'চোখ বড় করে গাড়ির দিকে তাকাল। গাড়ি? কার গাড়ি? গাড়িতে কে যায়? এ গাঁয়ের পাশ দিয়ে প্রতিদিন এতো গাড়ি, এতো ধরনের গাড়ি চলাচল করে যে গাড়ির প্রতি ওদের কৌতূহল নেই। আসল ব্যাপার হল, নিম্নবিত্ত এই গাঁয়ের ভেতর কখনো গাড়ি ঢোকে না। কেনই বা ঢুকবে? গাড়িঅলাদের সঙ্গে কারই বা যোগাযোগ রাখার সাধ্যি আছে? হ্যাঁ, মাঝে মাঝে বড়জোর দু একখানা মোটর বাইক আসা যাওয়া করে। অই পর্যন্ত। তার বেশি কেউ কখনো আশাও করেনি, দেখেও নি। সেক্ষেত্রে গাড়ি তাও আবার বিদেশি মডেলের চকচকে ঝকঝকে নতুন গাড়ি? গাড়িতে কে যায়? আরে এ যে সিকান্দার। সিকান্দার গাড়ির পেছনে গ্যাট হয়ে বসে আছে, সামনে ড্রাইভার চালিয়ে যাচ্ছে। উল্টো হলে তবু মানা যেত। সিকান্দার চাকরি বাকরি না পেয়ে গাড়ি চালানো শুরু করেছে। পেছনে বসে আছে গাড়ির মালিক। কোনো কাজে কম্মে এদিকে এসে গেছে বলে মালিককে ভজিয়ে একটু বাড়িতে ঢুঁ মেরে যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপার তা নয়। তাহলে ব্যাপার কি? চল্ দেখে আসি। ছোকরাদের দলটা একটু একটু করে সিকান্দারের বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। ইতোমধ্যে বাচ্চা-কাচ্চার দল গাড়ির সাথে হৈ-হৈ ক'রে ছুটতে আরম্ভ করেছে। বাচ্চাদের হৈ হৈ শুনে আরো নতুন বাচ্চারা ছুটে আসছে। বাচ্চাদের চেঁচামেচি শুনে বাচ্চার মায়েরা ঘরের কাজ হাতে রেখে মুখ বাড়িয়ে দিচ্ছে। বাচ্চার মায়েদের মুখ বাড়ানো দেখে বাচ্চার বাবা কাকারাও এগিয়ে আসছে। মোটমাট নিঃস্তরঙ্গ গাঁয়ের জীবনে বিপুল এবং সগর্জন তরঙ্গের মতো সিকান্দার গাঁয়ে ঢুকল।

বাড়ির সামনে বেশ বড়সড় একটা উঠোন। উঠোনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে সিকান্দার নেমে এল। ততোক্ষণে উঠোনের চারিদিকে লোক জমে গেছে। বিশেষত বাচ্চাকাচ্চার দল। সিকান্দারের বাবা খুব সুস্থ নন। হাঁটা চলায় একটু কষ্ট হয়। তিনি বারান্দায় বসেছিলেন। ছেলেকে গাড়ি থেকে নামতে দেখে চোখ বড় ক'রে সেই যে তাকিয়ে রইলেন তো তাকিয়েই রইলেন আর চোখ ফেরাতে পারছেন না। চোখ ফিরবে কি ভাবে? তার কাপড় জামার যা পারিপাট্য তাতে চোখ ফেরানো সম্ভব নয়। কাল রাতে কোন্ সিকান্দার গেল আর কোন্ সিকান্দার ফিরে এল! মাত্র একটাই তো রাত আর একটাই তো দিন! সিকান্দারের মা এক ঝলক তাকিয়ে দেখেই নিজেকে সামলে নিলেন। তাঁর কাছে বড় কথা, বাড়িতে অতিথি এসেছে। অন্তত কিছু আয়োজন-

আপ্যাযনেব ব্যবস্থা তো কবতেই হবে। তাঁব কাছে ছেলের ভাগ্য পরিবর্তনের ব্যাপারটা তখনো বড আকাবে দেখা দেযনি। সিকান্দারেব স্ত্রী নিতান্তই যুবতী। তাব ভেতবে এখনো এতো দুঃখ দাবিদ্রেব পবও আনন্দেব ঢেউ ওঠে, দুঃখেব ঝড় বয। আবেগ শুকিযে এখনো পাথব হতে পারেনি। স্বামীকে বীবদর্পে নামতে দেখে প্রথমেই তার যা মনে হয. কপাল ফিবে গেছে। কি-ভাবে ফিবল, কতো দ্রুত ফিবল সম্ভব কি অসম্ভব সেটা বড কথা নয। কপাল ফিবে গেছে সুতরাং আনন্দ কবো। সে দাওযাব সামনে একটু এগিযে এসে দাঁডায। তার মুখেব চাপা হাসিব ঝিলিক কিছুতেই সরতে চায না। আর সিকান্দাবেব ছেলেমেযেদেব প্রসঙ্গ খুব বড় কবে উল্লেখের দাবি বাখে না। অন্যসব বাচ্চাদেব মতোই তাবা সিকান্দাবেব কাছে ছুটে আসে। ·তবে অন্যেরা সিকান্দাবেব কাছাকাছি এসে থেমে যায, ওবা থামে না। নোংবা হাতেই বাবাকে জডিযে ধরে। বিশেষ করে ছেলেটা বয়সে সবার ছোট, এখনো পাঁচ পেবোযনি, সে বাবাকে সেই যে জড়িয়ে ধবে আছে আব ছাড়ার নাম নেই। মেযে দুটো প্রাথমিক আনন্দের রেশ কাটিযে বাবাব সাথে সাথে মালপত্র গাড়ি থেকে নামায। ছুটে ছুটে মাযেব পাযের কাছে জমা করে।

আন্তোনিও ভাবি জিনিসগুলো গাডির পেছন থেকে নামিযে বারান্দায তুলে রাখে। সুবাইযা নিজের আনন্দের অভিঘাত সামলে নিয়ে দামি মালামাল গুলো ঘবের ভেতবে ঢোকাতে ব্যস্ত হযে পডে। সিকান্দাব একটা ক্যাডবেরির টিন খুলে চাবপাশে জড় হওযা বাচ্চাদের টফি-চকলেট বিলিযে দেয়। তার আগেই নিজেব ছেলেমেযেদেব হাতে মুখোরোচক খাবাবেব নানান প্যাকেট চলে গেছে। পরিবেশ আনন্দঘন। ঠিক এখন কি করনীয তা ভাবাব আগেই অতি জঘন্য কাপে অতি অখাদ্য চা নিযে মা এলেন। ওদেব দুজনেব হাতে দিলেন। তাব সাথে অতি সস্তা টিনের প্লেটে ডিম ভাজা। এবাব সিকান্দাবেব সংকোচ লাগে। আন্তোনিওকে এই কাপ প্লেটে চা, এই বাজে প্লেটে খাবাব দেয়াটা কি ঠিক হচ্ছে? অথচ দেয়া তো হযেই গেছে, এখন নতুন কাপ প্লেট কোথায় পাবে? প্রায সবই কেনা হয়েছে শুধু এই কাপ প্লেট জাতীয ঘবোযা জিনিস হযনি। সময কোথায পেলাম? তাও যেটুকু যাহোক কেনা হল। কিন্তু এখন এই বিদেশি লোকটাব সামনে লজ্জায যে মাথা কাটা যায।

আন্তোনিও!

—স্যার ?

—আমবা খুব গবিব।

—না, স্যার। আপনি বললে, এক্ষুণি গাড়ি নিয়ে বাজাব থেকে কাপ প্লেট কিনে আনতে পাবি।

এই লোক গুলো প্রায় অন্তর্যামী। কথা বলাব আগেই বুঝে যায। এদেব সামনে কি আব লুকোবো ? যাব সামনে কিছুই গোপন থাকে না। তাব সামনে লজ্জা পাওযা অর্থহীন। 'না এখন থাক্। কাল দেখা যাবে। আপনি চা খেযে বিশ্রাম করুন। আমি একটু ভেতবে যাই।'

—ওকে স্যাব।

সাত

ভেতবে গিযেও ঠিক মতো আড়াল পাওযা গেল না। মা-বাবা কিংবা স্ত্রীর সাথে একটু প্রাণ খুলে কথা বলবে, এই হঠাৎ সৌভাগ্যে একটু যে প্রাণ খুলে আনন্দ কববে সে সুযোগ তাকে দেযা হল না। গাঁ-গঞ্জেব বাড়িতে তেমন আড়াল এমনিতে থাকে না। তাব ওপবে কোঠা বাড়ি নয, বেড়ার ঘর। ঘবেব ভেতবটায় চাল ডাল থেকে শুবু কবে সংসাবেব নানা টুকিটাকি জিনিসে এমন ঠাসাঠাসি যে সেখানে ঢোকাই বিপদ। একটা চৌকি এক সময় ছিল, এখনো আছে কিন্তু এখন সেখানে শোয়াব বালাই নেই। তাই চৌকিব ওপবেও সংসাবেব দবকারি অদরকাবি জিনিসে ঠাসা। সেখানে বসাব জাযগা নেই। এককালে, বিযেব ঠিক পবপব কিছুদিন সেখানে তাব স্ত্রীকে নিযে ঘুমোত সিকান্দাব। প্রথম বাচ্চা হওযাব পব প্রধানত স্ত্রী আব সন্তানই চৌকির দখল নেয। দ্বিতীয় বাচ্চার পর সিকান্দারেব দখল প্রায হাত ছাড়া। তখন তার ঘুমোবার জায়গা হল বারান্দা। তৃতীয বাচ্চার পর আব কোনোদিন ভুলেও চৌকিতে ঘুমোবাব কথা মনে পড়েনি। ততোদিনে সংসাবের দায দায়িত্ব বেড়ে গেছে। ছেলেমেয়ে একটু একটু কবে বাড়ছে, আড়াল কমছে, সংকোচ জড়তা-লজ্জা কমছে, ঘবেব জিনিসপত্র বাড়ছে, ফাঁকা চৌকিটা আস্তে আস্তে ভবে উঠছে। চৌকি ধীরে ধীবে মাল বাখাব একটা পাটাতনে বূপান্ত-বিত হযেছে। ঘর মাত্র একটা। চাবপাশে ঘোবানো বাবান্দা। বাবান্দাতেই শোযা খাওযা সব চলে। শুধু দক্ষিণেব বাবান্দাকে দুপাশ থেকে ঘিবে একটা খোপ মতো কবা হযেছে। যদি কোনো অতিথি আসে বিশেষত বোনেবা যখন

তাদের স্বামী সন্তান নিয়ে বেড়াতে আসে তখন তারা অই খোপটা ব্যবহার করে। এখন অই খোপটাই আন্তোনিওর থাকার কাজে লাগাতে হবে। হাজার হোক লোকটা বিদেশী। বড় কোম্পানির চাকুরে। শিক্ষিত দীক্ষিত লোক। তাকে একেবারে নাঙ্গা বারান্দায় ঘুমোতে বলা যায় না। ফলে এমন পরিস্থিতিতে সব দিক সামলে নিতে গিয়ে সিকান্দার আর বাড়ির কারো সাথে মন খুলে কথা বলতে পারে না। এদিকে বাচ্চাগুলো পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে। যেখানে সিকান্দার ওরাও সেখানে। শুধু তাই নয়, গাঁয়ের যারা বন্ধু বান্ধব, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজন, তারা ইতোমধ্যেই খবর পেয়ে গেছে। তারা যে যার কাজ ফেলে, কাজ সেরে সিকান্দারের সাথে দেখা করতে আসছে। একজন একজন করে তাদের সংখ্যা বাড়ছে। তারা এক সঙ্গে এবং সবাই আলাদা আলাদা ভাবে তাদের নানা প্রশ্ন, নানা পরামর্শ নানা প্রস্তাব দিতে চায়। এরা সবাই দুস্থ দরিদ্র মানুষ। গাঁয়ের একজন যে ভাবেই হোক কপাল ফিরিয়ে ফেলেছে তাকে ধরে যদি নিজের কপালটাও ফেরানো যায়। সুতরাং তারা তাদের কথা না বলে উঠবে না। তা সে যতো রাত হয় হোক। সিকান্দার ব্যাপার বুঝে স্ত্রীর হাতে ব্রিফকেসটা দিয়ে বলল—সাবধানে রাখো। সেই সাথে চোখের ইঙ্গিতে বোঝাল, ভেতরে মালকড়ি আছে। সুরাইয়া ব্রিফকেস নিয়ে চৌকির তলাকার অন্ধকারে কয়েকটা হাঁড়ি-কলসির আড়ালে এমন ভাবে রাখল যেন সহজে কারো নজরে না পড়ে।

সিকান্দার জামাপ্যাণ্ট খুলে একটু স্বাভাবিক হয়ে ভেতর বারান্দা থেকে বারবারান্দায় এল। ততোক্ষণে বারান্দায় আর বসার জায়গা নেই। কেউ কেউ ভেতরের ছোট্ট উঠোনে মাদুর পেতে বসে পড়েছে। এই অবস্থায় কার সাথে কি কথা বলবে? ও একটু ভেবে নেয়। এদেরকে কাজ দিলে কাজ করবে। সবাই কাজ চায়। বেশ, তবে কাজ করুক। আমার হয়ে খাটা খাটুনি করুক। ওরাও পয়সা পাবে আমারও বাড়ির কাজকর্ম গুলো গুছিয়ে নেয়া হবে। একা মানুষ কতোদিক সামলাবো?

সিকান্দার ভিড়ের ভেতর একটা নজর বুলিয়ে একজন বয়স্ক লোককে কাছে ডাকে। লোকটা রাজমিস্ত্রী। অঞ্চলে মোটামুটি ভালো মিস্ত্রি হিসেবে নাম আছে। বাইরে বাইরে কাজ করে। গাঁয়ে আর কে পাকা বাড়ি বানায়? কার সে ক্ষমতা আছে? ফলে প্রায় সারা বছর তাকে বাইরে বাইরে কাটাতে হয়। ওকে ডেকে সিকান্দার জিগ্যেস করে—মতিন ভাই, এখন বাড়িতে

আছো, না বাইরে যাবে ?

—আছি। কিছুদিন থাকতে হবে। মেয়েটার অবস্থা ভালো না। মাস দুয়েক ধরে জ্বর আর কমছে না। কি যে করি !

—কাজ করবে ?

—কেন করবো না ? কাজ না করলে খাবো কি ?

—সিতেশ সরকারের ভাটায় যাও। মোটামুটি দশ বারো কামরার একটা দোতলা বাড়ির যা ইট লাগে তার বায়না করে এসো। কাল থেকে বাড়ির কাজে লেগে যাও।

—বাড়ির প্লান কই ?

—আরে প্লান টপ্লান পরে হবে, আগে বাড়ি শুরু করো। কাল ভোর বেলা থেকেই লেগে পড়।

—ধুর ! তাই হয় নাকি ? প্লান ছাড়া বাড়ি হয় ?

—হবে। লোক আছে। প্লান আজ রাতেই হয়ে যাবে। তুমি ইট বালি সিমেন্টের ব্যবস্থা করো, আজ রাতের ভেতর। কাল থেকে বাড়ি উঠবে। ব্যস্। আর কোনো কথা নয়। যাও। খাটো, খাও। চিন্তা নেই।

সিকান্দার পাঁচশ টাকার একটা খোলা বাণ্ডিল থেকে কুড়িটা নোট আলাদা করে গুণে মতিনের হাতে দেয়। মতিন ভালো করে গুণে দেখে বলে—দশ হাজার ?

—হ্যাঁ। আপাতত একহাজার তোমার। বাকি টাকা ইটবালি সিমেন্টের বায়না করো। কাল কিন্তু কাজ শুরু করতে চাই। বুঝলে ?

—হয়ে যাবে। তুমি প্লানটা করে ফেল।

—ঠিক হ্যায়। চিন্তা নেই।

মতিনকে বিদায় করে অন্যদের দিকে তাকায়। ওরা সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। যদি কিছু জুটে যায়। সিকান্দার একটু চিন্তা করে। খবরটা এর মধ্যে রটে গেছে নিশ্চয়। কি ভাবে রাতারাতি তার ভাগ্য ফিরে গেছে তার একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দরকার। নইলে সবাই ভাববে চুরি ডাকাতি করেছি। সে ওদের দিকে ফিরে বলে—একটা বড় কোম্পানির

এজেন্সি পেয়ে গেছি। অনেকদিন ধরে চেষ্টা করছিলাম। আজই সব ঠিকঠাক হয়ে গেল। অনেক বড় কোম্পানি। সারা দুনিয়ায় ওরা ব্যবসা করে। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা। আমি বহু কষ্টে এজেন্সিটা বাগালাম। অনেক ধর-পাকড় করে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তবে ব্যাপারটা করা গেল। পয়সা কড়ি ভালোই দেবে। মানে আমার কমিশান। তা তোমরা আমার কাজকর্ম দেখাশোনা করো। আমি ভাবছি এখানেই একটা অফিস খুলে ফেলবো। তোমরা কিছু কাজ কাম পাবে। আমারও দেশের লোকের জন্যে কিছু করার সুযোগ আসবে।

ওর কথায় যে যার জায়গা ছেড়ে ওর দিকে এগিয়ে যায়। কাজ তবে মিলবে! কি কাজ, কেমন কাজ, কোথায় কাজ সে সব পরের কথা। আপাতত বড় কথা কাজ মিলবে। ওদের মুখে আশার আলো ঝল্‌কে ওঠে। যে যার দুঃখ বেদনা—অভাবের কথা ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে শুরু করে। সিকান্দার এসব ঝামেলা এড়াতে টাকার বাণ্ডিলে হাত দেয়। সমস্যা হচ্ছে পাঁচশ টাকার নিচেয় কোনো নোট পকেটে নেই। তাই সই। যারা উপস্থিত ছিল প্রত্যেককে পাঁচশ টাকা করে দিয়ে বলল—কাল সকালে এসে বাড়ির কাজে লেগে পড়। পরে দেখি, কোম্পানির কি কাজে তোমাদের লাগানো যায়।

আপাতত ভিড় কমে। সিকান্দার নিঃশ্বাস নেয়ার একটু ফুরসত পায়। বারান্দার খুঁটিতে গা এলিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকায়। সে দুটো মাঝারি আকারের মোরগ নিয়ে রান্না ঘরের কোণের দিকটায় এগিয়ে যাচ্ছে। তার পেছনে বড় মেয়ে টুনি। তার মানে, রাতে মাংস হবে। হোক! খাসির মাংস আনবে বলে ভাবছিল। তা আজকে মোরগ হোক, কাল খাসি হবে। কিভাবে দুনিয়া বদলায়! কালই সুরাইয়া বলছিল, মোরগ দুটো বেচে দিয়ে টুনির একটা ফ্রক কিনতে হবে। মেয়েটা বড় হচ্ছে। লজ্জা শরমের বোধ বাড়ছে, এখন ছেঁড়া-নোংরা কাপড় পরে স্কুলে যেতে চায় না। আজকালের ভেতরই মোরগ বিক্রি হয়ে যেত। বিক্রি হওয়া মানে অন্যের ভোগে যাওয়া। অন্যের ভোগের মাল কি চমৎকার ভাবে নিজের ভোগে লেগে যাচ্ছে। এই হল জীবন। কখন যে কার মাল কার ভোগে লাগে! আচ্ছা, আমার অতীত কার ভোগে লাগবে? সে কি ভাবে আমার অতীত ব্যবহার করবে? আমার অতীতটাকে এভাবেই জবাই করা হবে? 'সিকান্দার! একটু শোনো'। আব্বা গম্ভীর গলায় ডাকলেন। আব্বার এই ডাক ভালো নয়। খুব গভীর বিষয়ে কথা বলার

দরকাব পডলে তবেই তিনি এমন ভারি গলায ডাকেন। আর সবচেযে সমস্যার ব্যাপাব হল, ছোটবেলা থেকে যতোবাব ওই ডাক শুনে বাবার কাছে গেছে, ততোবাবই বাবাব কাছে বকুনি খেতে হযেছে। কিন্তু আজ আবাব কি হল ? এখনো, এই বুড়ো বয়সেও এই ডাক শুনতে হবে ! কেন, আবাব কি কবলাম ? 'সিকান্দাব' ! আবো ভারি আরো গম্ভীর গলাব ডাক শোনা গেল।

আট

সিকান্দাব বাবান্দা থেকে নেমে আব্বাব কাছে গেলে তিনি কোনো কথা না বলে বাডিব পেছন দিক লক্ষ্য কবে হাঁটতে শুরু কবলেন। হাঁটতে হাঁটতে ওবা একেবাবে বাডিব সীমানায় এসে দাঁডালেন। বাড়িব শেষ প্রান্তে বিল। বিল পেরিযে অদেকটা দূবে নদী। নদীব ওপাবে গ্রাম। ওদেব বাডির এই সীমানায এসে দাঁডালে এতোটা ফাঁকা জাযগা দেখা যায বলে কখনো কখনো সিকান্দাব এখানে এসে দাঁডায। বিশেষ কবে বিকেলে। সূর্যাস্ত দেখা যায। ছোট বেলায এটা একটা খেলাব মতো ছিল। সূর্যাস্তেব সময সূর্যেব রং ধীবে ধীবে কেমন লালচে হযে আসে। সোনালি আভা থেকে ক্রমশ লালচে, ক্রমশ লালচে থেকে লাল টকটকে, তাবপব ধীরে ধীবে লালচে থেকে কালচে তাবপব টুক কবে সূর্যটা একসময ডুবে যায়। এমনও হযেছে, ও সূর্যেব দিকে টানা চোখ বেখে ভাবছে, আজ ঠিক সূর্যেব ডুবে যাওযাটা দেখবোই দেখবো। দেখতে দেখতে এক টানা তাকিযে থাকতে থাকতে হঠাৎ কোনো কাবণে একটু চোখটা ফিবিয়ে আবাব ঘুবে সূর্যেব দিকে তাকিযে দেখে ততোক্ষণে সূর্যেব অর্ধেক নেই, তলিযে গেছে। তখন এতো খাবাপ লাগতো। আজ এতোকাল পরে সেকথা মনে পডতেই কেমন একটা মিশ্র অনুভূতি হয। ভালো আবাব মন্দও। আনন্দেব আবাব বেদনাব। কেন তা ব্যাখ্যা কবা অসম্ভব। হয়তো এমন হতে পাবে, স্মৃতি মানেই একই সাথে আনন্দেব একই সাথে বেদনাব। আচ্ছা, স্মৃতি কি অতীতের মধ্যে পডে না ? অবশ্যই ! তাব মানে আমাব স্মৃতি— 'সিকান্দাব' !

আব্বা সূর্যেব দিকে তাকিযে ওকে ডাকলেন। সূর্যের রক্তিমাভা দেখা যায। একটু পবেই সূর্য অস্ত যাবে। অস্তমিত সূর্যের মুখোমুখি দাঁড়িযে আব্বা আবাব ডাকলেন—'সিকান্দাব' !

—বলুন। সিকান্দার পেছনে দাঁড়িযে সাড়া দেয। আব্বাব কাঁধেব

দিকটায় ওর নজর পড়ে। শ্যামলা চেহারার মানুষটির কাঁধের রং যেন অদ্ভুত! ফর্সার প্রশ্নই আসে না। কালোও নয়। ঠিক শ্যামলাও নয়। কেমন রক্তিমাভ। সূর্যের রং লেগেছে বলে? না কি মৃত্যুর রং। মৃত্যুর রং বোধ হয় এমনই অদ্ভুত, ব্যাখ্যাতীত, অপ্রাকৃতিক, ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু আব্বার ঘাড়ে হঠাৎ মৃত্যুর রং লাগবে কেন? দূর ছাই! যতোসব উদ্ভট ভাবনা।

আব্বা ওর দিকে পেছন ফিরেই প্রশ্ন করলেন—তুমি টাকাটা কোত্থেকে পেলে?

আব্বার এই প্রশ্নের জন্যে সিকান্দার প্রস্তুত ছিল। এই একই প্রশ্নের জবাব তাকে আরো বহুবার দিতে হবে, সে জানে। অন্যদের কি বলবে, তাও মনে মনে রিহার্সাল ক'রে নিয়েছে। দু একবার ইতোমধ্যে তা বলাও হয়ে গেছে। কিন্তু আব্বার প্রশ্নের জবাবে তা বলা মুশকিল। বলতে পারলে ভালো হতো কিন্তু পারা যাচ্ছে না। সবচেয়ে বড় সমস্যা, মিথ্যে বললে, বানিয়ে বললে, এমন কি সত্যি-মিথ্যের মিশেল দিলেও উনি ধরতে পারেন। সে হবে ভয়ংকর ব্যাপার। উনি যদি একবার বোঝেন, মিথ্যে বলছি, ব্যস্, হয়তো কথাবার্তা বন্ধ করে দেবেন। আর সেই মৌনব্রত, অসহযোগ আন্দোলন যে কতোদিন ধরে চলবে কেউ বলতে পারে না। এক আধ বছরও চলতে পারে। এমন লোককে নিয়ে কি যে সমস্যা!

—আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

—আমি একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির ··

—ওই গল্পটা আগেই শুনেছি—সত্যি কথা বল!

—আপনি ওটা গল্প বলছেন কেন? যা সত্যি—

—ওটা সত্যি নয়। যা সত্যি তাই বল।

—কি যন্ত্রণা! আপনি আমার কথা বিশ্বাস না করলে···

—ওটা সত্যি নয় তাই বিশ্বাস করছি না।

—আমাকে কথাটা শেষ করতে দেবেন তো নাকি?

—শেষ করো।

—আমি একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির এজেন্সি নিয়েছি এটা সত্যি।

—কিন্তু এতো টাকা কেউ এজেণ্টকে রাতারাতি দিয়ে দেয় এটা সত্যি নয়—

—কতো টাকা দিয়েছে বলুন তো ? আপনি কোন কিছু না জেনেই আগেভাগে একটা ধারনা করে বসে থাকবেন।

—বেশ তো। কতো টাকা পেয়েছ, তুমিই বল।

সিকান্দার এবার নিজের ফাঁদে নিজেই আটকে গেল। 'কতো টাকা দিয়েছে' বলতে সে বোঝাতে চাইছিল, আব্বা যতো টাকা ভাবছেন অতোটা নয়। কম। কিন্তু এখন হয় মিথ্যে করে কমিয়ে বলতে হয়। নইলে সত্যি বলে আব্বার হাজার প্রশ্নের হাজার ব্যাখ্যা করার ঝুঁকি নিতে হয়। তার পরেও তাঁকে আদৌ মূল বিষয়টা বোঝানো যাবে কিনা সন্দেহ।

—কি হল, কথা বল ?

—শুনুন। আমি একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির এজেন্সি নিয়েছি এটা সত্যি, বিশ্বাস করুন·

—তুমি পাশ কাটিয়ে যাচ্ছো। কতো টাকা এজেন্সি ক'রে পেয়েছ আগে সেটা বল।

—আপনার মুশকিলটা হচ্ছে এই, আপনি কাউকে কথা বলতে দেন না। নিজের ধারনায় গোঁজ হয়ে বসে থাকেন।

—তার কারণ আমার ধারনা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সত্যি হয়। আর তোমার ক্ষেত্রে ধারনা নয়, আশংকা হচ্ছে!

—কি আশংকা হচ্ছে, সরাসরি বলুন তো ?

—তুমি মারাত্মক কিছু করেছ। মারাত্মক অন্যায় কিছু। হয়তো তার চেয়েও বেশি কিছু! আমি সেটাই জানতে চাই।

—বিশ্বাস করুন। আমি কোনো অন্যায় করিনি।

—বিশ্বাস করো সিকান্দার, আমি তাই বিশ্বাস করতে চাই! কিন্তু আমি জানি, আমি জানি সিকান্দার, তা সত্যি নয়।

—কি সত্যি নয় ?

আব্বা এবার ঘুরে তাকালেন। সিকান্দার চোখাচোখি হতেই চোখ ফিরিয়ে নিল। আব্বার চোখ লাল। লাল কেন ? সেই অদ্ভূত রং এর লাল। অপ্রাকৃতিক, অদ্ভুত, ব্যাখ্যাতীত এক বিষণ্নতায় ভরা লাল। এমন লাল কেউ কখনো দেখেনি। একি মৃত্যুর রং, মৃত্যুর ?

—তুমি অন্যায় করোনি !

—তার মানে আপনি জোর করে বলবেন, আমি অন্যায় করেছি,

তাই তো ?

—তুমি এখনো পাশ কাটিয়ে অবান্তর কথার ফুলঝুরি ওড়াচ্ছো। সিকান্দার! আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি। তোমার দুর্বলতা সবলতা আমার জানা। সিকান্দার নামটা রেখেছিলাম এই জন্যে যে আমার সন্তান হবে সমস্ত দুর্বলতার উর্ধে। মহাবীর আলেকজাণ্ডারের মতোই হবে তার সাহস, শক্তি, পৌরুষ। আসলে সেটা আমার প্রথম যৌবনের আবেগের ব্যাপার ছিল। পরে একটু বই পত্তর ঘাটাঘাটি করে বুঝলাম, আলেকজাণ্ডার বীর নয়, চোর। মানে, ডাকাত! যে চোর একা একা অন্যের মাল গোপনে আত্মসাৎ করে তাকে বলে চোর। আর যে সদলবলে অন্যের মাল জোর করে আত্মসাৎ করে তাকে বলে ডাকাত। আর যে ডাকাত একটা দেশ লুট করে তাকে বলে বীর। সিকান্দার, যখন তোমার নামটার ওপর ঘেন্না হল, ততদিনে তোমার নামটা স্কুল কলেজে পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। পাল্টাবার আর উপায় রইল না। সবশেষে মনকে প্রবোধ দিলাম, নামে কি আসে যায়। আমার সন্তান হবে সৎ, সাহসী, ঋজু, বলিষ্ঠ। কিন্তু এখন বুঝলাম—তোমার নামের মতো তোমার চরিত্রটাও বরবাদ হয়ে গেছে! তুমি আলেকজাণ্ডারের মতো দেশ লুঠ করার ক্ষমতা পাওনি, তাই ছিঁচকে চোর হয়েছ! বড় জোর ডাকাত! খুব বেশি হলে ঠগ, বাঁটপাড়!

—আপনি যা তা বলতে শুরু করেছেন। না জেনে না শুনে না বুঝে ·

—জানাও, শোনাও, বোঝাও। আমি তো ব্যাপারটা বোঝার জন্যেই আপ্রাণ চেষ্টা করছি। বোঝাও।

—আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না বলেই আমি এতোক্ষণ পরিস্কার করতে চাইনি। বিষয়টা একেবারে আধুনিক....

—সিকান্দার, দুনিয়ায় এমন কোনো বিষয় আছে যা বুঝিয়ে বলতে পারলে বোঝা যায় না? না হয় আমি তোমার মতো বিএ এম এ পাশ নই, কিন্তু বুঝিয়ে বললে বুঝবো না এতোটা নির্বোধ বোধ হয় নই।

—মুশকিলটা কোথায় জানেন, পৃথিবী অনেক এগিয়ে গেছে....এখন

দুনিযার প্রায় সব কিছুই কেনাবেচা করা যায়। কেনা বেচা হয়।

—তা বেশ তো। কেনা বেচা করা গেল, তারপব ?

—আমি কি বলি—কি ভাবে বোঝাই—আমি আমার অতীত বিক্রি করে দিযেছি।

—কি বিক্রি করেছ ?

—আমাব অতীত।

—অতীত ! তার মানে তোমার ঐতিহ্য, তোমার সংস্কৃতি তোমার ইতিহাস, তোমার পূর্বপুরুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা, তোমার স্মৃতি, তোমাব সমগ্র স্মৃতি, তোমার সমস্ত সত্তাব তিন ভাগের এক ভাগ !

সিকান্দাব আব্বাব চোখের দিকে তাকিযে রইল বোকার মতো। অতীত মানে যে এতো কিছু, অতীতের সঙ্গে এতো সব বিষয যে অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত অতীত থেকে যে এদেব কিছুতেই বিচ্ছিন্ন কবা যাবে না এই প্রথম সে যেন তা বুঝতে পাবল। পুরোপুরি হৃদয়ঙ্গম কবল। সিকান্দাবেব সমগ্র অতীত যেন পুবো ওজন নিযে তাব সামনে এসে দাঁড়াল। এখন অতীত আর আব্বা পবস্পব যেন পবস্পবেব অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। তাদেব আব আলাদা করা সম্ভব নয়। আব্বাই যেন অতীতেব মূর্তি ধবে সিকান্দাবেব সামনে দাঁডিবে আছেন। সিকান্দাবেব সেই আশ্চর্য অতীতেব চোখের বং লাল, সেই লাল চোখের কোণে যেন হালকা জলেং রেখা, সেই হালকা জলেব বেখায যেন মৃত্যুর মাতাল ছাযা। যেন মৃত্যু ছুটছে, ছুটতে ছুটতে কোনো এক দূব অতীতের গহ্বব থেকে নিকট অতীতের দিকে এগিযে আসছে। এগিযে আসছে কাছে, খুব কাছে। আরো কাছে।

—আব্বা !

—সিকান্দার। তুমি আমাকে বিক্রি কবে দিযেছ !

—কি বলছেন !

—আমি বিক্রি হযে গেছি !

—কি বলছেন আপনি !

—তোমাব সত্তাব তিন ভাগেব একভাগ বিক্রি করে দিযেছ !

—আব্বা !

—তোমার পিতাকে বিক্রি করে তুমি তোমার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছ।

—আব্বা। আব্বা।

—তোমার সত্তার তিন ভাগের এক ভাগ বিক্রি করে তুমি অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছ।

—আব্বা!

—কার জন্যে সিকান্দার, কার জন্যে তোমার এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা? নিজের বিক্রিত অস্তিত্বের জন্যে? নিজের অস্তিত্বের খণ্ডিত অংশের জন্যে? কার জন্যে তোমার অর্থনৈতিক স্বাধীনতা? তোমার সন্তানের বিক্রিত পিতার জন্যে?

—আব্বা! বিশ্বাস করুন…

—তোমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করছি সিকান্দার—তুমি তোমার পিতাকে বিক্রি করেছ। হায় অভিশপ্ত! যে পুত্র তার পিতাকে বিক্রি করতে পারে সে জারজ! সিকান্দার, আমার সিকান্দার! আমি এক জারজ পুত্রের জন্ম দিয়েছি, যে তার পিতার অস্তিত্বের মূল্যে, তার সমস্ত পূর্বপুরুষের অস্তিত্বের মূল্যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছে!

॥ প্রথম পর্ব সমাপ্ত ॥

———

PARICHAY August-October 1998 Regd. No. 13273
WB/EC—265

সম্পাদনা দপ্তর ঃ ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭
ব্যবস্থাপনা দপ্তর ঃ ৩০ / ৬ ঝাউতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০১৭

 দাম ঃ চল্লিশ টাকা